অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষের ঘরবাড়ি
অখণ্ড সংস্করণ
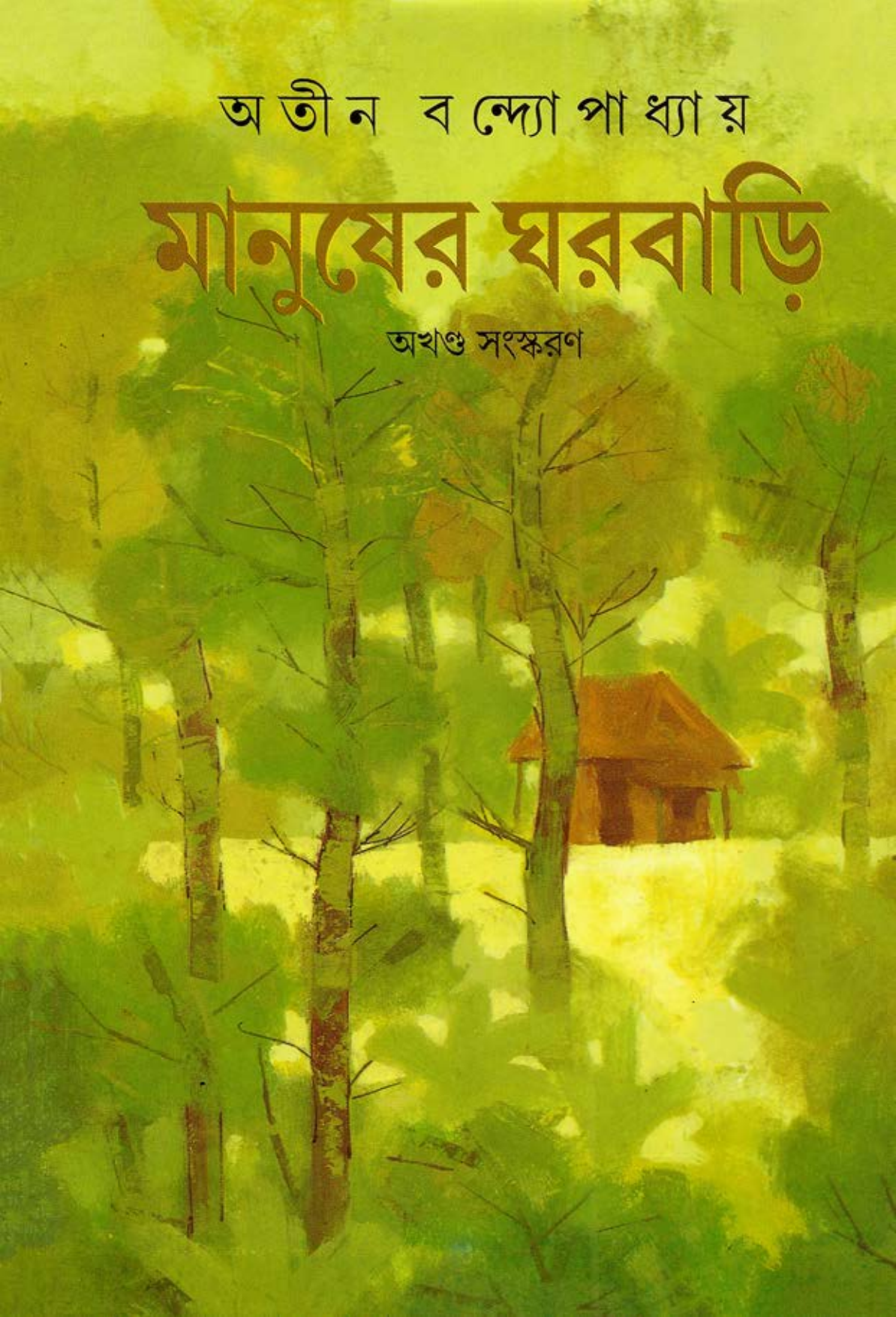
দেশভাগ নিয়ে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজের চারটি পর্ব। প্রথম পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', দ্বিতীয় পর্ব 'মানুষের ঘরবাড়ি', তৃতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান', চতুর্থ পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান'।

কিংবদন্তী তুল্য উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সম্পর্কে অগ্রজ সাহিত্যিক বিমল কর লিখেছেন, অতীনের সেরা লেখা, এর মধ্যে অতীনের সত্তা ডুবে আছে, আমরা যাকে বলি ভর পাওয়া লেখা।—পুতুলনাচের ইতিকথার পর এতটা আর অভিভূত হইনি—অশোক মিত্র। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এই সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এই সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—সমরেশ মজুমদার। সমকালের আর এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছিলেন—দুই বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ঐক্যে বিশ্বাসী বলে আমার জানাতে দ্বিধা নেই যে, অতীনের এই রচনা এযাবৎকালের নজিরের বাইরে। ভাবতে গর্ব অনুভব করছি যে, আমার সমকালে এক তাজা তেজস্বী খাঁটি লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। আজ হয়ত তিনি নিঃসঙ্গ যাত্রী। কিন্তু বিশ্বাস করি, একদা আমাদের বংশধরগণ তাঁর নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা অনুভব করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তিরস্কার বর্ষণ করবে। 'পথের পাঁচালীর' পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে। পাঠিকা ঝর্ণা নাগ শিবপুর থেকে লিখেছিলেন—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পড়ে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ঈশ্বরের সৃষ্ট সুন্দর পৃথিবী দেখে মুগ্ধ হয়ে যেমন তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কৌতুক বিস্ময় জাগে এও তেমনি। এমন অজস্র চিঠি এবং সাহিত্যঋণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। অন্য তিনটি পর্ব 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'অলৌকিক জলযান' এবং 'ঈশ্বরের বাগান' সম্পর্কেও। বিদগ্ধ এবং গুণী ব্যক্তিরা লিখেছেন, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যদি মহৎ উপন্যাস 'অলৌকিক জলযান' তবে মহাকাব্য বিশেষ—আর 'মানুষের ঘরবাড়ি' সোনার কিশোর জীবনের অবিনাশী আখ্যান। শেষ পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান'-এতে আছে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু পরিবারটির সংগ্রামী বিষয়, অভিনব চরিতমালা এবং পটভূমি সহ জীবনের রোমাঞ্চকর অভিযানের লৌকিক-অলৌকিক উপলব্ধি পুষ্ট খণ্ডিত বঙ্গের অখণ্ড বর্ণমালা।

মানুষের ঘরবাড়ি

[অখণ্ড সংস্করণ]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব

শ্রীযুক্ত বাবু অশোক মিত্র

মান্যবরেষু

সোনা এই পর্বে বিল্ব হয়ে আছে

'মানুষের ঘরবাড়ি' কবে লিখতে শুরু করি, তার নির্দিষ্ট সন তারিখ মনে নেই। তবে যতদূর মনে পরে ১৯৭৭ সালে অমৃত শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রথম কিস্তি লিখি। নাথ ব্রাদার্স সম্ভবত ১৯৭৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এই চটি উপন্যাসটি। 'মানুষের ঘরবাড়ি' নামেই প্রকাশিত হয়। সেই থেকে পরপর আরও কিছু কিস্তি পূজাসংখ্যা গুলোতে প্রকাশ হতে থাকে। সব কিস্তিগুলি এক সঙ্গে এই উপন্যাসের অন্তর্গত হয়। এবং 'মানুষের ঘরবাড়ি' নামেই পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় করুণা প্রকাশনী থেকে।

আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কুঁড়ে এবং অলস মানুষ। খুব চাপ সৃষ্টি না হলে লেখা হয় না। আর যা হয়, যে বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করি, তার রেশ মাথা থেকে কিছুতেই সরে যায় না। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' 'অলৌকিক জলযান' এবং 'ঈশ্বরের বাগান'ও প্রায় একই ধরনের রেশ থেকে লেখা। জীবনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই সব উপন্যাসের সৃষ্টি। এই সব উপন্যাস সৃষ্টির সঙ্গেই বোধ হয় মানুষের ঘরবাড়ির বিষয়টি মাথায় ক্রিয়া করে।

১৯৭৬ সালে আমার পিতার মৃত্যু হয়।

আর তখনই মনে হয় জীবনের আসল পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজ থেকে বাদ গেছে। দেশ ভাগের পর এদেশে এসে পিতার সেই একখণ্ড জমি অন্বেষণ নিয়ে শুরু হয় জীবনের আর এক সংগ্রাম। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যে সোনা, 'মানুষের ঘরবাড়িতে' সে বিল্ব বা বিলু। 'অলৌকিক জলযানে' সে ছোটবাবু, 'ঈশ্বরের বাগানে' সে অতীশ দীপংকর—এইভাবে জীবনের অজস্র বিচিত্র বাস্তব, রহস্যময়তা নিয়ে সমগ্র উপন্যাসটি উদ্ভাসিত হতে থাকে। পাঠকেরও অভিজ্ঞতা 'মানুষের ঘরবাড়ি' আসলে সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব। সুতরাং এখন থেকে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এর দ্বিতীয় পর্ব বলেই এই খণ্ডটিকে চিহ্নিত করা গেল। উপন্যাসটির এই পর্বে সোনা বিল্ব হয়ে পিতার সেই ঘরবাড়ি বানানোর মহাকাব্য সুলভ জীবন বোধের কথা লিখে রাখে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সি ১৮৫ প্রফুল্ল কানন
কলকাতা ৭০০ ১০১
৫-৯-২০০১

এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম, দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না। বাবা মা আমাদের ক'ভাই বোন সম্বল করে এদেশে পাড়ি জমালেন সত্য, কিন্তু থিতু হয়ে বসতে পারছিলেন না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—কখনো কোনো প্ল্যাটফরমে অথবা ভাঙা মন্দিরে, পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন বয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা গভীর বনের ভেতর বাবা তাঁর সঠিক আস্তানা খুঁজে বের করলেন।

আমাদের কাজ ছিল সকাল হলে জমির জঙ্গল কাটা, আগাছা সাফ করা। মানুষের নতুন ঘরবাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে। অথবা সেই প্রাচীনকালের মতো, কোথাও জল এবং জমিতে উর্বরা শক্তি থাকলেই যেমন জনপদ গড়ে উঠত আমরাও তেমন একটা জনপদের আদি বাসিন্দার মতো জায়গাটাতে এসে উঠেছিলাম।

দু' বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে থিতু হয়ে বসার আশায় বাবা খুব খুশী। বাবা বলতেন, জমি খুবই উর্বরা। রাজরাজড়ার পতিত জমি, নানা রকমের জীবজন্তুর বাস, এই সবই বোধ হয় জমিটার উর্বরা শক্তির উৎস। জমি খুব উর্বরা বলতে বাবা বোধ হয় এ-সবই বোঝাতে চাইতেন। বাবা খুব খুশী থাকলে মাঝে মাঝে বলতেন, দু ক্রোশ হেঁটে গেলে শহর, আড়াই ক্রোশের মাথায় একটা কাপড়ের মিল, বড় মাঠ পার হয়ে গেলে পুলিস ব্যারাক, জলের অভাব নেই, খাবারের অভাবও হবে না।

এত বড় বনটা কতদূর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছু বোঝার উপায় নেই। বনটার সামনে একটা বড় শস্যবিহীন মাঠ, তারপর দিঘির মতো কালো জল টলটল করছে, একটা পুকুর এবং আমবাগান ছাড়িয়ে ব্যারাক বাড়ি। হেস্টিংসের আমলের জীর্ণ প্রাসাদ-সংলগ্ন সব বেড়া দেওয়া প্ল্যাটফরমের মতো লম্বা খুপরি ঘর। জায়গাটা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বাবার কতটা উৎসাহ থাকবে মা বুঝি টের পেত। সংশয় ছিল হয়তো আবার কোন নবর বাবার খবর পেয়ে বাবা উধাও হতে চাইবেন। জমিটার প্রশংসায় মা বেশি রা করত না। প্রায় সময় চুপচাপ শুনে যেত। কিছু বলত না। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয়।

হেস্টিংসের আমলের সেই পুরনো বাড়িটাতেই ছিল পুলিসের আরমারি। বিরাট গম্বুজয়ালা বাড়িটার সামনে মাঠ। সকালে বিউগিল বাজলে শ'দুই রিক্রুট ফলইনে দাঁড়াত। তারপর পিটি প্যারেড আরম্ভ হয়ে যেত। মাঠের ভিতর রেলগাড়ির মতো সব লম্বা খুপরি ঘর, আমবাগানের ভিতর সেই কুঠিবাড়ি, পুকুরের টলটলে জল আর মানুষজনের সাড়া শব্দে বনটাকে বাবার কাছে মানুষের আবাসযোগ্য মনে হয়েছিল হয়তো। বাবা এখানেই শেষবারের মতো থিতু হয়ে বসতে চাইলেন।

বাবার কাছে পরে জেনেছি এই বনভূমির পশ্চিমে রয়েছে কারবালার মাঠ। পূবে ব্যারাকবাড়ি এবং বাদশাহী সড়ক, উত্তরে রাজরাজড়ার পুরনো শ্যাওলা-ধরা প্রাসাদ। বাবা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এসে খবর দিতেন। অথচ প্রথম দিন এখানে এসে বাবার কথায় মনে হয়েছিল আমাদের সবাইকে একটা গভীর বন দেখাতে নিয়ে এসেছেন।—এই যে বনটা দেখছ, এখানে আছে সব বিষধর সর্প। বাবার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় এলে সাধু ভাষার ব্যবহার। —বিষধর সর্প, একদা ব্যাঘ্র দেখা যেত। তরুলতা বলতে শাল, শিমূল। উত্তরে দক্ষিণে এর বিস্তার ক্রোশের ওপর। রাজরাজড়ার পতিত জমি বিনে পয়সায় বলতে গেলে মিলে গেল। উর্বরা জমিতে চাষাবাদ হলে তখন দেখবে এর চেহারা কত আলাদা।

বনটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার কিংবা পিলুর হয়নি। শুধু বাবা বলেছেন, বনের শেষে আছে রাজবাড়ি। পিলখানা আছে একটা। হাতি বাঁধা থাকে। একদিন তোমাদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাব।

দেশ ছেড়ে আসার পর এই নিয়ে বাবা চারবার জায়গা বদল করলেন। কিছুদিন এখানে বসবাস করতে করতে কি কখন মনে হবে বাবার, লোটা কম্বল গুটিয়ে ফের রওনা। তার আগেই রাজবাড়িটা দেখে আসতে হবে! অনেকদিন পর আবার হাতি দেখার এই মৌকা। বাবার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজাবার আগেই আমি এবং পিলু কাজটা সেরে ফেলব ভেবেছি।

আসলে আমাদের অন্নকষ্ট আরম্ভ হলেই বাবা এমন একটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতেন, যেখানে দুবেলা পেট পুরে আহার পাওয়া যায়—সদলবলে তার খোঁজে তখন শুধু রওনা হওয়া। খোঁজখবর করবেন, দেশের লোক কে কোথায় এসে উঠেছে, কি ভাবে বেঁচে আছে। এবং কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব ছিল না। সেই জায়গাটাতে যাবার আগে যা কিছু অসুবিধা ঘটাত আমার মা। মাকে সহজে তিনি বাগে আনতে পারতেন না। মা বলত, এখানেই কোথাও কিছু জোটাতে পার কিনা দ্যাখো। ঘুরে ঘুরে আর পারছি না।

বাবার বিদ্যা বলতে যজনযাজন। এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন। পুজো-আর্চা করতেন। এখানে এসে তেমন একটা উপযুক্ত কাজের সন্ধানেই আছেন। যদি কোথাও পাওয়া যায়। একবার খবর এল গুপ্তিপাড়াতে সব বনেদী মানুষের বাস। সেখানে গেলে এমন একজন সৎ ব্রাহ্মণের কিছু একটা হয়ে যাবেই। গুপ্তিপাড়াতে আমরা একটা ভাঙা মন্দিরের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাবা খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো চলাফেরা করলেন কিছুদিন। ঘাটে স্নানের সময় শব্দই ব্রহ্ম—এমন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করতেন যে মাঝে মাঝে মনে হত প্ল্যাটফরমে রেলগাড়ি পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়েছে। আর নড়তে পারছে না।

বাবার বোধ হয় আশা ছিল, ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে—লাইনবন্দি হয়ে আসবে মানুষজন। যাবতীয় পূজা পার্বণে ডাক পড়বে মানুষটার। এমনই বোধহয় সব মনে হত তাঁর। অথচ গাড়ি যায় ট্রেন আসে। বাবুদের সব কাজ কাম হয়ে যায়, ভাঙা মন্দিরে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। বাবা তারপর রেগে মেগে কোথায় চলে যান। আহার আমাদের কমে আসে। মন্দিরের চাতালে আমরা উপোসী মানুষ, কখন বাবা আসবে এবং না বলে না কয়ে তিনি কোথায় যে চলে যেতেন! তারপর একদিন ফিরে এসেই যেন একেবারে সদরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—ওঠো ওঠো। সব ম্লেচ্ছর বাস! মানুষ এখানে থাকে না। গলসীতে নবর বাবা আছে। সে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে। গোপালদির বাবুরা ওখানে বিরাট খামার করেছে। নবর বাবা চালের আড়ত করেছে বর্ধমান শহরে। না খেয়ে আর মরতে হবে না। স্টেশনে নবর বাবার সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল।

বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হত চালের আড়তটা আসলে নবর বাবার নয়, আমার বাবার। আর অন্নকষ্ট থাকবে না। কেবল খাও আর খাও। সারাদিন—অহ সে কি স্বপ্ন! যখন তখন খেতে বসে যাব। বাবা কত সহজে সব কিছু নিজের বলে ভাবতে পারতেন। বলতেন, এত বড় আড়ত নবর বাবার—চার পাঁচটা পেটের সংস্থান হবে না সে কি হয়! রওনা হবার আগে ধুমধাড়াক্কা লেগে যেত। এটা নাও ওটা নাও। কিছু পড়ে থাকল না তো। স্নান আহার করার সবুর সইত না বাবার। রওনা হতে পারলেই হল।

পিলু আর আমার তখন কাজ ছিল স্টেশনে বসে দুর্লভ হাঁড়ি পাতিল, ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া শীতলপাটি পাহারা দেওয়া। চারপাশের মানুষজনদের মনে হত চোর বাটপাড়। কে কি ভাবে ঠকিয়ে শীতলপাটি কিংবা ভাঙা বাক্সটা মাথায় করে ভাগবে কে জানে!

আর ট্রেনে সেই পকেটমার হইতে সাবধান—এমন সব বাক্য জোরে জোরে পড়তে আমাদের ভাল লাগত। আর তখন এই গাড়িতে কে পকেটমার নয় সেটা ঠিক করাই ছিল বড় দুরূহ কাজ। মনে হত সবাই পকেটমার। গাড়িতে সবাই সবাইকে বুঝি পকেটমার ভাবছে। আমাদের যা চেহারা এবং যা অবস্থা সহজেই সবাই পকেটমার ভেবে ফেলতে পারে। গাড়িতে উঠে ভয়ে আমরা দুই ভাই কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকতাম। কারণ আমার আর পিলুর যা পোশাক-আশাক ওতে অন্তত চোর বাটপাড়

না ভাবুক, চোর বাটপাড়ের আণ্ডা বাচ্চা ভাবতে পারে।

মা'র মুখ তখন আরও করুণ। একে বিনা টিকিটের যাত্রী—তার ওপর ট্রেনের গায়ে ও-সব লেখা, মা বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলবে। এত ভয় যে বাংকে না বসে নিচে বসে পড়েছে। বিনা টিকিটের যাত্রী—কখন কোথায় নামিয়ে দেবে—তার চেয়ে নিচে বসে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। নিচে তো আর কেউ বসে না। কারো জায়গা দখল করেও মা বসে নেই। কিছুতেই কারো কোনো অসুবিধা হোক মা চাইত না। আমরাও পাশে গোল হয়ে লটবহরের মতো গাদা মেরে পড়ে থাকতাম। বাবার অবস্থা একেবারে অন্যরকমের। যেন সংকীর্তনের দল নিয়ে বের হয়েছেন। গাঁয়ে গঞ্জে ঈশ্বরের নাম দেবে তার আবার ভাড়া কি! এবং সহজেই এত ভাল মানুষ হয়ে যেতেন তখন যে আমার মা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যেত।

আর আমার বাবা তখন এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে কখনও কি দেখতেন। কখনও দরজায়। কোনো স্টেশনে প্ল্যাটফরমে নেমে ঘোরাঘুরি করতেন। যেন বাবার জমিদারি ওটা। কার কি বলার আছে! আর চেকারবাবুকে দেখলেই মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে যেত। কিন্তু কাছে এলে একেবারে তিনি দু পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলতেন। বাবার হাসি দেখলেই বোধ হয় টের পেত নির্ঘাত রিফিউজি।

বাবা তখন সব সামলেসুমলে একেবারে অন্তরঙ্গ মানুষের মতো কথা-বার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন চেকারবাবুর সঙ্গে। যত বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তত বাবা মনে যেন বেশি জোর পাচ্ছে। এবং সব সময় একটা লোককে স্যার স্যার করলে যা হয়, একসময় চেকারবাবুটি যথার্থই সহৃদয় হয়ে উঠতেন। আর যেই না সামান্য সহৃদয় হয়ে ওঠা, বাবার সেই প্রথম আপ্তবাক্যটি মুখ ফসকে বের হয়ে আসত—স্যার আপনার দেশ ছিল কোথায়?

বাবার সাহস দেখে চেকারবাবুটি তার কাজকর্মের কথা ভুলে যেত। বোধ হয় বিরক্তও হতো। আচ্ছা ফিচেল লোক তো। তোমার কি এত দরকার আমার দেশ বাড়ির খবরে।

আমরা নানা জায়গায় বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই আপ্তবাক্যটির মূল ভাবার্থ ততদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছি। ঢাকা জেলার মানুষ আমরা। এতটা সগৌরবের জেলা বাংলাদেশে আর যেন একটাও নেই। বাবার অহংকার ঢাকা জেলার লোক দেশবন্ধু, ঢাকা জেলার লোক বিজ্ঞানী জগদীশ বসু। আর সেই জেলার লোক বাবার ডাকসাইটে জমিদার দীনেশবাবু। এই তিন ব্যক্তি বাবাকে তাঁর জেলা সম্পর্কে আমাদের এই দুঃসময়ে খুব অহংকারী করে রাখে মাঝে মাঝে। চেকারবাবুটাবুর সঙ্গে দেখা হলেই সেটা তাঁর যেন আরও বেশি করে মনে হয়।

বাবার বুঝি খুব ইচ্ছে হত, চেকারবাবু যদি ঢাকা জেলার লোক হন! ঢাকা জেলার লোক হলেই নিশ্চিন্ত। একই জেলার মানুষ, সুতরাং ভাই ব্রেদারের মতো। এবং সেই প্রথম আপ্তবাক্যটির পর বাবা আর কি বলবেন, তাও জানা থাকত। ঢাকা জেলার লোক হলেই বাবার পরের আপ্তবাক্যটি হচ্ছে, দীনেশবাবুকে চেনেন?

চেকারবাবু যদি জবাব না দিত তাতেও তাঁর কিছু আসত যেত না। ঠিক বাবা পরের তিন নম্বর আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করতেন, কি দেশ ছিল বলুন! কত বড় পাপ করলে সে দেশ ছেড়ে মানুষকে আসতে হয়! আমাদের আর কি থাকল! চেকারবাবুটি হয়তো তাঁর একটা কথাও শুনছে না। কিন্তু বাবার কথার কামাই নেই। চার নম্বর আপ্তবাক্যটি আবার বের হয়ে আসত।—দীনেশবাবুকে চেনেন না! ঢাকা জেলার লোক হয়ে তার নাম শোনেন নি! আমার তখন মনে হত, দীনেশবাবু হচ্ছে বাবার দেখা পৃথিবীতে সব চেয়ে সেরা মানুষ। সে মানুষটার নাম জানে না ঢাকা জেলাবাসী চেকারবাবু—কি তাজ্জব! লোকটা আসলে তখন ঢাকা জেলার কিনা বাবার সংশয় হত। তাঁর পাঁচ নম্বর আপ্ত বাক্যটি আর মুখ ফসকে বের হয়ে আসত না। কেমন দমে যেতেন একেবারে। মুড়াপাড়া কত বড় গ্রাম—শীতলক্ষার পারে দীনেশবাবুর সেই প্রাসাদের মতো বাড়ি, দীনেশবাবুর নুন খায় নি ঢাকা জেলার মানুষ বাবার বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। আর কি বৈভব। পূজাপার্বণে দোল-দুর্গোৎসবে তিনি ছিলেন সে বাড়ির প্রাণ। দীনেশবাবু এমন মানুষ, যাঁর পরিচয়ে তাঁদেরও পরিচয় মিলে যাবে। এবং বাবার মুখ দেখলেই আমরা টের পেতাম, তাঁর ছ নম্বর এবং শেষ আপ্তবাক্যটি এবারে বের হয়ে এল বলে,

আমাদের এমন দিন ছিল না মশাই, যা দেখছেন বুঝছেন আমরা তা নই।

তখনই আমার মা নড়েচড়ে বসত। বাবার এই অসহায় উক্তি এতবার মা শুনেছে যে আর সহ্য করতে পারত না। বাবার এই দীন হীন উক্তি মাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলত। এবং তখনই মনে হত বাবার ডাক পড়বে এবার। —দ্যাখ তো বিলু লোকটার সঙ্গে তোদের সেনাপতি কি এত ব্যাজর ব্যাজর করছে।

আমি উঠে গিয়ে বলতাম, বাবা, তোমাকে ডাকছে।

কে ডাকছে, কেন ডাকছে বাবার সব জানা। বলতেন, যাচ্ছি যাচ্ছি। কিন্তু যতই তিনি চড়া গলায় কথা বলুন না কেন, তাঁর আর এক দণ্ড দেরি করার সাহস থাকত না। পৃথিবীতে এখন একমাত্র যাকে সমীহ করার সে হচ্ছে আমার মা! পাশে চলে এসে বলতেন, ডাকছ কেন!

—কি অত ব্যাজর ব্যাজর করছ।

বাবার রক্ত বোধ হয় গরম হয়ে যেত। এবং সেই এক কথা—আরে রণ-সাজে আছি! এখন কে কোথায় কি করে বসবে তার আমরা কতটুকু জানি। সবাইকে খুশী না রাখলে চলে!

রণ-সাজে কথাটা বাবা খুব ইদানীং ব্যবহার করছেন। আর মাও বাবাকে সেই সুবাদে সেনাপতি আখ্যা দিয়েছে। এখন আর মা তোদের বাবা না বলে, বলে, তোদের সেনাপতি কোথায় গেল রে।

বাবা আবার লাফিয়ে কামরার দরজায় ছুটে গেলে মা বলত, দ্যাখ তোদের সেনাপতি কার সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে গেল।

আমরা বুঝতে পারি মার ভয়টা কোথায়। এমন একটা যুদ্ধের ফ্রণ্টে বাবা বোধ হয় তাঁর স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারছেন না। মার ভয় সেই চেকারবাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো স্টেশনেই নেমে পড়বেন। নেমে পড়বেন না নামিয়ে দেবে কে জানে। কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই—কি যে হবে! কিছু বললেই রেগেমেগে বলবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রণ-সাজে আছি। কখন কি হবে কিছু বলা যাবে না।

মার তখন আর কোনো উপায় থাকে না।—মতিভ্রংশ হয়েছে তোমার। মা খুব বেশি গালাগাল দিলে বাবাকে এমন সব নিষ্ঠুর কথা বলত।

মা কোনো উপায় না দেখে বলল, যা তো, কি বলছে শোন।

খুব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রেন তেমনি দ্রুত আমাদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে।

কাছে যেতেই বাবা বললেন, তোর মাকে বল সামনের স্টেশনে নামব।মার কাছে ফিরতে না ফিরতেই দেখলাম বাবাও ফিরে এসেছেন। সেই আমাদের হাঁড়ি পাতিল, শেতলপাটি, একটা পেতলের কলসি, বালতি দুটো এবং জীবনধারণের যা কিছু প্রয়োজন—কারণ আমাদের সঙ্গে এমন সব মহামূল্য সামগ্রী রয়েছে যে একটা ফেলে গেলে প্রচণ্ড সর্বনাশ হবে। বাবা গুনতে থাকলেন, আমি গুনে দেখলাম। পিলু টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক নিয়েছে কিনা মা একবার গুনে দেখল—একটা শেষ পর্যন্ত কম পড়ে যাচ্ছে—কি গেল, খোঁজ খোঁজ—যা চোর বাটপাড়ের দেশ, কোনটা কে নিয়ে যাবে—খুঁজে পাওয়া গেল, একটা ছেঁড়া চটের বস্তা। বাবা মহাখুশী কিছুই খোয়া যায়নি দেখে। তাঁর ছেলেরা যে ভীষণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ভেবে হয়তো গানই ধরে দিতেন—কিন্তু স্টেশনে ট্রেন তখন থেমে গেছে। বাবার আর গান গাওয়া হল না। হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। যেন স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন, নবর বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে মহামান্য মানুষের মতো স্টেশনে নিতে এসেছে নবর বাবা।

কেউ স্টেশনে ছিল না। বাবা স্টেশনে নেমেই খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথায় নবর বাবা, কোথায় সেই গোপালদি বাবুদের খামার! যাত্রীরা চলে গেলে শুধু ফাঁকা প্ল্যাটফরম পড়ে থাকল। অথচ এমন একটা অচেনা নির্বান্ধব জায়গায় বাবা এতটুকু ঘাবড়ে গেলেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কোথায় আর অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি হবে। স্টেশনেই থাকার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্টেশনের কল থেকে জল নিয়ে এলেন বাবা। প্ল্যাটফরমের একপাশে ছোট মতো একটা সেডও আবিষ্কার করা গেল। সেডটা পাওয়ায় জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। নবর বাবা কোথায় থাকে, নবর বাবা এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়ে দু-একজনের কাছে খোঁজ খবরও নিলেন। সবাই বাবার কথাবার্তা শুনে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয় মনে করল। কেউ আর দাঁড়ায় না। বাবার কথা শুনলেই পালায়। অন্ধকারে অদৃশ্য জনতার দিকে তখন বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। গোপালদির বাবুরা আছেন এখানে,

কোনদিকটায়—তারও খোঁজখবর পাওয়া গেল না কিছু। বাবা কি বুঝে আর আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। ঠায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মার বোধ হয় মায়া হল। বলল, ডেকে আন।

ফিরে এসে খুব নম্র গলায় বাবা বললেন, ধনবৌ, আজকের মতো এখানেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

মার কোনো যেন এতে আর আপত্তি নেই। অথবা মার চোখমুখ দেখে বোঝা গেছিল, বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না। শুধু বলল, শ্রীশ পাল এখানে কোথায় থাকে না জেনেই চলে এলে।

—সেই তো বর্ধমান স্টেশনে দেখা। সব বললাম। শুনে বলল, আমাদের দিকে চলে আসুন, বামুনের অভাবে পুজো পার্বণ সব ভুলে যাচ্ছি।

পিলু ইতিমধ্যে কিছু খড়কুটো সংগ্রহ করে ফেলেছে, ওর খাবার ঠিক না থাকলে মাথা গরম হয়ে যায়। বাবার ওপর ভরসা করে থাকতে সে বোধ হয় আর রাজী নয়। সে আর মায়া কিছু শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠও নিয়ে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি কাঠগুলো লুকিয়ে ফেলল। শিতলপাটি দিয়ে সেই কাঠগুলো ঢেকে রাখা হল। আর প্ল্যাটফরম পার হলে বর্ষার জল, নালা ডোবা। ডোবা থেকে পিলু অন্ধকারেই কিছু কলমি শাক তুলে এনেছে। মা সবই সযত্নে রেখে দিল। কুপি জ্বালানো হল।

বাবা ফের স্টেশনমাস্টারের কাছে হাজির হয়ে আদ্যোপান্ত খুলে বলছেন। শুনতে চায় না তবু বাবা বার বার বোঝাচ্ছিলেন, শ্রীশ পাল আমাকে কি বিপদে ফেললে বলুন তো। এখন এই ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় উঠি!

ফিরে এসে বাবা খুব মিনমিনে গলায় বললেন, বুঝলে ধনবৌ, একটা চিঠি দিয়ে এলে ভাল হত। ও জানবে কি করে আমরা এসে বসে আছি। আমাকে তিনি বললেন, মার যা লাগে এনে টেনে দিস। আমি একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি কে কোথায় আছে।

মা বলল, কোথাও যেতে হবে না। সকালে দেখা যাবে।

আমিও বললাম, সকালেই দেখা যাবে বাবা।

মা কোলের ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। খুব জোরে কথা বলতে পারছে না। পারলে যেন বলত, পুনু ঘুমচ্ছে। ওকে আর জাগিয়ে দিও না। জেগে গেলেই খেতে চাইবে।

—সকালে কি আর সময় পাব। যেন কত কাজের মানুষ বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ বাবা কোথাও গোটা তিন চার ইঁট পাস কিনা। কিছু তো খেতে হবে।

মেটে হাঁড়িতে চাল আছে এখনও কিছুটা। চাল থাকলে মার অন্য দুঃখ বড় একটা বেশি থাকত না। চাল ফুটিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক ভাত না। ফ্যানা ভাতও নয়। সবটাই জল, কিছুটা চাল। জাউ। খুবই পাতলা। এনামেলের থালায় ঢেলে পাখার হাওয়া। আমাদের খিদে এত প্রবল থাকে যে ভাঙা পাখার শনশন শব্দ একদম সহ্য হয় না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত গরমই হোক মুখে দিয়ে হাঁ করে বসে থাকা। আর প্রবল শ্বাসে তাকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া। মুখের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পেটে গেলে আরও ঠাণ্ডা। বাবা আমাদের খাওয়া দেখতে দেখতে বলতেন, তোরা বড় হা-ভাতে। এমনভাবে খাস যেন জীবনেও ভাত খাস নি। আস্তে খা। গাল, গলা পুড়ে গেলে ডাক্তার পাব কোথায়। সময় যা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাবার সময় কাউণ্টারে দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই টেবিলে ঝুঁকে কি লিখছেন। একবার অফিসঘরটার পাশে দাঁড়ালাম! দরজা খোলা। দু-তিনজন বাবু মতো মানুষ বসে গল্প করছে। টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে। কেমন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো পৃথিবী। আমি বড় হয়ে স্টেশনমাস্টার হব ভাবলাম। এবং এটা প্রায়ই দেখেছি, যখন কোনো মানুষ বাবাকে ধমকে কথা বলত, অথবা বাবা যাদের সমীহ করে কথা বলতেন তাদের ওপরয়ালা হবার মনে মনে বাসনা জাগত। তখন বাইরে অন্ধকার মতো একটা রাস্তায় বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই বললেন, সাবধানে থাকিস। আমি একটু ঘুরে আসছি। রাতে আর সত্যি বাবা ফিরলেন না। আমাদের বাবা মাঝে মাঝে এভাবে হারিয়ে যেতেন। কলমি শাক সেদ্ধ আর জাউ-ভাত খেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। অথচ বাবা নেই। মনটা ভার হয়ে গেল। অবশ্য জানি বাবা আবার ঠিক এক সময়ে ফিরে আসবেন। এ

ক'দিন কিভাবে যাবে আমরা জানি না। মাও জানে না। আমাদের কথা মনে হলে, মার কথা মনে হলে, বাবা কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না।

অনেক রাত এ-ভাবে তখন পরিত্যক্ত আবাসে অথবা প্ল্যাটফরমে আমাদের কেটে গেছে। আমি, পিলু, মায়া কখনো চুপচাপ প্ল্যাটফরমে বসে থাকতাম। ঘুরতাম। কখনো আকাশে জ্যোৎস্না থাকত, কখনো অন্ধকার। কিছু কুকুর বেড়াল ছিল তখন আমাদের সঙ্গী। ওরাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরত। বাবা আমাদের কোথায়, কতদূরে—বাবার জন্য আমাদের ভারি কষ্ট হত তখন। আমরা তবু কিছু খেয়েছি, বাবা কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেলেন। একটা মাল গাড়ি টং লিং টং লিং ঘণ্টা বাজিয়ে চলে আসত। অন্ধকারে কোনো দূরবর্তী ছায়া এগিয়ে আসতে থাকলে মনে হত বাবা বুঝি ফিরছেন। সবার আগে ছুটে যেত পিলু। পেছনে আমি। সবার শেষে মায়া। কিন্তু সে অন্য মানুষ। মাঠের অন্ধকারে মেঘলা আকাশের নিচে আমরা বাবার জন্য এভাবে অপেক্ষা করতাম। বাবা বুঝি ফিরছেন। মাথায় হাতে বাবার রকমারি পোঁটলা-পুঁটলি। ভেতরে পূজা-পার্বণের চাল-ডাল। মা'র জন্য লাল পেড়ে শাড়ি। হাত দিলে বলবেন, ওটা তোমার মা'র। ধরো না।

এতবড় পৃথিবীতে আমাদের বাবা বাদে আর কিছু নেই। মানুষের ঘরবাড়ি থাকে আমাদের তাও নেই। চুপচাপ থাকলে মায়া বলত, দাদা দ্যাখ, দূরে কেমন একটা নীল বাতি জ্বলছে। সিগন্যালের লাল বাতিটা গাড়ি আসবে বলে নীল হয়ে গেছে। সাইডিং-এ মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে। ইচ্ছে হত এঞ্জিনের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে থাকি। সে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাক। আমি তো বড় হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমি নিজেও কিছু একটা করতে পারি।

বাবার দূর সম্পর্কের এক ভাই কাছাকাছি শহরটায় থাকেন। তাঁর কাছে খবর পেয়েই এখানে চলে আসা।

ফলে আমাদের মনে হত, এতদিন আমরা অজ্ঞাতবাসে ছিলাম। এখন থেকে বনবাসের পালা। অন্তত বাবার কথাবার্তা এবং আচরণে এসবই মনে হত। বাবা কোথাও আর জায়গা পেলেন না, এখানে পাণ্ডববর্জিত একটা বনভূমিতে শেষ পর্যন্ত চলে এলেন।

ঘর বলতে বাঁশের খুঁটিতে দরমার বেড়া। টিনের চালের একটা বাছারি ঘর। আকাশ সামান্য ফর্সা হলে ঘরও ফর্সা হয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাতে বেড়ার ফাঁকগুলো এক একটা এক এক রকমের। কোনোটা তারাবাতির মতো, কোনোটা যেন মোমবাতির শিখা। বাঁশ কেটে মাচান করে দিয়েছেন বাবা। লম্বা মাচান। খলফা ফেলে মাচানকে সমতল করা হয়েছে। মা, পিলু, মায়া, পুনু বড় মাচানটায় শোয়। ছোটটা আমার আর বাবার। দুটো ছেঁড়া মশারি। কতকালের পুরনো বাবাও বলতে পারবেন না। রং একেবারে কালো—ধুলো ময়লা লাগলে নতুন করে টের পাবার উপায় নেই। তালিমারা এত যে আসল মশারিটা কবেই উবে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম বাবা পাশে নেই। বোধহয় রাত থাকতেই উঠে পড়েছেন। মানুষের ঘরবাড়ির বুঝি আলাদা একটা গন্ধ থাকে। সকাল না হতেই বাবা গন্ধটা পান। তখন আর বিছানায় থাকতে পারেন না। এত শীতেও কাবু হন না বাবা। এত ঠাণ্ডা যে কাঁথার ভেতর হাত পা জমে যায়। টিনের চাল বলে ঠাণ্ডাটা আরও বেশি। দরমার বেড়ার ফাঁকে হা হা করে শীত ঢুকে যায়। লেপ কাঁথা সব বরফ। বাবা পাশে শুয়ে থাকলে বেশ গরম থাকে। উঠে গেলেই শীতটা যেন আমাকে একলা পেয়ে বেশ জেঁকে বসে।

সূর্য ওঠার আগে বাবা তাঁর ঘরবাড়ির সীমানাটা প্রতিদিনের মতো একবার ঘুরে দেখবেন। বেশ চিন্তাশীল মানুষের মতো তখন তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। পাঁচ মাসে বিঘে পাঁচেক জমির বেশ কিছুটা সাফ করা হয়ে গেছে। শীতের সময় বলে হিম পড়ে থাকে ঘাস পাতায়। কোথাও শুকনো কাটা জঙ্গল, কোথাও আগুনে ডালপালা পোড়ে নি বলে আধপোড়া ঘাসপাতা। সব মাড়িয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবেন বাবা। কোন দিকটায় হাত দেওয়া দরকার, কোনদিকে হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সাফ হবার কথা—সব ভেবে ভেবে দেখা। তারপর যেমন পালংয়ের জমি, পেঁয়াজের জমি, সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান, কোথাও সামান্য জমিতে মুলো চাষ, সব জমিতে বীজ বপনের পর কার কতটা

বাড়বাড়ন্ত প্রতিদিন সকালে না দেখতে পেলে যেন তাঁর ভাল লাগে না। এ-সময়টুকু এইসব হাতে-বোনা ফসলের সঙ্গে থাকতে পারলে যেন বেঁচে যান মানুষটা। আয়ু বাড়ে তাঁর।

আর মনে হত বাবা সারারাতই জেগে থাকেন সকাল হবার আশায়। কতক্ষণে সকাল হবে। যে গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, অথবা যে লতায় ফুল আসবে, কখন কার কি পরিচর্যার দরকার রাতে শুয়ে শুয়ে কেবল বুঝি ভাবেন। কখন কোথাও দাঁড়িয়ে কোথাও বসে অতি সন্তর্পণে সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে দিতে দেখতে পান সকাল হয়ে গেছে। পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অন্য আকাশে। ঘরবাড়ি মিলে বাবার সকালটা আমাদের কাছে কেমন অন্য রকমের মনে হয় তখন।

বিছানায় শুয়ে বাবার গলা শুনতে পাই—উঠে পড় সবাই। সূর্য উঠে গেছে আর বিছানায় থাকতে নেই।

পূব আকাশটা সামান্য ফর্সা হলেই বাবা সূর্য ওঠার কথা বলতেন। তখন আমাদের কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হত না। কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকার ভেতরে ভারি আরাম। কুঁকড়ে শুয়ে থাকি। চোখে রাজ্যের ঘুম। বাবা চান তাঁর সঙ্গে আমিও এই সব চাষ আবাদ ঘুরে ফিরে দেখি।

এ-ভাবে বুঝতে পারি বাড়িটার চারপাশে ধীরে ধীরে সব শস্যক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। খুব সকালে মাও বোধ হয় শস্যের গন্ধ পায়। আর শুয়ে থাকতে পারে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পড়ে।

এখানে আসার পর বাবা কিছু পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন। কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন দুটো চাঁপা কলার গাছ। বড় যত্ন সহকারে গাছ দুটো জমির একপাশে লাগিয়েছেন। এতসব দেখেই বোধ হয় মা বাবাকে আবার নির্ভরশীল মানুষ ভাবতে পারছে। কথায় কথায় বাবাকে সেনাপতি বলে আর ঠাট্টা করে না।

এবং দেখা গেল, বাবা কিছু কলাপাতা এনে মায়াকে বললেন, অ আ লেখ। আমাকে বললেন, তোর বইগুলো বের কর, মানুর কাছে যা। পরীক্ষাটা দিতে হয়।

পরীক্ষাটা দিতে হয়, যেন অনেকদিন পর কথাটা বাবার মনে পড়ে গেল। দেশ ছেড়ে আসার পর গত দু'বছর কথাটা আমার এবং বাবার কারো মনে ছিল না। জমিজমা এবং মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলেই বুঝি কথাটা মনে হয়। পিলুকে বাবা কিছুতেই পড়াতে বসাতে পারেন না। তা ছাড়া পিলু খুব একটা আজকাল ভয়ও পায় না। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বুঝি একটু বেশি বেয়াড়া হয়। পিলু যে বের হয়ে গেল, বাবা পিলুকে কিছু বলতে পর্যন্ত সাহস পেলেন না। পিলু এখন সিক্স-সেভেনে পড়তে পারত। দুটো বছর বাবার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে ওর স্বভাবটাও কিছুটা বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। অবশ্য ঠিক বাউণ্ডুলে না বলে বরং বলা যায় পিলু মা'র দুঃখ অথবা অভাববোধটা বোধহয় আমার চেয়ে বেশি টের পায়। সে যতটা পারে মা'র জন্য বাবার জন্য কাজ করে বেড়ায়। কেউ তাকে আর ঘাঁটায় না। দেখা গেল পিলু আসছে, হাতে পায়ে কাদা মাখা—কোঁচড়ে সব পুঁটি ট্যাংরা মাছ। কোনো গর্ত থেকে সব ধরে এনেছে। হয়তো দেখা গেল পিলু মাথায় করে নিয়ে আসছে এক ঝুড়ি গোবর। কখনো কোঁচড়ে গিমা শাক। সে বাড়িতে বাবার মতো ইতিমধ্যেই আংশিক সংসারী মানুষ হয়ে উঠছে।

বাবা একদিন ভারি আশ্চর্য একটা খবর নিয়ে এলেন। বনটার শেষ প্রান্তে কেউ ঠিক আমাদের মতো মানুষের ঘরবাড়ি গড়ে তুলছে। বাবা সারাটা সকাল তাদের বাড়িতেই ছিলেন এবং কতদিন পর একজন প্রতিবেশী পাওয়া গেল ভেবে বোধহয় বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এসে সারাটা দিন, নিবারণ দাস আর নিবারণ দাস। তাঁর দুই বউ। বড় সংসার। বাদশাহী সড়কের ধারে বনের একটা অংশ কিনে ফেলেছে। বাবা এখানটায় তাঁর ঘরবাড়ি করে যে ভুল করেন নি, নিবারণ দাসের মতো বিচক্ষণ লোকের আগমনের সংবাদ দিয়ে সেটা বার বার মাকে বোঝাতে চাইলেন। বিচক্ষণ কে বেশি, যে আগে করল, না যে পরে।

বিকেলে ঠিক বাবার বয়সী সেই লোকটা আমাদের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, ঠাকুর-কর্তা আছেন। বাবা তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলেন। জঙ্গলের ঝোপঝাড় কাটছিলেন বলে মাথায় মুখে ঘাসপাতা লেগে ছিল। নিবারণ দাস এসেছেন, নিবারণ দাস, খোঁজ-খবর করতে এসেছেন—বারে বা— দেশ ছেড়ে আসার পর বাবার জীবনে কত বড় ঘটনা, বোধ হয় আর ইহজীবনে

এত বড় ঘটনা ঘটেছে বাবার জীবনে, নিবারণ দাসের আসা দেখে, আদর আপ্যায়ন দেখে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। বাবা তাকে তামাক খাওয়ালেন, এবং এমন একটা জায়গা বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছে বলে তাকে বাবা কত যে সাধুবাদ দিলেন। লোকটা মাকে কর্তা মা কর্তা মা করছিল। মাও বেজায় খুশী, আর লোকটির কথাবার্তা হাবভাব অদ্ভুত আপনজনের মতো। যেন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা শুনেই এখানে চলে আসা। সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে গঙ্গা পাড়ে আসা। পালা পার্বণে যদি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকে না। এমন কি দুজনে বসে ঠিকও করে ফেলল, আগামী শনিবারে শনিপূজা করবে নিবারণ দাস। বাবার একজন যজমান পাওয়া গেল তবে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর বাবা কিছুক্ষণ কেমন ধন্দ লাগা মানুষের মতো বসে থাকলেন। লাখ টাকা লটারি পেয়েছে শুনলে দুঃখী মানুষের মুখে যেমন রা সরে না বাবারও বুঝি তেমন কিছু হয়েছে। বসে আছেন তো আছেনই। আমাদের ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা! মা বলল, হ্যাঁগো তুমি কি ভাবছ অত!

বাবা কেমন সুদূরের মানুষ হয়ে গেছেন। খুব ধীরে ধীরে বললেন, ভাবছি মানুষের বাড়িঘরের কথা। বাবার এই ধরনের আত্মদর্শন ঘটলেই কেমন আমাদের সব গোলমাল ঠেকে। কাছে বসে বললাম, লোকটা সত্যি শনিপূজা করবে তো বাবা! মাও বলল, হ্যাঁগো, সত্যি করবে তো! এত সুখ শেষ পর্যন্ত কপালে সইবে তো!

বাবা কেমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ করবে। একবার যখন বলে গেছে তখন দ্যাখ মিথ্যে হবে না।

আর আমার মনে হল, বাবা কাল সকালেই চলে যাবেন, কি দাস মশাই পূজা তা হলে হচ্ছে। আর যদি না হয়, তবে বাবা না আবার ভিরমি খেয়ে পড়ে যান। কে দেখবে তখন! ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাব।

—কোথায় যাবি?

—নিবারণ দাসের বাড়ি।

—কেন?

তোমার কি হবে-না-হবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। বললাম শুধু, দেশের মানুষ এসেছে, ঘরবাড়ি করছে, দেখে আসব।

বাবা খুব ভারিক্কি গলায় বললেন, শনিপূজার দিন নিয়ে যাব।

শনিবারের জন্য আমাদের তখন কি আকুলি-বিকুলি! মাও শনিপূজা একটা না করলে হয় না এমন বায়না ধরলে বাবা বললেন, হবে হবে। সবই তো হয়ে যাচ্ছে। কোনটা বাকি থাকছে! আগে একটা পঞ্জিকা কিনি। পঞ্জিকা না হলে পুরুত মানুষের মান-সম্মান থাকে না।

শনিবারের আশায় পিলু পর্যন্ত সুবোধ বালক হয়ে গেল।

শনিবার সত্যি এসে গেল। বাবা বেশ বিকেলেই আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। কতকাল পর আমরা আবার সম্মানিত মানুষ। আমাদের জামা প্যান্ট খারে কাচা হয়েছে। কালীর পুকুরে মা সারা দুপুর আমাদের ছেঁড়া তালিমারা যা জামাকাপড় ছিল সব ধুয়ে ঘাসের ওপর শুকোতে দিয়েছে।

আমরা যাচ্ছিলাম। রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আসা হয় নি। বাবার গায়ে নামাবলী। মা সঙ্গে থাকলে একেবারে সপরিবারে শনিপূজা সেরে আসা হত। দু-একবার বাবা যে বলেন নি তা নয়। কিন্তু নিবারণ দাস বিশেষ কিছু বলে যায় নি বলে আত্মসম্মানে মা'র লেগেছে। বোধহয় সে জন্যই আসে নি। তবে মা বলেছে, আমি গেলে বাড়িটা খালি থাকবে না!

আমরা আমাদের তালিমারা ছেঁড়া জামা প্যান্ট পরে রওনা হয়েছি। মা চুলে কাকুই দিয়ে দিয়েছে। ভুরুর ওপরে একটু কাজলের ফোঁটা। মার এতদিন পর মনে হয়েছে তার সন্তানেরা ভারি সুন্দর দেখতে। এবং চারপাশে যা বনজঙ্গল, আর ভূত-প্রেত কখন কার নজর লেগে যাবে ভয়ে মা মাথায় একটু থুথু দিয়ে বা পায়ের গোড়ালী থেকে সামান্য ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে মাথায়। যতই রাত হোক, যতই অপদেবতার ভয় থাকুক, আমরা তার বাইরে। মা কত সহজে আমাদের সব বিপদ থেকে যে রক্ষা

করে থাকে।

ব্যারাকবাড়িতে তখন প্যারেডের হুইসিল বাজছে। এখন প্যারেড না থাকলে বাবা বোধহয় ঘুরে ব্যারেকের পথটা ধরে যেতেন। বাবা যে কত বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান এটা বোঝাবার এমন একটা মৌকা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে বোধহয় মনে মনে এখন আপসোস করছেন। ক'মাস হয়ে গেল, তবু পুলিসের কোয়ার্টারগুলোতে পূজা পার্বণে বাবার একদিনও ডাক পড়েনি। দেশ ছেড়ে সবাই এদেশে এসে মুচি মেথর সব ঘোষ বোস বনে যাচ্ছে। বাবা যে তেমন একজন কেউ নন কে জানে। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছিলেন না। নামাবলী গায়ে খালি পায়ে শনিপূজা সারতে যাচ্ছেন বাবা, যেন হাবিলদার সুবেদারের সঙ্গে দেখা হলেই বলা, যাচ্ছি শনিপূজা করতে। নিবারণ দাস শনিপূজা করছে। এসে হাতে পায়ে ধরল, কি আর করা যায়, শনিঠাকুর বলে কথা! কিন্তু প্যারেডের সময় কে আর কাকে লক্ষ্য করে! বাবা অগত্যা যেন বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আমি আসিনি। দু-পাশে বড় বড় শিরীষ গাছ, তার ছায়া এবং লতাপাতায় ঢাকা আশ্চর্য সব বনঝোপ। আমাদের পায়ের শব্দে পাখিরা উড়ে গেল ঝোপ থেকে। এবং কোথাও সুন্দর কুরচি ফুল ফুটে আছে। নাকে সুবাস এসে লাগছে। পায়ে হাঁটা একটা পথ এঁকে বেঁকে কতদূরে যে চলে গেছে মনে হয়।

বাবা অনেকটা আগে চলে গেছেন। একটা ছোট বাঁকের মাথায় বাবা অদৃশ্য হয়ে যেতেই কেমন ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা। পিলু বলল, আমি ঠিক চিনি। তুই আয়। মায়া বাবার নাগাল পাবার জন্য দৌড়চ্ছিল। আমি পিলু বাবাকে ধরার জন্য তারপর একসঙ্গে ছুট লাগালাম। বাবাকে আমাদের খুব এখন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। পিলু পর্যন্ত বাবার কথা শুনছে। সে বাবার নাগাল কিছুতেই ছাড়ছে না। আমার গায়ে হাফশার্ট। পা খালি আমাদের সবার। বেশ উঁচুনিচু পথ। দু'পাশের সব ঝোপজঙ্গল রাস্তা ঢেকে রেখেছে। কিছুটা প্রায় লাফিয়ে যেতে হচ্ছে কখনো। মনে হল পিলু এ-সব অঞ্চলে ঘুরে গেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল আমাকে। বলল, ডান দিকে ঐ যে দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিস না দাদা, বড় বড় দুটো বাঁশঝাড়, ওপাশে গেলে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। তারপর আছে তোর কারবালা, পরে মাঠ, রেললাইন। কারবালায় তোকে একদিন নিয়ে যাব। ইঁটের ভাটা আছে একটা। নবমী বলে একটা বুড়ি থাকে। কচু আর বন আলু সেদ্ধ করে খায়। কোনো দুঃখ নেই। লোক দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসে, ওমা তুমি কেগা! সুমার বনে একা ঘুরে বেড়াচ্ছ!

আমার ভাল লাগল না। পিলুর বেজায় সাহস। কোনো বনের ভেতর বুড়ি থাকলে ডাইনী বুড়ি না হয়ে যায় না। বুড়িটা যদি পিলুকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে!

পিলু বলেছিল, জানিস দাদা, বুড়িটার দুটো বড় ছাগল আছে। কত বড় শিং। ভাবলাম মাকে বলব, মা, বুড়িটা দেখবে পিলুকে বাঁদর বানিয়ে রেখে দেবে।

—কত তুকতাক জানতে পারে।

পিলু হাসত। বলত, তুই খুব ভীতু স্বভাবের। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি ; রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। বনবাদাড়ের রাস্তা বুঝি কখনও শেষ হতে চায় না। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। এত ঘন গাছপালা যে মাথার ওপরে আকাশ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কেমন ভয় লাগছিল। রাতে আমরা ফিরব কি করে! যদিও বুঝতে পারছিলাম এ-সব বলা যায় না। বাবা খুব গুরুগম্ভীর গলায় বলবেন, তুমি বামুনের ছেলে। তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। বাবার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যেমন সব ভূতপ্রেতের কথায় এলে বাবা অনায়াসে বলবেন, বামুনের বাচ্চা, কেউটের বাচ্চা এক। সবাই ভয় পায়।

পিলু বাবার কাছাকাছি হাঁটছে। মায়া মাঝখানে। সবার শেষে আমি। মাঝে মাঝে আমি কতদূরে আছি বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন।

বাবার ডান হাত ধরে রেখেছে মায়া। সে পুজোর সব খেয়ে নেবে বলছে। পেট ভরে সিন্নি খাবে, মুড়ি খাবে, নারকেল বাতাসা খাবে, যেন এমন অতীব এক ভোজন কতকাল পরে প্রায় উৎসবের মতো এসে গেছে।

আমি জানি, বাবা, আজ ভারি তন্ময় হয়ে যাবেন পুজোয় বসে। বেশ নিয়ম নিষ্ঠা, যা দেখলে

নিবারণ দাস আখেরে আর সাহসই পাবে না, পুজো-পার্বণে অন্য বামুনের কথা ভাবতে। একেবারে বাবা যেন আত্মীয়ের মতো অথবা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, পূজার সুফল কি, কেন এইসব পালাপার্বণ, হিন্দুধর্ম, তার দেবদেবীর কি মাহাত্ম্য এবং পাঁচালী পড়লে গেরস্থ মানুষের যা কিছু ফললাভ বাবা ব্যাখ্যা করে যাবেন।

পিলু বলল তখন, দাদা যাবি?

—কোথায়?

—কারবালাতে।

—আমার ভয় করে।

—ভয় কি রে!

—ওখানে মুসলমানদের কবরখানা আছে।

—তাতে কি!

—কত সব মানুষের কঙ্কাল!

—তুই দেখেছিস?

—দেখব কি করে?

—তবে! শেষে সে অভয় দেবার মতো বলল, একটাও থাকে না। শেয়ালেরা সব খেয়ে নেয়। সে একবার একটা শেয়ালকে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। প্রায়, যা বর্ণনা পিলুর, বাঘ-টাঘের শামিল। সে কিছুদূর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছনে দৌড়েছিল। এবং বনের ভেতর ঢুকে যেতেই ভারি একা মনে হয়েছিল নিজেকে। আর বোধ হয় ভয়ও করছিল। দাদা সঙ্গে থাকলে অন্তত সেটুকু থাকত না। এবং এ-জন্যই মাঝে মাঝে তোষামোদ দাদাকে—যাবি দাদা। কত রকমের সব ফলের কথা, এবং বড় বড় বন-আলু তুলে আনা যায়—এক একটা আলু পনের বিশ সের ওজনের। একবার তো সারাদিন পিলুর দেখা নেই। মা বার বার বলেছিল, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবার সাদাসিধে কথা। গেছে কোথাও—ঠিক চলে আসবে। সকালে পিলু কিছু না খেয়ে বের হয়ে গেছে সেদিন। মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। মা রেগে গিয়ে খেতে দেয় নি কিছু। রাগের মাথায় যদি একটা কিছু করে ফেলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মা না খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—আমিও কতবার ডাকাডাকি করেছি। ব্যারাকের মাঠে এবং বাদশাহী সড়কে উঠে দেখে এসেছি। নেই।

মা তখন প্রায় ভেউভেউ করে কেঁদেই দিত। মায়া এসে বলল, ছোড়দা আসছে। ছোড়দা মাথায় কি একটা অতিকায় বহন করে আনছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম অতিকায় বন-আলু। প্রায় হাতির সাদা দাঁতের মতো। মা'র যত রাগ, নিমেষে উবে গিয়েছিল—এতবড় বন-আলু মা জীবনেও দেখে নি। প্রায় দু হাতে মাথা থেকে নামাতে গেলে পিলুর প্যাণ্ট হড়হড় করে নেমে গেল পেট থেকে। কিছুই খায় নি বলে পেটটা কোথায় ঢুকে গেছে। হাতে পায়ে মুখে—শরীরের সর্বত্র মাটি কাদা এবং সেদিন ওকে পুকুরপাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বাংলা সাবানে শরীর পরিষ্কার করে দিয়েছিল মা। একটা আলুতে আমাদের কতদিন চলে যাবে। খেতে বসে পিলুর সাম্রাজ্য জয়ের কথা শুনতে শুনতে মা কেবল চোখের জল ফেলছিল। বাবার মতো পিলুকে সেই থেকে কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ভারী সমীহ করতে ইচ্ছে হত।

তখনই বাবা বললেন, এসে গেছি।

বনটার শেষ। এদিকেও সেই বাদশাহী সড়ক ঘুরে গেছে। এবং বোঝাই যায় পুব-উত্তরে কিছু দক্ষিণেও বনটাকে একটা হাঁসুলির মতো এই বাদশাহী সড়ক প্রায় সবটা ঘিরে রেখেছে। ঠিক রাস্তার ধারেই দুটো দোচালা টিনের ঘর নিবারণ দাসের। পুব দক্ষিণ খোলা বলে সকাল দুপুরের সবটা রোদই বাড়িটা পায়।

সাঁজ লেগে গেছে। আমাদের দেখে নিবারণ দাস হাতজোড় করে ছুটে আসছে। একটা জলচৌকিতে বাবাকে বসতে দেওয়া হল। বারান্দায় একটা হারিকেন জ্বলছে। খোলা উঠোনে বেশ বড় গামলায় দুধ, চালের গুঁড়ো। সাদা পাথরে ঠাণ্ডা নারকেলের জল। দাসের দুই বউ আমাদের দেখে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সেজেগুজে আছে। বড় মেয়েটা

শাড়ি পরেছে। ঢপ ঢপ করে প্রণাম বাবাকে। তারপর আমাকে পিলুকে লুটের বাতাসার মতো প্রণাম করতে থাকল। আমরা কত বড় মানুষের ছেলে এই বুঝি প্রথম টের পেলাম। পিলু দেখলাম মুখ বেশ গম্ভীর করে রেখেছে। ওর জামার নিচে প্যান্ট, প্যান্টে দড়ি পরানো নেই। পরিয়ে দিলেও থাকে না। এখন পিলু এত গম্ভীর যে মনে হয় দম বন্ধ করে আছে। দম আলগা করে দিলেই হয়েছে। প্যান্ট আবার হড়হড় করে নিচে নেমে না যায়। ভাগ্যিস বড় মেয়েটা একটা শতরঞ্চ পেতে বারান্দার একপাশে বসতে দিল। তাড়াতাড়ি যেন নিজের গরজেই আর মান-সম্মানের ভয়ে পিলুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম। আর আমরা সবাই নিরীহ মানুষের মতো পূজার ভোগসামগ্রী সতৃষ্ণনয়নে দেখার সময় মনে হল বুড়ি মতো কেউ লাঠি ঠুকে ঠুকে এদিকটায় আসছে। হারিকেন তুলে আমাদের মুখ দেখছে। ফোকলা দাঁতে বলছে, এ যে সব কার্তিক ঠাকুর এক একজন। বলেই লাঠি পাশে রেখে মাথা ঠুকতে থাকল। আমাদের তখন একেবারে হতভম্ব অবস্থা।

বাবা পদ্মাসনে বসে আছেন। আমরা তাঁর ছেলেপুলে কে দেখলে বলবে? আমরা কি করছি, কি-ভাবে আছি একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখছেন না। কেবল পুজোর ফুল, নৈবেদ্য, ঘট, আমের পল্লব, সিঁদুরের থান, তিল তুলসী সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। নিবারণ দাস বাবার পা ধুইয়ে দিয়েছে জলে। পা মুছে দিয়েছে। এত বড় মানুষটা বাবাকে এ-ভাবে সমাদর করতেই আমরা আরও নিরীহ গোবেচারা হয়ে গেলাম। বাবার মান-সম্মান এখন সব কিছুই আমাদের স্বভাব-ধর্মের ওপর নির্ভর করছে।

চারপাশে আর কোনো লোকালয় নেই। দূরে এই কিছু জমি পার হয়ে গেলে চৌমাথা। বাদশাহী সড়ক ফুড়ে রাস্তাটা গেছে রাজবাড়ির দিকে। চৌমাথায় বড় পাটের আড়ত।

বারান্দায় হ্যাজাকের আলো। এখানে বসেও দেখা যায় পাটের আড়তে কাজকর্ম হচ্ছে।

নিবারণ দাস বলল, পাটের আড়ত দেব ভেবেছি কর্তা। কেমন হবে? চারপাশে বাবা ফুল চন্দন ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। বাড়িটা জুড়ে বেশ পূজা পূজা গন্ধ। বাবা ভারি নিপুণ গলায় বললেন, লক্ষ্মী আপনার বাঁধা দাসমশাই। যাতে হাত দেবেন সোনা ফলবে। বাবার কথা অমৃত সমান ভেবেছে নিবারণ দাস।

আমার কেবল মনে হয়েছিল, আমাদের জন্য কেন বাবা এমন আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নেন না। কত সহজে বাবা নিবারণ দাসকে অমৃত সমান কথা বলে দিতে পারলেন। আমার বাবা বেশ সুশ্রী মানুষ, লম্বা এবং গৌরবর্ণ! আর বাবা এত অভাবের ভেতরও শরীর বেশ কোমল এবং মাথা ঠিক রাখতে পেরেছেন। পূজায় বাবাকে কে কি দিল—এই যে শনির পূজা, একটা বড় গামছা দিতে পারত নিবারণ দাস—কত না জানি দক্ষিণা দেবে, অথচ সে-সব বাবা আদৌ গ্রাহ্য করেন না এবং বেশ সময় নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে গেলেন। শান্তির জল দিলেন সবাইকে। সুর ধরে পাঁচালী পাঠ করলেন। সবাইকে প্রসাদ মেখে সিন্নি, চাল কলা এবং আমাদের হাতে হাতেও দিলেন। কাউকে বেশি না কম না। মায়া যে রাস্তায় পইপই করে বলেছে পেট ভরে সিন্নি খাব—সেসব যেন বাবা একেবারেই ভুলে গেছেন। অবস্থা এমন যে শেষ পর্যন্ত বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের বাড়ি পর্যন্ত চিনে নিয়ে যেতে পারলে হয়। এত কমে এত বেশি পুণ্য হয় না—বাবাটা যে কি! রাগে ভেতরটা গরগর করছিল।

পিলুর দিকে তাকিয়ে আরও বেশি রাগ হচ্ছিল। তুই কি রে! নিজের স্বভাবধর্ম মানুষ এ-ভাবে ভুলে যায়! তুই পর্যন্ত একবার বলতে পারলি না, আমাকে আর একটু দাও বাবা। তুই চাইলে বাবা দুবার আমাকেও দিত। মায়া পেট ভরে সিন্নি খাবে বলেছিল—কথাটা মনে পড়ত বাবার।

তখনই দাসের মা বলল, কর্তা, এত প্রসাদ খাবে কে?

দাসের মা'র কথা শুনেই আবার নড়েচড়ে বসা গেল।

বাবা বললেন, আসবে। মানুষজন আসবে। এলে দেবেন, প্রসাদ নামমাত্র।

তখন ভগবানকে বললাম, হা ভগবান, মানুষের বাবা এত নিষ্ঠুর হয়! পূজার দক্ষিণা মাত্র তিন আনা পয়সা। তিন আনা পয়সাই তামার। পয়সা কটা বাবা আঁচলের কোণায় শক্ত করে বাঁধলেন। দুবার টেনে দেখলেন, খুলে পড়ে-টড়ে যেন না যায়। গামছায় ভোজ্য দ্রব্য বলতে সামান্য চাল, দুটো

নাতি-বৃহৎ বেগুন, একটা হরিতকী, ছোট ছোট লাল জরুলের মতো দুটো আলু খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এই সামান্য পাওনার বিনিময়ে বাবা লোকটাকে কত বড় কথা বলে গেল! বাবা যখন উঠব উঠব করছেন, নিবারণ দাস বলল, এরা তো কিছুই খেল না। কর্তামার জন্য একটু এবং এই বলে সে একটা বড় জামবাটিতে অনেকটা সিন্নি, চাল কলা ফল গামছায় বেঁধে দিল নিজে। বাবা কিছুই দেখছেন না, যত কথা বলছেন দাসের সঙ্গে। আমাদের চোখ চকচক করছে। তার মেয়ের একটা ভাল বর খোঁজা দরকার। বাবা নিজের ওপরেই ভারটা নিয়ে নিলেন এবং এমন সব মানুষজনের খবরাখবর দিলেন বাবা, যে নিবারণ দাস বাবাকেই এ-বিপদে একমাত্র কাণ্ডারী ভেবে ফেলল।

ফেরার পথে একটা হারিকেন দিয়ে দিল। নিবারণ দাস কথা বলতে বলতে কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল। সিন্নি প্রসাদ নিবারণ দাসের হাতে। যে-ভাবে বাবা আর নিবারণ দাস কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেল, না জানি পুঁটুলিটা দাসের হাতেই থেকে যায়। যা আমার একখানা বাবা, ফেরার পথে শুধু হারিকেনটাই হয়তো ধরা থাকবে হাতে! পিলু বোধ হয় এটা টের পেয়ে বেশ কায়দা করে বলল, জ্যাঠা আমাকে দিন। আমি নিচ্ছি।

জ্যাঠা বলল, পারবে তো?

পিলু ঘাড় উঁচিয়ে বলল, খুব।

যখন কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে নিবারণ দাস টর্চ জ্বেলে চলে গেল তখন পিলু তার স্বভাব-ধর্ম ঠিক রাখতে পারল না! হাত ঢুকিয়ে একটা কলা বের করে বলল, দাদা খা।

আবার বের করে নিল দু টুকরো নারকেল। মায়াকে দিল, আমাকে দিল। সে নিজেও রাক্ষসের মতো সব মুখে ফেলছিল।

বাবা বললেন, বেশ তো ভাল ছেলে হয়ে ছিলে বাবারা। জঙ্গলে ঢুকতে না ঢুকতেই স্বমূর্তি ধারণ করলে বাবারা। তোমার মা'র জন্য কিছু রেখ!

আমরা এ-ভাবে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে হারিকেন। অন্ধকার ঘোলাটে পৃথিবী ফুঁড়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আলোতে আমাদের ছায়াগুলো কখনও লম্বা কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। পিলু সবার আগে। এবং জানি মা খলপার দরজা বন্ধ করে রাস্তায় কোনো শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। মা না একা আবার ভয় পায়। আমরা তখন প্রায় দৌড়ে সেই অন্ধকার বনভূমি পার হবার চেষ্টা করছিলাম। পৃথিবীতে এ-কটা প্রাণী বাদে এই বনভূমি এবং অন্ধকারে কিছু জোনাকি পোকা—বনের মধ্যে মা নিশীথে আমরা কতক্ষণে ফিরছি সেই আশায় বসে রয়েছে। বাড়ির কাছে আসতেই পায়ে ভীষণ জোর এসে গেল। দৌড়ে দরজায় উঠে গেলাম। ডাকলাম, মা আমরা এসেছি। ওঠো। মা লম্ফ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলল, তোর বাবা কোথায়?

—আসছে।

আমরা মা'র যেন কেউ না। বাবার জন্য লম্ফ হাতে মা উঠোনে নেমে গেল।

বাবা যাতে ভাল দেখতে পান সেজন্য লম্ফটা আরো উঁচু করে ধরল।

মনে হল মা আমার নিমেষে আকাশবাতি হয়ে গেছে। সবার ওপরে হাত। হাতে লম্ফ। লম্ফের আলো দাউদাউ করে জ্বলছে। বাবা আলোর দিকে এগিয়ে আসছেন। বাবাকে খুব শক্তিশালী যুবকের মতো মনে হচ্ছিল।

নিবারণ দাস পরদিনই সকালে এসে হাজির। একটা চাটাই পেতে দিল মায়া। মা ঘোমটা টেনে বলল, তোর বাবাকে ডেকে দে। বাবা এ-সময়টাতে কোথায় থাকেন সংসারে সবাই জানে। সীমানা বরাবর জিয়ল গাছের ডাল পুঁতে নিজের জমি ঠিক করে নিচ্ছেন। বাবা এলে দাস বলল, এলাম কর্তা। একটা দিনক্ষণ দেখে দিন। শুভদিনে আড়ত খুলব ভাবছি।

বাবা বলল, দাসমশাই, পাঁজি তো নেই।

এবং দাসমশাই পরদিনই একটা নতুন পঞ্জিকা উপহার দিয়ে গেল। দিনক্ষণ জেনে গেল। বাবা পঞ্জিকাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভারি অভিভূত হয়ে বসে থাকলেন। বড় মূল্যবান সামগ্রীর মতো বইটাকে দেখতে থাকলেন। কাছে গেলে ধমকে উঠলেন, এখানে কি, যাও! পাছে বইটাতে আমরা কেউ হাত

দিই ভয়ে একদম কাছে ভিড়তে দিলেন না। দূর থেকেই আমরা যতটা পারলাম আশ মিটিয়ে দেখলাম।

খুবই ভাগ্যবান মানুষ বাবা—আস্ত একটা পঞ্জিকা নিবারণ দাস উপহার দিয়ে গেল—ভাগ্যে লেখা না থাকলে এ-সব হয় না। এখানে আসার পর কতবার তো চেষ্টা করেছেন শহর থেকে বইটা আনিয়ে নেওয়ার। কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। গত জন্মের পুণ্যফলেই এখনও যা কিছু হচ্ছে। বিশেষ করে বইটা পেয়ে বাবা কেমন খুবই ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। পাতা খুলে খুব সন্তর্পণে একের পর এক দেখে যেতে থাকলেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন অমূল্য ধন তাঁর কাছে আছে, আর যদি জানতে পারে মানুষেরা, অমোঘ দিনক্ষণ বলে দিতে পারে মানুষটা তবে অঞ্চলের একজন সেরা মানুষ হতে বেশী আর সময় লাগবে না।

বইটা পেয়ে দু-তিন দিন বাবা নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে গেলেন। বাড়িঘরের কথা মনে থাকল না। সারাটাক্ষণ উবু হয়ে গোটা পঞ্জিকাটা পড়ে বোধ হয় শেষ করে ফেললেন। কোনো পাতায় আবার দুটো লাইন দেগে দিলেন। বইটা কোথায় রাখা যাবে, এই নিয়েও বড় সমস্যা দেখা দিল। পিলুকেই বেশি ভয় বাবার। ছবি দেখতে গিয়ে ছিঁড়ে না ফেলে। মলাট দেবার মতো বাড়তি কাগজ নেই। তিনি বইটি রাখার মতো কোনো জায়গাই ঘরে নির্বাচন করতে পারলেন না। ট্রাংক ভাঙা। যে কেউ খুলতে পারে। নিবারণ দাস দিলই যখন বাড়তি একটা তালা চাবি দিলে পারত। কোথায় এখন যে রাখা যায়!

মা বলল, দাও তুলে রাখি।

—কোথায়?

—কেন ট্রাংকে।

—থাকবে ভাবছ?

—থাকবে না তো কে খাবে!

—তোমার মূর্তিমান শ্বাপদেরা সব করতে পারে। সব খেতে পারে।

পিলু বলল, আমি ধরব না তো বলেছি।

আমিও বললাম, কেউ ধরবে না বাবা, তুমি ভাঙা ট্রাংকটাতেই রাখ। মা বলল, তোরা কিছু বলতে যাস না। তারপর কিছু হলে সব দোষ তোদের।

কিন্তু সারা দিন ধরে পঞ্জিকাটা বাবাকে ভারি বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। তিন দিনের দিন বাবা শেষ পর্যন্ত ট্রাংকে রাখাই স্থির করলেন। এত করেও পঞ্জিকার ভবিতব্য সম্পর্কে খুব একটা সংশয় থেকে গেল তাঁর। পিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো সংসারের সব কিছুই কাজে লাগে। এটাকে আর কাজে লাগাতে যেও না।

পিলু বলল, আমি ধরবই না।

যতই বলুক, আমিও বাবার মতো শেষ পর্যন্ত পিলুই অনিষ্টের কারণ হবে ভাবলাম। কারণ পিলুকে বিশ্বাস নেই। সে আজকাল সহজেই একশ রকমের মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। এবং সেবারে বাবা প্রায় মাসখানেক বাদে নিরুদ্দেশ থেকে ফিরলে আনন্দে পিলু বনটার এমন সব জীবজন্তুর খবর দিয়েছিল তার সাহসিকতা প্রমাণের জন্য যে একটা কথাও সত্যি না। বাবার একটা আমলকী গাছের চারা পিলু তুলে নিয়ে তার পছন্দমতো জায়গায় ফের পুঁতে দিলে গাছটা মরে গেল। পিলু স্বীকারই করল না সে কাজটা করেছে। আমরাও ঠিক দেখি নি, বাবা বাড়ি নেই, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, পিলু বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—এরই মধ্যে কখন সে কাজটা করেছিল আমরা কেউ জানিও না। অথচ পিলু ছাড়া এত বড় দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করতে পারে না। তিন ক্রোশ দূর থেকে বাবা হেঁটে গিয়ে চারাটা এনেছিলেন। ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে গেছিল। বাবা সকালে গর্ত করে গাছটা লাগিয়েছিলেন। পিলু বলেছিল, তুমি রাস্তার পাশে লাগালে বাবা! সব আমলকী লোকে চুরি করে নিয়ে যাবে। —এই সুমার বনে লোক আসবে কোত্থেকে? পিলু বলেছিল, গাছটা বড় হতে হতে সুমার বনটা আর থাকবেই না। মানুষজন ঠিক চলে আসবে। ফল হলে চুরি যাবে ভয়ে সে ঠিক গাছটা ঘরের পেছনে বেশ একটা নিরিবিলি জায়গায় পুঁতে দিয়েছিল বোধ হয়। এবং শেষে মরে গেছে বলে বেশ কিছুদিন বাবা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ভাল মানুষ হয়েছিল। বাবার চেঁচামেচিতে বুঝতে পেরেছিলাম, পিলুর খুব

সদাশয় হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল গাছটা।

তবে আমাদের সৌভাগ্য বাবা রাগ খুব বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারেন না। খেতে বসে বাবা পিলুর পাতে বড় পুঁটি মাছটা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, খা। একটা অমালকী গাছ কোথায় আবার পাব! আমলকী ফল অজীর্ণ রোগে কত কাজে লাগে জানিস!

পিলু বেশ বড় মাছটার লেজ ধরে দুবার মাছটা চাটল। তারপর এক গাল হেসে বলল, জান বাবা ক'টা বাবু মতো লোক এসে না বনটা দেখে গেছে।

বাবা বললেন, কারা ওরা?

—আমি তখন না বাবা মাঠে ছিলাম। আমাকে বলল, খোকা তুমি থাকো কোথায়। বনের ভেতরে বাড়িটা দেখালে বলল, এই জঙ্গলে তোমরা থাক! ভয় লাগে না?

জঙ্গল বলায় পিলুর খুব রাগ হয়েছিল। সে বলেছিল, জঙ্গল কোথায়। এটা তো একটা বন।

—তোমার বাবা বাড়ি আছেন?

—বাবা কোথায় গেছেন।

—কোথায়, জান না?

—না। বাবা মাঝে মাঝে আমাদের ফেলে চলে যান।

এতে বোধ হয় বাবার আত্মসম্মানে লেগেছে। তিনি বললেন, কোথায় যাই আবার! দেশ গাঁয়ের লোক কে কোথায় এসে উঠছে খুঁজতে হয় না। এখানে আমাদের আর কে আছে! ওরা কোথাকার লোক জিজ্ঞেস করলি না?

—বলল কোটালি পাড়ার লোক।

—কোন কোটালিপাড়া? বুলতার কোটালিপাড়া না ফরিদপুরের কোটালিপাড়া। আর একটা কোটালিপাড়া আছে কিশোরগঞ্জের কাছে। এতকিছু বোঝ আর এটা বোঝ না। কোন কোটালিপাড়া জিজ্ঞেস করতে হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার মজুমদার মশাইরা তো রানাঘাটে বাড়ি করেছে।

বাবার ভূগোল এত জানা যে মাঝে মাঝে মনে হত অনায়াসে বাবা পৃথিবীর সব খবর দিয়ে যেতে পারেন। আসলে বাবা জমিদার এস্টেটে আদায়ের কাজ করেছেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত বাবাকে। কত সব মানুষ পৃথিবীতে বাবার চেনা হয়ে গেছে। তখন বাবার জন্য আমরা গর্ববোধ না করে পারতাম না।

বাবা আবার ফিরে আসায় সংসারে সবাই ফের নিশ্চিন্ত। ক'টা দিন আবার পেট ভরে খাওয়া। বাবা এ-ক'টা দিন কোথায় কি ভাবে কাটিয়েছেন সারাক্ষণ সেই গল্প। কোথায় অনেকদিন পর কার বাড়িতে এই কর্তাঠাকুরটিকে পাবদা মাছের ঝোল খাইয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যা টীকা সহকারে মাকে বোঝাচ্ছিলেন। —পাবদা মাছ, তবে বুঝলে ধনবৌ, দেশের মতো না! তেমন পাবদা মাছ এ দেশে পাওয়া যাবে কেন! এবং এই পাবদা মাছ প্রসঙ্গে বাবা এমন নিদারুণ সব ঝালঝোল শুকতোনির গল্প করছিলেন যে রাতে আর আমাদের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমরা সবাই মশারির ভেতর থেকে মুখ বার করে বাবার পাবদা মাছ খাওয়ার গল্প শুনছিলাম।

পিলু বলে ফেলল, আমরা একদিন খাব বাবা।

—খাবে তো পাবেটা কোথায়। খেতে হলে রানাঘাটে যেতে হয়।

পিলু বলেছিল, রানাঘাট কতদূর বাবা?

—অনেক দূর। বড় হলে যাবে।

আমি বললাম, ও মা, তুই কিরে। আমরা যখন এদেশে এলাম তখন তো রানাঘাটের ওপর দিয়েই এলাম।

—সত্যি! পিলুর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

মা বলল, ওর মনে না থাকারই কথা।

—রানাঘাটে আমরা রাতে ট্রেন বদল করলাম না বাবা! স্টেশনে ম্যাজেন্টা রঙের আলো। কি রকম অদ্ভুত একটা দেশ মনে হচ্ছিল আমার। আর কত গাড়ি। এদিকে গাড়ি ওদিকে গাড়ি। মাথার ওপর দিয়ে একটা পুল চলে গেছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ।

পিলুর বুঝি মনে হল ওটা একটা স্বপ্নের দেশ। সে বড় হয়ে একবার রানাঘাটে যাবে বলল। বাবাও খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বললেন, এত দেশে গেছ আর রানাঘাটে যাবে না সে হয়!

এত দেশ বলতে তো আমাদের নিয়ে বেড়ালছানার মতো দুটো বছর এখানে সেখানে বাবা ঘুরে বেড়িয়েছেন। নবর বাবার খোঁজে তিনি সেই যে আমাদের প্ল্যাটফরমে ফেলে চলে গেলেন আর আসেনই না। সারাদিন না খেয়ে থাকার পর পিলু একটা বাড়ির পাশে শসার মাচান আবিষ্কার করে ফিরে এল। বিকেলে সে আমাকে নিয়ে সব দেখাল। আট দশটা কচি শসা। আমাদের চোখ মুখ এত ক্ষুধার্ত থাকত যে লোকে দেখলেই তেড়ে মারতে আসত। মা তো নির্বিকার। স্টেশনে দিনের পর দিন বাবার ফিরে আসার আশায় বসে আছে। পিলু সারাদিন না খেয়ে থাকলে ভীষণ বেয়াড়া হয়ে যায়। মাকে যা খুশি গাল দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় দেখি দূরের মাঠে সোরগোল। পিলু কাছে কোথাও নেই। মাঠে দেখছি এক দল ছেলে পিলুকে ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর পিলুর সেই আর্ত চিৎকার—দাদা রে। সেই প্রথম আমার মাথায় ভীষণ একটা বুনো মোষ তাড়া দিয়ে উঠেছিল। ছুটে গিয়েছিলাম। সবার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিলাম, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন। ও শসা চুরি করেনি। আমরা খুব গরীব। বাবা তিন চারদিন হল কোথায় গেছে।

সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো আমাকে দেখে কি ভাবল জানি না, পিলুকে ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, হারামজাদা, তোমার ভাইকে সহ এবার তোমাকে প্যাঁদাব। আবার যদি দেখি এদিকে ঘুরঘুর করছ কখনও।

সবিনয়ে বলেছিলাম, আর আসব না ইদিকে। পিলুর দিকে তাকিয়ে খুব গার্জেনি গলায় বললাম, তুই চুরি করেছিস। সত্যি করে বল?

—নারে দাদা। মিছি মিছি ওরা আমাকে ধরে নিয়ে ঠ্যাঙাবে বলছে।

ওরা চলে গেলে পিলু ভারি সন্তর্পণে বলল, বাবাকে খুঁজতে যাবি আবার?

—কোথায়?

—চল না। বলে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বড় একটা ইঁটের ভাটায়। কেবল জঙ্গল আর আগাছা। সামনে বড় বড় সব শিরীষ গাছ। পর পর সব উইয়ের বড় ঢিবি। ঢিবিগুলি পার হলে সুন্দর মতো দুটো মিনার। বোধহয় এখানে কোনো দরগা আছে। মেলা বসে কখনো। সে কি সব চিহ্ন দেখে ক্রমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছিল। এখানে বাবা কেন মরতে আসবে বুঝতে পারছিলাম না। সে একসময় শিশুর মতো সরল গলায় বলল, এই যে পেয়েছি। ঘাস পাতা সরিয়ে ফেলল সে দু হাতে।। জ্বলজ্বল করছে কটা কচি শসা। সত্যি পিলু চুরি করেছে তবে। পিলু চুরি করেছে বাবা জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবেন। সে বলল, দাদা, তুই বাবাকে বলে দিস না। কিরে বলে দিবি না তো?

পিলুর এত ভারি কষ্টের মুখ আর আমি জীবনেও দেখিনি। বললাম, বলব না। পিলুর ওপর রাগটাও আর বেশিক্ষণ থাকল না। পেটের খিদেটা যে কি, যে কোনো কুকর্মই এসময় খুব মহৎ কাজ মনে হয়। কিছুক্ষণ আগে যে, পিলুকে সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, শসা ক'টা পিলু বাদে যে আর কেউ চুরি করেনি—ওরা ঠিকই ভেবেছিল, এবং আমার ভাই পিলু, তা ছাড়া পিলু আমার বাবার মতো মানুষের ছেলে, আমার সম্মানে খুব লেগেছিল—সেসব কিছুই আর মনে পড়ছিল না।

চারপাশে তাকিয়ে বললাম, কেউ আবার যদি দেখে ফেলে?

—কত বড় জঙ্গল! কেউ এখানে আসেই না।

সত্যি বনজঙ্গলটা বেশ বড়। অদূরে রেল-লাইন, ইস্টিশান, লাল ইঁটের বাড়ি। পাড়াগাঁয়ের মানুষজনের চলাফেরার শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শসা ক'টা জামার তলায় লুকিয়ে ফেলা দরকার। কে কোথায় আবার দেখে ফেলবে। এত সব গাছপালা, পাখি কাউকে যেন বিশ্বাস নেই। প্ল্যাটফরমে আমাদের থাকা খাওয়া এবং শসা ক'টা কি যে অমূল্য ধন তখন, আমি খাব, পিলু খাবে, মা খাবে, মায়া তো সব ক'টা একাই খেয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু মা যদি না খায়। চুরি করা শসা মা না-ও খেতে পারে। তা ছাড়া মা'র মাথাও খুব একটা ঠিক নেই। বাবার আক্কেলের কথা ভেবে অদৃষ্টকে শাপমন্যি করছে। আর কেন যে ইষ্টিশানে ফিরে এলেই আমরা দু ভাই হুটোপুটি

লাগিয়ে দিই। এই বুঝি ট্রেন থেকে বাবা নামলেন। কত লোক আসে ট্রেনে অথচ বাবার মতো মানুষ ট্রেন থেকে একজনও নামেন না। তখন পিলুর এই দুর্বুদ্ধিকে দুঃসময়ে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। পিলুর প্রতি বরং প্রগাঢ় ভালবাসাই আমার প্রবল হয়ে উঠল।

পিলু বলল, দাদা তুই একটা খা, আমি একটা খাই। সে একটা আমাকে দিল, নিজে নিল একটা। আর একটা শসা দেখিয়ে বলল, এটা মায়ার। এটা খাবে মা। দুটো থাকল, কাল সকালে খাব। পিলু খুব হিসেবী মানুষের মতো বলল, বাবা ফিরে না আসাতক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে দাদা। সেদিন প্ল্যাটফরমে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাবার হাতে পয়সা নেই। রেলগাড়িতে বাবার টিকিট লাগে না। পয়সা না থাকলে মানুষের যা হয়। খুব মিশুকে স্বভাবের মানুষ—যেখানেই তিনি যান একসময় ঠিক ঠাকুরকর্তা বনে যান। ফলে পয়সা না থাকলেও কিছু আসে যায় না। ঠিক ট্রেনে চড়ে দূরদেশে চলে যেতে পারেন। বাবা কোথায় কি খান, কি পরেন কে জানে! কোথায় ভাল মাছ দুধ পাওয়া যায়, চালের দাম কত কিংবা কোথাও যদি কিছু যজন-যাজন করা যায় সেই আশায় বোধ হয় কেবল বাবা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশ ছেড়ে এসে বাবা খুব অথৈ জলে পড়ে গেছেন—কিছু একটা করা দরকার, বাবার মুখের দিকে আমরা আর তখন তাকাতে পারতাম না।

প্ল্যাটফরমের পানিপাঁড়ে বলল, কোথায় গেছিলে ছেলেরা? বাবার খোঁজ মিলল।

পিলু বলল, বাবা কি আমার নিখোঁজ হয়েছে?

—শুনেছি তোমাদের ফেলে কোথায় চলে গেছে!

আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল পানিপাঁড়ের কথায়। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমার বাবা কি তেমন মানুষ! আমাদের জন্য তাঁর কত দুর্ভাবনা। তবু কিছু বললে, কি আবার ভাববে, ওদের দয়াতেই এখানে পড়ে আছি। আবর্জনার মতো ঝেড়ে ফেললে যাবটা কোথায়!

পিলু এবং আমি খুবই সন্তর্পণে হাঁটছি। জামার নিচে বাকি ক'টা শসা। ধরা পড়ে গেলেই হয়েছে। সবচেয়ে ভয় আমার নিজের মাকেই। বলতে পারব না চুরি করে এনেছি। বরং বলা ভাল বড়বাবুর বউ দিয়েছে। কিন্তু মা তবে সকালেই জল আনতে গিয়ে বড়বাবুর বউকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারবে না। আমাদের এই দুঃসময়ে এতটুকু কেউ দয়া দেখালেই মা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনায় যখন মাথায় কিছুই আসছিল না, পিলু বলল, মাকে সত্যি কথা বললে কিছু বলবে না দেখিস। এবং মাকে সব খুলে বলতেই কেমন তাড়াতাড়ি শসা ক'টা লুকিয়ে ফেলল। ধমক খেতে হতে পারে, এমনকি, ঠ্যাঙাতেও পারে—আর কত সহজে মা আমার, শসা ক'টা লুকিয়ে ভাল মানুষের ঝি হয়ে গেল।

আমি মায়ের যেহেতু খুব সুপুত্র, বললাম, পিলুর কি সাহস মা!

ছোট বোন মায়া পাশে পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পুনুটাও ঘুমে অচেতন। কেবল আমরা তিনজন প্ল্যাটফরমে জেগে। যেন যে কোনো সময় দেখব প্ল্যাটফরম পার হয়ে বাবা চলে আসছেন। মা শুধু বললো, ভগবান তো মানুষকে উপোষ রাখেন না।

পিলু দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বলল, মায়া ওঠ। দেখ কি এনেছি।

মা বলল, না বাবা না। ডাকিস না। অনেক করে ঘুম পাড়িয়েছি, খাব খাব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাকুক। সকালে তো হাতের কাছে কিছু নেই। নীল লণ্ঠন দুলিয়ে একটা লোক হেঁটে চলে গেল। মা এই লোকটাকে দেখলেই মাথায় বড় ঘোমটা টেনে দেয়। ছেঁড়া মাদুর কাঁথায় একটা সংসার লেপটে আছে। বড় করুণ দেখায় প্ল্যাটফরমটা। যাত্রীরা তাকায়, দেখে। নতুন এই সব উদ্বাস্তুতে সব স্টেশনগুলি ভরে যাচ্ছে। কোনো সময় অযথা গালিগালাজও করতে থাকে কেউ। আমাদের সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। মনেই করতে পারছি না, আমাদের আবাস ছিল একটা। সেখানে শিউলি ফুলের গাছ ছিল। শরৎকালে আমরা ভাইবোনেরা মিলে ফুল তুলেছি। স্থলপদ্ম গাছ থেকে পদ্ম তুলে এনেছি। বাবা হাট থেকে তাজা আস্ত ইলিশ কিনে এনেছেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছে। আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু পেট ভরে খেয়েছি। বড় মাঠ ছিল, কখনও পার হয়ে গেছি তা। পুজোর ছুটি পড়লে স্কুল থেকে ফেরার পথে নৌকা ডুবিয়েছি জলে—কিছুই আর মনে করতে পারছি না। যেন কতদিন

থেকে এমন একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে আছি। আমাদের বাড়িঘর ছিল এখন দেখলে কে আর এটা বিশ্বাস করবে। আর সেই কবে থেকে একটা ট্রেন আসে যায়, সূর্য ওঠে আকাশে, শরতের জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যায়, বাবা তবু আসেন না। বাবার মতো মানুষ আর নেমে আসেন না ট্রেন থেকে।

ঘুম থেকে সকালে উঠেই অবাক। ট্রেন থেকে বাবা নামছেন। ইয়া বড় বড় পুঁটলি। ডেকেডুবে যেন গোটা প্ল্যাটফরমটাকেই কাঁপিয়ে তুলছেন। —নামা নামা। পিলু, ও বিলু, বাবা তাড়াতাড়ি আয়। ধর সব। দেখিস যেন কিছু থেকেটেকে না যায়। শ্রাদ্ধের কাজটাজ কিছু সেরে বাবা ফিরেছেন। আমরা টেনে টেনে নামাচ্ছি। মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। ছেঁড়া শীতলপাটিতে বসে বাবা তখন তালপাতার হাওয়া খাচ্ছেন। —তা দেরি হল একটু। বামুন মানুষ, হাতের কাছে কাজ, ফেলে আসি কি করে।

আমার মা তখন শুধু চোখের জল ফেলছিল। কিছু বলছে না। সব গোছগাছ করে রাখছে। সকালের রোদ আমাদের খুব মনোরম লাগছিল। এমন সুন্দর দিন মানুষের জীবনে খুব কমই বুঝি আসে। পিলু তখন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল। পুনু বাবাকে দেখেই কোলে গিয়ে বসে পড়েছে। মায়া বাবাকে হাওয়া করছে। টের পেলাম, আমার বাবার হাতেও একটা নীলবাতি আছে। বুঝতে পারলাম, সিগনাল ডাউন। আমাদের গাড়ি ছাড়ার আবার সময় হয়ে গেছে। কোথায় গিয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত থামবে জানতাম না। আমাদের ছিল তখন এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানোর জীবন। একটা নীলবাতি নিয়ে বাবা তাঁর বাড়িঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পড়াশোনার ব্যাপারটা আমাদের এখনও কিছু তেমন ঠিকঠাক হয়নি। দেশ ছেড়ে আসার সময় আমার কিছু বই সম্বল ছিল। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সব ক্লাসেই চলবে এমন ভেবে বাবা পাকাপাকিভাবে বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। দুটো একটা বের করে নিতে বলেছেন। বাবার ধারণা ঠিকঠাক হয়ে বসতে না পারলে পড়াশোনায় মন বসবে না আমার।

বিউগিল বাজলেই বুঝতে পারতাম পাঁচটা বাজে। সকাল হয়ে গেছে। ব্যারাকে ফল-ইনের সময়। এবারে দূরে মানুষজন দেখতে পাব বলে, বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম আমরা। বাছারি ঘরটার টিনগুলি বাইরে টানা। ছায়া পড়লে বারান্দা হয়ে যায়। ঘরটার একমাত্র দরজা খলপা দিয়ে তৈরি। একটা তেলতেলে বাঁশের খুটি—ঝাঁপটা ধরে রাখার জন্য ঠ্যাকার কাজ করে। একপাশে ছোট্ট বেড়া দিয়ে মাকে ঘরের সংলগ্ন রান্নাঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোবরে লেপা উনুনের পাশে আছে বড় একটা মেটে হাঁড়ি কাঁঠালের বিচি ভরা। সকালের জলখাবার গোনাগুনতি কাঁঠাল বিচি ভাজা। কারো ভাগে একটা কম হতে পারত না, বেশি হতে পারত না। বাবা কখনও ছেলেমানুষের মত হাত পেতে বলতেন, বেশ খেতে। আর দুটো দাও না।

মা নির্বিকার। এমন উদাসীন মা, একটা আর কথা বলত না বাবার সঙ্গে। বাবা ভয়ে ভয়ে উঠে যেতেন।

তখন বাদশাহী সড়কের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত পুলিসেরা। কখনও ডবল মার্চ, কখনও কুইক মার্চ করে তারা যাচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হত, বড় হলে আর স্টেশনমাস্টার হয়ে কাজ নেই। বরং পুলিস হব। বাবা বলেছেন, এতে খুব উন্নতি। খুব বড় সাহেবসুবা হতে বাধে না। কাজ দেখাতে পারলে দারোগা পর্যন্ত হওয়া যায়। কোনো হাবিলদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাকতেন, ঠাকুরমশাই আছেন। বাবার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হত। এবং কথাবার্তা শেষে বাবাকে মনে হত খুব অসহায়। এমন অবিষয়ী মানুষের জন্য বোধহয় লোকটারও করুণা হত। বলত, কি ঠাকুরমশাই, মরতে আর জায়গা পেলেন না। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাস করতে চলে এলেন।

বাবা কিছুতেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত দমে যেতেন না। কারণ দমে গেলেই মা বাবাকে পেয়ে বসবে। কোথায় কি কথাবার্তা হয় মা'র কান খাড়া করে শোনার অভ্যাস। —লোকটা কি বললো গো। সুতরাং বাবা বিচলিত হতেন না শেষ পর্যন্ত। খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বলতেন, মাটি, বুঝলে না, একবার সব আগাছা সাফ করতে পারলে দেখবে ফসল। জমি জুরে শুধু ধান। শীতের দিনে কলাই। সামনের জমিটাতে আম, জাম, লিচুর গাছ লাগিয়ে দেব। বড় হলে কত ফল। কত পাখপাখালি দেখবে তখন

উড়ে আসবে। জমির ধানে সমবৎসর চলে গেলে দুটো একটা বাতাবি লেবুর গাছ লাগিয়ে দেব ভাবছি। এমন জমি মানুষ পতিত ফেলে রাখে!

আসল কথা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না। বাবা খবর পেলেন মানুকাকা বহরমপুরে থাকে। বাবার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। খবর পেয়েই লটবহর নিয়ে রওনা। এবং কোনো দ্বিধা না করে পরম আত্মীয়ের মতো ভাই-এর বাড়িতে উঠে পড়লেন। আমাদের সেই কাকাটি বাবাকে দেখে একেবারে হতবাক। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো খবর না দিয়ে কেউ কখনও আসে! দেশে অবশ্য খুবই যাওয়া-আসা ছিল। কাকার মা, এবং ভাইবোনেরা ঠাকুরদা ঠাকুমা বেঁচে থাকতে বর্ষায় দু-চার হপ্তা বেড়িয়ে যে না গেছেন তাও না। সংসারে কোনো অভাব ছিল না বলে বাবা কিছুতেই তাঁর পিসিকে এবং ভাই বোনেদের যেতে দিতেন না। সেই সুবাদে খবর পেয়েই সোজা সেখানে উঠে বললেন, চলে এলাম মানু। দেশ থেকে যা এনেছি শেষ। শোনলাম তুই এখানে আছিস। তুই যখন আছিস তখন আর ভাবনা কি। কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে। কি বলিস! কাকা ঢোক গিলে বললেন, তা হয়ে যাবে।

কদিন যেতে না যেতেই কাকীমার গঞ্জনা শুরু হয়ে গেল। কাকা সারাটা দিন বাড়ি থাকে না। অফিসে থাকে। বাবা চুপচাপ বসে থাকেন মাদুরে। আগে তবু একটা চেষ্টা ছিল, এখানে এসে ওঠার পর বাবা কদিনেই কেমন ভালমানুষ হয়ে গেছিলেন।

কাকা একদিন বলল, সরকারী ক্যাম্পে উঠে যান দাদা। ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া মন্দ না। আমাদের অফিসের বড়বাবুর ভাই ক্যাম্পে চলে গেছে।

অভাব অনটনের কথা বোধহয় পাড়তে যাচ্ছিল, বাবা বললেন, ক্যাম্পে কোনো জাত বিচার নেই। আমি যাই কি করে! তার চেয়ে এদিকে কোথাও পুজোআর্চা করে যদি থেকে যেতে পারতাম। তোর বৌদির তাই ইচ্ছা।

অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বাবার পৃথিবীটা কবেই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। মানুকাকারও বিড়ম্বনা। তাঁর ছেলেমেয়েরা আমার বয়সী, শহুরে মানুষ। পরিচয় দিতে কিছুটা কুণ্ঠাবোধ হওয়া স্বাভাবিক। এবং আমার মা কেমন সেই প্রথম মনে হল বাবাকে ডেকে গোপনে কিছু বলল। বাবা বললেন, তাই বুঝি। এবং পরদিনই বাবা মানুকাকার সঙ্গে কোথায় গেলেন। ফিরলেন রাত করে। বাবা ফিরেই বললেন, সব ঠিক হয়ে গেল, আর তোমাদের ভাবনা নেই।

সলতে জ্বালাবার শেষ তেলটুকু গোপনে এতদিন কি করে এত কষ্টের মধ্যেও সঞ্চয় করে রেখেছিল মা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য জমি এবং যথার্থ বনভূমিতে হাজির হয়ে মার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল—তাই বলে শেষ পর্যন্ত এখানে!

বাবা বলেছিলেন, একেবারে জলের দরে জমি। একশ টাকায় কত জমি দেখ। তা তোমার পুরো একশও ছিল না। মানু কিছু দিয়েছে। জমির শেষ কোথায়, সীমানা কোথায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাবা উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে চারটে গাছ দেখিয়ে বললেন, এই তোমাদের সীমানা। এ জায়গা তোমাদের। বনের ভেতর সেই যে চারটে গাছ, সব কটাই শিরীষ। এবং লম্বা আকাশ বরাবর আর যা আছে মাঝখানে, তার মালিক আমার বাবা। বাবা বনটার পাশে গ্রীকরাজের মতো দণ্ডায়মান ছিলেন। যেন বনটা রাজা পুরুর মতো বশ্যতা স্বীকার করতে চাইছে না। বাবা বললেন, এখানেই জঙ্গল সাফ করে তোমাদের আবাস তৈরি হবে। আগাছা জঙ্গল সাফ করে বুঝতে হবে কতটা জমি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। রাজবাড়ির আমলারা তো বেজায় খুশী। বলেছে, বনটায় লোকবসতি দেখলেই জমির দর বাড়বে! এবং যা বললেন, তাতে মনে হয়েছিল, টাকা না দিলেও প্রথম আবাস করার দুঃসাহসের জন্য মিনি-মাগনায় জমিটা পাওয়া যেত। সুতরাং জলের দরে জমি—অদূরে গাছ দেখে বোঝা যাচ্ছিল জমির সীমানাটা কোথায় শেষ! জঙ্গল সাফ করে শেষ পর্যন্ত কবে সেখানে পৌঁছনো যাবে সেটা বাবার ঈশ্বরই একমাত্র বলতে পারেন। বরং জমি না বলে বন বলা ভাল। বাঘের নিবাস ছিল, এবং যে দুটো-একটা এখনও নেই কে বলবে। বাবা যতই সাহসী হোন অদূরে পুলিস ব্যারাক না থাকলে এখানে বাড়িঘর করার সাহস পেতেন না। সব বাবলা গাছ, নানা রকমের সব লতা, কাঁটা ঝোপ, কোথাও কোথাও সব মরা গাছের গুড়ি, ভাঙা ইঁটের ডাঁই। যত সাফ করে এগোনো

যাচ্ছে, তত সব আবিষ্কার করা যাচ্ছে। হেস্টিংসের আমলের কুঠিবাড়িও বনের ভেতর মিলে যেতে পারে—কিংবা নগর-টগর ছিল—এখন শুধু তার ধ্বংসাবশেষ। বাবা সারাদিন কোদাল কুপিয়ে আগাছা তুলছেন, সঙ্গে আমি এবং পিলু। আর ঠুং করে কোদালে শব্দ হলেই বাবা খুব সচকিত হয়ে উঠতেন। বুঝি আছে কোথাও কোন গুপ্তধন। তিনি ঝুঁকে বসতেন, কোদাল মেরে সেই ইষ্টক খণ্ডের নাড়িসুদ্ধ টেনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—ইষ্টকখণ্ড, না আসলে স্বর্ণপিণ্ড—বহুকাল মাটির নিচে পড়ে থাকায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সবাই দৌড়ে আসত। মা পর্যন্ত। মার মুখের কাছে নিয়ে বাবা বলতেন, কি মনে হয়? কেমন শক্ত দেখ। পাথর। পাথর আসবে কোত্থেকে। মা কিছু না বলা পর্যন্ত ফেলে দিতে পারতেন না।

মা বলত, আর কি মনে হয়! আমাদের কপাল খুলবে, তালেই হয়েছে।

বাবা অভয় দিয়ে বলতেন, পেয়ে যাব। ঠিক পেয়ে যাব। বুঝলে এটা কাশিম-বাজার কুঠির কাছাকাছি জায়গা। একসময় খুব বড় নগর ছিল এখানে। কলকাতা শহর আর কত বড়, তার চেয়ে বড় শহর ছিল। মানুষজন, কুঠি সাহেবরা, পৃথিবীর সোনাদানা সব লুটেপুটে এখানে এনেই জড় করেছিল। নবাব বাদশা সদাগর, বেনে কি না ছিল! কত নীলকুঠির ধনরত্ন এখানে সেখানে মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক পেয়ে যাব।

একদিন ছোট দুটো শালগাছের চারা আবিষ্কার করা গেল। বাবা বললেন, থাক, বড় হলে কাজে লাগবে।

সারাদিনে বাপ বেটা মিলে পাঁচ-সাত হাত জমি সাফ করে ওঠা যেত না। আর মাঝে-মধ্যেই বাবার রহস্যময় অন্তর্ধান তো লেগেই আছে। তখন আমার পিলুর ছুটি। পিলু এখন এই বনভূমিটার ছোটখাটো একজন সামন্ত রাজ। আর আমি হচ্ছি তার দাদা।

কত রকমের সব যে লতাপাতা! আশ্চর্য নীল ফুল বনের গভীরে ফুটে আছে। জঙ্গলের ভেতরে অদ্ভুত বড় বড় সব গিরগিটি, গোসাপ, বেজি। একটু সমতল মতো জায়গায়, যেখানে বেশ সবুজ ঘাস আছে এবং একটা ছোটখাটো উপত্যকার মতো মনে হয়, ঢুকে গেলে, দেখা গেল দুরন্ত খরগোশেরা ছুটছে। আমাদের মটরশুঁটি গাছগুলোর ডগা রাখা যাচ্ছে না। কারা খায় বোঝাও যাচ্ছে না। সজারু এসে খেতে পারে—পিলু বলেছিল। বাবা বলেছিলেন, সজারু ডগা খায় না। মূল খায়। এবং এক সময় খরগোশের খবর প্রথম পিলুই এনে দিয়েছিল বাবাকে।

বাবা বললেন, খরগোশের মাংস খুব সুস্বাদু। কখনো খেয়েছ? আমরা কি খাই না খাই বাবার চেয়ে আর কে ভাল জানে। তবু তাঁর এমনধারা প্রশ্ন ছিল। যেন আমরা কত কিছু তাঁকে না দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।

বাবা আরও বললেন, সজারুর মাংস খেতেও বেশ। তবে একটা দিন মাটির নিচে রাখতে হয়। তা না হলে গায়ের বুনো গন্ধ যায় না।

বাবার রহস্যময় অন্তর্ধানের সময় আমরা একেবারে শুধু বনআলু খেয়ে দিন কাটাই সেটা বোধহয় তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। সঙ্গে মাংসের ঝালঝোল, বেশ জমবে তবে। আর বাবাও নিশ্চিন্তে দুটো দিন দেরি করে ফেললে, কিছু আসবে যাবে না। এ সব ব্যাপারে বাবা পিলুকে যতটা গুরুত্ব দিতেন, আমাকে তার সিকি ভাগ দিতেন না। এবং একবার বাবা না থাকায় পিলু ঠিক দুটো খরগোশ শিকার করে চলে এল। মা বলল, করেছিস কি। এমন সুন্দর দুটো খরগোশকে মেরে ফেললি!

পিলু খুব মুষড়ে পড়ল। বলল, বাবা যে বলেছেন খরগোশের মাংস খেতে বেশ।

—তোমার বাবা এবার আরও কি তোমাদের খেতে বলবেন কে জানে।

পিলু খুব একটা অপরাধ করে ফেলেছে—কি করা যায়। মা কিছুতেই রাঁধতে রাজী হচ্ছে না। অগত্যা এ-সব ক্ষেত্রে সে আমারই শরণাপন্ন হতে পছন্দ করে। মায়া তো উল্টে-পাল্টে দেখে ওক তুলে ফেলল। এবং আমিই বললাম, ঠিক আছে, তোমরা কেউ খাবে না। আমি, পিলু খাব। এবং যখন কেটেকুটে থালায় রাখা হল, হলুদ বেটে মাখা হল, সামান্য আদা বাটা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে বেশ সুঘ্রাণ তৈরি হয়ে গেল, তখন মা বলল, দাও রেঁধে দিচ্ছি। তোমরা তো দেশ ছেড়ে এসে এক-একজন বকরাক্ষস হয়ে গেছ। এখন যা পাবে তাই খাবে।

কিছু চাল ছিল ঘরে, মা দুটো ভাতও ফুটিয়ে দিল। এবং খেতে বসে দেখা গেল, কেউ বাদ গেল না। মা নিজেও বড় পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলল শেষটুকু। বলল, খেতে তো বেশ। তোর বাবা এলে আবার দুটো ধরে আনবি তো।

বাবা বাড়ি থাকলে ঝোপজঙ্গল কেটে রাখা আমাদের কাজ। এবং টেনে আনা, অথবা কোন ঝোপজঙ্গল টেনে আনতে না পারলে রেখে দেওয়া। শুকোলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। কতসব গাছের গুঁড়ি আর ইঁটের চাতাল। কোনো ঢিবি আবিষ্কার করলেই বাবা গুপ্তধনের গন্ধ পেতেন। সহজে হাত দিতেন না। মনে হত বুঝি ঢিবিটা আছে থাক। সময় মতো খুঁড়ে ধনরত্ন তোলা যাবে।

জঙ্গল কাটতে কাটতেই বাবা কখনও চেঁচিয়ে বলতেন, ওদিকে না। এদিকে চলে এস। তেনারা পড়ে আছেন।

তেনারা কে এবং কি রকমের আমাদের এতদিনে বেশ ভাল জানা হয়ে গেছে। বলতাম কোথায় বাবা?

ঐ দেখ। আলিসান ভুজঙ্গ। এতটুকু ভয় ভীতি নেই। পিলুটার ছিল আবার খুব বাড়াবাড়ি। সে লাঠি তুলে তেড়ে গেলে বাবা বলতেন, তোমার তো কোনো অনিষ্ট করেনি। কেন মারতে যাচ্ছ।

এতবড় আলিসান ভুজঙ্গ দেখে আমাদের হৃৎকম্প দেখা দিত। বাবা কিন্তু নির্বিকার। কাজ করে যাচ্ছেন।

আমাদের খাওয়া-দাওয়াটা এখন কোনো নিয়মমাফিক ব্যাপার নয়! ভাত খাওয়াটা আমাদের কাছে ভোজের মতো। ভাত না থাকলে, বনআলু না পাওয়া গেলে শুধু গাছের পেঁপে সিদ্ধ করে খাওয়া। কিছু পেঁপে শহরে নিয়ে যেতে পারলে বিক্রি হত। দু-একদিন পেঁপে বিক্রির পয়সায়ও ভাত মাছ হয়ে যায় কখনো। এবং বাবা একদিন গোটা দশেক বড় সাইজের পেঁপে পেড়ে একটা ঝোলায় নিয়ে চাল সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন। কিন্তু আর ফিরলেন না।

ঠিক শহরে বাবা মানুকাকার কাছে কোনো খবর পেয়ে চলে গেছেন কোথাও। ফিরবেন যখন, মাথায় বড় সব পোঁটলাপুঁটলি। আমার কেবল ধারণা হত, বাবা গোপালদির বাবুরা কোথায় আছে জানতে পারলে গুপ্তধন পেয়ে যাবেন। বাবুদের সঙ্গে দেখা হলে পূজা-পার্বণে বাবাকে ডাকবে। দেশে থাকতে ওরা খুব দিত-থুত। দু আড়াই বছরে বাবার স্বভাবধর্ম আমাদের খুব জানা। না থাকলেও এখন আর মা এবং আমরা তেমন দুশ্চিন্তা করি না। পিলুটা কেবল বনের ভেতর অন্ধকার ঢুকে গেলে রাতে ভয় পায়। ঘর থেকে বের হতে চায় না। ওর ধারণা, বাবা যেহেতু বাড়ি নেই, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোরা সুযোগ বুঝে নিশীথে একটা লম্বা হাত বনের ভেতর থেকে বাড়িয়ে দেবে। এবং আমাদের ছোট বাড়িঘর তুলে নিয়ে মাথায় টোপর পরে বসে থাকবে। এই ভয়টাই খুব কাবু করত পিলুকে।

আর মা'র মনে হত, বাবা বাড়ি না থাকলে যা হোক একটা লোকের আহার বেঁচে গেল। কারণ তিনি যেখানেই যান বেশ চালিয়ে নেন। কোথাও বাবার কিছু অভাব থাকে না। এবং যদি কোনো শিষ্যবাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়—বাবা সেখানে তো ধর্মগুরুর মতো। এমন কি তখন সেখানে মচ্ছব-টচ্ছব লেগে যায়। তারপর ফেরার সময় নগদ টাকা, মার জন্য প্রণামীর শাড়ি, আমাদের জন্য শীতের চাদর নিয়ে আসতে পারেন।

বাবা পরদিনও ফিরলেন না। আশ্চর্য, এবারে মাকে খুব চিন্তিত দেখাল। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে এমনটাই বুঝি হয়। সকালের দিকে মা বলল, একবার যা তোর মানুকাকার কাছে। মানুষটা কোথায় গেল খবর নিবি না?

পিলু বলল, চল দাদা, বাবাকে খুঁজে আসি। এবং দুজনে কাকার বাড়ি গেলে জানলাম, বাবা গেছেন বেথুয়াডহরি। পেঁপে বিক্রির পয়সা কাকার কাছে রেখে গেছেন! কাকা আমাদের খেয়ে যেতেও বললেন। পিলু বলল, দাদা আমার তো খাবার ইচ্ছে খুবই। তোর? আমার কি ইচ্ছে কী করে পিলুকে বোঝাই, তবে অস্বস্তি এই যে, কাকার ছেলেমেয়েদের পোশাক এবং পারিপাট্য এত বেশি যে গেলে চাকর-

বাকরের মতো মনে হয় নিজেদের। তবু খেতে বলায় দুজনই খুব খুশি। খাবার লোভে একটা ঘরে দুজনে চোরের মতো বসে থাকলাম। একটা কথা বললাম না ভয়ে। খুড়তুতো ভাইবোনেরা দু-একবার উঁকি মেরে গেল। আমরা তখন অন্য দিকে চেয়ে থেকেছি। যেন আমরা খাওয়া বাদে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না বুঝি না। বড়ই সুবোধ বালক। ওদের চোখে চোখ পড়ে গেলেই টের পাই বড়ই অদ্ভুত দুটো জীব আমরা। কাকা অদ্ভুত দুটো জীব ধরে ঘরে পুরে রেখেছে। ওদের কৌতূহল মেটাবার জন্য যতটা পারলাম খাঁচায় পোরা দুটো হরিণ শাবকের মতো মুখ করে রেখেছি। যদিও খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু খাবার লোভে পালাতে পারছি না। খেতে বসে কোনোরকমে ঘাড় গুঁজে আমরা খেয়ে ফেললাম। পিলু ভাত খেতে খুব ভালবাসে বলে আকণ্ঠ খাওয়া কি ঠিক বোঝে না। ও বোধহয় ঘিলুতক ঠেসে খেল। খাওয়া দেখে হাঁ হয়ে গেল আমাদের ভাইবোনেরা। পেটে কি ধামা বাঁধা আছে—এত খায় কি করে! অন্য ঘরে ওরা ফিসফিস করে কথা বলে খুব হাসাহাসি করছিল। সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল।

কাকা গুনে দু টাকা দশ আনা পয়সা হাতে দিয়ে বললেন, ধনদার ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে। বেথুয়াডহরিতে দেশের লোক এসেছে অনেক। খবর পেয়েই চলে গেল। তাছাড়া তোদের কিছু শিষ্যবাড়িরও খোঁজ নিতে যাবে বলেছে।

বাবার একটা খেরোখাতায় আজকাল রাজ্যের সব মানুষজনের নাম ঠিকানা লেখা থাকে। পিতামহের আমলের কিছু শিষ্যদের নাম বাবা 'পুনরায়' হেডিং দিয়ে লিখে রেখেছেন। বাবা দেশে থাকতে হেলায় এই গুরুগিরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন এই দুঃসময়ে তাদের খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন বোধহয়। তাছাড়া নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকাটা তো বগলে রয়েছেই। এত বড় একটা মূলধন যাঁর আছে তাঁর আবার ভাবনা কি।

ট্রেনে বাবার যেহেতু পয়সা লাগে না, বাবা সহজেই যে কোনো সময় খুশিমত সুদূরে চলে যেতে পারেন। যারাই দেশ ছেড়ে এসেছে, সবাই প্রায় রেললাইনের লাগোয়া গ্রামে গঞ্জে অথবা কোনো পতিত জমিতে নিজেদের আবাস গড়ে তুলছে ক্রমশ। রেলে বাবার টিকিট লাগে না এটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার আমাদের কাছে। আর বাবার অকাট্য যুক্তি, আমরা ছিন্নমূল মানুষ, সব দেশের স্বার্থে, এটা কত বড় আত্মত্যাগ! আমাদের আবার ভাড়া কি। অথবা কখনও বাবা যেন দেশ ভাগ করে নেহরু যে ভুল করেছেন বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে তার খানিকটা উশুল করে নিচ্ছেন। বাবা তাঁর বিনা টিকিটে ট্রেনের ভ্রমণ-কাহিনী ফিরে এসে সগৌরবে বলতে খুবই ভালবাসতেন।

আর থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা বাবার যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিচিত মানুষের বাড়িতে আজন্ম অধিকারের শামিল হয়ে গেছে। যদি খোঁজখবর মিলে যায়, আর খোঁজখবর না মিললেও কোনো লতাপাতায় সম্পর্ক খুঁজে পেলে একেবারে তখন মৌরসীপাট্টা—থাকা খাওয়া, দেশের গল্প, এমন সোনার দেশ মানুষকে ছাড়তে হয় কত বড় পাপ করলে সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ তাঁর বক্তৃতা। বাবার কথাবার্তা শুনলে সবার বোধহয় মানুষটার ওপর মায়া পড়ে যায় এবং সহজে ছাড়তে চায় না। এবং বাবা যখন গেছেন, আর মানুকাকাকে বলে গেছেন তখন খুবই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আমরাও ডাল ভাত মাছ খেয়ে বেজায় খুশি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাকার বাড়ি থেকে বের হওয়া দরকার। পেট ভরে খাওয়ার আনন্দটা ঠিক উপভোগ করা যাচ্ছে না! কারণ কাকার ছেলে-মেয়েদের বিরূপ কথাবার্তা খুবই খোঁচা দিচ্ছে পেটে। কাকা এবং কাকীমাকে যত দ্রুত সম্ভব টুপটাপ প্রণাম সেরে বের হয়ে পড়া গেল। এবং শহরের রাস্তায় কতসব অলৌকিক ঘটনা দেখা গেল ক্রমে। রিকশা চড়ে মানুষেরা যায়। জানলায় সুন্দর মতো মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্জুনগাছটার নিচে একটা চায়ের দোকান। সবাই চা খাচ্ছে। বিকেল পড়ে আসতেই শহরে ঠাণ্ডা ভাব। সিনেমাহাউসে রামের সুমতি বই হচ্ছে। বাদ্য বাজছিল। বইয়ের কত দোকান, জেলখানার পাঁচিল পার হয়ে গেলে জলের ট্যাঙ্ক। টাউন ক্লাব। পাশে পুলিসের ব্যারাক। উর্দিপরা ব্যাণ্ড-পার্টি আগে আগে ব্যাণ্ড বাজিয়ে যাচ্ছে। পুলিসের সব খাকি পোশাক, আর রূপোর বকলেশ নীল আকাশের নিচে এক চিত্রকরের ছবির মতো। তারপরই বালিকা বিদ্যালয়। একই রকমের নীল ফ্রক পরে দলে দলে মেয়েরা বের হয়ে আসছে। একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির টবে গোলাপের গাছ। পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে বালিকা নিবিষ্ট মনে কোনো

গল্পের বই পড়ছে। এতসব ঘটনা একটা শহরে রোজ ঘটে। এক জীবনে এতটা দেখা যায় যেন আমার আগে জানা ছিল না।

তারপরই সোজা সড়ক চলে গেছে রেল-লাইন পার হয়ে। দু পাশে বড় বড় সব শিরীষ গাছ। পাতা ঝরছে। শনশন হাওয়া কবরখানা থেকে উঠে আসছে। সাহেবদের কাবরখানা ডান দিকে। এবং কত সব সমাধি ফলক আর কত প্রাচীন সব ঝাউগাছ। যত শহর শেষ হয়ে আসছে তত নিঝুম পৃথিবী। গাছপালা পাখি তত বেশি। কতশত বছরের পুরনো সেই বাড়িটা যেন, ভাঙা শ্যাওলা ধরা রাজপ্রাসাদের মতো। একটা টগর ফুলের গাছ, চত্বরে আর কিছু নেই। মজা দীঘি, ভাঙা ঘাটলা। আর এ-সব পার হয়ে ডান দিকে গেলেই সেই কারবালা। বনটার আরম্ভ। কোথাও ভিতরে কবে কোন্ আদ্যিকালের ইঁটের ভাটা। এবং এই বনেই নবমী বলে সেই বুড়িটা থাকে। পিলু বাড়ি ফেরার পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য কারবালার মাঠে নিয়ে এল আমাকে। এবং বনের এক আশ্চর্য মোহ আছে পিলুর। সে ইতিপূর্বে এই বনের ভেতর দুটো আমড়া গাছ, কিছু পেয়ারা লিচু গাছ এবং একটা কাঁঠাল গাছও আবিষ্কার করে ফেলেছে। আর নবমীকে এই ফাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে—কারণ আমার মতে নবমী একটা ডাইনি না হয়ে যায় না। আমার ভুল ভাঙাবার জন্যই যেন পিলু এই পথটা ধরে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পিলু তখন বলল, আমি খুব বেশি খেয়েছি নারে দাদা?

সত্যি কথা বললে যদি পিলু মনে কষ্ট পায়, ভেবে বললাম, কোথায় বেশি খেলি! ওটুকু না খেলে পেট ভরবে কি করে!

পিলু বলল, আয় দাদা, এখানে একটু আমরা গড়িয়ে নি! বড় উঁচু মতো একটা কড়ুই গাছ। নিচে সবুজ ঘাসের মাঠ। বেশ অনায়াসে শোওয়া যায়। বনটার ভেতরে ঢোকার আগে নিরিবিলি জায়গাটাতে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা গেল। দূরে রেল-লাইন। একটা গাড়ি যায় সন্ধ্যায়। পাশে কাশের বন দিগন্তব্যাপী। কেবল কারবালার মাঠটা একটু দূরে। দুটো একটা মিনার, ভাঙা মসজিদ এবং একটা কুকুর বাদে কিছুই আর চোখে পড়ছিল না।

পিলু বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাছের নিচে শুয়ে আছে। আমিও পাশে। বললাম, তুই এখানে কখনও এসেছিলি?

সে বলল, কত। কতবার এসেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। ও রাস্তাটা ধরেই যাব।

আমার কেমন গা ছমছম করছিল। ভয় লাগছিল। পিলুটা কিন্তু দিনের বেলায় একদম ভয় পায় না। ওর শুধু ভূতের ভয়। এছাড়া ওর অন্য কোনো ভয় নেই। তার ধারণা দিনের বেলায় ভূত-টুত বের হয় না।

বেশ লাগছিল। শহর ঘুরে দেখা গেল। বাবার খোঁজ পাওয়া গেল। আকণ্ঠ খাওয়া গেল। একজন মানুষের জীবনে আর কি দরকার তখন বুঝতে পারছিলাম না। এবং প্রকৃতির ভেতর আমরা দুই ভাই, এক অন্য জগৎ, শুধু পাতা ঝরছে আর নানা বর্ণের সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। গাছে বসে ডাকছিল।

গাছের নিচে শুয়ে দুই ভাই কত কথা বললাম। পিলু আবার বলল, সে বড় হয়ে রানাঘাটে যাবে। বলল, দাদা, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। আমি একটা দোকান দেব। দুজনে রোজগার করলে বাবার কোনো দুঃখ থাকবে না। পিলু বাবারও খুব প্রশংসা করল। বলল, বাবা ভাগ্যিস জায়গাটা খুঁজে বের করেছিলেন। পিলুর মতে এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় আছে! আসলে তখন আমি বুঝতে পারি এই বনজঙ্গলের আশ্চর্য একটা টান আছে! ছোট্ট ঘর—মা বাবা, রাতে কখনও বাবার ফিরে আসা, কখনও বনজঙ্গলে পিলুর ভ্রমণবিলাস, সব মিলে জায়গাটার আলাদা মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। পিলু না থাকলে এ-বনজঙ্গলের সব সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়। যেন এতদিন এই বনটা ঘুমিয়েছিল, পিলু আসায় বনটা জেগে গেছে! শীত-গ্রীষ্মে বনের পাতা ঝরা থেকে আরম্ভ করে সব প্রাণীকুল এক ছোট্ট বালকের কাছে কতকাল পর যেন ধরা পড়ে মহীয়সী রূপ ধারণ করেছে।

পিলু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, ঐ যে ঘরটা দেখছিস ওটার মধ্যে নবমী থাকে।

—ঘর কোথায়! এ তো পুরনো ইঁটের পাঁজা।

কাছে গেলেই নবমী পিলুকে দেখে বলল, ওমা, পিলু দাদা যে!

আমি তো অবাক। ভারি ভাব বুড়িটার সঙ্গে। শনের মতো সাদা চুল। একটাও দাঁত নেই। ঘরের বার হতেও কষ্ট। কচুর মূল, বনআলু এবং মালসার মধ্যে ঘুসঘুসে আগুন এই সম্বল করে বেঁচে আছে। নবমী আমাকে দেখে বলল, এ কেডা পিলু দাদা?

—আমার দাদা। তোমাকে দেখাতে এনেছি।

নবমীর শরীরে শুধু শুকনো কলাপাতার পোশাক। কোমর থেকে হাঁটু অবধি। বোধহয় মানুষের সাড়াশব্দ পেয়েই সে তার মহামূল্য পোশাক পরিধান করে অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছে। নতুবা বনের মধ্যে তার উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরার অভ্যাস। এবং বয়স খুব কাবু করে ফেলেছে দেখে বললাম, নবমী, তোমার ভয় করে না?

—না দাদা।

—তুমি এখানে আছ একা, ভয় করে না?

—এমন জায়গা কোথায় আর আছে দাদা!

—অসুখ-বিসুখে তোমাকে কে দেখে?

সে ওপরে হাত তুলে দেখাল। কি আশায় এখানে পড়ে আছ ভাবতে খুবই বিস্ময় লাগছিল আমার। কতদিন থেকে আছে কে জানে! এবং যা ভয় ছিল, তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল ওর কথাবার্তা শুনে। একটা ছাগলের তিনটে বাচ্চা হয়েছে। সে পিলুকে বলল, দাদা তুমি বামুনের ছেলে, বলেছিলে একটা ছাগলের বাচ্চা নেবে। আর নিতে এলে না তো।

পিলু বলল, বাবা বেথুয়াডহরি গেছে। এলে বাবার কাছে পয়সা চেয়ে রাখব।

—পয়সা দিয়ে কি হবে গো দাদা। ওমা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন যে গো দাঠাকুরের দল। আমার কত পাপ, বলে সে দুটো ইঁট পেতে দিল। বলল, বসেন।

আমার তখন কত রকমের কূট প্রশ্ন মাথায়। বললাম, নবমী, তোমার আর কেউ নেই?

—কেউ নেই কেন হবে গো। এত বড় একটা সংসার আমার। তার পরে পিলু দাদা শেষ বয়সে এইসে গেল—কি আর লাগে।

—ওরা খোঁজখবর নেয় না তোমার?

নবমীর মুখটা সরল হাসিতে ভরে গেল। বড় জানতে ইচ্ছে হয়, ওর সেই শৈশবের কথা। কত বয়স এখন—মনে হয় সত্তর আশি। তার ওপরও হতে পারে। বললাম, তোমার বয়স কত নবমী? সে বলল তিন কুড়ি বছর হবে এখানটায় আছি। সেনবাবুদের ইঁটের ভাটিতে আমার মরদ সর্দার ছিল গো বাবু। দশাসই মানুষ। সে পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দাদা, আপনার বাবাঠাকুর আসবেন বলেছিলেন। এল না তো। একবার গড় হতাম। গড় হলে মুক্তি মিলে যেত।

নবমীর এত বড় সংসারে কে কে আছে জানতে চাইলে বলল, ছিল তো অনেক দাঠাকুর। বয়স বাড়ছে, তেনারাও ছুটি নিচ্ছেন। ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, তেনারা কারা?

—ঘর বার হতেই কষ্ট। খোঁজখবর করতে পারি না। দু পা হাঁটলেই হাঁটু ব্যথা করে দাঠাকুর। আমি না গেলে ওরাই বা আসবে কেনে বলুন।

কেমন রহস্যময় কথাবার্তা। বললাম, ওরা কারা?

নবমী ঘর থেকে দুটো নারকেল বের করে দিল। বলল, বাবাঠাকুরকে দিবেন। ফের বললাম, তাহলে তোমার কেউ নেই?

—আছে গো আছে। ওপরে হাত তুলে দেখাল—তিনি আছেন। চারপাশে গাছপালা দেখাল হাত তুলে, তেনারা আছেন। দূরে কোনো বন্যপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল—বলল, তেনারা আছেন। তারপর গাছের ফল-মূল, ঋতু পরিবর্তন, ফুলের সৌরভ—তার কাছে সবই অমৃতময় এখানকার। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বলল, এত সব আমার দাঠাকুর। মানুষটা নেই বলে, ইঁটের ভাটা উঠি গেল বলে, একা ভাববেন না। মানুষটাকে ওই যে দেখছেন শিমূল গাছ তার নিচে রেখে দিইছি। তেনার কথাবার্তাও কানে আসে। বলতে বলতে নবমী হাঁপিয়ে উঠল। একটা কংকালসার প্রাণে কত

আকাঙ্ক্ষা। ওর চামড়া কুঁচকে স্থবিরতা এসে গেছে শরীরে। তবু এই বনভূমির মাঝে নবমীকে মনে হচ্ছিল বড়ই সুন্দরী। বয়েসকালে সে আমার মা'র মতো তার মানুষের অপেক্ষায় কত রাত না জানি জেগে থেকেছে। বনটাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে আর কোথাও চলে যেতে পারেনি। শেষে নবমী বলল, মানুষের বাড়ি-ঘরের বড় মায়া। কোথায় আর যাব দাঠাকুর।

মাকে ফিরে এসে বললাম, বাবা বেথুয়াডহরি গেছেন।

—কার কাছে?

—বলে যাননি কিছু।

—কবে ফিরবে, কিছু বলেনি?

—না।

মা'র মুখটা কেমন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল। এই আবাস তৈরির পর, না অন্য কোনো কারণে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, এবারে বাবা চলে যাওয়ায় মাকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল। বাবা বাড়ি না থাকায় এবং কবে ফিরবেন বুঝতে না পারায় একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তির ভিতর যেন পড়ে গেছেন। মনে হল, সবাই কাছে আছে, কেবল একটা মানুষ ঘুরছেন, কি খান কোথায় থাকেন এ-সব ভেবেই হয়ত মা'র মুখটা এত করুণ দেখাচ্ছে। সুখে হোক দুঃখে হোক মানুষটা এই নতুন আবাসে একটা বড় গাছের মতো। এটাই বোধ হয় মা'র ভরসা! আগের মতো আর উদাসীন থাকতে পারছে না। মাটিতে শেকড় ঢুকে যেতে থাকলে বুঝি তাই হয়।

বাবা বাড়ি না থাকলে পিলু সংসারের অভিভাবক গোছের। সে একদিন সকালে উঠে বলল, এই দাদা ওঠ। যাবি না?

মনে পড়ে গেল রাতে পিলু বলে রেখেছে, খুব সকালে উঠতে হবে। ঝাঁকায় যাবে পেঁপে, কিছু মুলাশাক। আপাতত এই বিক্রি করে যা-কিছু উপার্জন। সকালেই উঠে পড়া গেল। সূর্য ওঠেনি। আকাশে বাতাসে বনভূমি থেকে শেষ সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোদ উঠলেই গন্ধটা কেমন মরে যায়। গাছপালা পাখ-পাখালি তখন জেগে যায় বলে গন্ধটা বুঝি আর থাকে না।

জমিতে সুন্দর সতেজ সব মুলাশাক। হেমন্তের শেষাশেষি বলে এবং অসময়ের প্রায় বলা যায় এই সব্জি দামে বিক্রি হবার খুব সম্ভাবনা। পিলু রাতে বলেছিল, মা, আমরা কতদিন আবার পেট ভরে ভাত খাইনি। পিলুর যা কাজকর্ম, দেখে মনে হচ্ছে সে আজ পেট ভরে ভাত খাবে। এটা যে সংসারে কত দরকারী কাজ পিলুর মুখ না দেখলে বোঝা যাবে না। সকাল থেকেই সে একজন বিষয়ী মানুষের মতো গম্ভীর।

শহরে রওনা হবার সময় মা বলল, দাঁড়া। একটা লাল পেড়ে শাড়ি ট্রাঙ্ক থেকে বের করে বলল, নিয়ে যা। কোথাও বিক্রি করে টাকা নিস।

পিলু বলল, তুমি এটা কেন দিচ্ছ মা। বাবা জানতে পারলে কত কষ্ট পাবেন।

মা বলল, জানবে না।

মাকেও সকালে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। তবু কেন যে গভীরে তাকালে বোঝা যায় আশ্চর্য এক বিষণ্ণতা আছে মায়ের চোখে। বাবা বাড়ি না থাকাতেই বোধ হয় এটা হয়েছে। আমরা সবাই পেট ভরে খাব, বাবা বাড়ি নেই, বাবা খাবেন না, বাবার ছেলেমেয়েরা পেট ভরে খাচ্ছে, তিনি জানতেও পারবেন না। বোধহয় দুঃখটা এ-জন্যই মায়ের এত বেশি।

এবং যেভাবে তাড়া লাগিয়েছে পিলু, যেন বেশ আমরা আগেকার মতো মানুষ। বাজারহাট, মেলা, টাকচাঁদা মাছের ঝোল, ঘোড়-দৌড় কত কিছুতে ভরে ছিল আমাদের জীবনটা। সকাল থেকেই পিলুর হাঁক ডাক—নিপুণভাবে সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছে ধামায়। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল—শহর দু-ক্রোশের ওপর। শহর যেখানে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে এখনও রাতে হ্যাজাক জ্বলে। আলো আসেনি। এবং চায়ের দোকান, মোটর গ্যারেজ, কিছু পাইকার মানুষ বসে থাকে—তাদের কাছে কম দামে সব বিক্রি করে দিতে হবে। ঝাঁকায় নিয়ে যাওয়া মুটে মানুষের মতো নিজেকে ভাবতে খুব খারাপ লাগছিল।

পিলু বলল, কিরে দাদা, আয়। তুলে দে।

পিলু নিজের ঝাঁকাটায় প্রায় বেশিটা নিয়েছে। আর পিলু বুঝি বুঝতে পেরেছিল, মাথায় এভাবে মুটে মানুষের মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া তার দাদাটা পছন্দ করে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, মা, একটা ব্যাগ দাও না? পেঁপে কটা দাদা ব্যাগে নিক, যদিও খুব স্বার্থপরের মতো দেখাচ্ছিল তবু পিলুর ওপর সামান্য সদাশয় হওয়া গেল। পিলুকে আগে আগে যেতে বললাম। পেছনে, বেশ দূরে, দূরে আমি। পিলুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে রাস্তার মানুষেরা, অথবা কোনো লোকালয়ে ঢুকে গেলে বুঝতেই পারবে না কেউ। সবচেয়ে বেশি সেই দোতলা বাড়ি, টবে, গোলাপফুলের গাছ, বালিকার ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়া জায়গাটায় দূরত্ব আমাদের আরও বেড়ে গেল। পিলু আমার মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে বেশ সচেতন। সে সারা রাস্তায় এমন কি সেই সুন্দর মতো সোনালী ফ্রক গায়ে মেয়েটার কাছে বুঝতেও দিল না আমি তার দাদা হই। পিলুর ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

আর পিলু প্রায় রীতিমতো দাম দর করে, কী যে বলছেন, এ দামে দেওয়া যায়! কি পেঁপে দেখেছেন, এক একটা কত বড় দেখেছেন! ভেতরটা কত পুষ্ট, আর যা মিষ্টি হবে সে না বলাই ভাল। একবার খেলে সারাজীবন মনে রাখতে হবে। প্রায় একজন দোকানীর মতো দরদস্তুর করে সবটা বিক্রি করে দিল। তারপর নতুন লাল পেড়ে শাড়িটা বিক্রি করা। সেও ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে বেশ দামেই বিক্রি করা গেল। এবং গুনে দেখা গেল সবসুদ্ধ বার টাকার কাছাকাছি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমরা অনেকদিন দেখিনি। প্রায় যেন আমরা জাদুকরের মতো বলশালী মানুষ। আমাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচুর্য। এত টাকায় কি হবে প্রথমে স্থিরই করা গেল না। কি কিনব, কি না কিনব—বাজারসুদ্ধ সব তুলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের। মাছের বাজারে ঢুকে খুব বড়লোকি চালে কথাবার্তা বলতে থাকল পিলু।—মাছ তো তোমার ভাল না। এ-মাছ মানুষে খায়! পচে গেছে। দেখি ওটা। আরে দাদা, দেখ, চাপিলা মাছ—কিনব। চাপিলা মাছ এ-দেশে এসে আমাদের কখনও খাওয়া হয়নি। পিলুর লোভ বেড়ে গেল। বেশ দামেই সে কিনে ফেলল পোয়াটাক মাছ। পুরো আট আনা পয়সা তিনবার গুনে পিলু লোকটার হাতে দেবার আগে ফের আমাকে গুনতে দিল। তারপরও পিলুর সংশয় গেল না। হিসাবে সে খুব পাকা।

তারপর শহর ছাড়িয়ে আটাকল ফেলে এবং সেই ভুতুড়ে সাঁকোটার কাছে আসতেই পিলু কেমন দুঃখী গলায় বলল, পেট ভরে ভাত খাব। বাবা দেখতে পাবেন না। খুব খারাপ লাগছে।

সাঁকোটার নিচে নেমে আমি বললাম, দুদিন পরে হলে কি হত। বাবাও থাকতেন। সবাই মিলে খেতাম। পিলু কিছু বলল না। সে ঝাঁকা মাথায় হাঁটছে। ডাল, আলু, মসলাপাতি, আনাজের মধ্যে বড় বড় বেগুন, যেমন দেশবাড়িতে আমাদের হাসিমের মাথায় বাবা হাট ফেরত সওদা করে ফিরতেন, মাছের থলে হাতে আমরাও প্রায় সে-ভাবে ফিরছি। গাছে গাছে রোদ, মানুষজন রাস্তায়, গরুর গাড়ি পাট বোঝাই, ছোট গঞ্জ মতো জায়গা পার হয়ে সোজা মিলের পথ ধরে হাঁটছি। আমাদের বাড়ি ফেরার আর একটা রাস্তা আছে পিলুর সঙ্গে ফেরার সময় টের পেলাম।

পিলু একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, এদিকে গেলে বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। মাকে নিয়ে একবার আসব। ওদিকে গেলে রাজবাড়ি। তোকে নিয়ে একদিন যাব। সারা রাস্তায় পিলু সব চিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় শহরটার দক্ষিণের রাস্তায় গেছি, ফেরার সময় উত্তরের রাস্তায়। আর সবই দেখছি পিলুর নখদর্পণে। বড় হলে পিলুর গাড়ি ঘোড়া না হয়ে যাবে না। কত কম বয়সে সে কত বেশি অভিজ্ঞ।

আমার হাতে চালের ব্যাগ। এবং যেহেতু বাবা বাড়ি নেই, এ-দিয়ে আমাদের কতদিন যে চালিয়ে নিতে হবে। চাল সামান্য, কিছু বন আলুর কুচি, একেবারে মা নিপুণভাবে কেটে নেয়। আলুর কুচি-সেদ্ধ সরু চালের ভাতের মতো মনে হয়—এ-ভাবে ভাত আর আলু কুচি ভাতের মতো আমাদের পাতে— কোনোরকমে জীবনধারণ করা, পেট ভরা নিয়ে কথা—যে কোনো ভাবে, যে কোনো উপায়ে। আজ ভাতে আলুর কুচি থাকবে না, সত্যিকারের ভাত মাছ খাব ভাবতেই মনটা পুলকে ভরে গেল।

পিলু বোধহয় সেই আনন্দেই জোরে হাঁটছে। কতক্ষণে মাকে তার এই সওদা নিয়ে দেখাবে! মা হেসে ফেললেই পিলু দুটো লাফ দেবে—আরে ব্বাস, মাগো মা, একদিন তোমায় আমি কালীবাড়ি নিয়ে যাব। ওখানে মানত করলে সব হয়। আমাদের সব হবে না মা! আমরা বেশিদিন আর গরীব

থাকব না।

শেষ হেমন্তের রোদ উঠতেও সময় লাগে না। চলে যেতেও সময় লাগে না। দুপুর হয়ে গেল ফিরতে। মা, মায়া রাস্তায় ছুটে এসেছে। যেন মা আমরা কতক্ষণে ফিরব, সেই আশায় পথ চেয়ে বসেছিল। মাছ দেখে বলল, খুব তাজা মাছ। আনাজপাতি মা কত যত্নের সঙ্গে ঘরে তুলে নিলেন! রাতে আজ পেট ভরে আহার, সত্যিকারের মাছ ভাত। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় সুখ, বড় আরাম আর কি আছে।

রাতে বাড়িতে ভোজ। চাপিলা মাছের ঝোল সঙ্গে ধনেপাতা। ভাবা যায় না। যেন বাড়িটাতে রাতে উৎসব হবে কিছু। মা পুকুর থেকে চানটান করে এল। পিলু কাঠ সংগ্রহ করছে। রাতে মা'র রান্না করতে যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। মায়া খুব বিনয়ী হয়ে গেছে। যত কাজ কাম, যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, সব এক হাতে করে ফেলছে। বাসন-কোসন ধুয়ে রাখছে। মসলা বেটে দেবে মাকে বায়না ধরলে মা বলল, পারবে না। ওটা আমি করে নেব। কেউ রাগ করছে না আজ। বচসা করছে না। পুনুকে মায়া আজ আর কোল থেকে নামাচ্ছেই না। গাছ, পাতা, পাখি, কীট-পতঙ্গ যেখানে যা আছে পুনুকে সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। রাতে মাছ ভাত, বেগুন ভাজা, ভাজা মুগের ডাল। মাকে পিলু গাছ থেকে একটা ছোট কচি লাউ পর্যন্ত কেটে দিল। সব দেখে বোঝা যায় দিন দিন যথার্থই বনভূমিটা মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাড়িটাতে সবাই আমরা উৎসাহী মানুষের মতো যেখানে যা কিছু কাজ সেরে ফেলছি। পিলু একটা কোদাল নিয়ে বের হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে আগে সে ফিরে এল। বনের মধ্যে সারা বিকেল সে কি করেছে আমি জানি। সে বড় একটা আলুর লতা ঠিক আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটা অতিকায় বনআলু কাল পরশুর মধ্যে বাড়িতে চলে আসবে বোঝা গেল।

পিলু ফিরে এলে মা বলল, কিরে পেলি?

পিলু বারান্দায় কোদাল রেখে ঠিক বাবার মতো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। চোখ মুখ উত্তেজনায় খুব অধীর। সে শুধু বলল, কত বড় মা। সে দু হাত ছড়িয়ে দেখাল।

মা'র বিশ্বাস হল না। পিলু বলল, দু হাত মাটি তুলেও ওর শেষ নাগাল পেলাম না মা। অর্থাৎ প্রায় মণখানেক ওজন না হয়ে যাবে না। চারপাশে মাটির অভ্যন্তরে আলুর শাখা-প্রশাখা ঢুকে গেছে। সে সবটাই তুলে আনবে বলে, খুব বড় মতো গর্ত করে রেখে এসেছে। কাল বাকি যা আছে গর্ত করে ফেললেই সেই প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের মতো, কিংবা তার চেয়েও বড় একটা বনআলু। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত বনআলুটা গোলায় মজুত শস্যের মতো কিছুদিন পিলুকে অহংকারী করে রাখবে।

সূর্য অস্ত যাবার মুখে, মা আমাদের সবাইকে হাত পা ধুয়ে আসতে বলল কালীর পুকুর থেকে। লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে বসতে বলল। দল বেঁধে আমি পিলু মায়া ঘড়া নিয়ে গেলাম সেই মাঠ এবং জঙ্গল পার হয়ে কালীর পুকুরে। হাত মুখ ধোওয়া, সঙ্গে রান্নার জল। পিলু ব্যারাকের টিউকল থেকে খবার জল নিয়ে এল। ফিরে আসার সময় দেখতে পেলাম, দূরে বনের গভীরে বাড়িটাতে পিদিম জ্বলছে। তুলসী গাছের নীচে মা রোজ এই পিদিম দিচ্ছে কদিন থেকে। প্রণিপাত করছে ধরণীকে। জীবন ধারণের সব উপায় মানুষের যেমন থাকা দরকার, তেমনি শুভাশুভর জন্য ঈশ্বর বড় প্রয়োজনীয় জীব। মা তাঁর সব প্রার্থনা এই সময় সেরে নেয়। বনের গভীরে অন্ধকার। মা বারান্দায় লম্ফ জ্বালিয়ে রেখেছে। এখন আর শুধু বাড়িটা নয়, তার চারপাশে যা কিছু আছে, এমনকি আকাশ নক্ষত্র এবং বনভূমি সবটা মিলে আমাদের আবাস। আকাশ থেকে কেউ যদি ছোট্ট একটা নক্ষত্রও তুলে নেয়, টের পাব যেন আমাদের কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।

রান্নাঘরে মা রান্না করছে এক হাতে। পুনু আমাদের পাশে বসে ঢুলছিল ঘুমে। পিলু পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ফেলল। স্লেট এগিয়ে দিয়ে সে পর পর তিনটে মিশ্র যোগ অঙ্ক করে, হাতের লেখা লিখতে বসে গেল। আমি ডেফোডিলস কবিতাটা মুখস্থ করতে থাকলাম, টেন থাউজেণ্ড আই স এট্ এ গ্ল্যান্স...... তারপর পড়লাম—হোম দি ব্রট ওয়ারিয়র ডেড। এবং এই কবিতা পড়তে পড়তে কখন জন কিটসের টু অটাম পড়ছি খেয়ালই নেই—জোরে জোরে, যেন এই আবাস এবং বনভূমি পার হয়ে আমার কণ্ঠস্বর দূরে কোনো এক অলৌকিক ভুবনে ছড়িয়ে পড়ছে। অ্যাণ্ড গেদারিং সোয়ালোজ

টুইটার ইন দি স্কাইজ। আমার মা তখন ভাজা মুগের ডালে সম্বার দিচ্ছে। আশ্চর্য সুঘ্রাণ চারপাশে—আমরা কত সহজে কত বেশি মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে গেলাম।

মায়া পড়ছিল, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলছিল মায়া। পিলু বলল, এই মায়া, ঘুমোচ্ছিস কেন রে?

মায়া বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে দাদা।

পিলু খুব গম্ভীর গলায় বলল, চোখে জল দিয়ে আয়। ঘুমিয়ে পড়লে খেতে পাবে না। আমরা সব খেয়ে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে মায়া দৌড়ে উঠে গেল। ফিরে এসে পড়ল ফের—আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে...। সে কিছুতেই আর ঘুমোবে না ঠিক করেছে।

ক্রমে অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল। মাথার ওপরে আকাশ, কিছু নক্ষত্র! বনভূমিতে পাতা পড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। কত সব কীট-পতঙ্গের আওয়াজ এবং দূরে শেয়ালের হাঁক। বাবা বাড়ি না থাকলে, বড় ভয় লাগে। যেন বনটা ধীর পায়ে খুব কাছে এগিয়ে আসে। সহজেই আমাদের বাড়িটাকে গ্রাস করে নেয়। চারপাশে গাছপালা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে পড়ে না।

ভোজ হবে বলে, পিলু কলাপাতা কেটে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কখন মা বলবে, তোমরা খেতে এস। পিলু পড়া ফেলে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখছে—আর কত দেরি। এত বেশি সময় ধরে তার পক্ষে মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে থাকা কঠিন। মা কেবল বলছিল আর একটু পড় বাবা। এইতো হয়ে গেল বলে। সে ফের এসে কিম্ভূতকিমাকার গলায় তীব্র আওয়াজে চেঁচিয়ে ফের পড়া শুরু করে দিল। আমি বললাম, এই পিলু, এত জোরে পড়ছিস কেন রে। সে কর্ণপাতই করছে না। মাকে বললাম, দ্যাখো মা, পিলু ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। পড়তে দিচ্ছে না।

মা বুঝি বুঝতে পেরেছিল, পিলু আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। রাগে দুঃখে সে এখন পড়ার নামে চেঁচাচ্ছে! হেসে বলল, আসন পেতে তোরা বোস। দিচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলু বইটা মাথার ওপরে ছুড়ে ফের কপ করে ধরে বলল, ওঠ ওঠ। বলে প্রায় টান মেরে মাদুর-ফাদুর তুলে আসন পেতে ফেলল। গ্লাসে গ্লাসে জল। কলাপাতা ধুয়ে নুন রাখল পাশে। মা আমাদের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। পিলুকে যত দিচ্ছে তত খেয়ে নিচ্ছে। আমার পাতেও ভাত পড়ে থাকছে না। এবং পিলুর খেতে খেতে সহসা মনে পড়ে গেল, সে সবই খেয়ে ফেলছে না তো! সে বলল, মা, তোমার জন্য কিন্তু রেখ।

—আছে। তোরা খা।

—কৈ দেখি!

মা হাঁড়িটা তুলে এনে দেখাল।

—দি আর দুটো।

—তোমার তবে থাকবে কি!

—হয়ে যাবে। নে না।

আমি বললাম, পিলু তোর পেট ভরেনি?

সে তাকিয়ে থাকল। গলা অবধি খেয়ে এখন বোধহয় কানে-টানেও কম শুনছে।

—তুই উঠে দাঁড়া তো দেখি!

পিলু উঠে দাঁড়াল।

—জামাটা তোল। পেটটা দেখি।

সে চাদর সামলে কোনোরকমে জামাটা তুলে পেটটা ভাসিয়ে দিল।

—পিলু করেছিস কি! তোর পেট ফাটল বলে।

পিলু আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। তবু সে দোনোমোনো গলায় বলল, যাঃ!

—নুয়ে দেখ, পেটটা কি হয়েছে তোর!

সে নুতে গিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকল। বলল, দাদারে, নুতে পারছি না। মাকে বললাম, আর তুমি দিও না। দেখেছ পেটের রগগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠেছে! মা এবার লম্ফ তুলে পিলুর পেটের কাছে উঁকি দিয়ে সত্যি দেখল। বলল, কই। তুই যে কি না! ও আরো দুটো খেতে পারবে। বলে

মা পিলুর পেটে দুটো টোকা মারল।

—ঠিক আছে, থাক। পেট ফেটে গেলে আমি কিছু জানি না।

পিলু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, না মা, আর লাগবে না। সে ফট করে প্যান্টের গিঁট খুলে কিছুটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হাত চাটতে বসে গেল।

মায়ার খাওয়া হয়ে গেছে। আমারও। মায়া শেষ পর্যন্ত মাছটা আস্তই রেখে দিয়েছে পাতে। সবার খাওয়া হলে, সে তারিয়ে তারিয়ে মাছটা খাবে। এটা মায়ার চিরদিনের অভ্যাস। ভাল সুস্বাদু খাবার দিলেই সে হাতে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে খাবে, চাটবে। আমাদের শেষ না হলে সে শেষ করবে না।

তখনই মনে হল রাস্তায় অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এগিয়ে আসছে মতো। বাবা বাড়ি না থাকলে, সাঁঝ লাগলেই আমাদের গা ছমছম করতে থাকে। যত রাত হয় তত ভয়টা বাড়ে। গভীর রাতে কখনও ঘুম ভেঙে গেলে গুটিসুটি শুয়ে থাকি পিলুকে জড়িয়ে। রাতে একা আমরা ঘর থেকে কেউ বের হতে সাহস পাই না। মা পাশে না থাকলে ভীষণ ভয় করে—তখন এমন একটা ছায়া-ছায়া মানুষের অবয়ব অন্ধকারে এগিয়ে আসতেই কেমন আমরা সবাই গুটিয়ে গেলাম। ছায়াটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠতাম সবাই—তখনই লম্ফের আলোতে দেখলাম—সেই হাবিলদার লোকটা। লম্বা জুলফি, গোঁফ ঝুলে পড়েছে। দশাসই একটা দৈত্যের মতো। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছে, ঠাকুরমশাই আছে?

মা আমার কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পিলু বলে দে, তিনি বাড়ি নেই?

—কোথা গেছেন?

অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলছিল। লম্বা মোটা গোঁফ, নাক থ্যাবড়া অতিকায় এক পাষণ্ডের মতো চেহারা। হাবিলদার লোকটা ব্যারাকে থাকে। এত রাতে বাবার সঙ্গে এমন কি কাজ বোঝা গেল না।

—কখন আসবে?

মা আবার ভেতর থেকে বলল, পিলু বলে দে, কবে ফিরবেন কিছু বলে যাননি। পিলু হঠাৎ মুখিয়ে উঠোনে নেমে বলল, কেন, কি দরকার?

পিলুর সাহসে আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ বারান্দা থেকে কিছুতেই উঠোনে নামতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। পিলুর পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাবা ফিরলে কিছু বলতে হবে?

—না কিছু বলতে হবে না। শেষে বলল, তোমার পিতাঠাকুর কেমন লোক আছে!

পিলু বলল, ভাল লোক আছে।

লোকটার এত কি দায় বোঝা গেল না। পিতাঠাকুর ভাল কি মন্দ আছে আমরা বুঝব। আর লোকটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পিতাঠাকুর বাড়ি নেই, আর কি কাজ কার সঙ্গে লোকটার থাকতে পারে। মা ভেতর থেকে কিছুতেই বের হচ্ছে না। এত ভয় মার আমি কখনো দেখিনি। এমন এক বন-জঙ্গলে কেউ খোঁজখবর নিতে এলে ভাল লাগারই কথা।

পিলু বলল, বাবা কাজে বেথুয়াডহরি গেছেন।

মা খুব সন্তর্পণে বলল, বলে দে, তোর বাবা এলে যেন আসেন।

লোকটা তখন খুব আপনজনের মতো বলল, ইতো ঠিক নেহি আছে। ইসান বন-জঙ্গলে রাখকে চলা গিয়া!

বাবার নামে কেউ খারাপ কিছু বললে, পিলুর মাথা গরম হয়ে যায়। সে কেমন চোয়াড়ে গলায় বলল, কাজ থাকলে যাবেন না! বাবা এলে কিছু বলতে হবে?

—কুছ বুলতে হবে না। একবার কি ভি মোনে হল, যাই ঠাকুরমশাইর সাথ দেখা করি।

লোকটা যেন কি খুঁজছে। কথা বলছে আর ধূর্ত চোখে ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। চারপাশের এই নির্জনতা, গভীর অন্ধকার আর জোনাকি জ্বলছিল বলে লোকটার মতলব খুব ভাল ঠেকছে না। মা ঘরেই বসে আছে। মায়া এঁটো বাসনকোসন খুব দ্রুত ঘরে তুলে রাখছে।

এই লোকটা আরও দুবার আমাদের বাড়ি এসেছিল। বাবা বাড়ি না থাকলেই চলে আসে। কি

করে যে টের পায়, বাবা বাড়ি নেই। অন্য দুবার দিনের বেলায় এসেছিল বলে, আমাদের তত ভয় ছিল না। মাও সহজভাবে দুটো একটা কথা বলেছে। কিন্তু আজ মাও কেমন দুর্ব্যবহার করছে লোকটার সঙ্গে। বলছে, পিলু বলে দে, তোর বাবা এলে খবর দিবি।

—বাবা এলে জানাব। তখন আসবেন।

তবু লোকটার যাবার নাম নেই। কিছু করলে শত চিৎকারে কেউ কিছু টের পাবে না। অনায়াসে আমাদের সুন্দর ঘরবাড়ি লোকটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এই প্রথম একজন মানুষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভীষণ এবং ভয়াবহ টের পেলাম। লোকটা অথচ এমন কিছু করছে না, বরং লোকটার যেন দরদের শেষ নেই—তবু মার ভয়ার্ত মুখ দেখে আমরা ভারি কাবু হয়ে যাচ্ছি। এমনিতে মা ভীষণ সাহসী। কোনো ভূত-প্রেত, সাপখোপে মা এতটুকু ভয় পায় না। এ-সময়ে আমরা কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

মা তখন কেমন শক্ত গলায় ঘর থেকে বলল, আপনি যান। উনি বাড়ি নেই। এলে বলব, আপনি এসেছিলেন।

লোকটা তারপর আর দাঁড়াল না। চলে গেল। কেমন রাহুগ্রাস থেকে সমস্ত পরিবারটা যেন রক্ষা পেয়েছে। বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে মা আমাদের সবাইকে ঘরে ঢুকে যেতে বলল। পিলু গেল না। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় লোকটাকে দেখল। বনজঙ্গলে কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, কিছু শেয়ালের হাঁক এবং ক্রমে দূরাগত কোনো নিথর শব্দ বনভূমির অভ্যন্তরে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে যেন। রাতে আর মা বের হতে সাহস পেল না। কেবল বাবাকে গালমন্দ করতে থাকল। রাতে মা আর খেলও না। পিলু সকাল হলে কিছু একটা প্রতিবিধানের জন্য কোথায় যে না বলে না কয়ে বের হয়ে গেল!

সকালে উঠেই দেখি মা'র মুখ ভার। বাবার ওপর অভিমানে মা কারো সঙ্গে একটা কথা বলছে না। পিলু কোথায় গেল, দুপুর হয়ে গেল, এখনও ফিরে আসছে না—অন্য সময়ে মা স্থির থাকতে পারতো না। অথচ আজ সব জ্বলে পুড়ে যাক, কি হবে ঘরবাড়ি দিয়ে—যেমন বাবা, তার ছেলে আর ভাল হবে কোত্থেকে, একটা চিঠি দিয়েও তো জানাতে পারে, তা না। যেন আমরা সব ভেসে এসেছি। এ-সব থেকেই বোঝা গেল মা'র মন-মেজাজ খুব খারাপ। আর মন-মেজাজ খারাপ হলেই আমাদের কপালে দুর্ভোগ বাড়ে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। কার পিঠে কখন কি পড়বে কিছুই বলা যাচ্ছে না। মা'র কাছেপিঠে থাকা আজ আর খুব নিরাপদ নয়।

তখনই রাস্তায় একটা লোক সাইকেল থেকে নেমে ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাচ্ছে। ডাকছে আমাকে—এই ছেলে, এটা অমুকের বাড়ি? আমি দৌড়ে চলে গেলাম। পোস্টাফিসের লোক। গায়ের জামা প্যান্ট সাইকেলে থলে দেখেই বুঝে ফেলেছি। লোকটাকে বললাম, হ্যাঁ।

—সুপ্রভা দেবী বলে কেউ আছেন? মনি অর্ডার আছে।

মাকে দৌড়ে গিয়ে বললাম, মা তোমার নামে মনি অর্ডার এসেছে। মা তো খুব হতবাক হয়ে গেল। বলল, সত্যি!

লোকটা তখন সাইকেলটা গাছে হেলান দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। মায়া তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল একটা। লোকটা বসেই বলল, এক গ্লাস জল দিন আগে খাই। এখানে বাড়িঘর হয়েছে কি করে জানব বলুন। তিনি-চার দিন ব্যারাকে ঘুরে গেছি, ও-নামে কোথায় এখানে কে আছে কেউ বলতে পারে না। ভাগ্যিস একটা চিঠি এসেছে আজ। এবং চিঠিটার ওপর ঠিকানা লেখা, পরম কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী, গ্রাম নিমতলা। তারপর লিখেছেন, পুলিস ব্যারাকের অদূরে দক্ষিণমুখী বাড়ি। পোঃ কাশিমবাজার। চিঠিটা না এলে আপনাদের মনিঅর্ডার ফিরে যেত।

মা একটা কথাও বলছে না। সামনে একটা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় সুখ কপালে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনি অর্ডারে টাকা আসবে, মা স্বপ্নেও ভাবেনি। চিঠি আসবে সেটাও যেন বিশ্বাস করা যায় না। মাসাধিক হয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে গেছেন বাবা—টাকাই বা পাবেন কোথায়!

পিয়ন দেখিয়ে দিল, এখানে টিপ দিন। মা হয়ত টিপই দিত, কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিলাম, এখানে তুমি মা সই কর। মার হস্তাক্ষর ভারি সুন্দর। এবং মা যখন সই করল, পিয়নটাও হতবাক হয়ে গেল। কেমন নিজের মানুষের মত বলল, দেশ ভাগে কত মানুষের যে কপাল পুড়েছে।

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বললাম, চিঠিটা দিন।

—দিচ্ছি দিচ্ছি। আগে টাকা ক'টা গুনে নাও। তুমি এখানটায় আর একটা সই করে দাও। দেখ চল্লিশ টাকা আছে। সবই এক টাকার নোট। গুনে বললাম, ঠিক আছে। তারপর সেই লোকটা দেবদূতের মতো একটা নীল খাম বের করে দিল। কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী। মা'র চিঠি। তাকিয়ে দেখলাম, মা'র চোখ জলে ভরে গেছে। মা টাকা ক'টার দিকে ফিরেও তাকাল না। চিঠিটা নিয়ে কোথায় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

পিলু ফিরে এল, বেশ বেলা করে। কদিন থেকে শীত পড়েছে খুব। সকালে অন্য সব দিনে খড়কুটো সংগ্রহ করে পিলু আগুন দেয়। আমরা তখন আগুনের পাশে গোল হয়ে বসি। রোদ না উঠলে, শীত না কমলে কেউ নড়ি না। মা কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে হাত সেঁকে নেয়। ঠাণ্ডা জলে মা'র হাত তখন সাদা দেখায়। মনে হয় কেমন রক্তশূন্য হাত। সকালবেলায় এত কি কাজ, একটু বেলা হলে সহজেই কাজ করা যায়—কিন্তু রোদ না উঠতে সব বাসি থালাবাসন ধুয়ে রাখা, গোবরছড়া, ঘরের দাওয়া লেপে দেওয়া মা'র বড় জরুরী কাজ। মানুষের ঘরবাড়ি হলে যে যে স্বভাব—মা'রও তাই। পিলু সকালেই বের হয়ে গেছিল বলে আগুন জ্বালানো হয়নি। অন্য দিনের মতো আগুনের উত্তাপে আর আজ আমাদের ঘুম ভাঙেনি। যখন ভাঙল, তখন দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাছের মাথায় শীতের রোদ চিকচিক করছে। তারপর কত সুখবর সংসারে—ডাকপিয়ন এসেছিল—বাবার চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। পিলু তখন জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিলু কিছুই জানে না। সেই পিলু শীতের চাদর গায়ে যখন ফিরল তখন মনে হল বগলের নিচে কিছু একটা কুঁই কুঁই করছে। কি কোথা থেকে ধরে এনেছে কে জানে।

বললাম, জানিস পিলু, ডাকপিয়ন এসেছিল। মা'র নামে মনিঅর্ডার, নীল খামে চিঠি।

সে কানেই তুলল না কথাটা। খুব সতর্ক চোখে রাস্তার দিকে কি দেখছে। আমি বললাম, তোর চাদরের নিচে কুঁই কুঁই করছে কে রে? সে খুব ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকে গেল। পিছু পিছু আমরা গেলে দেখলাম, একটা ককুরছানা সে বগলের নিচ থেকে বের করছে। আশ্চর্য কি নরম তুলোর বলের মতো একটা কুকুরছানা পিলু কোত্থেকে নিয়ে এসেছে।

ভয়ে বাচ্চাটা লেজ গুটিয়ে আছে। এক ফাঁকে পালাতেও চাইছিল কিন্তু পিলু খপ করে ফের ধরে ফেললে—ত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল তুলোর বলটা। মা এসে দেখে তাজ্জব। বলল, হ্যাঁরে তুই এটা আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি! দুধের বাচ্চা বাঁচবে কেন? সারাটা সকাল টোটো করে ঘুরে বেড়ালি। একটু পড়াশোনা করলি না। তোরা আর আমার হাড়মাস কত পুড়িয়ে খাবি।

কারো কোনো কটু কথায় পিলুর যেন এখন কিছুই আসে যায় না। সে খুব সন্তর্পণে চারপাশে কিছু খুঁজছে। আর যেন কান খাড়া করে রেখেছে। মায়া কুকুরের ছানাটাকে কোলে তুলে নিতে গেলে এক ধমক—রাখ বলছি। ঘাঁটবি না। সে বোধহয় কোথাও থেকে বাচ্চাটা চুরি করে এনেছে। সে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরের পেছনে চলে গেল। এবং রাস্তা থেকে দূরে আড়াল মতো জায়গায় লুকিয়ে রাখার সময় বলল, দড়িটড়ি আন তো।

আমি বললাম, ছেড়ে দে না। ওটুকু বাচ্চা কোথাও আর পালাতে পারবে না।

—ছেড়ে দিলেই চলে যাবে। ওর মা-টা ভীষণ পাজি। আমার পেছন পেছন এসেছিল। ঢিল ছুঁড়তেই কোথায় পালাল। ও মা, বাড়ির কাছে এসে দেখছি, আবার মা-টা পেছনে।

—কোত্থেকে আনলি?

—বাগদীপাড়া থেকে।

—ওর মা-টা কোথায়?

—ঠ্যাঙানি খেয়ে পালিয়েছে। তবু মা তো, আবার ঠিক চলে আসতে পারে।

মা তখনও কাজকাম করতে করতে চেঁচাচ্ছিল, পিলু বাচ্চাটা দিয়ে আয়। দুধের বাচ্চা, বাঁচবে

না। এটুকু বাচ্চা মা ছাড়া থাকবে কি করে। ঘরে দুধ নেই যে দুধ দেব।

আমারও ইচ্ছে ছিল না—ওটা আবার পিলু রেখে আসে। রাতে যে-ভাবে হাবিলদার লোকটা আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল, তাতে করে পিলুর এমন কাজকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

লোকটা ভয় দেখিয়ে চলে যাবার পর বোধহয় পিলু সারা রাত ভেবেছে কি করা যায়। রাতে বোধহয় ওর ভাল ঘুমও হয়নি। বাবা নেই, বাবা মাঝে মাঝে এভাবে থাকে না, বনের অন্ধকারটা তখন রাতে দাঁত বের করে হাসে। যে বনটা দিনের বেলায় পিলুর সঙ্গী রাতে সেটাই কেমন তার শত্রু হয়ে যায়। তারপর চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতো যদি আবার সেই বাটপাড় লোকটা রাতে চলে আসে তখন কি হবে? সে এত সব ভয়ের কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত একজন তার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে এনেছে।

সে ফিরে এসে ভেবেছিল, কুকুরের এমন সুন্দর বাচ্চাটা দেখে মাও খুব খুশী হবে। কিন্তু মাকে তেমন খুশী দেখাল না বলে সে বেশ মুষড়ে পড়েছে। বাচ্চাটার ভাল করে চোখ ফোটেনি। ঠিকমতো দেখতে পায় না। দুধ না পেলে বাঁচবে না। মা তখনও পাঁচালী পাঠ করে যাচ্ছে—দুধের বাচ্চাটা তুলে নিয়ে এলি, তোর মায়াদয়া কিছু নেই রে পিলু। মা এমন সব হরবখত বলে যাচ্ছিল।—দিয়ে আয়। এমনিতেই কি পাপে যে পড়েছি, দেশ ছাড়া, দু-মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—আর পাপ বাড়াস না বাবা। বড় হলে আনবি। যা লক্ষ্মী বাবা, দিয়ে আয়। পিলু এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য ভরসা খুঁজছে। অন্তত একজনও যদি তার এই দুঃসময়ে পিছনে না দাঁড়ায় তবে সে যায়টা কোথায়! মায়া ততক্ষণে কোলে নিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করতে বসে গেছে। পেটের কোথায় লুকিয়ে আছে বাচ্চাটা টেরও পাওয়া যাচ্ছে না।

মা রেগে গেলে ভারি মুশকিল আমাদের। সারাদিন পাঁচালী পাঠ চলবে। রাজা শ্রীবৎস থেকে আরম্ভ করে পুরাণের সব দুঃখী মানুষদের গল্প এক এক করে কপালে করাঘাত করার মতো শোনাবে আমাদের।

এ-সব সময়ে আমার মধ্যস্থতা খুব কাজ দেয়। তখন আমি পিলুর পক্ষেও না, মায়ের পক্ষেও না। একেবারে নিরপেক্ষ মানুষ। পিলুকেই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, তুই যে আনলি, ওর মা-টা কোথায় থাকে জানিস?

—ঐ যে তোর বড় শিশুগাছটা আছে না, একটা চালতা গাছ, আরে ঐ যে তোর বাগদিপাড়ার মুখে একটা ঝুপসি মতো ছিটকিলার জঙ্গল আছে—বুঝতে পারছিস না, খড়ের গাদা আছে একটা তার নিচে মা-টা থাকে।

বুঝতে পারলাম, বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। বাদশাহী সড়ক পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালে বিকেলে দুবার দুধ খাওয়ানো দরকার। এবারে মাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে।

মা বিছানা রোদে দিচ্ছিল। শুনতে পেল কি না কে জানে। বেশ চেঁচিয়ে বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে মা!

—তা কাছেপিঠেটা কোথায়?

—ঐ তো রাস্তাটা আছে না!

—রাস্তায় কখনও কুকুর বাচ্চা নিয়ে থাকে? তার বাড়িঘর থাকবে না।

বাড়িঘরের কথায় আসতেই বললাম, ব্যারাক বাড়িতে থাকে।

বাড়িঘরের কথা শুনে মা বেশ খুশীই হল। মা বলল, পুলিস ব্যারাকে থাকে বলছিস?

পিলু চোখ টিপে দিল। বললাম, হ্যাঁ।

কাছেপিঠে যখন থাকে মা-টা তখন আর ভাবনা নেই। মারও বেশ আগ্রহ বাড়ছে বাচ্চাটার জন্য। মা বলল, দু দিন বাদে আবার কেউ না নিয়ে যায়!

মা এবার পুনুকে কোলে নিয়ে বাচ্চাটার কাছে এসে বসল। পুনু দুহাতে বাচ্চাটাকে চটকাতে চাইছে। আমরাও তখন গোল হয়ে ফের একজন অতিথি, ঠিক অতিথি বলা চলে না, একেবারে আর একজন এই সংসারের ভেবে আনন্দে মেতে গেলাম। সংসারের আর পাঁচটা কাজের মতো এই বাচ্চাটাকে বড় করার দায়িত্বও আমাদের পড়ে গেল।

পিলু তখন বলল, মা, বাবা সত্যি চিঠি লিখেছেন?

মা বলল, হ্যাঁ লিখেছে। চিঠি লিখেছে, টাকা পাঠিয়েছে।

—কবে আসবেন বাবা?

—তা কিছু লেখেনি। এখন জলপাইগুড়িতে আছে। সেখান থেকে কোথায় আসামে অভয়াপুরী আছে সেখানে যাবে। দু-দশ ঘর শিষ্যের খোঁজ পেয়েছে। আরো পাবে বলেছে। ওদের প্রণামী টাকা সব একসঙ্গে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। বোঝা গেল বাবার ফিরতে আরও মাসাধিককাল।

মা ফের বলল, তোমাদের পড়াশোনা করতে বলেছে মন দিয়ে।

মায়া বলল, আমার কথা কিছু লেখেনি মা?

—সবার কথাই লিখেছে।

তাছাড়া মা'র কাছে আরও জানা গেল, বাবা শিলচর কাছাড় হয়ে ফিরবেন। দেশ থেকে হরমোহন জ্যাঠামশাইরা চলে এসেছেন। আসার সময় হরমোহন জ্যাঠামশায়ের কাছে বাড়ির বিগ্রহ রেখে এসেছিলেন বাবা। বিঘে দুই ভুঁই ঠাকুরের নামে রেখে এসেছিলেন। সব বিক্রি করে নগদে বাবা যা পেয়েছিলেন, সবটা আনতে পারলে, আমাদের এখানে পাঁচ-সাত বছর রাজার হালে চলে যেত। কিন্তু ঐ তো দোষ বাবার, বাই উঠলে রক্ষা নেই—দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার এক দণ্ড সবুর সইল না। জলের দরে তারক মাঝির কাছে সব বিক্রি। তাও তারক মাঝি বলল, কর্তা, এত টাকা নিয়ে তো যেতে পারবেন না, দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে নেবে। বরং বাকিটা আমি হুণ্ডি করে পাঠিয়ে দেব। সেই দেব বলে আর দিল না। চিঠি দিলে লিখত, সব ফিরিয়ে নিন কর্তা। আমার আগাম টাকা আর আপনাকে ফেরত দিতে হবে না।

বাবা খুব উত্তেজিত হলে বলতেন, তারক আমাকে এমনভাবে ডোবাবে ভাবিনি।

মা বলত, আসলে লোকটা বিষয়ী মানুষ। ধূর্ত। তুমি ওর কথা বিশ্বাস করলে—কত বললাম, নিয়ে নাও। রাস্তায় যা হবার হবে।

বাবা খুব চড়া গলায় বলতেন, মেয়েছেলের বুদ্ধি আর কাকে বলে! রাস্তায় কেড়ে নিলে একেবারেই যেত। তবু তো আশা আছে, তারকের সুমতি হলে টাকাটা পাঠিয়েও দিতে পারে।

—আর দিচ্ছে।

—বামুনের টাকা কেউ মারে!

বাবার এমন ধরনের কথা শুনে শুনে মা শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারত না। বলত, দ্যাখো তোমার কি হয়! নিজের ভালটা একটা কুকুর বেড়ালও বোঝে, তুমি তাও বোঝ না। লোকের কথায় কেবল নাচ।

—লোকের কথায় নাচব না, তোমার কথায় নাচব! বাবা তারপর ধৃতরাষ্ট্র থেকে দশরথের কৈকেয়ী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নারীবুদ্ধি সংসারে কত বিপত্তিকর সব উদাহরণসহ এক এক করে তুলে ধরতেন। আমরা ঐ সময়ে কার কত বেশি রামায়ণ মহাভারতে দৌড় টের পেতাম। বাবা শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলে মাকে মহারোষে চণ্ডীপাঠ আবৃত্তি করে শোনাতেন। মার হাজার কথার এক বর্ণও আর যেন কানে না ঢোকে। বলতেন :

যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

মা তখন আমার আরও রেগে যেত। চেঁচিয়ে বলত, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তোমার মতিভ্রংশ হয়েছে। তুমি আমাকে আর কত জ্বালাবে। হাড়মাস তো কিছু আর রাখনি। সব গেছে আমার।

বাবার চণ্ডীপাঠ তত দ্রুত বাড়ত। প্রায় পাল্লা দেবার মতো, কেউ কম যায় না, একদিকে বাবার উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ অন্য দিকে মায়ের সারাজীবনের জ্বালা, সারা বাড়িটায় তখন খোল-করতাল সহ হরিসংকীর্তনের মতো। আর আমরা তখন একেবারে স্বাধীন নাগরিক। খুশিমতো পেলে খাই, না পেলে খাই না, যা পাই তাই খাই। উদাহরণ দেবার মতো স্বাধীন নাগরিক অধিকার রক্ষা করে যাচ্ছি। যেখানে সেখানে চলে যেতে পারি।

এখন সে-সব খণ্ড-যুদ্ধের মলিন দিনগুলি আর ভাসে না চোখে। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় আমরা

মা বাবার খুবই অনুগত হয়ে উঠেছি। মা দেখছি সব কিছু, সময় মতো মনে করিয়ে দেয়। টাকাটা দিয়ে মোটামুটি আমাদের বেশ কিছু দিন খুব ভালভাবে চলে যাবে বলে, একটা হিসাবপত্রও হয়ে গেল। এক মণ চাল, সতের টাকা দশ আনা, মায়ার ফ্রক, তিন টাকা ছ আনা, পিলু এবং আমার প্যান্ট শার্ট সাত টাকা চোদ্দ আনা, বাকি টাকায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠবে—এত সব পরিকল্পনার পর মা মনে করিয়ে দিল, মনার দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, কৈ রে পিলু যা বাবা, দেখ ওর মা-টা কোথায় আছে, একটু দুধ খাইয়ে আন।

তখন হয়ত সকালের রোদ উঠে গেছে। আমরা দু ভাই সেই নেড়ি কুকুরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোলে তুলোর বলের মতো বাচ্চাটা চোখ বুজে ঘুমোচ্ছ। কোথাও নেড়ি কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। আস্তানায় নেই। মাঠঘাট এবং গাছপালার অভ্যন্তরে কুকুরের আভাস পেলেই ছুটছি। আস্তানায় অন্য বাচ্চাগুলি সারারাত দুধ খেয়ে অঘোরে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। মনা রাতে দুধ খায়নি। ভোর রাতে কেঁদেছে। খিদেয় মাঝে মাঝে কোলের মধ্যে কোঁ কোঁ করেছে। সারারাত মনা থাকে পিলুর লেপের নিচে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে পিলু বনবাদাড়ে গেলে বাচ্চাটাও যায়। পিলু ঘাটে গেলে বাচ্চাটাও হেলতে দুলতে চলতে থাকে। পড়তে বসলে দু পা সামনে রেখে হিজ মাস্টারর্স ভয়েস হয়ে যায়। কান খাড়া রেখে আমাদের পড়াশোনা মন দিয়ে শোনে। আমরা তখন আরও মনোযোগী ছাত্র হয়ে যাই বাচ্চাটার জন্য। মা বাটিতে করে সবার জন্য ভাগে ভাগে তেল পেঁয়াজ মাখা মুড়ি রেখে যায়। পুনু বারান্দায় উঠোনে হেঁটে বেড়ায় তখন। কখনও হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়। আমরা মুড়ি খাই, পড়ি। মনা মুড়ি খায়, পড়া শোনে। পুনু মা মা করে তখন ফ্যাক করে কাঁদে। আর তখনই মায়ার পড়া থেকে ছুটি—সে পড়ার চেয়ে ভাইকে আদর করা, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সংসারে বেশি দরকারী কাজ মনে করে থাকে। মা'রও বোধহয় এতে সুবিধা হয়। মায়া পড়ছে না বলে তার বাড়ির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। পিলু এতটা সহ্য করতে পারে না। সেও পড়া ফেলে তখন উঠে পড়ে এবং কুকুরের বাচ্চাটার সঙ্গে তু-তু খেলা শুরু করে দেয়। পড়া ছেড়ে ওঠার আমার কোনো অছিলাই থাকে না। মনটা ঘরবাড়ির উপর বেজায় ক্ষেপে যায়।

মাস শেষ হতে না হতেই বাচ্চাটা সেয়ানা হয়ে গেল। অচেনা ঘ্রাণে চিৎকার করে উঠতে শিখে গেল এক সময়। গাছ থেকে পাতা পড়লে দৌড়ে যায়, কোনো শব্দ পেলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। রাস্তায় লোকজন দেখলে তাড়া করে যায় মানুষকে।

বনভূমির অভ্যন্তরে আমাদের বাড়িটার প্রায় রক্ষাকারী বাচ্চাটা। বাচ্চাটারও নিজস্ব একটা নাম হয়ে যাওয়ায় পিলু, পুনুর মতো সে সংসারে বেশ একজন হয়ে গলে।—মনা কোথায়, মনাকে খেতে দে। তোরা স্নান করতে যাচ্ছিস, মনাকে নিয়ে যা। গায়ে খুব ময়লা পড়েছে।

আমার মা সবার সঙ্গে মনার ভাল মন্দ নিয়ে ভাবে। যা শেয়ালের উপদ্রব, কিছুতেই রাতে বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। সে ঘরেই থাকে রাতে। আর যখন তখন এলোপাথাড়ি চিৎকার। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে পিলু বিছানা থেকে নেমে কান মুচড়ে দিয়ে বলে, হয়েছে। খুব হয়েছে। এখন ঘুমোতে দে।

আসলে বোধহয় কুকুরটার রাতে লেপের তলায় থাকা অভ্যাস ছিল বলে নিচে একা থাকতে কিছুতেই রাজি না। ক্ষোভে দুঃখে বোধহয় সারারাত ঘেউ ঘেউ করত। তারপর একা থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে আর কুঁই কুঁই করত না। সত্যিকারের ঘ্রাণ টানে সে যখন ভাল মন্দ বুঝতে শিখে গেল, তখনই এই ঘরবাড়ির আসল চোরের ঘ্রাণ পেয়ে একদিন গভীর রাতে ত্রাহি চিৎকার। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় সত্যি খুট খুট শব্দ করছে কে। মাও উঠে পড়েছে। লম্ফ জ্বেলে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কুকুরটা একেবারে লাফিয়ে, সত্যি বাঘা কুকুর, বাঁচলে হয়—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে দিতে চাইছে খলপার দরজা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে, কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। তখন মা আমার না পেরে অত্যন্ত সরল গলায় বলছে, থাম বাপু, খুব হয়েছে। আলো হাতে মা দরজা খুলে দিলে দেখলাম, বাবা আমার ফিরে এসেছেন। হাতে কাঁধে কত সব ছোট বড় মাঝারি পোঁটলা-পুঁটলি। আর তখনই বুঝি পিলুর মনে হল, কুকুরের স্বভাব কামড়ানো। যেভাবে বাবার দিকে একবার এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, কখন না কামড়ে দেয়। সে প্রায় সার্কাসের রিং মাস্টারের মতো কুকুরটাকে গম্ভীর গলায় বলল, এদিকে এস। আমার বাবা। বেয়াদবি করবে না।

কে কার কথা শুনছে! কুকুরের বাচ্চাটা পিলুকে আমলই দিচ্ছে না। বাবাও খুব বিব্রত বোধ করছেন। গলায় আবার একটা গামছা বাঁধা বাবার। গামছার মধ্যে ভারি কিছু পাথরটাথর ঝুলছে গলায়। একটা বড় সাইজের মাদুলির মতো লাগছিল পুঁটলিটাকে। এক গাল দাড়ি। বাবাকে ঠিক চেনাই যাচ্ছে না। পিলুর মতো কুকুরের বাচ্চাটাকে সাহসের সঙ্গে বলতে পারছিলাম না—হ্যাঁরে আমাদের বাবা। সত্যিকারের বাবা। একা পিলু বললে কুকুরের বাচ্চাটা বিশ্বাস করবে কেন।

পিলু ফের গম্ভীর গলায় বলল, মনা ভাল হচ্ছে না। বাবা কত দূরদেশ থেকে এসেছেন। বাবাকে বসতে দাও।

বাবাও কুকুরটাকে দেখে ভারি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন। এক পা এগোচ্ছেন না, পিছোচ্ছেনও না। কি বলবেন যেন ঠিক করতে পারছেন না। আর গলায় যা আছে সেটাও একটা যেন বাবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন আমি বললাম, এই মনা, আমার বাবা, সত্যিকারের চোর-ছ্যাঁচোড় না। থাম বলছি।

তবু যখন থামল না, পিলু বেজায় চটে গেল। রিং মাস্টারের মতো ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধাঁই করে ফুটবলের মতো সজোরে লাথি, বেশ উঁচুতে উঠে টপকে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে ঘরের কোণায় গিয়ে বসে পড়ল। বাবা বললেন, আহা মারছিস কেন, ওর কি দোষ। না বলে না কয়ে এসেছি, চোর-ছ্যাঁচোড় তো ভাববেই।

বাবার দিকে তাকিয়ে মা আর একটা কথাও বলতে পারছিল না। বাবার চেহারাটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেছে যেন। খুব বড় অসুখ-বিসুখ থেকে উঠলে যেমন দেখায়—লণ্ঠনের আলো তুলে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মা। তখন ক্ষীণ গলায় বাবা বললেন, একটা মাদুর পেতে দাও। বিছানায় বসব না। গলায় ব্রহ্মান্ড।

মা ঠিক বুঝতে না পেরে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল কথাটাতে। বলল, তোমার কিছু হয়েছে?

—আরে না না।

—বড় অসুখ-টসুখ? তারপরই বুঝি মনে হয় মা'র, বাবা আর দু দন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে বলল, বোস।

বাবা নিস্তেজ গলায় বললেন, জল দাও। তিন দিন থেকে জল খেয়ে আছি। আজও থাকতে হবে। নিরম্বু উপবাস করতে ভরসা পেলাম না। সবই তাঁর ইচ্ছে। এবং গলায় এত বড় পুঁটলিটা নিয়ে বাবার কতটুকু অস্বস্তি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমাদের কেমন হাঁসফাঁস লাগছিল। বললাম, বাবা ওটা খুলে ফেল। ওতে কি আছে?

বাবা বললেন, ওতে বিশ্বব্রহ্মান্ড আছে।

বাবার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে পিলু বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, কি বললে বাবা? বিশ্বব্রহ্মান্ড!

—হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মান্ড আছে। বলছি না বিশ্বব্রহ্মান্ড— বুঝলে ধনবৌ, আর রাত জেগে কি হবে, নিচে শুয়ে থাকছি। সকালে তোমাদের কাজের অন্ত থাকবে না। লোকজন ডাকতে হবে।

আমরা বাবার কথায় খুবই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। লোকজন ডাকতে হবে কেন! কিছু একটা তবে সকালে হচ্ছে। সেটা কি— কিন্তু বাবা একে নিস্তেজ তায় আবার গম্ভীর, গলায় গামছা ঝুলিয়ে তদুপরি বিশ্বব্রহ্মান্ড বয়ে বেড়াচ্ছেন—সুতরাং কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো আমাদের রা সরছিল না।

মা কেমন অসহায় বালিকার মতো কেঁদে ফেলল। বলল, কি হয়েছে বলবে তো? বাবার মুখে সুমধুর হাসি ফুটে উঠল। বললেন সব। কোথায় হরকুমার জ্যাঠারা বাড়ি করেছেন, কোথায় দাদুর শিষ্যরা কে কি ভাবে বেঁচে আছেন, কে কত টাকা দিয়েছে—সব। হরকুমার জ্যাঠার কাছ থেকে বাড়ির গৃহদেবতা চেয়ে নিয়ে এসেছেন। দুটো রাধাগোবিন্দের মাঝারি সাইজের পেতলের মূর্তি, শালগ্রামশিলা—এবং ওজনে সের দশেক হবে। তেনারা গলায় ঝুলছেন একটা ছোট মাপের ঢোলের মতো। তিন দিন তিনি অনাহারী, গলায় বিশ্বব্রহ্মান্ড ঝুলিয়ে আহার করেন কি করে। কালই দেবতাদের জন্য ঠাকুরঘর উঠবে। সকালে সবাইকে তুলে নিয়ে যাবেন নদীতে। গঙ্গাস্নান করবেন। ভিজে কাপড়ে ফিরে আসতে হবে সবাইকে। দুলে-বাগদিকে ডাকতে হবে। সে ছোট মতো ঠাকুর ঘর বানাবে, ১লা বৈশাখ ঠাকুরের অভিষেক। লোকজন খাবে, চন্ডীপাঠ হবে। দু-দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন। এতসব শুনে আমরা হাঁ হয়ে

গেছি। কুকুরের বাচ্চাটাও লেজ নাড়ছে। আনন্দ প্রকাশের কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। শুধু নিঝুম এক অন্ধকারে এই বাড়িঘর বড় বেশি সজাগ হয়ে উঠেছে। আর আমার মনে হল আজ থেকে আকাশের ছোট একটা নক্ষত্র সারাক্ষণ রাতে বাড়িটার মাথায় পাহারায় থাকবে। বাড়িটার ভেতর কোনো দুঃখ ঢুকতে দেবে না। বাবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা তালপাতার ঘরে, সত্যি ভাবা যায় না। জীবনে কত বড় সুখ কত সহজে বাবা আমাদের জন্য মাঝে মাঝে যে নিয়ে আসেন।

সকালে ঢাকের বাদ্যিতে বনভূমিটা জেগে গেল। ঠাকুরের নতুন ঘর উঠছে। ঠাকুর ঘরের জন্য শেষ পর্যন্ত দু বান টিন কিনে এনেছেন বাবা। এক বান টিন দিয়ে ঠাকুরের দোচালা ঘর, বাঁশের চাটাই-এর বেড়া। ছোট্ট একটা কাঠের সিংহাসনও রাজু মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গেছে।

বাবা ফেরার পর একটা দিন আমরা দিনের বেলায় দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বাবা কথাবার্তায় সাধু ভাষা প্রয়োগ করলে টের পেতাম, বসে থাকার সময় আর নেই। শুধু কাজ। কাজই মানুষকে বড় করে দেয়। সুতরাং লিস্টি মিলিয়ে সওদা এল শহর থেকে। জীবনে প্রথম বাবার সঙ্গে রিক্‌শয় চড়ে সওদা করে ফিরলাম। অবশ্য এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল—রিক্‌শয় ফিরব শুনে পিলু এবং মায়া বায়না ধরেছিল, তারাও যাবে। কিছুতেই যখন বাবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তখন কথা দিতে হল, একদিন বাবা ওদের দুজনকে নিয়ে রিক্‌শয় চড়বে। এবং যখন ফিরলাম, আমার সৌভাগ্যে পিলু ভীষণ হতাশ গলায় বলল, সে কোনো কিছুই বাড়ি অবদি বয়ে নেবে না। বড় রাস্তা থেকে বেশ দূরে বাড়িটা—বড় বড় ব্যাগ, চালের বস্তা। এবং আলু, পটল, ঝিঙে, আতপ চাল, মুগের ডাল, সব মিলে একটা বেশ বড় রকমের উৎসবই বাবা যখন করছেন, তখন পিলুর এই বাঁদরামো আমার কাছে ভীষণ অসহ্য ঠেকল। ইচ্ছে হল বলি তোর ঘাড় নেবে, কিন্তু পিলুকে জানি বলেই অমন রূঢ় গলায় কিছু বলতে সাহস হল না।

বাবা রিক্‌শ থেকে নেমেই বললেন, পিলু ধর বাবা। ব্যাগটা ধর, পিলু যখন ভাল করে চেয়ে দেখল, রিকশ ভর্তি— ছোট বড় ব্যাগ, হাঁড়ি পাতিল, চালের বস্তা, তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। ব্যাগ নিয়ে দৌড়ল। আমিও দুটো ব্যাগ নিয়ে ফিরলাম। মায়া খবর পেয়ে ছুটে এল বড় রাস্তায়। সে হাঁড়ি পাতিল যতটা পারল নিল। বাবা বাকিটা। চালের বস্তাটা রিক্‌শওয়ালা মাথায় নিয়ে যখন এল মা তখন গাছের নিচে বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

ক'দিন ধরে বাবা পড়াশোনার কথা একদম বলছেন না। কুলদেবতাকে নিয়ে এসেছেন, এবং কত বড় ভরসা এখন তাঁর এই বাড়িতেই আছে, ছেলেরা এখন ঠাকুরের কৃপাতেই সব পার হয়ে যাবে। বাবার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল, মাথায় তাঁর ঠাকুরের অভিষেক ভিন্ন অন্য কোনো ভাবনা নেই। ঠাকুরঘর, তেপায়া দুটো, তামার পাত্র, কোষাকুষি, পেতলের থালা দুখানা—গজ খানেক নতুন গরদ এবং লাল সিল্ক অর্থাৎ ঠাকুরের পোশাক-আশাক, তারপর শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসি, একটা জল-শঙ্খ দরকার।—বাবা সারাক্ষণ মার সঙ্গে পরামর্শ করছেন, আর কি লাগবে দ্যাখো। কিছু বাদ গেল না তো।

মা কি বলবে! একেবারে মুহ্যমান মা। মানুষটা ঈশ্বর ভরসা করে আছে, তাঁর ঈশ্বর দুটো পয়সার মুখ দেখিয়েছেন। তিনি দিচ্ছেন। এবং মার কাছে বাবা একসময় সবই খুলে বললে, মা বলল; শেষ পর্যন্ত দেবে তো।

—দেবে না কেন? ওরাই তো বলল, কর্তা, বাড়ির ঠাকুর, বাড়ি নিয়ে যান। আমরা তো আছি। ঈশ্বরের সেবায় কিছু দিলে পুণ্যটা আপনার হবে না। আমাদের হবে।

এবং বোঝা গেছিল আমার দাদুর বড় বড় শিষ্যদের বাবা ঠিক খুঁজে বের করেছেন। দেশের সব যজমান, কে কোথায় আছে খুঁজে খুঁজে বের করেছেন। কেউ বোধহয় বাদ যায়নি। তারাই বাবাকে ঠাকুরের নামে মাসোহারা পাঠাবে বলেছে। এবং সঙ্গে যে কিছু দিয়েও দিয়েছে খরচ-পত্তরের বহর দেখেই তা আমরা টের পাচ্ছিলাম। কে কে খাবে, তারও একটা লিষ্টি হয়ে গেছে। মানুকাকা আসবেন, ছেলেরা মেয়েরা আসবেন তাঁর। নিবারণ দাসের বাড়িতে সবাইকে বলা হয়েছে। শহর থেকে আসবেন দুজন পণ্ডিত। বাবা এ-সব ব্যাপারে মানুকাকার পরামর্শ ছাড়া চলেন না। এবং সকালে উঠে পিলু

চলে গেছে গোবর আর ষাঁড়ের চনা সংগ্রহ করতে। দুটো বড় গর্ত করা হচ্ছে উনুনের জন্য। মা ঘর, দরজা উঠোন লেপে বাড়িটাকে ঝকঝকে করে তুলেছে। পুনুও বুঝেছে বাড়িতে কিছু একটা হচ্ছে। এক্কা দোক্কা সে বেশ একা একাই খেলছিল। আর ঢাকের বাদ্যি বাজতেই মায়া পুনুকে কোলে নিয়ে ঢাকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর বেশ বাজাচ্ছিল লোকটা। ঘুরে ঘুরে আর নেচে নেচে বাজাচ্ছিল। কাঁসি বাজছিল ট্যাং ট্যাং করে। দুলে বাগদি খুব খাটছে। সে-ই প্রায় এক হাতে সামিয়ানা টাঙিয়েছে—সকালেই সব লোকজন চলে আসবে। তাদের বসার জায়গা চাই। এবং আমাদের পরিবারে এমন একটা দিন আসবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি। নিবারণ দাস এলে বাবা বলেছিলেন, দাসমশাইকে বসতে দে।

—তা হলে কর্তা সব ঠিকমতোই হয়ে যাচ্ছে।

বাবা নতুন ধুতি পরেছেন। দুলে তামাক সেজে দিচ্ছিল। কে বলবে, আমরা এখানে এসে একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে থেকেছি দিনের পর দিন। কি করে যে মানুষ তার বাড়িঘর ঠিক এক সময় বানিয়ে ফেলে। বাবার হয়ে আজ নিবারণ দাস সব দেখাশোনা করবে। কারণ বাবা তো সারাটা দিন ঠাকুরঘরেই থাকবেন। এবং নিবারণ দাস বেশ নিজের বাড়ির লোকের মতো বলল, কর্তা মা, উনুনে কটা কাঠ ফেলে দিই। আগুন ধরিয়ে দিই। কাকিমা এলে মা বঁটি দিয়ে বলল, বসে যা নেরু। পটলের ঝুড়ি এগিয়ে দিল মা। নিবারণ দাসের লোক গেছে বাজারে। সে পছন্দমতো মাছ কিনে আনবে বলেছে।

এক একজন আসছে আর আমি পিলু মায়া হৈ-চৈ করে খবর দিচ্ছি বাড়িতে। মা আরতিদিরা আসছে, মা সুজয়দারা আসছে। যাদের চিনি না, বাবাকে বলছি ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে—বাবা কে এসেছেন দ্যাখো। এবং বেশ বোঝা গেল বাবা এখানে আসার পর পরিচিত ব্যক্তি বলতে আর কাউকে বাদ রাখেননি। যেখানে যার সঙ্গে দু দন্ড কথা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, সুখ-দুঃখের দুটো কথা হয়েছে তারা সবাই আজ আমাদের উৎসবে আমন্ত্রিত।

দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা লোকজনে ভরে গেল। দুলে রাশি রাশি কলাপাতা কেটে রেখেছে। পিলু মায়া কলাপাতার মুখোস পরে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। কাকপক্ষিদেরও যেন জানতে বাকি নেই। সবাই টের পেয়ে গেছে আজ আমার বাবা তাঁর কুলদেবতার অভিষেক করছেন। সারা রাস্তায় রেলগাড়িতে ঠাকুর গলায় ঝুলেছে...বাছ-বিচার কিছু ছিল না, শোধন করে নিচ্ছেন সে-জন্য।

নিবারণ দাসের বড় মেয়ে আরতি এসে বলল, সাধন মামা আসছে। বড় ঝুড়িতে বিরাট একটা রুই মাছ। সবাই রাস্তায় ছুটে গেছি। মাছটা নামালে আমরা ঘিরে বসলাম। পিলু খুঁটে দুটো আঁশও তুলে ফেলল। সাধনদা নিবারণ দাসের শ্যালক। সে বড় বঁটি নিয়ে এল। মাছ কাটা দেখার জন্য আমাদের উৎসাহের শেষ ছিল না। বড় গামলা কেউ টেনে আনছে। কেউ ড্রামে জল ভর্তি করছে। রান্না হচ্ছে দুটো বড় উনুনে। মুগের ডাল, তিতের ডাল, বেগুন ভাজা, শাক হয়ে গেলে সব মা আর কাকিমা ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখছে। তখনই পিলু বলল, মা নবমীর জন্য দুটো ভাত নিয়ে যাব? সবাই খাবে, এই বনভূমির কাক পক্ষীরাও যখন বাদ যাচ্ছে না, তখন নবমী খাবে না সে হয় না। পিলু বোধহয় সেই ভেবে কথাটা বলেছে।

অন্যদিন হলে নিজেই দেওয়া যাবে কি যাবে না মা সাফ বলে দিতে পারত। সংসারে আমার মা'র ওপর আর কারো কোনো কথা নেই, কিন্তু মা কেন জানি আজ বড় বেশি বাবার অনুগত। বলল, তোর বাবাকে বলে দেখ, কি বলে।

পিলু ঠাকুরঘরের দরজায় এসে বলল, বাবা নবমী কতদিন কিছু খায় নি। দুটো ভাত দিয়ে আসব?

বাবা তখন গদগদ চিত্তে ঠাকুরের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য মানুষ। পিলুর মনে হল বাবা ইচ্ছে করেই তার কথা শুনছেন না। এবং এ-সব সময়ে পিলুর যা হয়, মেজাজ চড়ে যায়, সে হেঁকে ডাকল, বাবা!

বাবা ঘাড় ফিরিয়ে পিলুকে দেখল।

—নবমীকে দুটো খেতে দেব?

বাবা বললেন, নবমী!

—ইঁটের ভাটার ওদিকটায় একটা বুড়ি থাকে না!

—দাও। যখন ইচ্ছে হয়েছে দেবে বৈ কি। সংসারে সবাই খাবে নবমী খাবে না সে কি করে হয়!

আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ। ফল, বাতাসা, ধূপ দীপের গন্ধে বাড়িটা ভরে আছে। সকালে মা বাড়ির আঙিনায়, ঠাকুরঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকে দিয়েছিল। মানুষজনের হাঁটাহাটিতে সব মুছে যাচ্ছে। ঠাকুরঘরে পূজা-আর্চা চলছে সেই কখন থেকে, ঢাকের বাদ্য বাজছে সেই কখন থেকে। বাবা কাপড়ের খুঁট থেকে এটা ওটা আনার জন্য মাকে টাকা পয়সা বের করে দিচ্ছিলেন কখনো। সাধন এবং মানুকাকা এবং আর যারা যারা এসেছে সবাই প্রণিপাত হচ্ছে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। নিবারণ দাস কিছুক্ষণ ঠাকুরঘরের বাইরে থম মেরে বসেছিল। দেব-দেবীর মুখ দেখতে দেখতে কখনও মা মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠছিল। কেউ কেউ বাবার বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছে। আশ্রমের মতো মনে হচ্ছে, একটা আগাছা নেই, জমি উঁচু নিচু নেই—দুটো চারটা ফলের গাছ মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশে।

কুকুরটা আরও বড় হয়েছে। মানুষজন দেখে প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল, পরে বোধহয় বুঝতে পেরেছে—ওরা বাড়িরই লোক, কিছু আর বলছে না। লেজ নাড়ছে আর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে। মাঝে মাঝে পিলুর খবরদারি, ওদিকে যাবে না। এদিকে এস। ওখানে রান্না হচ্ছে। কথা না শুনলে বেঁধে রাখবে ভয় দেখাচ্ছে।

এত সবের মধ্যে সবই হয়ে যাচ্ছিল। সামিয়ানার নিচে শতরঞ্চ পাতা। বাবা সবাইকে ঠাকুরঘর থেকেই বসতে বলছেন। বিকেল হলেই খেতে বসবে সবাই। দূর দূর থেকে যারা এসেছে সন্ধ্যার মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে। দুটো প্যাট্রোম্যাক্স আনিয়ে রেখেছে নিবারণ দাস। বড় আপনজনের মতো সে কোনো কিছুর ত্রুটি রাখছে না।

এবং নিবারণ দাসই বলল, কর্তা, পূজো শেষ হতে আর কত দেরি?

বাবা বললেন, এর শেষ নেই দাসমশাই। যতদিন আছি ততদিন শুধু তাঁর সেবা করে যেতে হবে।

ধার্মিক মানুষের কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা এবং অন্য সকলের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম, জীবনে সব কিছু বলতে আমার বাবা এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝেন না। বাবা এতদিন একটা ছিন্নমূল, ছন্নছাড়া মানুষ ছিলেন। এই বাড়িঘর এবং দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করে বাবা ফের তার শেকড়-বাকড় মাটিতে ছড়িয়ে দিতে দিতে কখন দেখি বাবার মুখে ভারি প্রসন্নতা বিরাজ করছে। বাবার এমন সুন্দর মুখ কখনও আর এর আগে দেখিনি। অকারণে আমার চোখ দুটো জলে ভার হয়ে এল। বাবার মুখ দেখে এই প্রথম বুঝি টের পেলাম জীবন কত বড়।

বাড়িতে ঠাকুরের অভিষেক হয়ে যাবার পর গাছপালা বনের মধ্যে আমাদের অনেকটা ভয় কেটে গেল। কাছে পিঠে নতুন আবাস এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তেমনি মাঠ পার হলে পুলিসের ব্যারাক, কালীর দীঘি, বাদশাহী সড়ক— কেবল সেই চৌমাথায় নিমতলার কাছে নিবারণ দাসের বাড়ি এবং তার আশেপাশে আরও সব বাড়ি উঠছে। নতুন কলোনির পত্তন হচ্ছে। সাপ-খোপের উপদ্রব তেমন একটা কমেনি। বৈশাখ শেষ না হতেই জ্যৈষ্ঠ। খরা। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, মাঠ-ঘাট ঘাস সব হেজে গেছে। মাটি ফেটে চৌচির। মনে হত দুপুরটা এক গনগনে আঁচের আগুনের কুন্ড। এরই মধ্যে পিলু কোথা থেকে কোঁচড় ভর্তি করে আম সংগ্রহ করে আনত। ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুর সবই সে সহজে সহ্য করতে পারে।

এখন এই বাড়িতে আমার বাবার সাধ বলতে আর কিছু ফল টলের গাছ লাগানো। পাঁচ বিঘে জমির সবটা এখনও সাফ হয়নি। উত্তরের দিকে একটা বড় জঙ্গল রয়েই গেছে। বছরের ওপর হল আমাদের এই নতুন আবাস। এখন আর এ জায়গাটাকে মনেই হয় না অচেনা-অজানা, ভুতুড়ে সাপখোপ অথবা শেয়াল-খাটাশের একমাত্র আস্তানা। ঠাকুরঘরটা হয়ে যাবার পর বাবা একদিন দুটো জবা ফুলের ডাল নিয়ে এলেন। তিনি গেছিলেন বেলডাঙার কাছে বহুলা গাঁয়ে। নিবারণ দাসের বড় শ্যালকের

বিয়ে। বিয়ের কাজ সেরে ফেরার সময় দুটো জবা ফুলের ডাল সঙ্গে এনেছেন। বিয়ে দিয়ে পেয়েছেন প্রণামীর টাকা আর একটা পুরোহিত বরণ। কিছু চাল-ডাল। অন্য সময় বাবা যখন এ-ভাবে ফিরে আসেন তখন উপার্জনের নিমিত্ত কতদূর যেতে হয়, এমন সব সাধুবাক্য সংকল্পের মতো পাঠ করেই থাকেন। এবারে অন্য রকম। সব কোনো রকমে নামিয়ে রেখে হাঁকতে থাকলেন—ও ধনবৌ, তোমার সুপুত্ররা সব কোথায়? কাউকে দেখছি না। বাবা ফিরেছেন বিকেলে, তখন কী আর বাড়ি থাকা যায়। এবং বাড়ির পাশে কোথাও কোনো বাড়ি ছিল না বলে, শুধু বন-জঙ্গল ছিল বলে, বনের গাছপালা, লতাপাতা, সরু পথ, বুনো ফলের সন্ধান অথবা কোথায় গভীর বনে লিচু গাছ আবিষ্কার করা যায় সেই নেশায় বিকেল হলেই আমি পিলু কখনও মায়া সঙ্গে থাকত— বের হয়ে পড়তাম, কারণ আমরা কয়েক বারই এমন কিছু আবিষ্কার করেছি এই বড় বনটাতে যাতে বাবা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এবং আমাদের কাছে বাবাকে স্তম্ভিত করার আনন্দ ছিল পৃথিবী জয় করার মতো। বাবা দু'দিন বাড়ি নেই, বাবা ফিরে এলে তাঁকে নতুন কোনো খবর দিতে পারব না, সেটা কেমন আমাদের কাছে খারাপ লাগত। এটা লিচুর সময়। আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম, জাম, জামরুল সবই এ সময়টাতে হয়। কাঁঠাল গাছ এবং দুটো আনারসের গাছ প্রথম আবিষ্কার করেছিল পিলু। আমি একবার একটা সরু পথ ধরে যাবার সময় প্রথম একটা আম গাছ তারপর আরও বনের গভীরে ঢুকে গেলে বুঝলাম, ওটা আমেরই বাগান, তারপর পিলু খবর নিয়ে এল বনটায় একটা বাতাবী লেবুর গাছও আছে, তখন আমি আর কি আবিষ্কার করব—একটা বাঁশ বাগানের মধ্যে যে ছোট্ট ঢিবি ছিল, সেখানে একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে এসে বাবাকে খবরটা দিলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে যথার্থ স্বাধীন, খাও-দাও ঘুরে বেড়াও। তারপর মায়া আমি কখনও কোনো গভীর বনের মধ্যে ঢুকে নিরিবিলি গিমা শাক খুঁজে বেড়াই। বাবা আমার খুব গিমা শাক খেতে ভালবাসেন।

এ-হেন দিনে বাবা বাড়ি ফিরে স্বাভাবিকভাবেই অমাদের তাঁর স্বগৃহে উপস্থিত থাকতে না দেখে খুব ক্ষেপে গেলেন। মাকে বোধহয় দুটো মন্দ কথাও বলে ফেললেন। আগের মতো আর তো মা'র প্রতি বাবার শংকাভাবটা নেই। নানা জায়গায় ঘুরে বাবা তাঁর খেরো খাতার লিস্টি মিলিয়ে সব যজমান এবং শিষ্যদের পুরো একটা তালিকা রচনা করে ফেলেছেন। এ দেশে আসার পর এতদিন লিস্টি ঠিক করতেই চলে গেছে।

এখন আমাদের অবস্থা যেন ফিরে গেছে, মা'র এবং বাবার আচরণে এটাই মনে হত। এবং অবস্থা ফিরে যাওয়ার মূলে বাবা, তিনি তাঁর গাছের শেকড়-বাকড় সত্যি মাটিতে এবার পুঁতে দিতে পেরেছেন। বনের শাক, কচু লতাপাতার ওপর আর যেহেতু সংসারটা নির্ভরশীল নয়, তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন-তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে, এটা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। বাবা জবা ফুলের ডাল দুটো নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঠাকুরঘরের পাশে লাগাবেন, না একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করবেন, ফুলের বাগান তৈরি করতে হলে এলোমেলোভাবে লাগালে চলবে না। ক'হাত বাই ক'হাত বাগানটা হবে, রাস্তা থেকে কিভাবে বাগানের সবটা দেখা যাবে এ-সব ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিলেন। তাছাড়া যার ওপর ভরসা করে সব তিনি লাগাবেন, সেই মেজ পুত্রটি এখন বাড়ি নেই। মেজ পুত্রটি তাঁর তো পুত্র নয় সাক্ষাৎ দেবতা। পছন্দমতো জায়গায় গাছ লাগানো ঠিক না হলে তিনি সেটি তুলে তাঁর পছন্দমতো জায়গায় লাগাবেন। তাতে গাছ বাঁচুক-মরুক কিছুই আসে যায় না। আর কাজটি এমন নিখুঁত সতর্কতার সঙ্গে করা হবে যে বাড়ির কাক-পক্ষিটি পর্যন্ত টের পাবে না। এভাবে দামী দামী কটা গাছের চারাই তিনি বিনষ্ট করেছেন। সুতরাং বাবার সমস্যার শেষ নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে খুব মোলায়েম গলায় বললেন, আপনার মেজ পুত্রটির কি এখন আসার সময় হয়েছে?

মা বুঝতে পারে বাবা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বাড়ি ফিরে না দেখতে পেয়ে খুব রেগে গেছেন। আজকাল যজমান এবং শিষ্যরা মাসান্তে ঠাকুরের নামে দু-পাঁচ-দশ টাকা মনিঅর্ডার করে থাকে। অন্যান্যবার এসেই প্রথম বাবা সাধারণত বারান্দায় বসে হুঁকো সাজতে না সাজতেই বেশ মধুর স্বরে বলতেন, ও ধনবৌ, টাকা-পয়সা কিছু এল? সাধারণত কিছু এসেই থাকে। দু টাকা পাঁচ টাকা মাঝে মাঝেই এসে থাকে। তাতে খুব একটা সমারোহে সংসার চলে যায় না—কোনো রকমে ডালভাতের

সংস্থান হতে পারে—এই ডালভাতের সংস্থান করতে পারাটা একটা উদ্বাস্তু পরিবারের পক্ষে কত কৃতিত্বের ব্যাপার সেটা বাবার হুঁকো খাওয়ার সময় মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এবারে তিনি হুকোটি পর্যন্ত ছুঁলেন না। মা নিজেই হুঁকো সেজে বাবার সামনে এনে দিয়ে বলল, কোথাও গ্যাছে, আসবে। বাবার মাথা ঠাণ্ডা করার এর চেয়ে মোক্ষম দাওয়াই আর কি থাকতে পারে! এতদূর থেকে এসে স্ত্রীর এমন আপ্যায়নে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন, গেছে কোথায়?

—কোথায় যাবে আবার। পিলু বোধহয় ব্যারেকে গেছে। মায়া বিলুকে বলেছি, তোর বাবা ফিরবে, দেখ্‌না দুটো গিমা শাক পাস কি না। এখন বর্ষা পড়েছে, কোথাও গজাতে পারে। তুমি তো গিমা শাক খেতে খুব ভালবাস। গাছে দুটো বেগুন হয়েছে। বেগুন দিয়ে রাতে গিমা শাক করব ভেবেছি।

এ-সবই হয়ে থাকে সংসারে এখন। সামান্য চাল ডাল নুন তেল থাকলে আর কোনো উচ্চাশার কথা ভাবা হয় না। বাবা জবা ফুলগাছটা লাগাবার ঠিক আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। আমি আর মায়া। আমাদের কোঁচড় ভর্তি গিমা শাক। বাবা দেখে তো বেজায় খুশী। বললেন, জবা ফুলের ডাল দুটো কোথায় লাগাবি? যেন আমি যেখানে পছন্দ করব সেখানেই লাগানো হবে। বাবা তাঁর নতুন আবাসটির কোথাও আর কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছেন না। এই সুমার বন-বাদাড়ে পূজার ফুলের খুবই অভাব। বিশেষ করে শ্বেত জবা রক্ত জবা এই দুটো ফুল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। পূজায় বসে বাবা সে সব ফুল পাবেন কোথায়? বাগদি পাড়ার কাছে একটা করবী ফুলের গাছ শেষ পর্যন্ত কিছুটা বাবাকে স্বস্তি দিয়েছে। পুলিস ব্যারাকে ফুলের গাছ বলতে ম্যাগনলিয়া, গোলাপ, বোগেনভেলিয়া। এমন সব ফুল যা একটাও পূজায় লাগে না। সেজন্য বাবা রোজ সকালে স্নান করার সময় ল্যাংড়ি বিবির হাতা থেকে দুটো একটা পদ্ম তুলে আনেন। ভবিষ্যতে যাতে পূজায় ফুলের অভাব না হয়, স্থলপদ্ম গাছ, শিউলি ফুলের গাছ এবং কিছু দোপাটি ফুলের চারা ইতিমধ্যেই লাগিয়ে ফেলেছেন। আর বাবা বাড়ি না থাকলে পূজার ভার আমার ওপর। পঞ্চদেবতার পূজা, গনেশের পূজা, লক্ষ্মীর ধ্যান, এই সব মন্ত্র একটা খাতায় লেখা থাকে। আমি দেখে দেখে মন্ত্র আওড়াই আর 'এষ দীপায় নম, এষ ধূপায় নম' করি। তখনই সংসারে পিলু সব চেয়ে বেশি খাপ্পা হয়ে যায় আমার ওপর। যেহেতু আমাদের খুব শৈশবে পৈতা হয়েছে—পিলুর ধারণা পূজা করার এক্তিয়ার তারও আছে। কিন্তু বাবা বাড়ি থেকে যাবার আগে পূজার ভার যেমন আমার ওপর অর্পণ করেন, তেমনি বাড়িঘর দেখাশোনার ভার পিলুর ওপর অর্পণ করে যান। এতে পিলু বাবার ওপর রুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মুশকিল পিলু সকাল হলেই পেট ভরে খেতে চাইবে। পিলুর পুজো করার কথা থাকলে সে না খেয়ে পূজোয় বসবে না, আসলে অত বেলা পর্যন্ত আজকাল আর না খেয়ে একেবারেই সে থাকতে পারে না। আর ওর ঈশ্বরে বিশ্বাসও খুব একটা প্রবল নয়। যদিও ঈশ্বরের প্রতি ভূতের ভয়ের মতো একটা ভয় তার সব সময়ই আছে।

বাবা বললেন, আমার মেজ পুত্রটি না এলে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এবং এক সময় মেজ পুত্রটি এক বোঝা কাঠ মাথা থেকে নামিয়েই বাবার কাছে ছুটে এল। পিলু কাছে এলে হুকোটি ওর হাতে দিয়ে বললেন, এখন অনেক কাজ। পিলু হুঁকোটি যথাস্থানে রেখে এলে বাবা বললেন, দুটো জবা ফুলের ডাল এনেছি। একটা শ্বেত জবা, একটা রক্ত জবার। কোথায় লাগাবি?

পিলু এত বড় গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে প্রথমে সামান্য হকচকিয়ে গেল। বাবা গাছটাছ তাঁর মর্জি মতোই লাগান। তারপর দ্বিতীয়বার আবার সেই গাছটাছ পিলুর মর্জি মতো লাগানো হয়। কোনোটা বাঁচে কোনোটা মরে। কিন্তু জবা ফুলের ডাল দুটিকে দু'বার দুজনের মর্জিমতো লাগালে ধকল সইতে পারবে না। এবং এমন মহার্ঘ ডাল দুটোকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাবা বাধ্য হয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শরণাপন্ন হলেন।

বাবার দ্বিতীয় অথবা মেজ পুত্রটি পেছনে দু'হাত রেখে প্রথমে ঠাকুরঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখল। যেসব গাছটাছ আছে, যেমন একটা স্থলপদ্মের গাছ, পাশে দুটো গোলাপের গাছ, টগর এবং জুঁই ফুলের গাছ, তার পাশে সুন্দর মতো একটা করবীর চারা বেশ সতেজ ডাল মেলে দিয়েছে, পিলুর জায়গাটি কেন জানি লাল জবাফুলটির জন্য পছন্দ হয়ে গেল। সে উঠোনে গিয়ে বলল, বাবা দাও, লাগাচ্ছি।

ওই লাগাক, ওর মর্জিমতো কাজটা হলেই শেষ পর্যন্ত গাছটা বাঁচবে ভেবে বাবা বললেন, কোথায় লাগাবি ঠিক করেছিস?

—করবী গাছটার পাশে।

মেজ পুত্রটি এমনিতে তাঁর বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু জায়গা নির্বাচনের কাজটি যে ঠিক হয়নি এবং সোজাসুজি ঠিক হয়নি বললেও মেজ পুত্রটির শেষমেষ যদি নিজের জেদ বজায় রাখার নিমিত্ত আবার দু'বারের ঠেলা সামলাতে হয় গাছটাকে তবেই গেছে। তিনি ডালটি এবং একটা খুরপি নিয়ে ওর সঙ্গে এলেন। বললেন, সত্যি জায়গাটা খুব ভাল। গরু-ছাগলে খেতে পারবে না। কিন্তু করবী গাছটা বড় হয়ে গেলে তোর জবার ডালটা আলো-বাতাস একেবারেই পাবে না।

এমন একটা সাধারণ সত্য-জ্ঞানের অভাব ভেবে পিলু কেমন বাবার ওপরই কাজের ভারটা ছেড়ে দিল। তারপর আমাকে, মাকে ডাকল। আমরা প্রায় বাড়ির সবাই, এমন কি কুকুরটা পর্যন্ত যতক্ষণ ডাল দুটো লাগানো না হল দাঁড়িয়ে থাকলাম। এবং বাবা এবারে যেন নিশ্চিন্ত মনে বললেন, যাক ধনবৌ, তোমার লাল জবা, শ্বেত জবাও হয়ে গেল।

আসলে বাবা আমার তাঁর সেই দেশ বাড়ির কথা বুঝি এতদিনেও এক বিন্দু ভুলতে পরেননি। বাড়িটার জন্য বাবা কী যে না করছেন! ফলের গাছের একটা লিষ্টিও বাবা এক রাতে বসে কুপির আলোতে বানিয়ে ফেললেন। মানুষের ঘরবাড়ি করতে যা যা লাগে তার কোনো ত্রুটি থাকুক বাবা সেটা একদম পছন্দ করতেন না।

মা একদিন বাবার এত উৎসাহের মধ্যেই বলে ফেলল, সবই হচ্ছে, খুঁজে পেতে সব শিষ্য যজমানদের ঠিকানা নিয়েছ, সব খেরো খাতায় লিখে রেখেছ, ছেলে ক'টাও বড় হচ্ছে। শুধু তোমার ঘর-বাড়ি বানালেই চলবে, বিলু পরীক্ষাটা দেবে না? পিলুকে শহরের স্কুলে দেবে না? মায়া বাড়িতেই পড়তে পারে। ছোটটার না হয় বয়স হয়নি...।

বাবা নিশ্চিন্ত মনে বললেন, ও হয়ে যাবে। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে সব হয়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাক্স থেকে বইগুলো বার কর। বসে থাকলে তো পেট ভরবে না।

বাবা তাঁর পছন্দমতো কাজ না হলে নির্বিঘ্নে সব ভুলে যেতে ভালবাসেন। তিনি বই বাক্স থেকে কবেই বের করে দিয়েছেন। যখন দু-চার দিনের মতো খাবার মজুত ঘরে থাকত, তখন আমাদের পড়ার কথাটা বাবার মনে পড়ত। প্রায় সকালেই উঠে বাবা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতেন। নিজেই মাদুর পেতে বলতেন, পড়তে বোস। বইটই নিয়ে এস, দেখি কে কতটা এগোলে। মাসাধিককাল পর পর তিন-চার দিনের বাবার এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা খুবই ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমরাও তখন উচ্চস্বরে পড়তাম। সবচেয়ে উচ্চস্বরে পড়ত তাঁর মেজ পুত্রটি। সে রাজ্যবর্ধনের বোন রাজশ্রীর সেই আগুনে ঝাঁপ দেবার মুখের দৃশ্যটি খুব মনোযোগসহকারে পড়ত। গ্রহবর্মা মালবরাজ দেবগুপ্ত আর বাংলার রাজা শশাঙ্কের মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজয়ের পাতাগুলিও সে পড়ত গলা ফাটিয়ে। আর মাঝেমাঝে নিজের বোন মায়া দেবীকে কিল চড় ঘুষি বাবার অলক্ষ্যে যখন যেটা সুবিধা ব্যবহার করে চলত।

আমাদের এই তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসে থাকতেন বাবা। বাবার কোলে যিনি থাকতেন, তার প্রতাপ সবার চেয়ে বেশি। সে খুশিমতো যার তার বই টেনে নিত, চিবুত, কখনও কোনো বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলত। তার সব অধিকার ছিল। বাবা মাঝে মাঝে তার ছোট পুত্রটির কান্ডকারখানায় বিব্রত হয়ে বলতেন, আহা কী করলি! দিলি তো ছিঁড়ে। ধমক দিলেই ছোট ভাইটির ভারী বদ অভ্যাস ছিল। নির্ঘাত সে বাবার কোলে পেচ্ছাব করে দেবে। বাবাও সেই ভয়ে খুব জোরে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। কোল থেকে তুলেও দিতেন না। কারণ মা'র তো সকাল থেকে কাজের অন্ত থাকে না। মাকে গিয়ে জ্বালাতন করবে ভয়েই বাবা সব উপদ্রব সুবল মানুষের মতো সহ্য করে যেতেন। ছোট সন্তানকে তাঁর শাসন করার কোনো অধিকারই মা বাবাকে দেয়নি। এছাড়া এ-সব ব্যাপারে বাবার ভীষণ আপেক্ষিক তত্ত্বে বিশ্বাস ছিল।

আমি প্রথমে কিছু ইংরেজি কবিতা পড়লাম। কবিতাগুলি ক'দিন পড়লে বেশ মুখস্থ হয়ে যায়, না পড়লে আবার সহজেই ভুলেও যাওয়া যায়। বাবার সামনে কখনই বাংলা সংস্কৃত পড়ি না। কারণ

বাংলা এবং সংস্কৃত পড়লেই তাঁর অধীত বিদ্যার মধ্যে পড়ে যায়। তিনি তখন এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন যে, আমার আসল পড়াটাই আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ বাবা আমার সংস্কৃতে এবং বাংলাভাষায়, এমন কী ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকালটা কীভাবে যে নষ্ট করে দেন! তাঁর মেজ পুত্রটি বাবার এই দুর্বলতা বিলক্ষণ টের পায় বলেই প্রথমে ইতিহাস ধরেছে। বাবা একটা কথাও বলেননি। তারপর বাংলা—বাবা তেমনি চোখ বুজে শুনে যাচ্ছেন। উচ্চারণে ত্রুটি ঘটলে কেবল সেটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। বাবা কিছুদিন আগে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত একবিন্দু আমাদের কারো পড়া হয়নি, মা সেটা ধরিয়ে দিতেই মৌনীবাবা সেজে এখন ছেলে কোলে নিয়ে প্রায় মহাদেবের মতো বসে আছেন।

আর সেই বাবা সহসা বলে উঠলেন, ওরে বিলু অঙ্ক করছিস না কেন?

বললাম বইটার হাফ নেই বাবা।

—জ্যামিতি?

—ওটা আনতে হবে।

বাবা তারপর মোটামুটি হিসাব নিয়ে বুঝতে পারলেন, আমার বই-এর সংখ্যা যথার্থই কম। এবং বাবা যেন এটা আজই জানলেন, তেমনভাবে বললেন, তবে শহরে চল, মানুকে বলে-কয়ে কিছু পুরনো বইটই পাওয়া যায় কিনা দেখি। কি কি নেই একটা লিষ্টি করে ফেল।

এই লিষ্টি আজ নিয়ে মোট পাঁচবার করা হল। কে. পি. বসুর অ্যালজাব্রা আছে। তবে সবটা নেই। জ্যামিতির হাফ আছে। কারণ দু'বছরের টানা হ্যাঁচড়া। এবং আমার আর কখনও পড়াশোনা হবে ভাবিনি। যতই বাবা বলুন, বাড়িঘর হয়ে যাক তখন দেখা যাবে। কখনও প্ল্যাটফরমে, কখনও পোড়ো বাড়িতে থাকতে থাকতে ভাবতেই পারিনি, এ দেশে এসে কখনও আমাদের শেষ পর্যন্ত বাড়িঘর হবে। সুতরাং বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর পরীক্ষাটা না দিলে যেমন বাবার সম্মান থাকে না, তেমনি এই বাড়িঘর বানানোর কোনো অর্থ হয় না।

বিকেলেই বাবা শহরে মানুকাকার কাছে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় বললেন, কাকাকে বলো তোমার কী কী বই নেই। যখন পুরো লিষ্টি দিলাম, তখন সেই কাকাটি হতবাক্। বললেন, কি করে পরীক্ষা দিবি? চার মাসও তো বাকি নেই। কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টারমশাই কাকার বন্ধু লোক। কাকা আবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি চিরকুট লিখে তাঁর এক শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁর দুই ছাত্রের ঠিকানা দিলেন। ওদের বাড়তি বই-টই যদি থাকে। ওরা পাঠালো খেলোয়াড় বিনয় দাসের কাছে। সে এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে না। তার বইগুলি যদি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলি যে নেই বলল না। বললে, বিনয় দাসের বাবা মুদিখানার মালিক তাকে আর আস্ত রাখত না। যাই হোক এই করে যখন কিছু বই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, মা আমার খুবই আশ্বস্ত হলেন। যে মা, কখনও জানেই না, কোন্ বই-এর কি নাম সেও লণ্ঠন জ্বেলে উবু হয়ে বসল। সব বই দেখে বলল, এর তো দেখি ভেতরে সব পাতা কাটা রে। কেমন সুন্দর করে কেটেছে দেখ!

বাবা বললেন, সত্যি তো!

আমি বললাম, বাবা বিনয় দাস চারবার চেষ্টা করে পারেনি। বোধহয় সেজন্য মা সরস্বতী রাগ করে সব ভাল ভাল জায়গাগুলি বই থেকে চুরি করে নিয়েছেন।

বাবা বললেন, তবু তো বই। এই বা কে দেয়। মন দিয়ে পড়লে ওতেই পাস করে যাবে।

বাবা বলতে কথা। বাবার কথা ফেলা যায় না। তখন সেই বই সম্বল করেই আমার পড়াশোনা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী আমি। বাবা এক ফাঁকে নিবারণ দাসের আড়তেও চলে গেলেন। বলে এলেন, দাসমশাই বড় ছেলে আমার এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। শুধু নিবারণ দাস কেন, যার সঙ্গেই দেখা হত একথা সেকথার ফাঁকে বাবা বলতেন, বড়টা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। বাবার কাছে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টা বড়ই গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাটা আরও যেন গম্ভীর শোনায়। বাবা সব সময় খুব জরুরী কথাবার্তায় খুব সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। এবং এভাবেই এই বাড়িতে শীতকালও এসে গেল।

এখন পিলু পর্যন্ত আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। আমার পড়ার জন্য বাবা শেষ পর্যন্ত একটা হারিকেনও কিনে ফেললেন।

আর আমি জানি, বাবা যেখানেই এখন যাচ্ছেন, বিয়ের কাজে অথবা কোনো পুজো-আর্চার ব্যাপারে— ঠিক কথায় কথায় তাঁর বড় ছেলে কত লায়েক, কী পরীক্ষা দিচ্ছে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করে ছাড়ছেন না। বাড়ি ফিরলেই বাবা বলতেন, জগদীশ বলল, প্রবেশিকাটা পাস করলেই কর্তা আপনার আর কোনো ভাবনা নেই। অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। বাবার ছেলে অফিসবাবু হবে শুনে মা খুব অমায়িক হয়ে যেতেন। মা বলতেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু কিছু খাও। কোন সকালে তো বের হয়েছ।

এই বাড়িঘর, গাছপালা এবং বনভূমির মধ্যে রাতে আমার উচ্চস্বরে পড়া বাবার চোখে-মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি এনে দিত। তিনি মাঝে মাঝে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন। আর কখনও সকালে সেই পড়াশোনার মধ্যেই পিলু খবর দিত এই বিরাট বনভূমির কোন দিকটার সব গাছপালা কেটে লোকে নতুন আবাস তৈরি করছে এবং আমার মনে হত পিলুর ভারি কষ্ট হত এতে। এই বনভূমিটা যেন পিলুর সাম্রাজ্য—সবাই কে কোথা থেকে এসে সব গাছপালা কেটে ফেলছে। বনভূমির সেই আদিম আশ্চর্য রহস্যটা মরে যাচ্ছে বলে পিলুকে প্রায়ই খুব ম্রিয়মান দেখাত। কুকুরটাকে নিয়ে সে আগে যেমন এই বনভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসত আমাদের জন্য, এখন আর তেমন পারে না। গাছপালা কেটে ফেলায় উষর জমির মতো দেখায় এবং সেখানে মাঝে মাঝে শোনা যায় বাঁশ কাটার শব্দ। বাবার খুব তখন আনন্দ। পূজা শেষ করে বাবা যত জোরে সম্ভব শঙ্খে ফুঁ দিতেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজাতেন। পিয়ন আসত ঠাকুরের নামে আসা যজমান অথবা শিষ্যদের মনি অর্ডার নিয়ে। কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা মাসোহারা দেয়। আর বাবার কিছু যজমান নিবারণ দাসই ঠিক করে দিয়েছে। শহরের মানুকাকাও ভাল পুরোহিতের খোঁজে কেউ এলে বাবাকে খবর পাঠায়। আর যারা বাবার মতো নতুন ঘরবাড়ি করছে, দিনখন দেখাতে এলে বলে দেন, ঠাকুরের ফুল-তুলসী নিয়ে যাও। ওতেই হয়ে যাবে। জায়গাটার কথা বললে বলেন, মাটি মাটি। তার তুলনা নেই ভুবনে। যেখানেই আবাস, সেখানেই মানুষের সবকিছু। বাবার এমন সুন্দর কথা ওদের খুব ভাল লাগত। পূজা-পার্বণে দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এটা বোঝা যাচ্ছিল—সবই বাবার স্বভাবগুণে।

এ-ভাবে শীতকাল শেষ হয়ে গেল এই বনভূমিটায়। এখন আর আগের মতো একে আমরা ঠিক বনভূমি বলতে পারি না। কারণ বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে সর্বত্রই মানুষের নতুন বাড়িঘর উঠে যাচ্ছে। ভেতরের দিকে, অর্থাৎ যে সুমার বনটা প্রায় মাইলব্যাপী কারবালা পর্যন্ত চলে গেছে এবং যেখানে কবে কোন আদ্যিকালে একটা ইঁটের ভাটাও কেউ করেছিল—কেবল সে জায়গাটা কেন জানি মানুষ এখনও ঠিক পছন্দ করছে না। ফলে ওদিকটার বড় বড় শিরিষ গাছগুলি থেকে পাতা ঝরতে লাগলো ঠিক আগের মতই; কিছু শাল গাছ অথবা পিটুলি গাছের পাতাও ঝরছে। রোদের তাত বাড়ছে। মাঠে অথবা কোনো শস্যক্ষেত্রে আগে যে খরগোস সজারুর উপদ্রব ছিল তাও ক্রমে কমে আসতে লাগল। কিছু বড় বড় গো-সাপ ছিল বনটাতে, ওদের আর বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। রাতে শিয়ালের সেই তীব্র চিৎকার ক্রমে দূরবর্তী শব্দের মতো মিহি হয়ে যেতে থাকল। এবং এত সবের মধ্যেই আমায় একদিন শহরে যেতে হল পরীক্ষা দিতে। মা কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিল। বাবা-মাকে প্রণাম করতে হল। ঠাকুরের ফুল বেলপাতা বাবা পকেটে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্য বাবার বিশ্বাসে যা কিছু দরকার সবই করা হল।

পরীক্ষার কটা দিন বাড়ি থেকে বাবা কোথাও বের হলেন না। পূজার সময় বেড়ে গেল। শালগ্রামের মাথায় বোঝা বোঝা তুলসী পাতা চাপাতে থাকলেন বাবা। শহরে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। বাড়িতে বাবা ঠাকুরের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছেন। ধৈর্যের পরীক্ষা বোধহয়। কারণ বাবার জানা যত দেবতা আছেন সবার উদ্দেশেই ফুল চন্দন দিতে দিতে বিকেল হয়ে যেত বাবার। কেউ বাদ গেলে ষড়যন্ত্র করে বাবার সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি মা খুবই উৎকণ্ঠায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মায়া ভাইকে কোলে নিয়ে রাস্তার গাছপালা দেখাচ্ছে। পিলু রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল আমি কখন ফিরব! কেবল বাবা নেই। ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ। মাকে বললাম,

বাবা কোথায়?

ঠাকুর ঘরে সেই সকালে ঢুকেছে এখনও পুজোই শেষ হচ্ছে না।

বুঝলাম, তাঁর বড় পুত্রের জন্য বাবা আজ তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই খুশী করতে ব্যস্ত। তাঁর নিজের এত সখের বাড়িঘরের কথা মনে নেই। প্রিয় কুকুরটার কথা মনে নেই। দেবতাদের তুষ্ট করতে গিয়ে দিন শেষে বেলা যায় তাও তিনি বুঝি ভুলে গেছেন।

ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। খুব সতর্ক গলায় ডাকলাম,—বাবা।

বাবা রা করলেন না।

আবার ডাকলাম, বাবা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

বাবা কেমন ধ্যানমগ্ন গলায় বললেন, শেষ বলো না। পরীক্ষা সবে শুরু হল। কী অর্থে কথাটা বললেন, বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবা তখন ডাকলেন, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর এবং এ-সবে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের অভাব ছিল। তবু বাবার কথা। ঘরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম করলে সামান্য চরণামৃত দিলেন হাতে। এত সবের পর বাবার পুজো শেষ ধরতে পারলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীক্ষার ভালমন্দের কথা তিনি আজ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। সবই ঠাকুরের কৃপা, ভাল-মন্দ বলে যেন কিছু নেই। শুধু নিজের কাজটুকু করে যাও। বাবার এমন সব কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। মা মাঝে মাঝে একই কথা শুনে রেগে যেত। কিন্তু পরীক্ষার কটা দিন বাবার পুজো আর্চায় মা সাংসারিক অনটনের কথা বলে এতটুকু বিব্রত করল না। বাবার সঙ্গে মাও এ-ক'টা দিন খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম।

ফল বের হবার আগ পর্যন্ত বাবা আমাকে কোথাও গেলে সঙ্গে নিতে শুরু করলেন। শহরে মানুকাকার বাড়ি গেলে বললেন, সব তাঁরই ইচ্ছে। তোমার ভাইপো তো এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। তোর তো জানাশোনা আছে অনেক। দেখিস যদি কিছু করতে পারিস। নিবারণ দাসের আড়তে নিয়ে গেলেন একদিন। বললেন, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে পুত্র।

এই প্রবেশিকা পরীক্ষা বাবার জীবনে তাঁর বাবার জীবনে কখনও ঘটেনি। অতবড় পরীক্ষা দিয়েছে ছেলে, তাকে দশজনের কাছে নিয়ে যাওয়া বাবার খুবই দরকার। তাঁর বড় ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কত বড় কথা!

ফল বের হবার দিন শহরে গেলাম। মানুকাকা বললেন, তুমি এক বিষয়ে ফেল করেছ। স্কুলের মন্টু মাস্টার খবরটা দিয়ে গেছে। খুব দমে গেলাম। তিনি ফের বললেন, দু' মাস পরে পরীক্ষা হবে। তখন পরীক্ষাটা দিতে পারবে। অঙ্ক পরীক্ষা। দুটো মাস আর কতই বা সময়। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পাস করে যাবে। কিছুই ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফেরার পথে সাহেবদের একটা নির্জন কবরখানা পড়ে। বড় বড় সব ঝাউগাছ। সেখানে সারাটা দুপুর শুয়ে থাকলাম। কেবল বাবার মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। তাঁর কত বিশ্বাস আমার ওপর। এখন মুখ দেখাব কী করে! কী করি। ফেরার হলে কেমন হয়। তখনই মা'র সেই বিষণ্ণ মুখ ভেসে উঠল। বাবার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পুত্র গৌরব নিমেষে কেউ হরণ করে নিয়ে গেল। তবু কেন জানি পিলু মায়া ছোট ভাইটার কথা ভেবে ফেরার হতে ইচ্ছে হল না। সাঁঝ লাগার আগে গুটি গুটি বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটা যেন আজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। পুলিস ব্যারাক পার হতেই বড় মাঠ। মাঠে পড়েই দেখলাম, সবাই বাড়ির রাস্তায় গাছের নিচে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটতে ছুটতে আসছে। মায়া ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল। অন্য দিন হলে ভ্যাক করে কেঁদে দিত। আজ তার কান্নার কথা মনে পড়ল না। কতক্ষণে আমার কাছে পৌঁছবে! ওরা কাছে এলে কীভাবে যে বলব, পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি পিলু। পিলু এ-কথায় সবচেয়ে বোধহয় বেশি ভেঙে পড়বে এবং বনভূমিটা থেকে আমরা যে ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি, আমার মনে হল খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বনভূমি বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে। পিলু চিৎকার করে বলল, দাদা, পাস করেছিস?

কিছু বললাম না। কারণ বলতে পারছিলাম না কিছু। আমার চোখ ফেটে জল আসছে! বাবা এগিয়ে এসে বললেন, পাস করলি?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম।

বাবা বললেন, কান্নার কী আছে? সবাই বুঝি পাস করে!

বাবার কথায় ভেতরের দুঃখটা সহজেই কত লাঘব হয়ে গেল।

বাবা আবার বললেন, ক' বিষয়ে পাস করেছিস?

এটাই বোধহয় বাবার শেষ সান্ত্বনা। বললাম, ন' বিষয়ে পাস। অঙ্কে ফেল!

বাবা বিজয় গৌরবে এবার আমার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাস—কম কথা হল! এটা তো পাসই। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করেছে! বড় হলে বুঝতে পারবি।

এবং তারপর থেকে আমার সেই নির্দিষ্ট অঙ্ক পরীক্ষার দিনটি পর্যন্ত যার সঙ্গে দেখা হত বাবা বলতেন, বড় পুত্র দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টাতেই পাস করেছে। একদিন নিবারণ দাসের পাটের আড়তেও খবরটা দিতে চলে গেলেন বাবা। বললেন, কম বড় কথা না। কী বলেন দাসমশাই!

দাসমশাই আড়তে বসে হুঁকাটি বাবার হাতে দিয়ে বললেন, সত্যি ভারি গৌরবের কথা। বাবা আনন্দে তখন তন্ময় হয়ে তামাক টানছেন। পুত্র-গৌরবের হাসিটি তাঁর মুখে লেগেই আছে।

দেশ ছেড়ে আসার পর, দু-তিন বছর আমাদের কারো কেনো অসুখ হয়নি। এমন কি সামান্য সর্দি কাশিতেও কেউ ভুগিনি। মানুষের অসুখ বিসুখ থাকে আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। গাছপালা আর মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকলে তাই বুঝি হয়। শীতের চাদর থাকত না, খালি গায়ে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়ানো, গাছ পাতা বনআলু খেয়ে আমাদের আশ্চর্যভাবে জীবনীশক্তি বেড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এখন প্রায় সুদিনই বলা চলে। শীতের চাদর পর্যন্ত বাবা কিনে দিয়েছেন। আর তখন থেকেই আমরা কেউ কেউ সর্দি কাশির শিকার হতে থাকলাম। সর্দি কাশিতে বাবা গা করতেন না। হয়েছে সেরে যাবে। মানুষের ঘরবাড়ি হবে অসুখ বিসুখ হবে না সে আবার কেমনতর কথা! আমার মা, বাবার হাবভাব কিছুদিন শুধু লক্ষ্য করেই গেল। পিলুর সর্দি-কাশি, মায়ার আমাশয়, আমারও ক'দিন জ্বর, মাও কিছুদিন অম্বলের রোগে ভুগে উঠল। সবই বিনা ওষুধে সেড়ে যাওয়ায় বাবা বললেন, নিজের মধ্যেই আছে, সঞ্জীবনী সুধা। তাকে ধনবৌ বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু বর্ষা পড়তেই একদিন পিলু খুব জলে ভিজে বাড়ি ফিরে এল। পুকুর ডোবা খাল বিল জলে ভেসে গেছে। পিলু ব্যারেকের পুকুরে উজানী মাছের খোঁজে গিয়েছিল। কটা কৈ, মাগুর, সিংগি মাছ সে জলে ভিজে ধরেছে। সারা আকাশ জুড়ে ছিল গুড়গুড় কালো মেঘ। আর ঝড়ো বাতাস। গাছপালা জলে ভিজে চুপসে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে পিলু বৃষ্টি মাথায় করে মাছ নিয়ে যখন ফিরল, তখন মা ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছে। বাবা বাড়ি নেই। ঠাকুরের বৈকালির কাজ আমাকেই সারতে হবে। সে সময় পিলু গামছা খুলে বলল, দাদা দেখবি আয়। বারান্দায় বের হয়ে দেখলাম, সত্যি কত বড় সব সিঙ্গি, কৈ, মাগুর। সে বলল, কী মাছরে দাদা! আবার যাবি? এমন ঝড় বৃষ্টিতে আমার যেতে সাহস হল না। আর মাও দেখলাম বেশ চুপচাপ। পিলু আবার বলল, মাঠে মাছ উঠে আসছে। কত মাছ ফসকে গেল। মা কুপি জ্বেলে মাছ দেখতেই সহসা চিৎকার করে উঠল, ওরে পিলু, তোর প্যান্টে এত রক্ত কেন রে!

পিলু হাসতে হাসতে বলল, সিঙ্গি মাছের কাণ্ড মা। হাত ফুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু পিলুর মুখ দেখে আমার ভাল লাগল না। কেমন সাদাটে আর নীল দেখাচ্ছে মুখটা। মা তাড়াতাড়ি কিছুটা হলুদ গরম করে আনতে গেল। পিলু এত সবের মধ্যেও মাছগুলি নিয়ে রাখল হাঁড়িতে। প্যান্ট ছেড়ে একটা খোট পরে নিল। বলল, খুব শীত করছে রে দাদা। বলে সে মার একটা শাড়ি দু ভাঁজ করে গায়ে দিয়ে কেমন ঝিম মেরে বসে থাকল।

মায়া তখন কাছে গিয়ে বলল, এই ছোড়দা ঝিমুচ্ছিস কেন?

—খুব শীত করছে।

—শীতে কেউ ঝিমোয়?

—মেলা কথা বলবি না। যা তো!

ঝিমুনোর কথায় আমারও খুব একটা ভাল লাগছিল না। বললাম, সত্যি সিঙ্গি মাছে ফুঁড়েছে না অন্য কিছু!

—অন্য কিছু আবার হতে যাবে কেন!

—তুই দেখেছিস?

—জলে দেখা যায়! ঘাসের মধ্যে অন্ধকারে হাত দিতেই ফুঁড়ে দিল। লম্বা। ধরতে পারলাম না। কত বড় যে না! বলেই ওর চোখ বুজে আসছিল।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। মাকে তাড়াতাড়ি ডেকে বললাম, পিলু কেমন করছে!

মা দৌড়ে এল। বলল, কি হয়েছে?

পিলু ঝিমোচ্ছে।

মা তাড়াতাড়ি গরম হলুদ আঙুলে লাগিয়ে বলল, ব্যথা করছে?

—না।

—জ্বালা করছে?

—না।

—তোমার কিছুই করছে না। তবে ঝিমোচ্ছ কেন?

—ঘুম পাচ্ছে।

—পোকামাকড়ে কাটেনি তো?

পিলু বলল, না।

আমি বললাম, যখন ফুঁড়ে দিল, তখন ব্যথা করছিল?

—টের পাইনি।—কত মাছ! মাছ ধরব, না ব্যথা টের পাব।

মা কেমন হাউমাউ করে কাঁদতে বসে গেল। পিলু ঝিম পায় কেনরে! সিঙ্গি মাছে ফুঁড়ে দিলে ব্যথা করবে। তুই কী ধরতে কীসে হাত দিয়েছিস রে!

মহা জ্বালা দেখছি। মা কাঁদতে কাঁদতে ওর হাতের কব্জিতে মশারির দড়ি বাঁধাতে গেলে, পিলু মহারোষে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলছি তো পোকামাকড়ে কামড়ায়নি। এবং আমার সামনে তখন একটা মহাভুজঙ্গ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাচ্ছি, পিলুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। সংসারে মহা সর্বনাশ। বাবা কাল ফিরে এসে কি দেখতে পাবেন বুঝতে পারছি না। ভেবেচিন্তে কিছুই করতে পারছি না। আর মার এই হাউমাউ কান্না বনটার মধ্যে কেউ শুনতে পাবে না—মানুষের এটা কত বড় বিপদ এই প্রথম টের পেয়ে এক দৌড়ে নিবারণ দাসের বাড়ি যাব ভাবতেই মা বলল, অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছিস! শুধু সেই অন্ধকার এবং ঝড় বৃষ্টি থেকে চিৎকার করে বললাম, নিবারণ দাসের বাড়িতে যাচ্ছি মা। জ্যাঠাকে খবরটা আগে দিই।

পাল্লা দিয়ে ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি। শাঁ শাঁ শব্দ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথের যখন যেখানে পা দিচ্ছি, মনে হচ্ছে কেবল সাপ। যেন হাঁটলেই পাটা সাপের মাথায় পড়বে। আর এ-সময়ে মনে পড়ল বাবার সেই মহাবাণী, উচ্চারণ করলাম, দোহাই আস্তিকমুনি। আমরা এই বনভূমি সাফ করার সময় কত বড় বড় গোখরো সাপ দেখেছি। বাবা একটাও মারতে দেননি। দেখলেই তিনি বলতেন, দোহাই আস্তিকমুনি। সাপেরা তখন মাথা নিচু করে ঝোপে জঙ্গলে ঢুকে যেত। এবং এসবে আমার এবং মার তাছাড়া পিলুর কোনই বিশ্বাস ছিল না। কেবল মনে হত বাবাকে ভালমানুষ পেয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে সাপগুলো। অথচ এখন ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকারে হাতের কাছে এমন মহাসম্বল পেয়ে আরও বেগবান হয়ে গেলাম। মানুষের কি যে থাকে! আকাশ ফালা করে দিচ্ছে তখন বিদ্যুতের শেকড়বাকড়।

একবিন্দু আর ভয় নেই। যেন সেই আস্তিকমুনির দোহাই শুনে সব আস্তিকেরা আমাকে দেখলেই পালাচ্ছে। এবং মহাভারতের পুণ্যশ্লোকের মতো আকাশ ধরণী নিমেষে বড় পবিত্র হয়ে গেল। বুঝলাম বাবার সব বিশ্বাসই বড় পবিত্র ইচ্ছের দ্বারা চালিত। বুঝতে পারলাম মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে এমন সহায় সম্বল না থাকলে সে খুবই অসহায়। এবং কখন নিবারণ দাসের বাড়ি পৌঁছে গেছি খেয়ালই করিনি। এত বড় একটা দুর্যোগের মধ্যে এতটুকু ক্লেশ নেই শরীরে। রাস্তার দু-পাশে আকাশে বাতাসে

কি ছিল টের পাইনি। সামনে নিবারণ দাসের বাড়ি আর মুখে দোহাই আস্তিকমুনি, এতক্ষণ এই ছিল আমার অস্তিত্ব।

দাসের মা বলল, আড়ত থেকে তো ফেরেনি। এই ঝড় বাদলায় ভিজে! কি খবর কর্তা।

কেবল কোনরকমে বললাম, পিলুকে কিসে কেটেছে।

নিবারণ দাসের মা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর ছোট মেয়ে বলল, ঠাকুর ছাতা নিয়ে যান।

আমি আর কিছুই শুনতে পাইনি। কারণ শরীর তখনও ভারি বেগবান। একটা পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছি। দু-বার আছাড় খেয়েছি। সারা শরীর কাদায় লেপ্টে গেছিল, আবার যেতে যেতে কখন তা বৃষ্টিতে ধুয়েও গেছে। পেছনে একবার তাকাতেই মনে হল, বাড়িটা বৃষ্টির ঝাপটায় কুয়াশার মধ্যে যেন আবছা হয়ে গেছে। নিবারণ দাসের আড়ত সামনে। ঝড় বৃষ্টির জন্য পাল্লা ভেজানো! ফাঁক দিয়ে হ্যাজাকের আলো বাইরে এসে পড়ছে। সামনে দুটো গরুর গাড়ি। গাড়িগুলোর ওপর দিয়ে লাফ মেরে নেমে গেলাম। একটা গরুর পিঠে পা পড়ল, এবং পাল্লা ফাঁক করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, জ্যাঠা, বাবা বাড়ি নেই, পিলুকে কিসে কেটেছে। মা কাঁদছে।

নিবারণ দাস বলল, কী বলছেন, কিসে কাটবে!

—মাছ ধরতে গেছিল। শীতে শরীর কাঁপছে পিলুর। আর ঝিমুনি। কিছুতে যদি কেটে থাকে, কি করব?

নিবারণ দাস সাহস দেবার জন্য বলল, কিচ্ছু হয়নি। দাঁড়ান। সব তো ভিজে গেছে! ছাতা আনেননি কেন? এই গোপাল, টাকাগুলো তুলে রাখ। চাবিটা দে। শিগরির কর।

গরীব মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়া কিছু সম্বল থাকে না। বাবারও তাই সম্বল। অথচ আমরা, বিশেষ করে মা এবং পিলুর ঈশ্বর বিশ্বাসে ঘাটতি ছিল খুব। সারাটা রাস্তা ভারি দুর্গম। ঝড় জলে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। এতটা পথ একা অন্ধকারে ঝড় জলের মধ্যে কী করে এলাম! নিবারণ দাসের কথায় যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছি। শীত করছে! জানি একা এতটা পথ আর অন্ধকারে যেতে পারব না। ভূতের ভয় এবং সাপখোপের ভয়। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। নিবারণ দাসের জন্য অপেক্ষা করব না আবার যেমন এসেছিলাম তেমনি ঝড় জলে বের হয়ে পড়ব! বাবা বাড়ি নেই। মা একা। বনভূমির মধ্যে মা'র অসহায় চোখ মুখ একদণ্ড স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সম্বল বলতে আমার গলায় পৈতা আছে আর সাপখোপের জন্য আছেন, আস্তিকমুনি। এবং এই সম্বল করে আবার বের হয়ে ছুটব ভাবছি, খবরটা যখন দিয়েছি, নিবারণ দাস ঠিক যাবে, ওর দেরি হতে পারে, আমার দেরি হলে মা আরও ভেঙে পড়বে। বললাম, জ্যাঠা আপনি আসুন। আমি যাচ্ছি।

নিবারণ দাস রে রে করে উঠল।—আরে না না। আমি যাচ্ছি সঙ্গে। গোপাল, বাবা তাড়াতাড়ি কর।

তাড়াতাড়ি বললেই তো আর হয় না। পাটের আড়ত। কত কাজ গোপালের। দুজন দেহাতী লোক পাটের গাঁট সব তুলে ভিতরে নিয়ে রাখছে। সব রাখতে দেরি হবারই কথা। তারপর দরজা বন্ধ করা, গোটা দশেক তালা ঝোলানো, এতসব কাজের জন্য দেরি হতেই পারে। আমার কাছে একদণ্ড কত অমূল্য সময় এই প্রথম টের পেলাম।

রাস্তায় নিবারণ দাস ছাতা মাথায় বড় ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল। টর্চ মেরে গোপাল আগে আগে যাচ্ছে। আমি আরও আগে। নিঝুম অন্ধকার, গাছপালার সাঁই সাঁই শব্দ আর কড়াৎ করে বাজ পড়ার মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ। সব কিছুই কত সহজে এক নিমেষে তুচ্ছ করতে শিখে গেলাম। কেবল আশঙ্কা ভেতরে, পিলু এখন না জানি কেমন আছে। পিলু তোর এত মাছ ধরার বাই কেনরে! পিলুর ওপর অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছিল—কিছু যদি ওর হয়ে যায় দেখ তোমাকে আমি কি করি। তারপরই মনে হল বাবার যখন ভগবান আছে, তখন খুব একটা কিছু হবে না। শুধু দুর্ভোগ কিছুটা ওর। মনে মনে বললাম, ঠাকুর পিলুকে ভাল করে দাও। ও খুব দুষ্ট ছেলে। ওকে কষ্ট দিও না ঠাকুর। ও সংসারে না থাকলে আমাদের কিছুই থাকবে না। এবং যতভাবে দরকার ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে কখন যে বাড়ির রাস্তায় হাজির টেরই পাইনি। দু-লাফে একেবারে উঠোন ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললাম, জ্যাঠা আসছে। পিলু, এই পিলু। কোন সাড়া দিচ্ছে না। —এই পিলু জ্যাঠা আসছে রে। আর কোন ভয় নেই।

পিলু খুব ক্ষীণ গলায় বলল, দাদা তুই খুব ভীতু। আমার কিছু হয়নি রে!

পিলুকে তো জানি। সে দশটা কথা বললে পাঁচটা মিছে কথা বলে। এখন দাদাকে ঘাবড়ে যেতে দেখেও মিছে কথা বলছে।

নিবারণ দাস ঘরে ঢুকতেই মা উঠে দাঁড়াল। মা একটা কথা বলল না। এতক্ষণ পিলুকে জাগিয়ে রাখার জন্য জোরজার করে বসিয়ে রেখেছে। ঘুমিয়ে পড়লেই সব শেষ! দাস লাঠিটা বেড়ার পাশে রেখে পিলুর কপালে হাত দিল। বলল, ও কি তাত? খুব জ্বর হয়েছে দেখছি! জলে কাদায় ঘুরে বেড়ালে তো জ্বর হবেই কর্তামা। ওকে শুইয়ে দিন।

মা ঘোমটা সামান্য আরও টেনে বলল, কিসে কেটেছে। ও দেখেনি। হাত বেঁধে দিয়েছি।

নিবারণ দাস হা হা করে হেসে দিল। বলল, কর্তামা পোকামাকড়ে কাটলে শরীরে তাপ ওঠে না। কৈ দেখি হাতটা মেজ ঠাকুর? বলে টর্চ জ্বেলে আঙুলের কানা দেখল। টিপে টিপে বলল, বেশ জাঁদরেল মাছ ছিল দেখছি! ধরতে পারলেন না!

পিলু কেমন সাহস পেয়ে গেছে। সে বলল, খুব বড় ছিল। এই বড় জ্যাঠা। মাছটা না.....।

নিবারণ দাস দড়ির গিঁটগুলি খুলে দিতে দিতে বলল, ও কি বেঁধেছেন, হাতে দাগ বসে গেছে! এতক্ষণ বোধহয় হাতটা পিলুর ভীষণ টনটন করছিল, বাঁধন খুলে দিতেই পিলু যেন প্রাণ পেয়ে গেল। বলল, জ্যাঠাকে দেখা না দাদা, কত বড় বড় সিঙ্গি মাগুর ধরেছি। যেন ওর কিছুই হয়নি। মারও মনে জোর এসে গেছে। মা তাড়াতাড়ি মাছগুলি টেনে নিয়ে এনে দেখাল, দেখুন কী কাণ্ড, কত বড় মাছ। নিবারণ দাস বলল, মেজ ঠাকুর আপনার কিছু হয়নি। জলে কাদায় ভিজে জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে। এত বড় বড় মাছ ধরেছেন একটু জ্বর জ্বালা হবে না সে কি করে হয়।

এই বলে নিবারণ দাস গোপালের সঙ্গে বের হয়ে গেল। মা বসতে বলল একটু। আমাকে তামাক সেজে দিতে বলল, নিবারণ দাস জানাল, বাবা এলে বসবেন। তামাক খাবেন। কেমন থাকে পিলু, সকালে একটা খবর দিতেও বলে গেল। মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে একজন ভাল প্রতিবেশী কত দরকার এই প্রথম আমরা টের পেলাম। নিমেষে সব ভয় আতঙ্ক কত সহজে দূর হয়ে গেল। আমার মা দেখলাম আবার বীরাঙ্গনার মতো চলাফেরা করছে। বলছে, ওরে, ঠাকুর শোওয়ানো হয়নি। যা বাবা বৈকালিটা দিয়ে আয়। পিলু তুমি আর বসে থেক না। মায়া কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িঘরে এমন একটা আতঙ্ক এসে ভর করেছিল সে টেরই পায়নি।

কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি প্রদীপটা ঝড়ো হাওয়ায় কখন নিভে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাঁ সাঁ শব্দ খড়ের বাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জোরে কথা না বললে, ও-ঘর থেকে কিছুই শোনা যায় না। ডাকলাম, মা দেশলাইটা দাও। প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অন্ধকারেই দেখলাম দরজায় একটা লম্বা হাত। মা আলো জ্বালাবার জন্য দেশলাই বাড়িয়ে ধরেছেন। আলো জ্বালা হলে দেশলাইটা আবার নিয়ে যাবে। বললাম, তুমি আবার বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছ কেন মা। তোমরা সবাই দেখছি একরকমের। মা হেসে বলল, আমার কিছু হবে না! তুই আলোটা ধরা তো।

প্রদীপটা জ্বাললে দেখলাম, মা আমার প্রণিপাত করছেন। জল ঝড়ে কার উদ্দেশ্যে এই প্রণিপাত জানি। সামান্য দুটো পেতলের মূর্তি সাক্ষাৎ দেবতার মতো মিটি মিটি হাসছেন তখন। শালগ্রাম-শিলার মাথায় তুলসীপাতাটি চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাবার কথা মনে হল। দূর থেকে তিনি কি সব টের পান! তিনি বুঝতে পারেন, আমরা কেমন আছি। বাবা গলায় ঝুলিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমার তালুতে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত সহজে তাকে ধারণ করে আছি। পিলু তখন, চেঁচিয়ে বলছে, দাদা, বাতাসা সব তুই একা খেয়ে ফেলবি না। আমার জন্য রাখিস। বৈকালির গোনাগুনতি তিনটে বাতাসা। এবং আমার পূজার পালা থাকলে, পূজা শেষে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলার স্বভাব আছে। প্রসাদ কণিকা মাত্র, এক কণিকা প্রসাদ দিলে পিলু চিৎকার করে বলত, দেখ মা দাদাটা কি রাক্ষস! সব একা একা খেয়ে আমাদের শুধু হাত ছোঁয়াচ্ছে। বৈকালি শেষে, দুর্লভ তিনটি বাতাসাই ঘরে ঢুকে পিলুর হাতে দিয়ে বললাম, পিলু ওঠ। প্রসাদ নে। বলে তিনটে বাতাসা ওর হাতে দিলে সে খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, কিরে দাদা, সবই আমাকে দিলি। তুই নে মাকে দে। প্রসাদ সবাইকে খেতে হয়। বলে পিলু নিজের জন্য একটা রাখল, মাকে একটা দিল, আমাকে একটা। অন্যদিন আমি

জানি, পিলু কিছুই পেত না, কণিকা ছাড়া, আজ পিলুর চেয়ে আমি সদাশয়। পিলুকে বললাম, আমারটা তুই খা পিলু। আসলে মানুষের ঘরবাড়ির মায়া এমনিতেই বাড়ে। পিলুর মতো আমার একটা ভাই আছে বলেই বাড়ে। কিছুক্ষণ আগে টের পেয়েছি, বাবার ঘরবাড়িতে পিলুর বেঁচে থাকা কত দরকার। সে না থাকলে অন্ধকার কি গভীর তাও জানি! সামান্য একটা বাতাসা দিয়ে তা কেনা যায় পিলুর আশ্চর্য অকৃত্রিম হাসিটুকু না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

সকালেও পিলুর জ্বরটা সারল না। মা গায়ে হাত দিয়ে বলল, দেখি। পিলু হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, বলছি তো জ্বর নেই। মা তবু কপালে হাত রেখে বলল, জ্বর আছে। বের হবে না কোথাও। সকালে কিছু খাবে না। দুপুরে বার্লি। পিলু রেগে গেল। বলল, কিছু খাব না! জ্বর আছে! সে মুখ ভেংচাল মাকে।—আমার শরীর, আমি বুঝি না, তুমি বোঝ।

অগত্যা আমার পালা। হাত দিয়ে দেখলাম, গায়ে জ্বর বেশ। বললাম, যা শুয়ে থাকগে। ঘোরাঘুরি করলে জ্বর বাড়বে।

বেশ রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা সকালের হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। কুকুরটা দু'দিন হল বাড়ি ফিরছে না। বাবার মতো কেমন বাউণ্ডুলে স্বভাবের। এক দণ্ড বাড়ি ঘরে তিষ্টোয় না। কেবল সারা মাঠ, এবং সড়কে ঘুরে বেড়াবে।

গতকাল আমাদের এমন একটা আতঙ্কের দিনেও কুকুরটা রাতে ফিরে আসেনি বলে পিলু বসে বসে গজগজ করছিল। আসলে আমরা বুঝতে পারি কুকুরটা কোথায় আছে খুঁজে দেখার নাম করে পিলু এখন একটু মাঠঘাটে অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে ঘুরে আসতে চায়। আমি বললাম, ঠিক আসবে। যাবে কোথায়!

—এলে দেখ না কি করি! খেতে পাবে না ভেবে পিলুর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। কাউকে সকালে খেতে দেওয়া হোক পিলু এখন সেটাও চাইছে না। পিলুর জ্বরের সঙ্গে সামান্য সর্দি কাশি আছে। সামান্য বাসক পাতার রস দিলে খুব কাজে আসত। বাবা থাকলে কোন ঝামেলা ছিল না। ঠিক জঙ্গল থেকে এটা ওটা খুঁজে এনে রস করে দিতেন। অবশ্য বাবা অসুখের তিন-চারদিন না দেখে কিছু করার পক্ষপাতী নন। আমরা গত শীতে যে সামান্য জ্বর জ্বালায় ভুগেছি তাতে টের পেয়েছি, অসুখ-বিসুখে আমার বাবা বড়ই নিস্পৃহ। কেবল পাঁচদিনের মাথায় যখন সর্দি কফ বুক থেকে নড়ানড়ি করার নাম করছে না তখনই বাবা বলেছিলেন, বাসক পাতার একটা গাছ লাগানো দরকার। বাসক পাতা, তুলসীপাতা, শিউলীপাতা আর আদার রস, একটু লোহা পুড়িয়ে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা বলেছেন, বাসক গাছ কোথায়?

—আরে লাগালেই হবে।

—গাছ লাগাবে, বড় হবে, পাতা হবে, তবে রস হবে। সে তো এ-জন্মে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ধনবৌ তোমার জিভ বড়ই ক্ষুরধার। মা, বাবার এই উক্তিতে খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। জ্বরজ্বালা হলে লোকে ডাক্তার ডাকে। একটা কিছু করে। তা না করে মানুষটা কেবল বসে বসে হিতোপদেশ ঝাড়ে। কিছু বললেই জিভ ক্ষুরধার হয়ে যায়। উচিত কথা বলা যাবে না। মা আর অসুখ-বিসুখ নিয়ে বাবাকে একটা কথা বলেনি। ছ'দিনের মাথায় আমার বুকের কফ নড়ে উঠল। সাতদিনের মাথায় বেশ তরল হয়ে গেল। বাবা স্নান করতে বললেন। অবগাহন স্নান এবং অবগাহন স্নানের পরই শরীর কেমন ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর তিন দিন তিন রাত মানুষের শরীর সম্পর্কে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা কে কি বলে গেছেন, ফাঁকে ফাঁকে তা মার প্রতি সামান্য কটাক্ষ হেনে বলতেন, শরীরের নাম মহাশয়, বাকিটা বলতেন না। যেন ভাবটা এই বুঝে নাও আর সব।

বাবার চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে এটা বোঝা গেল বিকেলবেলায়। বাবা বিকেলের ট্রেনে ফিরে এসে পিলুকে বাড়ি দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। পিলু এমন নিরীহ শান্ত-শিষ্ট হয়ে জলচৌকিতে

বসে আছে, আসলে পিলু না অন্য কেউ, যেন চশমা থাকলে খুলে দেখতেন। বাবার পোঁটলা-পুঁটলি এবার খুবই ছোট সাইজের। বাবা সামান্য নুয়ে বারান্দায় উঠে এলে পিলু বেশ ক্ষীণ গলায় বলল, মা, বাবা এসেছে। আমি ঘরে অঙ্ক করছিলাম। বাইরে বের হয়ে এলাম। আর মা রান্নাঘর থেকেই বলল, বসতে দে। বাবা বুঝতে পারলেন এবারের দোষ ত্রুটি একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেছে। মার অতিথিপরায়ণতা দেখেই বুঝি সেটা টের পেয়েছেন। বের হলে ঘরে ফেরা কবে হবে যেন তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। ঘোরাঘুরি করার সময় মানুষজন, ট্রেনে ভ্রমণ, শিষ্যবাড়ির গুরু ভোজনে মনে থাকে না, বনভূমিতে একটা তাঁর আবাস রয়েছে। চিঠিপত্র দিতেও ভুলে যান। না কি তাঁর মনে হয়, কালই তো ফিরছি, কাল আবার যে কি কালে গ্রাস করে ফেলে, কারণ রোজই তাঁর বাড়ি ফেরার উদ্যোগ আয়োজন করার সময়ই বুঝি মনে পড়ে যায়, লক্ষ্মণ মল্লিকের সঙ্গে কতদিন দেখা নেই, যখন এসেছেন, তখন ঘুরেই যাবেন। এমন সব বহুবিধ লক্ষ্মণ মল্লিক বাবার ঝোলায় রয়েছে। ফলে প্রতিদিনই একবার করে বাড়ি ফেরার তাগিদ, একবার করে লক্ষ্মণ মল্লিকদের তাগিদ। ফলে দুই তরফের ঠোকাঠুকিতে বাবার শেষ পর্যন্ত বুঝি চিঠি লেখাটাও হয়ে ওঠে না। বাড়ি ফিরেই বাবা টের পেলেন, মা আর ধনবৌ নেই, সুপ্রভা দেবী হয়ে আছেন। তখন সামান্য গলা খাকারি দিলেন। মেজ পুত্রটিকে বললেন, তোমরা সবাই ভাল আছ তো? মাকে জ্বালাওনি তো? তবু যখন ভেতর থেকে কোনো উচ্চবাচ্য নেই, আমাকে বললেন, মানুর কাছে গেছিলি? পরীক্ষা কবে জেনেছিস? আমি গেছিলাম কি গেছিলাম না ওটা বড় কথা নয়। আসলে বুঝি বাবা কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না! মায়া তখন বলল, জান বাবা, ছোড়দাকে সিংগি মাছে আঙুল ফুঁড়ে দিয়েছে। দাদার জ্বর হয়েছে।

পিলু বলল, হ্যাঁ বলেছে, আমার জ্বর হয়েছে! না বাবা, কিছু হয়নি। মা আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছে না।

বাবা এবারে বললেন, দেখি কোথায় ফুঁড়েছে।

মা ভেতর থেকেই খুবই নিরুত্তাপ গলায় বলল, দেখা, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী এসেছেন, দেখা।

বাবার মুখটা খুবই অসহায় দেখাল। পিলুর আঙুলটা খুবই ফুলে আছে। বাবা মা'র বিদ্রূপ এতটুকু গায়ে মাখলেন না। আঙুল বিশিষ্ট চিকিৎসকের মতোই টিপে টিপে দেখলেন। তারপর বললেন, ভয় নেই সেরে যাবে। মায়া, একটা ছোট বাটি দিতে পারবি। কারণ বাবা এবং মায়ের মধ্যে অদৃশ্য খোঁচাখুঁচি আরম্ভ হলেই আমরা সংসারে ভীষণ গুরুত্ব পেয়ে যাই। বাবা এখন সব কথাই আমাদের সঙ্গে বলবেন। মাও। যেন বাবা মাকে চেনেন না। অথবা দুজনই দুই বিপরীত মেরুতে বসে অদৃশ্য সুতো জুড়ে আমাদের দিয়ে টরে টক্কা বাজাচ্ছে!

পিলু বলল, বাবা, কাল আমি ভাত খাব?

—খাবে।

বাবা এখন কল্পতরু। সুপ্রভা দেবী বুঝোক সংসারে তাঁর দাম কম নয়। পিলু বুঝি ভাবছে, আর কি চাওয়া যায়। মায়া তখন ছোট্ট একটা বাটি এনে দিলে বাবা কোথা থেকে অনেকটা ভেরেণ্ডার কষ নিয়ে এসে হাতে লেপ্টে দিলেন। বললেন, রাতে শোবার সময় আর একবার। সকালেও দেবে। আঙুলের ফোলা কমলে জ্বরও সেরে যাবে। পরদিন পিলুর জ্বর সেরে যাওয়ায় সুপ্রভা দেবী আবার সংসারে ধনবৌ হয়ে গেল। বাবাকে বলল, কিগো চানটান করবে না! কত বেলা হল? কখন ঠাকুরঘরে ঢুকবে!

বাবা জমিতে গাছপালা লাগাবার সময় কথা কম বলেন। আজ সকাল থেকেই গাছপালা লাগাবার কাজে ব্যস্ত। কত সব শেকড়-বাকড় নিয়ে এসেছেন তিনি, পোঁটলাপুঁটলি খুললে টের পেয়েছিলাম। একটাতেও প্রণামীর কাপড় কিংবা চাল ডাল বলতে কিছু নেই। ছোট ছোট অঙ্কুরের মতো গাছ আর শুধু শেকড়বাকড়। বাবা একটা মূল তুলে রোপণ করছেন আর কাঠি পুঁতে দিচ্ছেন। বলছেন এটা হল হরতকী গাছের চারা। এখানে পুনর্ণবার ঝাড়, এদিকটায় থানকুনিপাতা, এখানে থাকল গন্ধপাদাল। বাসকের ডাল লাগাবার সময় জায়গাটার উর্বরা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। বাবা ডালটা তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কাঠা খানেক জমি জুড়ে তিনি আজ যাবতীয় ভেষজ রোপণে ব্যস্ত। কারো কথায় কর্ণপাত করার সময় এটা নয় বুঝে মা সটকে পড়েছে। কেবল পিলু পাশে দাঁড়িয়ে

দেখছিল। কুকুরটা রাতে ফিরে এসেছে। সে পিলুর পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ছে।

বাবা গাছ লাগাবার সময় কোন গাছে কি ফল দেবে বলে যাচ্ছেন। আর কি ভাবে সংগ্রহ করেছেন, তিনি এই শেকড়-বাকড়ের জন্য কতদূর গিয়েছিলেন তার আদ্যোপান্ত বিবরণ। সব জায়গায় সব গাছ হয় না। কিন্তু এখানকার যা মাটি তাঁর ধারণা সব গাছই ফলবতী হবে। একটা অর্জুনের বিচি পুঁতে বললেন যদি গাছটা হয়, দেখবে কি সুন্দর তার ডালপালা। গাছের ছাল হৃদরোগের মহৌষধ। হালিশহরের পঞ্চানন কবিরাজ বীজ দিল। পঞ্চানন কবিরাজ বলল, কর্তা নিয়ে যান, সব সময় পাওয়া যায় না। সব বীজ থেকে গাছও হয় না। আমার কাছে এই অমূল্য রত্নটি পড়ে আছে এখন কাকে দিই ভাবছিলাম। আপনার মতো সদাশয় মানুষের হাতে বীজ কথা বলতে পারে। নিয়ে যান যদি কথা বলে। পিলুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, তোর কি মনে হয়, গাছটা হবে তো?

পিলু বলল, তুমি লাগালে সব হয় বাবা।

পিলু এই কথাটা যেন আরও জোরে বলে, এমন ইচ্ছাতে বাবা বললেন, তুই কি শরীরে জোর পাস না?

পিলু বলল, পাই তো!

না, ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার শরীরটা ঠিক হচ্ছে না পিলু, ভেতরে ভেতরে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে হয়তো। খাওয়া দাওয়া ভাল দরকার। দুধ খেতে হবে।

দুধ খেতে হবে বললেই আর খাওয়া হয় না। মানুষের ঘরবাড়িতে একটি সবৎসা গাভী কত দরকার পিলুর দিকে তাকিয়ে যেন সেটা মনে পড়ে গেল। বাবা তারপর কি ভাবলেন, দুপুরে খেতে বসে বললেন, বুঝলে ধনবৌ, সবই তো হয়ে গেল, চাঁপাকলার গাছও বড় হচ্ছে। এবারে কার্তিক অঘ্রানে ছড়া পড়বে। চাঁপাকলা দুধ হলে বেশ হয়। বারান্দায় খেতে বসে বাবার দুধ খাবার বাসনার কথা ভেবে মা'র চোখে কি যেন সংশয় দেখা দিল। বলল, এই তো ঘুরে এলে। কটা দিন অন্তত বাড়ি থাক। কারণ মা বুঝি বুঝতে পারে ঠিক সবৎসা গাভীর সন্ধানের অজুহাতে বাবা আবার বাড়ি থেকে উধাও হবার ধান্ধায় আছে।

—পিলুর দুধ খাওয়া দরকার। বাবা নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে পুত্রদের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিতে চাইলেন।

মা বলল, পাবে কোথায়?

সত্যি কথাটা ভেবেই খাবার ব্যাপারে বাবা অত্যধিক মনোযোগী হয়ে গেল।

এতগুলো টাকা একসঙ্গে—না ভাবা যায় না।

পিলু বলল, নবমী বলেছিল, একটা ছাগলের বাচ্চা দেবে বাবা। নিয়ে আসব?

এই নিয়ে বছরখানেক ধরে একটি ছাগলছানা আনার জন্য কতবার বাবার কাছে পিলু আর্জি পেশ করেছে। বারবারই বাবার প্রত্যাখ্যানে পিলু চেয়ে আনতে সাহস পায়নি। মোক্ষম সময় বুঝে আবার পিলু কথাটা পাড়ল।

বাবা বললেন, বামুনের বাড়ি এটা। বামুনের বাড়িতে ছাগল পোষে না!

সুতরাং যতই দুধের প্রয়োজন থাকুক একটা ছাগলছানা তার জন্য এনে হাজির করা যায় না। পিলু কি ভাবল কে জানে, ক'দিন পর ঠিক একটা ছাগলছানা বগলে করে নিয়ে এল। বাবা হয়ত প্রথম বকাঝকা করবে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দরকার আপাতত ছাগলছানাটিকে বাবার চোখের সামনে থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রাখা। আমাদের পাঁচ বিঘে ভূঁইর শেষ দিকে, যেখানে একটা ইঁটের ভাঙা পাঁচিল আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে এখনও গাছপালার জন্য রোদ আসে না, তার পাশে নিরিবিলি একটা জায়গায় ভাঙা ইঁটের খুপরি বানিয়ে ফেলল পিলু। ছাগলের বাচ্চাটাকে কিছু ঘাস দিল খেতে। বাবা সারাদিন ওদিকটায় বড় যান না।

কেন যান না রহস্যটা অবশ্য অনেকদিন পর আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং যেহেতু সেদিকে যান না, পিলুর কাছে সব চেয়ে নিরাপদ মনে হয়েছিল জায়গাটাকে। সে বাড়ির দশটা কাজের কথাও ভুলে গেল। কখন ডেকে উঠবে কে জানে। এই ভয়ে সারাদিন ঘাসপাতা খাওয়াল গোপনে। বাবা যখন

সন্ধ্যায় নিবারণ দাসের আড়তে জম্পেস করে আড্ডা দিতে রওনা হলেন তখনই পিলু ছাগলের বাচ্চাটাকে বগলে করে একেবারে বাড়ির মধ্যে।

এবং আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম, আপাতত বাচ্চাটাকে রান্নাঘরে রাখা যাক। ও-ঘরটায় বাবা পারতপক্ষে ঢোকেন না। কারণ এ এলাকার সবটাই সুপ্রভা দেবীর একান্ত নিজস্ব। ভেতরের দিকে ছোট বারান্দায় খাওয়া-দাওয়া হয়। বাবা শুধু দরজায় উঁকি দিলে দেখতে পাবেন। এতসব ভেবে বাচ্চাটাকে রাখা গেল ঠিক, কিন্তু হলে কি হবে, ছাগলের বাচ্চা, বুদ্ধি আর কতটা হবে, দুপুর রাতে সহসা ত্রাহি চিৎকার। বাবা ধড়ফড় করে উঠে গেলেন। আমরা সবাই। শেয়ালের উপদ্রব হতে পারে ভেবেও পিলু টু শব্দটি করছে না। কারণ বাবার কি মর্জি হবে কে জানে। তখনই বাবা বললেন, কিসে ডাকে।

মা বলল, তাই তো!

বাবার জীব-জন্তুর প্রতি মমতা এমনিতে একটু বেশি। সাপ-খোপের বেলায় এটা যথার্থ টের পেয়েছি। তিনি খুবই উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি লম্ফটা জ্বাল ধনবৌ। মনে হচ্ছে শেয়ালে ছাগলের বাচ্চা ধরেছে। বাইরে বের হয়ে লম্ফের আলোতে কোথায় বাচ্চাটা খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন। কোথা থেকে এল, অথবা এখানে ব্যারেকে যে সুবাদার সাবের ছাগল রয়েছে, বাচ্চাটা তারও হতে পারে, পথ ভুলে চলে আসতে পারে, অন্ধকারে কোথাও ডাকছে তিনি হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন।

আশ্চর্য, পিলু আগের মতোই লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সে উঠছে না, নড়ছে না।

পিলু জোরে জোরে নাক ডাকতে থাকল।

বাবা বললেন, কোথায় দেখছি না তো! রান্নাঘর থেকে বাচ্চাটা মানুষের সাড়া পেয়ে আরও জোর গলায় ব্যাঁ ব্যাঁ করতে থাকল। দু-তরফের ডাকাডাকিতে বাবাকে সত্যি কথাটা বলে দিলে এখন বেশ হয়, পিলুকে জব্দ করা যায়। পিলুর নাক ডাকানি বন্ধ করা যায়—তখনই মা বলল, দাঁড়াও। মনে হচ্ছে রান্নাঘরে আছে। মা রান্নাঘরে ঢুকে গেলে বাবাও ঢুকে গেলেন। বাচ্চাটা দেখে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকলেন বাবা। মেজ পুত্রটির কাজ, ছাগলের জন্য কত হরেক রকমের কচি ঘাস, ছেঁড়া আসন, জলের পাত্র—সাদা রঙের একটা কচি বাচ্চার সেবাযত্নের বহর দেখে বাবা বোধ হয় ধীরে ধীরে সংবিৎ ফিরে পেলেন। কিছু বললেন না। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে বললেন, হয়েছে, এবারে নাক ডাকা বন্ধ কর বাবাধন। সঙ্গে সঙ্গে পিলু কেমন নির্জীব হয়ে গেল। নাক ডাকল না আর।

বললেন, ওঠ। কথা আছে।

পিলু উঠে বসল।

বললেন, নাম এবার।

পিলু নেমে এল।

—কোথা থেকে চুরি করেছিস?

—চুরি না তো বাবা!

—তবে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

—তুমি দেখলে যদি কষ্ট পাও। বামুনের বাড়িতে ছাগল পুষতে হয় না যে বলেছিলে।

—সত্যি, তবে নবমী দিয়েছে? না বুড়িটাকে ঠকিয়েছিস? না বলে কয়ে নিয়ে এসেছিস?

পিলু আমার দিকে তাকাল। পিলুর সাংঘাতিক বিপদের সময় আমি তার বড়দা হয়ে যাই। সেই একবার নবমীর কাছে আমাকে নিয়ে গেছিল। পিলুর প্রতি নবমীর ভক্তি স্বচক্ষে দেখেছি। পিলু আমার দিকে তাকিয়ে আছে—যদি আমি ওর হয়ে কিছু বলি।

বাবা ফের বললেন, একটা গরীব ভিখিরি বুড়ি, তিন কুলে কেউ নেই, জঙ্গলে থাকে, কত কষ্টে থাকে আর তুই না বলে না কয়ে.....

পিলু বলল, আমাকে সত্যি দিয়েছে বাবা। চুরি করে আনিনি।

পিলুর অসহায় মুখ দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। বাড়িঘর হয়ে যাবার পর বাবা মাঝে মাঝে দু-এক ঘা আজকাল পিলুকে দিয়ে থাকেন। এই পুত্রটির উপদ্রবে দু-একজন পড়শী ইতিমধ্যেই নালিশ জানিয়ে গেছে। এখন বাবা বাড়িতে কিছুদিন আছেন বলে, মার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবং এই সূত্রে বাবার শাসনের অধিকার বোঝাই যাচ্ছে আজ একটু বেশি। মাও যে বলবে, হয়েছে থাক, নিয়ে যখন

এসেছে থাক, নবমীকে জিজ্ঞেস করলেই হবে—সেই মাও কেমন চক্রে জড়িত হয়ে পড়ায় পিলুর হয়ে সাফাই গাইতে সংকোচ বোধ করছিল। অগত্যা আর কি করি, বললাম, না বাবা, পিলু, সেই ছেলেই নয়। নবমী ওকে দাঠাকুর ডাকে। নবমীকে পিলু ফল পাকুড় দেয়। পাতা কেটে দেয়। শুকনো কাঠ দিয়ে আসে। শীতে মরে যাবে ভেবে পিলু মাকে না বলে নবমীকে একটা পুরনো শাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এসেছে। মারবে ভেবে মা তোমাকে কিছু বলেনি।

বাবা পিলুকে আর একটা কথাও বললেন না। সহসা পুত্রগৌরবে বাবার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখ বাবার জলে ভার হয়ে গেল। বললেন, তোদের একটু ভাল কিছু খাওয়াতে পারি না। ছাগলের বাচ্চাটা বড় হয়ে যদি একটু তবু দুধ দেয়। তারপর কেমন দুঃখী মানুষের মতো নিজেকে মশারির মধ্যে গুটিয়ে নিলেন। আর বোঝাই গেল না, বাবা আমার এ-বাড়ি-ঘরেই আছেন; এ-বাড়িঘরেই থাকেন।

এই বনভূমিটা তার জঙ্গল গাছপালা নিয়ে আগে একরকমের ছিল, মানুষের বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় এখন অন্যরকমের। দূরে দূরে দরমার বেড়া দিয়ে মানুষজন ঘরবাড়ি কেবল তুলছেই। বনজঙ্গল ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছিল। তবু বাবা তাঁর বাড়িঘরে নিয়ে আসছেন যাবতীয় ফুল ফলের গাছ। যেমন বাবা এর মধ্যে গোটা কয়েক আমের কলম পুঁতেছেন। নারকেল গাছ দুটো। একটা সফেদা ফলের গাছ, পেয়ারা তিনটে, লেবুর কলম কিছু রোপণ করেছেন বাড়িটাতে। আর পেঁপে গাছগুলি বুড়ো হয়ে যাওয়ায় নতুন কিছু পেঁপের চারা। করমচা লাগিয়েছেন টক ডাল খাবেন ভেবে। অর্থাৎ দেশ বাড়িতে বাবার যা কিছু ছিল, এই আবাসে প্রায় তার সবই তিনি এনে হাজির করার চেষ্টা করছেন। কিছুই বাদ দিচ্ছেন না। এক একদিন বাবা ফিরতেন এক এক রকমের গাছের সংবাদ নিয়ে। একবার মাঝে বাবা দশ ক্রোশ দূরে হেঁটে গেছিলেন, শুধু শহরে মানু কাকার এক বন্ধু বলেছিল, বাড়িতে তার একটা জামরুল গাছ আছে। গাছটার কলম বাঁধার জন্য একবার যেমন দশ ক্রোশ হেঁটে গেছিলেন, আবার কলমটি আনার জন্যও তাঁকে দশ ক্রোশ ভাঙতে হয়েছিল।

জঙ্গল সাফ করে যত এগিয়েছি, তত গাছগুলো বাবা পুঁতে গেছেন। শুধু বিঘা দুই ভূঁই শাক-সব্জীর জন্য আলাদা রেখে দিয়েছেন। আর বাবার গাছপালা-অন্ত প্রাণ ছিল বলে, এক একটা গাছের পরিচর্যায় বড় সময় দিতেন। ঋতু বদলের সঙ্গে গাছের গোড়া কুপিয়ে সামান্য শেকড়-বাকড় আলগা করে বর্ষার জল খাওয়াতেন। কোন গাছে কি সার দরকার বাবার চেয়ে কেউ ভাল জানত না। ফলে এই বছর দুই যেতে না যেতেই জমির রুক্ষ ভাবটা কেটে গেছে। ছায়া শীতল এক সুষমা বাড়িটার চারপাশে গড়ে উঠেছে, আমরা ধীরে ধীরে টের পাচ্ছি। আর বাবার সঙ্গে এই গাছপালা, কুকুর, ছাগলছানা বাড়িঘর আমাদের নতুন এক সাম্রাজ্য। দূরে রাজবাড়ি। যেখানে পূজায় মেলা বসে, যাত্রাগান হয়। হাতী দেখা যায়। শহরে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়েদের দেখা যায় ফ্রক পরে স্কুলে যাচ্ছে। নিমতলায় গেলে আজকাল মানুষজনের অনেক মুখ দেখা যায়। আর রয়েছে মাঠ, বাদশাহী সড়ক, ল্যাংড়া বিবির হাতা, বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। পৌষে মেলা বসে। এইসব মিলে আমাদের ঘরবাড়ির চারিদিকে বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য রহস্যময়তা গড়ে উঠেছিল। বাবা কত সহজে আমাদের একটা নতুন পৃথিবী উপহার দিলেন।

যারা বাড়িঘর করছে, অথবা নতুন বাড়িঘর করে চলে এসেছে, তারা অনেকেই সপরিবারে আজকাল আমাদের বাড়ি আসে। মা তাদের বসতে দেয়। বিকেলবেলায় মা মায়াকে নিয়ে কখনও নতুন নতুন বাড়িতে বেড়াতে যায়, গল্প করে এবং কখনও দেখা যায়, ওদের কেউ দিয়ে গেছে বড় একটা লাউ। পঞ্চানন চন্দ, কাঙ্গালী আইচ সকাল হলেই আসে। ঠাকুরঘরের দাওয়ায় মাথা ঠেকে চরণামৃত নেয়। মুখে মাথায় মাখে। ওদের ছেলেরা মেয়েরা মাকে মাসিমা ডাকে। বাবাকে মেসোমশাই। কত দূর দেশে সবার বাড়িঘর ছিল! অথচ সব কিছু ফেলে আসার শোক ক'দিনেই মানুষের বুঝি উবে যায়। নতুন এক জীবন, মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করে নেয়। বাবা ট্রেনে এখন কোথাও গেলে টিকিট কাটেন। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা আজকাল পছন্দ করেন না।

এরই মধ্যে একদিন বাবা একটি খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। এই কাগজ আমরা বাড়িতে বসে গোল হয়ে প্রথম পড়ি। বাবা কাগজটা সারাদিন পড়লেন। পরদিনও পড়লেন। বাবার কাছে খবরের কাগজ পড়াটা একটা সম্ভ্রমের ব্যাপার। বাবা কাগজের খবরগুলি নিয়ে নিবারণ দাসের আড়তে সন্ধ্যায় ঘুরে এলেন। এবং সব খবর দিয়ে ভাব দেখালেন—বাবা খুব হেজিপেঁজি মানুষ আর নন। পূজার মাস আসছে, একটা দুর্গাপূজার বায়না পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় তিনি প্রায়ই বহরমপুরে গিয়ে মানুকাকার বাসায় আজকাল বসে থাকছেন।

আর আসা যাওয়া করতে করতে একদিন বাবা খুব বড় একটা খবর নিয়ে এলেন। বললেন, বুঝলে ধনবৌ, কালুবাবুর মা'র কাজ। খুব দেবে থোবে মনে হয়। বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে হবে। খুবই ধনী ব্যক্তি কালুবাবু। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের খোঁজে এসেছিল মানুর কাছে। তা কালই রওনা হয়ে যাব। মানুকে বলে রেখেছি, শহরেও তো অনেক সার্বজনীন পূজা হয়—একটু খোঁজখবর রাখিস। সোনাতো তো বড় হয়ে গেছে। ওকে তন্ত্রধার করে নেব। কিরে পারবি না?

তন্ত্রধারের কাজ কি আমি জানি। ধুতি পরতে হবে। নামাবলী গায়ে দিতে হবে। দেবীর সামনে আসনে বসে পুরোহিতদর্পণ আওড়ে যাব। মন্ত্র শুনে শুনে বাবা দেবীর নামে মন্ত্রপাঠ করবেন। বাবাকে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। এতসব মানুষের মধ্যে আমি বাবার পুত্র, আমার খালি গা, জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ, দেবীর মুখে গর্জন, ধূপ ধুনোর গন্ধ, চন্দনের গন্ধ আর আমি বাবার পুত্র হয়ে বসে আছি ভাবতেই ভারি বিভ্রমে পড়ে গেলাম। বাবাকে ঠিক আগের মতো আর অত সহজে বলতে পারলাম না, হাঁ পারব বাবা। কি যেন একটা সংকোচ অথবা লজ্জা বলা যেতে পারে মনের মধ্যে তিরতির করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাবা ফের বললেন, অন্য তন্ত্রধার নিলে সে তো ভাগ নেবে। পুরোহিত-বরণ পাবে। পাঁচ দশ টাকা দক্ষিণা পাবে। সেটা তুই গেলে ঘরেই আসবে। কোনো অসুবিধা হবে না। যেখানে ঠেকে যাব, সেখানে একটু ধরিয়ে দিবি।

মা বলল, পূজার দেখা নেই। হবে কি হবে না এখন থেকেই....

—এই তো ধনবৌ, সবটাতেই আগ বাড়িয়ে বাধা। হবে না কে বলেছে! কী হয়নি! তারপর কালুবাবুর মতো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে বাবার চণ্ডীপাঠে আমন্ত্রণ—কোথায় ওঠা গেছে, ধনবৌ বুঝেও কেন যে বোঝে না বাবার মুখ দেখে এমন মনে হল আমাদের।

বাবা ফের বললেন, বিগ্রহের কৃপায় সবই হচ্ছে, বাকিটুকু হবে। একটা গরু হয়ে গেলে দেখবে, তোমার আকাঙ্ক্ষার কত নিবৃত্তি।

আমরা বুঝতে পারলাম, বাবার মনে শুধু এখন একটাই দুঃখ, সন্তানদের পাতে সামান্য দুধ দিতে পারছেন না। দুঃখটা ঘোচাবার তালে আছেন সেটা ক'দিন থেকে বাবার কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারছি। এখন শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার বিষয়।

পিলু পাশেই ছিল। ছাগলের বাচ্চাটার জন্য একটা খোঁয়াড় তৈরি করছে। সে বলল, দাদা না গেলে আমি যাব বাবা। আমি ঠিক পারব।

আমি বললাম, তুই গেলেই হয়েছে! পরের বারে বাবা আর পূজাই পাবেন না।

পিলু বলল, কেন পাবেন না?

মা বলল, লোকে ভাববে ছানাপোনা দিয়ে কি কাজ হয়! আর তন্ত্রধার হেলাফেলার কাজ না! ঠাকুরমশাই-এর কি ভীমরতি হয়েছে!

বাবা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, পারলে পিলুই পারবে। তোকে পিলু আমি সব শিখিয়ে দেব। এবং কথা হল, একটা পুরোহিতদর্পণ বাবা যে-করেই হোক সংগ্রহ করবেন। কোথায় যে পাওয়া যেতে পারে, পঞ্জিকাটা না হয় প্রতিবছর নিবারণ দাসই এনে দেয়, কিন্তু পুরোহিতদর্পণ! বাবার বোধহয় মনে হল, কালুবাবুর কাছে তাঁর এই বাসনা নিবেদন করলে তিনি দয়াপরবশে দিয়েও দিতে পারেন। মানুষই তো দেয়। তবে আর ভাবনা কেন!

অবশ্য বাবার কাছে একটা পুরনো পুরোহিতদর্পণ থাকার কথা। দেশ বাড়িতে দুর্গাপূজা বাঁধা ছিল। আসার সময় ওটা আনতে ভুলে গেছেন, না হারিয়ে গেছে বাবার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল না।

শুধু বললেন, কাল চণ্ডীপাঠ। বোধহয় বাবা এখন মনে মনে হেঁকে উঠবেন, কাল চণ্ডীপাঠ। কতবড় একটা ঘটনা এটা ছেলেরা যদি বুঝতো! বাবা সকাল সকাল স্নান করলেন। ঠাকুরঘরে আরও সকালে ঢুকে গেলেন। একটা নতুন গামছায় বাবার সব অমূল্য গ্রন্থাদি সযত্নে বাঁধা। ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর ওটা রাখা থাকে। বাবার যা কিছু জরুরী কাগজপত্র, সবই ঐ গামছায়। এমন কি দলিল দস্তাবেজ। তাছাড়া বাবার ধারণা, ঠাকুরের মাথার ওপর থেকে হাত দিয়ে কেউ কিছু সরাবার তালে থাকলে, অপহরণকারী ধনে জনে মারা পড়বে। ফলে টাকা পয়সা ঐ একটা গামছায়। ঠাকুরঘরে যেহেতু আমার প্রবেশ করার অনুমতি আছে, সিংহাসনের সবটাই ঘেঁটেঘুঁটে দেখার সৌভাগ্য হয়। বাবার গামছার পুঁটলি খুলে যা যা দেখেছিলাম—একটা তালপাতার পুঁথি। কতকালের জানি না। স্বহস্তে লিখিত কার সেটা বাবা নিজেও জানেন না। বাবার বাবার, না তস্য বাবার, কোন বাবার জানা ছিল না বলে, আমার পিতৃদেব সেটি লাখ টাকার শামিল ভাবতেন। ওতেই পুরো চণ্ডীর বর্ণনা আছে। নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকা, একটা রুদ্রাক্ষের মালা আর নানারকম গাছগাছালির গুণাগুণের একটি বই। দুটো তামার পয়সা। কাশীর কোন এক সাধু বাবাকে দিয়েছিল। এই পয়সার গুণে সংসারে কোনো অপমৃত্যু ঘটবে না। একটা আসন, ওটা কার দেওয়া বাবা আজ পর্যন্ত বলেননি। আসনটাতে বাবা বসেন না। সব সময় তোলা থাকে। আর কিছু লাল নীল পাথর। এগুলি দিয়ে কি হবে বললেও বাবা ভীষণ অহংকারী হয়ে যেতেন। রেখে দাও। তোমাদের কতদিন বলেছি, আমার জিনিসে হাত দেবে না। কিছু ভূর্জপত্র। সঙ্গে আমার আর পিলুর ঠিকুজী কুষ্ঠি। গামছার পুঁটলিটাতে যখন পুরোহিতদর্পণটা নেই, তখন সেটা খোয়া গেছে ধরে নেওয়া গেল। থাকলে ওটা পুঁটলিতেই থাকত।

কোথাও পূজা-আর্চা থাকলে বাবা খুব সকাল সকাল ঠাকুর ঘরে ঢুকে যান। সূর্য উঠতে না উঠতে কোনো দিন পূজাও শেষ হয়ে যায়। সকালে প্রাতঃস্নান সেরে নেন তাড়াতাড়ি। জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করেন। এবং গলায় পৈতার যে কী মাহাত্ম্য বাবাকে এই সময়টায় না দেখলে বোঝা যাবে না। একেবারে পরম নিষ্ঠাবান মানুষ। পৃথিবীতে হিংসা-দ্বেষ আছে, চুরি-চামারি, কোর্ট-কাছারি আছে, যুদ্ধ আছে, সিনেমা-বায়স্কোপ আছে, নাটক-নভেল আছে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না। শুধু ঠাকুরঘর, আমরা ক'জন আর মা'র ব্যস্ততা বাবার ব্যস্ততা, ফুল জল, তিল, তুলসী, দূর্বা প্রভৃতির মধ্যে বাবা একসময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে যখন বের হতেন, তখন হয়তো পিলু দুলে দুলে পড়ছে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বের হচ্ছে সুবাদে পিলুর পড়ায় এত উৎসাহ। যত খুশী থাকবেন, তত তাড়াতাড়ি হবে কাজকর্ম। বের হতে সময় লাগবে না। পিলু সুপুত্র হওয়ার তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত।

আজ বাবার কোথাও যাবার কথা নেই। পূজা-আর্চা থাকলে, ঘটা করে আগের দিনই সবাইকে বাবা জরুরী খবরটা দিয়ে রাখেন। মায়া খুব সকালে উঠে ফুল দূর্বা তুলে রাখে। ভাইটা মা'র সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে ভেবে, আমার পাশে রেখে যায়। বাবাকে জলখাবার যা হোক কিছু, এই মুড়ি খৈ অথবা যবের ছাতু। বাবা যবের ছাতু জলে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতে খুব ভালবাসেন। মাকে তার আগে ঘরদোর লেপে ফেলতে হয়। ঠাকুরঘরের বাসনপত্র মেজে রাখতে হয়। বাবার সঙ্গে মা'রও কাজের তখন অন্ত থাকে না। অথচ আজ এত সকালে কেন বাবা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন বোঝা গেল না। পিলু মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসে, দেখে বাবা ঠাকুরঘরে পদ্মাসনে বসে আছেন। সে ভেবে পেল না, সুপুত্র হবে, না ছাগলটাকে নিয়ে ঘাস খাওয়াবে এখন। বাবার তো যাবার কথা নেই কোথাও। সে তবু খুব ভাল ছেলের মতো বলল, বাবা, তুমি কোথাও যাচ্ছ?

—কেন রে?

—না এমনি, এত সকালে ঠাকুরঘরে তুমি.....

বাবা বললেন, পড় পড়। লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। কেবল আমি কখন বের হব সেই তালে থাকে।

পিলু ধরা পড়ে গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেল। সে পড়তে থাকল গলা ফাটিয়ে।

ছাগলের বাচ্চাটা কি মরে গেছে! কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দু-পাতা পড়ে মাকে বলল, বাচ্চাটা রা করছে না কেন মা?

বাবা ঠাকুরঘর থেকেই বললেন, বাচ্চাটা রা করছে না কেন তা তোমার মা কি করে বলবে?

—আমি একবার দেখে আসব?

বাবা বুঝতে পারলেন বুঝি পুত্রটি বাচ্চাটা সম্পর্কে নাছোড়বান্দা। বললেন, দেখে আয়। না দেখলে তো শান্তি হবে না। দেখে এস। তারপর একটু পড়ে আমার ঘরবাড়িকে উদ্ধার কর।

বাচ্চাটা দেখে এসে পিলু বলল, খুব খিদে পেয়েছে বাবা।

কার খিদে পেয়েছে, পিলুর না বাচ্চাটার ঠিক বোঝা গেল না। বাবা তখন পূজায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। এখন পিলু পড়ল কি পড়ল না, সংসারে কোথায় কি হচ্ছে জানার কোনো উৎসাহ নেই। তিনি আচমন করার পর কোনো কথাই বলবেন না। তারপর গণেশের পূজা আরম্ভ হবে। বাবা জোরে জোরে বললেন, খর্বং স্থূলতং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদর সুন্দর এবং আরও সব মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হলে পিলু বইটই ভাঁজ করে প্রথম কুকুরটাকে ডাকল, মনা মনা। মনা তো ছুটে এসে পায়ে গড়াগড়ি। সে এবার বাচ্চাটাকে বগলে নিল। পিলুকে বের হয়ে যেতে দেখে মা আর চুপ করে থাকতে পারল না—পিলুরে তোর কি হল? সাত সকালে কিছু মুখে না দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিস। তোর বাবাকে ডাকবো! পড়াশুনা লাটে ওঠালি!

পিলু জানে সব অহেতুক। বাবা আর কথা বলছেন না। যতই মা চেঁচামেচি করুক বাবা পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বাক্য নয়। কটু বাক্যও নয়। বরং মা'র চেঁচামেচি যত আরম্ভ হবে, বাবার মন্ত্রপাঠের স্বরগ্রাম তত উঁচুতে উঠবে। ততক্ষণে মাও আরম্ভ করে দিয়েছে যেমন বাপ, তেমন ছেলে। একটা কথা বলছে না! হ্যাঁগো শুনতে পাচ্ছ, পিলু দ্যাখো কোথায় বের হচ্ছে।

—কোথায় বের হব আবার! বাচ্চাটার খিদে পায় না! একটু ঘাসপাতা ছিঁড়ে খাওয়াব তাও তোমার সহ্য হয় না মা। না খাইয়ে শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই বাচ্চাটাকে মারবে!

অকাট্য কথা। বাচ্চাটা খেল কি খেল না সংসারে আর কারো দেখার অবসর নেই। সেই দেখে থাকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে না খাইয়ে মেরে ফেলে সে তো পাপের ভাগী হতে পারে না। সুতরাং সে সোজাসুজি কিছু গ্রাহ্য না করে বের হয়ে গেল। বগলে ছাগলের বাচ্চা, পায়ে পায়ে কুকুরটা। পিলু এখন সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছে। ঘরবাড়ির প্রতি তার এখন এতটুকু আকর্ষণ নেই। বাবা যতই মন্ত্রপাঠ করুন, যতই রাগে দুঃখে স্বরগ্রাম একবার উঁচুতে একবার নিচুতে নামিয়ে আনুন, পিলুর কিছু আসে যায় না। আসলে সে বাবাকে বোবা বানিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে। ফিরে আসার পর এই বাবা আর সেই বাবা থাকবেন না। এইটুকুই পিলুর ভরসা। সে এখন পরিত্যক্ত বনভূমিতে, নবমীর ইঁটের ভাটায়, ঝোপ জঙ্গলে রাজার মতো ঘুরে বেড়াবে। আমরা বুঝে নিয়েছি, বাবা বিদেশে, পিলু স্বদেশে দু'জনই সমান। দুজনে কোন ফারাক নেই। পিলু ফিরে এলে মা'র সামনে বাবার তখন কোন সাহসও নেই কিছু বলার। কারণ কোথাকার জল কতদূর গড়াবে কেউ বলতে পারে না। বোবার শত্রু নেই। এই মহামন্ত্র সম্বল করে বাবা তখনকার মতো সব সামলে নেবেন।

এইভাবে আমাদের দিন যায়। বাবা কালুবাবুর মা'র কাজে চণ্ডীপাঠের জন্য সকালে রওনা হয়ে গেলেন। বেলডাঙ্গা থেকে বাবাকে সাত ক্রোশের মতো পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালের ট্রেনে স্টেশনে নামলে, রাতে রাতে পৌঁছে যাবেন। পরদিন কাজ। বাবা নামাবলী গায়ে বগলে পুঁথি, হাতে ব্যাগ। আমরা বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছি। বাবা যেতে যেতে পিলুকে অমৃতবাণী শোনাচ্ছিলেন। পিলু এক কান দিয়ে শুনছে, অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে।

বাবা বললেন, তোমরা ভাল হয়ে থেকো।

পিলু বলল, থাকব বাবা।

—মা'র কথা শুনবে।

পিলু বলল, তুমি কবে ফিরবে বাবা?

খুবই বিস্মিত গলায় বাবা বললেন, কাজ হলেই ফিরে আসব।

—কবে কাজ শেষ হবে বাবা?

—কালই হবে।

—কতদিন লাগবে ফিরতে?

মনে হল বাবা হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। বললেন, কালই ফিরে আসতে পারব বোধহয়।

আমি বললাম, বোধহয় কেন বাবা?

আসলে এত সব প্রশ্ন করার সাহস আমার কিংবা পিলুর কারো নেই। বাবা আমার দিকে তাকালেন। পিলুটা না হয় বেয়াদপ হয়ে গেছে, মায়ের আসকারাতে জাহান্নমে যেতে বসেছে, তাই বলে তুমিও। বাবা আমার দিকে তাকিয়েই কিছু আঁচ করতে পারলেন। বললেন, তোমার মাকে বল, কাল রাতেই ফিরব।

সকাল থেকেই মা'র সঙ্গে বাবার বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। কেন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে আমরা দু ভাই আজকাল কিছুটা বুঝি। আজকাল মা মাঝে মাঝে কেন যে যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে যায়! কেবল গজগজ করে। কথা দিয়ে বাবা কথা রাখে না, একটা মানুষ বাইরে বাইরে ঘুরলে, খবর না পাওয়া গেলে কত চিন্তা হয়, মানুষটার যদি সেই আক্কেল থাকে! ছেলেরা বড় হয়ে গেল, এই ধরনের অজস্র কথা, আর যত অভাব তখন মা'র বেড়ে যায়। মা খুব সামান্য উপকরণ সম্বল করে বাবার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে তখন।

বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম আমরা। বাবা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। আমাদের দিকে হাত তুলে বললেন, বাড়ি যা। রাস্তায় অন্য সব অনেক কাজের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে আমার বড় কাজ মানুকাকার কাছে যাওয়া। বাবার জন্য কার কি হয় জানি না, আমার ভারি কষ্ট হয়। গতকাল বাবা সারাদিন চণ্ডীপাঠ করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। সংসারে কি হল না হল, একবারও মুখ বার করে দেখেননি। পিলু কখন ফিরে এল, কখন কে খেল, ভাইটা এখন হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, সেই ভাইটা দুবার ঠাকুরঘরে মুখ বাড়িয়ে ডেকেছে, বাবা, বাবা, কোনো উত্তর দেননি। চণ্ডীপাঠের মধ্যে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে মা না পেরে আমাকে বলল, দেখ তো তোর বাবার বাহ্যজ্ঞান আছে কি না? আমি মা'র কথায় কোনো গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু মা না খেয়ে বসে আছে। বাবা বাড়ি থাকলে যতই বেলা হোক মা খায় না। বাবার খাওয়া হলে মা পাতেই বসে যায়। বেলা পড়ে গেছে কখন, গাছের ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে এবং যখন সাঁজ নেমে আসার দেরি নেই, তখনই মা না পেরে কথাটা আমাকে বলেছিল। মা'র কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায়, পিলু দেখলাম দায়িত্বটা সহজে নিয়ে নিল। সে সোজা ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে ডাকল, বাবা।

বাবা চোখ উন্মীলন করে সামান্য তাকালেন। তারপর ফের চোখ বুজে চণ্ডীপাঠে লিপ্ত হতে গেলে, সে বলল, বাবা।

বাবা সোজা হয়ে বসলেন।

পিলু বলল, মা জানতে চেয়েছে....

বাবা তাকিয়েই আছেন। বোধহয় সামান্য বাকি আছে। সেটুকু শেষ করে কথা বলবেন।

পিলু শেষ করল কথাটা, মা জানতে চেয়েছে, তোমার বাহ্যজ্ঞান আছে তো!

বাবা চণ্ডীপাঠ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন। শুধু বাইরে এসে বলেছিলেন, চণ্ডীপাঠে ঘরবাড়ির সব অকল্যাণ দূর হয়। জীবনে খাওয়াটাই সব নয়।

মা খোঁচা হজম করে গেল। তখনকার মত কিছু বলল না, পরে বাবাকে খেতে দিয়ে নিজে আর খেল না। খাওয়া নিয়ে খোঁটা শেষ পর্যন্ত! বাবা তারপর সাধ্য সাধনা করলেন অনেক। মা'র দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। এবং আজ সকালেও অভিমানবশে মা জলগ্রহণ করেনি। বাবার অনেকদূর পর্যন্ত যেতে হবে বলে জলগ্রহণ না করলে চলে না। বাবার জন্য মা সবই রান্নাবান্না করেছে। বরং অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিই করেছে, নিজে খায়নি। বাবা বলেছেন কপাল। দুর্ভাগ্য বলতে পার। আমাকে বলেছে, তোমার মা'র সবই ভাল, তবে বড্ড জেদ। যাই হোক, আমি তো কাজে যাচ্ছি, খেতে বল। না খেয়ে যেন থাকে না। গৃহলক্ষ্মী অভুক্ত থাকলে ঘরবাড়ির অকল্যাণ হয়।

বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কবে ফিরবে কিছু বলে গেল?

পিলু বলল, কালই।

—আর কাল! মা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমি বললাম, বাবা বলেছে তোমাকে খেয়ে নিতে। না খেয়ে থাকলে নাকি অকল্যাণ হয়।

বাবা বাড়ি নেই বলে মা'র কাজে কর্মে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। প্রথম দাওয়ায় বসে রাস্তায় বাবার সঙ্গে আমাদের কি কি কথা হল সব শুনল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হরেন মল্লিক এসেছিল। মঙ্গলচণ্ডী পূজা।

বাবা বাড়ি না থাকলে সাধারণ পূজা-আর্চার কাজ এখন আমাকেই করতে হয়।

পালা-পার্বণে বাবা আজকাল একা পেরে ওঠেন না বলে, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজার সময় বাড়ি বাড়ি আমিও যাই। প্রথম প্রথম খুবই ভুল হত। বাচ্চা ঠাকুর বলে যজমানরা ক্ষমাও করে দিত।—ও কর্তা সংকল্প করলেন না। ও কর্তা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন না। মূর্তি পূজা থাকলে প্রায়ই ভুল হত চক্ষুদানের সময়। কাজল যেমনকার তেমন পড়ে থাকত। একটুও আঁচড় পড়ত না। মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ গুলিয়ে ফেলতাম—মনে থাকত না, বাবার কথামত তখনই গায়িত্রী জপ করে সংকট থেকে ত্রাণ পেতাম। বাবার মতে গায়িত্রী পাঠের মতো মহামন্ত্র আর কিছু নেই। বামুন ঠাকুরের ওটা ব্রহ্মাস্ত্র বলতে পার। সুতরাং পূজায় অসুবিধায় পড়লেই বাবার ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করতাম। ফলে পূজা-আর্চায় ভয় ভীতির চেয়ে, খেয়ে না থাকার কষ্টটাই বেশি। যেমন এই এখন, আমাকে স্নানটান সেরে সড়কের ও-পাশে যে নতুন কলোনি হয়েছে, যেখানে হরেন মল্লিকরা থাকে সেখানে ছুটতে হবে। তারপর বাড়ি ফেরা বাড়ির বিগ্রহে ফুল জল দেওয়া এবং এত সবের পর খাওয়া। দুপুর গড়িয়ে যাবে। মেজাজটা খুবই বিগড়ে গেল। বললাম, পিলুকে বলো করতে। আমি পারব না।

পিলু এক পেট খেয়ে এক পায়ে খাড়া। কারণ দ্বিতীয়বারের সময় হতে হতে সে দুটো পূজাই শেষ করে ফেলতে পারবে। পূজা করার সময় সে বিধি বিধান গ্রাহ্য করে না। মোটামুটি গণেশের পূজা আর পঞ্চদেবতার পূজা জানা আছে। বাকিটা তো এষ গন্ধ পুষ্প, অথবা দীপায় নম, নৈবেদ্যায় নম—আর বামুন ঠাকুর যা বলবে—সবই ঈশ্বর দু হাত পেতে করজোড়ে গ্রহণ করবে—সুতরাং তার ভয় ভাবনা এত কম যে, মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানের সময় সে অত্যন্ত তদ্গতচিত্তে গণেশের ধ্যান জপ করে যাবে। বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না কারো যে সে এক দেবতার পূজা করতে এসে অন্য দেবতার পূজা সেরে উঠে যাচ্ছে।

চুল বড় চোখ বড় পিলুর। চোখ দুটোতে ওর আশ্চর্য এক ভালবাসা। সব কিছুতেই সে পা বাড়িয়ে থাকে। পেট ভরা থাকলে, সব কাজই সে কত সহজে করে আসতে পারে। চারপাশে তাকালে বোঝা যায় পিলু সব সময় এই বাড়ি-ঘরের জন্য ঠিক বাবার মতো অহংকারী।

আমি বললাম, তুই তো ঠিক মন্ত্র পড়িস না!

—কে বলেছে!

—তুই লক্ষ্মীর ধ্যান জানিস?

—হ্যাঁ।

—বল তো।

—ওম পাশাক্ষ মালিকাম্ভুজ...এইটুকু বলেই বলল, তারপর কিরে দাদা?

—ঐ তো!

—কেন বাবা তো বলেছে না পারলে, গায়িত্রী পাঠ করতে।

—তাও তুই করিস না।

—দক্ষিণা কম দিলে কি করব?

—দক্ষিণার সঙ্গে পূজার কি সম্পর্ক রে!

—বারে সব জিনিসের দামদর থাকে, খাঁটি জিনিসের এক দাম, ভেজাল জিনিসের এক দাম, দক্ষিণা কম দিলে কম মন্ত্র, বেশি দিলে বেশি মন্ত্র।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে বললাম, শুনছ মা, পিলু কি বলছে!

মা বলল, ঠিকই তো বলছে। তোমার বাবার মতো হলে সংসার চলে না।

সুতরাং ঠিক হল, পিলুই যাবে হরেন মল্লিকের পূজা সারতে। আমি যাচ্ছি না। সে কিছুক্ষণ ঘাসপাতা

সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকল। ছাগলের বাচ্চাটা এই পরিবারের আর একজন হয়ে গেছে। তার নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছে পিলু। অনেক ভেবেচিন্তে নাম রেখেছে রত্না। গতকাল থেকেই সংসারে পিলু, মায়ার মতো, মনার মতো বাচ্চাটা আমাদের এক পরিবারভুক্ত জীব। পিলুকে যদি কেউ বলে সংসারে তোমরা ক'জন প্রাণী, সে গর্বের সঙ্গে বলবে আটজন। দেশ থেকে আসার পর আরও দুজন বেড়েছে।

এবং পিলু বাচ্চাটাকে ঘরবার করে থাকে। একটা বস্তা বিছিয়ে দেয়। হেগে মুতে বস্তাটা নোংরা করে ফেলে বলে, সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল পিলু রত্নাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রত্নাকে বলছে, তোমার বড়ই স্বভাব খারাপ। মুতে নাও বলছি। রত্না যত ঘরের দিকে ছুটতে চাইছে, তত শক্ত হাতে দড়ি ধরে রেখেছে। বলছি না মুতে নিতে। মুতে নিলে রান্নাঘর নোংরা হয় না।

দু'দশবার বলার পর সত্যি রত্না শিরদাঁড়া লম্বা করে দিল। এবং মুতে দিল। পিলুর অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসি। এই সংসারে মনার মতো রত্নাও তার কথাবার্তার মানসম্মান রাখছে। সে ঘরে নিয়ে রত্নাকে শুধু বেঁধেই রাখল না, রাতে খিদে পেলে যাতে খেতে পায়, সেজন্য কিছু ঘাসপাতা দড়িতে বেঁধে মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখল। ঘুম ভাঙলে চেঁচেমেচি করার সুযোগ পাবে না। সামনে দেখতে পাবে কচি ঘাসপাতা। শুধু একটাই ভয় পিলুর, শিয়ালে না নিয়ে যায়। এ জন্য সে মনাকে কয়েকবার শাসিয়েছে। পাহারা দেবার জন্য রান্নাঘরের ঠিক দরজার সামনে শুয়ে থাকতে বলেছে। এবং রাতে যখন পড়াশোনা সেরে খেতে বসেছি, দেখি, ঠিক রান্নাঘরের দরজার এক পাশে মনা মুখ তুলে বসে আছে। পিলু কিছুটা খেয়ে বাকিটা তুলে নিয়ে গেল। মনাকে খাইয়ে বলল, কোথাও যাবে না। তোমারও দেখছি বাউন্ডুলে স্বভাবে পেয়েছে। যখন খুশি যেদিকে চলে যাও। ঘরবাড়িতে ফেরার কথা মনে থাকে না।

মা বলল, তোমরা সবাই একরকমের। শুধু মনাকে দোষ দিয়ে কি হবে।

তারপর আমাদের এই বাড়িঘরে রাত ক্রমে গভীর হতে থাকে। টের পাই রত্না চোখ বুজে জাবর কাটছে, মনা ঘরের দাওয়ায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, একটা পাতা পড়ার শব্দে সতর্ক, কান খাড়া হয়ে উঠছে। বাড়িঘরের গাছগুলি বর্ষার জল পেয়ে সতেজ—বনভূমিটা পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে। আর ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে টোপরের মতো বাড়িটা তুলে নিতে পারছে না। মা শুয়ে শুয়ে কেবল সারাক্ষণ আমাদের সুসময়ের গল্প বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গল্পে সারাক্ষণ বাবার কথায় ঘুরে ফিরে আসছিল। বুঝতে পারি মা বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। মা হয়ত ঘুমিয়েও বাবার স্বপ্নই দেখছে। স্বপ্নে বোধহয় এই ঘরবাড়ির মাথার ওপর রয়েছে তেমনি আকাশ, দূরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জ। বাবা নীলবাতি হাতে মাঠ পার হয়ে ক্রমে বাড়িঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

যথারীতি বাবা তাঁর কথামত রাতে ফিরে এলেন না। মানুষটা আসবে ভেবে মা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিল। আমি রাত জেগে অঙ্ক কষছিলাম। বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা দরজায় হেলান দিয়ে—কেমন নিরুপায় রমণীর মতো মুখ তাঁর। মাঝে মাঝে উঠোনের দিকে চোখ সরে যাচ্ছে। কোনো শব্দে মা সতর্ক হয়ে উঠছে। এবং সারা মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ডুবে। উঠোনে জ্যোৎস্না। গাছের মাথায় বনভূমিতে জ্যোৎস্না। যেন জ্যোৎস্না নিরিবিলি আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু বাবা ফিরে আসেনি বলে সবই কেমন অর্থহীন মায়ের কাছে।

একসময় বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড় মা।

মা বলল, দেখি আর একটু।

সুতরাং আবার দুটো ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করে বর্গমূলে চলে এলাম। মা একসময় কেমন ছোট্ট বালিকার মতো উবু হয়ে বসল। আমার বইগুলির পাতা উল্টে গেল অযথা। বইয়ের ছবি দেখল। এক একটা ছবির নিচে কি লেখা আছে পড়ল। যেহেতু বইয়ের তাকটা সামনে, বইগুলি নামিয়ে আবার সুন্দর করে ভাঁজ করে তাকে সাজিয়ে রাখার সময় কেমন ছোট্ট বালিকা হয়ে গেল। মা'র পাশে বসে থাকতে এখনও আমার ভাল লাগে। মায়ের শরীরে এক আশ্চর্য ঘ্রাণ। অঙ্ক কষতে খুবই ভাল লাগছিল। বুঝতে পারি মা আমাকে মাঝে মাঝে সহসা চুরি করে দেখছে। মুখে সামান্য গোঁফের রেখা,

আমি বাবার মতো বড় হয়ে যাচ্ছি, বোধহয় মা'র কোথাও ভেতরে সন্তান বড় হলে যে সুখ অথবা বাবার মতো একজন পুরুষমানুষ আমার মধ্যে জেগে উঠছে ভেবে কেমন মুহ্যমান। জননী গো বলতে ইচ্ছে হল একবার। আর তখনই মা'র দু ঠোঁট ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মা'র দু চোখ কি এক বেদনায় ভার হয়ে গেছে। বললাম, বাবা ঠিক আসবে।

মা উঠে পড়ল। উঠোনে নেমে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এমনটা তো আমার মা ছিল না। বাবা ফিরে না এলে কখনও এমন বিচলিত বোধ করেনি। উঠোনে নেমে বললাম, বাবা তো প্রায়ই দেরি করে আসে। তবে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মা বলল, তোরা বড় হয়ে যাচ্ছিস।

বড় হয়ে যাচ্ছি বলে মা'র ভয়টা কোথায় বুঝতে পারলাম না। আমরা বড় হব না কাজ করব না, বাবার দুঃখ ঘোচাব না—তবে মানুষের ঘরবাড়ি দিয়ে কি হবে!

মা লালপেড়ে শাড়ি পরেছে। মাথায় ঘোমটা। আকাশ নীল এবং কোথাও ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। বাবার গাছপালা মা'র চারপাশে কেমন প্রহরীর মতো সজাগ! তখন মা বলল, বড় হলে তোরাও তো তোদের বাবার মতো হবি। যাবি আর ফিরতে চাইবি না।

তখন বাড়িঘরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি কেউ আমায় দূরে ডাকে। সংগোপনে শহরের সেই ব্যালকনিটা মগজের মধ্যে ভরা থাকে। পায়ের কাছে গোলাপের টব। ইজিচেয়ারে বালিকা ফ্রক গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। শীতের পাখিরা আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা পালক নেমে আসে এবং জীবনের অর্থ পাল্টে যায়। বালিকার জন্য বুকে আমার কোথায় যেন টান ধরে গেছে। নিশীথে লণ্ঠনের আলোতে মা আমার মুখ দেখে ধরে ফেলেছে সেটা। বড় হয়ে যাচ্ছি ভেবে দুঃখটা কোথায় মা'র টের পেয়ে বললাম, মা তুমি ভেব না, আমরা এই বাড়িঘরেই থাকব।

মা'র মুখে অদ্ভুত কুট হাসি ফুটে উঠল। জ্যোৎস্নায় সেই হাসিটুকু আমাকে সত্যি কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। একটা কথাও আর মাকে বলতে পারলাম না। চুপচাপ ঘরে ঢুকে মাথা গুঁজে থাকলাম। যেন আমি সত্যি এখন আগের মতো এই বাড়িঘরের জন্য টান অনুভব করি না। কেউ নদীর পাড়ে, অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে এখন আমাকে নিয়ে হারিয়ে যেতে চায়। মা সেটা টের পেয়ে ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

তারপর মাও আর আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। খেয়ে নিল। দরজা বন্ধ করে দিল। মশারির ভেতর ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, শুয়ে পড়ার সময় আলোটা কমিয়ে রাখিস। নিভিয়ে দিস না।

মা'র আশা যে কোনো মধ্যরাতে বাবা ফিরে আসতে পারে। আলোটা সে জন্য কমিয়ে রাখতে বলল।

শুয়ে পড়ার সময় মনে হল, খুবই নিস্তব্ধ ধরণী। এমন কি কোনো কীটপতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মা যে ঘুমোয়নি টের পেলাম, কারণ শুয়ে পড়ার সময় মা বলল, দরজায় খিল দিয়েছিস তো।

বললাম, হ্যাঁ মা দিয়েছি। খুব সকালে ডেকে দিও।

—সে দেব। তুমি এখন ঘুমোও।

রাত থাকতে উঠে আবার অঙ্ক নিয়ে বসব ভেবেছি। আসলে এখন বুঝতে পারছি, অঙ্কটা আমার আদৌ করা হয়নি। পরীক্ষার দেরি নেই। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক খবর আসবে কোথায় কবে পরীক্ষা। হপ্তা দুই হয়ত সময় পাব আর। যে করেই হোক দশটা বিষয়েই পাস করতে হবে। নটা বিষয়ে পাস বাবার আমলে চলতে পারে, এই আমলে দশটা বিষয়ে পাস খুবই জরুরী।

পরদিনও বাবা এলেন না। সকাল সকাল বহরমপুরে কাকার কাছে গেলাম। পরীক্ষা কবে, কোথায় জানা হয়ে গেল। পরীক্ষার সিট পড়েছে কলকাতায়, দ্বারভাঙা হলে। কলকাতা খুবই বড় শহর, মানুকাকা এমন বলেছে। সেখানে কোথায় উঠব, কার কাছে উঠব এই নিয়ে কাকা কিছুক্ষণ সমস্যা বোধ করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, নীলমণির দাদা তো কলকাতায় থাকে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওখানেই তোমাকে উঠতে হবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। পিলুর সোজা পথটায় না এসে ঘুরে এলাম। ও-পথটায়

সেই ব্যালকনি—টবে গোলাপের গাছ, সামনে ছোট্ট বাগান এবং জানালায় বালিকার মুখ। ওদিক দিয়ে গেলে শুধু একবার সেই বালিকাকে দেখতে পাব ভেবে ঘুরে এসেছি। সে নেই। তাকে দেখতে না পেয়ে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। মানুষের বড় হতে হতে কি যে সব হয়। সারা রাস্তাটা বড়ই দীর্ঘ মনে হয়েছিল। মা বাবা ভাই বোন বাদে কোথায় যেন আরও একটা ছোট্ট পৃথিবী বাবার মতো আমি এখন কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাড়ি এসে দেখলাম, মা বেশ উগ্রচন্ডা। মা ভীষণ গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। পিলুকে সকালে বেদম প্রহার করেছে। মায়া ভয়ে ভয়ে মা'র কাছে ঘেঁষছে না। ছোট ভাইটা পড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছে। সকালে যারা দিনক্ষণ তিথি-নক্ষত্রের খবর জানতে বাবার কাছে আসে তাদের সবাইকে বলে দিয়েছে, বাড়ি নেই। কবে ফিরবে বললে জানিয়েছে, সে তেনার মর্জি। অন্যদিন সকালে বাবার এসব কাজ আমিই করে থাকি। তিথি নক্ষত্র শুভদিন পঞ্জিকায় লেখা থাকে। কেউ ফিরে যায় না।

ফিরতেই মা বলল, তোর মানুকাকা কিছু বলল?

—কলকাতায় সিট পড়েছে।

—তোর বাবার কথা কিছু?

বুঝতে পারলাম, মা এখন বাবার খবরের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আমার পরীক্ষা নিয়ে মা'র কোনো মাথাব্যথা নেই। কি বলি!

একটু ঘুরিয়ে বললাম, কালুবাবু খুব সদাশয় লোক। বাবার মতো মানুষকে পেয়ে ছাড়তে চাননি। দু-একদিন হয়ত ঘুরে ফিরে কালুবাবুর ঘরবাড়ি, চাষবাস দেখছেন।

—মানুকাকা তোমায় কি বলল?

—এই তো বলল।

—বেশ। তাহলে তোমরাও এবার সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি গিয়ে ওঠ। সংসারে আমার আর কারো দরকার নেই।

বাবার ওপর এই প্রথম কেন জানি আমারও ভীষণ রাগ হল। সত্যি তো, আগে একরকমের দিন ছিল, কোথায় কে থাকছে, খুব একটা ভাববার ছিল না। বরং বাবা কোথাও গেলেই কিছু তখন হয়ে যেত। এখন কেন জানি মা'র এবং আমাদেরও সময় মতো বাবা না ফিরলে চিন্তা হয়। বাবা সেটা কেন যে বোঝেন না। মানুষের বাড়িঘরও হবে, বাউন্ডুলে স্বভাবও থাকবে সে হয় না। দুটো একসঙ্গে মানায় না। মা বোধহয় সেজন্যই বাবার ওপর এবার হাড়ে হাড়ে ক্ষেপে গেছে।

মা বলল, তুমি বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে পারবে?

—কোথায় যাব?

—সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি।

—কত দূ...র! সাত ক্রোশ রাস্তা, সোজা কথা!

—স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ দূর হয়ে গেল!

অগত্যা আর কি করা! বললাম যাব।

—কালই সকালে রওনা হয়ে যাবে।

এ সময় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পিলুটা মার খেয়ে বাড়িঘরের কাছে পিঠে নেই। মায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাইটা মায়ার কোলে। সবাইকে মা সকালে বাড়িছাড়া করেছে। কেবল আমি বাকি। এ সময় কিছু বুঝিয়ে বলাও নিরর্থক। সব কিছুরই মা এখন অন্যরকম অর্থ দাঁড় করাবে। বললাম, ঠিক আছে, যাব।

তারপরই বাবাকে উপলক্ষ করে সেই গজগজ করা, ছেলেরা মানবে কেন! ছেলেরা ভাল হবে কোত্থেকে। সব একরকমের। আমি না হয় কেউ না। ছেলেদের কাছে পর্যন্ত কথা রাখলে না।

মা'র আঘাতটা কোথায় এতক্ষণে ধরা গেল। আর তখনই দেখি দূরে পিলু চিৎকার করছে, মা বাবা আসছেন। মা বাবা একটা গরু নিয়ে আসছেন।

মা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আমিও। পিলু মাঠ পার হয়ে জোরে ছুটে আসছে। আর চিৎকার—

বাবা গরু নিয়ে আসছেন।

বাবা অথবা গরু কিছুই রাস্তা থেকে দেখা গেল না। পিলু খবরটা দিয়েই ফের উল্টো মুখে ছুটতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে পিলু মাঠঘাট পার হয়ে বাদশাহী সড়কে উঠে গেল। আশ্চর্য দ্রুতগামী পিলু। তাকে দৌড়ে নাগাল পাওয়া খুবই অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে, আবার দেখা দিতে পারে। আর এত বড় একটা খবর, একটা সত্যি সত্যি আস্ত গরু বাবা নিয়ে আসছেন, সে স্থির থাকে কি করে! ডাকলাম, পিলু দাঁড়া।

আমার ডাকে সে সহসা ঝোপঝাড়ের ফাঁক থেকে উঁকি দিল। বলল, আয়। তারপরেই ডুব। রাস্তার দিকে না গিয়ে সে লেংড়ি বিবির হাতার দিকে ছুটছে। আবার ডাকলাম, দাঁড়া পিলু।

মা সেই বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। মায়া কিছুটা মাঠের মধ্যে আমি কালীর পুকুর পার হয়ে গেছি— পিলু আরও আগে। সে কোথায় বাবাকে দেখেছে, কতদূরে বোঝা যাচ্ছে না। না কি পিলুর সংশয় আছে, বাবা এই ফাঁকে না আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবা যা একখানা মানুষ! বাবার জন্য সকালে মায়ের জ্বালায় সে বাড়িছাড়া, সেই বাবাকে যখন কোথাও একটা আস্ত গরুর সঙ্গে আবিষ্কার করা গেছে তখন আর কিছুতেই ছাড়ছে না। সেই জন্যেই মনে হয় পিলু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। গরুটাকে নিয়ে সে তার বাবাসহ মায়ের কাছে ফিরবে।

—ওরে পিলু দাঁড়া।

আর দাঁড়া! সে একবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আয় না। ছুটতে পারছিস না! সত্যি আমি আর ছুটতে পারছিলাম না। সড়কে এসে ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। দেখি, মায়া আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, বাবা কোথায় রে দাদা?

—দেখছি না তো।

—গরুটা কোথায়?

—কিছুই দেখছি না।

—ছোড়দা কোন দিকে গেল?

—লেংড়ি বিবির হাতায় ঢুকে গেল।

আর তারপরই মূর্তিমান তিনজন, বাবা আগে, পিছনে গরুটা তার পিছনে মায়ার ছোড়দা। পাটক্ষেতের ভেতর থেকে বাবা একবার ভেসে উঠছে, গরুটা একবার ভেসে উঠছে। মায়ার ছোড়দা একবার ভেসে উঠছে, মেস্তা পাটের জমি, উঁচু নিচু বলে তিনজনেই আবার মেস্তা পাটের জমিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা খুবই অধীর। কতক্ষণে বাবা এবং গরুটা দূরে আবার ভেসে উঠবে। ভেসে উঠেই আবার ডুবে গেল। এবং এভাবে আমার বাবা মায়ার ছোড়দা আর বাবার গরুটা পাটের জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকল। পেছনে দিগন্ত, তার মধ্যে একটা প্রাণীর দুদিকে দুজন, এবং আমরা সড়কে ভাই বোন, অনেক পেছনে, বাড়ির রাস্তায় মা, আর ভাই—বোঝাই যাচ্ছিল, বাড়িঘরে এটা কত বড় সুখবর। আমি যে আমি, যে একটু সব তাতেই ইয়ে ইয়ে ভাব সেও, শেষ পর্যন্ত খুশীতে মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে ঢুকে গেল। আর গরুটা নিয়ে যখন সে উঠে এল, তখন অবাক।

গরুটা কালো রঙের। শিং ভীষণ লম্বা। শিরদাঁড়া হাড়গোড় বের করা, এ পর্যন্ত সহ্য করা যায়। গরুটা খোঁড়া। চারটে পায়ের মধ্যে একটা নড়বড়ে। পাটা মাটিতে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে নড়ে চড়ে বেড়ায়। কিন্তু রাস্তায় বাবাকে ঘাবড়ে দিতে মন চাইল না। কেবল পিলু একবার কি ভেবে বলল, বাবা গরুটার একটা পা ঠিক নেই, না বাবা?

পিলু খোঁড়া শব্দটি উচ্চারণ করল না। যাতে বাবা মনে আঘাত না পান, সেজন্য সে পা ঠিক নেই বলল। বাবার যা চেহারা, হাঁটু অবধি কাদা উঠে গেছে, সারা রাস্তা হেঁটে এসে বাবা আমাদের দেখে খুবই গম্ভীর—বাবা এমনটা কখনও থাকেন না, বোঝাই যাচ্ছিল সারা রাস্তায় বাবা গরুটাকে নিয়ে বেশ ধকল সয়ে তবে পুত্র কন্যাদের জন্য দুধের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পিলু শুধু বলল, বাবা আমাকে দড়িটা দাও।

বাবা বললেন, না পারবি না।

—পালাতে পারবে না, দাও না।

বাবা বললেন, তুই ধরলেই শুয়ে পড়বে। ওঠানো যাবে না।

আমরা লক্ষ্য করলাম, বাবা গরুটার গলার কাছে বেশ রশির টান রেখেছেন। গরুটাকে বাবা টেনে টেনে নিয়ে আসছেন, আর কি যেন ভয়ে ভয়ে আছেন। বাড়ির কাছে এসে নেতিয়ে পড়লে, শুয়ে পড়লে কেলেঙ্কারির এক শেষ। এভাবে টেনে টেনে বাবা কতক্ষণে নিয়ে যাবেন, পিলুর তর সইল না। মা কতক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ভাইটা—সে লেজটা মুচড়ে দিল একটু তাড়াতাড়ি হাঁটবে বলে। সেই যেমন কে তেমন, পাটা ঘুরে ফিরে পড়ছে, এক পা এগুলে দু পা পিছিয়ে যায় মনে হচ্ছে। ততক্ষণে পিলু বুঝতে পারল, এমন একটা গরু নিয়ে তাদের বাবার পক্ষেই সম্ভব এতটা পথ হেঁটে আসা। কিন্তু এখন পিলু এবং আমাকে যে ভয়টা সব চেয়ে বেশি কাবু করছিল, সেটা আমাদের মা। আজ বাবার না জানি কি হবে। বাবা আমাদের সাহস দেবার মতো করে বললেন, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে তো, একটু নেতিয়ে পড়েছে। লেজ মুচড়ে কিছু হবে না।

বাবা এবং গরুর দুরবস্থা দেখে পিলু খুবই সংকটে পড়ে গেল। বলল, জল আনব বাবা, গরুটার জলতেষ্টা পেয়েছে। বলেই সে ছুট লাগালে বাবা বিষম খেলেন। ডাকলেন আর তো দূর নেই। জলটল বাড়ি গিয়ে দেখানো যাবে। টানাটানিতে গরুর ছাল চামড়া উঠে আসতে পারে ভেবে বাবা আমাকে বললেন, ধর তো। দড়িটা টান করে ধর। যতটা সম্ভব টেনে ধরতে গেলে বললেন, আহা লাগবে। ফাঁস লেগে যাবে। অত জোরে নয়। বলে পেছন থেকে বাবা যতটা জোরে পারলেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে থাকলেন।

সুতরাং বাবা পেছনে আমি আগে। পিলু কি করবে বুঝতে পারছে না। সে একবার ছুটে বাড়িতে চলে গেল, এক বালতি জল নিয়ে আসতে দেখে বাবা কেমন ক্ষেপে গেলেন। বললেন জলটা গরুকে না দেখিয়ে আমাকে খাওয়াও, কাজে লাগবে। পিলুর এই আচরণ বাবার পছন্দ না বোঝা গেল। সে বলল, কোথা থেকে আনলে বাবা?

বাবার তখন কাছার কাপড় সব খুলে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললেন, গরুর মতো গরু। কত দুধ দেবে দেখ।

পিলু বলল, ল্যাংড়া গরু বেশি দুধ দেয় বুঝি বাবা?

বাবা কপালে দুর্গতি আছে ভেবে বললেন, তা দেয়। তোমাদের জননী কি বলে?

—কিছু বলেনি।

—খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো করেছে তো?

—তুমি কাল ফিরে আসবে বলে গেলে, কৈ এলে না তো।

—কপালে এমন একটা গরু জুটবে কে জানত। বাবা কথা বলছিলেন আর গরুটাকে হেঁইয় মার টান বলে ঠেলছিলেন। পিলু মাঝে মাঝে বাবাকে সাহায্য করছে। সেও শীর্ণকায় গরুটাকে যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে ঠেলতে ঠেলতে মা'র এজলাসে হাজির করতে চাইল।

গরুটাকে নিয়ে বাড়ির রাস্তায় উঠতেই মা সহসা হাউমাউ করে উঠল, ওমা, একি গো, হাড়মাস বের করা গরু, একটা ল্যাংড়া গরু!

বাবা এসব সময় খুবই রাশভারি হয়ে যান। মা'র কাছে এসে বাবা আরও গম্ভীর। এতটা হেঁটে জ্যান্ত একটা গরু নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল সেজন্য এদের যদি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে। বাবা ভীষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে গরুটাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে বারান্দায় সোজা বসে পড়লেন। তারপর ক্লিষ্ট গলায় বললেন, জল।

বাবার কাছে যেতে কেউ আমরা সাহস পাচ্ছিলাম না। বাবা কখনও বিষয়ী মানুষ হয়ে গেলে ভয় পেতাম। যেন আঙুল উঁচিয়ে বলা, বসে নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত করছি তবু সুখ নেই। তিনি সে সবের কিছু বললেন না। মাও বুঝতে পারছিল না, সেবাশুশ্রূষা কার আগে দরকার। বাবার না গরুটার। মায়া ইতিমধ্যে ছুটে এক গ্লাস জল এনে দিলে সবটা বাবা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললেন। মা তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখা এনে বাবাকে বাতাস করতে লাগল। আমরা উঠোনে গরুটার সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে। পিলু ফাঁক বুঝে গরুটার তেজ দেখার জন্য বাঁটে হাত দিলে বাবা তেড়ে উঠলেন, লাথি-ফাতি খেয়ে মরবে দেখছি সব।

গরু পা তোলা তো দূরে থাক, এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। পিলু বলল, ভারি ঠান্ডা গরু বাবা।

আমার মনে হল ঠান্ডা গরু না বলে সভ্রান্ত গরু বলা ভাল। বাবা হয়ত এখন তাই বলতেন। কিন্তু মা কেমন বিমূঢ়ের মতো বলল, হ্যাঁগো দেখছ গরুটা তো নড়ছে-টড়ছে না।

—নড়বে নড়বে। অত তপ্ত খোলা হলে হয়। কতটা পথ হেঁটে এসেছে।

—তাই বলে গরুর লেজ নাড়া বন্ধ থাকে কখনও।

—সবই নড়বে। সময় দিতে হয়। এই বিলু, বাবা গরুটাকে একটু জল দেখা তো।

এতটা পথ হেঁটে এসে সত্যি গরুটা জীবিত না মৃত বাবারও বোধহয় সংশয় দেখা দিল। বাজপড়া প্রাণীর মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে। মা'র ভয়ে কিছুতেই বুঝি সত্যি কথাটা বলতে পারছেন না। জল দিলে বোঝা যাবে। এক বালতি জলও গরুটার সামনে রাখা গেল। তবু সে দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটে গিয়ে আহ্লাদে এক আঁটি ঘাসও তুলে এনেছে। তাও দৃকপাত নেই।

মা বলল, ওমা কি গরু গো, ঘাস খায় না, জল খায় না। নড়ে না চড়ে না।

বাবা প্রায় উঠে বসলেন এবার। —আরে খাবে খাবে। ঠান্ডা হয়ে নিক খাবে।

—আর খেয়েছে। মা বোধহয় দু হাত ছুঁড়েটুড়ে বাবার কান্ড দেখে কাঁদতে বসে যাবে এবার।

বাবা তেমনি আমাদের সবাইকে সাহস দিয়ে যাচ্ছেন। —ভাল গরু। জাত ভাল। দুধ দেবে। গেরস্থ বাড়িতে গরু না থাকলে মা লক্ষ্মী থাকেন না। কতটা পথ হেঁটে এসেছে। গরু বলে কি আরাম বিরাম থাকতে নেই!

মানুষটাও অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। সঙ্গে গরুটা। হাঁটু অবধি কাদা। চোখমুখ কোথায় ঢুকে গেছে। সারারাত গরুটাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটির চিহ্ন। দু দিন আগে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরছেন আজ। চন্ডীপাঠের নাম করে শেষপর্যন্ত সোজা একটা ভাগাড়ের গরু নিয়ে হাজির। কার এত কৃপা হল মানুষটার ওপর। মা বাবাকে দেখতে দেখতে বোধহয় এসবই ভাবছিলেন। রাগে দুঃখে চোখ ফেটে বোধহয় এবারে জল বের হয়ে আসবে মা'র।

মা'র চেহারা দেখে বাবা ঘাবড়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে নাচাতে থাকলেন। খুবই তেজী অহংকারী মানুষ। ভেঙে পড়লেই গেছে। সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে। বলছিলেন, হবে হবে সব ঠিক হয়ে যাবে। গরুটা দুধ দিতে থাকলেই তোমার আর দুঃখ থাকবে না ধনবৌ।

এবং এবারে দেখা গেল গরুটা সত্যি লেজ নাড়াচ্ছে। বাবা লাফিয়ে উঠলেন। ওগো দ্যাখো লেজ নাড়াচ্ছে। বাবার বুকে যেন দুগুণ বল এসে গেল।—বললাম গরু লেজ নাড়াবে না সে হয়। দে রে জল দে।

জলের বালতিটা মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। গরুটা নাক টানল দুবার। মুখ খানিকটা জলে ডুবিয়ে ফের তুলে নিল। খেল না।

বাবা বললেন, ফ্যান আছে ধনবৌ, থাকলে দাও না। একটু নুন মিশিয়ে দাও। মা ফ্যান এনে নুন মিশিয়ে দিল। না, খাচ্ছে না। শত হলেও গরু একটু আদর যত্ন চায়। মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে বুঝল, কঙ্কাল বাদে গরুটার আর কোনো সম্বল নেই। মা অগত্যা বলল, খাবে কি? শরীরে কিছু আছে!

—বাঁধা খাওয়া সইবে কেন? ছেড়ে খাওয়ালে দেখবে দু দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

মা এতক্ষণ যা বলতে চেয়েছিল, এবারে তা বলে ফেলল, কে দিল গরুটা? বের হলে তো চন্ডীপাঠের নাম করে। আর নিয়ে এলে একটা মরা গরু। কার এমন কৃপা হল কর্তার ওপর। আর লোক পেল না! ভয়ে বাবা মা'র দিকে না তাকিয়েই বললেন, কালুবাবুই দিল। সবৎসা গাভীর কথা পাড়তেই ওনার দয়া হল। বলল, গোয়াল থেকে রাইমণিকে নিয়ে যান। ভাল জাতের গরু। বয়স হয়েছে। তবে কার বয়স না হয় বলুন!

বাবা দেখছি আসলে গরু নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে রাইমণিকে।

মা কেমন স্বগতোক্তি করল—কি যে তার এত দায় ছিল, এমন অবলা জীবকে এমন একজন অবলা মানুষের জিম্মায় তুলে দেওয়া।

আমরা যে ঝড়ের আশঙ্কা করেছিলাম, দেখলাম সেটা কেটে গেছে। মা গরুটার জন্য দুবেবা তুলতেও

বলল মায়াকে। বুড়ো হোক, গায়ে কিছু না থাক, সাক্ষাৎ ভগবতী। রাইমণির জন্য বাবা আমাদের নিয়ে একটা নতুন দড়িও পাকালেন। খালের জলে ঘষে ঘষে স্নান করানো হল সাক্ষাৎ ভগবতীকে। বেশি জোরে ঘষা গেল না, ঘষতে গেলেই রাইমণির ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে। স্নান-টান সেরে রাইমণি ঘাস এবং জল দুই খেয়ে ফেলল।

রাইমণিকে বাবা আমি এবং পিলু মিলে যখন ঠেলাঠেলি করে জল থেকে তুলে আনছিলাম, শেষবারের মতো মা বলেছিল, গরুটাকে দিয়ে কালুবাবু ভাল করেনি। ভোগাবে। বাবা তখন কেমন শোকসন্তপ্ত গলায় বললেন, দানের গরু আর কত ভাল হবে ধনবৌ? সংসারে এত করেও কিছু করা গেল না। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। খুব ভালমানুষের মতো বাবা রাইমণিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে ভারি দুঃখী মানুষ কিছুতেই কাউকে টের পেতে দিচ্ছেন না। তখন বাবার জন্য আমার কেন জানি চোখে জল আসছিল। বললাম, রাইমণি কি সুন্দর দেখতে, না?

বাবা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ বাবা। রাইমণি সত্যি ভাল। নিরীহ।

বাবা বললেন, এখন কত কাজ। দাঁড়িয়ে থাকিস না। রাইমণির একটা ঘর করতে হবে। দুলেকে ডেকে আনতে হবে। দুলে এলে সবাই মিলে সাঁজ লাগতে না লাগতেই রাইমণির পাতার ঘর বানিয়ে ফেললাম। বাঁশের বন থেকে বাঁশ এল। কাশের বন থেকে কাশ। পাটের দড়িতে বাতা বেঁধে দিলাম। বাবলা গাছের খুঁটিতে রাইমণিকে বেঁধে বাবা বাড়ির কোণায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি দেখছেন! সাঁজ লেগে গেছে। সারাটা দিন বাবা একদন্ড বসে নেই। এখনও এই সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এত কি দেখছেন!

ডাকলাম, বাবা!

অন্ধকারে সংবিৎ ফিরে পাবার মতো বললেন, বিলু!

—হ্যাঁ বাবা।

—এদিকে আয়।

কাছে গেলাম বাবার।

—দ্যাখ তো!

ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, কি দেখব বাবা?

—বাড়িটা দ্যাখ। ঠিক এতদিনে এটা মানুষের ঘরবাড়ি মনে হচ্ছে না? থাকার ঘর, খাবার ঘর, ঠাকুরঘর, গোয়ালঘর—সব মিলে মানুষের ঘরবাড়ি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যি মানুষের ঘরবাড়ি।

— তোর মা বোঝে না। রাইমণিকে এনে ভাল করিনি?

—খুব ভাল হয়েছে।

—রাইমণি না থাকলে বাড়িটা ঠিক বাড়ি মনে হত না। দুধ না দেয় গোবরটা তো পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মনের বাড়ি গোবর ছাড়া চলে!

—দুধও দেবে বাবা।

বাবাকে আর কি বলে সুখী করব বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে পিতাপুত্র আমাদের এতদিনের গড়ে ওঠা আবাস দেখছিলাম। সত্যি ধীরে ধীরে রাইমণির প্রতি ঠিক অন্য সবের মতো আমারও মায়া পড়ে যাচ্ছে। রাইমণি অন্ধকারে ঘাস চিবুচ্ছিল—তার শব্দ, এবং দূরে ব্যারেক বাড়িতে বিউগিল বাজছে। গাছপালার ভেতর মানুষের ছোট্ট একটা ঘরবাড়ি ক্রমে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। জোনাকির আলোতে বাবার মুখে অস্পষ্ট সুখের আভাস। গাছপালা ঘরবাড়িটাতে সতর্ক প্রহরীর মতো বড় হয়ে উঠেছে।

বাবা বাড়ির দিকে একসময় যেতে যেতে শুধু বললেন, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের আর কি লাগে!

খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে আসার পর বাবার ঘরবাড়ি ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ অভাব বলতে তাঁর তখন সন্তান-সন্ততিদের পাতে একটু দুধ দেওয়াই ছিল প্রাণাধিক ইচ্ছা। ইচ্ছা-পূরণে বাবা আমার ক'দিন থেকে মেজাজী মানুষ। তারপর এল বাবার জীবনে আরও বড় সুখবর—তাঁর প্রথম সন্তান বিলু সব বিষয়ে পাস। বিলু অর্থাৎ এই অধম জীবনে ন'টা বিষয়ে পাস করে বসে আছে—বাবা আমার তাতেই খুশি ছিলেন। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে! বাকি একটা বিষয়ে পাসের খবর আসায় বাবা আমার একবারে হতভম্ব।

বাবা আমার দেশে থাকতে জমিদারী সেরেস্তায় আদায়পত্র করতেন। আর ছিল যজন-যাজন। পৈতৃক সম্পত্তি মন্দ ছিল না! ভালভাবে চলে যেত। বাবার জীবনে পরীক্ষায় পাস করার কোন দায় ছিল না, এ দেশে এসে অথৈ জলে পড়ে গেলেও খুব একটা ঘাবড়ে যান নি। আমার সব বিষয়ে পাস করার কথা শুনে কেমন হয়ে গেলেন! ঠাকুরঘরে ঢোকার আগে ডেকে বললেন, সত্যি তুমি সব বিষয়ে পাস করেছ?

বললাম, হ্যাঁ বাবা।

মা রান্নাঘর থেকে বললেন, ওটা কি আবার হাতি-ঘোড়া নাকি, পাস করতে পারবে না।

—না, বলছিলাম, সব বিষয়ে পাস ভাবা যায়না।

আসলে আমাদের পরিবারের জীবনে কেউ কোন বড় পাস দেয় নি! আমিই প্রথম, এবং এতে বাবা খুব অহংকারী ছিলেন—বাবার কাছে পাস করাটা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়, এমনই জানতাম। কিন্তু আজ দেখছি অন্যরকম। পিলু তখন তাড়া লাগাচ্ছিল, চল না দাদা? ঠাকুরঘর থেকে বাবার গম্ভীর গলা, না, দাদা যাবে না। বিলু তুমি চান করে এস। আমার পাশে বসে থাক। ঠাকুর সুপ্রসন্ন না হলে মানুষ কখনও এত বড় কাজ করতে পারে না।

আমরা বাবাকে ভয় করি কি সমীহ করি, ঠিক বুঝি না। এই ভয় কিংবা সমীহ সবটাই নির্ভর করত মা'র উপর। তিনি বাবার উপর প্রীত থাকলে বুঝতে পারতাম, পিতৃদেবের উপর কোন কথা নেই। প্রীত না থাকলে বুঝতাম, নির্দেশ অমান্য করাই বিধেয়। কিন্তু বাবা দীর্ঘ তিন চার মাস বাড়ি ছাড়া হন নি বলে, মা'র এখন বাবা ছাড়া কথা নেই। আমরা মায়ের সন্তান। বাবা সংসারী মানুষ হয়ে গেছেন প্রমাণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত একটা দানের গরু পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এ-হেন সময়ে পিলুর সঙ্গে বন-বাদাড়ে ঢুকে যাব না বাবার ঠাকুর ঘরে বসে স্তোত্র পাঠ শুনব, বুঝতে পারছিলাম না।

পিলু অবশ্য বাবার কথা খুব গ্রাহ্য করে না। মা'র কথাও না। তার উপর দাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে যাওয়ায় কিছুটা বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সে আজ। বাতা কেটে তরবারি বানিয়ে ইতিমধ্যেই কোমরে গুঁজে ফেলেছে। মাথায় পাতার টুপি পরে পড়শীদের বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে এসেছে, দাদা সব বিষয়ে পাস করেছে। কারণ এত বড় খবরটা পৃথিবীর কেউ জানবে না, সে হয় না। বাকি আছে, নবমী বুড়ী, সে থাকে ইটের ভাটা পার হয়ে, কারবালার রাস্তার ধারে। এখনও সে দিকটায় মানুষের বসতি হয়নি। কবরভূমি বলেই হয়ত মানুষের ভয়। দলে দলে যে সব ছিন্নমূল মানুষ আসছে তারা তো খালি জায়গা দেখলেই বাঁশ পুতে খুপরি বানিয়ে আস্তানা গেড়ে নিচ্ছে। আগে অনেকটা হেঁটে গেলে শহরের ঘরবাড়ি দেখা যেত, এখন রেল-লাইন ঘর বাড়ি পর্যন্ত এসে যাওয়ায় বাবা আরও স্থিতিশীল মানুষ হয়ে গেছেন। কারণ জমির দাম যে ভাবে বাড়ছে তাতে কবে না হাজার টাকা বিঘে হয়ে যায়—আজকাল এমন স্বপ্ন বাবা প্রায়ই দেখতে পেতেন বলে বোধহয় এখন আর ঘরবাড়ি ছেড়ে ডুব দিচ্ছেন না কোথাও।

এ-সব মুহূর্তে পিলুই আমার ত্রাণকর্তা, সে হাত ধরে টানতে থাকল, চল না দাদা! ও দাদা, যাবি না?

বাবা পাটায় চন্দন ঘষছিলেন, হাত থামিয়ে বললেন, কোথায় যাবে শুনি? তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও? সে তো তোমার মতো বাউণ্ডুলে নয়।

পিলু বলল, আমার কী দোষ?

বাবা এ সময় প্রশ্ন করতে পারতেন, তবে কার? কিন্তু তিনি জানেন, উত্তরটা সুখের হবে না। পিলুর যা একখানা স্বভাব, বলেই না ফেলে, তোমার। বাবার বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য মা আমাদের গালাগাল দিয়ে বলতেন, যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। সেই থেকে পিলু জেনে ফেলেছে, আসল দুরাত্মা সংসারে বাবা। বাবার স্বভাব সে পেয়েছে, এটা তার কাছে বড়ই অহংকারের বিষয়। চন্দন ঘষতে গিয়ে বাবা টের পেয়েছেন, দ্বিতীয় পুত্রটির মাথা তার মা চিবিয়ে খেয়েছেন। সুতরাং কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর।

কি জিজ্ঞেস করবে পিলু বোধহয় বুঝতে পারেনি। বাবার বাউণ্ডুলে স্বভাব সম্পর্কে সত্যাসত্য যাচাই করবে, না সে এ সময় কোথাও দাদাকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করবে, —কোনটা? সে মাকে ডেকে বলল, মা, বাবা আমাকে বাউণ্ডুলে বলছে। দাদাকে নিয়ে যাব?

মা রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছে বের হয়ে আসছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মাকে। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে, শরীরে মা মা গন্ধ। আমি বললাম, পিলু বলছে নবমী বুড়ীর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে।

—তা যা না, ধরে রেখেছে কে?

—এই তো ধনবৌ, সংসারের ভাল-মন্দটা তুমি বোঝ না। যার কৃপায় সব হয়, এই যেমন ধর ঘরবাড়ি, গাছপালা, দুধালো গাই, তার কাছে না বসে তুমি বিলুকে নবমীর কাছে পাঠাচ্ছ। বাবা যে বিষয়ী মানুষ সেটা প্রমাণ করার জন্য বললেন, রোদে ঘুরে জ্বরজ্বালা হলে ওকে মানুর কাছে নিয়ে যাব কী করে? একটা কাজটাজ হয়ে গেলে, তোমার হাতে দুটো পয়সা বেশি পড়বে।

মা বলল, কেন দুধালো গাই!

বাবা মার কথায় ভড়কে গেলেন।

দুধালো গাই বলার অর্থ গরুটার পর সংসারে আর একজন আমি, যাকে নিয়ে সাশ্রয়ের স্বপ্ন দেখছেন বাবা।

দানের গরুটি অস্থিচর্মসার এবং বুড়ো তা ছাড়া তিন পা অবলম্বন করে যার বেঁচে থাকা সে সংসারে উৎপাত ছাড়া আর কি। তবু বাবা পুজো-আর্চার নাম করে বের হয়ে পড়ছেন না, এবং খোঁজখবর না দিয়ে দেশের মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক কমে গেছে বলে গরুটির প্রতি সদয়ই ছিলেন মা। দুধালো গাই বলাটা বাড়াবাড়ি। দুধ না হয়, গোবরটুকু তো হয়, এই আপ্তবাক্য সার করে মা মুখ বুজে সব সয়ে গেছেন। তা ছাড়া দানের গরু আর কতটা ভাল হতে পারে, এমনও একটা সংশয় তিন মাস ধরে মা'র মধ্যে কাজ করছিল। তার সেবাযত্ন একটু অধিক মাত্রাতেই চলছে। পিলু কচি ঘাসের খোঁজে একটু বেলা বাড়লেই বের হয়ে যায়। মা জল গরম করে ভাতের মাড় সহ কিছু খোল মিশিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় পিতা, পুত্র এবং জননী মিলে সাধ্য-সাধনা চলে—যদি শরীরে ভগবতীর মাংস লাগে। কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন, তার বেশি এক পা নড়ছেন না। এই নিয়ে মহাভারত পাঠ যে কোন সময় শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রতিদিনই আমরা এমন একটা প্রবল আশঙ্কায় ভুগছিলাম—এখন পর্যন্ত পাঠ শুরু হয়নি। মা বরং আজকাল সাংসারিক বিরোধে বাবার পক্ষই নিয়ে থাকেন। মা, বাবার পক্ষ নিলে আমার পিলুর সংসারে গুরুত্ব কমে যায়, বিশেষ করে পিলুর স্বাধীনতা খর্ব হয়। বাবার সংসারী মানুষ হয়ে যাওয়াটা পিলুর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

মা শুনে বললেন, তাই তো। এই দুপুরে যাবার কী হল?

পিলুর প্যান্ট কোমরে থাকে না। হড়হড় করে নেমে যায়। নাকে সর্দি স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। যতবার প্যান্ট নেমে যায় ততবার তাকে ওটা তুলে পরতে হয়, নাক মুছতে হয় বারবার। এজন্য সে কিছুটা সময় নিয়ে বলল, মা, তুমি বুঝছ না দাদা পাস করেছে খবরটা না দিলে নবমী বুড়ী খারাপ ভাববে। ওকে ভাল খবর দেবার তো কেউ নেই।

এমন কথায় বাবা ভিতরে কেমন চমকে উঠলেন। দ্বিতীয় পুত্রটির কথাবার্তাই এই রকমের। নবমীর কেউ নেই, বাড়ির ভালমন্দ হলে কলাপাতায় বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে দিয়ে আসার মধ্যে পিলুর কী যেন এক আলাদা জগৎ আছে। যা তিনি ঠাকুরঘরে বসে টের পাবার চেষ্টা করেন, পিলু সেটা টের পায় বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে। তিনি বললেন, যাও, তবে ওখানে আটকে থেকো না।

সঙ্গে সঙ্গে মাও বললেন, হ্যাঁ, যাও—তবে ওখানে আটকে থেকো না।

এত সহজে ছাড়পত্র মিলে যাবে, অনুমান করতে পারি নি। মনে হল বাবা-মা আমাদের কত ভাল। আমরা হাঁটতে থাকলাম। বাড়িটা আম জাম কাঁঠালের চারাগাছে ভর্তি। বাবার সংসারে এখন একটাই কাজ, গাছপালা পুঁতে যাওয়া। কত যে গাছের খবর নিয়ে আসছেন। আমলকী গাছটা ঘরবাড়ির উপর দু'বছরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমের মতো বাড়িটার জন্য দিন দিন মায়া বেড়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সব কেমন টের পাচ্ছিলাম। আমরা, বাবার ঘরবাড়ির সব। আমরা না থাকলে বাবার কিছু থাকে না। বাবা না থাকলে আমাদের কিছু থাকে না।

শরৎকাল বলে সূর্যের তাত কম। চারপাশে সবুজের সমারোহ। যেতে যেতে বন-জঙ্গলের সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। তখনই কেউ যেন ডাকল, দাদা, দাঁড়া, আমি যাব। দেখি পেছনে মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসছে মায়া। পিলু মায়াকে দেখে ভারি গম্ভীর হয়ে গেল।

বন-জঙ্গলের ভেতর তার দুই দাদা যাচ্ছে, সে বাড়িতে একা থাকে কি করে! আর সঙ্গে আসছে হেমন্তের কুকুর। সংসারে সেও আমাদের একজন। মায়া, হেমন্তের কুকুর, আমি, পিলু এই মিলে যাত্রা, মন্দ না। কিন্তু পিলু মায়ার ছোড়দা। শাসন করার সুবর্ণ সুযোগ—সে বলল, বাড়ি যা বলছি। মা'র কত কাজ।

মায়া বলল, না, আমি যাব।

—যাবে না! পিলু ধমক লাগাল।

মায়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদার সঙ্গে যাব। তোর সঙ্গে যাচ্ছি না।

পিলু ক্ষেপে গেল—যা, যা না। দাঁড়ালি কেন? আমি যাচ্ছি না।

পিলুকে অগত্যা বললাম, আসুক না। নবমী আমাদের সবাইকে দেখলে খুশি হবে। এমন কথায় পিলুর মনটা নরম হয়ে গেল। বলল, দাদা, তুই চাকরি করলে, নবমীকে বাড়িতে নিয়ে আসব, কেমন।

পিলুর এই স্বভাব। আমাদের ভারি অভাব-অনটনের সংসার। সম্বল বলতে ক' বিঘা উড়াট জমি, কিছু শিষ্য আর বাবার বাড়ি বাড়ি পূজা-আর্চা। পিলুর বড়ই অভিযোগ, এ-দেশে এসে আমরা কত গরিব হয়ে গেলাম! অভিযোগটা আমারও। আমাদের বাবা এ-দেশে এসে বড় গরিব হয়ে গেলেন, এ-কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

তবু একটা আশ্রয় মানুষের জন্য কত দরকার, আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেলে টের পেলাম। আমরা যে অন্য একটা পৃথিবীতে এসে উঠেছি, এখন আর মনেই হয় না। উঁচু নীচু মাঠ, কাঁটা গাছ, কোথাও ঢিবি, কোথাও অজানা ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক, নীল আকাশ মিলে আমাদের যেন সেই পুরনো অস্তিত্ব। কোথাও একটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে, যেন কতকালের চেনা। কোথাও বাবলার বন, তারপর সেই প্রাচীন ইঁটের ভাটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে। বড় মজা দীঘি, শান বাঁধানো পরিত্যক্ত ঘাটলা, পাড়ে পাড়ে অজস্র দেবদারু গাছ। জনহীন গভীর নির্জনতা তখন আমাকে গ্রাস করে! দূরের স্বপ্ন দেখতে পাই। কেউ যেন আমার সামনে ফুলের টব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কে, এখনও বুঝতে পারি না। মা-বাবা ভাই-বোন ছাড়া আরও কেউ পাশাপাশি পথ হাঁটছে, শুধু এইটুকু টের পাই।

পিলু, মায়া, অজস্র কথা বলছিল।

পিলু বলছিল, দাদা, তুই চাকরি করলে, একদিন পেট ভরে রসগোল্লা খাব।

মায়া বলল, দাদা কলেজে পড়বে। কি মজা!

পিলু বলল, বাবা যে বলল, মানুকাকাকে চাকরির কথা বলে এয়েছে।

সংসারে বাবার দু'জন মানুষ সম্বল। দেশে থাকতে বাবার জমিদার দীনেশবাবু।

আর এখানে এসে মানুকাকা। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

পিলুই বলল, মানুকাকা বলেছে, পড়িয়ে আর কি হবে! একটা কাজেটাজে ঢুকে যাক।

কবে বলেছে? মজা দীঘির ধারে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। গাছপালা, নীল আকাশ নির্জনতা ভেঙে কেমন খানখান হয়ে গেল। চিৎকার করে ফের বললাম, কবে বলেছে? বল কবে বলেছে! আমার স্বভাব নয় জোরে কথা বলা। কেন যে এত রেগে গেলাম! কার উপর রাগ, তাও

বুঝতে পারছি না। বাবার উপর, না মানুকাকার উপর। না দেশ ভাগ—কারণ দেশ ভাগ না হলে আমরা এত গরিব হয়ে যেতাম না। পিলু দাদার চণ্ডমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল। তার দাদাটি বড় শান্ত স্বভাবের। মায়া বলল, দাদা, তুই কলেজে পড়বি। কারো কথা শুনবি না।

নবমীকে খবর দেবার আমার আর কোন ভরসা থাকল না। আসলে যে ফুলের টব হাতে নিয়ে আমার সামনে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়, সে কেমন ভ্রূ কুঁচকে বলল, ও মা, তুমি আর পড়বে না! তালে তুমি মানুষ হবে কী করে? বড় হবে কী করে?

বড় হওয়াটা যে আমার খুবই দরকার। পিলুকে বললাম, আমি যাব নারে। তোরা যা!

তবু পিলু ছাড়ল না। বন-জঙ্গলের মধ্যে নবমী থাকে। ট্যানাকানি পরে। না থাকলে পরে না। এখানে আসার পর পিলুর সাম্রাজ্যের মধ্যে নবমী বুড়ীও পড়ে গেছে। বাড়িতে ভালমন্দ হলে আগে নবমীর জন্য চুরি করত, এখন করে না। বাবার ছাড়পত্র মিলে গেছে।

অভাবের সংসারে মা গজগজ করলে বলতেন, আরে দিলে কখনও ফুরায় ধনবৌ? যতটুকু দিতে পারলে, ততটুকুই আখেরের কাজ করলে। তেনার মাপা জিনিস। তাঁর সব। তুমি দেবার কে ধনবৌ?

পিলু মজা দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, ন—ব—মী! কারণ সে জানিয়ে দিল, নবমীর দাঠাকুর এই বনের মধ্যে হাজির। যেন তাড়াতাড়ি গায়ে ট্যানাকানি না থাকলে পরে নেয়! আগে বোধ হয় কখনও পিলু বন-বাদাড়ে ঘুরতে গিয়ে দেখেছে—উলঙ্গ এক বুড়ী বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। পিলুর কেমন লজ্জা লেগেছে। আবার পূজা-পার্বণের দানের কাপড় একটা চুরি করলেই হয়ে যায়। এবং তা দিতেই পিলু বোধ হয় নবমীর দা-ঠাকুর হয়ে গেছিল। দা-ঠাকুরের জন্য নবমীও কিছু রেখে দেয়। এই সেদিন একটা ঝুনো নারকেল নিয়ে গেছে পিলু। গাছতলায় কুড়িয়ে পেয়েছে নবমী। দা-ঠাকুরকে না খাইয়ে সে খায় কী করে? এই বনটার মধ্যে আমরা এখন তিনজন প্রাণী। আর আমাদের হেমন্তের কুকুর। পিলুর পার্টনার। কুকুরটাও মুখ তুলে ঘেউঘেউ করে উঠল। পিলু ডাকছে, সে ডাকবে না, কী করে হয়? আর তখনই খসখস শব্দ। খুব ক্ষীণ গলায় সাড়া দিচ্ছে নবমী, আসেন গা দা-ঠাকুর!

মণীন্দ্র কাঁটাগাছের জঙ্গলে জায়গাটা ভরা। ইচ্ছে করলেই ছোটা যায় না। পিলু ছুটতে চেয়েছিল, কাঁটায় জামা আটকে গেছে। মায়া উবু হয়ে জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। তার অবশ্য হুঁশ নেই। চিৎকার করে বলছে, আমার দাদা পাস করেছে নবমী। দাদাকে নিয়ে এসেছি। মায়া এয়েছে।

এবং যখন কাঁটা গাছ এবং আগাছা মাড়িয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম, নবমীর কি আনন্দ। যেন তার কত নিকট আত্মীয়স্বজন আমরা! নবমী বলল, কি পাস গ?

পিলু বলল, ওমা তোমাকে বলেছি না, দাদা এ বছর একটা পাস দেবে। মেট্রিক পরীক্ষা। সে তুমি বুঝবে না। তোমার কিছু মনেও থাকে না। কত বার বলেছি, দাদা ন'টা বিষয়ে পাস করে গেছে। আর একটা বিষয়। ব্যস, তাও পাস। বাবা তো বিশ্বাসই করেন না, সব বিষয়ে মানুষ পাস করতে পারে। জীবনে নাকি সেটা হয় না।

বাবার কথায় নবমী কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল, তিনি দেবতা আছেন গ। তারপরই নবমীর যা স্বভাব গড় হয়ে গেল। পিলু এটা তার প্রাপ্যই মনে করে থাকে। কিন্তু আমার বড় সংকোচ হল। বললাম, ছি ছি, কী করছ? বলে পা সরিয়ে নিতেই শীর্ণ হাতটা কেমন কেঁপে গেল। যেন সে কি অপরাধ করে ফেলেছে! খোনা গলার স্বর স্পষ্ট নয়। এখন তার চলতে ফিরতেও কষ্ট। একদিন পিলু তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেছিল, বাবার ঠাকুরঘরে সে মাথা ঠেকিয়ে আসতে পেরেছে—আর এই যে আমাদের দর্শন, সেটা তার নিতান্ত পুণ্যফল। এ-হেন সময়ে আমার এমন বলা বোধহয় উচিত হয় নি। নবমী কেমন শুকনো গলায় বলল, দা-ঠাকুর, কত ভাগ্যিমানী হলে পায়ের ধুলো পড়ে। দ্যান চরণখানা মুঠা করে লই।

ওকে বঞ্চনা করতে কেন জানি আর মন চাইল না। পা দু'খানা পিলুর মতো আমিও বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আসলে এ সবই আমায় কোন দূরবর্তী নক্ষত্রের খবর দিচ্ছিল। সেটা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। নবমী আমার দিকে কিছুটা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভাল দেখতে পায় না। একটা পাস দেওয়া মানুষ তার সামনে। সে কোন রকমে উঠে, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, বাপের মুখ উজ্জ্বল

করেন গ দা-ঠাকুর।

মায়া বলল, জান নবমী, আমার দাদা কলেজে পড়বে।

নবমী এ সব কিছুই বোঝে না। মুখে তার আশ্চর্য সরল হাসি। যেন এটা এমন কাজ, যা আমিই একমাত্র পারি। কম্পার্টমেণ্টালে পাস করার মত এত বড় কাজ আমার পক্ষেই সম্ভব। সে বলল, একটা শীতের চাদর দেবেন গ দা-ঠাকুর? বড় হয়ে গেলে দিতে হয়।

নবমীর পক্ষে এত দিন বেঁচে থাকা সম্ভব না। এই শীতে অথবা আগামী শীতে সে মরে যাবে। তবু মানুষের মরণ বাঁচন বলতে কথা দিলাম, বড় হয়ে তাকে একটা শীতের চাদর দেব। এই আমার কাউকে প্রথম কথা দেওয়া।

বাবার ফিরতে বেশ রাত হল। শরতের শেষ বেলা বলে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মা বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে বাবার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। মানুষটা ফিরলে তাঁর অনেক কাজ। আমারও ঘুম আসছিল না। বাবা কি খবর নিয়ে আসবেন কে জানে? কারণ মানুকাকার ইচ্ছা না হলে আমার কলেজে পড়া হবে না জানি। ঈশ্বরের কাছে কেবল প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর, বাবা-মানুকাকার সুমতি দাও। ওঁরা যেন এখনই আমার পড়াশোনা বন্ধ করে না দেন। রাস্তা থেকেই বাবার গলা পাওয়া গেল!—বেড়াটা কে ভেঙেছে? তিনি বাড়িঘরে যখন থাকেন, খুবই সংসারী মানুষ। গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও তিনি টের পান। মা বললেন, দানের গরু ভেঙেছে। মানু ঠাকুরপো কি বলল?

দানের গরু ভেঙেছে যখন সাত খুন মাপ। বাবা খুব সদাশয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন। অবলা জীব বলে কথা।

বারান্দায় উঠে এলে ফের মা বললেন, ঠাকুরপো কি বলল?

—খুব সুখবর।

আমার ভেতরে উল্লাস। তবে ঈশ্বর মানুকাকার সুমতি দিয়েছে।

বাবা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মা মাঝপথে থামিয়ে বললেন, পরে শুনছি। আগে হাত-মুখ ধুয়ে নাও! ঠাকুরের বৈকালী হয় নি।

—কেন, কেন তোমার বড় পুত্র, কি করছিল?

—দেয় নি তো! কিছু নাকি ওর ভাল লাগছে না।

—পিলু!

—সারাক্ষণ ঝগড়া করেছে মায়ার সঙ্গে। আমার কথা কে শোনে?

বাবা ওসব কথা একদম শুনতে চাইছেন না।—সব হবে ধনবৌ। তোমার বাড়িঘর যখন হয়ে গেছে, সব হবে। মানু যা আমাদের জন্য করছে!

মা বললেন, ভাই হয়, করবে না?

—না করলেও পারত। বাড়িঘর সব তো বলতে—

—তোমার আবার বাড়াবাড়ি।

আসলে বুঝতে পারছিলাম, বাবাকে মানুকাকা খুব বড় খবর দিয়েছেন। বাবা এজন্য মানুকাকার ওপর খুবই প্রসন্ন। বাবা প্রসন্ন হলে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। আগের দুর্ব্যবহারের কথা মনে রাখতে পারেন না। মা'র সব মনে থাকে। কারণ দেশ থেকে এসে মানুকাকার বাড়িতে উঠলে কাকা যে খুব বিরক্ত বোধ করেছিলেন, সেটা চোখ বুজলে এখনও টের পাই। আমাদের ক্যাম্পে পাঠাবার জন্য তিনি অনেক হাঁটাহাঁটিও করেছেন। কিন্তু বাবার এক কথা। জাত খোয়াব মানু! ও তো হয় না। মা তখন তাঁর শেষ সম্বলটুকু মানুকাকার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, একটু জমি, আর কিছু চাই না। ক'দিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম, আমরা মানুকাকার সংসারে উচ্ছিষ্ট। অবশ্য বাবার স্বভাব কিছুই গায়ে না মাখা। সুতরাং এ-হেন বাবা আজ কি না জানি খবর নিয়ে এসেছেন। বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতেই শুনলাম, বাবার বেশ ক্ষুণ্ণ গলা—ধনবৌ, মানুষের খারাপটা মনে রাখতে নেই। ভালটা মনে রাখলে কষ্ট পাবে কম। মানুষ এতে বেশি সুখী হয়, ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন।

বাবা তারপর খাটো গলায় বললেন, বিলুটা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মা বললেন, বোধ হয়।

ভেতর থেকে বললাম, না বাবা, ঘুমাই নি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলুর গলা, আমিও ঘুমাই নি বাবা।

মায়া বলল, আমার খুব ভয় লাগছিল তুমি আসছ না, চিন্তা হয় না?

মায়া আজকাল পাকা পাকা কথা বলে। আসলে সবাই জেগে আছে। বাবা আমার কি ভাগ্যফল লিখে আনছেন জানার জন্য কেউ ঘুমোতে পারছে না।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বাবা আর মানুকাকার কথায় যাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে বললাম, মানুকাকা কি বলেছে?

—বলেছে। অনেক কথা বলেছে। তোমার তা শুনে দরকার নেই। তোমার একটা কাজও ঠিক করে ফেলেছে।

—কাজ!

—হে, যে সে কাজ নয়, বড় কাজ। মানু বলল, কলেজে পড়লে ত, কেরানীগিরি করতে হয়, মাথা ঠিক থাকে না। তোমার পাসটাও খুব ভাল না বলল। বললাম কত, দেখ মানু, আমাকে পাস নিয়ে বোঝাস না। সব বিষয়ে পাস কে করে রে? তুই করেছিস? করলে তোকে কেরানীগিরি করতে হত?

আমি জানি, আসলে বাবা এসব কিছুই বলেন নি। তবে মনে মনে হয়তো বলেছেন! মনে মনে বলাটাকেও তিনি ভাবেন বলাই হল। আমার সব কেমন গোলমাল ঠেকছে। বললাম, কি কাজ?

—খুব বড় কাজ। এ কাজ করে মানুর বন্ধু শহরে তিনটে বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। বাসরুট করেছে। জলঙ্গী ডোমকল বাস যায়, সব ওদের। কত বড় কথা!

মা বললেন, কাজটা কি বলবে তো।

—মোটর মেকানিকের কাজ। এই যে গাড়ি দেখছ, বেগড়বাই করলে তোমার পুত্র কান মলে দিতে পারবে। তোমার পুত্র কত দূরে যেতে পারবে জান। একটু-আধটু কালি-ঝুলি মাখতে হবে, তা বড় কাজে মাখতেই হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ছাইভস্ম মাখেন, সে কি খুব খারাপ কাজ?

বাবা জলচৌকিতে বসে অনর্গল কথা বলছেন—কোথায় কবে মানুকাকার বন্ধু এমন একটা কাজেই প্রথম হাত দিয়েছিল। গাড়ি চালাতে শিখল। দূর দূর জায়গায় চলে যেত। যখন খুশি তুমিও যেতে পারবে, ইচ্ছে হলে একটু পদ্মাপাড়ে ঘুরে আসবে, সে তোমাকে গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে যাবে। মাকে বাবা খুশি রাখবার জন্য বললেন, এখন তুমি যা বলবে তাই হবে।

—বিলু তো বলছিল কলেজে পড়বে।

—কলেজ! না না ধনবৌ, তোমাদের সবারই দেখছি মতিভ্রম হয়েছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। একটা আস্ত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি কম বড় কথা। গাড়িতে কত মানুষ, কত কাজ, অফিস কাছারি সব সে টাইম মতো করাবে। ওর মর্জির ওপর সব।

আমার রা সরছিল না। বুঝতে পারছিলাম, মানুকাকা আমার যে কাজটি ঠিক করেছে, তা তার বন্ধুর গ্যারেজে। প্রথমে হেল্পার নাম দিয়ে সব রকমের কাজ চালিয়ে নেওয়া। মানুকাকা আমাদের দুরবস্থার কথা ভেবে, তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়ে দিতে চান। যা বিদ্যে হয়েছে, ওতেই ও কাজ চলে যাবে। আমরা গাঁয়ের মানুষ, দেশের বাড়িতে ঠাকুরদার টোল ছিল, সেই সুবাদে বাবার মন্ত্রপাঠ, পূজা-আর্চা নিখুঁত। প্রথমে এ দেশে এসে বাবা ভেবেছিলেন, তাঁর হাতের সম্বলটুকুই যথেষ্ট। গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে খুব বেশি আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু তাঁর যে মন্ত্রপাঠের ঠিকুজী কুষ্ঠি ঠিক আছে, এই নিয়েই বড় সংশয় মানুষের। মানুকাকাই পূজা-পার্বণে শ্রাদ্ধে বাবার হয়ে পার্টি ঠিক করে দিতেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় কিছু লোকজনও বাবা খাইয়েছিলেন। তাঁর খেরো খাতায় দেশের মানুষজনের সব খবর লেখা আছে। তারা কোথায় কে থাকে, তিনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। অভাবের তাড়নায় পূজা-পার্বণের নাম করে বের হলে আর বাড়ি ফিরতে চাইতেন না। সেই বাবার ছেলের এ-দেশে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে মানু, তাতেই আমার সুমহান পিতৃদেব গদ্‌গদ।

আমি বললাম, বাবা!

বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমার চোখে মুখে কি লেখা ছিল জানি না, বাবা কি পড়লেন জানি না—তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করে বসে থাকলেন। আর ঠিক এ সময়েই বাবা আমার কত অসহায় উপলব্ধি করলাম। কলেজে পড়ানো বাবার ক্ষমতার বাইরে। পিতার এই চোখ-মুখ আমাকে বড় পীড়া দিল। বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, গাড়ি চালিয়ে নেওয়া কত বড় কাজ না বাবা!

বাবা খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, তালে তুই বুঝেছিস। কথায় বলে না, বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে। ছোট কাজে কোন লজ্জা রাখতে নেই বিলু। সব কাজই মানুষ করে। আসল কথা স্বভাব। স্বভাব ঠিক থাকলে সব কাজ বড় কাজ।

আমাদের স্বভাব ঠিক আছে, এটাই বাবার এখন আপ্তবাক্য। তাঁর কথা পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে অপহরণ করা হয়। আমি এ বিষয়ে পিতার মতোই শুচিবাইগ্রস্থ। অবশ্য পিলুটা অন্য রকমের। তার এতটা শুচিবাই নেই। বাবা একবার স্টেশনে ফেলে রেখে আমাদের উধাও হয়েছিলেন। পিলু তখন সংসারে স্বাধীনতা সংগ্রামী। যত্র তত্র তার বিচরণ। সে যেখানে যা পেত, তুলে নিয়ে আসত। শসা চুরি করতে গিয়ে সে মারও খেয়েছে। অবশ্য অতটা দৈন্যদশা এখন আমদের আর নেই। মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলে যা হয়। আকাশ মাটি শস্যক্ষেত্র সব এখন পাপপুণ্যের কথা বলে। বাড়িঘর করার পর পাপপুণ্য বোধ সংসারে বাড়ে। বাবা বললেন, বুঝলে না, এ সব কাজে বিশ্বাসী মানুষদের দরকার। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কিন্তু বংশের মান রাখিস। মানুর মুখ রক্ষা করিস।

পিলু বলল, দাদা, তুই এ কাজ করবি না।

মায়া বলল, দাদা আমার কলেজে পড়বে না বাবা?

মা খুবই নিরুপায় চোখেমুখে তাকাচ্ছিলেন। লন্ঠনের আলোটা দপদপ করে জ্বলছে। শরতের গাছপালা বাতাসে দুলছিল। অন্ধকার অরণ্যে একটি ছোট্ট ঘরের বারান্দায় আমরা চার জন মুখোমুখি বসে। কেউ আর কোন কথা বলছিলাম না। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল। কারণ কোন দূরবর্তী নক্ষত্রে কে যেন ডাকে। বড় হই, গাছপালা মাঠের সঙ্গে সেও আমার পাশাপাশি হাঁটে। গোপনে কত কথা বলি। কখনও সুদূরের মাঠ পার হই হাত ধরে। কখনও শস্যক্ষেত্র মাড়িয়ে যাই দুজনে। কেউ পৃথিবীর এই গোপন খবর টের পায় না। রাতে ঘুম হয় না। ছটফট করি। মাথার ঘিলু পোকায় কাটে। এবং সেদিনটি এসে যায়। বাবা আমাকে মানুকাকার দোকানে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। মানুকাকা একটা স্যাঁতসেঁতে পুরনো ভাঙা চালাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, গোবিন্দ, ওকে দেখে-টেখে রাখিস। লোহালক্কড়ে ভর্তি ভাঙা গাড়ি, মানুষের ভিড়ভাড়াক্কা দিনের বেলায়। নাট-বোল্ট খোলা, রেঞ্চ আর হাতুড়ি সম্বল, সকালে একখানা পাঁউরুটি দুপুরে ডাল ভাত, রাতে তড়কা আর রুটি। খিস্তি-খেউড় আর দাবানলের মতো অনন্ত জ্বালা। বিকেলে দেখি লালদীঘির পাড় ধরে ছেলেরা যায় মেয়েরা যায়। কী সুন্দর নীল রঙের পোশাক শরীরে। মনে হয়, ওরা কোন স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা। আমার বুঝি সেখানে আর কোনকালে যাওয়া হবে না। গাড়ির ফুটবোর্ডের নীচে মাথা, ভিতরে গাড়ির কলকব্জা, তার নীচে জীবনের সব বিষয়ে পাস বাবার নিরীহ এক কৃতী ছেলে।

সবই সহ্য হচ্ছিল। কেবল খিস্তি-খেউড় বাদে। গোবিন্দ-পঞ্চানন আমার মনিব। তার মনিব গোলক দাস। বাসে ঘন্টি বাজায়। বাস মালিক কিংবা কাকার সেই বন্ধুটির সাক্ষাৎ আর পাই না। পেলে একটা আর্জি ছিল। কারণ সহনীয় নয়, এমন কিছু কাজ গোবিন্দ আমাকে দিয়ে করাতে চায়। আইন অমান্য করি বলে তার সহ্য হয় না। না পেরে ছুতোয়-নাতায় কিল ঘুষি। ভাবি পালাই, কিন্তু বাবার বংশের মুখ রক্ষা না হয় ভেবে পড়ে থাকি। কিন্তু জীবন মানবে কেন, সে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ থেকেই আমার প্রথম নিরুদ্দেশ যাত্রা।

সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত-টাত ছিল। শহরের রাস্তায় আলো ছিল না। আমাকে স্টেশনে যেতে হলে মাঠ ভাঙতে হবে। সাহেবদের কবরখানা পার হয়ে যেতে হবে। ভূতের ভয় বড় প্রবল। অনেকটা পথ ঘুরে, ফলে স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। ভেতরে প্রচন্ড অভিমান সবার উপর। বাবা, মা, মানুকাকা সবাই যেন সংসারে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সব তছনছ করে দিয়ে পালাচ্ছি। রেলগুমটি দেখা যাচ্ছে। সিগনালের নীল বাতি। গাড়ি আসছে। গাড়িতে উঠে পড়লেই মনে হল, আমার নতুন

জীবন শুরু। সম্বল বলতে এখন আমি একজন উদ্বাস্তু বাবার সন্তান। তবে সাত খুন মাপ। গাড়িতে টিকিট লাগে না। চেকার হলে শুধু বাবার পুরনো স্বভাবটা ঝালিয়ে নেওয়া। আমাদের বেড়ালছানার মত নিয়ে যখন তিনি ট্রেনে এখানে সেখানে আশ্রয় খুঁজছিলেন, তখন বাবার স্বাভাবিক বুদ্ধি আমাদের কত অপমান থেকে যে রক্ষা করেছে। বাবা দিলখোলা মানুষ। আমি একেবারে বিপরীত। মুখচোরা স্বভাবের বলে ঠিক কথার পৃষ্ঠে ভাল কথাও যোগাতে পারি না।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই হু-হু করে কান্না উঠে এল বুক থেকে। আমি আমার প্রিয় গাছপালা, হেমন্তের কুকুর পিলু মায়াকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ফিরলেও মানুষ হয়ে ফেরা দরকার। বাবার যেন বংশের মান রক্ষা হয়। এমন কিছু করব কি করে, তাও জানি না। কেন জানি সব সময় মনে হয়, আমার দুরবস্থা দেখে কেউ আমায় ঠিক আশ্রয় দেবে। আর কিছু না পাই, বাবার আকৃতি পেয়েছি। বাবা আমার বড় সুপুরুষ মানুষ। দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এবং বড় পুষ্ট গোঁফ আর মজবুত শরীরের খানিকটা আমার মধ্যে ইতিমধ্যে এসে গেছে। চোখ বড় বড়। যে চোখ দেখলে মানুষের মায়া হবার কথা।

রাতের ট্রেন ছুটছে। রাতের ট্রেন বলে যাত্রী কম। শুয়ে বসে থাকা যায়। এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছি। অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে আছি, কেউ একবার জিজ্ঞেসও করছে না খোকা কোথায় যাবে? এ সময় কেউ দুটো কথা বললেও যেন সাহস পেতাম। সব যাত্রীদের দিকেই চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার সমবয়সী মেয়েটি মাত্র দুবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, গায়ে আমার কোন ভদ্রলোকের বাচ্চার ছাপ নেই। হাফ প্যান্ট, কালিঝুলি মাখা, মুখটা কেমন দেখাচ্ছে তাও জানি না। পা খালি। এই সম্বল করে আমি আপাতত কলকাতা যাচ্ছি। শুনেছি শহরটাতে মাটি নেই। যেখানে মাটি নেই, সেখানে মানুষের পাপপুণ্য বোধও কম। কলকাতার নামে বাবা সব সময়ই ক্ষেপে থাকতেন। সেই শহরে আমি গেছি জানলেই বাবা ভারি মনোকষ্টে ভুগবেন! কিন্তু যাঁর সঙ্গে আমার আপাতত দেখা হওয়া দরকার, তাঁকে পেতে হলে শহরটা না মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তিনি দিল্লীতে থাকেন। মানুষের জন্য তাঁর ভারি কষ্ট। কাগজে পড়েছি, তিনি যে কোন মানুষকে ইচ্ছে করলে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা দিতে পারেন। আমার এতটা দরকার নেই, একটু আশ্রয় আর খাদ্য আর নীল মলাটের বই। সঙ্গে ভদ্রগোছের কাজ। বাবার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা, ফেরার সময় পিলু-মায়ার জন্য জামাপ্যান্ট। ছুটিছাটায় বাড়ি ফিরব যখন, মার জন্য জামদানি একখানা শাড়ি।

গ্যারেজে তাঁর ছবি কাগজে দেখেছি, আর মনে মনে কথা বলেছি। তাঁর কোটে লাল গোলাপ ফুল। শিশুদের তিনি গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। এই দেশবাড়ির কাকা জ্যাঠার মতো—তিনি আমায়ও বুকে জড়িয়ে যেন কথা বলছেন, তোমার খুব কষ্ট। বলব, হ্যাঁ, এই দেখুন না, গোবিন্দ আমাকে শুধু শুধু মারে। আমার খুব পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হয়। আমি কি ইচ্ছে করে অঙ্কে ফেল করেছিলাম? বাবা বলতেন, বাড়িঘর না হলে মানুষের পড়াশোনারও দরকার হয় না। যাও বাড়িঘর হল, বই নেই। পরীক্ষার আগে একটা কাটাছেঁড়া অঙ্কের বই—ও পড়ে কেউ পাস করতে পারে? ১৬-র উপপাদ্যটা পর্যন্ত উপড়ে নিয়েছে। আঃ, যদি ওটা থাকত, ফেল করতাম না অঙ্কে। কিন্তু আমার বাবা যখন জানলেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাস করেছি, তখন কি খুশি! আমার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে বললেন, বিলু, জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করেছে রে? মন খারাপ করছিস কেন? দেশের যে অত বড় মানুষ আপনি, আপনার নাকি ন'টা বিষয়ে পাস। বাবার কাছে সব বিষয়ে আপনি পাস করতে পারেন নি কেন? দেশ ভাগে আপনার মদত না থাকলে বাবা বোধ হয় আপনাকে সব বিষয়েই পাস মার্ক দিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু বাবার কাছে জীবনে সব বিষয়ে পাস করা ছেলে। আমার কিছু একটা হিল্লে করে দিতেই হবে।

এসব কথাগুলিই ঘুরে-ফিরে আমার মাথায় আসছে। মাঝে মাঝে দরজায় শব্দ হলেই তাকাচ্ছি। চোর-বাটপাড়ের মতো বসে থাকা। চেকারবাবু কোন দরজা দিয়ে ঢুকবে কে জানে? মাঝে মাঝে জানলায় উঁকি মেরে দেখছি। গোটা দুই-চার স্টেশন পার হয়ে গেলে বড় একটা স্টেশনে গাড়ি এল। এখানে এত বিলম্ব কেন বুঝতে পারছিলাম না। তবে কি দেশের সব পুলিস আর চেকারবাবুরা দেখে ফেলেছে, ট্রেনে একজন বিনা টিকিটের যাত্রী আছে? বুকটা গুরগুর করছে। উপরে বাঙ্ক। পা ঝুলিয়ে বেশ নির্বিঘ্নে

ঘুমাচ্ছে কেউ। টিকিট কেটে যেদিন আমি ট্রেনে চড়ব, ঠিক এভাবে একটা ঘুম। অনেক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আরও একটা আকাঙ্ক্ষা জীবন আমার এ মুহূর্তে পকেটে পুরে ফেলল। ট্রেনে যেতে যেতে কত সুন্দর সব গাছপালা শস্যক্ষেত্র শহর গঞ্জ চোখে পড়ে—কিছুই তারিয়ে তারিয়ে দেখতে পারছি না। সাত খুন মাপ ঠিক, কিন্তু আমি যে উদ্বাস্তু তার প্রমাণ? কথা বলি বাঙাল ভাষায়, ওটা একটা বড় রকমের সার্টিফিকেট—আর যদি নাই শোনে, বলে দেব বাবার আমি জীবনে সব বিষয়ে পাস করা কৃতী ছেলে—কাজের খোঁজে বের হয়েছি। আমার মা-বাবা বড় গরিব। আমি কলেজে পড়ব, ভাইবোনেদের কত আশা। যখন বড় হব, আমার টাকা হবে, মান যশ হবে, কড়া ক্রান্তি মিটিয়ে দেব।

মনে মনে নানা ভাবে সাহস সঞ্চয় করে যাচ্ছি। আর সারাক্ষণ নেংটি ইঁদুরের মতো এ দরজায় ও দরজায় পালাচ্ছি। কখনও উঁকি মারছি, কখনও রড ধরে এ কামরা ও কামরা করছি। যতক্ষণ সম্মানের সঙ্গে ট্রেনযাত্রা শেষ করা যায়। ও মা, কখন আমি এ সব করতে করতে বাঙ্কের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিই না। সকালবেলায় ঝাড়ুদার এসে পা টানতেই জেগে গেলাম। ও বাবা, মরা মানুষ নাকি!

খুব কাঁচুমাচু মুখে তাকালাম। কথা বললাম না। টেনে বের করে দিয়েছিল কতকটা আর কিছুটা বের করে দিলে কামরার বাইরে। সেটা দয়া করে করে নি। করলে রক্ষা পাওয়া যেত। ট্রেনে যে এসেছি, তার কোন চিহ্ন থাকত না। ফলে কামরাটা পার হতে হল নিজেকে। আর নেমেই দেখি, কি পরিচ্ছন্ন আকাশ, শরতের মিষ্টি রোদ। রেলের অজস্র লাইন বাড়িঘর পেছনে ফেলে কত দূরদূরান্তে ছুটেছে। আর তখনই দেখলাম পায়ের কাছে একটা ডাইরি কার পড়ে আছে। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নিতে নেই। বাবার শিক্ষা। কিন্তু আমার ইতিমধ্যে নানাভাবে নিয়মভঙ্গ হয়েছে। কাজেই ডাইরিটা পকেটে পুরে ফেললাম। কেউ না আবার দেখে ফেলে। একা মানুষ, সব কিছুই এখন জীবনে বড় দরকারী বস্তু হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়, কত গাড়ি, কত ইঞ্জিন, এটা যে কোন স্টেশন নয়, বুঝতে অসুবিধা হল না। শান্টিং করছে গাড়ি। ঝমঝম শব্দ। খুব সন্তর্পণে লাইনগুলি পার হয়ে ছোট্ট একটা নিমের ছায়ায় বসা গেল। এবং মনে হল ডাইরিতে সব লিখে রাখা দরকার। কারণ সব আবার ভুলে না যাই। বিশেষ করে ধার-দেনা যার কাছে যা জমছে। প্রথমেই লিখলাম গোবিন্দ-বিশ টাকা। পরে লিখলাম, রেলগাড়ি—তিন টাকা দশ আনা। গোবিন্দের কৌটায় রাখা কুড়িটা টাকা না বলে নিয়ে এসেছি। একটা চিরকুটে লিখে এসেছি, গোবিন্দদা, তুমি আমাকে মার কেন? আমি তোমার কুড়ি টাকা নিলাম। যখন বড় হব, মান যশ হবে, তখন টাকা ফেরত দেব। বাবার নামে চিরকুট—বাবা, আমি আপনার কাছে ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করব বলে বের হয়ে পড়েছি। আমার জন্য ভাববেন না। আর যাই মানাক, আপনার সব বিষয়ে পাস করা ছেলেটির কিন্তু গ্যারেজে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া মানায় না। গোবিন্দদা আমাকে অনর্থক মারধোর করতো। আমরা গরিব বলেই ও এতটা সাহস পায়।

তা হলে মোটামুটি ধার-দেনার হিসাব লেখা হয়ে গেল। এখন কিছু খাওয়া দরকার। দিল্লীর গাড়িটা কোথা থেকে ছাড়ে খোঁজখবর নিতে হবে।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সামনে কিছুটা হেঁটে গেলেই শিয়ালদা স্টেশন। স্টেশনেই গাড়ি ছিল। শেষ মাল খালাস করার জন্য আবার বুঝি নিয়ে এসেছিল এখানটায়। সেটা খালাস পেয়ে যাওয়ায় গাড়ি হালকা হয়ে গেছে। চলেও গেছে। এখন খালাস মালের বিড়ম্বনা। সে কি করে?

খালাস মালটি আসলে খুবই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কি সব বড় বড় বাড়ি, যেদিকে চোখ যায় গিজগিজ করছে টিনের চাল, অজস্র রাস্তা। দালান কোঠার মেলা বসে গেছে। খালাস মালটির পেটে খিদের উদ্রেক হয়েছে। চোখে-মুখে জল দিয়ে কিছু খাওয়া দরকার।

খালাস মালের খিদেটা একটু বেশি। যাকে বলে খিদে সম্পর্কে নাড়ি তার টনটনে। কিন্তু এখানে সবই গোলকধাঁধা। লোহার রেলিং দু'ধারে। সুতরাং কাউকে অনুসরণ করা ভাল। শেষ পর্যন্ত যেখানটায় আসা গেল, ওটার নাম তার জানা নেই। পিছনের দিকে তাকাতেই বুঝল জায়গামতই এসে গেছে। বড় বড় হরফে লেখা স্টেশনের নাম। চা-বিস্কুটের দোকান। ডিম ভাজা, মাছ ভাজা, মানুষজন, মলমূত্র গাদাগাদি। ভারি দুর্গন্ধ। স্টেশন চত্বরে শুয়ে বসে কালিমাখা সব মুখ। হোগলা চাটাই পাতা, মুড়ি

চিড়া ভাত যে যা পারছে খাচ্ছে।

বুঝতে কষ্ট হল না, এরাও আমার মত খালাস মাল। বুকে সাহস এসে গেল। এক আনার চিনাবাদাম কিনে খাচ্ছি, আর ভাবছি, গাড়িটার খবর কে দেবে? কাকে বলি, দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়ে? বেশি কথাও বলা যায় না, যদি ধরে ফেলে পালাচ্ছে। পুলিস তো না পারে, হেন কাজ নেই। পালাচ্ছে যখন, নির্ঘাত চুরি-চামারি করেছে। তা করেছে, কিন্তু গোবিন্দদার কাছে সে তো চিঠিতে জানিয়ে এসেছে, অর্থ ফেরত যোগ্য। তাছাড়া যদি পুলিস ধরেও ফেলে, ডাইরি খুলে দেখাবে, এই দেখুন কে কি পাবে, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে সব ফেরত। টাকা মান যশ হলে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠব। একটা লম্বা ঘুম দেব। কেউ বিরক্ত করলে ধমক দেব। ওঃ, কি মজা! ট্রেনটা যাচ্ছে আর যাচ্ছে।

তখনই খ্যাঁক করে উঠল একটা মুখ, এই উল্লুককা বাচ্চে। আমাকে ঠেলা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। গাড়ি চাপা পড়ি নি, ভাগ্য। এত দিকে নজর রাখি কী করে? কলকাতা শহর—বাবা ঠিকই বলেছেন, এখানে মানুষ থাকে! এখনই বাবার কৃতী ছেলেটা যেত। আসলে বুঝতে পারছিলাম, এই শহরে আসতে হলে আগে থেকে ট্রেনিং দরকার। কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছিলাম না। এত গাড়ি যে কোথায় থাকে! তারপর চোখ বুজে লম্বা দৌড়। যা হয় হবে। তারপর চোখ খুলে দেখি না সত্যি পার হয়ে এসেছি। যাক্। আর পায় কে? ফিসফিস করে রাস্তাটাকে বললাম, এই বাচ্চে, আটকে রাখতে পারলি? সামনে দেখলাম লেখা, এনকোয়ারি। এই তো সেই জায়গা। ভিড় ঠেলে মুখ বার করে বললাম, দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়বে? লোকটা কি ভাবল, কে জানে? হঠাৎ তেড়ে এল, এই ধর ধর। ধর তো ওটাকে। চ্যাংড়ামো করার জায়গা পায় না। ধরতে বললেই কি আর ধরা যায়? নিজের ভাবনা-চিন্তা না করে দৌড়। একটু আড়ালে এসে দাড়াতেই হুঁশ হল, আমি কি অন্যায় বলেছি, লোকটা আমাকে ধরতে বলল? সামান্য ঘাড় তেড়া করে এগিয়ে গেলাম—আমার কি দোষ? আমায় এত অবজ্ঞা করছেন কেন? দিল্লীর গাড়িতে আমি উঠতে পারি না? শেষে মনে হল, যাক গে, বয়স্ক মানুষ! যা ভিড়, মাথা খারাপ হতেই পারে। আর আমার তো এক জামা প্যান্ট সম্বল। পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। যার এমন হতশ্রী অবস্থা তার বোধ হয় দিল্লীর গাড়িতে ওঠার নিয়ম নেই। মানুষজন পঙ্গপালের মত উড়ছে। কাকে বলা যায়? আমারই বয়সী একটা ছেলে লজেন্স বিক্রি করছে। সমবয়সী ভেবে টান ধরে গেল। আপাতত ত্রাণকর্তা ভেবে বললাম, এই যে শুনছ।

—লজেন্স? কটা দেব?

—না। দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়ে?

—এটা তো এখানে ছাড়ে না। হাওড়া যেতে হবে।

—কোন্ দিকে?

—সামনের মোড়ে বাস পাবে।

সামনেটা কোথায়? কারণ যেদিকে তাকাই, মানুষের মিছিল। যাচ্ছে আসছে। গাড়ির মিছিল। যাচ্ছে আসছে। এত সব পার হয়ে সেই সামনেটাকে খোঁজা কত যে দুরূহ এবং মনে হল চড়চাপড় খেয়ে জায়গার মাল জায়গাতেই পড়ে থাকা ভাল ছিল। কি যে দুর্মতি হল। বেলা বাড়ছে। পেটে কামড় বসাচ্ছে। সামান্য ভাত মাছ, আমার একান্ত প্রিয় খাদ্য। সুস্বাদু খাবার বলতে এই বুঝি। নিচে নেমে ট্রাম লাইনও পাওয়া গেল। আর কোথা থেকে আসছে ইলিশ মাছ ভাজার ঘ্রাণ। সব গুবলেট করে দিল। দিল্লীর ট্রেন, হাওড়া, টাকা মান যশ, সব মাথা থেকে ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু এক টুকরো ইলিশ মাছ ভাজা—আপাতত মাছ ভাজা ভাত হলে মন্দ হয় না। সূর্য মাথার উপর কখন উঠে গেছে—এত কি ভাবনা গেল মাথার মধ্যে দিয়ে যে বেলা যায় টের করতে পারি না। ও মা, এই সেই বেরন হোটেল। গোবিন্দদা বলেছিল, কলকাতায় গেলে বেরন হোটেলে খাস। তখন কলকাতার স্বপ্ন বড় শহরে গেলেই নাকি মানুষের হিল্লে হয়ে যায়। এখন আর কিছু খোঁজাখুঁজি না। চটপট ঢুকে বললাম, ভাত দিন।

কাউন্টারের লোকটা তাকাল। আমি যে ভাত মাছ খেতে পারি, আমার যে রেস্ত আছে, লোকটার বোধ হয় বিশ্বাস হল না। তাকিয়ে হঠাৎ বলল, যা ভাগ! বেটা কোথাকার ভিখারী—

খুব রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা দেখা যাবে। টাকা মান যশ হোক। দেখা যাবে। তবে এখন কোন

গন্ডগোল করা ঠিক হবে না। সময়টা আমার ভাল যাচ্ছে না। বললাম, টাকা দেব। এই দেখুন আমার কাছে টাকা আছে। বলে টাকা বের করে দেখাতেই লোকটার মায়া পড়ে গেল।

বলল, বস। কি খাবি?

—ভাত খাব। মাছ খাব। ওদিকের টেবিলে একটা লোক মাছের মুড়ো তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। লোভে পড়ে বলে ফেললাম, মাছের মুড়ো খাব।

সামনের বেসিনে হাত ধোওয়া গেল। মুখে চুরি করে সামান্য সাবান মেখে ফেললাম। আড়চোখে দেখছি, কারণ হাতমুখ ধোবার এমন সুযোগ আর কখন পাব জানি না। মুখটা ধুতেই বাবার মুখশ্রী ভেসে উঠল। আমায় এখন দেখলে লোকটা নিশ্চয়ই আর ভিখিরীর বাচ্চা ভাববে না। জামার আস্তিনে মুখ মুছে যখন খেতে বসলাম, তখন আমার প্রায় জ্ঞানগম্যি লোপ পেল। ঝোল, ভাত, ভাজা, মুগের ডাল, মাছের মুড়ো সব চেটে খেতে লাগলাম। চারপাশের টেবিলের লোকগুলি হাঁ করে দেখছে, তাও খেয়াল নেই। ওরা তো জানে না, কাল দুপুর থেকে পেটে কোন দানা পড়ে নি। খিদে পেলে মানুষ বোধ হয় কিছুটা আহাম্মক হয়ে যায়। খাবার শেষে বিল দেখে টের পাওয়া গেল, পুরো দু' টাকা পাঁচ আনা বিল। এত টাকা একসঙ্গে খেয়ে মনটা ভারি দমে গেল। হিসাব করে বুঝলাম রেস্ত বলতে এখন সম্বল সতের টাকা এগার আনা। এটা যে কত বড় সম্বল, এই বড় আগাপাশতলাবিহীন শহরে না এলে বোঝা যেত না। কারণ শহরটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝছি না। সব বড় বড় রাস্তা, এত বড় রাস্তা আমার বাপের জন্মে কে কবে দেখেছে? এক সঙ্গে দু'তিনটে গাড়ি রাস্তা ধরে যায় আসে। বড় বড় ট্রাম গাড়িগুলি গলে যায়। আর ভেপোঁ বাজে, ক্রিং ক্রিং শব্দ। যেন পাগলা ঘন্টি—হুঁশিয়ার! সামনে পড়লেই ভোগে লেগে যাবে।

আর যাই হোক, ভোগে লাগছি না। কারো হাত ধরে রাস্তা পার হওয়া যায় না? হাত না হোক, জামার আস্তিন। তাও যখন সাহসে কুলাল না, লোকের পিছু পিছু যাওয়াই ভাল। একজন মুটের পেছনে যেতে গিয়ে রাস্তা পার হবার জ্ঞানগম্যি মিলে গেল। একার ভয় অনেক। অনেকের পেছনে থাকলে গাড়িও ভয় পাবে। মোড়ে শরবতের দোকান। কাপড়ের দোকান। মিষ্টির দোকান। পান সিগারেটের দোকান। মানুষের শুধু অগুনতি মাথা। এত লোক কলকাতায় থাকে? এতটুকু নির্জন জায়গা নেই যে এমন সুস্বাদু খাবার খেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া যেতে পারে! তার পরই মনে হল, পকেটে টাকাটা থাকতে থাকতে দিল্লীর গাড়ি ধরা দরকার। কোন্‌দিকে গেলে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যাবে? শহরের উত্তরে না দক্ষিণে? মুশকিল শহরের উত্তর দক্ষিণও টের পাচ্ছি না। সূর্য আকাশছোঁয়া সব বাড়ির পেছনে লুকিয়ে আছে।

মানুষের সঙ্গে কথা বলা কী যে নিদারুণ বিপত্তিকর, রাস্তায় ট্রেনে সর্বত্র টের পাচ্ছি। সবার যেন টাকার থলে হারিয়ে গেছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে। কেউ দু'দণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়ালেই অন্য কেউ থলেটা বুঝি গস্ত করবে! মনে অবশ্য অনেক প্রশ্নটশ্ন কখন থেকে থিকথিক করছে। হাওড়া কোন্ দিকে? হাওড়ার বাস কোথায় পাওয়া যায়? কখন ছাড়ে? এতগুলি প্রশ্ন শুনে যদি বিরক্ত হয়। পালিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, সদাশয় মানুষের বড় অভাব পৃথিবীতে। সবারই টাকার থলে হারিয়ে গেলে যা হয়। শরবতওয়ালাকে বললে কেমন হয়? সে তো নিশ্চিন্তে শুধু ঢালাঢালি করছে। আর লাল নীল রঙের বাহারী শরবত এগিয়ে দিচ্ছে। টুক করে মুখ বাড়িয়ে বললাম, হাওড়ার বাস কটায় ছাড়ে? কে বলছে, লোকটির যেন লক্ষ্য করার কথা না। কী বলছে, তার জবাব দেওয়াই সারকথা। গ্লাসে ঢালাঢালি করতে গেলেও গভীর মনোযোগের যে দরকার হয়, অর্থাৎ সারা মাস কাল বছর যুগ যুগ ধরে অনন্ত এই ঢালাঢালি করতে করতেই জীবন যায়, এমন মনে হবার সময় শুনলাম—ঐ তো যায়।

ঐ তো যায় কাকে বলা। তাই তো, বাসটা আমারই সামনে দিয়ে চলে গেল! এটা হাওড়ার বাস! কী যে দুর্গতি এখন! মনে মনে বললাম, শরবতওয়ালা, বাস আবার কখন আসবে? জোরে বলতে পারছি না। যদি মনোযোগ ভঙ্গের দরুন খ্যাঁক করে ওঠে। আসলে এদেশে আসার পরই বাবার পায়ের তলাকার মাটি সরে যায়। ক্রমে আমরা বাবার সঙ্গে কেমন যেন ভীরু স্বভাবের হয়ে যাই। কেবল পিলুটা অন্য রকমের। ও সঙ্গে থাকলে কখন হাওড়া পৌঁছে যেতে পারতাম।

পিলুর জন্য, বাড়ির জন্য আবার মনে টান ধরে গেল। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। সকালের মধ্যেই বাড়িতে খবর পৌঁছে যাবার কথা। মা হয়ত হাউ-হাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। বাবার স্বভাব অন্য রকমের। তিনি শুধু একটা কথাই বলবেন, ভবিতব্য। পিলুটা গুম মেরে থাকবে। তার দাদাটা হারিয়ে গেছে। বনে-জঙ্গলে তার ঘোরাঘুরিটা হয়ত একটু বেড়ে যাবে। মায়ার যা স্বভাব— সে রোজই আশা করবে, মাঠ পার হয়ে দাদা ফিরে আসছে। ফাঁক পেলেই সে বড় রাস্তায় চলে যাবে।

হাওড়ার বাসের জন্য খুব আর একটা ভাবছি না। আবার ক'টায় হাওড়ার বাস আসবে জিজ্ঞেস করলেই হয়ে যাবে। এখন হাতে কিছুটা সময় যখন আছে, এদিক ওদিক দেখে এলে হয়। এই যেমন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর—এই কলকাতাতেই এগুলি আছে। বেশি দূরে যেতে হবে না। তারপরই মনে হল, ফিরে এসে যদি বাস ফেল করি, এই সব ভয়ে জায়গা থেকে কেন জানি নড়তে সাহস হল না।

শরবতওয়ালার নজর আছে বলতে হবে। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি—কেন দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তায় কেউ কলকাতায় দাঁড়িয়ে থাকে না, দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু একটা অপকর্মের ধান্ধা আছে—তার কাঁচা পয়সা কেড়ে নিতে কতক্ষণ? সে বেশ সতর্ক গলায় বলল, এই সামনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সরে দাঁড়া।

কথা যখন বলেছে, সাহস আমারও কম না। কিছুটা সরে গিয়ে বললাম, হাওড়ার বাস আবার ক'টায় আসবে?

লোকটা হয়ত আমাকে ত্যাঁদড় ভাবল। আমি যে সদ্য কাঁচামাল, এই কলকাতায়, সে বিশ্বাস করল না। আপদটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, এটাই তার বোধহয় এখন বড় ভরসা। সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিতেই কলকাতার শেষ চেনা লোকটা আমার আবার কেমন অচেনা হয়ে গেল।

আবার সামনে একের পর এক বাস চলে যাচ্ছে। বাপস্! বাসের কপালেও যে লেখা আছে কী সব? এতক্ষণ এটা খেয়ালই করি নি। সারাক্ষণ মানুষজন, বাস-ট্রাম আর গাড়িঘোড়া কেবল দেখে যাচ্ছি। স্টেশনের ও পাশটায় সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি, একটা ভাড়া করলে সে নিশ্চয়ই হাওড়ায় পৌঁছে দিত। কিন্তু কত দূর কে জানে? হাওড়ার ব্রীজ জানা আছে, তাই বলে রাস্তাটা কত লম্বা, কি করে জানব? শহরে এসে কত কিছু ইচ্ছে হচ্ছে! ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, ইডেন গার্ডেন—সব নাম শুনেছি, অথচ বাবার সেই ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে আমার বড় জরুরী কাজ। কখন কোথায় আবার চলে যায়? এবারে স্বাদ আহ্লাদ না মিটুক, পরের বারে হবে। টাকা মান যশ হলে সবাইকে কলকাতা দেখিয়ে নিয়ে যাব। সবাইকে নিয়ে ট্রামে চড়ব। পিলু প্রথম ভড়কে গিয়ে এত ভাল ছেলে হয়ে যাবে যে রাস্তাই পার হতে পারবে না। আমার তখন হাসি পাবে।

বাবা, রানাঘাটের বড় পাবদা মাছ খাবার গল্প করলে, পিলুর বড় বাসনা হয়েছিল রানাঘাট দেখার। সেটা কত দূর, সে বাবাকে বার বার প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিল। পিলু জানেই না তার দাদা রানাঘাট পার হয়ে আরও কত দূর চলে এসেছে। ফাঁকে ফাঁকে বাসের কপালে নাম পড়ে যাচ্ছে—এই নামগুলিই গন্তব্যস্থল বাসের, এই অনুমান নির্ভরের উপর ভরসা করে শেষ পর্যন্ত হাওড়াগামী বাসে ওঠা গেল। কিন্তু সংশয় প্রবল। কোথাকার মাল কোথায় নিয়ে আবার খালাস করে দেবে কে জানে? বললাম, বাস হাওড়া যাবে? লোকটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে বলল, যাবে। ভিতরে ঢুকে মনে হল, স্টেশনের কথা বলা হয় নি। আবার মুখ বাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে প্রশ্ন, হাওড়া স্টেশন যাবে?

—যাবে।

সে তো যাবে। স্টেশনটা আমি চিনব কী করে? ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করার এত ফ্যাসাদ আগে জানলে, মাথা গরম করতে সাহস পেতাম না। এমন একটা ব্যস্ত শহরে একই লোককে পর পর দুটো প্রশ্ন করেছি এবং জবাব পেয়েছি—ভাবাই যায় না। গাদাগাদি বাসে দাঁড়িয়ে। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজিয়ে লোকটা কি সব হাঁকছে। এই হাঁকগুলি কিসের সংকেত? কারণ পিলুটা যা, সে তো হাঁ করে দাদার অভিযানের প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

শুনবে। কি ভাবে হাওড়া পৌঁছলাম, তাকে কোন বর্ণনাই দিতে পারব না। আসলে মনে হচ্ছিল, টানেলের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। মানুষজন চারপাশে এত ঘন হয়ে দাঁড়ালে পৃথিবীটা গোলকধাঁধা হওয়া স্বাভাবিক। একবার অতি কৌতূহলে মাথা গুঁজে দেখার চেষ্টা করলে কনুইয়ে গুঁতো মেরে জায়গারটা জায়গায় ফিরিয়ে দিল। কোনরকমে টাল সামলে কনুইওয়ালাকে বললাম, দাদা, হাওড়া স্টেশন এলে বলবেন।

লোকটা এবারে খুব ভালমানুষ হয়ে গেল। বলল, বাসটা স্টেশনেই যাবে।

কিছুটা স্বস্তি। লোকটার কনুই সোজা হয়ে আছে, ওটা আরও স্বস্তি। নাকে লেগেছে। টনটন করছে। একবার হাত বুলিয়ে দেখলাম, হাতে রক্ত-টক্ত লাগে কিনা? না, এখন পর্যন্ত হাত-পা-মুখ সবই অক্ষত রাখতে পেরেছি। বাবা-মার আর্শীবাদেই সব। বাবা-মার আশীর্বাদে স্টেশনেও ঠিক পৌঁছে যাব। কিন্তু লোকটা ভুলে যায় নি তো? আমার কথা মনে রাখার তার কোন দায় নাও থাকতে পারে। এত ভিড় ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতির মধ্যে বাবার নাম ভুলে গেলেও দুঃখ করার নেই। সুতরাং ফের প্রশ্ন—স্টেশন আর কত দূর?

লোকটা বলল, অনেক দূর। বাসটা যাচ্ছে না, সেই থেকে হর্ন বাজাচ্ছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এত কি রাস্তায় পড়ে আছে যে, বাসটাকে এগুতে দিচ্ছে না? এটা কেমন আজব শহর, যেখানে গাড়িঘোড়া চলে গোযানের মত। বাবার কথাই ঠিক, শহরটায় মাটি নেই, মাটি না থাকলে মানুষের ধর্ম থাকে না। শান পাথর শুধু, গরমে ভ্যাপসা হয়ে যায়। শহর তো নয়, যেন অতিকায় এক উত্তপ্ত তাওয়া। মানুষজন ঘরবাড়ি, তার উপর ভাজাভুজি হচ্ছে।

এখন আমি বাসে নিরালম্ব মানুষ। কোন ভয় নেই। ভেসে আছি মতো। আঠার মধ্যে লেপটে আছি, উড়ে যাবার ভয় নেই। তারপরই বাসটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে কোথাও উঠে গেল। মৃদুমন্দ হাওয়া আসছে। পাশের লোকটা তখনও আমার কথা মনে রাখতে পেরেছে। আমার তৃতীয় বার প্রশ্ন করার সাহস কম। সে নিজ থেকেই যখন বলল, এসে গেছি, তখন তার কাছে আমার ঋণের শেষ থাকল না।

বাস খালি করে সব নেমে গেল। সামনে অতিকায় লাল রঙের বাড়ি। পিঁপড়ের সারি যেন মানুষজনের মিছিল। এর মধ্যে আমার পা গুটিগুটি চলছে। বড় বড় সাইনবোর্ড, খেজুর, আপেল, আঙুরের দোকান, বইয়ের দোকান। মানুষজন দৌড়াচ্ছে কেন? কোথাও আগুন লাগে নি তো? ভিতরে ঢুকে রহস্যটা ধরা গেল। গাড়িগুলি উগরে দিচ্ছে মানুষজন। আবার উদর ভর্তি করে চলে যাচ্ছে। কি সব এলাহি কাণ্ডকারখানা! একটা বড় ঘড়ি, কত সব ফাঁক ফোঁকরে মেমসাবের মুখ। আর অজস্র ভিখারী। সবাইকে একটা করে পয়সা যদি দিই, তালেও কুলাবে না। মানুষের আর্ত চিৎকার শুনলে নিজের মধ্যে কেউ যেন আমার কথা বলে ওঠে, তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ। এদের মধ্যে মিশে গেলে, তোমার মা-বাবা আর তোমাকে চিনতে পারবে না।

সহসা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কেউ যেন আমায় ডাকছে। সে কে, বুঝতে পারছি না। চারপাশে গভীর অন্ধকার। কোন আলো জ্বলছে না। কোথায় আমি আছি, ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। ঘুমের জড়তায় মাথাটা বড় নির্বোধ। ভ্যাবলার মতো বসে থাকা ছাড়া যেন আর কোন উপায় নেই। জড়বুদ্ধি, স্থির চোখ, ভেতরে চাপা অসহায়তা। মাথার উপরে আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা আরও দূরে কোন জংশন স্টেশন কিংবা কোন লোকালয়ে আছি বিশ্বাস হচ্ছিল না। মাথার মধ্যে একটা রেলগাড়ি সহসা ঝমঝম করে চলে গেল। মনে পড়ে গেল, ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম—এই পর্যন্ত। না, তারপর মনে কিছু আসছে না।

অন্ধকারে টের পেলাম, কেমন আবছা মতো একটা মানুষ যেন এগিয়ে এসে আমাকে দেখছে। আবছা ছায়ামূর্তিটাকে জায়গা করে দেবার জন্য সরে বসলাম। এটা একটা বাড়ির গেট, বসার রোয়াক দু'পাশে। একটা ধাপের সিঁড়িতে এতক্ষণ এক পলাতক শুয়েছিল তবে। নীচে কাঁচা নর্দমা—গুনগুন করছে মশার পঙ্গপাল। আবছা মূর্তিটা এবারে টর্চ জ্বেলে আমার কি দেখল কে জানে? জায়গা বেদখল দেখে লোকটা রাগ করতে পারে। কেউ রাগ করলে আমার বড় খারাপ লাগে। অন্ধকারে সরে পড়াই

শ্রয়—হাঁটা দিলাম। মাথাটা ঘুরছে। তিন-চার দিন অনাহারে থাকলে মাথার কি দোষ! যতটা পারা যায় ঠিক থাকার চেষ্টা করছি।

—এই কোথায় যাচ্ছ?

তাহলে এই লোকটাই আমাকে ডাকছিল। আমাকে ঘুমের নেশায় পেয়ে গেছে। কাল থেকে, যেখানে পারছি শুয়ে পড়ছি। পৃথিবীতে আমার ঘরবাড়ি আছে, মা-বোন আছে, পিলু আছে, কিছুই মনে আসছিল না। আমার পলাতক জীবনে কেউ আজ পর্যন্ত এমন প্রশ্ন করে নি! আমি কোথায় যাচ্ছি, এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা ছিল না। থমকে দাঁড়ালাম। অনেকদিন পর কেউ আমায় ডাকল।

লোকটা নেমে এল। কাছে এসে দাঁড়াল। কেমন টলছে। আপাদমস্তক টর্চ মেরে কি দেখে বলল, রাগ দ্যাখ ছোকরার। আমি খুব খারাপ মানুষ! তুমিও। মশারা যে ষড়যন্ত্র করছে, টের পাও নি। যা ঝাঁক বেঁধে বসেছিল, উড়িয়ে নিত। আমার সামনে হাপিস করে দেবে—না, সে হবে না। হতে দেব না। তার পরই লোকটা ওক দিল। মাথার ওপরে হাত তুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো মুখের ওপর দুলতে থাকল।

লোকটা টেনে টেনে কথা বলছিল। সব কথা স্পষ্ট নয়। জড়তা রয়েছে কথায়। লোকটা মাতাল টের পেলাম। কেমন ভয় ধরে গেল। দৌড়ে পালাব ভাবছি। কিন্তু হাঁটুতে জোর পাচ্ছি না। খেতে না পেলে যা হয়। মাথা ঠিক থাকে না। হলে কি হবে, জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। মর্যাদার বড় দম্ভ মনে।

সে বলল, রোয়াকে শুয়ে ছিলে কেন? বাড়িঘর নেই? আমার আছে। চিনতে পারছি না। ওক। আবার কথা, কিন্তু শেষ করতে পারল না। তার আগেই পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম। পড়লে কাঁচা নর্দমায় ডুবে যাবে। মানুষের এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না। বললাম, হাত ধরুন, দিয়ে আসি।

—সেই ভাল। একটা হেঁচকি দিল। তারপর টর্চটা আমার হাতে দিয়ে বলল, খুঁজে দেখ জুঁই ফুলের গাছ।

—জুঁই ফুলের গাছ এত রাতে কোথায় খুঁজব?

লোকটা আমাকে অবলম্বন করে হাঁটছে। টর্চ মেরে মানুষটির অবয়ব দেখার চেষ্টা করতেই, কেমন আর্ত চিৎকার—না না। আলো না। মানুষটিকে বড় সম্ভ্রান্ত মনে হল। পাজামা পাঞ্জাবী গায়।

—কী—পেলে?

—না।

—দুটো পাম গাছ?

—না।

—তবে কোথায় নিয়ে এলে?

—জানি না।

—আলবত জানতে হবে। তোমার বাপকে জানতে হবে।

—বাপ তুলে কথা বলবেন না। রাগ করব।

লোকটা কেমন চুকচুক করে বলল, আমার মনু—

তারপরই পাম গাছ, রোয়াক পার হতেই এটা টের পাওয়া গেল। একটা পেয়ারা গাছ, উঠোন, জুঁই ফুলের গাছ। রঙিন ফুলের ঝাড়। সুঘ্রাণ ফুলের। কি ফুলের এমন ঘ্রাণ হয়! সামনে সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠেই লোকটা কি হাতড়াতে থাকল এবং পেয়েও গেল যেন। ভিতরে সহসা আলো, লণ্ডভণ্ড এক ঘরের ছবি।

লোকটা আমার হাতে চাবি দিয়ে সংকেত করল কিছুর। তারপর ধপাস করে সিঁড়িতে বসে পড়ল। দরজা লক করা, চাবি ঘুরিয়ে দিতেই দরজা খুলে গেল। বললাম, উঠুন। কোন সাড়া শব্দ নেই।—উঠুন।

লোকটা হুঁম শব্দ করল।

—আপনার ঘরবাড়ি?

ঘরবাড়ির কথা মনে পড়তেই লোকটা হামাগুড়ি দিতে থাকল। এবং ঘরে ঢুকে খাটের ওপরও

উঠে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। শুধু বলল, বড় সমুদ্র পার হওয়া যায় না?

এমন প্রশ্নের কি জবাব হবে জানি না। এখানে সমুদ্রই বা কোথা থেকে এল? তবে খাটটা বড়ই প্রশস্ত। সাদা চাদর জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে। বালিশ ঠিকঠাক করে দিলে পরিপাটি বিছানা। বিছানাতে উঠেই লোকটা লম্বা হয়ে গেল। মরার মতো পড়ে থাকল।

এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ। কথা বললে আর জবাব দেয় না। কেবল হুঁম করে ওঠে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। আর কি কেউ নেই। ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন—মানুষটার ভূগোল জানতে ইচ্ছে করছে। তবে ক্ষুধার্ত মানুষের যা হয়। অবসাদ—অবসাদ ক্রমেই আমাকে আরও বেশি জড়বুদ্ধি করে তুলছে। খাটের এক পাশে আমিও কেমন লম্বা হয়ে গেলাম। রাত অনেক। চোখ আমার আবার জড়িয়ে আসছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম, লোকটা নেই। দরজা ভেজানো। আর বসে থাকা ঠিক না। রাতের কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত লোকটার ভূগোলে বুঝতে পারছিলাম বড় বেশি পাহাড় জঙ্গল। যে কোন সময় বাঘ লাফিয়ে পড়তে পারে। আর তখনই লোকটা হাজির। ব্যাগে কি সব ভর্তি করে নিয়ে এসেছে। কাঁধে ফ্লাস্ক। হাসি-খুশি মেজাজী মানুষ! কি, ঘুম হল?

—কথা বলতে পারলাম না।

—কাল খুব জ্বালিয়েছি।

মুখে রা সরছে না। অজ্ঞাতকুলশীল এক লোককে এত বড় বান্ধব কি করে মানুষটা ভাবে? তারপরই হাসতে হাসতে বলল, তুমি একটা পাগল আছ। দেশ কোথায়? ঠিক আছে, এখন ওসব থাক। আগে চান করে এস। সামনে গুরুদুয়ারা আছে, কল আছে—এই নাও সাবান। ভাল করে চান করবে। ঘুরে ঘুরে গায়ে বোটকা গন্ধ লাগিয়েছ।

বসে আছি। এতটুকু জোর পাচ্ছি না। চোখ জ্বলছে। সারা গায়ে এক অপার্থিব যন্ত্রণা। টাকা, মান, যশ—না, আর ভাবতে পারছি না। সব বড় সুদূরের হয়ে যাচ্ছে। কেবল লোকটা সদাশয় হয়ে ওঠায় কোথায় যেন মাথায় এক কী-লক গেঁথে দিল কেউ। তাতে পা রেখে ওপরে ওঠা যেতে পারে। মনের মধ্যে অদ্ভুত ঘোলা জল, বেনো জল, নদীর জল, জলপ্রপাতের জল ঢুকে যাচ্ছে। সব কেমন গুলিয়ে উঠছে।

লোকটা ফের বলল, কী হল! বসে থাকলে কেন? যাও। আমার কত কাজ। সামনে গুরুদোয়ারা আছে। রাস্তা পার হলেই পাবে। এই সাবান। জামা-প্যান্ট কাচবে।

তবু বসে থাকলাম। হাই উঠছে।

সদাশয় মানুষটি লুঙ্গি দিল পরতে। ঢোলা ফতুয়া। হাতে তুলে দিয়ে বলল, শীগগির যাও। আমায় আবার বের হতে হবে।

এত সকালে মানুষটি স্নান-টান করে ফিটফাট! কে বলবে, অনেক রাতে মানুষটা তার আবাসে নেশা করে ফিরেছিল। আর যাই হোক, মানুষটিকে ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষের আচরণ কত সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায় কখনো। স্নান সেরে এসে দেখি, চারপিস পাউরুটি, ডিম ভাজা আর ডালমুট সাজিয়ে বসে আছে। আহার শব্দটি এদেশে আসার পরই একটু বেশি মনোরম। আহার শব্দটি মনে এলে মাথা আমার এমনিতেই ঠিক থাকে না। দেরি করলে কোন অদৃশ্য আত্মা কেড়েকুড়ে খাবে, ভয়ে প্রায় হামলে পড়লাম। নিমেষে শেষ করে ফেলতেই মানুষটি হাত মুছে বলল, কত দিন হল?

মুখে পাউরুটির শেষটুকু। কোঁত করে গিলে বোকার মতো তাকালাম।

—কত দিন পর খাওয়া হল তোর?

আমার চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু করে ফেললাম। মানুষটি বোধহয় চোখের জল দেখতে পারে না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে—মনু শোন, বের হচ্ছি। পায়ে জুতো গলিয়ে বলল, তোমার কি নাম?

নাম বললে মানুষটা কেমন আঁতকে উঠে বলল, এই রে, তোর তো ভাই জাত গেল। ছিঃ ছিঃ আগে বলতে হয়—

জাত বিষয়টা আমার বাবার পরম গৌরবের বিষয়। কুলীন ব্রাহ্মণ তিনি। তাঁর কাছে ঘরবাড়ি আশ্রয় সব যেতে পারে—কিন্তু জাত যেতে পারে না। সগৌরবে তাকে টিকিয়ে রাখতে হয়। জন্ম মৃত্যু সব অর্থহীন, জাত ঠিকঠাক না থাকলে। আমার স্বভাবটা অন্যরকমের। বাবার কাছে এজন্য মাঝে-সাজে কুলাঙ্গার। যে মানুষটি আমাকে খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়েছে, তার সংস্পর্শে জাত যায় কি করে ভেবে পেলাম না। আমার বাবা তো জাত যাবে বলে দেশ ছেড়ে চলেই এলেন।

মানুষটির পরনে দামী প্যান্ট শার্ট। শৌখিন। যা কিছু অগোছালো ছিল, সব গোছগাছ করে বের হচ্ছে। একটাই ঘর। পাশে পাঁচিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে পাঁচিল সংলগ্ন সুন্দর ছিমছাম বাড়িটা দেখা যায়। সামনে বড় পাকা রাস্তা—কোথায় কত দূর চলে গেছে! স্নান সেরে আসার সময় কিছু শিউলি ফুল মাড়িয়ে এসেছি। তখনই মনে হয়েছিল একবার—দুর্গাপূজার সময়—শরৎকালে কাশ ফুল ফোটে শিউলি ফুল ফোটে।

আমি কিছু না বলায় মানুষটিকে গম্ভীর দেখাল। তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছিল। আবার সামনে এসে দাঁড়াল। এখন দেখলে মনে হয় না আর কোন তাড়া আছে। রাস্তায় একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল। কি যেন ভাবছে।

মানুষটি এবার কি ভেবে বলল, এ হারামের নাম সামসুর রহমান।

আমি বললাম, এখানে কোন কাজটাজ পাওয়া যাবে না?

—কি কাজ করবে?

—এই যে কোন কাজ।

দুজনই কিছুটা এবারে স্বাভাবিক হয়ে আসছি।

—তোর বাবা-মা আছেন?

—আছেন।

—পড়াশোনা কতটুকু?

—আমি চুপ।

—তোর তো পড়াশোনার বয়স। কাজ করবি কি?

—না, আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোন কাজ। বলতে সাহস হল না, ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হয়েছিলাম। কত বড় আহাম্মক হলে এটা হয়, এখন বুঝতে পারছি। মনের মধ্যে একটা বিড়াল এতদিন বাঘের মতো হালুম ডাকছিল—ঘুরেফিরে মনে হয়েছে বেড়াল বেশি হলে ইঁদুর মেরে খেতে পারে। হরিণের মাংস সে পাবে কোত্থেকে! আসলে এই প্রথম আমার বোধোদয় ঘটল। মানুষই মানুষকে ভালবাসে। মানুষই মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে। আবার আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়। মানুষ স্বার্থপর, কুটিল, হিংস্র, নিরাভরণ, যখন যা দরকার তার সবই ঘটে।

—যে কোন কাজ তুই পারবি কেন? চোখ মুখ তো সে কথা বলে না।

আমাকে আবার চুপ করে থাকতে দেখে মানুষটি বলল, ঠিক আছে। এখনকার মতো দশ আনা রেখে দাও। আমার ফিরতে রাত হবে। পাঁড়েজীর দোকানে দুপুরে খেয়ে নেবে। ভাত, মাছ, ডাল। ফ্লাস্কে চা আছে—ও আর খেতে হবে না। খেতে ইচ্ছে হলে দোকানে চলে যাবে। বলেই মুখ বার করে দোকানটা দেখিয়ে দিল।

—চা তো খাই না।

—চা খাও না! অসুখ আছে?

—না। চা খাই না। আসলে আমাদের পরিবারের ভূগোলটাই ছিল আলাদা। বাবা চা, ধূমপান, মদ্যপান—একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ মিলে দুই সমকোণ ধরে নিয়েছিলেন। চা না খাওয়াটাই ভাল মানুষের লক্ষণ। আমার পক্ষে বাড়তি বিপজ্জনক কিছু করা এ সময় আর ঠিক হবে না। ফের বললাম, সত্যি বিশ্বাস করুন, চা খাই না।

মানুষটি এবার উঠে বের হয়ে গেল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, পাঁড়েজী দশ আনা—দশ আনায় মিল দেবে পেট ভরে খাবে।

দুটো খাঁজকাটা চৌ-আনি, একটা দো-আনি, মোট দশ আনি! দশ আনায় পেট ভরে ভাত। দশ

আনা কত বড় ব্যাপার, এ সময় আমার চোখমুখ না দেখলে বোঝা যাবে না। বাইরে রোদ উঠেছে। তারে জামাপ্যাণ্ট মেলা দরকার। কালো রঙের চেক-কাটা লুঙ্গিটা সাইজে বড়। কালো রঙের ফতুয়াটা ঢোলা। বামুনের ছেলের পক্ষে বড় বেশি বেমানান। ওটা পরে বের হতে লজ্জা করছিল। কিন্তু আয়নায় যখন দেখলাম, বামুনের ছেলেকে লুঙ্গি পরে খারাপ দেখাচ্ছে না, তখন নিশ্চিন্তে বের হওয়া যাক। পয়সা ক'টা হাতছাড়া করছি না। সেই ট্রেনে চলে যাব, টিকিট কেটে যাব, লাটসাহেবের মত বাঙ্কে পড়ে ঘুমোব এবং চেকার এলে ইঁদুরছানা ভয়ে মরে করতে হবে না—আসলে পয়সা থাকলে কত না কাব্য হয়—আর কাব্য করতে গিয়ে কাল—টিকিট কেটে যাও বা ছিল, এটা ওটা খেয়ে শেষ। বামুন হলে যা হয়। অভাবী হলে যা হয়। পয়সা হাতে থাকলেই খাই খাই—সব খাই, কমলালেবু খাই, লজেন্স খাই, ঝালমুড়ি খাই—খেতে খেতে কখন ট্রেনে ভিড়ের চাপে উড়ন্ত চাকির মত প্ল্যাটফরমে ভেসে পড়েছিলাম মনে করতে পারছি না। পেট ভরে খেলে বোধহয় বাকিটা মনে পড়বে। পয়সা কটা মুঠো করা। বাইরে বের হতেই ছিমছাম বাড়িটা থেকে পাখির মতো এক বালিকা উড়ে এল সাইকেলে। একেবারে সামনে।

তাড়াতাড়ি এবাউট টার্ন। আবার ভিতরে। খেতে পাব ভেবে লজ্জা-সরম যা এতদিন উবে গিয়েছিল তা আবার ফিরে এসেছে। এতদিন মনেই হয় নি কেউ আমায় দেখে। হাতে দশ আনা পয়সা আসতেই নিজের অস্তিত্ব ফের টের পাচ্ছি। পয়সার এত বড় মাহাত্ম্য। চুপি দিয়ে দেখছি মেয়েটা আবার ভিতরে কখন ঢুকে যায়। আর যাই করা যাক, একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া গায়ে দিয়ে একজন কিশোরের পক্ষে কোন কিশোরীর সামনে যাওয়া যায় না। মেয়েটা টুক করে ভিতরে ঢুকে গেলে আমিও টুক করে তারে জামাপ্যাণ্ট ফেলে আবার ঘরে। একের পর এক ধাক্কা খেয়ে সকালবেলায়ও চারপাশটা ভাল করে দেখা হয় নি। ছিমছাম সাদা রঙের বাড়ি—বাংলো গোছের—এই পর্যন্ত। বাড়িটার লাগোয়া বেশ বড় একটি ফুল-ফলের বাগান, পুকুর আছে। ঘরের উত্তরের জানলাটা খুলতেই তা দেখা গেল।

মেয়েটা ভেতরে কোথায় যায়, কোন্ রহস্যময় জগৎ থেকে বা ভেসে এল—দেখা দিয়ে আবার উধাও—পালিয়ে চুপি চুপি দেখছি। আশ্চর্য মায়াময় ছায়ায় ঘেরা এক পৃথিবী। সেখানে মেয়েটা গাছে সাইকেল হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ডাকছে। সাইকেল পেলে আমিও অনেক দূর চলে যেতে পারি। আমি কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে ফ্রকপরা বালিকাটিকে দেখছিলাম। গাছের মতো ঋজু এক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু বাদেই আমি পেট ভরে খেতে পাব। আয়নায় মুখ দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গি পরে যাই কি করে? তারপরই দেখলাম, সাদা ফ্রকপরা মেয়েটা কোথায় অদৃশ্য! চিঠি দিলে পিলুকে লিখতে হবে, জানিস পিলু, সার্কাসের একটা মেয়ে এখানে থাকে। সাইকেল চালাতে জানে। স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বাস না হয় তুই আসিস, তোকে দেখাব।

মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যেতেই কেমন জায়গাটা ফাঁকা এবং অর্থহীন হয়ে গেল। বসে থেকে লাভ নেই। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ পাঁড়েজীর দোকান খুঁজে বের করা। স্টেশন রোডে গেলে পাওয়া যাবে। সেটা কত দূর জানা নেই। যা দিনকাল, সব মানুষ রাক্ষুসে হয়ে আছে, আগে থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু মুশকিল, লুঙ্গি আর ফতুয়া। মেয়েটিকে দেখার পর আমি মুশকিলাসান হয়ে গেছি। হাতে সেঁজবাতি আর গলায় পাথরের মালা—ব্যস। ষোল আনা কাজ শেষ। কালো অন্ধকারে কিন্তুতাকার সেই মানুষের মতো এখন লাগছে নিজেকে। তবে ক্ষুধার তাড়নার কাছে মান-সম্মান বালাই ষাট। লুঙ্গি তুলে খিঁচে এক দৌড় মারব। রাস্তায় পড়লে কে আর কার চেনা! যত অসুবিধা, আম গাছ, জুঁই গাছ, রঙ্গন ফুলের গাছের মাঝখানে। বাংলোবাড়িটা উঠোনে বের হলেই দেখা যায়। ব্যালকনিতে যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে। গলা বাড়ালাম। নেই। চুপি চুপি বের হলাম। লুঙ্গি খিঁচে দৌড়। আ-হা-হা আবার সাইকেল। পাক খাচ্ছে। দৌড় দৌড়। সোজা ঘরে। দেখার আগেই দরজার আড়ালে। এ আবার কী বিড়ম্বনা শুরু হল। খেতে যেতে পর্যন্ত দেবে না।

উঁকি দিলাম। সামনের উঠোনটা ফাঁকা। পেয়ারা গাছটা একা দাঁড়িয়ে। নীচে খাটিয়া পাতা, রাস্তায় মানুষজন, গাড়ি, রিকশা এবং প্রসন্ন রোদ। গুরুদোয়ারাতে ভজন হচ্ছে। লুঙ্গিটা তুলে নিলাম। লুঙ্গিটা তুলে না নিলে তাড়াতাড়ি ছোটা যাবে না। জড়িয়ে গিয়ে রাস্তাঘাটে চৌপাট হলে আবার দশ রকমের প্রশ্ন—কোন্ বাড়ির ছেলে—আহা লাগল না তো? ওঠো ওঠো, গাড়ি আসছে, এত সবের

পর ভাত খেতে লেট হয়ে যেতে পারে। পেট পুরে খাওয়া ভাবা যায় না। এ কদিন বেশ ছিলাম, অনাহার সয়ে গেলে যা হয়। কেমন বোধগম্যিহীন এক কিশোর—রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। চোখে ঘোলা ঘোলা দেখা—পৃথিবীতে তখন অন্যরকমের মজা দেখা যায়। সকালে পেটে কিছু পড়তেই পুরনো রোগটার উদ্রেক হয়েছে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা। মেয়েটা বুঝতে পারে না কেন এ-সময় সাইকেলে পাক খেলে ক্ষুধার্ত ছেলেটির পথ আগলে থাকা হয়।

ফাঁকা দেখে বের হওয়া মাত্র সহসা পাঁচিল থেকে মুখ বাড়িয়ে ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। ঐই রে—আমাকে ধরার জন্য পাঁচিল খামচাচ্ছে। নতুন লোকের গন্ধ পেয়ে ক্ষেপে গেছে! বুঝতে পেরেছে কাছেই চোর-বাটপাড়ের আস্তানা। মনে মনে আওড়ালাম, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে কড়া-ক্রান্তি মিটিয়ে দেব। তুমি একখানা বিলিতি কুকুর। তোমার মান-সম্মানই আলাদা। আমায় ছেড়ে দাও বাছা।

মুশকিল হচ্ছে, এখনও ঘরে আছি। বিলাইতি পাঁচিল টপকালে দরজা বন্ধ করে দেব। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলোবাড়ির শখের কুকুর। উঠোনে নেমে গেলে, বিলাইতি পাঁচিল টপকাতে না পারুক, সদর দিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। সুতরাং এ বেলার মতো আমার আর খাওয়া হল না বোধ হয়। রহমানদা না ফিরলে কিছু হচ্ছে না।

ঘরে পায়চারি করছি। একটা টেবিলক্লক দেয়াল-আলমারিতে। টিকটিক করছে। দশটা, দশটা এক মিনিট, দু' মিনিট—মিনিটের কাঁটাও এত লম্বা হয়! ভারি অস্বস্তি বোধ করছি। আমাকে নিয়ে তোমরা মজা পেয়ে গেছ! দেখাচ্ছি—দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ফের চাবি দিয়ে সোজা চোখ বুজে দৌড়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। রোয়াক পর্যন্ত দৌড়ে এসেই টের পেলাম, পেছনে আমার লুঙ্গি কে খিঁচে ধরেছে। পালাতে হলে লুঙ্গি খুলে পালাতে হয়। এমন অব্যবস্থার ভেতর আমি জীবনেও পড়ি নি। পেছনে চোখ খুলতেই অবাক। বিলাইতি আমার লুঙ্গিটা চামড়া ছেঁড়ার মতো টেনে পালাতে চাইছে। বিকট কুকুরের এই অসম্ভ্রান্ত আচরণে মর্মাহত তরুণ ফের চোখ বুজে ফেলল ভয়ে। বাবার ঈশ্বর কত করুণাঘন, টের পেল সে। আর তখনই সাইকেলওয়ালী কোথা থেকে উদয়। খিলখিল করে হাসছে। মা-মা, দেখ টাইগারের কাণ্ড।

দোতলায় ব্যালকনি থেকে কারো গম্ভীর গলা, এ কি অসভ্যতা হচ্ছে টাইগার। রুমকি, তুমিই বা কেমন, দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসছ! লোকটা কে রে?

বলতে পারতাম মা জননী, আমি রিফুজি। বাবার সুপুত্র, জীবনের সব বিষয়ে পাস কৃতী ছেলে। কিন্তু যা অবস্থা, গলা শুকিয়ে কাঠ। দু'হাতে লুঙ্গি চেপে ধরে আছি কোমরে। কথা বের হচ্ছে না। আসলে তোতলাচ্ছি ভয়ে।

—এই, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি। বুঝতে পারছিলাম, আমার মত হতভাগার লুঙ্গি কামড়ে ধরায় বিলাইতির ইজ্জত গেছে। সাইকেলওয়ালী ধমকাচ্ছে কুকুরটাকে।

—কে রে লোকটা? ব্যালকনি থেকে ফের হাঁক।

—এই, ছাড়, কে জানি না তো! ছাড় বলছি। টাইগার, ভাল হবে না।

—কোন রকমে বললাম, রহমানদা দশ আনা পয়সা দিয়েছে। সত্যি বলছি, চুরি করি নি। হাতের মুঠোয় পয়সা ক'টা খুলে দেখালাম।

—রহমান কে হয়?

চোখ বুজেই বলছি, কে হয়—কুকুরটাকে বলুন না ছেড়ে দিতে। খুব ভাল কুকুর। ভারি ভদ্র। কে হয় মনে করতে পারছি না।

—ছেড়ে দেবে? তুমি এখানে কেন? সময় হলেই দেবে।

—কুকুরটা কি দামী না। কত ভাল। আপনার কুকুর বুঝি। কুকুরের শিক্ষাদীক্ষা আছে।

রুমকির শাসনের গলা, জানালা খুলে বাগানে কি দেখছিলে? কুকুরের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

অপরাধ টের পেয়ে গেছে। স্বীকারোক্তি চায়—আর খুলব না।

—রহমান তোমার কে হয়?

—দাদা হয়।

—কেমন দাদা?

—কেমন দাদা! তাই তো—কেমন দাদা হয় জিজ্ঞেস করা হয় নি। বললাম, অরে কন ছাইড়া দিতে। বুঝতে পারছিলাম, সম্বিত হারাবার আগের অবস্থা। না হলে আমার মাতৃভাষা মুখ থেকে খসে যাবে কেন!

—মা, ছেলেটা বাঙ্গাল! মিছে কথা বলছে।

—সত্যি কই, বিশ্বাস করেন, আমি বাঙ্গাল না। রহমানদা আমার সত্যিকারের দাদা হয়। আর তখনই মনে হল, গেল, সব গেল। করছি কি! নিজের মাতৃভাষাটিকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না। হড় হড় করে যে বমি ওঠার মতো উঠে আসছে। যা এখানে আসার পর চেপেচুপে রেখেছি, বিলাইতির ডরে ফাঁস। আসলে মাথা ঠিক নেই। ববকাটা সুন্দর মতো মেয়েটা যে এত প্রশ্ন করতে জানে, ভাবতেই পারি নি। দাদা বলেছি, বিশ্বাস হয় নি। চাচা বলব। আমার কাছে এখন দাদা চাচা সমান। ছাড়া পেতে চাইছি।

—বাঙ্গাল তো এখানে কেন?

সেই তো। বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের দেশে থাকবে। এখানে কেন? হক কথা।

—যেখানে সেখানে বাঙ্গাল দেখা যাচ্ছে। দেশটার যে কী হবে!

তাই মা দেশটার বড়ই অধোগতি। আপাতত ছেড়ে দিতে বলুন। এত সব ভেবেই যাচ্ছি। কিন্তু বলতে পারছি না কিছু। একবার ফস করে মুখ থেকে মাতৃভাষা বের হয়ে যাওয়ায় বড়ই করুণ অবস্থা। যাও সহৃদয়তা পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম, বাঙ্গাল বলে সেটাও গেল বুঝি!

রুমকি এবার কুকুরটার বকলস ধরে ফেলল। এক হাতে সাইকেল, আর এক হাতে বিলাইতি। হুকুম হল, যাও। জানালা খুলবে না। জানালা খললে মা রাগ করে।

ছাড়া পেয়ে ছুটতে ইচ্ছে হল। ছুটতে গিয়ে মনে হল কাপুরুষতার লক্ষণ। রুমকি হা-হা করে আবার হাসবে। রুমকি হাসলে আমার খারাপ লাগবে । বেশ একজন সবল মানুষের মতো হাঁটার চেষ্টা করছি। ফতুয়া ঝেড়ে লুঙ্গি ঝেড়ে এই ধুলোবালি লাগার মতো আর কি, কিন্তু ঝাড়তে গিয়েই টের পেলাম, লুঙ্গির পেছনটা খাবলাখানেক বিলাইতি হজম করে দিয়েছে। একজন মানুষের পেছনে খাবলাখানেক নেই ভাবা যায় না। হাঁটছি আর ভাবছি, কি করা যায়—ঘুরিয়ে লুঙ্গিটা সামনে নিয়ে এসেও খাবলাখানেককে হজম করা গেল না। কেবল হাঁটুর উপর লুঙ্গিটা কোঁচার মতো ধরে রাখলে কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু হাঁটুর উপর বেশি তুলতে গেলে কি হবে কে জানে? অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। ফলে খুবই সন্তর্পণে অঙ্গ ঢাকাঢাকি চলছে। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। পাম গাছগুলি দেখা যায়। স্টেশন রোড বিজ্ঞাপনের গায়ে লেখা। পাঁড়েজীর দোকান একেবারে সামনে। মাছ ভাজার গন্ধ। নিমেষে সব দুঃখ হাওয়া। খাওয়া বাদে মানুষের আর কোন অস্তিত্ব আছে, এ মুহূর্তে বিশ্বাস করতে ভাল লাগল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি—তার নাম খাওয়া। চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

খড়ের ছাউনির নীচে পাকা মেঝে। একপাশে ভুঁড়িয়ালা একজন মানুষ ক্যাশবাক্স আগলে বসে আছে। উপরে টিনের পাতে লেখা, 'রামভরসা হোটেল'। নীচে স্বাক্ষর পাঁড়েজীর। এবং এক কোণায় ঝুড়ির মধ্যে ভাজা মাছ—হাঁড়িতে ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। খদ্দের এখনও লাগে নি। আমি বোধ হয় প্রথম খদ্দের। ঢুকতেই বলল, হোয়া নেহি।

কি হয় নি, বোঝা গেল না। আমাকে চিনতে পেরেছে যেন। রোজকার খদ্দের যেমনটা হয় আর কি। দাঁড়িয়ে আছি দেখে কিছুটা অস্বস্তি। তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। মাছি ভনভন করে উড়ছে। কারণ পাশেই কাঁচা নর্দমা। মাঝে মাঝে ভাজাভুজির গন্ধ বেমালুম হাপিস করে দিচ্ছে পচা নর্দমার দুর্গন্ধ। তবে ক্ষুধার্তের নাক কান চোখ বোধহয় বেশি খোলা থাকে। অনেক দূর থেকেই টের পাচ্ছিলাম সেদ্ধ ভাতের ঘ্রাণ। এখন বুঝতে পারছি, আসলে ছলনা। সব কিছুর মতো নিজের বিবেককেও ছলনা করছে। সব সময় খাব বলে বুঁদ হয়ে থাকলে বিবেকেরই বা আর দোষ কি। পাঁড়েজী তখন বলল, ঘুমকে আও। রহমান সাব বোলে গেছে।

যে সাব রাতে এত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য থাকে, সকালে তার চারপাশে এত সর্তক নজর! যাবার আগে বলে গেছে। কোথায় যায়, কী করে মানুষটা! মানুষটা সম্পর্কে কেমন ধন্দের মধ্যে পড়ে আছি। ঘুমকে আও যখন বলেছে, তখন পেয়ারা গাছটার কথা মনে পড়ল। নিচে খাটিয়া পাতা। সেখানে ফিরে লম্বা হয়ে থাকতে পারি। তাছাড়া ঘুমকে আও কতটা সময়ের মধ্যে—পাঁড়েজী আবার বলল, ঘুমকে আও। ভাত ডাল মাছ সব্জি—দেখলাম বাবার মতো লোকটার কাছেও একটা লম্বা লাল মলাটের খেরো খাতা আছে। তাতে কিছু লেখা। এই খেরো খাতাটা না থাকলে বুঝি জীবন সম্পূর্ণ হয় না।

লোকটা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, বুলছি না ঘুমকে আও। আর দেরি করা গেল না। মানুষ আমাকে দেখলে বিরক্ত হয় কেন? পাছে রাগ করে, বের হয়ে পড়লাম। বলতে সাহস হল না, কখন? কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার ফিরে আসতেই পাঁড়েজীর পাখার হাওয়া খুব বেড়ে গেল। হাঁটু নাচাচ্ছে। এখনও তবে ঘুমকে আও। রোদ মাথার উপর—খাটিয়া বেশ মন্দ না, কিন্তু যেই না ব্যালকনিটা মাঠ থেকে চোখে ভেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে এবাউট টার্ন। ওখানে জানালা খুললে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়।

পালাবার সময় মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সবাই আত্মীয়। শুধু মা-বাবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করে গেল। এখন বুঝতে পারছি, পৃথিবীতে আত্মীয়ের বড় আকাল। সবাই স্টেশনে তল্পিতল্পা নিয়ে বসে আছে। গাড়ি এলেই উঠে যাবে। আমার মতো মানুষ সামনে ঘোরাফেরা করলে কখন কি না জানি খোয়া যায়। যেভাবে বাসে ট্রেনে সর্বত্র লেখা, পকেটমার হইতে সাবধান—মানুষের আর দোষ কি। শুধু বাড়ি ফিরে গেলেই আবার বাবার সুপুত্র হয়ে যেতে পারি—কিন্তু চিরকুটে যে লেখা আছে, আমি ফিরছি না। মানুষ না হয়ে ফিরছি না। সাত-আট দিন পর ফিরে গেলে মনুষ্যত্বের অবমাননা। হেরে যাবার লজ্জা! পিলু পর্যন্ত বলবে, তুই না দাদা, একটা কি! বাড়িঘর ছেড়ে কেউ পালায়। মা-বাবার মতো নিজের মানুষ আর কে আছে রে?

সবই বুঝি রে পিলু। জাঁতাকলে পড়ে গেলে বুঝতিস। রহমানদাকে বলেছি, একটা কাজের কথা। এটা একটা জংশন স্টেশন। সব ঘুরে দেখা হয় নি। ফাঁকা ফাঁকা ঘরবাড়ি। দূরে পাহাড় দেখা যায়। তুই এলে একদিন আমরা পাহাড়টায় ঘুরে আসব।

আবার পাঁড়েজীর দোকান। পা দুটোও বলি, ঘুরে-ফিরে আর কোনদিকে যেতে জানে না। যেন গণ্ডি এঁকে দিয়ে গেছে কেউ। এবারে নিজেই বললাম, হোক না। দাঁড়িয়ে আছি। হলেই বসে পড়ব। কেউ কেউ খাচ্ছে। আমায় দিচ্ছে না কেন! অবশ্য প্রশ্নকর্তার আর বেশি কথার হক নেই। কারণ পাঁড়েজী বড়ই সদয় এবার—সবজি হোয়ারে?

—থোড়া বাকি হ্যায়।

—থোড়া বাকি হ্যায় তো কিয়া হ্যায়? হামকো বৈঠনে দিজিয়ে না। আসলে মেহমান আমি, সবজি না দিলে আপ্যায়নে ত্রুটি থেকে যাবে।

—না বেটা, রহমান সাব বহুত গোঁসা করবে। বহুত মেজাজী আদমী আছে। তিন কিসিম নেই দেনে সে হুজ্জোতি করবে।

তাহলে রহমানদাকে পাঁড়েজী ভয় পায়। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল! অহংকারী হয়ে গেলাম। বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, পাত লাগাইয়ে, ভাত-ডাল পয়লা দিজিয়ে তো। বলে আর অপেক্ষা করা গেল না। একটা চাটাই পেতে সোজা নিজের গরজেই পদ্মাসন।

পাঁড়েজীর লোক শালপাতা দিল। সেটার গন্ধ শুঁকে নিচে বিছিয়ে রাখলাম। খুরিতে জল। জল ছিটিয়ে যতটা পারা যায় সাফসোফ করে ভাতের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। আসছে। আমার পাশের লোকটি ওম ব্রহ্মনেভ্য নমঃ করে গণ্ডুষ করছে। ভাত মাখছে ডাল দিয়ে। রসনা বড় বেশি সিক্ত। তাড়াতাড়ি জল খেলাম। এভাবে ক্ষুধার দুর্বলতাকে কিছুটা পরিহার করা। আসলে আমার তর সইছিল না। শালপাতায় ভাত পড়লে ডাল দেবার ফুরসত দিলাম না। শেষ। লোকটা ডালের হাতা নিয়ে সামনে থ। নিজেকে সামলে নিলাম। ক্ষুধায় এতটা বুঁদ হয়ে থাকা ঠিক না। স্বাভাবিক মানুষের আচরণ ভুলে যাচ্ছি। এবারে ডাল দিলে, একটু চেটে দেখলাম। ভাত আসছে। ভাতের সঙ্গে ডাল, তারপর গোগ্রাসে হাত চালাচালি—শেষ। হঠাৎ খটাস শব্দ। পাঁড়েজীর পাখা হাত থেকে পড়ে গেছে। আমি বোকার মতো বললাম, না এই খাচ্ছি, খাওয়া তো। অনেক দিন পর খাওয়া তো, আর বলা হল

না। রহমানদার সম্মানে লাগতে পারে। বললাম, বেশ রান্না। সবজি এসে গেল। ভাত নেই। পাঁড়েজী কি রাগ করছে! এক বেলায় আর কতটা রাগ বাড়তে পারে! সুসময় তো মানুষের সব সময় আসে না। যখন এসেছে, তার সদ্ব্যবহার করাই ভাল। বাবা বলেছেন, হাতের পাঁচ ছাড়তে নেই। যখন সুযোগ এসে গেছে, তাকে অবহেলা করা ঠিক না। ভাতের অপেক্ষায় সোজা হয়ে বসলাম।

পাঁড়েজী এবং ঠাকুরের মধ্যে ইশারায় কিছু কথা হল। চোখ তুলতেই সেটা লক্ষ্য করলাম। ভাত দিতে এত দেরি হয় কেন! দুটো না হয় বেশিই খাচ্ছি। খেতে দিয়ে বসিয়ে রাখলে নিন্দা হবে। হোটেলের বদনাম হবে। বললাম, ঠাকুর, ভাত। ভাত মাছ এল। মেখে মনে হল, ভাত আর একটু লাগবে। হাতায় ঠাকুরের ভাত উঠতে চাইছে না। আবার ভাত চাইলাম। পাঁড়েজীর হাঁটু নড়া বেড়ে যাচ্ছে। আমার কী দোষ, রহমানদা বলে দিয়েছে, পেট ভরে খেতে। পেট না ভরলে আমি কী করব। আমি তো আর শত্রুতা করে বেশি খাচ্ছি না। কারো অনিষ্ট হয়, এটা আমি কখনও চাইও না। খেতে বসে কম খেয়ে উঠি কী করে?

ভাত মাখতে গিয়ে মনে হল, একটু ঝোল হলে বেশ হয়। ঠাকুর, তোমার ঝোল একটু বেশি হবে?

পাঁড়েজী বলল, ঝোল মাংতারে?

ঠাকুর আমার কথা শুনতে পায় নি। দোষ নেই। এক হাতে সব খদ্দের সামলাচ্ছে। আমার দিকে নজর দেবার ফুরসত কম হতেই পারে। আপাতত খেয়ে নেয়া যাক। ঝোল দিলে ফের ভাত চেয়ে নেব। না দিয়ে পারবে না। ঝোল আছে, ভাত নেই, খদ্দের বলতে কথা। কী হল! শেষ, তবু ঠাকুর তাকাচ্ছে না। কড়াইয়ে খুন্তি চালাচ্ছে তার তাবৎ শক্তি প্রয়োগ করে। খুব জোর দেখাচ্ছে ঠাকুর। পেট ভরে খেলে সবই হয়। আমারও হবে।

খালি পাতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি দেখে পাঁড়েজীর বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে! উঠে দাঁড়াল। ভাবলাম, বাড়াবাড়ি ভাল না। বিদেশ-বিভুঁয়ে মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা দরকার। সম্পর্ক নষ্ট করে লাভ নেই। এক বেলা একটু কম খেলে মরে যাব না। পাঁড়েজীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যই উঠে দাঁড়ানো গেল। দেখে মনে হল, পাঁড়েজীর যেন ধড়ে প্রাণ এসেছে। সান্ত্বনা দেওয়া দরকার ছিল। রোজ এমন হবে না। অনেকদিন পর তো। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে এভাবে আর মরা মাছের মতো আমার দিকে তাকাতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গেল। পয়সা দশ আনা ঠিক আছে তো। এরপর যদি পয়সায় খামতি হয়, যেভাবে রুমকি আর বিলাইতির হেনস্থা, কখন কোথায় কি ছিটকে পড়েছে কে জানে? ফতুয়ার পকেটে হাত দিলাম—আছে। বের করে গুনে দেখলাম, আছে। ঠিক আছে। কোথাও কিছু ছিটকে পড়ে নি। দশ আনা পয়সা দেবার সময় তিন বার গুনে তারপর হাতে দিয়ে বললাম, দো চৌ-আনি। এই দু-আনি। মোট দশ আনা। মনে মনে বললাম, পাঁড়েজী, কথা ঠিক রেখেছি। তুমি রাখলে না। আরও দুটো খেলে ঠিক হত।

বাইরে বের হয়ে আসতেই খর রোদ মাথার উপর। দূরে ট্রেন যাচ্ছে। টং-লিং টং-লিং শব্দ। মগজের মধ্যে ঘুমপাড়ানির গান কেউ গেয়ে যায়। সুস্বাদু আহারের পর কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। সেই গাছটার নিচে খাটিয়া। দেওড়ি শুধু পার হয়ে যাওয়া। রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্প মনে আসে। পদ্মমানিক হাতে। কোথাও রাজকন্যা শুয়ে পায়ে রূপোর কাঠি, মাথায় সোনার কাঠি। ঘুমে অচেতন। রাক্ষস-খোক্কসেরা গেছে যুদ্ধ করতে। বন্দিনী রাজকন্যার জন্য রাজপুত্রের হাহাকার। কখনও মনে হয়, তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে একটা সবল লাল রঙের ঘোড়া—রাস্তা আর ফুরোয় না, ঘোড়াটা কদম দিচ্ছে—রাত হয়, আকাশে নক্ষত্র ওঠে। গভীর বনভূমিতে রাজপুত্র পথ হারায়। কোথায় যে সেই রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব, মাঠটা পার হয়ে খুঁজছি! দেখি রাজকন্যাও নেই, রাজত্বও নেই। ব্যালকনিতে আম গাছের ফাঁকে শুধু কুকুরের বকলস ধরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

এই রে! সেই কুকুরটা! দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক মহাপ্লাবনের ছবি। টুক করে পেয়ারা গাছ আর খাটিয়াটা চোখের ওপর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। জায়গাটায় আর কিছু নেই—শুধু প্লাবনের জল থিকথিক করছে। জলে নাক জাগিয়ে রেখেছে শয়তান কুকুরটা। কাছে পেলেই খক করে কামড়ে ধরবে।

আর যাই! বরং স্টেশনের দিকে গেলে হয়। সেখানে একটা শোবার জায়গা মিলে যাবে। আমাকে

আবার দেখছে না তো। টুক করে মাথাটা শেডের পাশে আড়াল করে দিলাম। এই সেই ছোকরা যে জানালা খুলে গোপনে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল! রহমানদাকে নালিশও দিতে পারে। পাঁড়েজীও বলতে পারে, কি লড়কা আদমি ভেজিয়েছিলে সাব, পাতে ভাত পড়ে থাকে না, ডালও পড়ে থাকে না। কেবল কব্জি ডুবিয়ে রাক্ষসের মতো খায়। তা খেয়েছি। তাই বলে, রাক্ষস নই। অভাবী মানুষের এটা হয়। আবার কবে খাবার জুটবে, ভয়ে ভয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। খুব দোষের না।

আসলে একা হয়ে গেলে মানুষ নিজের সঙ্গেই বেশি কথা বলে। এই সাত-আট দিনে টের পেয়েছি, কত শত কোটি কথা মনের মধ্যে বুড়বুড়ি দিয়েছে। নিজের সঙ্গেই বোধ হয় মানুষ প্রিয় কথা বলতে ভালবাসে। রুমকিটা কি! আমাকে মানুষের মধ্যে গ্রাহ্য করল না। পেটে দানা পড়ার পর অপমানটা খুব গুড়গুড় করছে! তখনও দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। ফিরলেই আবার কুকুরটাকে লেলিয়ে দেবে। এত নিষ্ঠুর হয় মানুষ! নিজের দিকে তাকিয়ে অবশ্য খুব জোর থাকল না। রাস্তায় মেলা লোকজন, আমাকে কেউ দেখছেই না! এত বড় পৃথিবীতে একেবারে উহ্য হয়ে আছি—অথবা একেই বুঝি বলে ছায়াবিহীন মানুষ। পেছন ফিরে দেখলাম, ছায়াটা ঠিক আছে তো! নেই। এই রে! ওঃ, এটা তো একটা শেডের তলা। বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। আমার ছায়াটা এখনও সঙ্গে আছে। প্রতারণা করে নি। তাহলে আমি মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো এখন যে কোন জায়গায় এ বেলাটা ঘুমিয়ে নিতে পারি। রাতে ঘুম হয় না। ভয়। একা অন্ধকারে মনে হয় সব সময় ভূত দানোদের উপদ্রব। লোক যেখানে গিজগিজ করছে, সেখানেই ওম পাবার মতো জায়গা খুঁজি। কিন্তু কেউ ভালবাসে না। কেবল দেখলে দূর ছাই করে।

হাঁটতে হাঁটতে ফাঁকা জায়গায় হাজির। ধান সিঁড়ি ক্ষেত, পরে শালবন। মাঠ চিরে রেল-লাইন চলে গেছে কত দূর। ঘাস, মাঠ এবং বুনো ফুল। নিরিবিলি বেশ। এখানটায় শুয়ে থাকলে কেউ টের পাবে না, কুকুরের ভয়ে এত দূর কেউ চলে আসতে পারে ভাবা যায় না।

কিছু পাখির ডাকে এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। বেলা পড়ে গেছে। শরতের বিশাল সবুজ মাঠ সামনে। ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে উঁচুনীচু পাহাড়ী টিলা। জায়গাটা ভারি সুন্দর। কোন সুন্দর জায়গা দেখলেই মনে হয় পিলুকে নিয়ে আসতে হবে। সে বিশাল মাঠ এবং অরণ্য দেখলে খুশি হয়। পাহাড়ী টিলা, বনজ ফুলের গন্ধ পেলে পাগলা হয়ে যাবে। কিছু দূরেই বোধহয় কোন পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। একটা সাঁকোয় সূর্যাস্তে মানুষের পারাপারের ছবি। এ সব দেখে মনটা কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে কবে যে লিখতে পারব, একটা কাজ পেয়েছি। দুপুরে কাজ। সকালে মর্নিং কলেজ। না হলে প্রাইভেটে পড়াশোনা চালিয়ে যাব। একটা কাজ হলে সব হয়ে যাবে। হাই উঠছিল। কত বড় আকাশ, কত বিশাল এই পৃথিবী, বের হয়ে টের পেয়েছি। শেষ নেই। গাড়ি যায়—আর যায়। গ্রাম মাঠ তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যায়। কত রকম ভাষা মানুষের। কত বিচিত্র পোশাক। যেন এ ক'দিনে পৃথিবীর অনেক গূঢ় গোপন খবর আমি পেয়ে গেছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার। দুটো একটা নক্ষত্র এবার উঠবে। ঘাসের মধ্যে কিছু কীটপতঙ্গ লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। আমাকে এবারে উঠতে হয়—বাড়িটায় না ফিরে আর কোথায় যাওয়া যায়! একটা কুকুর আর একটা মেয়ে জীবনে এত ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে, অনুমানই করতে পারি নি।

স্টেশনে সব সময় মানুষজন থাকে। রাত্রিবাসের পক্ষে ভাল জায়গা। রোয়াকে বসে থাকতে থাকতে কখন কাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রহমানদা আবিষ্কার না করলে ফের স্টেশনেই চলে যেতাম। রহমানদা কখন ফিরে আসবে কে জানে! কিছু বলেও যায় নি। ফিরে এলেও, ভয় কমছে না। একা থাকলেই কুকুরটা আর মেয়েটা পেছনে লাগবে। মানুষ বলে যে ইজ্জত দেয় না, তার পক্ষে সব সম্ভব। টাকা মান যশ হোক তখন দেখব—সব লিখে রাখছি। রহমানদা টের পাবার আগেই এখান থেকে ভেগে পড়া দরকার কি না, এই নিয়ে কুট তর্ক। যা হোক তবু তো একটা আশ্রয়। মানুষটা ভাল।

দুত্তোরি ভাল। কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবে যখন?

ও হয় না। কুকুর দিয়ে মানুষ খাওয়ানো যায় না।

যা নিরিবিলি বাড়ি, সব সম্ভব।

আফটার অল মেয়ে তো?

সাইকেলওয়ালী বলুন। সারকাসের জাদুকর একবার আস্ত একটা মুরগী গিলে ফেলেছিল। জাদুকর পারে না, এমন কাজ নেই।

ভিতর থেকে আমায় সে বলল, তাড়াতাড়ি যা করার কর। তোমার যা অন্ধকারের ভয়!

তাহলে কি করব? য পলায়তি স জীবতি!

খুব যে সংস্কৃত ওগরাচ্ছ?

আর কি করা! বাবা যে ওটাই কেবল সার জেনেছেন।

তখনই দূরে ঘেউঘেউ করে একটা কুকুর ডাকছে। আর সঙ্গে আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে, তুই, তুই কোথায়? আমরা তোকে খুঁজছি?

এই রে! আবার! রহমানদা আর সেই মেয়েটা। কুকুরটা এদিকেই ছুটে আসতে আসতে গন্ধ শুঁকছে। দৌড়—দৌড়। রহমানদা চিৎকার করছে, ওরে, যাস না। ফিরে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। কোথায় ঘুরছিলি? পাঁড়েজী বলল, কখন তো খেয়ে চলে গেছে।

কে শোনে কার কথা? কিচ্ছু কানে আসছে না। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি, রহমানদা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটাও রহমানদার মতো কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে আমার ছোটা দেখে। আর থাকি! নির্ঘাত কোন ষড়যন্ত্র। হলে কি হবে, বিধির বিধান। লাঞ্ছনা কপালে লেখা থাকলে কে খণ্ডায়? সেই বদমেজাজী শয়তানটা গোটা কয়েক লাফ দিয়ে এসেই পেছন থেকে লুঙ্গি জাপটে ধরল। এ শিক্ষাটা যে কার কাছে পেল! না কি কুড়ি টাকা চুরি করার খেসারত। গন্ধটা গায়ে এখনও লেগে আছে। লুঙ্গি খুলে একমাত্র পালাতে পারি। জলজ্যান্ত মেয়েটা না থাকলে কি করতাম জানি না। আর লুঙ্গি খুলে ফেলতে সাহস হল না। থাক ব্যাটা তোর লুঙ্গি নিয়ে, আমি আমার পথ দেখছি বলতে কিঞ্চিত সম্ভ্রমে বাধল।

মরেছি যখন মেরে মরব। যতটা জোরে পারলাম, নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লাথি মারতে থাকলাম।

রহমানদা চিৎকার করছে, ছোড়দি কুকুরটাকে সামলাও। ও তো ক্ষেপে গেছে। কুকুরটাও ক্ষেপে গেছে।

রুমকিকে রহমানদা ছোড়দি বলে! ছোড়দির তবে এত সব কাণ্ড। ছোড়দি গম্ভীর গলায় বলল, ওকে মের না। টাইগার—টাইগার।

সঙ্গে সঙ্গে টাইগার কি এক জাদুমন্ত্রে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুঁইকুঁই করতে থাকল। ছোড়দির এত প্রভাব।

পালাবার পথ নেই। পেছন থেকে আসছে রুমকি আর রহমানদা। সামনে টাইগার। সত্যি ছোটখাট জ্যান্ত বাঘ। কুকুরটা কত বিশাল, টের করতে পেরে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

রহমানদা বলল, তুই কী রে? তুই মানে, তোর কি ভালমন্দ জ্ঞানগম্যি নেই?

কথা বলছি না।

—বিশ্বাস করে চাবিটাবি সব—তুই কি না—রহমানদা রাগে সব কথা শেষ করতে পারছে না।

—ফিরে দেখি, দরজা বন্ধ। তুই নেই। কোথায় ঘুরছিলি?

কিছু বলতে হয়—এখানে শুয়েছিলাম।

—বন্য স্বভাবের কেন রে তুই?

রুমকি বলল, তুই না রহমান মরবি। আর একবার সেই ছেদি না কি নাম, তোর সব নিয়ে পালাল। বিশ্বাস করে থাকতে দিলি, খেতে দিলি, রাতে একদিন হাওয়া।

রাগ দুঃখ ক্ষোভ—এই সেই পুচকে মেয়েটা—যার দাপটে পরিত্রাহি জীবন আমার—চোখে জ্বালা, রহমানদা পর্যন্ত পুচকিটাকে ছোড়দি বলে! লুঙ্গির খানিকটা কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে, বাকিটাও আমার খাইয়ে দিত—পাজিটা কেমন বলছে, রহমান তুই মরবি। বেশ মরবে, তোমার কি। তারপরই কি হল কে জানে, বোধহয় ক্ষোভে মাথা ঠিক ছিল না—এই তো সেই, যে আমাকে এত দূর পর্যন্ত পালিয়ে আসতে উসকে দিয়েছে, কোন দূরবর্তী নক্ষত্র যাকে ভেবেছি—তার এই আচরণ! হঠাৎ বলে ফেললাম, আমি যাব না।

—যাবি না, থাকবি কোথায়? খাবি কোথায়?

আবার কথা নেই। আসলে আমি যে বাবা-মার ছেলে, ঘরবাড়ি আছে, পিলু আছে, নবমী আমাকে দা-ঠাকুর বলে, এত সব অহংকার থাকলে যা হয়—অথবা কিছুটা অভিমান, কার উপর জানি না, এ বয়সে এটা বোধহয় খুব বেশি থাকে, না হলে, পালাব কেন?

—এই, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? হাঁট। রুমকি শাসাচ্ছে। বাবা আসুক, তোকে পুলিসে দেব। রহমানের চাবি নিয়ে হাওয়া। ভাগ্যিস টাইগার ছিল।

পুলিসকে আমি ভয় করি, আমার বাবা ভয় করে—সেই পুলিস আবার? জল ঘোলা দেখছি। মুখ শুকিয়ে গেছে। দিতেই পারে। না বলে কয়ে উত্তরের জানালা খুলেছি, না বলে কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছি, কুড়ি টাকা চুরি করেছি—এর জন্য কত বছর জেল হয়, জেল না ফাঁসি, নিয়মকানুন পুলিসের একেবারেই জানি না, খুব ভীতু বালকের মতো আর কথা না বলে হাঁটা দিলাম। কিন্তু মনে অস্বস্তি, রুমকির বাবা এলে কি সত্যি আমাকে পুলিসে দেওয়া হবে। তার চেয়ে বরং কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিক না। পুলিসে দাগী আসামীদের ধরে নিয়ে যায়। বাবার সব বিষয়ে পাস করা ছেলেটা শেষ পর্যন্ত দাগী আসামী হয়ে যাবে!

রহমানদা খুব মুখ গম্ভীর করে হাঁটছে। আগে আমি। কুকুরটাকে বকলশে শেকল পরিয়ে রুমকি পেছনে আসছে। যেন পালাতে না পারি। আর পারছিলাম না—এরা আমাকে যদি পুলিসে দেয়, আর বাবা যদি জানতে পারে আমি হাজতে আটকে আছি, বাবার এ-দেশে এসে বাড়িঘর করার গৌরব সব এক সেকেণ্ডে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বাবা আমার না অপমানে আবার তাঁর ঘরবাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যান।

পায়ে জোর পাচ্ছি না। একটা টিলার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূরের পাকা সড়কে ট্রাকের শব্দ। গরুর গাড়ির শব্দ। মাঠ থেকে চাষীরা ফিরছে ঘরে। শহরের আলো কেমন মায়াবী পৃথিবীর কথা বলছে। কান পাতলে শস্যক্ষেতের কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যায়। আর এ সময় কি না একটা কুকুর, একটা মানুষ আর একজন নারী আমাকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিসে দেবে বলে। ভেতরে যখন ভয় এভাবে দাপাদাপি করছে তখন আর পারলাম না—রহমানদার সামনে গিয়ে সহসা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। মাথা নিচু করে বললাম, আমাকে আপনারা পুলিসে দেবেন রহমানদা? খুব কাতর চোখে-মুখে তাকিয়ে থাকলাম।

জাঁহাবাজ মেয়েটা লাফিয়ে এসে পড়ল মুখের উপর—বলল, না দিলে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কেন?

আমি রহমানদার দিকে তাকালাম—আমার চোখে কি ভয়ে অভিমানে জল এসে গেছে। রহমানদা কিছু টের পেয়ে বলল, দূর পাগলা, আয় তো!

ফেরার সময় সারাটা রাস্তা ভারি বিমর্ষ থাকলাম। রুমকিকে বিশ্বাস নেই। যা জাঁহাবাজ মেয়ে, সব করতে পারে। ওর বাবা মানুষটিকে আমি দেখি নি। খুবই জাঁদরেল হবে। রুমকি যাঁর মেয়ে আর যাঁদের ঘরবাড়ি সাহেব-সুবোদের মতো, তাঁরা জাঁদরেল না হয়ে যায় না। রহমানদা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। আমরা টিলা পার হয়ে শহরে ঢোকার পথ ধরে হাঁটছি। রাস্তার দু'পাশে সব বড় বড় গাছ। ইতস্তত লাইট-পোস্ট। আলো জ্বলছে। চারপাশে তাকালে শহরটা যে এখনও ভারি ব্যস্ত, বোঝা যায়। রাস্তায় বড় বড় ট্রাক বোঝাই মাল চলে যাচ্ছে। আর পাশ দিয়েই গেছে রেলের লাইন। আমরা একটা গুমটি ঘর পার হলাম। কুকুরটা মাঝে মাঝে আমার পাশে এসে গা ঘষটাতে চাইছে। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছি। ভয়ও হচ্ছে। কিছু বলতেও পারছি না। কুকুরটা আমার অসহায়তা ধরতে পেরে যখন তখন ইয়ার্কি করছে! বিদ্রূপ করছে। কখনও ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠছে। কখনও পায়ের কাছে হুমকি দিচ্ছে। রুমকি হাসছে। যত কুকুরটা রাস্তায় আমাকে বিব্রত করছে, তত রুমকি মজা পাচ্ছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না। কারও মজার বিষয় যে কারও প্রাণ নিয়ে খেলা এটা প্রথম রুমকির কুকুর আমাকে বুঝিয়ে দিল। কুকুরটাকে যখন তখন পেছন থেকে লেলিয়ে দিলে আমি আর কি করতে পারি? রহমানদা দেখেও দেখছে না। রহমানদা অন্তত আশা করেছিলাম আমার হয়ে কিছু বলবে। আমার তো বলা শোভা পায় না। যাকে পুলিসে দেবার কথা হচ্ছে, সে কি করে কুকুরটাকে কষে লাথি মারে! এ সময়ে মানুষের কাছ থেকে কুকুরটার প্রাপ্য বলতে ধমাস করে মুখে সজোরে লাথি। যা আমার থেকেও নেই।

গুরুদোয়ারার সামনে আসতেই রহমানদা বলল, চাবিটা আছে তো?

—আছে।

—না থাকলে দুজনকেই বাইরে। চাবিটা দে।

চাবি দিলে রহমানদা দরজা খুলে বলল, তুই পালিয়েছিলি কেন বল তো!

সব বলতে পারি। কিন্তু টাইগার আর রুমকি থাকলে বলা সহজ নয় খুব। কতক্ষণে যাবে সেই আশায় আছি।

সুইচ খুঁজতে গিয়ে রহমানদা বলল, কথা বলছিস না কেন? তুই কি কালা আছিস?

আলো জ্বলে উঠলে বললাম, রহমানদা, কুকুরে কামড়ায়।

—টাইগার তোকে কামড়েছে?

—না, মানে—দেখি, রুমকি টাইগারের বকলস ধরে আমার দিকে ত্যারছা চোখে তাকিয়ে আছে।

—টাইগার তো খুব ভাল। একটা কাকপক্ষী বাড়িতে এলাউ করে না। কামড়ায় না তো! ভাল ছেলের মতো হাসতে হাসতে বললাম!

লুঙ্গিটা উল্টে পরেছিলাম। ফলে বস্ত্রখানি অটুট দেখাচ্ছে। খুলে দেখাতেও পারছিলাম না। কি জানি, রেগে গিয়ে সত্যি যদি পুলিসে দিয়ে দেয়। তার চেয়ে বলা ভাল, কুকুরে কামড়ায় না।

রহমানদা রুমকিকে বলল, ছোড়দি, তোমায় বোধহয় ডাকছেন মা।

—ডাকুক গে।

—মা-বাবার কথা শুনতে হয়, না রহমানদা? এর চেয়ে বেশি বলার সাহস হল না। আসলে বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ এখান থেকে। হতচ্ছাড়া মেয়ে। মায়া হলে কান মলে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।

—রহমান—রহমান—

—আজ্ঞে যাই।

রহমানদা বাইরে বের হয়ে দ্বিতীয় সদরটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

—রুমকি কি করছে! ওকে পাঠিয়ে দাও। খাবে না! সেই কখন তোমার সঙ্গে লাফিয়ে বের হয়ে গেল! লোকটাকে খুঁজে পেলে!

—পেয়েছি। লোক না মা। ছেলেমানুষ।

—ছেলেমানুষ তো এখানে কেন?

—বাড়ি থেকে বোধ হয় পালিয়েছে?

—পালিয়েছে!

আমার মাথাটা ঘুরছিল।

রহমানদা বলল, ঠিক পালায় নি। কাজের ধান্ধায় বের হয়েছে।

—ছেলেমানুষের আবার কাজের ধান্ধা কেন? ছেলেমানুষ তো পড়াশোনা করবে।

গাছপালার অভ্যন্তর থেকে অথবা অন্য গ্রহ থেকে কেউ যেন কথা বলছিল; আমরা নিচের গ্রহে দাঁড়িয়ে শুনছি। অমোঘ বাণীর মতো রহমানদা সেই দেবলোকের কথাবার্তা অবধান করছে।

হঠাৎ গ্রহ থেকে আবার অমোঘ কথাবার্তা ভেসে এল, ছেলেটা বাঙ্গাল নাকি!

আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি। তক্তপোশে বসে আছি, তবু পা হাঁটু কাঁপছে। একজন মানুষের এত অপরাধ থাকলে তাকে রহমানদা রাখবে কী করে!

—তা তো জানি না মা।

—জিজ্ঞেস করে দেখ। না জেনে-শুনে লোককে জায়গা দিতে নেই। তোমার ক্ষেপামিতে শেষে না আমাদের সব যায়।

ওদের সব যাবে কেন! বাঙ্গাল আমি ঠিক। ইস, কী যে রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত করেও দমন করা গেল না।

আবার গ্রহলোকে কথাবার্তা—পীলখানার মাঠে সব ছেয়ে গেছে শুনেছ!

—আজ্ঞে শুনেছি!

—তরফদাররা থাকতে দিয়েছিল। এখন সব দখল করে নিয়েছে। কত বড় সম্পত্তি। বেহাত হয়ে

যাবে। উনি তো বললেন, আইন-আদালতেও কিছু হবে না। বাঙ্গালরা নাকি ভগবান। বসলে উঠতে চায় না। ঠাকুর দেবতার মতো। আমাদের গ্রহ থেকে সংযোজনকারীর আক্ষেপ—সেই মা—কী যে হবে! হুড়হুড় করে সব ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসছে। ফাঁকা জায়গা। পতিত জায়গা আর থাকছে না।

—দেখ না, যা অবস্থা, দেশটা বাঙ্গালদের হয়ে যাবে। সেই কবে একবার কলকাতায় বাবা আমাদের বাঙ্গাল দেখিয়েছিলেন। জজ মানুষ—বললেন, আজ দেখবি একজন বাঙ্গাল আসবে। বাবার সঙ্গে কাজ করতেন। তিনিও জজ। খুব ডাকসাইটে জজ। অথচ বুঝলে, এসেই ডাকাডাকি—অ নিবারণবাবু, বাড়ি আছেন নাকি? বাবা বললেন, এসেছেন? —আরে আইছি। দরজা বন্ধ কইরা বইসা আছেন। বাঙ্গালরে ডরান দ্যাখতাছি খুব। —না না, বাবা বিগলিত। বুঝলে রহমান, সেই আমাদের বাঙ্গাল দেখা। লোকটা কি চেঁচিয়ে কথা বলত! যেন আমরা সব কানে কম শুনি।

রুমকি কুকুরটার বকলস ধরে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটার লম্বা জিভ হা-হা করছে। হাঁ করলে আমার পুরো মুখটা মুখে ঢুকে যাবে। দু'পা সরে বসলাম।

রহমানদা ফিরে এসে বলল, তুই বাঙ্গাল?

মাথা গোঁজ করে বসে থাকলাম।

মা তো বলল, তোরা নাকি এখন ঠাকুর দেবতা। বসলে আর উঠতে চাস না। বলেই হেসে দিল। ছোড়দি, তুমি যাও। এখন আমরা খাব। বাবুসাব এলে রাগ করবেন।

বাবুসাবের কথায় রুমকির মনে হল, আমাকে নিয়ে বোধ হয় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

রুমকি চলে গেলে রহমানদা বলল, ছোড়দি খুব ভাল মেয়ে। তুই ওকে ছোড়দি ডাকবি। এতক্ষণ যাও সহ্য হচ্ছিল, আর পারা গেল না! আমি ওকে ছোড়দি ডাকব বলছেন, পুচকে মেয়েটাকে আমি, না আমি পারব না। আমায় কী করেছে আজ? কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির সেই মহীয়সী—মিছে কথা বলছিস?

আমার সব বলা এক দণ্ডে উবে গেল। স্থির হয়ে বললাম, হ্যাঁ, মিছে কথা।

—তবে।

রুমকি যে চলে যায় নি, এ বোধটা থাকা উচিত ছিল। উঁকি দিয়ে দেখে নিলে আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হত না। বললাম, না, সব ঠিক আছে। আমি তোমাকে ছোড়দিই ডাকব। এই কথা বলার পর ছোড়দি কেমন ভালমানুষ হয়ে গেল। বলল, পালাবার চেষ্টা করবি না। টাইগার দিনরাত ওত পেতে থাকে। সব টের পায়।

তা যে পায়, তার ঠ্যালা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। ছোড়দি কিছু আর বলল না। কুকুরটাকে নিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে রহমানদা বলল, এ বাড়িতে ছোড়দির দাপট খুব। ওকে খুশী রাখতে পারলে আর কথা নেই। তোর সাতখুন মাপ। নে আর দেরি করিস না, কখন তো খেয়েছিস। তারে জামাপ্যান্ট রয়েছে, নিয়ে আয়। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাল্টে নে। খাবার দিতে বলে এয়েছি।

খাবার এলে রহমানদা বলল, তোদের তো আবার জাতের মাথামুণ্ডু নেই। কি করতে কোন্‌টা কাটা যাবে—তার চেয়ে বরং তুই খেয়ে নে। পরে আমি খাচ্ছি বলে উঠে দাঁড়াল। ভিতরের দিকে আর একটা দরজা আছে, ওটা খুললে টের পেলাম, রহমানদার সব কিছু ঐ ছোট্ট কুঠরির মধ্যে। আসলে তবে দুটো ঘর। ঐ ঘরটায় রহমানদার যাবতীয় মহার্ঘ জিনিস, বাক্স পেঁটরা লকার সব কিছু। ওখান থেকে কি বের করতে ঘরে ঢুকল। বাইরের ঘরটা এ জন্য খুবই নিরাভরণ।

শুধু একটা টেবিল ক্লথ বাদে বলতে গেলে আর কিছুই নেই। খাট এবং বিছানা, টেবিল আর গোটা তিনেক চেয়ার। এই সম্বল করে সে সব কিছু অসংকোচে আমার মতো একজন পলাতকের কাছে গচ্ছিত রেখে চলে যেতে পেরেছে। মানুষকে বিশ্বাস নেই, এ বোধটা রহমানদাকে বোধহয় ছোড়দি বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাব এ-রকমেরই। তবু মানুষ অধিকাংশ এক একজন স্বার্থপর দৈত্য। ট্রেনে এটা খুব মালুম হয়েছে। তা না হলে যে দাড়িওলা লোকটিকে ভিড়ের ট্রেনে একটু জায়গা করে বসতে দিয়েছিলাম,

তারই চাপ কেন ব্লাডারের মতো আমাকে উদ্বাস্তু করে ছাড়বে। চাপে প্রায় ছিটকে গেলাম। ভিন রাজ্যের মানুষটি আমার জায়গা সম্পূর্ণ বেদখল করে নিয়েছে বলে এতটুকু অনুকম্পা নেই। স্টেশন যত পার হয়ে যাচ্ছি, তত কোন এক অদৃশ্য শক্তি দরজার কাছে আমাকে ঠেলে নিয়ে চলে এসেছে। যে যেখান থেকে পারছে উঠছে। বাক্সপেঁটরা যে যার মতো জানালায় দরজায় গলিয়ে দিচ্ছে। দেখে মনে হয়েছিল, ট্রেনে জায়গা না পেলে মহাপ্লাবনে সব তাদের ভাসিয়ে নেবে।

—কি রে, বসে আছিস কেন? ওঠ, খাবি না?

হাত-মুখ ধুয়ে জামাপ্যান্ট পরার পর আগেকার মতো হয়ে গেলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কেউ আবার দেখছে কিনা। না, নেই। কেবল গাছগাছালির ফাঁকে একটা আলোর ডুম জ্বলছে। এবং বাড়িটাকে এত রহস্যময় করে রেখেছিল যে রহমানদাকে লুঙ্গিটা দেখানো দরকার আছে, ভুলে গেছিলাম।

রহমানদা লুঙ্গি পরে একটা হাফ-হাতা গেঞ্জি গায়ে আবার হাজির। চোখে মুখে বুঝি আশঙ্কার ছাপ টের পেয়েছে। বলল, তুই কি খুন-টুন করে পালিয়েছিস? সব সময় কেমন সিঁটিয়ে আছিস?

কি করে বোঝাব খুনেরই শামিল। গোবিন্দদার কৌটা থেকে কুড়ি টাকা চুরি আর খুনে আমার কাছে তফাত এক গাছি সুতোর। বাবার কাছে সব সমান! খুনেও পাপ, চুরিতেও পাপ। দুটোতেই ঈশ্বর তাঁর রাগ করেন। এ হেন মানুষের সন্তানের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা খুবই কঠিন। সামান্য হাসার চেষ্টা করে বললাম, না না, খুন করব কেন? আমি গুণ্ডা না ডাকাত? তা ছাড়া ভাবলাম, আমাকে পুলিসে দেবার কথা হচ্ছে। মাথা ঠিক থাকে কি করে?

—সে তো চেহারা দেখেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

খেতে বসে দেখলাম, বড় টিফিন ক্যারিয়ারে মাংস ভাত রুটি আলাদা করা।

রহমানদা বললে, যা লাগে নে।

সবটাই খেতে পারি। খিদে তখন ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে বসে আছে। যা পায় তাই নিয়ে দৌড়াতে চায়। কি নেব, কতটা নেব আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

—ভাত খাস রাতে?

ঘাড় কাত করে দিলাম।

—ভাতই খা। আমার আবার রাতে ভাত সহ্য হয় না।

রহমানদা বললে, দুপুরে পেট ভরে খেয়েছিলি তো?

না, বলতে সংকোচ হচ্ছে। আসলে কতটা খেলে পেট ভরে তার আন্দাজ আমার গেছে। হয় তো যতটা খেয়েছি, তারই নাম পেট ভরতি খাওয়া। পাঁড়েজী দীর্ঘদীন এ লাইনে আছে। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। সে জানে কতটা খাওয়ার নিয়ম। বেশি খেলে সইবে কেন? পেট ভরেছে, গলা অবধি হয় নি। পাইস হোটেলে আকণ্ঠ কে খেতে দেয়? যে দেয়, সে লাটে ওঠে।

—বললাম, খুব খেয়েছি।

—খাবি। লজ্জা করবি না। এত যার বিবেক তার আবার বাড়ি থেকে পালানো কেন! কাজের ধান্ধা দেশে থেকে করলেই হত।

এ সব কথা কানে যাচ্ছিল না। একবার ভাবি বলি, আচ্ছা রহমানদা, ছোড়দি কি সত্যিই থানা পুলিসের কথা ভাবছে। কিন্তু রহমানদা তখনও কথা বলে যাচ্ছে, আমার কথা শোনার সময়ই নেই।

—তোর মতো আমিও বের হয়েছিলাম। সে বেশ একটা জীবন গেছে। এখন মুঠো মুঠো পয়সা। না, তা বলে ভাবিস না, তোর মতো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলে। লেখাপড়া জানলে দুনিয়া উল্টে দিতে পারতাম।

মানুষটা কী করে জানি না। বাংলো বাড়িটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তাও জানি না। নেমপ্লেটে আছে, ডাঃ এস. কে. দত্ত। এই সহরটা খুব বড় নয়—জংশন স্টেশন, আর মহকুমা শহর মিলে যা ঘরবাড়ি থাকার কথা তাই আছে। বাড়িটা শহরের একপাশে, অনেকখানি জমিজমা নিয়ে বাগান নিয়ে বাড়ি। যেন মানুষটা নিজের একটা আলাদা পৃথিবী বানাবার তালে আছে। আসলে সবাই নিজের জন্য একটা আলাদা পৃথিবী তৈরী করতে চায়। আমারও সেই বাসনা।

খাওয়া হলে রহমানদা বলল, শুয়ে পড়। এখন আমি একটু বসব।

তা বসুন, আপনার জায়গায় আপনি বসবেন শোবেন—তা আবার বলা কেন। কিন্তু বসা যে মানুষের এ রকমের হয়, জানতাম না। বোতল গ্লাস, পরিপাটি করে চানা ভাজা এবং ভক করে ঝাঁজটা নাকে লাগলে এক কোণায় সরে গেলাম।

—তোর অসুবিধা হচ্ছে। তবে পেয়ারাতলায় খাটিয়াতে শুয়ে থাক। পরে ডেকে আনব।

—সেই ভাল। আপনি খান। একটা বালিশ নিয়ে সামনের পেয়ারাতলায় চিৎপাত হওয়া গেল। রাস্তার আলো আসছে। পাতার জাফরিকাটা ছায়া ছড়িয়ে আছে খাটিয়াটার ওপর। শুয়ে মনে হল, ভয় করবে। বাড়িতে হলে কিছুতেই পারতাম না। মানুষের বসবাসের জায়গায় কিছু অদৃশ্য আত্মা সঙ্গী হয়ে যায়। আবাস নয়, এবং অপরিচিত জায়গা বলে কোন প্রেতাত্মা বোধ হয় সঙ্গী হতে চাইছে না। জংশন স্টেশনে মাঝে মাঝে হুইসিল দিয়ে গাড়ি যায়, রাস্তায় ট্রাক-বাস রিক্শর শব্দ এবং আলোর মধ্যে প্রেতাত্মার কোন অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না। বরং প্রেতাত্মা বলতে এখন রুমকি। সে আমাকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে রেখেছে।

ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিলাম। মাঝে মাঝে টাইগার গলা ফাটিয়ে ওপাশে চিৎকার করছে। জেগে আছে জানান দিচ্ছে। সকালে ছোড়দিকে বোধহয় সব খুলে বলাই ভাল হবে। কুড়ি টাকা চুরি করেছি ঠিক তবে ডাইরিতে লিখে রেখেছি। কে কি পাবে, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে ফেরত। আজ যে দশ আনা পয়সা দিয়েছে রহমানদা, তাও লিখে রাখব। আশ্রয় দিয়েছে, তাও। কাজ দিলে তাও লেখা থাকবে, কারো কাছে কোন ঋণ রাখব না। বাবা বলেছেন, অঋণী অপ্রবাসী থাকতে। তবে দেশ ছেড়ে আসার পর তাঁর মুখে অপ্রবাসী কথাটা আর বের হত না। শরণার্থীদের জন্য সরকার লোন দিচ্ছে, বাবা সেদিকটাতে যানই নি। কে কার ঋণ শোধ করবে! যা সব সন্তান-সন্ততি, তাদের আর ঋণের মধ্যে রেখে পিতৃদায় বাড়াতে চান না। শিষ্যদের মানি-অর্ডার এলে শুধু জবাবে লিখতেন, ঠাকুরসেবার জন্য প্রেরিত তোমার প্রণামী যথাসময়ে পেয়েছি। প্রণামী কখনও ঋণের পর্যায়ে পড়ত না। যে যার মঙ্গলের জন্য পাঠায়। তিনি শুধু উৎসর্গকারী, বাবার এসব ধারণা মনে হওয়ায় গোপনে হেসে ফেললাম। মানুষ বোধহয় নিয়মকানুন এভাবেই নিজের মতো করে তৈরি করে নেয়। নেশা করা, মাতলামি করা পাপ কাজের মধ্যে পড়ে রহমানদার খেরো খাতায় বোধ হয় লেখা নেই। থাকলে বলতে পারত না, তুই শুয়ে পড়। আমি একটু বসব।

রহমানদা কী করে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করে জানি না। একদিনে জানা সম্ভবও নয়। শহরটায় এসে বুঝেছি, সব মানুষই রোজগারের ধান্ধায় ঘুরছে। যার যেমন ক্ষমতা। আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক ইংরেজি। বাংলা ভাষাটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওটা রহমানদাও জানে। একজন ভিখিরীও জানে। হিসাবপত্র রাখতে পারি, সরকারী অফিসের কাজে লাগতে পারি—কোন একটা বাবু-কাজ আমার চাই। রুমকির বাবা যদি পুলিসে দেয়, তবে সব যাবে। দাগী আসামী জানলে কুকুর পর্যন্ত পেছনে লাগে। ওদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। আসলে কি টাইগার টের পেয়ে গেছে, পাঁচিলের পাশে একটা খুদে চোর শুয়ে আছে?

না, ঘুম আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছে পাঁচিল টপকে কুকুরটার গলা টিপে ধরি। সত্যিকারের একটা খুন-টুন না করলে চলছে না। কুকুর তুমি মরবে। ফাঁক পেলেই দড়ির ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দেব। বেশি হুজ্জোতি আমি সহ্য করব না। প্রাণীদের প্রতি বাবার সব সময়ই একটু বেশি আবেগ। মনাকে পিলু কোন কারণে লাথি-ফাথি মারলে বাবা বলতেন, দেব নাকি এক ঘা। মনার বুঝি লাগে না। বাবার কাছে মানুষ এবং জীবজন্তু তেনারই সৃষ্টি। তুমি শাসন করার কে হে?

কিন্তু এমন পেছনে লাগলে রাগ হয় না! আচ্ছা, ঠিক আছে—কিছু করব না। খুনের কথায় বাবার মুখটা ভেসে উঠল!

তুমি শেষ পর্যন্ত নিরীহ একটা অবলা জীবের প্রাণ হরণ করলে। পারবে তুমি কারো প্রাণ দিতে? যা পার না, তা তুমি মারতেও পার না। হতাশায় কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। আমাকে দিয়ে আসলে কিছুই সম্ভব নয়। উচ্চাশা বাদে আমার আর কোন সম্বল নেই—এত সব ভাবনার মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—সকালে দেখি গাছতলাতেই শুয়ে আছি। রহমানদা ডেকে ডেকে সারা—রহমানদার স্নান সারা।

—এবারে ওঠ। আর কত ঘুমাবি। হাত-মুখ ধুয়ে এলে সেই ডিম ভাজা, পাঁউরুটির পিস। এখন

দেখছি খাবার সামনে থাকলে মাথায় আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। রুমকি যে কুকুরটা নিয়ে যে কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে, তাও মনে নেই।

দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পাবার মোক্ষম একটা উপায় খুঁজে বার করা গেল। সারাদিন খাদ্যসামগ্রী সামনে নিয়ে বসে থাকলে হয়। কিন্তু পাব কোথায়। দিতেই সব যার সারা হয়ে যায়, তাকে কোন সরবরাহকারী আছে যে, এটার পর এটা খান, তারপর এটা, তারপর মিহিদানা, খান না আর দুটো রসগোল্লা—সুতরাং মোক্ষম উপায়টা কাজে লাগতে পারত একমাত্র কোন যদি সদাশয় সরবরাহকারী বিনা শর্তে রাজী থাকতেন।

রহমানদা বলল, অসীমকে বলেছি, ওর মোটর পার্টসের দোকান আছে। তার যদি কোন কাজে লাগে—

তাহলে রহমানদা কাজে লেগে গেছে।

—কাজ পাওয়া বড় কঠিন বিলু। তার চেয়ে ব্যবসায় নেমে পড়।

—কি ব্যবসা?

—আমার সঙ্গে থেকে থেকে শিখবি। বিচারবুদ্ধি একটু থাকলেই হয়ে যায়। কি করবি?

—কোন অফিসে-টফিসে—

—তুই ক্ষেপেছিস। সরকারী অফিসে চাকরি, সে হয় না। আমি পারব না। সব চোর, বুঝলি। পকেটমার, ছিনতাইবাজদের আমি ক্ষমা করে দিই। দেবে না, কেড়ে খাবে। কিন্তু ব্যাটারা সাধু সেজে বসে থাকে। এক দু'টাকার কাঙ্গাল। বেটারা সব লেঙ্গু।

লেঙ্গু শব্দটি নতুন। লুঙ্গির অপভ্রংশ কি না ঠিক জানি না, কিংবা লেজুড়ের। যাই হোক, রহমানদা আপাতত খেয়ে ওঠার পর বলল, দশ আনা থাকল। আজ আবার পালাস না। ফিরতে দেরি হলে রোয়াকে বসে থাকিস। গাড়িটাড়ি গেলে লক্ষ্য রাখবি। কেউ এলে বলবি, রহমানদা নেই। তুই যে এখানে এসে উঠেছিস, স্যাঙাতরা সব জেনে ফেলেছে। কোথায় ঘুরছি ফিরছি জানতে চাইবে।

—তুমি কী কর রহমানদা?

এই প্রথম ওকে 'তুমি' বললাম। এবং কিছুটা চমকে গেলাম। মানুষ কত সহজে একজনকে নিজের করে নিতে পারে।

—থাকলে টের পাবি। বলতে হবে না। তোকেও লাইনে ভিড়িয়ে দেব। হিসাব ঠিক থাকলে পাঁচ সাত বছরেই গাড়ি-বাড়ি। তুই লেখাপড়া জানা ছেলে, তোর সহজেই হবে।

রহমানদা প্রচণ্ড জোরে একটা হাই তুললে। মুখে তুড়ি দিলে। শেষে বললে—স্বাধীন দেশ তো। লোকজন সব স্বাধীন। আগে পরাধীন ছিলাম। শৃঙ্খলিত বলে দেশনেতারা। হাত-পা বাঁধা থাকলে কাজে অসুবিধা। না থাকলে কত সুবিধা। বল। যাই করবি, তাতেই ফসল। কেবল কোন্ গাছে কি কি সার লাগে জানতে হয়।

একটা টিকটিকি সে সময় ধপাস করে আমার মাথায়—ভয়ে উঠে দাঁড়ালে বললে —তুই খুব পয়া আছিস। কাল ভাল রোজগার হয়েছে। আরও হত, লেখাপড়া জানি না। অক্ষরজ্ঞান নেই, ছোড়দিদের গাড়ি চালিয়ে পেট ভরত। আর এখন সময়ে ছোড়দির বাবাই বলে—হবে নাকি?

—কি হবে নাকি?

—টাকা।

—টাকা চায়?

—চায় মানে? নেশা। জমিজমার নেশা। শহরের ফাঁকা জায়গা পেলেই কিনে ফেলে। নেশা না থাকলে হয় না। যেমন নেশা না থাকলে কার দায় বল এত সকালে দুটো মুখে দিয়ে ছোটার? বড় হ', বুঝবি।

রহমানদার এত কথা বলার দায় আমার সঙ্গে নেই। বরং গম্ভীর থাকলেই মানাত। যার আশ্রয়ে যে থাকে, সেই তার মনিব। সব সময় গোবিন্দদার মত রহমানদাও আমার মনিব—মনিবের এমন দিলখোলা কথাবার্তায় আরও বেশি মজে গেলাম। রহমানদা চলে গেলেই সারাদিন একা। পেয়ারা গাছ এবং পাঁচিল, রাস্তার লোকজন দেখা আর পাশের বাংলোবাড়িটায় রুমকি, টাইগার ভয় দেখাবে।

সদর দরজায় পুলিস।

দুম করে বলে ফেললাম, না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয় না রহমানদা?

—চুরি!

—না, এই আর কি, কেউ যদি নেয়, নেবার পর যদি চিরকুটে লিখে রাখে, নিয়েছি। তবে কি চুরি হয়?

—মরণ হয়।

—তার মানে?

—কিছু লিখে রাখতে নেই রে। 'শতং বদ মা লিখতি' কি না বলে যেন। কোনদিন এমন কাজ করবি না। লেখাপড়া শিখে তোর এই বুদ্ধি হল। কেউ নিয়ে আবার লিখে রাখে নাকি?

—লেখে না?

—লিখলেই তো ধরা পড়তে হয়।

গ্যাছে। সব গেল। নিজের হাতে মরণ-ফাঁদ পেতে এসেছি। কি করি? মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পৃথিবীতে কত বড় নির্বোধ হলে এমন হয়! নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। চুপ করে থাকলে রহমানদা বললে, যাকে যা দিই মুখে মুখে হিসাব। লেখা থাকলে হিসাবে গন্ডগোল হয়। লোকও সব তক্কে তক্কে আছে, পেলেই খপ করে ধরে ফেলে।

তারপর রহমানদা কখন চলে গেল, টের পাই নি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি—রাস্তাই একমাত্র মুক্তির পথ—ফেরার হওয়া ছাড়া আর ভাগ্যে কিছু লেখা নেই। টেবিলে দশ আনা পয়সা। বাইরে দরকার পড়লে তালা দেবার চাবি। আর কিছু নেই। একটা তোয়ালে স্নানের জন্য, আর কিছু নেই। টেবিল ঘড়িটা টিকটিক করে বাজছে, না মস্করা করছে, বুঝতে পারছি না। রাস্তার হাতছানি—তখনই ঘেউ—এই রে, যাব কোথায়? সে তো জেগে আছে। দিনরাত কেউ জেগে থাকলে, আমি করি কি? অগত্যা ছোড়দিই আমার সব। হাতজোড় করে অপরাধ স্বীকার করলে, পুলিসে দেবার কথা ভাবতে নাও পারে। বাইরে পেয়ারাতলায় বসে আছি, ছোড়দির সঙ্গে দেখা করব বলে। আর সেই সময় একটা সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িতে নীল ফ্রক গায়ে ছোড়দি। গাড়িটা হুস করে বের হয়ে যাবার সময় হাত নেড়ে বলল, তাহলে পালাস নি, এখনও আছিস?

দৌড়ে গেলাম, ছোড়দিকে কিছু বলব বলে। ছোড়দির গাড়িটা চলে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে ছোড়দি। পায়ে সাদা মোজা, কালো পাম্পশু। ফাঁপানো ববকাটা চুল। কপালের অর্ধেকটা ঢেকে আছে। একটা সাদা রঙের গাড়ি যেন আশ্চর্য এক পৃথিবীর খবর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরবর্তী নক্ষত্র বুঝি মানুষের শৈশবে, এভাবেই আকাশে আলো দেয়। কেন জানি বিশ্বাস হল, ছোড়দি আর যাই করুক পুলিসে দেবে না। টের পেলাম, ছোড়দির দুষ্টু চোখে বড় বেশি সুষমা। অন্য গ্রহ থেকে তখন কেউ যেন সংকেত পাঠায়—আমি আছি, আমি বড় হচ্ছি। মনের সব গ্লানি নিমেষে কেউ হরণ করে নেয়। প্রসন্ন মনে ভাবি, আমার বড় হওয়া তারই হাত ধরে। বাবা-মা ভাই বোনের মতো সেও জীবনে অংশীদার হয়ে যাচ্ছে। ভারি গোপনে পা টিপে টিপে সে আসছে।

এখন আমি স্বাধীনও বলা যায়, পরাধীনও বলা যায়। স্বাধীন এ জন্যে, আমার মনিব রহমানদা নেই। দরজায় তালা মেরে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারি। মানুষজন দেখলে, জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। বাবার কথা। বনের মধ্যে বাড়িটা করার পর, বাবা বোধহয় এটা টের পেয়েছিলেন। ভিটেমাটি ছেড়ে বনের মধ্যে বাড়িঘর করতে কেউ এলেই, বাবার অহংকার বেড়ে যেত। মাটি মানুষ এবং গাছপালা সম্পর্কে নানা রকমের কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা বলতেন। মানুষ নিজের ঘরবাড়ি চায়। প্রতিবেশী চায়। গাছপালা চায়। প্রতিবেশী না থাকলে, তোমার অহংকার কার কাছে? প্রতিবেশী আছে তাই মানুষ এত উদ্যোগী, জীবন সম্পর্কে মানুষের এত আগ্রহ। বাবা গভীর বনটার প্রথম ইজারাদার। নিজের মতো একখানা গ্রাম তাঁর আবার দরকার। তিনি ঘুরে ঘুরে খবর দিয়েছেন, চলে যাও, বহরমপুর স্টেশনে নেমে রেল-লাইন বরাবর। সামনে পাবে বাদশাহী সড়ক। পাশে পুলিস ট্রেনিং সেন্টার। পরে মাঠ। আরও পরে রাজরাজড়াদের আম-কাঁঠালের বাগান। জঙ্গল গড়িয়ে এখন সুমার বন। জঙ্গল সাফ করে ঘর বানাও। কত কাল আবাদ নেই—বীজ বুনলেই গাছ। খাবার থাকবার ভাবনা নেই।

বাবাকে তখন আমার কিছুটা মোজেসের মতো মনে হত। অথবা বাবা যেন সেই মহাপ্লাবনের সময়কার মানুষ—নৌকায় তিনি সব জোড়ায় জোড়ায় পাখি, জীবজন্তু এবং মানুষের প্রজাতি তুলে নিচ্ছেন। নোয়ার নৌকা এখন বাবার গ্রামের আবাসটি। সেই বাবার ছেলে এইমাত্র নিজেকে স্বাধীনও মনে করছে—আবার পরাধীনও ভাবছে।

পরাধীন এই জন্য যে একটা কুকুর নোয়ার বংশধরকে আটকে রেখেছে—বাবা এটা ভাবতেই পারতেন না। কুকুর গৃহপালিত জীব। তার এত আসকারা হবে কেন! মানুষের কাছে সে তো মাথা হেঁট করে রাখবে। সেই কুকুরের ভয়ে নোয়ার বংশধর খাটিয়ায় শুয়ে আছে। মাথার ওপর নিষ্ফলা পেয়ারা গাছ। শরতের বাতাসে, দুটো একটা পাতা ঝরে পড়ছে মাথায় পায়ে। রাস্তায় রিক্শর প্যাঁক প্যাঁক শব্দ। জংশন স্টেশনে গাড়ি—নীল আকাশ গুরুদোয়ারার গম্বুজ পার হয়ে একটা কলের চিমনির কাছে আটকে গেছে। নোয়ার বংশধর ভারি বিপাকে। পা নাড়লেও মনে হচ্ছে পাঁচিলের ওপাশে টাইগার গরগর করছে। এ হেন অবস্থায় বাবার বিচারবুদ্ধি সাফ। ট্রেনে দেখেছি, বিনা টিকিটে বাবা আমাদের তুলে দিয়ে এ-কামরা ও-কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চেকার দেখলেই পরিপাটি হাসি এবং সখ্যতা। সখ্যতার মতো বড় শত্রুতা অপহরণকারী আর কিছু নাকি নেই। সুতরাং টাইগারের বেলায় বাবার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা প্রয়োগ করে দেখবার একটা বাসনা গজাল। একটা কুকুরের হেপাজতে থাকতে মানুষের কতক্ষণ ভাল লাগে? কুকুরটাকে হাত করতে পারলেই খোলামেলা স্বাধীন জীবন। ভাবা যায় না।

ডাকলাম, কুঁ।

কুঁ ডাকলে, কুকুর আসে। পায়ে লুটায়। ঘাউ ঘাউ করে উঠল কিন্তু কুকুর এল না।

আবার—কুঁ।

রাস্তা থেকে দুটো নেড়ি কুকুর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল। এল না। তাহলে কুঁয়ে হবে না। রাস্তার কুকুরও আমায় চিনে ফেলেছে। দেবার মুরদ নেই, ডাকে। হন্যে হয়ে ঘুরছি, শুঁকছি সব কিছু, কোথাও কিছু নেই—কুঁ দিলেই হল। আর টাইগারের ইজ্জত কত! ছোড়দির নফর, সে কুঁ দিলে ঘাউ ঘাউ করবে শুধু। আপাতত তবে উঁকি দেওয়া যাক। পাঁচিলে উঁকি দিতেই মনটা ভারি প্রসন্ন হয়ে গেল। টাইগার জাফরিকাটা বারান্দায় বন্দী হয়ে আছে।

শত হলেও স্বভাবে কুকুর—খেতে দিলে সব হয়—ছোড়দি সেই ভয়ে বোধহয় আটকে রেখে গেছে। লাফিয়ে পাঁচিল টপকে নোয়ার বাচ্চার সঙ্গে ভাব জমালেই গেছে। সব প্রভুত্ব ছোড়দির তবে যাবে। তারপরই মনে হল, বাড়ি থেকে বের হওয়া তক আমি কেবল মানুষের খারাপ দিকটাই দেখছি। এও তো হতে পারে, পাঁচিল টপকে আমাকে কামড়াতে পারে ভেবে আটকে রেখে গেছে। ছোড়দি নেই, স্কুলে গেছে, গাড়িটা ফিরে এলে, সাহেব-সুবো মানুষ বের হয়ে গেল গেট দিয়ে। খাটিয়ায় শুয়ে থাকলে খারাপ দেখাতে পারে ভেবে গাছের নিচে খুব অবলা জীবের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ছোড়দির যখন এত প্রতাপ, তার বাবা কিনা জানি একজন। আমাকে দেখে তিনি যখন কিছু বললেন না, তখন কেন জানি মনে হল ফাঁড়া কেটে গেল। এখন ছোড়দি ফিরে এলে শুধু বলে রাখা, আমি মাত্র কুড়িটা টাকা চুরি করেছি। টাকাপয়সা হলে ফেরত দেব। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। কান মলছি, আর কখনও এ কাজ করব না। আমাকে আর যাই কর, পুলিসে দিও না। পিলু জানতে পারলে ক্ষেপে যাবে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবনা—যার খাচ্ছি, তার তো কিছু কাজ করা দরকার। ঘরটা খুলে ঝাঁট দিলাম, কুঁজোতে জল রাখলাম—রহমানদা এসে সব দেখে যেন খুশি হয়—আর একটা বড় কাজ করে যাচ্ছি ফাঁকে ফাঁকে—সেটা ঘড়িতে সময় দেখা—লুঙ্গি, গামছা নিয়ে চানও করে আসা গেল। দশটায় পাঁড়েজী গেলে আবার রাগ করতে পারে—পা বাড়িয়েই রেখেছ! তার চেয়ে আর একটু পায়চারি করলে সময়ও কাবার হবে, ক্ষুধারও ষোল আনা বেগ আসবে। পায়চারি করার পক্ষে উঠোনটা প্রশস্ত। পুবে-পশ্চিমে পা ফেলে দেখলাম ছাব্বিশ বার, উত্তরে-দক্ষিণে আঠারোবার। আরও দশ দফে উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম আপাতত করা যাক। করা শেষ হলে দৌড়ে গিয়ে ঘড়িটা দেখলাম—মাত্র চার মিনিট। মিনিটে এতটা হাঁটা যায়, এর আগে কখনও জানতাম না। বুঝতে পারছি, ক্ষুধার বেগের তালে হাঁটার বেগ জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বরং এই ধরনের বেগ নিয়ে পৃথিবী

পরিক্রমা করতে কত সময় লাগতে পারে, তার গণিত সেরে রাখা ভাল। পৃথিবীর পরিধি জানা, তাকে গুণ, ভাগ করলে সময়টা পাওয়া যাবে। এতে সময়ও পার করা যাবে অনেকটা। অর্থাৎ এগারোটায় গেলে পাঁড়েজী খুব একটা বেশি রাগ করবে না। বসে বসে অঙ্কটা সেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। উঠোনের মাটিতে একটা কাঠি দিয়ে অঙ্কটা করতে গিয়ে দেখা গেল, সারা উঠোন যোগ-ভাগে ভরে যাচ্ছে—কিন্তু অঙ্কটা মিলছে না। এই সমস্যাটা তৈরি হওয়ায় বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া গেছে, টেরই পাই নি। যখন পিছুতে পিছুতে পিঠ পাঁচিলে ঠেকেছে তখন হুঁশ ফিরে এল—কার জন্য এত বড় অঙ্ক, মনে পড়ে গেল দুটো আহারের জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে সব অর্থহীন। রাস্তায় এসে মনে হল, নেশার ঘোরে তালা দিতে ভুলে যাই নি তো। ফিরে এসে দু'লাফে দেখে যাওয়া গেল—তারপর কতটা দ্রুতবেগে মাঠ পার হয়ে পাঁড়েজীর দোকানে হেঁটে গেছলাম, টের পাই নি। শালপাতা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ঠিক করে বসে আছি। পাঁড়েজীর কত আপনজন আমি দেখুক।

কিন্তু—

কিন্তু কি?

ভাত আসছে না কেন?

আমায় সে বলল, জল খাও।

পাঁড়েজী আমার দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে।

এনামেলের গ্লাসে জল। ঢক-ঢক করে জল খেলাম।

পাঁড়েজী আমাকে দেখে প্রথমে কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বোধহয়—অথবা চিনতে পারছিল না—কোথাকার কে হে, বলা নেই, কওয়া নেই, পাত পেতে বসে যাওয়া। তারপর চিনতে পেরে 'ওফ' শব্দ শুধু।

আমি দেখেছি, বাবা শিষ্যবাড়ি গেলে কিংবা ঠাকুরের ভোগ হলে সব সময় অন্ন বলতেন। ভাত বলতেন না। গাম্ভীর্য রক্ষা করার প্রয়াসে বলতেন, অন্ন। কাজেই গাম্ভীর্য রক্ষার্থে বোধহয় অন্ন বলারই নিয়ম। আপাতত পাঁড়েজীর গাম্ভীর্য দেখে মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, ঠাকুর অন্ন।

—কিয়া বলতা? কি বলছ?

—অন্ন।

—দশ আনায় অন্ন হয় না।

—ঠিক আছে, দশ আনায় ভাতই হোক।

—ভাতও হবে না।

কেন হবে না বলার জোর আমার নেই। পাঁড়েজীর পাইস হোটেলে দশ আনার মিল তবে উঠে গেল! বসে থেকে বোধহয় লাভ নেই। আমার দিকে আর ফিরেই তাকালো না। এত আহ্লাদ করে ক্ষুধার বেগ বাড়িয়ে এই ফল। কোন রকমে, বললাম, দিন আজকের মতো।

—পোষাবে না।

এ বেলায় বেশ বাংলা বলে। পোষাবে না। মাথায় বজ্রাঘাত কাকে বলে এই প্রথম টের পেলাম। না খেয়ে আছি, থাকছি এক কথা—সয়ে যায়, কিন্তু আশা করে থাকা খাব, সময় হলেই ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি সেই স্বপ্নের মধ্যে, যেন কত কাল ধরে শখ করে খাব কথাটা পুষে রেখেছি মনে—খাব অন্ন খাব—আর পাঁড়েজী বলে কিনা পোষাবে না। কত হলে পোষাবে আর বলার সাহস হল না। বেশি চাইলে দেব কোত্থেকে? দশ আনা বরাদ্দ মিলের জন্য। বেশি চেয়ে রহমানদাকে বিগড়ে দিলে অভিমানের জাত রক্ষা করার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত যাবে। মানে মানে উঠে পড়াই ভাল। চারপাশে হালুম-হুলুম শব্দ। পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে—কি যেন একটা লাইন বার বার মনে আসছে। খুব খিদে পেলে মানুষের বোধহয় চোখে জল আসে। বের হয়ে আসার সময় কেমন সব ঝাপসা দেখছিলাম—সামনের মাঠটা সহসা কেন যে এত কুয়াশায় ছেয়ে গেল! কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। মাঠটা বেশ বড়। দুটো ন্যাড়া বেলগাছ পার হয়ে রাস্তা। রাস্তা পার হলে কাঁচা নর্দমা, খুপরি ঘর, লরি-টেমপোর গ্যারেজ। সারি সারি ট্রাক। তারপরই গুরুদোয়ারা এবং বাংলোবাড়ির সদর। দু'দিনেই জায়গাটার মধ্যে একটা নিজস্ব ভাব এসে গেছে। খাটিয়ায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকার বড় সুসময় এটা

আমার। কিন্তু পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা, সে কেন মানবে? গুরুদোয়ারার কলে জল, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে জলপান করতে হবে। আঁজলা পেতে আকণ্ঠ জল খেলাম। হা-অন্ন পেট এতটা জল সইবে কেন? কিছুটা বমি হয়ে সে তার নিজের সমতা রক্ষা করতেই ভাবলাম, ঠিক হয়েছে। ঢেকুর। জল খাবে, তাতেও রাক্ষুসেপনা। দশ আনায় মিল তোমার মিলবে কেন? এখন খাটিয়ায় শুয়ে পড়তে পারলে কথা নেই। নির্ভেজাল ঘুম। ঘুম মানুষের কত বড় সম্বল, এ সব সময়ে টের পাওয়া যায়। ঘুমিয়ে পড়লে মরা। কাকপক্ষীতে ভয় পায় না। আমার চারপাশটায় বিচিত্র সব পাখিরা এ সময়টা ওড়াউড়ি করবে জানি। ডাক খোঁজ করবে। —হ্যাঁরে ওঠ, খাবি না? কেউ যেন দূর থেকে তখন ডাকে। কে ডাকে। ঘুমটা লেগে আসছিল—কার মুখ। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ডাকছেন, ওঠ। খাবি না? কত বেলা হল রে!

আমি যে না খেয়ে আছি, পলাতক জীবন, আমার কিছুই মনে আসছিল না। বাড়িঘর, উঠোন, ঠাকুরঘর যেন ডাকলেই পিলু দৌড়ে বের হয়ে আসবে, বলবে যাবি না দাদা, মাছ ধরতে যাবি না, কিংবা আরও দূরের খবর সে দেবার জন্য মুখ বার করে রেখেছে। চোখ কচলে যখন তাকালাম, দেখি সাদা রঙের গাড়িটা ঢুকছে। ছোড়দি ফিরল। ছোড়দি আমার দিকে তাকালও না। আমি যে আছি, কাল থেকে, ছোড়দি যেন ভুলে গেছে। গাড়িটা থামলে বলতাম, জান ছোড়দি, মানুষের স্বপ্ন কত সুন্দর হয়। পিলুটা দরজায় মুখ বাড়িয়ে আছে। কিছু একটা হলেই পিলুকে নিয়ে আসব। ও পাহাড় দেখে নি। তোমাকে নিয়ে আমরা দু' ভাই একদিন কাছের পাহাড়টায় ঘুরে আসব।

ছোড়দি কথা বলুক চাই না বলুক—আমার কিছু আসে যায় না। ছোড়দি এসে গেছে—বাড়িটার মধ্যে ছোড়দি আছে—ঠিক যেন কি থেকে যায় ছোড়দি থাকলে—ঠিক কাউকে বোঝাতে পারছি না—অসীম হাহাকার সমুদ্রে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো ছোড়দি। ছোড়দিকে কখন যে কথাটা বলব। উঠে দু'বার পাঁচিলে উঁকি দিলাম। জানালা খুললে ছোড়দিকে বাগানের মধ্যে দেখা যেতে পারে—কিন্তু বারণ। সুতরাং একবার রোয়াকটায় ঘুরে আসা গেল—দেখলাম রোয়াকে উঠে বসলে বাড়ির ভেতরের অনেকটা দেখা যায়—কিন্তু ছোড়দিটা কোথায়? গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাচ্ছে লোকটা—দেখা যায়, অথচ ছোড়দি কেমন অদৃশ্য।

ছোড়দি আমার শত্রুপক্ষ, পুলিসের ভয় দেখিয়ে রেখেছে—সবই ভুলে যাই—কারণ এই প্রথম টের পেয়েছি, এবাড়িতে আমার জন্য কেউ জেগে থাকে—যাতে পালাতে না পারি, টাইগারকে সতর্ক করে দিয়ে যায়। সম্পর্ক মধুর নয়, তবু কোথায় যেন একটা টান বোধ করতে পারছি। সদ্য গাঁ থেকে আসা লোয়ার বংশধরের পক্ষে এই আশা কুহকিনী কত দূর নিয়ে যাবে, সে অবশ্য তা অনুমান করতে পারে না। তবু সখ্যতা, এবং নক্ষত্রের সংকেত-বার্তা মিলে ছোড়দি আমার এক ভয়ঙ্কর অরণ্য। সে কাছে এলে ভয় লাগে, দূরে চলে গেলে কষ্ট পাই।

শরতের আকাশ এমনিতেই একটু বেশি নীল থাকে, আজ একটু বেশি গভীর নীল মনে হল। এগুলো কি মানুষের বড় হওয়ার লক্ষণ? এক অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে দুটো কথাবার্তা তাও কত ভয়ের কথাবার্তা অথচ কেন যে সম্পর্কের গভীরে নিয়ত এক টান থেকে যায় এবং কখনও কিছুটা ঝড়ো হাওয়ার মতো কেউ যেন উঁকি দেয় পাঁচিলে। ছোড়দি টাইগারকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছে রাউন্ড দিতে। এদিকেই ছুটে আসছে। হাওয়ায় ছোড়দির চুল উড়ছিল, ফ্রক উড়ছিল। কোথা থেকে এই প্রবল হাওয়া আসছে টের পাচ্ছি না। আমার কাছে এসে ঠিক উল্টো রোয়াকে বসে পড়ল। টাইগার পায়ের কাছে। সোজাসুজি বলল, গাছে উঠতে পারিস?

পিলু পারে। আমি গাছে চড়তে ভাল পারি না। তবু বললাম, হ্যাঁ, গাছে চড়তে জানি।

—লাফাতে পারবি?

—হ্যাঁ পারব।

—আয় তো। দেখি, কেমন লাফাস?

ছোড়দি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। এখনই বলে দিলে হয়। ছোড়দির কুকুরটা টের পেয়েছে, আমি একটা চোর। চুরি করা পাপ না ছোড়দি? বাবা তো চুরি করাকে মহাপাপ মনে করে। চুরি করি নি ঠিক—

—এদিকটায়। ওদিকে না।

দু' লাফে ছোড়দির বাগানের মধ্যে চুপি চুপি ঢোকা গেল।

—ঐ দ্যাখ অকালের গোলাপজাম। পেড়ে আন।

তাকিয়ে দেখলাম, অনেক উপরে গাছের মগডালে চাঁপা ফুলের মতো ক'টা গোলাপজাম ঝুলে আছে। বললাম, কী সুন্দর!

গাছের মগডালে এক গুচ্ছ পাকা গোলাপজাম। মানুষের সাধ্য নয়—কিন্তু আমার অসাধ্য কাজ বলতে কিছু নেই। প্রাণ দিয়েও ছোড়দির কাছে ভালো মানুষ প্রমাণের দরকার। গাছটা সরু লম্বা, যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যত উঠছি, তার চেয়ে বেশি নেমে আসছি। এত পিছল যার কান্ড সে কেন আমাকে সহজে রেয়াত দেবে। তবু রবার্ট ব্রুসের কথা মনে পড়ল। আমাদের পড়াশোনার সময় অমনোযোগী হলে বাবার দুটো আপ্তবাক্য সার ছিল। পারিব না কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার। তারপরই রবার্ট ব্রুসের গল্প। পড়াশোনার বিষয়ে দ্বিতীয় আপ্তবাক্যটি বিদ্যাসাগরমশাই। বই নেই —বিদ্যাসাগর, খাতা-পেনসিল নেই—বিদ্যাসাগর, আলো নেই—বিদ্যাসাগর।

বড়ই রাগ হত, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যে একজন ঈশ্বরচন্দ্র রেখে গিয়েছিলেন বাবাদের জন্য। পড়ার কথা উঠলে রাস্তার গ্যাসের আলো থেকে দামোদর নদ পার হওয়া পর্যন্ত বাবা আমাদের সবটা না বলে নিস্তার দিতেন না। এতে করে বাবার প্রশান্তি বাড়ত। সব সদগুণই ছেলেরা পাবে এবং তুলনায় বাবা যে একজন ঠাকুরদাসের সর্বশেষ সংস্করণ, হাবে ভাবে তা প্রকাশ করতে চাইতেন।

গাছ থেকে নেমে দেখলাম, জামা-প্যান্টের খানিকটা গাছে এবং ডালে। সঙ্গে শরীরের কিছু ছাল-চামড়া। গোলাপজাম পেড়ে হাতে দিলে ছোড়দি বলল, শীগগির পালা, মা আসছে।

গাছ এবং আগাছার জঙ্গলে পুকুরের এদিকটায় ভর্তি। মাথা নুয়ে দৌড়। পকেটে দুটো গোলাপজাম। ছোড়দির অলক্ষ্যে রেখে দিয়েছি। গাছে থাকতেই নিরন্ন পেট এবং নীতিবোধের ঠোকাঠুকি হচ্ছিল—কখন হাতসাফাই হয়ে গেছে টের পাই নি। ছোড়দি যদি পকেট সার্চ করত—ভয়ে কেমন কাঁটা হয়ে গেলাম। তারপর দৌড়। কারণ চারপাশে মানুষজন, চুরি করে গোলাপজাম খাচ্ছি—কে কোথা থেকে টের পাবে—একটু নিরিবিলি জায়গা হলে ভাল হয়। বারবার পেছনে তাকাচ্ছি। বাড়িটা, মায় তার গাছপালা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত থিতু হতে পারলাম না। শেষে মনে হল, নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছি, এবং শরীরও আর দিচ্ছে না। সন্তর্পণে খেলে কেউ টের পাবে না। একসঙ্গে দুটোই মুখে পুরে প্রায় গিলে ফেলার মতো—তারপর মুখ মুছে ভারি নিরীহ ছোকরা হেঁটে যাচ্ছে, মুখে চোখে এমন অভিনয় ফুটিয়ে হাঁটা দিতেই টের পাওয়া গেল, ছাল-চামড়া ওঠা জায়গাগুলো জ্বলছে। আর চকিতে দশ আনা পয়সার যে মালিক আমি, পকেটে আছে তো, দেখতেই সব ফাঁকা। দৌড়ঝাঁপে কোথায় ছিটকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্ শব্দ বের হয়ে এল মুখ থেকে। কি বোকা আমি, দশ আনায় মিল না হোক, পাঁউরুটি জিলিপী, মিষ্টি, মিহিদানা কত কিছু খেতে পারতাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ভাতখেকো বাঙ্গালের মিল না খেয়ে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে।

দশ আনা পয়সা এখন সারাটা রাস্তায় খোঁজা। কিন্তু যদি পয়সা ক'টা ছোড়দির বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। সেখানে তো একা যাবার নিয়ম নেই। তবু যে পথে আসা গিয়েছিল, ঠিক ঠিক পথটা অনুসরণ করে আসা গেল। রাংতা এবং নাট-বল্টু যাই দেখি উবু হয়ে তুলে নিই। না, সবই আশা কুহকিনী। বাবার ঠাকুরদাস হওয়ার মতো। এমন একজন পিতৃদেব কি করে যে আমাকে মোটর ড্রাইভার করার কথা শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলেন। কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে একজন ড্রাইভারের তুলনামূলক সম্পর্কের কথা ভাবলে নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে পারে—সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ তো কি চকচক করছে। টী-স্টলের পাশটায়—না, সোডার বোতলের ছিপি। একটা আস্ত সিকি যেন—আসলে পয়সা ক'টা কত দুর্লভ বস্তু, আমার চোখ না দেখলে তখন কেউ টের পেত না। একটা আবর্জনার ঢিবিতে লাফিয়ে গেছি, সেখানে বসে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করা গেল। তবু নিরাশ হতে শিখি নি—না পারিলে দেখ শতবার। এই শতবার করতে গিয়ে কখন যে বেলা পড়ে গেছে, কখন ডুবন্ত জাহাজের হতাশ নাবিকের মতো খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছি, টের পাই নি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বাংলোবাড়িটায় মিউজিক বাজছে—কোথাও হাউই পুড়ছে—পৃথিবীতে মানুষের অনন্ত সুখ, শুধু আমার কাছেই সে

মুখ ফিরিয়ে আছে। কবে যে সদয় হবে—

রহমানদা ফিরে আমাকে দেখল শুয়ে আছি। পালাই নি, এতেই তার মুখ উজ্জ্বল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ঘরের সব কিছু ছিমছাম দেখে খুব খুশি। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাতেই কেমন বিস্ময়—হ্যাঁরে, তোর চোখ-মুখ কোথায় গেছে? কি হয়েছে তোর? মুখ এত শুকনো কেন?

সারাটা দিন যা গেছে, সব বললে বিশ্বাসই করবে না। মানুষের এত হুজ্জোতি হয়, তার ধারণায় হয়ত নেই। খাই নি বলতে গিয়ে গলাটা কেমন বুজে এল। অভিমান এত যে আমার কোথা থেকে আসছে! বুঝি, সব মানুষের উপর অভিমান। মা-বাবা, পাঁড়েজী এমন কি পিলুটা পর্যন্ত আজ আমার শত্রু। পিলু যদি এক-আধ দিন শহরের সেই গ্যারেজে দেখা করতে যেত, তবে হয়তো পালাতাম না। পিলুরও যে অভিমান হতে পারে, তার দিগ্‌বিজয়ী দাদাটা শেষ পর্যন্ত মোটর গ্যারেজে ঝুল-কালি মেখে একটা ক্লিনারের কাজ করছে—সহ্য হবে কেন? পিলু তো কত দিন বলেছে, তুই দাদা যখন বড় হবি, কলেজে পড়ে এই-য়া বড় মানুষ হবি, তখন আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। সেই মস্ত বড় দাদাটা কিনা গ্যারেজে কাজ করতে রাজী হয়ে গেল!

—কী হয়েছে বলবি তো? রহমানদা জুতো মোজা খুলে, হাতঘড়ি খুলে ভেতরের ঘরটায় রেখে এল।

—পাঁড়েজী খেতে দেয় নি।

—ঝগড়া করেছিস?

—না-না। বলল, দশ আনায় মিল হবে না।

—মগের মুল্লুক। সহসা একটা ধনুকের ছিলা কেটে গেলে যেমন হয়, রহমানদা সেরকম সোজা হয়ে বলল, চল তো, শালার থুতনি নেড়ে দেব।

—ওর দোষ নেই দাদা তুমি শুধু-শুধু রাগ করছ।

এমন কথায় রহমানদা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তবে কার দোষ?

—আমারই।

—তোর মানে তুই কি কিছু....

—না, না। আমি কিছু চুরি করি নি। মানে...

—চুরি! চুরি করবি কেন? চুরির কথা আসে কি করে? এতটুকুন একটা ছেলেকে পারল, না খাইয়ে রাখতে?

—না পোষালে কি করবে?

—তোর কোন কথা বুঝতে পারছি না। বলে ফের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। দশ আনা পয়সা সোজা! দশ আনায় সব জায়গায় মিল দেয়, ও দেবে না মানে? তুই ব্যাটা জরু-গরু বৌ ক্ষেত সব করবি আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর মিল দেবার বেলায় জুচ্চুরি। পাষন্ড কোথাকার। হারামির সব ক'টা দাঁত যদি তুলে না দিই। ইস, সেই থেকে না খেয়ে আছিস?

প্রায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। আমার কোন কথাই কানে তুলছে না। দোকানের সামনে গিয়ে রহমানদা হাঁক পাড়ল, পাঁড়েজী—

—আজ্ঞে যাই জনাব।

কী ভাল মানুষ!

—তুমি ওকে খেতে দাও নি?

বুঝতে পারছি, রহমানদা ক্ষেপে গিয়ে হয়ত এখন তুই তুকারি করবে। এতটা আমার ভাল লাগছিল না। ভিতরে আবার মজাও পাচ্ছিলাম। একটা কুকুর থাকলে, আরও ভাল দেখানো যেত। লুঙ্গি খুলে দিতে পারত।

—দিচ্ছি।

—ও পেট ভরে খাবে। কত লাগবে তোমার?

—যা খায়, চোদ্দ আনা লাগে জনাব।

লোকটা একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে দেখছি।

—তাই দাও। মাছের মুড়ো আছে?

—আছে।

—টক?

—আছে?

—দুটো মিষ্টি?

—দেব।

—সব মিলে কত?

—এক টাকা।

—ব্যস তো এই কথা। দেখবে নড়েচড়ে বসেছ তো আগুন ধরিয়ে দেব চালায়। পাঁড়েজী একটা হাতল ভাঙা চেয়ার টেনে এনেছে। খুব বিনয়, বলছে, বসুন রহমান সাব। কি খায় দেখুন! তারপর রাগ করতে হয় করবেন।

—তাই দেখব। এই বিলু, পেট ভরে খাবি। তুই এমন কি খাস যাতে ওর পোষায় না। আর যদি দেখি লজ্জা করছিস খেতে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।

এমন উভয় সংকটে জীবনে কমই পড়া গেছে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আগে দরকার। পেট ভরে খাব। সেটা আকণ্ঠ হবে। এবং আর যাই করি, কোন কারণে রহমানদার সঙ্গে অবিশ্বাসের কাজ করতে পারি না। বড় আসনে আসন পিঁড়ি হয়ে বসা গেল। অনেক দিন পর ভোজের খাওয়া। গণ্ডুষও করা গেল। অর্থাৎ খাবার আগে দেবতারা তুষ্ট হোন, পেল্লাই জবরদস্ত ভোজ—যত দেয় তত খেয়ে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখছি পাঁড়েজীর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে। এদিক থেকে রহমানদা বলছে, ওর ভাত লাগবে। এই ঠাকুর তোমার কি বাতে ধরেছে, হাতায় ভাত ওঠে না কেন? বিলু চালিয়ে যা।

যত বলছি আর লাগবে না, তত রহমানদা বলছে, লাগবে। তুই খা তো। ব্যাটা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেবে না। কুনজুস। পাপ হবে না। মানুষকে কখনও আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয়? না খাইয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়? চিল্লাচিল্লিতে আরও দশটা লোক জমে গেছে। রহমানদা দুপুরের ঘটনা সবিস্তারে বলছে। বলুন, বেটা তুই কোন মুলক থেকে এয়েছিস পয়সা কামাতে, পয়সা কামা, বারণ করেছে কে? তাই বলে এমন নিষ্পাপ ছেলেটাকে না খাইয়ে রাখা। আপনারা বলুন, দশ আনায় মিল হয় কি না? সবার যদি হয়, ওর হবে না কেন!

সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সায় দিচ্ছে—রহমান সাব, এক পয়সা বেশি দেবেন না। যেমন দেশের গরমেন্ট, সব শালা লুটেপুটে খেতে এসেছে। এক পয়সা বেশি দেবেন না।

রহমানদা বেশিই দিল। পুরো এক টাকা। এতটা খেয়েছি যে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। রহমানদা বলল, বোস। আমি আসছি। বোধহয় রহমানদা তার রাতের সিগারেট আনতে গেল—কিংবা ওদিকটায় যে সার্বজনীন হোটেল আছে সেখানে খেতে চলে গেল। আমি বসে থাকলাম।

রহমানদা ফেরার সময় দুটো পান নিয়ে এসেছে। খা, খেলে হজম হবে। পাঁড়েজী অন্য খদ্দের সামলাচ্ছে। ভয়ে রহমান কিংবা আমার দিকে তাকাচ্ছে না। একা পেলে লোকটা কি করবে কে জানে? রাস্তায় বললাম, কাল খেতে দেবে তো?

—ওর বাপ দেবে। আরে তুই কি! না খেয়ে থাকলি! পয়সা তো ছিল, অন্য কোথাও কিছু খেয়ে নিতে পারলি না?

দৌড়ঝাঁপে পয়সা হারিয়েছে, ছোড়দির বাগানেই পড়েছে পয়সা ক'টা, কাল খুঁজলে পেয়ে যাব। পয়সা হারিয়েছি বলতে সাহস হল না।

রহমানদা রোয়াক পার হবার সময় বলল, কেউ এসেছিল?

—না।

—জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়লি কি করে?

—ছোড়দির গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে। তারপর রহমানদা যদি প্রশ্ন করে, গাছে উঠলি কখন?

পয়সা ক'টা দে। রেখে দি। বলে ফেলাই ভাল—রহমানদা!

ঘরে ঢুকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল—কিছু বলবি?

—গাছে উঠতে গিয়ে পয়সা ক'টা কোথায় পড়ে গেছে।

—তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। খুঁজেছিলি?

—হ্যাঁ। পাই নি। বাগানে আছে মনে হয়।

—কাল খুঁজে দেখিস।

—ঢুকতে দেবে?

—ছোড়দিকে বলে দিয়ে যাব। পয়সা হল গে মানুষের ইজ্জত। যেখানে সেখানে তাকে হারাতে নেই। ঠিক এই সময়ই কড়া নাড়ার শব্দ।

—এই খুলিস না। কেমন ফ্যাকাসে মুখ রহমানদার। বলল, কে?

—আমি।

—আমিটা কে?

—পাঁড়ে রহমান-সাব।

—অঃ। আসুন।

ভিতরে এলে বলল, বসুন।

—বৈঠেগা নেহি। আপনি মেহেরবান আদমি।

—তা বুঝছি। টাকা পয়সা এখন নেই।

—ও বাত নেহি।

—তবে কি বাত আছে?

পাঁড়েজী আমার দিকে চশমার উপর দিয়ে তাকাল। চোখ দুটো পিটপিট করছে। গোবদা মুখ, ঝাঁটা গোঁফ। গলায় ঢোলের মতো তাবিজ। তাগা কনুইতে বাঁধা। চেহারাতে রাম নাম সত্ হ্যায় হয়ে আছে।

—আজ্ঞে, রহমান সাব বলছিলাম...

—বলে ফেলুন না।

—দশ আনা আচ্ছা থা সাব।

—মানে

—চোদ্দ আনা মিল দিলে পোষাবে না সাব। বহুত খা লিয়া।

—কতয় পোষাবে?

—না—বলছিলাম, আপনার না যায়, হামার ভি না যায়। খাস বাত এক—দশ আনাই। দশ আনা দিলেই হবে।

—এত সুমতি!

—সুমতি না সাব, বাত এই হ্যায় ও ভি দশ আনা খাবে। হাম ভি দশ আনা মিল দেবে।

চুক্তি বাতিল হলে আবার কোথায় গিয়ে পড়ব কে জানে? যা দশা চলছে। বললাম, রহমানদা, ঐ কথাই থাক।

—মানে?

—দশ আনা মিল।

—পেট ভরবে?

—খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে? ক্ষুধার সঙ্গে কিছুটা চোখের খিদে আছে, ওটা আর বিশদ করে বোঝালাম না। আমার কথা পেয়ে পাঁড়েজীর হাতে স্বর্গ মিলে গেল!

—খোকাবাবু বহুত ইমানদার আদমি আছে সাব। হাম চলে। রাম রাম।

চোদ্দ আনায় আমার আকণ্ঠ খাবার স্বাধীনতা রহমানদা দিয়েছিল। পাঁড়েজীর এত বড় স্বাধীনতা পছন্দ নয়। সে আমার সেটুকু হরণ করে দিব্যি রাম নাম বলতে বলতে চলে গেল।

সকালে আজ ঘুম থেকে রহমানদার আগেই উঠেছি। রহমানদা সকালে উঠে ঘরের কাজকর্ম কিছু সেরে রাখে। কুঁজোতে জল রাখা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কিছু কাচাকাচি থাকলে তাও। জানি না, কেন

মানুষটাকে অত্যন্ত কাছের মনে হচ্ছে দিন দিন। বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কাজ কিছু নেই। কী পরিবারে, কী বাইরে। বাবার কথা। রামায়ণ থেকে মহাভারত থেকে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ। যিনি অন্ন দেন, তিনি ঈশ্বর। জমিদারী সেরেস্তায় বাবা কাজ করতেন—জমিদার মানুষটি তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ।

কাজেই এখানে যিনি অন্ন দিচ্ছেন, তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ থেকে যাচ্ছে। গৃহকর্ম করে আপাততঃ সে ঋণ থেকে আংশিক মুক্তিলাভের উপায় খুঁজছি। ঘুম থেকে উঠে রহমানদা আমাকে এ সব করতে দেখে ভারি ক্ষেপে গেল—বের হয়ে যা। এক্ষুনি বের হ বলছি। তোকে বলেছি কাচাকাচি করতে? নিকালো হিঁয়া সে।

খুব কাতর গলায় বললাম, সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

রহমানদা এ দু'দিনে আমার মোটামুটি পরিচয় জেনে নিয়েছে। আমাকে যে নবমী দা-ঠাকুর বলে তাও। বাবার কিছু কথাবার্তা তাকে আমার সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বোধহয় শিখিয়েছে। অবস্থা বিপাকে আমরা গরিব হয়ে গেছি, এবং এ সব কারণেই বোধহয় বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেল না। বলল, ঠিক আছে, কাল থেকেই কাজে লেগে যা। নিমতা যাবি। গাড়ি আসবে। গাড়িতে যাবি।

—কখন যাব?

—বিকেলের দিকে তুলে নেবে। তোর জামাপ্যাণ্ট জুতোর দরকার। ভাল হয়ে থাকতে শেখ।

দুপুরের দিকে রহমানদা আমাকে নিয়ে কিছু সওদাপাতি করল। তখনই কথায় কথায় বলল, আমি এক রকমের, তুই আর এক রকমের। তুই দেখছি তোর বাবার স্বভাব পেয়েছিস। আরও জানলাম, ওর দু'রকমের ব্যবসা আপাতত আছে। কোলিয়ারি থেকে কয়লা আনা আর পারমিটের পেট্রল ব্ল্যাক করা। বাবুদের পয়সা দিলেই পারমিট। পারমিট বেচলে পাঁচ-সাতশো টাকা হয়ে যায়। পুলিস, সরকারী বাবু, সবাই অংশীদার। রহমানদার পয়সার অভাব নেই। লেখাপড়া শিখে যদি মানুষ অধর্ম করে, চুরি-চামারি করে, তবে লেখাপড়া না-শেখা মানুষের আর ধর্ম থাকে কোত্থেকে। কাজেই এ-সব কাজে তার কোন পাপবোধ নেই।

এটা যে খুব একটা অধার্মিক কাজ, আমারও তেমন মনে হল না। কারণ বিষয়টা প্রথমে ভারি গোলমেলে। যুদ্ধের সময়কার কথা। ব্ল্যাক-মার্কেট শব্দটি তখন আমাদের শোনা। বয়সে খুব বাচ্চা, ব্ল্যাক-মার্কেট করে টাকা কামাচ্ছে কথাটা চুরি-চামারির পর্যায়ে পড়ত না। বরং যুদ্ধের কালোবাজারী একজন মানুষের পিতৃশ্রাদ্ধে যে এলাহি ভক্তির প্লাবন দেখেছিলাম, তাতে তার ধর্মবোধে এখনও বিস্মিত হই। ফলে রহমানদার ধর্মাধর্মে কিছুটা খামতি আছে, আদৌ বিষয়টা আমাকে স্পর্শ করল না। মানুষটা সোজাসুজি কথায়—বরং অনুরাগ আরও বেড়ে গেল। বললে জীবন দিতে পারি এমন অবস্থা।

সেদিন বিকেলের দিকটায় সেজেগুজে বসে আছি। এ সময়টাতে প্রায়ই আমার চোখ বাংলোবাড়িটায় গিয়ে পড়ছে। সকাল থেকে আজ ছোড়দি-কে দেখি নি। ইস্ত্রি করা জামাপ্যাণ্ট পরে কেমন দেখাচ্ছে, যদি ছোড়দি দেখত। দেখলে বোধহয় আর আগের মতো কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবার সাহস পাবে না। দেখা হলে, বাগানে যেতে পারতাম। কবে থেকে বাগানে পড়ে আছে দশ আনা পয়সা। কেউ নেই দেখছি। এমন কি, মালীটা যে ওদিকে কি টুকটাক কাজ করে, সেও নেই। কুকুরটার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচিল টপকে পালিয়ে দেখে এলে হয়। যেই টপকেছি, আর কোত্থেকে সেই বিশাল কুকুরটা এসে হামলে পড়েছে। ভয়ে কাঁটা। হাত তুলে দাঁড়িয়েছি। দৌড়ে আসছে কেউ। তাকে চিনি না। বাড়িতে কে কোথায় থাকে টের পাওয়া ভার। এসেই খপ করে হাত ধরে ফেলল, ক্যারে তুই?

যত বলি আমি বিলু, ছোড়দি আমাকে চেনে, তত লোকটা ক্ষেপে যায়। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। যত বলছি, গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে আমার পয়সা হারিয়েছে, তত লোকটা রেগে যায়। এত রাগ থাকলে মানুষ যায় কোথা?

সিঁড়ি ধরে উঠতেই বিশাল বারান্দা, একদিকে চিক ফেলা। নানারকম পাথরের কাজ করা মেঝে। আমার কেন জানি বিশ্বাস—ছোড়দি আমাকে আর তাড়া করবে না। ভাল জামাকাপড় পরলে মানুষের অন্য রকম চেহারা হয়ে যায়। ভিতর থেকে কেউ ছুটে আসছে—কে ঢুকে ছিল রে বাগানে?

—এই ছোঁড়াটা মা।

ছোড়দির মা! এত সুন্দর। কেমন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। দূর থেকে দেখেছি। ছবির মতো

দেখতে পৃথিবীতে মানুষ জন্মায়, ছোড়দির মাকে দেখে প্রথম সেটা বিশ্বাস হল। আর কি জানি, জানি না, আমার পোশাক-আশাক দেখে ছোড়দির মা যেন কিছুটা বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়ে গেছে—তুমি খোকা বাগানে?

—পয়সা পড়েছে।

—পয়সা!

—ছোড়দি জানে।

—ওর তো জ্বর। দাঁড়াও দেখছি। কিসের পয়সা? বলে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন। কুকুরটা বারান্দায় এখন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। লোকটা আমাকে ছোড়দির মার হেপাজতে রেখে কোথায় হাওয়া। ছোড়দির মা বুঝতেই পারছে না আমিই সেই বাঙ্গাল।

কী বলি! কারণ গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে পয়সা ক'টা বাগানে পড়তে পারে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে একটাই ইচ্ছে আমার—যা হয় হোক্, ছোড়দি আমাকে দেখুক। ভাল জামাপ্যান্ট পরলে আমিও যে কম যাই না, এবং এতক্ষণে মনে হল, পয়সা খোঁজার অজুহাতে এ বাড়িটার মধ্যে আমি ঢুকতে চাইছি। কিন্তু ছোড়দির জ্বর—কেন জ্বর হল, বড় চঞ্চল ছোড়দি—তার যদি জ্বর হয় কি হবে? ছোড়দির মা আমাকে চুপচাপ দেখে হঠাৎ বললেন—কে আছিস রে? রুমকিকে পাঠিয়ে দে তো।

ছোড়দি পুরু হাতা জামা, লম্বা পাজামা পরে অনেক দূর থেকে যেন হেঁটে আসছে। গায়ে নরম উলের চাদর। আর আশ্চর্য উষ্ণ এক ঘ্রাণ সঙ্গে বয়ে আনছে। কাছে আসতেই কেমন চমকে উঠল ছোড়দি—আমাকে দেখে! বিশ্বাস হল না, সেই বাঙ্গালটা। কাছে এসে বলল—তুই? বলে বেশ নরম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—ছোড়দি?

ছোড়দি কেমন চকিত চোখে ফের তাকাল।

—পয়সা হারিয়েছি।

—কোথায়?

—তোমার বাগানে!

—কখন?

—সেই যে গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে। খুঁজে দেখব?

ছোড়দির মা ভিতরে ঢুকে গেছেন। ছোড়দি কি খুঁজল যেন, তারপর বলল—আয়। ভিতরে আয় না।

আমার ভারি সংকোচ হচ্ছিল। বাবার জমিদারের প্রাসাদ আমি দেখেছি, কিন্তু এত ছিমছাম নয়। সব কিছু সাজানো, এতটুকু ধুলোবালি কোথাও নেই। মেঝেতে আমার প্রতিবিম্ব ভাসছে। হলুদ নীল রঙের দেয়াল, লতাপাতা আঁকা পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—বোস, আসছি। তারপর মা মা করে ডাকতে থাকল।

মা এলে বলল—এই সেই বাঙ্গাল মা, রহমানের কাছে থাকে।

ছোড়দির মা কি ভেবে বললেন—বাঙ্গাল বলে কী মানুষ না? আমার দিদিমা তো শুনেছি বাঙ্গাল ছিল। জানিস, বাঙ্গালরা দেখতে খুব সুন্দর হয়। দিদিমার মায়ের কি রঙ ছিল। আমি আর তার কী পেয়েছি?

ছোড়দির সান্নিধ্য আমাকে ভারি আপ্লুত করছিল। ছোড়দি আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসিয়েছে। কত সব জিনিস! একটা বাক্সে কি ঢাকা দেওয়া—কিছুই চিনি না। টেবিল চেয়ার বই আলমারি, সব কিছুতেই আমার কৌতূহল—এটা কি ছোড়দি?

ছোড়দি বলল—রেকর্ড প্লেয়ার।

—কি হয়

—গান। শুনবি?

—দেখব।

—দ্যাখ না।

—কত বই, না ছোড়দি? এত বই তুমি পড়েছ!

—এগুলো তো সব গল্পের বই রে।

—কখন পড়তে হয়? স্কুলে পড়লে এ সব পড়া বারণ নয়?

—বারণ হবে কেন?

ছোড়দি ছোট্ট সবুজ সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়ল।

এত বই ছোড়দিকে তার বাবা কিনে দিয়েছে। বললাম—এ ঘরের সব কিছু তোমার?

— সব।

পৃথিবীতে ছোড়দি এত সব শৌখিন জিনিস নিয়ে বড় হচ্ছে। ছোড়দির বর কি রকম হলে মানায়, আমার ধারণায় আসছিল না। বললাম—ছোড়দি, যাবে?

—কোথায়?

—পয়সা ক'টা খুঁজে দেখব। পয়সা নাকি হারাতে নেই!

—কি হয় হারালে? তুই কি বোকা রে! তোর কথাবার্তা শুনলে হাসি পায়! কবে পয়সা পড়েছে, এতদিনে মনে পড়ল।

—পয়সা হারালে নাকি মানুষের ইজ্জত যায়।

—ধুস। আমার তো কিছু ঠিক থাকে না। মা কত বকে।

তখনই মনে হল, ছোড়দির সঙ্গে এক ঘরে বসে এতক্ষণ কথা বলা উচিত হচ্ছে কি না। লাই দিলে ঘাড়ে চড়ে—এমনও তো ভাবতে পারে। বিচারবুদ্ধি সজাগ রাখা ভাল। বললাম—ছোড়দি, আমি বরং উঠি। তোমার জ্বর—

—বোস না। বিকেলের জলখাবার হচ্ছে।

বিকেলের জলখাবার বিষয়টি আমার মাথায় ঠিক আসছে না। লোকে সকালে জলখাবার খায়। দুপুরে পেট ভরে, রাতে পেট ভরে খেতে হয়। আমরা ভাই-বোনেরা দেশের বাড়িতে থাকতে তিন-বেলাই পেট ভরে ভাত খেতাম। জলখাবার খেত বড়রা। তাও সকালে।

বললাম, বিকেল কে আবার জলখাবার খায়? যেন বড়ই অনাসৃষ্টি কারবার। বড়ই নিয়ম-বহির্ভূত কাজ।

আর তখনই দেখি গরম লুচি ভাজা দু'প্লেট, বেগুন ভাজা, এক গ্লাস করে জল। মীনা করা গ্লাসগুলি সাজিয়ে রাখা হল। ছোড়দির সঙ্গে আর কেউ খাবে। এ সময় আমার থাকা ঠিক না। হ্যাংলা ভাবতে পারে! ছোড়দি জলখাবার খেয়ে হয়ত বাগানে যাবে! এজন্য বসতে বলেছে। কাজেই খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, ছোড়দি, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি খেয়ে এস।

—তোরটা কে খাবে?

এতটা আমার সাহস নেই, অথবা ভাবতে পারি, কেউ আমার জন্য গরম লুচি ভেজে বসে থাকতে পারে? প্রথমে ভুল শুনতে পারি, এমন মনে হল। আমার এখন কিছুতে বিশ্বাস নেই। আশা করেছিলাম ছোড়দি পোশাক দেখে বলবে, ভারি মানিয়েছে তোকে। কিছুই বলে নি। যেন আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, আজ তাই পরে এসেছি। এতদিন শুধু আমার নাটক গেছে।

লুচির প্লেটটা থেকে ভারি সুঘ্রাণ আসছে। পাশে দুটো মিষ্টি। কোনরকমে সামলে বললাম, আমাকে খেতে বলছ?

—তবে কাকে?

—না। মানে ভুল হচ্ছে না তো?

ছোড়দি এবারও ভাবল, ঠাট্টা করছি। উঠে এসে বলল—মারব এক থাপ্পড়। খা তো।

এ সব বিষয়ে প্রথমে নানা সংশয় দেখা দেয়। প্রথম কথা, আমি কে? আমাদের বাড়িতে ছোড়দির মত বয়েস হলে বিয়ের কথা ওঠে। আমার এবং ছোড়দির বয়সটা বোঝাবুঝির মাঝখানটায়। কিছুটা এগিয়ে এসেছি। সবটা হয় নি। কি এক রহস্য, ঠিক বুঝতে পারি না, তবু টানে। প্রকৃতি আমাদের

সামনে জাদুকরের গালিচা পেতে রেখেছে। শুধু আজীবন তা হেঁটে পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ছোড়দি-কে বললাম, তুমি সাইকেল চড় কেন? যেন এই যে খাওয়া, এখনই যথার্থ সময় সব ঝাল মিটিয়ে নেবার।

—ছোড়দি বলল, তুই মেট্রিক পাস করেছিস?

—সব বিষয়ে পাস করেছি। শুধু পাস নয়, সব বিষয়ে পাস।

—তবে এত বোকা বোকা কথা বলিস কেন?

—ছোড়দি ভয়ে। ট্রেনে চড়ে যাচ্ছিলাম সব বিষয়ে পাস না করা একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে। বাপস, এত ঝামেলা কে জানে?

সব শুনে ছোড়দি হা হা করে হেসে উঠল। যত বলি হাসছ কেন, হাসার কি হল, তত ছোড়দি হাসতে হাসতে সোফায় লুটিয়ে পড়ছে। যত বলছি, আমার কি দোষ বল, আমাকে তো তিনিই একটা পছন্দমত কাজ দিতে পারেন। পড়তেও পারি, বাবা মাকেও খাওয়াতে পারি, কে না চায়?

ছোড়দির হাসি থামছে না। আর মাঝে মাঝে ডাকছে—মা, শীগগির এস। বিলু কী কাণ্ড করেছে শোন। মা-মা—

তিনি এলে, ছোড়দি আবার হাসতে থাকল—মা বিলুটা না, বিলুটা কোথায় গিয়েছিল জান? মা, ও না প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। হাসছে আর বলে যাচ্ছে। শুনে দেখি তিনিও হাসছেন—তুই কী রে? তুই দেখছি সত্যি বাঙ্গাল। এবং আমার এমন পরিচয় পেয়ে তাঁরা কিছুটা বোধহয় আমার মধ্যে একজন সরল সহজ মানুষকে খুঁজে পেয়ে গেল। এই নিয়ে রহমানদা থেকে জজ মানুষটিও বেশ আমাকে নিয়ে মজা করল। এতে কি মজা আছে, আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। মানুষই তো মানুষের কাছে যায়। আর সে মানুষ যদি বড় হয়, তবে তার কাছে তো অনেকে যাবেই। দেশটা যে চালায়, মানুষগুলির ভাবনাও তো তার। এটা এমন কি হাসির কাজ হল ভেবে পাচ্ছি না। কেমন বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু।

ছোড়দি বলল—নে, খা। খেতে খেতে পাঁড়েজীর কথা উঠল। দশ আনা মিল ঠিক হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শর্তের কথাগুলোও ছোড়দিকে বললাম। তা ছাড়া দুপুরে মিল পর্যন্ত দেয় নি—লোকটা কি কুনজুস। ছোড়দি বোধহয় হেসে ফেলবে। না, আর বলা ঠিক না। সারাদিন না খেয়ে ছিলাম শুনলে আরও মজা পাবে। হঠাৎ দেখি তখন ছোড়দি ভারি গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল, তুই না খেয়েছিলি?

—তুমি আবার হেসে ফেলবে না তো?

—যা বলছি, উত্তর দে।

পুলিসের ভয়টা একবার উঁকি দিয়ে গেল। কুকুরটা কোথায় দেখছি।

—কি, না খেয়েছিলি?

—হ্যাঁ ছোড়দি।

—খাস নি, বলিস নি কেন?

—তুমি যে বললে পুলিসে দেবে?

—কবে বললাম?

—বা রে। মনে নেই? আমাকে ধরে নিয়ে আসার সময়।

ছোড়দি আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল। ভয় লাগছে। এত সুন্দর ব্যবহার ছোড়দির মার, ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, সন্দেশ, সব তবে যাবে। বললাম—খেয়েছি। দুটো গোলাপজাম খেয়েছি। তোমাকে সত্যি কথা বলাই ভাল। গোবিন্দদার কাছ থেকে পালাবার সময় কুড়িটা টাকা নিয়েছি। বলে নিই নি। বাবা তো বলেন, না বলে কিছু নিলে অপহরণ করা হয়। আমি সেজন্য লিখে রেখে এসেছি। টাকা মান যশ হলে সব ফেরত। ছোড়দি, আর যাই কর, পুলিসে দিও না। পিলু বাবা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন।

ছোড়দি কিছু বলছে না। তাকিয়েই আছে। চোখ দুটো ছোড়দির চকচক করছে কেন? কেমন জলে ভার। ছোড়দির এটা কি হচ্ছে? ছোড়দির চোখে জল—এই ছোড়দি, ছোড়দি, ঠিক আছে, আর বলব না।

ছোড়দি কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল। সমবয়সী যদি কেউ এভাবে চোখের জল ফেলে, আমার বড় খারাপ লাগে। ধুস, না বললেই হত। কেন যে বলতে গেলাম? ছোড়দি ফিরে এল কেমন অন্য এক ছোড়দি হয়ে। বলল—বিলু চল, তোমার পয়সা ক'টা খুঁজে পাই কিনা দেখি। ছোড়দি তার কুকুরের চেনটা এবার আমার হাতে দিয়ে বলল—শক্ত করে ধরে রাখ। তুমি যা মানুষ, যে কেউ তোমার হাত থেকে পালাতে পারে।

সেই থেকে ছোড়দি কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেল। সারাটা বিকেল গাছের নিচে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে শুকনো ডাল পাতার ভেতর পয়সা ক'টা খুঁজল। আমার কাছে পয়সা ক'টা কত দামী, ছোড়দির খোঁজা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। কিছুই পাওয়া গেল না।

বাড়ি থেকে এক সময় ছোড়দির মাও হাজির। বললেন—পেলি?

ছোড়দি কিছু বলল না।

যেন বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে ছোড়দি। পয়সা ক'টা খুঁজে পেতেই হবে। আমি বললাম—যাক গে। রহমানদাকে বলব, খুঁজে পাই নি।

ছোড়দির মা বললেন—আমার সঙ্গে এস। দশ আনা দিয়ে দিচ্ছি। রহমানকে দিয়ে দিও।

আমি বললাম—সেই ভাল।

ছোড়দি কিন্তু আমার সঙ্গে গেল না। ছোড়দির মা পয়সা ক'টা দিয়ে চলে গেলে, ছোড়দি সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন অপমানে থমথম করছে চোখ। ছোড়দিকে নিয়ে সত্যি পারা গেল না। জ্বর নিয়ে খোঁজাখুঁজি, তার চেয়ে এই ভাল—রহমানদাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে—তা না, কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে। বলছে, কেন নিলে বিলু?

—কী হয়েছে? উনি তো ভালবেসে দিয়েছেন।

—দাও, পয়সা ক'টা দাও।

—তুমি নিয়ে নেবে?

—হ্যাঁ। আমাদের পয়সা ভিক্ষা নেবে কেন? লজ্জা করে না! বলে প্রায় কেড়েই পয়সা ক'টা হাত থেকে নিয়ে নিল। যাবার সময় ক্ষোভে দুঃখে বলে গেল, দ্যাখনা আজই রহমানকে বলে দেব, তোমার বাবাকে যেন চিঠি লিখে দেয়। তিনি যেন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। তারপর ছোড়দি যেমন গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আজও তেমনি হারিয়ে গেল।

খাটিয়ায় ফিরে কেমন হতাশায় ভেঙে পড়লাম। ছোড়দিকে কিছুতেই খুশি করা যাচ্ছে না। এই রোদ, এই বৃষ্টি। এমন দুরন্ত পৃথিবী নিয়ে কে আর কত দূর যেতে পারে? কী যে অপরাধ আমার বুঝি না!

কিছু ভাল লাগছিল না। ক্রমে রাত বাড়ছে। চারপাশে আলো। গুরুদোয়ারাতে ভজন হচ্ছে। তেমনি নীল আকাশ, নক্ষত্র সব ফুটে আছে। সেই নক্ষত্র থেকে বার বার সংকেত ভেসে আসছে। বিলু, আমি তোমার জন্য বড় হচ্ছি। গ্রাম মাঠ শস্যক্ষেত্র আমার দু'হাতের মুদ্রায় নাচানাচি করে। ফুল ফোটে। শস্য জন্মায়। নদীর পাড়ে আমরা হেঁটে যাই। কোন দূরবর্তী উপত্যকায় আমি ছুটি। তুমি আছ বলেই আমি আছি। আমি ছুটি, আমি বাঁচি।

ছোড়দিকে একদিন বলেই ফেললাম, আমার টাকা না হলে চলছে না, কিছু টাকা জমলেই চলে যাব। কলেজে ভর্তি হব। প্লিজ বাবাকে তোমরা চিঠি লিখতে যেও না।

ছোড়দির চোখে জল। ছোড়দি বাবাকে আসতে লিখতে পারে, নাও লিখতে পারে—কিন্তু আমার যে সংকেত আসছে দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে—বড় হও, বড় হও। আমি কাকে নিয়ে বড় হব? সে আমার কে? কি সংকেত তার আমার জন্য? কেন চোখে জল? কে যেন আশ্চর্য ইশারায় বলে গেল, বিলু, তোমার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ভালবাসা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। তার টানে তুমি ভেসে পড়েছ। সে তোমাকে ঠিক কোথাও পৌঁছে দেবে। কোন গভীর অরণ্যে অথবা ফুলের উপত্যকায়।

এভাবে অনাবৃত আকাশের নীচে আমি আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখছি, ছোড়দি আমার শিয়রে চুপচাপ বসে আছে।

আমি বাড়ি ফিরে আসায় পিলু ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। পিলুর সব ছিল, গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, বনজঙ্গল, খোঁড়া গরু—সব। কেবল দাদা নেই। দাদা ফেরার। সে নিজে কত জায়গায় দাদাকে খুঁজতে গেছে। নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে বলেছে, দাদা আমার কোথায় চলে গেছে! রেলগাড়ি চড়ে দাদা চলে গেছে। রেলগাড়ি কতদূর যায়! সকাল বিকেল সে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকত, দাদাটা যদি ফেরে। বাবা বলতেন, মতিচ্ছন্ন। মতিচ্ছন্ন না হলে এমন হয় না।

বাবার সম্বল ছিল তখন গ্রহগুরু। সকাল হলেই গ্রহগুরুর দরজায় হাজির হয়ে ডাকতেন, ও সুবল, কিছু টের পেলে?

গ্রহগুরু বলত, ভালই আছে কর্তা। ভাববেন না। সব গ্রহের ফের। ফিরে আসবে।

বাবা বলতেন, এমন একটা ভাল কাজ মানু ঠিক করে দিল, ক'জনের হয়! মানুর বন্ধু এই করে বাড়ি গাড়ি সব করেছে। তোর যে হত না কে বলবে! তুই একটু ধৈর্য ধরে কাজটা শিখতে পারলি না। চিরকুটে লিখে রেখে গেছে,—আমি যাচ্ছি, ভাববেন না। বড় হয়ে ফিরব।

বাড়ি ফেরার আমার খুব একটা মুখ ছিল না। কত দিন বাড়ি ছাড়া—মা নাকি একদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আর বাবাকে দোষারোপ করছিল। আমি যা ছিলাম তাই আছি। বড় হয়ে ফিরব এই চিরকুটটি বাবা পুঁটলিতে ঠিক যত্ন করে বোধহয় রেখে দিয়েছেন। আসলে আমার মুখ নেই। বাবাই খবর পেয়ে আমাকে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার বড় হওয়াটা কী, বাড়ি ফিরে নিজেও বুঝতে পারছিলাম না।

দু-তিনদিন পিলু আমার সঙ্গ ছাড়ল না। আমি যেখানে পিলু সেখানে। কী জানি, আবার যদি দাদা ফেরার হয়! দাদাটি তার বড় হয়ে কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার জন্য টান নেই। ভাই-বোনের জন্য ভাবে না। মায়া তো বাড়ি ফিরে এলে রাস্তায় দৌড়ে গিয়েছিল। তারপর জড়িয়ে ধরে ভ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল। —দাদা তোর সঙ্গে আর আমরা কথা বলব না। কোনদিন কথা বলব না। তারপর দৌড়। —মা, বাবা দাদাকে ধরে এনেছে। প্রায় চোরের মতো দেখছি সব। পলাতককে দেখার জন্য কলোনির ধীরেনের মা, গোপালের পিসি, সুবোধ, পল্টু যেখানে যে ছিল ছুটে এসেছিল। —কোথা থেকে ধরে আনলেন? কত রকমের প্রশ্ন। তখন পিলুই আমার ত্রাণকর্তা। সে ডাকল, দাদা, এদিকে আয়। বলে সে আমাকে বাড়ির পেছনটাতে নিয়ে গেল। —খোঁড়া গরুটার বাচ্চা হয়েছে—আয়, দেখবি।

বাড়ি থেকে ফেরার হবার পর কী ঘটেছিল পিলুই সব এক এক করে বলল। দু-তিনদিন শুধু এই। একটা কথা মনে হয় আর বলে,—বুঝলি দাদা, সেই লোকটা রে—গোবিন্দ না কী নাম, সকালে মানুকাকার কাছে হাজির। বলল, মানুকর্তা, আপনার ভাইপো কুড়ি টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

—বলল!

—কী মিছে কথা, বল। তুই কখনও চুরি করতে পারিস? আমি বড় হলে লোকটার মুখ ঘুষি মেরে ভেঙে দেব। কী সাহস, আমার দাদার নামে মিছে কথা! আমি বললাম, না, মিছে কথা বলেনি রে! গোবিন্দর কৌটো থেকে কুড়ি টাকা নিয়েছি।

—সত্যি নিয়েছিস?

—তা না হলে ট্রেনে চড়ে যাব কী করে!

পিলু কেমন গুম মেরে গেল। এতদিন যে বিশ্বাস দাদার উপর ছিল তা যেন নিমেষে উবে গেল। খুব কষ্ট হচ্ছে পিলুর। সান্ত্বনার স্বরে বললাম, গোবিন্দদার কৌটোয় আর একটা চিরকুটে লিখে গেছি।

—কী লিখে গেছিস?

—টাকা মান যশ হলে সব দিয়ে দেব।

পিলুর পায়ে বোধহয় একটা পিঁপড়ে কামড়ে ছিল, সেটা সে ঝেড়ে ফেলে বলল, মানুকাকাকে তো বলেনি সে-কথা। জানিস দাদা, তুই কাউকে বলিস না, একদিন বিকেলে আমি না গেছিলু রেললাইন পার হয়ে গেছি। লোকটাকে আমি চিনে রেখেছি। বড় হই, তারপর মজা দেখাব।

পিলু কি জানে, গোবিন্দ আমাকে মারধোর করত? বাবার কত বড় বাসনা ছিল, আমি একজন

মোটর মেকানিক হই। একটা গ্যারেজে মানুকাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কমপারমেনটাল পরীক্ষায় পাস করলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নাকি মিলবে না। বাবাকে মানুকাকা এমন বোঝাবার পরই গ্যারেজের কাজটা বাবার কাছে হাতে-পাওয়া স্বর্গ ছিল। সেসব ছেড়ে ফেরার হওয়ায় বাবা নাকি খুব মনোকষ্টে ভুগছিলেন।

—মা, জানিস, খুব ক্ষেপে যেত। একেবারে রণচণ্ডী। কি মানুষ রে বাবা, ছেলেটা কোথায় ফেরার হল কোনো খোঁজখবর করছে না কেউ!

বাবা বলতেন, গেছে যখন ফিরে আসবে। কার জন্য তবে গাছপালা লাগিয়েছি, বাড়িঘর করেছি। ছেলে বোঝে না—কার জন্য!

—আর ফিরেছে!—বলেই মা'র কান্না।

—আরে ফিরবে। দেখো না দু-চারদিন! না খেতে পেলেই সুড়সুড় করে ফিরে আসবে।

—তুমি আমাকে জ্বালিও না।

সেই বাবা নাকি তিন-চারদিন পর নিজেই সকালে উঠে গ্রহগুরুর কাছে গেছিলেন। এ-দেশে আসার পর বাবার অনেক নতুন বিষয়ের উপর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। যেমন তাঁর গ্রহগুরু। তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। গ্রহগুরুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে মাকে জানালেন, খুব বেশি দূরে যায়নি। কাছে পিঠে কোথাও আছে। মতিচ্ছন্নভাব কাটলেই চলে আসবে। ওটা এ বয়সে হয়। একটু গৃহহারা হবার শখ জাগে। তারপর নাকানিচুবানি—সংসার নিত্য হাঁ-করা জিভ, সব গিলে খেতে চায়। যখন বুঝতে পারবে সুড়সুড় করে বাছাধন ফিরে আসবে। তারপরই বাবা গাছের সবচেয়ে পুষ্ট আতা, পেঁপে এবং একথালা চাল ডাল গ্রহগুরুর সেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার বিশ্বাস, গ্রহগুরু সন্তুষ্ট থাকলে সংসারে কোনো অমঙ্গল ঢুকতে পারে না। তাঁর পুত্র যেখানেই অবস্থান করুক কোনো অমঙ্গলের ভয় নেই।

মা আমার জেদি এবং একরোখা। দেশ ছেড়ে আসার পর ওটা আরও বেড়েছে। বাবার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কম। সবকিছুতে অদৃষ্টবাদী যে মানুষ তাঁকে মা বিশ্বাস করেন কী করে! সেই বাবার ছেলে আমি। বাপের স্বভাব ছেলে পাবে, মার এটা জানাই ছিল। বাবার অবিচল গ্রহভক্তিতে মা'র মেজাজ নাকি খুবই তিরিক্ষি ছিল। কথায় কথায় কান্না জুড়ে দিত। রাতে ঘুমাত না। গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও উঠে বসত। পিলু জানাল, বাবা ঘুমালে মা আর সহ্য করতে পারত না। যার ছেলে নিখোঁজ সে এভাবে নিদ্রা যেতে পারে! —তুমি কি মানুষ না! দেখ পিলু, কে বলবে তোর দাদা বাড়ি নেই। কে বলবে দেখে, আমাদের সময় খারাপ। কেমন নিশ্চিন্তে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। চেঁচামেচিতে রাতে বাবার ঘুম ভেঙে গেলে বলতেন, ঘুমাও ধনবৌ। মন শান্ত কর। শরীর নষ্ট করে লাভ নেই। তেনার ইচ্ছের উপর আমাদের হাত নেই। শুধু লড়ালড়ি সার। বলে বাবা আবার শুয়ে পড়তেন এবং কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রায় মগ্ন হতেন। বাবার নিস্পৃহতা যখন চরম বোধ হত, মা আহার বন্ধ করে দিতেন। এটাই ছিল বাবার প্রতি মার মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগের বিধি। বাবা খুব বিড়ম্বনাবোধ করতেন। খোঁজাখুঁজি শুরু হতো। মানুকাকার কাছে ছোটাছুটি, গ্যারেজে ছোটাছুটি, চিরকুটটি আমার হস্তাক্ষরে লিখিত কিনা, না গুমখুন, এসব নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা দেখা দিলে, ঠাকুরঘরে ঢুকে যেতেন। যখন একান্ত অসহায় তখন দেশ থেকে আনা শালগ্রামশিলা ভরসা। পুজোর ঘরে বসে রোজ একশ একটা তুলসীপাতা শালগ্রামশিলার মাথায়। মা'র তাতেও ভরসা কম। বিপদনাশিনী ব্রত প্রতি বৃহস্পতিবার শুরু করে দিল। এই করতে করতে বাবার কাছে এক চিঠি হাজির।—আপনাদের বিলু রহমানের কাছে আছে। ঠিকানা সমেত চিঠি পেতেই বাবা দুর্গানাম সম্বল করে সোজা সেই শহরে।

ফিরে আসার পর পিলু কলোনির সর্বত্র খবর দিয়ে এসেছে, দাদা ফিরেছে।

দাদা আমার কত বড় হবে, দেখিস। একা একা বর্ধমান পার হয়ে চলে গেছে। দাদা এম এ বি এ পাস করবে। আমার বাবাটা না দাদাকে ড্রাইভার বানাতে চায়। আচ্ছা, বাবা যে কী না! মানুকাকা যে কী না! এক বিষয়ে ফেল করলে কী হয়? বাবা তো বলেছে, কিছু হয় না। সেই বাবাটাই মানুকাকার বুদ্ধিতে দাদাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিল। আমরা গরিব বলে মানসম্ভ্রম নেই! দেশবাড়িতে থাকলে মানুকাকা এমন বলতে সাহস পেত! দাদা চলে গিয়ে বেশ করেছে। এখন বোঝো!

এক বিকেলে আমরা সবাই বারান্দায় বসেছিলাম। অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। ব্যাঙ ডাকছে। মাঠঘাট জলে ভেসে গেছে। অঘ্রাণের মাঝামাঝি খুব বর্ষা হলে যা হয়! এখানে আসার পর এবারেই প্রথম বাবার লাগানো গাছে কাঁঠাল ধরেছে। আম গাছগুলিতে মুকুল দেখে গিয়েছিলাম। কিছু আমও হয়েছে। বাড়ি ফিরে আসব আসব করে মা কটা আম রেখেছিল, কিন্তু শেষে পচে যায় দেখে আমার জন্য আমসত্ত্ব বানিয়ে রেখেছে। আঝোরে বর্ষণ হলে আমার খুব ভালো লাগে। সব গাছপালা বাড়ির চারপাশে সজীব। মা রান্নাঘরে কাঁঠাল বীচি ভাজছে। গরম গরম কাঁঠাল বীচি ভাজা অঝোর বর্ষণের দৃশ্য দেখতে দেখতে খাওয়ার কী যে মজা! পিলু খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে আসছে। দু'জনেই ভিজে গেছে। দূর থেকেই বললে, দাদা, কী খাচ্ছিস রে!

বললাম, কাঁঠাল বীচি ভাজা।

—মা, আমি খাব।

মা বলল, কটা তো ছিল। সব তো সাবাড় করেছিস। মা যে গোপনে কাঁঠাল বীচি ও আমসত্ত্ব আমার জন্য তুলে রেখে দিয়েছে, পিলু জানত না। পিলু অন্য সময় হলে মার-দাঙ্গা শুরু করে দিত, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি এই পুণ্যফলে সে কিছু আর বলল না! বারান্দায় উঠে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে পিলু বলল, দাদা, আমাকে একটা দিবি?

আমি বললাম, সবার জন্যই করেছে!

মায়া কোঁচড় থেকে তুলে বলল, নে না।

পিলু কিন্তু নিল না।

আমি বললাম, নে, আমার কাছ থেকে।

পিলু বলল, না, খা। আমাকে মা দেবে।

মা বলল, খুব যে ভালো ছেলে রে! সইবে তো! বলেই মা একটা বাটিতে বীচি ভাজা এনে পিলুকে দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কী গো, খাবে? খাও না দুটো! বিলুর জন্য তুলে রেখেছিলাম।

আমাদের বারান্দাটা টালির। বেশ লম্বা বারান্দা। আগে খুব ছোট ছিল। পা ছড়িয়ে বসা যেত না। বাবার কাছে শুভাশুভ জানতে সব যজমানরা আসে। তাদের বসার জন্যই বারান্দাটা করা হয়েছে। এবং বড় বলে, আমাদের পোষা কুকুরটাও ভিজতে ভিজতে উঠে এল। ছোট ভাইটা হাঁটতে শুরু করেছে। ঝড়বৃষ্টিতে বড় ভয় পায়। মেঘ ডাকলে ভয় পায়। সে বাবার কোলে ভালো মানুষটি হয়ে বসে আছে। আমাদের সংসারে এই আমরা ক'জন। সামনের জমিতে বাবা কিছুটা জায়গায় পাট লাগিয়েছিলেন। সেগুলো কবেই কাটা হয়ে গেছে। নারকেল গাছের মাথায় বসে একটা কাক ভিজছিল। ছাতা মাথায় রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। পরে খালের মতো একটা সরু ফালি বাদশাহী সড়কের দিকে গেছে। জল উপচে পড়লে কই, শিঙি, মাগুর, বড় পুঁটি, ট্যাংরা বৃষ্টির জলে ভেসে আসবে। বৃষ্টিটা আরো হোক, আরও জোরে, মেঘের দিকে তাকিয়ে পিলু এমনই বোধ হয় ভাবছে। লেখাপড়া করা ছাড়া পিলুর সব কাজেই ভারি উৎসাহ। কত খবর সে রাখে। কোন মাছ কখন ডিম পাড়ে, কোন মাছ বর্ষা হলে রঙবেরঙের হয়ে যায় সে ছাড়া এ খবর আমাদের আর কেউ রাখে না। সেই পিলু বীচি ভাজা খেতে খেতে বলল, দাদা, যাবি? মাছ উঠবে!

মা বলল, সেবারের কথা মনে নেই? তোমাদের আক্কেল বড় কম।

—কী হয়েছে! পিলু তেতে উঠল।

বাবা খুব উদাস গলায় বললেন, ধনবৌ, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

মা খুব তপ্ত হয়ে উঠল—হয়েছে ধর্মের কথা আর শুনিও না। ঐ করে তো গেলে!

কী যে গেল বাবা বুঝল না। কপর্দকশূন্য মানুষের এখন যা হোক বাড়িঘর হয়েছে, ছেলেপুলে বড় হচ্ছে, বিলুটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, মানুকেও খবর দেওয়া হয়েছে, শ্রীমান ফিরে এসেছেন। নিয়ে আসা হল, এখন কিছু একটা করতে হয়। শ্রীমানের বড় ইচ্ছা কলেজে পড়ে। এই পড়া নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধবে বোঝাই যাচ্ছিল। মানুকাকার জবাব, পড়াবেন কী করে! খাওয়াতে পারেন না, ছেলেরা বোঝে না? এখন সংসারে কী করে দুটো পয়সা আসবে না দেখলে চলবে কেন? বাবার কাছে মানুকাকার কথাই শেষ কথা। কিন্তু এবারে মানুকাকার পরামর্শমতো কাজ করবেন কিনা, সেই

নিয়ে তাঁর কিছু বোধ হয় সংশয় জন্মেছে। মানু তো বলেই খালাস, হয়তো চেনাজানা কোনো কাপড়ের দোকানে লাগিয়ে দেবে। সে তো জানে না তার ধনবৌদিটি কী বস্তু!

আমি বাড়ি ফেরার পরই মা বাবাকে শাসিয়ে রেখেছিল, ছেলে যা চায় তাই কর। পড়তে চায়। ভর্তি হবার টাকা ছেলে তোমার রোজগার করে এনেছে। বাধা দিলে অনর্থ ঘটবে।

তা সত্যি, রহমানদা ফেরার সময় বাবাকে বলেছে, এই নিন, কটা টাকা দিলাম। বাবা এখানে আসার পর একসঙ্গে এত টাকা কখনও হাতে পাননি। শিষ্যরা পাঁচ দশ টাকা বেশি হলে দেয়। ঠাকুরের নাম করে পাঠায়। কলোনিতে নিত্যপূজা আছে নিবারণ দাসের ঘরে। কিছু জমি এবং যজমান এই ভরসা বাবার। পড়াবার জন্য বাড়তি টাকা হাতে কমই আসে। বাবার সাহসে কুলোচ্ছিল না। কিন্তু মা এবং পিলু ও মায়া চায় তাদের দাদা কলেজে পড়ুক। এতে সংসারের ইজ্জত বাড়ে, বাবাটা কেন যে বোঝে না! মা তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, ছেলে আমার কলেজে পড়বে। বাবা বুঝতে পারেন, মানুষের বাড়ি-ঘর হয়ে যাবার পর একটা নীল লণ্ঠনের দরকার। সেটা ধনবৌ এখন জ্বালতে চায়। সলতে পাকানো আছে। শুধু জ্বেলে দেওয়া বাকি।

বাবা বললেন, মানুকে বলে দেখি, দু-একটা টিউশন ঠিক করে দিতে পারে কিনা।

অনেকদিন পর আবার মনে হলো, মানুষটার বিষয়-আশয়ে ভক্তি বেড়েছে। সুবুদ্ধি গজিয়েছে মাথায়।

প্রবল বর্ষণে বাবার কথা শোনা যাচ্ছিল না। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। গরুটা ডাকছে। আমাদের কাঁঠাল বীচি খাওয়া শেষ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মা ঘরে ঢুকে হারিকেন জ্বালাল। দুদিকে দুটো বড় বাঁশের মাচান। বাবার অনেকদিন থেকে শখ একটা তক্তপোশ করাবেন। উত্তরের দিকের জমিতে বড় একটা শিশুগাছ আছে। ওটা কেটে বানালে শুধু মজুরির খরচা। আমি যদি দুটো টিউশন করি, বাড়তি পয়সা আসবে সংসারে। মারও মনঃপূত হয়েছে কথাটা। কবে যাওয়া হবে এই নিয়ে কথা হতেই বারান্দায় হারিকেন রেখে মা বলল, কালই যাও। ঠাকুরপোকে বলো, তার তো শহরে চেনাজানা মানুষজন আছে। ওকে বললে ঠিক করে দিতে পারবে।

রাতে পিলু ঘুমাচ্ছিল না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছিল। এটা হয়। রাতে আমাকে কিছু বলতে চাইলেই তার এটা হয়। কিন্তু আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ডাকলে ঘুম ভেঙে যাবে, ঘুম ভাঙলে আমার ভারি রাগ হয় সেটা সে জানে। বুঝতে পারছিলাম, আমি সাড়া না দিলে সে কিছু বলবে না। বললাম, কীরে ঘুম আসছে না।

পিলু খুব সতর্ক গলায় বলল, দাদা তুই সত্যি কলেজে পড়বি? তুই টাকা রোজগার করেছিস?

আমি যে টাকা রোজগার করে এনেছি, পিলু জানে না। রহমানদার সামান্য কাজকর্ম করেছি। ট্রাক নিয়ে কয়লা খনিতে গেছি। ওজন মিলিয়ে কয়লা চালকলে সাপ্লাই করেছি এবং রহমানদার খুব বিশ্বাসভাজন লোক হয়ে গেছিলাম, সে তা জানে না। আমার ইচ্ছে ছিল, টাকা জমলে বাড়ি ফিরে আসব। কিন্তু রহমানদা আমাকে আশ্রয় দেওয়ায় কী দেবে-থোবে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আসার সময় যে সে এতগুলি টাকা বাবাকে দেবে তাও বিশ্বাস হয়নি। টাকা কটা আসার সময় বাবার কাছেই ছিল। বাড়ি ফিরে বাবা টাকা কটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, মার হাতে দাও। প্রথম উপার্জনের টাকা মার হাতেই দিতে হয়। হাতে দেওয়ার পর মাকে প্রণাম করবে। পৃথিবীতে আজীবন তিনিই তোমার সবচেয়ে অধিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের বাড়ি থেকে শহরটা বেশি দূর নয়। ক্রোশ দুই লাগে যেতে। পুলিস ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা বাদশাহী সড়কে উঠে গেছে। বিরাট এলাকা নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প। দেশছাড়া মানুষ যারা, বনজঙ্গল কেটে ঘর বানাচ্ছে যারা, তাদের পক্ষে ক্যাম্পটা বড় কাজে লাগে। সুমার মাঠ ক্যাম্পের মধ্যে। সবুজ ঘাসপাতা—গরু-বাছুর সব ছাড়া থাকে সেখানে। ক্যাম্পের সব হাবিলদার সুবাদার থেকে সি ডি আই পিলুর অনুগত। ফলে গোটা এলাকাটাই যেন তার নিজস্ব জায়গা। অন্যের গরুবাছুর চরে বেড়াচ্ছে কে খবর রাখে। কেবল পিলু সব খবর রাখে! তাকে মাঠে দেখলে মনে হবে, সে এত বড় বিশাল ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক। ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে বাদশাহী সড়কে উঠতে আমাদের কম সময় লাগত। এমনিতে সাধারণের যাওয়া নিষিদ্ধ। পিলু আমাদের পাড়াটার পাসপোর্ট। বন্দুক উঁচিয়ে

যে যখন সেনট্রি দেয়, পিলুর নাম বললেই হল, পিলুদের পাড়ার লোক আমরা।

সেই পিলু এখন বাড়ি-ছাড়া হচ্ছে না। দাদা কলেজে পড়বে, এটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সে আরও অহংকারী হয়ে উঠল। তার দলবলের সংখ্যা বেড়েছে। সেখানে এখন তার একটাই গল্প। দাদা কীভাবে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় গেছে। কলকাতা কত বড় শহর। রেলগাড়ি চড়ে যেতে হয়। চেকার টিকিট চায়। টিকিট না থাকলে তোমাকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না। রেলগাড়ি চড়ে পিলু যখন এদেশে আসে, তখন তার সব ভালো মনে ছিল না। দাদার কাছ থেকে আবার জেনে নিচ্ছে সব। বাবার কাছে রানাঘাটের গল্প শুনেছে। দাদার কাছে কলকাতার। আর একটা শহর বর্ধমান পার হয়ে। এখন এই তিনটি শহর সম্পর্কে সে প্রায় অভিধান, এমন একটা ভাব নিয়ে আছে দলবলের কাছে। ট্রামগাড়ি দেখতে কেমন লম্বা স্কুলবাড়ির মতো। শিয়ালদা ইস্টিশনে রেলগাড়ি বিরাট একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠলে জেল।

পিলুর যে কত প্রশ্ন থাকে। পিলু যে ভাবে কথা বের করে নিচ্ছে, কখন না জানি ফস করে ছোড়দির কথা বলে দিই। সেই লম্বা ফ্রক গায় দেয়া মেয়েটা, সুন্দর মুখ, সবসময় বাড়িতে জুতো পরে থাকে। সবসময় পরীর মতো বাগানে ঘুরে বেড়াত। রহমানদাকে নাম ধরে ডাকত। একসময় ছোড়দির বাবার গাড়ি রহমানদা চালাত। একটা এত্ত বড় কুকুর ছিল ছোড়দির সঙ্গী। তেমন একটা পরীর মতো মেয়ে আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছিল। বাবা নিয়ে আসার পর আমার এখন একটাই কষ্ট। সকাল হলে আর ছোড়দিকে দেখতে পাই না। কী যে থাকে মনে। ছোড়দির কথা মনে হলেই কেমন একটা রূপকথার রাজত্ব চোখে দেখতে পাই। ছোড়দি গাড়িতে উঠছে। পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, ফ্রক, নীল বেল্ট, মাথায় নীল চুল। বিকেলে সাইকেল চালাচ্ছে বাড়ির লনে। আমাকে পিছনে নিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। ছোড়দি যা বলত, তাই করতাম। একদিন ছোড়দি সাইকেলটা হাতে দিয়ে বলল, বিলু ধর। আসছি—ছোড়দি সেই যে গেল, আর এল না। পাঁচিলের পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রহমানদা বলেছিল, কীরে, ছোড়দির সাইকেল নিয়ে কী করছিস! পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিল, ছোড়দি ভুলেই গেছে। সাইকেলটা দিয়ে আয় বাড়িতে। ছোড়দি এমন স্বভাবেরই ছিল। সে-ই বাবাকে চিঠি লিখেছিল, বিলুকে নিয়ে যান। বিলু আমাদের এখানে আছে। ছোড়দির প্রতি আমার এজন্য একটা অভিমানও আছে। কিন্তু কেন জানি পিলুকে সব কথা বললেও ছোড়দির কোনো গল্প তাকে করতে পারিনি। কোথায় যেন এই প্রথম কিছু গোপন করতে শিখে গেছি।

পুলিস ক্যাম্প পার হলেই বাদশাহী সড়ক। দু'পাশে আম জামের গাছ। কোথাও বড় বড় রেনট্রি। সোজা জেলা বোর্ডের অফিসের পাশ দিয়ে রেললাইনে উঠেছে। একটা জেলখানা, তারপর সাহেবদের কবরভূমি। শেষে সরকারি খামার ডাইনে ফেলে রাস্তাটা শহরে ঢুকে গেছে। যেতে আসতে আমার এই রাস্তাটার প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছিল। পৃথিবীতে এমন সুন্দর রাস্তা আর কোথাও বোধ হয় নেই। দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত এবং মাঝে মাঝে আকাশের প্রান্ত দিয়ে পাখিদের উড়ে যাওয়া আমাকে মুগ্ধ করত। ছোড়দির কথা মনে এলে রাস্তাটায় একা একা হেঁটে বেড়াতাম। ইঁট সুরকির তৈরি রাস্তা। বৈশাখের ঝড়ে কখনও সেই লাল ধুলো আমাদের বাড়ি পর্যন্ত উড়ে আসত। বাবা এখানটায় বাড়ি করার পর সব কিছুর সঙ্গে কী করে যেন একাত্ম হয়ে উঠছি। আমার মা, বাড়ির গাছপালা, খোঁড়া গরু, শালগ্রামশিলা, পিলুকে নিয়ে শীতকাল পর্যন্ত একরকম কাটল। বাবা একদিন শহর থেকে ফিরে এসে বললেন, হয়ে গেল।

বাবার এমনই স্বভাব। বাড়ি এসে বারান্দায় বসলেন। মায়া পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কি হয়ে গেল কিছু বলছেন না। বাড়িতে দু'জন অতিথি আছেন হপ্তাখানেক ধরে। দেশ থেকে বাবা খবর দিয়ে আনিয়েছেন। এখনও সময় আছে, চলে এসো। জমিজমা কিনে এদেশে ঘরবাড়ি করে ফেল। মা এতে মনে মনে সাংঘাতিক চটে থাকে। নিজেরই খাবার নেই, শংকরাকে ডাকে। —মার এই রকম ক্ষুরধার বাক্যে বাবা কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেও দমে যান না।

বাবার কথা, মানুষের দুঃসময় যাচ্ছে ধনবৌ—খোঁটা দিয়ে কথা বলো না। চলে তো যাচ্ছে। কোনদিন না খেয়ে আছ বল!

এসব কথাবার্তা অতিথিরা বাড়িতে না থাকলে বলতেন। এরাই নয়—বাবা যেখানেই যান, সবাইকে

বলে আসেন, আসবেন, ঘরবাড়ি কেমন করলাম দেখে যাবেন। দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই এই কথা। লোকজন, আত্মীয় কুটুম বাড়ি না এলে ঘরবাড়ি কার জন্য। বাবা নিজে খেতে ভালোবাসতেন, আত্মীয় কুটুমের বাড়ি বেড়াতে ভালোবাসতেন। খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পরই দেশের আত্মীয় কুটুম চেনাজানা লোকের কাছে চিঠি। ও-দেশে আর থাকতে পারবে না। বৃথা আশা। দেশটা আবার এক হয়ে যাবে ভেব না। থাকার তো অভাব হবে না। আমি যখন আছি।

মা'র কাছে এই 'আমি যখন আছি' খুবই বিরক্তিকর। ছেলেটাকে ' 'র পড়াবার মুরদ নেই, তার আবার এসব লেখা কেন। বাবার চিঠির বিশ্বাসেই দেশ থেকে দুই চৌধুরী এখন এখানে এসে উঠেছেন। রোজই রাজবাড়ি যেতে হচ্ছে। জমির বিলি বন্দোবস্ত দেখতে। বাবা প্রথম দু'দিন গেছিলেন সঙ্গে। উপেন আমিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। এখন ওরা নিজেরাই যায়। আমাদের বাড়ির পেছনটাতে কিছু ডোবা জঙ্গল আমবাগান আছে। তাই আপাতত কিনে রাখা। বাবা যে ভালো আছেন, সচ্ছল পরিবার বাবার, এসব বোঝানোর জন্য বেশ ভালো মাছ-টাছ বাজার থেকে আসছে। একটা আস্ত ইলিশ পর্যন্ত। যে দামই হোক বাবার যেন অর্থের কমতি নেই—ফিরে গিয়ে কেউ না বলে বাবা আমার ভারি কষ্টে আছেন।

বাবা মনে করেন সংসারের অভিভাবক হিসাবে এটা তাঁর বড়ই কৃতিত্ব। বিলুটা কলেজে পড়বে—এই খবর দিতে নিবারণ দাসের আড়তে ছাতা বগলে চলে গেছেন ক'দিন। নতুন বাজার বসেছে সেখানে চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। —কি কত্তা ছেলের খোঁজ পেলেন?

—পাব না কেন! ও তো আর বাড়ি ছাড়া হয়নি। মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে। কলেজে পড়তে চায়। যখন চাইছে পড়ুক। আমার একভাবে চলে যাবে। আসলে বাবার এতসব কথা বাড়িঘর করার মতোই। ছেলে আমার আর একটা পাস দেবে। এখানে যারা বাড়িঘর করেছে, কেউ কলেজের মুখ দেখার সুযোগ পায়নি, কেবল তার ছেলে বিলু কলেজে পড়ে। এই একটা বড় খবরে বাবা কিছুদিন মশগুল থাকলেন। যজমান বাড়ি গেলেও আমি জানি একথা সে কথায় তিনি তাঁর পুত্রের কথা টেনে আনবেন। এবং এমন যখন চলছিল তখনই সেদিন শহর থেকে ফিরে এসে বাবা বারান্দায় বসতে না বসতেই জানালেন, হয়ে গেল। হয়ে গেল কথাটার কত রকম মানে হতে পারে বাবা যদি বুঝতে পারতেন। মা কুমড়ো ফুলের বড়া করছিল, খুন্তির শব্দে ঠিক শুনতে পায়নি। কেবল বলল, কি বললে?

—হয়ে গেল।

মা এবার সবটা শোনার জন্য কড়াই নামিয়ে বারান্দায় উঠে এল। —কি হয়ে গেল!

—বিলুর পড়ার ব্যবস্থা। সামনের ছুটির পরই ভর্তি হবে। কি যেন বলল, মানু, তবে হয়ে যাবে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। সব ক্লাস ভর্তি হয়ে গেলেও মানু যখন আছে, বিলুর জন্য আটকাবে না। মা বোধ হয় বাবার সব কথা বুঝতে পারছিল না। আমাকে ডেকে আনল। কাছে গেলে বলল, তোর বাবা দেখ কি বলছে। আটকাবে না বলছে।

বাবা বলল, আগে এক গেলাস জল দাও, খাই। বাবা জলটা খেয়ে পিলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন গরুটা নেড়ে দিয়েছে কিনা, না এক খোঁটাতেই আছে। বাবা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটিকে সব সময় সংশয়ের চোখে দেখেন। সে সহজেই কাজ না করেও বলে দিতে পারে, হ্যাঁ দিয়েছি। এই তো দিয়ে এলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে দ্বিতীয় পুত্রটি একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। এতে সংসারের অনিষ্ট হলেও প্রতিবেশীরা পিলুর সুখ্যাতি করতে ছাড়ে না। সে তার বাবার কাজের প্রতি বড়ই অমনোযোগী। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখে আয় নেড়ে দিল কি না।

গরুবাছুর আমি নাড়ানাড়ি করি পিলুর পছন্দ নয়। দাদার আভিজাত্য নষ্ট হবে ভাবে। দাদা কলেজে পড়বে, সেই দাদা মাঠে গরুবাছুর টানাটানি করুক সে চায় না। সে বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল, যাচ্ছি। তোমার যে বাবা—আর কি যেন বলার ছিল বলতে পারল না। মুগুরটা কাঁধে ফেলে চলে গেল। যাবার সময় বাবা হেঁকে বললেন, শোনো, পুকুরে এখন নেমো না। যদি নামো দু'ডুব দিয়ে উঠে আসবে। যদি দেখি দেরি হচ্ছে ভালো হবে না।

এটা অবশ্য পিলুর হয়। গরমকালটায় সে পুকুর পাড়ে গেলেই কিছুক্ষণ পুকুরে সাঁতরে নেয়।

কখনও সখনও গামছায় ছেঁকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে। আর কিছু না পারুক, ঘাসপাতা পেলে তাও জড় করে নিয়ে আসবে। বাইরে গেলে ফেরার সময় তার হাতে কিছু থাকবেই। পিলু খালি হাতে বাড়ি ঢুকতে শেখে নি। মা'র তর সইছিল না। এমনই স্বভাব মানুষটার। সবটা না বলে অস্বস্তির মধ্যে রাখা। মা একটু রুখে উঠল, কি বলছিলে বিলুকে বল।

—বলছি বলছি। বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। মানু তো বলল, আই এস সি না কি বলে ওটা হবে না। এফ এ-টাও হবে না। আই কম-টা হবে। নতুন খুলেছে। কিছু সিট খালি আছে।

আমার অবস্থা যা হয়। কলেজে পড়া নিয়ে কথা। ছোড়দিও আমাকে বলে দিয়েছে, পড়াটা ছেড় না বিলু। আমি বুঝি আমাকে বড় হতে হলে পড়তে হবে। বড় হওয়ার সঙ্গে কলেজে পড়াটার এমন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে আগে যদি বুঝতাম। মাকে বুঝিয়ে বললাম, কমার্স নিয়ে পড়ব।

বাবা যা বললেন, তার মধ্যে এফ এ-টা বুঝেছে। মা'র এক মামা এফ এ পাস ছিল। স্বদেশী করত। মানুষজন তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তার মতো ছেলে হবে ভাবতেই মা'র গর্ব বোধ হত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না শুনে খুব দমে গেল। আর জেদি এক রোখা হলে যা হয়, বলল, বিলুকে এফ এ পড়তে হবে। ও সব আইকোম টোম চলবে না। ওতে কিছু হয় না।

বাবা নিরাশ গলায় বললেন, বোঝো।

—বোঝার কি আছে। সারাজীবন বুঝিয়ে তো এই হাড়মাসে এনেছ।

এ-দেশে আসার পর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মা'র শরীরটা বেশ ভেঙে গেছে। বাবা আমার কেমন অতলে ডুবে যাচ্ছিলেন। কি করে বোঝান, বিষয়টা একই। লাইন আলাদা। বাবা অগত্যা পার পাবার জন্য বললেন, মানু তো বলল, আজকাল আর এফ এ পড়ে লাভ নেই।

—রাখ তোমার মানু। উই তো ডোবাল। কে বলেছিল একটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিতে। জলে পড়ে গেছি বলে, আমরা বুঝি আর মানুষ না।

বাবা অগত্যা বললেন, তালে মানুকে বলতে হবে বিলু এফ এ পড়বে। তার ব্যবস্থা কর।

—তাই বলগে।

মা এইটুকু বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাবার অবস্থা এখন খুবই বিপজ্জনক। মানুকাকাকে চটাতে পারেন না। মাকেও না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি করবি?

তখনই আবার আমার মা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় হাজির, টিউশনির কথা কিছু বললে না?

বাবা খুব ক্ষিপ্ত। বোঝে না সোঝে না—কেবল তর্ক। বাবা বললেন, জানি না! মা আরও এক ধাপ ক্ষেপে গেল। —ঠিক আছে, নিবারণ দাসকে বলছি। সেতো মরে যায় নি।

নিবারণ দাস বাবার অবস্থাপন্ন যজমান। বাবা না থাকলে বিপদে আপদে সে আমাদের দেখে থাকে। বাবা নিবারণ দাসকে শেষ সম্বল মনে করেন। কোথাও কিছু না হলে সেতো আছেই। তাকে এ-নিয়ে জ্বালাতন করা বাবার বোধহয় পছন্দ নয়। অগত্যা বললেন, বলেছি। সব বলেছি। ঠিকও হয়েছে। কালীবাড়িতে বিলু থাকবে। ওখানকার সেবাইত নাকি একজন মাস্টার খুঁজছে। বিলুকে দিয়ে হয়ে যাবে মানু বলল। বাবার এই আশ্বাসে মানুকাকার উপর মা'র আবার আস্থা ফিরে এল। একেবারে শান্তশিষ্ট বালিকা তখন মা আমার। খুব অল্পতেই মা'র বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় আবার খুব অল্পতেই মা'র আস্থা চলে আসে। যাবার সময় শুধু বলল, তোমরা যা ভালো বোঝো কর। বিলু আবার যেন ফেরার না হয়। বড় চাপা স্বভাবের।

বুঝতে পারছিলাম মা তার পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে আমার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে বেশি ভাবছিল। মাকে বললাম, কর্মাস পড়লে সহজেই চাকরি পাওয়া যায়। আমার ওটাই পড়ার ইচ্ছে!

সুতরাং পুজোর পর বাবা আমার যাত্রার আয়োজন করলেন। খুব দূর নয়। আমাদের বাড়ির পেছনটাতে বড় একটা পুরনো ইঁটের ভাটা আছে। ওখানে নবমী থাকে। পিলু আমাকে নিয়ে সেখানে দু-একবার গেছেও! আমি ফেরার হলে পিলু নবমীকে বলে এসেছিল, দাদাটা যে কোথায় চলে গেল! পিলুকে মনমরা দেখে নবমী বলেছিল, আপনার দাদা একজন গুণীমানী মানুষ হবে গ দাঠাকুর। তার কি কলোনি ভালো লাগে। বড় হলেই চলে আসবে। সেই থেকে পিলু নাকি স্বপ্ন দেখত, দাদা রোজই

সকাল বিকেল একটা গাড়িতে বাড়ি আসছে। পিলুর জন্য নতুন প্যান্ট, মার জন্য শাড়ি, আর এক হাঁড়ি রসগোল্লা। পিলু রসগোল্লার কাঙাল। স্বপ্নে সে কতদিন নাকি দাদার হাত থেকে নিয়ে রসগোল্লা খেয়েছে।

আমি বাড়ি ফিরলেও পিলু নবমীকে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। দাদাকে বাবা গিয়ে নিয়ে এসেছেন। ছোড়দির চিঠি পেয়ে বাবা যে আমাকে আনতে রওনা হয়েছে, সে-খবরও দিয়েছিল। পিলুর সব সুখ-দুঃখের খবর নবমী বুড়িকে দেওয়া চাই। তার যত কাজ থাক, যত ফলপাকুড় সংগ্রহের বাতিক থাক, নবমীকে সব খবর না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই নবমী বুড়ির বনটা পার হলে, কারবালা। তারপর একটা ইঁট সুরকির রাস্তা এবং পরে কাশের বন—রেল লাইন। রেললাইন পার হলেই সেই কালীবাড়ি। পিলু শুনে বলল, ওতো খুব কাছেরে দাদা। আমি রোজ এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসব। পিলু বোধহয় ভেবেছে বাড়ি ছেড়ে আমার থাকতে কষ্ট হবে। দাদা ঘাবড়ে না যায়। সে দাদাকে সাহস দিচ্ছে।

বাবা সকাল থেকেই আমার যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখে যাওয়া হবে। যাবার আগে বাবার পুজো-আর্চার সময় বেড়ে গেল। বিগ্রহ খুশি থাকলে সব ঠিক থাকবে। আগে তাঁকে খুশি করা দরকার। নীল অপরাজিতা তুলে এনেছেন—নেংড়ি বিবির হাতা থেকে পদ্মফুল তুলে এনেছেন, একশ একটা। খোঁড়া গরুটার দুধের সবটাই পায়েস হয়েছে। মা সকাল সকাল রান্নাঘরের কাজ সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছে। বাবা এক হাতে পুজোর আয়োজন করতে দেরি করে ফেলবেন—কারণ সব সময়ই বাবার ধারণা পুজোর কোনো ত্রুটি থাকলে বাড়িঘরে অমঙ্গল ঢুকবে। কিনা অঘটন ঘটে। কাজেই সব দিক বজায় রাখতে হলে মা টের পায়, তারও হাত লাগানো দরকার। মায়া আজ পিলুকে আমাকে সকালের খাবার দিল। দুপুরের খাবার মা পুজোর ঘর থেকে বের হয়ে দেবে। স্নান করে গরদের শাড়ি পরে পায়েস রান্না, তারপর ঠাকুরঘরে মা চন্দন বেটে আতপ চাল ধুয়ে তিল তুলসী হরিতকী সাজিয়ে এবং ধূপ দীপ জ্বেলে যখন বুঝল বাবা খুব প্রসন্ন তখনই বের হয়ে এল। আমাকে বলল, চান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।

পুজোর সময় বাবা কেমন নির্বিকল্প মানুষ হয়ে যান। পুত্র-কলত্র সব তাঁর কাছে তখন অর্থহীন। ধ্যানে মগ্ন থাকেন আর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজান। তুলসীপাতা একের পর এক চাপান বিগ্রহের মাথায়। বাবার ধারণা বিগ্রহের সেবা ঠিকঠাক হচ্ছে বলেই আমরা সব বেঁচে বর্তে আছি। আমি যে ফিরে এসেছি, সেও বিগ্রহের অসীম কৃপায়। বোঝাই যায় বাবা কেমন এক মহাবিশ্বের খবর পেয়ে যান এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। মানুষের জন্মমৃত্যু, বেঁচে থাকা সবই অপার রহস্যময়। যেন সব কিছুর অস্তিত্বের মূলে তিনি।

বাবার পুজো শেষ হলো বেলা করে। একসঙ্গে আমরা খেলাম। খেতে বসে বাবা বললেন, বিলু তোমার নতুন জীবন শুরু। মনে রেখ পৃথিবীতে কেউ তোমার পর নয়। বাবা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন—তার অর্থ বোঝালেন! তুমি একা এ বিশ্বসংসারে। আবার তুমিই এই বিশ্বসংসার। তুমি নিজেও একজন ঈশ্বর। সবই তাঁর লীলা তোমার মধ্যে।

বাবা খুব বিচলিত হয়ে পড়লে এমন সাধুবাক্য সব আমাদের বলেন। আমার কষ্ট হচ্ছিল, কারণ যত কাছেই হোক—অন্যের বাড়ি—তারা কেমন হবে জানি না, তাছাড়া পিলুকে ছেড়ে থাকতে আমার কেন জানি কষ্ট হয়। সেই শহরটাতেই হয়েছিল, কিন্তু ছোড়দি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল—অত খারাপ লাগে নি। পিলুকে বললাম, যাস কিন্তু!

যাবার সময় দেখলাম মা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বললেন, এখন মন খারাপ করতে নেই।

মা'র মন খারাপ। এটা কি মা টের পায় আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। খুব বেশি দূর না। কালই হয়তো সকালে চলে আসব হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু মা কি আমার সেই গোপন রহস্যের খবর জেনে গেছে। মা কি জানতে পেরেছে বিলুর পৃথিবীতে আর কেউ ঢুকে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় সে কোন এক পরী কে জানে।

বেলা থাকতেই রওনা দিলাম। বাবা পিছনের বনজঙ্গল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হেঁটে এলেন। পিলুর

হাতে আমার জামাকাপড়ের পুঁটলি। ওতে আছে দুটো প্যান্ট, গোটা তিনেক হাফ শার্ট। একটা বাবার পুজো-পার্বণে পাওয়া কোরা অল্পদামের ধুতি। বাবার ধারণা একজন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি পোশাক-আশাক নিষ্প্রয়োজন। বাড়িতে খালি গা, খালি পা এবং হাফ প্যান্ট পরনে—কারণ বাবার কাছে আমি এখনও খুব ছোট আছি। আমারও মনে হয় এই যথেষ্ট। কেবল ছোড়দি আমাকে বুঝিয়েছে, খালি গায়ে থাকিস না। অসভ্যতা। ছোড়দির ভয়ে সবসময় গায়ে জামা রাখতে ভারি কষ্ট হতো। এখন এসব দেখার কেউ নেই। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আবার যদি কোনো ছোড়দির উদয় হয় তবেই হয়েছে। পায়ে জুতো পর্যন্ত আছে! শার্ট গুঁজে পরতে শিখেছি। পিলুর কাছে আমি এখন একজন বাবু মানুষ। বাবু মানুষের হাতে গামছার পুঁটুলি শোভা পায় না। সে সেজন্য আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তার হাতেই সব। পরনে তার ইজের। মা যত্ন করে দু-জায়গায় তালি মেরে দিয়েছে। সেই পরে একটা মারকিন কাপড়ের জামা গায় সে আমার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে ওটা কালীবাড়িতে রেখে আবার দৌড়ে ফিরে আসবে। দাদার জায়গাটাও ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখে আসবে। তার দাদা মাস্টার—ছাত্র পড়াবে। কেমন বয়সের ছেলে বোধহয় সেও দেখার বাসনা। যেতে যেতে কত গল্প তার। কিছুদূর এসেই পিছনে তাকিয়ে দেখলাম গাছপালার আড়ালে আমাদের বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা নবমীর বনটায় ঢুকে গেছি।

—দাদারে?

দাঁড়ালাম। —কিছু বলবি।

—নবমীর সঙ্গে দেখা করবি না?

—দেরি হয়ে যাবে। তোকে আবার ফিরতে হবে। অবশ্য বললাম না, বনজঙ্গলে সাপখোপের উপদ্রব থাকে। পিলুর অবশ্য বেজায় সাহস। এ ব্যাপারে সে বাবার স্বভাব পেয়েছে। রাতবিরেতে বাবা কখনও আলো নিয়ে বের হন না। বাবার কথা—তুমি অনিষ্ট না করলে তিনি তোমার অনিষ্ট করবেন কেন। তিনি বলতে মা মনসা। মনসার বাহন মাত্রেই দেবতা। তাঁকে সংশয়ের চোখে দেখলে সেও সংশয়ের চোখে দেখবে। সংসারে এমনই নাকি নিয়ম। পিলু এ বিষয়ে বাবার কিছুটা স্বভাব পেলেও সবটা পায়নি। সে সাপের খোঁজ পেলে তেড়ে যাবেই। বাবা কতবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পিলু ওটা করিস না। বনজঙ্গলে থাকি। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই ঠিক না। তুই কবে যে তেনার কোপে পড়ে যাবি।

নবমীর সঙ্গে দেখা না করে যাব ভাবতেই পিলু বোধহয় রুষ্ট হলো। সে আর একটাও কথা বলছে না! পুঁটুলিটা বইতেও কষ্ট যেন।

অ্যাঁ, নিজে বাবুর মতো যাবে! আমি নিতে পারব না।—বলেই পুঁটুলিটা মাটিতে ফেলে দিল।

পিলু আমার চেয়ে বেশ ছোট। তবু মনে হয় বিষয়বুদ্ধিতে সে আমার চেয়ে প্রবল। আমার আলাদা একটা সম্ভ্রমবোধ গড়ে উঠেছে সেও যেন পিলুর জন্য। সেই এমন ভাব করে যে আমি আলাদা জাতের! দাদার সুখ্যাতির জন্য সে বড় কাঙাল। নিজে যা পারছে না, দাদার মধ্যে সেটা দেখতে পেলে সে খুশি হয়। সেই দাদার পুঁটুলিটা এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পিলু কি নবমীর সঙ্গে দেখা করা না করার মধ্যে কোনো মঙ্গল-অমঙ্গলের আভাস দেখতে পায়! নবমীর সঙ্গে দেখা না করলে দাদাটার কি না জানি অনিষ্ট হবে—এমন সংস্কারে তাকে পেয়ে বসতে পারে। পাশ দিয়ে যাচ্ছ, একটু ভিতরে ঢুকে দেখা করে যাওয়া এমনকি কষ্টের! আর কতটুকুনই বা দেরি হবে। বললাম, সেই ভালো পিলু। নবমীর সঙ্গে দেখা করেই যাব।

পিলুর মুখে আশ্চর্য সরল মধুর হাসি। এমন উজ্জ্বল চোখ মুখ যে নিমেষে সে ভুলে গেল দাদাটার উপর তার অভিমান হয়েছিল। পুঁটুলিটা তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে আবার বগলে নিল। শেষে একটা কচুবন পার হয়ে যেমন অন্যবার ডাকে, এবারেও ডাকল, আমি দাঠাকুর, নবমী। নবমী টের পায় সেই সরল বালক, তার জন্য কোনো খবর বয়ে এনেছে। পৃথিবীতে নবমীর কাছে খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই। সে বনের ফল-পাকুড় খেয়ে থাকে, কচু-ঘেচু সিদ্ধ করে খায়। আর আছে একটা ছাগল আর তার দুধ। বনটা পুরো পার হয়ে যাবার ক্ষমতা সে কবেই হারিয়েছে। পিলুই একমাত্র তার ডাকপিয়ন। বনটার বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর দেয়। বন কেটে যারা ঘরবাড়ি বানাচ্ছে তাদেরও।

বুঝতে পারি, নবমী এক্ষুনি সাড়া দেবে। ঠিক জবাব এল, একটু দাঁড়াওগো দাঠাকুর। এই ফাঁকে সে পিলুর দেওয়া বাবার পুজো-পার্বণে পাওয়া খোঁট পরে নেবে। বনের ভিতরে কে আর দেখে। লজ্জা নিবারণের দায় তার থাকে না। গাছপালার মধ্যে অবিরাম যে কথাবার্তা চলে তার মধ্যে লজ্জা নিবারণের কথা থাকে না। সে পিলুর ডাকে সাড়া দেয়। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ডাকে মানুষের সাড়া পেয়ে। ছাগলটার যে বাচ্চাটা নবমী বুড়ি পিলুকে দিয়েছিল, পিলুর অত্যধিক যত্ন এবং পর্যাপ্ত আহারে পেট ফেঁপে মরে গেছে। নবমী বলেছে, বাচ্চা হলে আবার তাকে একটা দেবে।

নবমীকে সহসা দেখলে এখন সত্যি ডাইনী বুড়ির মতো মনে হয়। চেহারাটা হাড় জিরজিরে আরও কঙ্কালসার। দাঁত দু'পাশে দুটো বের হয়ে আছে। আলগা মতো দাঁত দুটো কথা বলতে গেলে নড়ে। চোখ কোটরাগত। নাক বাজপাখির মতো লম্বা। ত্যানাকানি পরে সে যখন বনের ভিতর থেকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বের হয়ে এল তখন পিলুর কি আনন্দ! পিলু বোধহয় ভাবে, একদিন নবমী বুড়ি আর তার ডাকে সাড়া দেবে না। মরে যাবে। যেতে আসতে একবার খোঁজ নিয়ে যায়, সে শুধু বুড়ি বেঁচে আছে কি না। বুড়ির খোঁজ-খবর নেয়। কি খায় জিজ্ঞেস করে। সেই নবমী কাছে এলে পিলু বলল, আমার দাদা। চিনতে পারছ।

—ও মা, কি মানুষগো। আমি কি কালা না হাবা চিনতে পারব না। তারপরেই লম্বা হয়ে গেল। গড় হলে আমার ভারি লজ্জা করে। পিলুকে এখন সাক্ষাৎ দেবতা ভেবে থাকে। সেই যেন কখন আসে, এমন এক অপেক্ষা তার। কে জানে, এভাবেই কোন শবরীর প্রতীক্ষা ছিল কি না সেকালে! নবমী আর পিলুকে দেখে আমার কেন জানি চোখে রামায়ণের সেই সুন্দর কাহিনীটি ভেসে ওঠে।

পিলু বলল, দাদা আমার মাস্টার হয়েছে!

—মাস্টার!

—হ্যাঁগো, দাদা ছাত্র পড়াবে। কালীবাড়ি চেন? আমরা সেখানে যাচ্ছি। দাদাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরব।

—তবে আর দেরি করবেন না গো দাঠাকুর। ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে যাবে। ভয় পেলে বুলবেন, বন-বাদাড়ে কতকিছু থাকে, এরা আমাকে চেনে—আমার কথা বুলবেন—নবমী বুড়ির দাঠাকুর আমি। কেউ ছুঁতে সাহস পাবে না।

নবমীর কাছ থেকে এভাবেই বুঝি পিলু ভয় জয় করার সাহসের মন্ত্র পায়। সে বলল, আমার দাদার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। আমায় যে দিয়েছিলে।

আমার গাটা ভয়ে কেমন শিরশির করছিল। পিলুর যে কতরকমের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে নবমী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি পালাব কিনা ভাবছি। পিলু বুঝতে পেরে বলল, ভয় পাস না দাদা। নবমী বলেছে, আমি ওর মতো পরমায়ু পাব। এখন দাদারও এমন হয় সে চায়। ততক্ষণে নবমী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, আমার মতো পেরমায়ু পানগো দাঠকুর। আমার কেশের মতো।

দেশ ছাড়া হয়ে আমরা কত অসহায় পিলুর আচরণ দেখলেই টের পাওয়া যায়। এদেশে এসে হেজেমজে না যাই তার জন্য পিলু সব দিকে খেয়াল রেখে চলে। নবমীকে দেখলে পুণ্য হয়, আয়ু বাড়ে, পিলুর ধারণা। বাবার সম্বল, শালগ্রাম-শিলা। মা'র বিপদনাশিনী ব্রত। এত সব আছে বলেই কেন জানি মনে হলো আমরা ঠিক বেঁচে থাকব। পিলুর এখন আর কোনো ভয় নেই। দাদাকে বনবাসে দিয়ে এলেও না। সে বরং আমাকে গার্জিয়ানের মতো শেখাচ্ছে।

—দাদারে!

—কী!

আমরা হাঁটছি আর কথা বলছি। ইঁটের ভাটা পার হলে সেই কারবালা। ডান দিকে মাইলখানেক জুড়ে মাঠ, মুসলমানদের সারি সারি কবরখানা, মিনার, বাঁধানো শান, রুপোলি চাঁদ তারা আঁকা। আর উপরে বিশাল সব বৃক্ষ। মিনারে কত স্মৃতিকথা লেখা। পড়া যায় না। উর্দু ভাষায় লেখা। সোজা গরুর গাড়ি চলার মতো। একটা পথ, উঁচু নিচু ঝোপঝাড়।

পিলু দু-লাফে আমার আগে এসে গেল—বলল, দাদারে!

—কী বলবি তো!

—পেট ভরে খাবি।

—খাব না কেন!

—তুই ঠিক লজ্জায় পেট ভরে খাবি না।

—হ্যাঁ বলেছে।

—ঠিক জানি। আমরা কাঙাল হয়ে গেছি নারে?

—কাঙাল হব কেন?

—মা যে বলে তোমাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা, কার ক্ষমতা নিবারণ করে।

পিলু ঠিকই বলেছে। ছোড়দির ওখানে এর জন্য আমার ভোগান্তি গেছে। পিলু কষ্ট পাবে বলে তাকে গল্পটা বলিনি। পাইস হোটেল বলে অবশ্য সেখানে আমার খেতে কোনো লজ্জা ছিল না। পয়সা দিয়ে খাব—যত খুশি খাব। যত খুশি খেতে গিয়েই ঝামেলাটা হয়েছিল। কিন্তু যদি কালীবাড়িতে ছোড়দির মতো কেউ থাকে, মুখ তুলে খেতেই পারব না। পিলু কি করে যে টের পায়!

—কি রে খাবি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ খাব।

—আমার কি, না খেলে নিজেই কষ্ট পাবি। বড় হলে কেউ সঙ্গে থাকে না। নিজেরটা নিজেই দেখে নিতে হয়।

—হয়েছে, আর পাকা পাকা কথা বলতে হবে না।

রেল লাইনে উঠে বলল, জানিস দাদা, এখানে একটা লোক কাটা পড়েছিল।

—কবে?

— সেই যে মেলা গেল। মেলাতে লোকটা এসেছিল কালীথানে পুজো দিতে। পিলু কেমন ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। ভয় ভিতরে ঢুকে গেলে পিলুর চোখ খুব ভ্যাবলা হয়ে যায়। সে গুছিয়ে তখন কথা বলতে পারে না!

—কি করে কাটা পড়ল! কথা বলছিস না কেন। এসে তো গেলাম।

দূর থেকে কালীবাড়ির বিশাল নিমগাছটা দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের গুমটি ঘর পার হলেই দেখা যায়। ওকে বললাম, তুই আর যাবি? পিলু কিছুক্ষণ কি ভাবল। আমার উপর বিশ্বাস কম। বলল, তুই যেতে পারবি।

—খুব পারব। তুই যা। নালে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আবার ডাকে, দাদারে!

—বল।

—তুই কিন্তু রেল-লাইন পার হোস না।

—কেন?

—কখন গাড়ি এসে ঘাড়ের উপর পড়বে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম পিলুর ভয়টা কোথায়। কালীবাড়ির সীমানা ঘেঁষে রেল লাইন চলে গেছে। পিলুর ধারণা রেল লাইনটা ভাল না। কালীবাড়ির কাছটায় ফি বছর কেউ না কেউ কাটা যায়। কেউ এখানে আত্মহত্যা করতে চলে আসে। জায়গাটার কোনো অশুভ প্রভাব আছে। কেউ বলে মা কালীর ভোগে গেছে। তার দাদাটাকে কাজে অকাজে রেল লাইন পার হতেই হবে। যা অন্যমনস্ক। যদি কিছু হয়ে যায়। সেই ভয়ে কেমন ভ্যাবলু বনে গেল পিলু।

—আমি ঠিক দেখে পার হব। ভাবিস না।

পিলুর এইভাবে কতরকমের যে ভয় তার দাদাটাকে নিয়ে! সে নিমগাছটার কাছে এসে বলল, আমি যাই।

কিন্তু আশ্চর্য কালীবাড়ির সামনের রাস্তাটায় কেউ নেই। সেবাইত কোন দিকটায় থাকে জানি না। পকেটে মানুকাকার দেওয়া একখানা চিঠি সম্বল। লম্বা পাঁচিলের মতো মন্দির চলে গেছে। কিছু কাক হাহাকার করে ডাকছে অশ্বত্থ গাছের মাথায়। দুটো বড় পেল্লাই দরজা। দুটোই বন্ধ। মন্দিরের বাঁ দিকে

এক ফালি একটা দরজা চোখে পড়ল। দুটো লোক মন্দিরটার দক্ষিণের মাঠে ঘাস কাটছে। একটা রিকশ ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজিয়ে এল আবার নিমেষে উধাও হয়ে গেল। পিলু তার দাদাকে এভাবে একা ফেলে যেতে ভরসা পেল না। এ যেন দাদাকে একটা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হবে। সে খুব সাহসী হয়ে যায়।

আমি খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছি। গাছপালার ফাঁকে বিকেলের রোদ নেমে যাচ্ছে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই মন্দির। শনি-মঙ্গলবারে মানত দিতে লোকজন আসে। আমরাও দু-একবার ওইসব দিনে ঘুরে গেছি। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। বলির পাঁঠার আর্তনাদ আর মন্দিরের ভিতর কেউ জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করছে। লোকজনে ভরে থাকে। মাথায় কপালে পাঁঠার রক্ত। বৌ-ঝিরা নানারকম মানতে ব্যস্ত। সারি সারি রিকশ, গাড়ি লেগে থাকে। আজ সে সবের কিছু নেই। কেমন খাঁ-খাঁ করছে। মন্দির থেকে কাউকে বের হতে দেখা গেল না। মহামারীতে সব শেষ হয়ে গেলে যেমন জনশূন্য হয়ে যায় গাঁ-গঞ্জ আমার আর পিলুর কাছে এখন জায়গাটা সে রকমের।

পিলু তবু এগিয়ে যাচ্ছে । সে ইঁটের রাস্তাটা পার হয়ে মন্দিরের রোয়াকে উঠে গেল। তারপর ফালি দরজাটা ঠেলতেই দেখল—সামনে বড় কোঠাঘর—তক্তপোশে তিনচারজন ছেলে বুড়ো শুয়ে। আসলে সবাই দিবানিদ্রা যাচ্ছে। সে সন্তর্পণে নেমে এসে বলল, দাদা সবাই ঘুমোচ্ছেরে। এ কেমন জায়গারে! বেলা পড়ে এল, তবু ঘুমোচ্ছে। তারপর বলল, ডাকব!

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। পরের বাড়ি। আমি এদের আশ্রিত হয়ে থাকব। আমার এ অসময়ে কতটা ডাকার দাবি আছে সে নিয়ে যখন ভাবচি, তখনই মন্দিরের দরজা-খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিরাট পেল্লাই দরজা ঠেলে ঠেলে কেউ খুলে দিচ্ছে। আমারই বয়সী একটি মেয়ে। ডুরে শাড়ি পরনে। মাথায় ঘোমটা। পিলু ছুটে গিয়ে বলল, আমার দাদা, এখানে থাকবে। ভিতরে খবর দাও না। বালিকাটি কিছু বুঝতে পারল না। সে ঘড়া করে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে মন্দিরের চাতালে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কেউ যেন মন্দিরের ভিতর গেরুয়া নেংটি পরে শুয়ে আছে। মানুষ না বলে কঙ্কালই বলা ভালো। আমাদের কথাবার্তায় কারো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবে বালিকাটি সদর দরজার বাইরে বের হয়ে বলল, কাকে খুঁজছ।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পিলু বাধা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। বলল, আমার দাদা। মাস্টার। পকেটে চিঠি আছে। দেখানারে দাদা।

বালিকাটি হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল, অমা! আমাদের নতুন মাস্টার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গো। আসেন, আসেন। তা অত ছোট কেন? ভিতরে আসেন। আপনার সকালে আসার কথা ছিল না? বলেই সে ভিতরে দৌড়ে খবর দিতে গেল। কোন দিক দিয়ে যায় লক্ষ্য করছি। চাতালের পাশে মন্দিরের মিনা করা থাম। মেয়েটি থামের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপরই ফের হাজির। — অমা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন গো? আমার সঙ্গে আসেন।

—এটা কে?

—আমার ভাই।

—আপনিও আসেন।

পিলু বলল, দাদাকে দিয়ে গেলাম। আমি যাব না। বাড়ি ফিরতে হবে। দাদাকে দেখে রাখবে কিন্তু। বলেই দৌড়।

মেয়েটি এবারেও হাসল। বলল, আমরা খেয়ে ফেলব না। আপনার দাদাটি আস্তই থাকবে।

বুঝতে পারছি বয়েস কম হলেও অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ মেয়েটির মুখে। জানি না এ বাড়ির সে কে হয়। এতটুকুন মেয়ের ঘোমটা কেন। চোখ ডাগর। মুখে আশ্চর্য সজীবতা। শরীরে বড় বেশি লাবণ্য। পিলুর চেয়েও বেশী পাকা, পাকা কথা। চাতাল পার হয়ে যাবার সময় বলছিল, ভয়ে কুঁকড়ে আছেন গো দেখছি। দিন পুঁটুলিটা হাতে দিন। বলেই আমার দিকে ভারি চোখে তাকাল। এমন চোখ এবং চোখে টান আমি জীবনেও দেখিনি। যেতে যেতে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পুঁটুলিটা সে যেন জোর করেই হাত থেকে কেড়ে নিল।

এভাবে আমার পৃথিবী ক্রমেই বড় হয়ে যেতে থাকল। এখানে এসে টের পেলাম, ধর্মস্থানে খাবারের অভাব হয় না। দেশ ছেড়ে আসার পর এই প্রথম পর্যাপ্ত আহারের মুখ দেখলাম। সেবাইত মানুষটি যে এ অঞ্চলের একজন মানী ব্যক্তি, দু-একদিনেই তা টের পাওয়া গেল। জেলা কংগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তি। মানুকাকাও কংগ্রেসের হয়ে জেল খেটেছে—সেই সুবাদে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। ফলে আমার আরও দু-চারজন আশ্রিতের মতো এখানটায় জায়গা হয়ে গেল। তবু প্রথমটায় দু-দিন খুবই আড়ষ্ট ছিলাম। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। স্নানের সময় হলে সেই ঘোমটা দেওয়া বালিকাটি আসত। বলত, চান করে নিন। খাবেন না? জড়ভরত হয়ে থাকেন কেন?

মেয়েটা এত চোপা করে কেন বুঝি না। এখানে বোধহয় সবাই হৈচৈ করে থাকতে ভালবাসে। বাড়ির হালচাল বুঝতে সময় লাগে, এই কথাটা কি করে যে মেয়েটাকে বোঝাই। ওর নামও জেনে গেছি। সবাই লক্ষ্মী বলে ডাকে। ভিতরে গেছি—দেখেছি পাকশালার দরজায় কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও ওকে কাঁখে কলসি ছাড়া দেখিনি। এর কি শুধু এই কাজ। আর মাঝে মাঝে ইদানীং আর ও একটা কাজ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আমার দেখাশুনা করা।

চিঠিটা দেখার পরই সেবাইত মানুষটি বলেছিল, থাকতে পারবে তো! বাড়ির জন্য মন কেমন করবে না তো?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলাম।

—যখন যা দরকার বলবে। কোনো সংকোচ করবে না। নিজের বাড়ি মনে করবে। যে যার মতো এখানে থাকে খায়। এটা এজমালি সংসার। লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, ওর ঘরটা দেখিয়ে দে। হাত-পা ধুয়ে নাও। চা খাও তো? চা না খাও মুড়ি সন্দেশ, যেটা ভালো লাগে বলবে! তারপরই ডেকেছিল, শুনছ—মাথায় বেশ ঘোমটা দিয়ে যিনি এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাস্টারদার ভাইপো। দেশ থেকে সবাই এরা চলে এসেছে। তোমাদের নতুন মাস্টার। খেয়াল রেখ। এত ছেলেমানুষ বুঝতে পারিনি। এখান থেকেই কলেজে পড়বে। নটু পটুকে পড়াবে। পছন্দ কিনা দেখ।

আমি বাড়িতে থাকব শুনেই তিনি মাথার ঘোমটা কিছুটা টেনে কপালের উপর তুলে নিলেন। নিজের লোক—ঘোমটা দেওয়া ঠিক না। —ছেলে দুটো ভারি দুষ্টু। পড়তে চায় না। তোমার নাম কি?

—বিলু।

—আমি কিন্তু বিলু বলেই ডাকব।

সেবাইত বললেন, তোমার বৌদি। যা কিছু দরকার এর কাছে চাইবে! কোনো সংকোচ করবে না।

আমার বৌদিটির রূপের বর্ণনা দিলাম না। কারণ এমন কিছু সৌন্দর্য থাকে যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। এতে বৌদিকে আমার খাটোই করা হবে। দীর্ঘাঙ্গী। পরনে লাল পেড়ে শাড়ি। হাতে দুটো সাদা শাঁখা। খুব লক্ষ্য না করলে শাঁখা এবং হাতের রঙ পার্থক্য করা যায় না। বৌদি লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, নটু পটুকে ডেকে দে। ওদের মাস্টারমশাই এয়েছেন। প্রণাম করে যেতে বল। লক্ষ্মী বলেছিল, তোমার ছেলেরা ঘুমাচ্ছে।

—ঘুমাচ্ছে, তুলে দে।

ভাবতে পারছি না, কার্তিকের বেলা পড়ে আসে সহজে, সহজেই সন্ধ্যা নেমে আসে। অবেলায় কেন এরা ঘুমায়। লক্ষ্মী আমাকে বারান্দায় টুলে বসিয়ে সেদিন প্রায় সবাইকে চেঁচামেচি করে জাগিয়ে দিয়েছিল। নিজেই বিরক্ত বোধ করছিলাম ওর চেঁচামেচিতে। কি না জানি ভাবে। অথচ সেবাইত মানুষটি ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিলেন, কে এসেছে বললি?

—নতুন মাস্টার এয়েছে। তোমরা ঘুমোচ্ছ আর মানুষটা কি ভাববে বলত! মানুষটা মানে আমি।

—নতুন জায়গা, ভিনদেশী। দেখলে সব কি ভাবে!

এ বাড়ি কার বাড়ি, কে আসল মহাজন, কাকে বেশি সমীহ করতে হবে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। নটু পটু এসেছিল, তবে তখন নয়। সন্ধ্যায় লক্ষ্মী হারিকেন জ্বালিয়ে দেবার পর। কারণ ভিতর বাড়িটাতে অসংখ্য ঘর। ছোট ছোট দরজা, জানালা আরও ছোট। ছোড়দির বাড়ির মতো

বিশাল বিশাল দরজা জানালা এ বাড়িতে নেই। মন্দিরের দুটো বিশাল দরজা বাদে আর সর্বত্র কেমন কানা গলিগুঁজির মধ্যে ঘরগুলি হারিয়ে গেছে। আমাকে লক্ষ্মী যখন পড়ার ঘরটায় নিয়ে গেছিল তখন প্রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। রাস্তার পাশে, রোয়াকের উপর ঘর। একটা দরজা সামনে, ভিতরের দিকে আর একটা দরজা। রাস্তার উপর দু-দিকে দুটো জানালা। আর দক্ষিণের দিকেও একটা জানালা আছে। ওটা খুলে দিতেই সামনের মাঠ দেখতে পেয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল এই ঘরটাই সবচেয়ে বেশি বড়। দু-পাশে দুটো বড় তক্তপোশ। মাঝে তিনটে হাতল ভাঙা চেয়ার। একটা টেবিল চাকচিক্যবিহীন। সামনে তাক। নটু পটুর শ্লেট পেন্সিল খাতা বইতে ঠাসা। বাড়িতে ঢোকার আগে এখানেই তিন চারজন লম্বা হয়ে শুয়েছিল। ঘুমোচ্ছিল। পিলু দরজা ফাঁক করে বলেছিল, এ কেমন বাড়িরে দাদা। অবেলায় সবাই ঘুমায়।

দু-রাত কাটাবার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে গেছি। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে—শুধু একজন বাদে। তিনি মন্দিরেই থাকেন খান। একটা গেরুয়া নেংটি পরে থাকেন। গায়ে জামা দেন না। চোখ সব সময় লাল। যেন সেই মহাভারতের দুর্বাশা মুনি। সকালবেলায় হোতার সাঁকো থেকে বড় নিমগাছটা পর্যন্ত কেবল পায়চারি করেন—আর সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল আওড়ে যান। যেন পৃথিবীটাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব, ধর্মাধর্ম রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে কেউ অর্পণ করে গেছেন। এমন কঙ্কালসার মানুষ অথচ কি দৃপ্ত আর তেজী। মন্দিরের আসনে যখন বসে থাকেন, আমার মাঝে মাঝে তাঁকে কাপালিকের মতো লাগে। যদি কখনও তার চিৎকার ভেসে আসে, বাড়ির সবাই কেমন তটস্থ হয়ে পড়ে। নটু বলেছিল, নরেন খ্যাপা। কাছে যাবেন না। চোখ পড়ে গেলে রক্ষা নেই। মন্দিরে বসিয়ে সারাদিন গীতাপাঠ করাবে। উঠতে দেবে না। চান করতে দেবে না। কেবল বলবে, খা খা। আমারে খা। ভয়ে এই ঘরটা থেকে সহজে তাই বের হই না।

সেবাইতের ছেলে নটু। পটু ওর বোনের ছেলে। বোন এখানেই থাকে। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে শাঁখা নেই। পটুর বাবা কোথায় থাকে জানি না। তবে তিনি বেঁচে আছেন জানি। গতকাল পিয়ন পটুর বাবার চিঠি দিয়ে গেছে। ধনঞ্জয় বলে একজন এ বাড়ির আশ্রিত, পটুর জ্যাঠতুতো দাদা। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দেখতে। ধনঞ্জয়ও ঘরের বার হয় না। পটুর মার ঘরে দিন রাত শুয়ে থাকে। ঘরটার জানালা ছোট বলে বারান্দার আলো থেকে সব কিছু ভিতরে স্পষ্ট দেখা যায় না। পটুর মাকে আমি দিদি ডাকার পর স্নেহশীলা রমণীর আচরণ লক্ষ্য করেছি। বাইরে বড় কম বের হন। সকালবেলায় তাঁকে দেখলে মনে হবে, সারারাত যেন না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। চোখ বসে গেছে। সুশ্রী দেখতে, তবে লাবণ্য নেই তেমন। কোনো রোগ-টোগ থাকলে মেয়েদের যেমন লাগে দেখতে পটুর মা সে রকমের।

আমার ঘরের ও পাশের তক্তপোশটায় আরও একজন এ বাড়ির আশ্রিতজন থাকেন। কালো কুচকুচে দেখতে। মাথায় বিশাল টাক। বেঁটেখাটো মানুষ। এ বাড়ির আদায়পত্র তাঁর হাতে। নটু পটু দাদু ডাকে—আমি আর কি ডাকি, দাদুই ডাকতে শুরু করেছি। এতে খুব খুশী তিনি। আমার খাওয়া চান নিয়ে তাঁর দেখছি বেশ একটা ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

আমার জামা প্যান্ট কোরা কাপড় দু'দিন ধরে কুলুঙ্গিতে পড়ে আছে। সকালে লক্ষ্মী মুড়ি সন্দেশ আর গ্লাসে জল নিয়ে এ-ঘরে একবার আসে। তিন চেয়ারে আমরা তিনজন। পড়ার চেয়ে নানারকম মুখরোচক খবর নিতে নটু পটু বেশি ভালোবাসে। খাবার এলে সেটা বেড়ে যায়। আমি আশ্রিত বলে, সন্দেশের পরিমাণ কখনও কম হতো না। বরং আমার মুড়ির সঙ্গে চারটে কাঁচা গোল্লা থাকলে নটু পটুর ভাগে দুটো বরাদ্দ থাকত। সকালের জলখাবার আমাদের তিনজনের একসঙ্গে, দুপুরের খাবার একসঙ্গে রাতেও তাই। সকালের তদারকির দায় লক্ষ্মীর। দুপুরে বৌদি নিজ হাতে দেন। রাতেও তাই। নটু পটুর স্কুল নেই। আমার কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি দাদাই ভার নিয়েছেন। সময় মতো হবে। লক্ষ্মী দু'দিনেই কেমন তেরিয়া হয়ে বলল, মাস্টার, তোমার কিছু হবে না। ও ভাবে সব ফেলে রাখে! বলে সে নিজেই নিয়ে এল একটা তার। সেটা টানিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখে দিল জামাকাপড়। লক্ষ্মীর এ ঘরে আর একটা কাজ রাতে থাকে। আমাদের বিছানা করে মশারি টানিয়ে দেওয়া। নটু পটু আর আমি এক বিছানায় পাশাপাশি। পটুর শোওয়া খারাপ বলে লক্ষ্মী বলে গেছে, ওটারে একপাশে দেবেন। খুব লাথি মারে।

জামা প্যান্টের দুরবস্থা নিয়ে এখন আর আমার ভাবনা হয় না। একটা হাফপ্যান্ট পরে সহজেই এ-ঘর ও-ঘর করতে পারি। এ বাড়িতে পোশাক-আশাকের প্রাবল্য খুব কম। আমার ছাত্ররাও দেখছি খদ্দরের প্যান্ট জামা পরে। বদরিদাও তাই। বদরিদা হাতে কাচা কাপড় পরেন। ধোপা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কম। কেবল দিদি একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসেন। তাঁকে কখনও দেখেছি, আয়নার সামনে বসে সাজগোজ করছেন। বৌদির তিনবেলা স্নানের অভ্যাস। বাড়িতেই চান করেন। আমারও তাই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কালীবাড়ির পিছনে বিশাল ঝিল, বাঁধানো ঘাটলা দেখার পর দাদুর সঙ্গে সেখানে চান করাই শ্রেয় বোধহয়। সারাদিন লক্ষ্মীর কাজ ছিল ঝিল থেকে জল টানা। আমার জন্য বাড়তি জল ওর আর টানতে না হয় সেটাও বোধহয় মনের মধ্যে কাজ করছিল। আর তারপরই লক্ষ্মী কেমন আমার প্রতি সদয় হয়ে গেল। কোনো কথায় আর চোপা করত না। বরং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি কথা বলতে বলতে চোখ নামিয়ে নেয়। সে অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে এসেছে, এটাও টের পেলাম আর টের পেলাম লক্ষ্মীর ইতিপূর্বে দুবার বিয়ে হয়েছে। বর কপালে সয়নি। মা বাবা নেই। শেষে কাগে বগে ঠুকরে খাবে এই ভয়ে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে উঠেছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মীর জন্য আমার ভিতরে আর একটা কষ্ট তৈরি হচ্ছে। কেন এমন হয় বুঝি না!

আসলে এরি নাম বড় হওয়া। খেপে খেপে কষ্ট রেখে যাচ্ছি এক এক জায়গায়। আগে দেশ বাড়ির জন্য কষ্ট হতো। পরিচিত গাছপালা, মানুষজন, গোপাট, স্কুলবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান জন্মে যায়! চলে আসার সময় কেবল মনে হতো এখানে আর আমি থাকব না, কখনও আর আসব না, অথচ এরা শীত গ্রীষ্মে একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে বালক দৌড়ে যেত, গ্রীষ্মের দিনে আম পাড়ত, সে থাকবে অনেক দূরে। শস্যক্ষেত্রগুলিতে ফসল ফলবে, কিন্তু যে বালক ক্ষেতে ফসল বেড়ে ওঠার সৌন্দর্য উপভোগ করত, সে আর থাকবে না। দেশ ছাড়ার সময় আমার চোখে জল এসে গেছিল। এদেশে এসেও যখন যেখানে ছিলাম সে জায়গাটার জন্য মায়া পড়ে গেছে। এখানে এসেও তাই। এত কম বয়সে লক্ষ্মীর দুবার বিয়ে হয়েছে! অথচ কেউ বেঁচে নেই। মা নেই, বাবা নেই। লক্ষ্মীর চালচলন দেখলে বোঝাই যায় না সে এত শোকতাপ পেয়েছে। বরং ওই যেন এত বড় বাড়িটার আসল চাকা। কারণ এ বাড়িতে সবাই যে যার, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, এমন কি তারা চান করে জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে দেয় না। সব লক্ষ্মীর জন্য পড়ে থাকে। পাকশালায় আর দু'জন মাঝবয়সী বৌ থাকে। কার্তিকের বৌ আর সদি পিসি। ওরা রান্নাবান্নার তদারক করে। উত্তর দিকের অতিথিশালার পাশে কার্তিকের থাকার ঘর। সে মোড়ে একটা মুদি দোকান করেছে। বৌ তার পাকশালে থাকে। বিনিময়ে সেও খেতে পায়। সে অবশ্য বলে, দুবেলা প্রসাদ পায়। বদরিদাকে মামা ডাকে। সম্পর্কে তাই হয়। আমি বদরিদাকে দাদা ডাকি বলে সে আমাকে মামা ডাকে। মাস্টার ডাকে না। আমার ঘরটার ভিতর দিয়েই যেতে হয় সবাইকে। চার পাঁচটা সাইকেল আছে, সাইকেলগুলি সব পড়ার ঘরের এক কোণায় জমা হয়ে থাকে। সাইকেলের গায়ে কারো নাম লেখা নেই। যার যখন যেটা দরকার নিয়ে বের হয়ে যায়। বদরিদা বলেছে, এজমালি সংসার। আসলে বুঝি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, পান্থশালা।

সকাল থেকেই পান্থশালায় লোক আসা শুরু হয়। মন্দিরের সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে ঘুরে যেতে হয় বলে আমার ঘরটা দিয়ে সর্টকাট করে। যাবার সময়, সবার একটা কথা, কি মাস্টার তোমার ছাত্ররা পড়ছে ত। এরা এখন ভিতরে গিয়ে বদরিদার ঘরে তাস খেলতে বসবে। তারপর দুপুরে খেয়ে কখনও ঘুমিয়ে শেষ বেলায় বাড়ি ফেরে। কেউ যাবার সময় নটু পটুর মাথায় গাঁট্টা মেরে যায়। নটু যে এ বাড়ির হবু মালিক কেউ মানতেই চায় না। তার বাবার বন্ধুরা আসে শহর থেকে। কেউ আবার বৌ বাচ্চা নিয়েও চলে আসে। ভিতর বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায় কত বিচিত্র মুখ। সবারই লোভ প্রসাদে। এবং এই লোভেই বোধহয় বদরিদার চেনাজানার জগৎ এত বিশাল হয়ে যাচ্ছে। বদরিদার এক কথা, এসেছ, মার প্রসাদ না নিয়ে যাবে কি করে!

নটু বলল, স্যার শনিবার কিন্তু সকালেই দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

আমি বললাম, কেনরে?

—শনি মঙ্গলবারে বড় ভিড় হয়। সকাল থেকেই দেখবেন কতদূর থেকে সব লোকজন আসছে।

মানত দিতে আসে! নটু আমাকে আরও খবর দিল, রাতে সদু পিসির ভর উঠবে কালীর থানে। লোকজন তখন—এ ঘর দিয়েই ছোটাছুটি করবে। আপনারও পড়া হবে না। আমাদেরও না।

শনিবারে সেটা যথার্থই টের পেলাম। সকাল হতে না হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মন্দিরের চতালে ঢাক বাজছে। পাঁঠার আর্তনাদ। যে-সব ছাড়া পাঁঠাগুলি অতিথিশালার ওদিকটায় শুয়ে থাকে তারাও আর্তনাদ করছে। চাতালে ঢাক বাজলে কেমন গুমগুম শব্দ হয়। কার্তিক সকাল থেকেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বসে থাকে। শনি মঙ্গলবার তার দোকান বন্ধ থাকে। বড় রামদাটা বালিতে ঘষে ধার তোলে। পট্টবস্ত্র পরে নেয়। এবং তাকে দেখলে বোঝা যায়, সে একজন তখন তান্ত্রিক মানুষ। আমাকে মামা পর্যন্ত ডাকে না। গাঁজা ভাঙ খায় বোধহয়। না হলে এত গুম মেরে থাকে কেন? মানত করা পাঁঠাগুলি চাতালের এক কোণায় জড় থাকে। মন্দিরের মধ্যে কেউ যেতে পারে না। বাইরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সন্দেশের ঠোঙা, অথবা নৈবেদ্য ছুঁড়ে দিতে হয়। সবারই কত রকমের যে দুঃখ। কত রকমের যে প্রার্থনা। ছেলেবুড়ো যুবতী মেয়ে বৌ বেটি সবার এত কি প্রার্থনা থাকে! অবশ্য আমি একবার মাত্র বের হয়ে দেখেছিলাম। তারপর মনে হয়েছে, ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘুরবে। নিজের ঘরে এসে নটু পটুকে নিয়ে বসলাম। ওদের এ ব্যাপারে কৌতূহল খুবই কম। বরং নটুর দেখলাম সিঁড়িভাঙা অঙ্ক শেখার আজ বেশ আগ্রহ। এটা দেখে আমার মাস্টারি করার প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খুব অভিনিবেশ সহকারে পড়াচ্ছি। পটু কিন্তু জানালায় বার বার কি দেখছে। পটুর টাস্‌ক দেওয়া আছে সেটা সে করছে না।

—কি হচ্ছে পটু, ওদিকে মন কেন! একেবারে গুরুজনের মতো গলা আমার।

পটু বলল, এই ওখানে কি করছিস রে! জানালায় কাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে।

তাকিয়ে আমি অবাক! দেখি ওখানটায় পিলু দাঁড়িয়ে আছে। সে দাদার টানে চলে এসেছে। আমি কিভাবে পড়াচ্ছি, ভীষণ গর্বের সঙ্গে দেখছে।

পিলুকে দেখে যতটা চঞ্চল হয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা হওয়া গেল না। আমার ভাই বলতেও কেমন সংকোচ হচ্ছিল। সে জানালার সিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ইজের, খালি গা, উষ্কখুষ্ক চুল। ও এরকমভাবেই থাকে। সকালবেলায় উঠে ঠিক দাদার জন্য মন কেমন করায় দৌড়ে চলে এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে বললাম, ভিতরে আয়। তারপর একটু শাসনের গলায় বললাম, কি করতে এসেছিস?

নটু বলল, স্যার কে ছেলেটা?

আমি বললাম, তোমরা ভিতরে যাও। তারপরই মনে হলো হাফপ্যান্ট পরা স্যারের এত গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত টিকতে নাও পারে। বললাম, পিলু।

পিলু কিন্তু বেশ খোস মেজাজে তক্তপোশে বসে পা দোলাচ্ছে—আমার দাদা। আমি দাদার ছোট ভাই। তোমরা দাদার স্টুডেন্ট? নটু বলল, হ্যাঁ। নটু পটু সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। ওদের সমবয়সী আমার একটা ভাই থাকতে পারে বিশ্বাসই ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার ভিতরে যাব। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি নটু, ওর নাম পটু।

—যাও।

—এই পিলু ভিতরে যাবি?

পিলু আমার দিকে তাকাল। নটু কি তার মাকে দেখাতে চায়—এই পিলু মাস্টারমশাইর ভাই। সকালবেলায় দাদাকে দেখতে চলে এসেছে। বৌদি যদি কিছু ভাবে, কিংবা বদরিদা। বাড়িটার এমনিতেই এত বেশি আকর্ষণ যে কেউ এলে যেতে চায় না। পিলু যা স্বভাবের তাকে এমন বাড়িই মানায়। আমি বললাম, পিলু এক্ষুনি চলে যাবে। ওকে ভিতরে নিয়ে যেও না। যেন নিয়ে গেলেই পিলু ধরে ফেলবে, এখানে দাদার মতো সেও থেকে যেতে পারে। কেউ কিছু বলবে না। মন্দিরের ডাঁই করা সন্দেশ, দুপুরে সরু আতপ চালের ভাত, মাছ ভাজা, পটল ভাজা, মুগের ডাল, শনি মঙ্গলবারে বাটি ভর্তি পাঁঠার মাংস, চাটনি। পাত পেতে বসে গেলেই হলো। যে আসে সেই যখন পাত পেতে বসে যেতে পারে তবে তার বেলায় কতটা আর রামায়ণ মহাভারত অশুদ্ধ হবে! কিন্তু পিলুটা বোঝে না কেন, আমার ইজ্জত আছে। তুই তো আর কার্তিক ভাদুড়ি নোস, যে পাঁঠা কেটে বাড়ির লোক

হয়ে যাবি—তুই যে নটু পটুর স্যারের ভাই। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেল। লক্ষ্মী এসে গেছে এক বাটি মুড়ি আর চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে। তার সকালের টিফিন। পিলু বড় বড় চোখে বাটিটা দেখছে।

লক্ষ্মী বলল, ধরো মাস্টার। তারপরই পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, ও মা এ যে তোমার সেই ভাইটাগো। লক্ষ্মী পিলুকে একবার দেখেই চিনে রেখেছে। কি গো দেখতে এলে দাদাকে খেয়ে ফেলেছি কি না।

লক্ষ্মীর ভিতরে অন্য এক ব্যথা কাজ করে বুঝতে পারি। সে কি টের পায়, যাকে সে ভালোবাসে সে মরে যায়। তার কি ভয় থাকে গভীরে। কোনো গোপন ভালোবাসায় পড়ে গেলে আমাকে নির্ঘাত গিলে ফেলা হবে। এবং লক্ষ্মীর আচরণ মাঝে মাঝে আমাকে বিস্মিত করে। আমার সমবয়সী অথচ এই বাড়িতে তার কি হম্বিতম্বি। সারাটা দিন কাজ, কেবল সন্ধ্যার পর সে আর কোনো কাজ করে না। ভিতর বাড়ির বারান্দার এক পাশে শরীর মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে— ভোঁসভোঁস করে ঘুমায়। রাত বারোটার পর শিবা ভোগ হয়। তারপর বদরিদা, বৌদি নটু পটু দিদি অর্থাৎ সেবাইত বংশের সবাই খাবে। অবেলায় কেন ঘুমায় সবাই, এখন বুঝতে পারি। বৌদি আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি আগে খেয়ে নেবে ভাই। খেলে বলো। আমার কেমন সংকোচ হয়েছিল বলতে, এত রাতে কখনও খাই না বৌদি। আবার মনে হয়েছিল, আমার দুই ছাত্র যদি এত রাত করে খেতে পারে, আমি পারব না কেন! বলেছিলাম, না না, ঠিক পারব। কোনো অসুবিধে হবে না। রাত জাগা অভ্যাস নেই বলে ঘুমিয়ে পড়তাম। লক্ষ্মী এসে ডেকে দেয়, ও মাস্টার ওঠো। খাবে চলো। দাদা বৌদি সবাই বসে আছে। আমার এত ঘুম যে কখনও বিরক্ত হয়ে যেত ডাকতে ডাকতে—কি যে মরণ, বুঝি না বাপু। খিদে পায় না। খিদের চেয়ে ঘুমটা বেশি! সেই কখন চাট্টি খেয়েছ—দেখ কেমন হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। দেব জল ঢেলে বলছি। উঠে বসলে দেখতাম লক্ষ্মী আমার দিকে তাকিয়ে নেই। যেন দেয়াল টেয়াল দেখছে। আসলে এ বাড়িতে লক্ষ্মীর পছন্দ মতো লোকের অভাব। আমাকে তার পছন্দ, সেটা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। বয়সের তুলনায় হাতে পায়ে লম্বা হয়ে গেছি বেশি। সোনালী দাড়ি গোঁফ অল্প অল্প সারা গালে। লক্ষ্মী ঠাট্টা করে কাল বলেছিল, নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর গো, কি যে আমার হবে?

সেই লক্ষ্মী পিলুকে দেখে ছাড়বে না বোঝাই যাচ্ছিল। এতেই আমি আরও বেশি কাবু হয়ে গেছিলাম। নটু পটু দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যাবে বলে। পিলু পা পা করে এগুচ্ছিল। কিন্তু চারটে বড় বড় কাঁচাগোল্লা এক জামবাটি মুড়ি দেখে তার এগোনো বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মী সব রেখে ছুটে গেছে ভিতরে। কেন গেল বুঝি না। পিলু কি সং! তামাশা! ভিতরে ভিতরে পিলুর উপর ক্ষেপে যাচ্ছিলাম। এলি তো একটা জামা গায়ে দিয়ে আসতে কি ক্ষতি ছিল। জামাটা ছেঁড়া—তাহোক না, জামাতো। ওর নাকটা দেখলাম। পোঁটা লেগে থাকে—বড় খারাপ স্বভাব। সেই কবে থেকে গায়ে রিফ্যুজি ছাপ লেগেছিল, সেটা বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর থাকা ঠিক না। তবে রক্ষে নাকে পোঁটা নেই। ওর রঙ শ্যামলা। মুখে মায়ের আদল। চোখ দুটো বড়ই মায়াবী। যা কিছু দেখে, তাই ওর কাছে বিস্ময়। ফলে চোখ দুটো বোধহয় দিনে দিনে আরও বেশি ডাগর হয়ে উঠছে। এ হেন বালকের প্রতি লক্ষ্মী নটু পটু সবাই টান বোধ করবে সেটা আর বেশি কি। কিন্তু ওর এই বিস্ময়ে আমার যে সম্ভ্রম যায়। চকিতে এতসব ভাবনা মাথায় খেলে গেল। কেউ নেই দেখে বললাম, পিলু বাড়ি যা। এক্ষুনি চলে যা।

পিলু যেন আমার কথা শুনছে না।—দাদা তুই চারটে কাঁচাগোল্লা খাবি? তারপর আর আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে নিজেই ছুটে কাঁচাগোল্লা তুলে একটা মুখে পুরে দিল। কাঁচাগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিলে গলায় আটকে যায়। পিলুর অভ্যাস নেই—সে মুখে দিয়েই বুঝল, গলা দিয়ে ঢুকছে না। আমি চিৎকার করে উঠলাম, শিগগির জল খা। জল খেলে এমন সুস্বাদু খাবার মিলিয়ে যাবে — সে কিছুতেই জল খেতে রাজি না। কিন্তু চোখ মুখের অবস্থা খারাপ। জল ঠেসে ধরলাম মুখে। বিষম খাচ্ছে—এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা—আর তখনই দেখি, বৌদি, লক্ষ্মী নটু পটু হাজির। সবাই পিলুকে দেখতে এসেছে। দেখবে কি, সে তো বিষম খেয়ে অস্থির। তার হাতে আরও একটা কাঁচাগোল্লা।

বৌদি কাছে গিয়ে মাথায় ফুঁ দিল, এবং দেখলাম পিলুর চোখ আবার সহজ হয়ে আসছে। হাতে আর একটা কাঁচাগোল্লা, দাদার বাটি থেকে তুলে নিয়েছে—কে কি না জানি ভাবে, সে পিছনে নিয়ে গেল হাতটা। কেউ আর দেখতে পাবে না। বৌদি বলল, তোমার ভাই?

—হ্যাঁ।

—কি নাম?

—পিলু।

—কি সুন্দর দেখতে। এ যে একেবারে যশোদা দুলাল। এ-বাড়ির কথাবার্তাই এই রকমের। বৌদির ঘরে একটা ছবি দেখেছি। মুখটা ঠিক পিলুর মতো। মাথায় ময়ূরের পালক—ওটা না থাকলে হুবহু পিলুর ছবি হয়ে যেত। বৌদি বলল, লক্ষ্মী ওকেও দুটো খেতে দে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দুপুরে মার প্রসাদ খেয়ে যাবে। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিন্তু যেও না।

এ সময় আমার গম্ভীর থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। পিলুকে এরা জানে না। পিলু যদি আসকারা পেয়ে যায় তবে এমন সুস্বাদু খাবার হাতছাড়া করে নড়বেই না। পিলু আরও একজন আশ্রিতজন হয়ে যেতে পারে ভাবতেই আমার কেমন সম্ভ্রমে লাগল। যেভাবেই হোক পিলুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্মীর ছোটাছুটি বেড়ে গেছে। সে পিলুর জন্য দুটো কলা, এক বাটি মুড়ি, চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে এসেছে। পিলু এখন খুব ভালো ছেলে। সে কলা দুটো খেয়ে ফেলল, কাঁচাগোল্লা খেল। মুড়ি খেল। তারপর আমার পড়ে থাকা বাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

—খাবি।

—তুই খাবি না দাদা?

—না!

—দে। বলে সে বাকি দুটো কাঁচাগোল্লা খেয়ে ঢেকুর তুলে বলল, এদের বাড়িতে কাঁচাগোল্লার গাছ আছে নারে দাদা?

—তাই। আমার ক্ষোভে দুঃখে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পিলু তুই বুঝলি না, এ বাড়ির আমি কে? লক্ষ্মী বৌদি নটু পটু না কি ভাবল! আমরা হাভাতে, তাই বলে লোকের কাছেও সেটা প্রকাশ করতে হবে। তোর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হবে। ভালো খাবার দেখলে তুই মাথা ঠিক রাখতে পারিস না। এসব কথা বললে পিলু দুঃখ পেতে পারে, বলাও যায় না—বড় অবোধ আমার এই ভাইটি। নটু পটু দাঁড়িয়েছিল—খাওয়া হলেই তাকে নিয়ে যাবে—ঘুরবে, সব গাছপালার ভিতর হেঁটে বেড়াবে—সমবয়সী হলে যা হয়। ওরা আমার শুধু অনুমতির অপেক্ষায় আছে। নটু পটুকে বললাম, তোমরা এখন যাও।

ওরা চলে গেল। পিলু অবাক হয়ে দেখল। দাদাটার কি প্রভাব প্রতিপত্তি। সে তো তার দাদাকে একদম মানে না। আর সে দাদার এমন গম্ভীর ভারিক্কি মুখ কখনও দেখেনি। সে যেন কিছুটা ঘাবড়েই গেল। বলল, দাদারে আমি চলে যাব?

—এখুনি যা।

—খেতে বলল যে!

—আর একদিন খাবি। ওকে বলতে পারতাম, ওরা জানে আমরা খুব গরিব পিলু। গরিব হলেই কি সব সময় হাভাতে হতে হয়। তুই বাবার মানসম্ভ্রম বুঝবি না। কিন্তু সেসব বলতে কষ্ট হলো। সে চুপচাপ বের হয়ে গেল। লাফিয়ে নেমে গেল রোয়াক থেকে। তারপর রেললাইন পার হয়ে গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিলু চলে যেতেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হলো, বের হয়ে ডাকি—পিলু যাস না। খেয়ে যাবি! এমন সুস্বাদু খাবার পিলু কতদিন খায়নি। টানাটানির সংসারে নিত্য দিনের খাওয়া খুব একটা ভালো হয় না। পিলু এখানে খেলে বাড়ি গিয়ে বলত, মা কালীবাড়িতে ভোজ খেয়ে এসেছি। শুধু মাকে কেন, যাবার সময় নবমীকেও খবরটা দিয়ে যেত। কি সরু চাল নবমী, আর কি সুঘ্রাণ! পাঁঠার মাংস এক বাটি। মুগের ডাল, মাছভাজা, টক মিষ্টি। কালীবাড়িতে শনি-মঙ্গলবারে এত প্রসাদ হয় কি বলব! ভোগের রান্না, স্বাদই আলাদা। মুখে লেগে আছে। তোমাকে

একদিন ধরে ধরে নিয়ে যাব। তারপর মনে হল ভালোই হয়েছে। পিলুর বড় পেটুক স্বভাব! খাবার লোভে পড়ে গেলে সে সহজে নড়তে চায় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ এসে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বাড়িতে খাওয়া নিয়ে যত ঝামেলা তার। সে মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বাজার না হলে সে নিজেই যায় ডোবা নালায়। কুঁচো চিংড়ি, কাঁকড়া যা পায় কোঁচড়ে করে নিয়ে আসে। আর মাংস কেনার এত পয়সা কোথায়। একবার মাংস খাব খাব করছিল—কিন্তু হয় না। সে নিজেই গুলতি মেরে দুটো খরগোশ শিকার করে নিয়ে এল।

নটু পটু দুবার উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মুখ গম্ভীর দেখে ঢুকতে সাহস পায়নি। তবু নটু একবার সাহস করে ঢুকে বলল, পিলু কোথায় স্যার?

—পিলু? পিলু তো চলে গেল।

—পিলু চলে গেছে! মা যে বলল, মাস্টারের ভাই এয়েছে। ও খাবে এখানে। রান্নাঘরে খবর দিল।

লক্ষ্মীও হাজির, কৈগো মাস্টার তোমার ভাইটি কোথায়! বদরিদা ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। দেখতে চেয়েছে।

ওরা কি ভাবে! পিলু কি সং। ভিতরে আমার কেমন অহংকারে বাধল। তারপরই মনে হলো, আমি অন্যায় অভিমানে ভুগছি। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে। সব মানুষ সমান হয় না। পিলুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছি ঠিক, বাবারও সম্ভ্রম রক্ষা করা গেছে—কিন্তু ঠিক মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়নি। এমন একটা সরল বালকের প্রতি আমি ভারি অবিচার করেছি। ততক্ষণে খবরটা ভিতরে পৌঁছে গেছে।

লক্ষ্মী কলসী কাঁখে ঠায় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। আর হাজার রকমের প্রশ্ন, চলে গেল কেন?

—চলে গেছে। আমি কি করব। নিজের ইচ্ছায় এসেছিল, নিজের ইচ্ছাতে চলে গেছে। ও কারো কথা শোনার পাত্র নয়।

—তুমি মিছে কথা বলছ মাস্টার। কালীর থানে মিছে কথা বলতে হয় না জান! যেচে খেতে এসেছে ভেবেছ!

আমার ভিতরে ক্ষোভ বাড়ছিল। মেয়েটার এমন রূঢ় কথা আমার সহ্য হচ্ছে না। মিছে কথা বলছি, তুই তো এ বাড়িতে জল তুলিস, খেটে খাস—তোর এত আস্পর্ধা হয় কি করে! বললাম, লক্ষ্মী তুমি পিলুকে চেন না। মিছে কথা বলার কি আছে।

কিন্তু যখন বৌদি আর বদরিদা এলেন, আমার সত্যি তালগোল পাকিয়ে গেল। এবার আর খুব জোর ছিল না কথায়। বদরিদা বললেন, কোথায় সে? কোথায় গেল!

লক্ষ্মীই জবাব দিল, কোথায় আবার যাবে! বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মাস্টার। সম্ভ্রমে লাগে।

মেয়েটা এত বোঝে কি করে। কিন্তু সবার সামনে লক্ষ্মীকে বলতেও পারছি না, কেন বাজে বকছ। সম্ভ্রমের কি আছে। আমিও তো আশ্রিতজন।

বদরিদা রোগা মানুষ। গলায় লম্বা পৈতা। খদ্দরের মোটা ধুতি মালকোচা করে পরা। দেখলে মনে হবে, যেন ক্ষিপ্ত হয়েই ভিতর বাড়ি থেকে উঠে এসেছেন। কিন্তু আমি জানি, এই অমায়িক মানুষটির ভিতরে একটা বড় মাপের মানুষ বাস করে। তার কাছে মিছে কথা বলতেও বাধছে। বৌদি শুধু বলল, মাস্টার এটা ভালো কাজ হলো না। কতদূর থেকে দাদাকে দেখতে এয়েছে। আবার যাবে রোদে!

আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললাম, বাড়িতে কিছু বলে আসেনি। খেয়েদেয়ে ফিরলে বাবা মা খুব চিন্তায় পড়ে যেতেন।

বৌদি-দাদা কথাটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেয়ে আর কিছু বললেন না। নটু পটু পিছনে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। ওকে বড় ভয় করছে। সে সবার সামনেই না বলে দেয়, সব মিছে কথা। মাস্টারের বানানো কথা। কি নিষ্ঠুররে বাবা! ভাইটাকে দুটো ভালো মন্দ খেতে পর্যন্ত দিল না।

খেতে খেতে বেলা দুটো আড়াইটা বেজে যায় এবাড়িতে। ভোগের রান্না শেষ হয় দেরি করে। পাঁঠা বলি হয় বারোটার মধ্যে, মানুষের তো মানতের শেষ নেই। যারা বলি পছন্দ করে না, পাঁঠা

উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। শনি মঙ্গলবারে একটা দুটো ছাড়া পাঁঠা থাকেই। দিনে দিনে এরা জমে যায়। বাড়ে— বড় হয়। শনি মঙ্গলবারে মানতের পাঁঠা না পাওয়া গেলে, ছাড়া পাঁঠা বলি হয়। ওদিকটায় আমি যাই না। ঘরের মধ্যে বসেই টের পাই কার্তিক রামদা নিয়ে এগোচ্ছে। ঢাক কাঁসি এবং গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ হলেই বুকটা আমার কাঁপে। পাঁঠা ধরার লোক ধনঞ্জয়। সে সকাল সকাল চান করে মন্দিরে এ দিনে চলে যায়।

পিলু চলে যাবার পর আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। এমনকি মন্ত্রপাঠ ঢাক-ঢোলের বাজনা সব কিছুতেই মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে। ঝিল থেকে স্নান সেরে আসার সময় দেখেছিলাম—কত বিচিত্র মানুষ মন্দিরের চারপাশে জড় হয়ে আছে। সাধু, ভিখিরি, ছেলেমেয়ে বউ বুড়ি গর্দানমোটা ব্যবসায়ী, জমিদার বাড়ির মানুষজন সব যে যার মতো অশ্বত্থ গাছগুলির নিচে শুয়ে বসে আছে। চা খাচ্ছে ফ্লাস্ক থেকে। পিলু এসেছিল দাদাকে শুধু দেখতে। তার কিছু আশা ছিল না। এত মানুষের মধ্যে পিলু থাকলে কি আর বেশি বাড়তি মানুষ হতো। লক্ষ্মী এসে বলল, খেতে যান গো মাস্টার! খাবার দেওয়া হয়েছে।

বলার ইচ্ছে ছিল, খিদে পায়নি। কিন্তু জানি কথাটা লক্ষ্মী শেষও করতে দেবে না। খিদে পায়নি কেন? মন খারাপ। অত দেমাক ভালোনাগো মাস্টার। কালীর থানে এয়েছ, কপালে না থাকলে হয় না। মান অভিমান কমাও। গরিব বলে কি মানুষ ছোট হয়ে যায়।

খেতে গেলাম অগত্যা। কিন্তু খেতে পারলাম না। বার বারই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। পিলুটা হয়ত ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে গেছে। কিছু ভাজা, কুমড়ো ফুলের বড়া আর কি বেশি রান্না হতে পারে। দুই চৌধুরী থাকার সময়ই বাবা ফতুর। আমার উপার্জনের টাকাও বোধহয় শেষ। খাওয়া-দাওয়া কষ্টে চলছে এখানে থেকেও তা বুঝতে পারি। লক্ষ্মী বারান্দায় একপাশে দাঁড়িয়ে। কলাপাতায় নুন, লেবু, কাঁচালঙ্কা জল সে সবাইকে দেয়। তার চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন বলে, চোখ ঝাপসা হলে মুখ নিচু করে রেখেছি। যতদূর জানি ভিতরের দুঃখটা কেউ টের পায়নি। লক্ষ্মীকেও পেতে দিইনি। চুপচাপ খেয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলাম। তক্তপোশে মাদুর পেতে জানলা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছি। চোখে হাত রেখে কত কিছু ভাবছি। নতুন জীবন শুরু। বদরিদা দু-একদিনের মধ্যে কলেজে যাবেন বলেছেন আমাকে নিয়ে। ভর্তি করার দায়িত্বটা মানুকাকার কথায় তিনিই ভার নিয়েছেন। মানুকাকা নাকি বলেছেন, বাবা খুব অসহায় মানুষ! তা বলতেই পারেন। যজনযাজন ছাড়া তাঁর আর কিছু কাজ জানা নেই। এদেশের মানুষদের এমনিতেই ধারণা, দেশ ছেড়ে এসে সবাই কুলীন বামুন কায়েত হয়ে গেছে। বাবা যে তেমন নয় কে জানে। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সময় লাগে।

আর তখনি কার মৃদু পায়ের শব্দ। টেবিলে খুটখুট করছে। নটু আসতে পারে পটুও। এরাও আমার পাশে শুয়ে দিবানিদ্রা দেবে। বদরিদা ওদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পাশে শোয় ঠিক, কিন্তু ঘুমাতে চায় না। এ-পাশ ও-পাশ করে। কখনও দু'জনে মারামারি পর্যন্ত শুরু করে দেয়। সবকিছুর মীমাংসা আমাকে করতে হয়। চোখ খুলে দেখলাম, তারা কেউ কিনা। না। তারা নয়। লক্ষ্মী। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খেলে না কেন মাস্টার।

একটা কড়া জবাব দেব ভাবলাম। কিন্তু চোখ দুটো এত মায়াবী যে কড়া কথা বলা গেল না। আমি খাইনি বলে যেন এক গোপন কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে। থাকতে না পেরে এখানে চলে এসেছে। বললাম, খেলাম তো।

—এটা খাওয়া। তুমি কতটা খাও আমি দেখি না। তুমি খেতে খেতে চোখের জল ফেলছিলে কেন?

—লক্ষ্মী! কেমন চিৎকার করে উঠতে গিয়েও পারলাম না। পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, এখন যাও। আমি ঘুমাব।

—ঘুমাতে কে বারণ করেছে। ঘুমাও না। তাই বলে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

একবার বলার ইচ্ছে হল, তুমি কি এ বাড়ির গোয়েন্দা। বৌদিকে না আবার বলে দেয়। ওরা তবে কি ভাববে! উঠে বসলাম। ধরা পড়ে গেছি যখন উপায় কি! বললাম, কাউকে বলো না।

লক্ষ্মী কেমন মাথা নিচু করে বলল, তুমি এটা মাস্টার ভাবলে কি করে আমি সবাইকে বলে

বেড়াব। আমি ছোট জাতের বলে মনটা ছোট হবে কেন। কালীর থানে থাকলে মন ছোট রাখতে নেই। তিনি তো সব দেখতে পান। গোঁসা হবে না তাঁর।

এ-হেন মেয়েটির সঙ্গে আমি কথায় কি করে পারি। চুপচাপ থাকলাম। লক্ষ্মী তবু দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। কি ভাবছে কে জানে। লক্ষ্মী গায়ে কিছু পরে না। অথচ শরীর আশ্চর্যভাবে ঢেকে ঢুকে রাখতে শিখেছে। এ বয়সটা এমন যে সব কিছু ফুটে বের হতে চায়। লক্ষ্মী টের প্রায় বলেই শরীর নিয়ে এবং তার ডুরে শাড়ি নিয়ে সব সময় খুব সতর্ক থাকে। আমার ঘরে হুট হাট চলে আসে, ওতে আমি শঙ্কিত থাকি। এই সেদিনও এটা ছিল না। ছোড়দির কথা মতো সব করতে পারতাম। ছোড়দির পিছনে সাইকেলে চেপে কতদিন দামোদরের পাড়ে চলে গেছি। নদীর চরায় হেঁটে বেড়িয়েছি। ছোড়দি কত কথা বলত, বিলু তুই বড় হবি কিন্তু। পিলু ছোড়দি মা বাবা সবাই চায় আমি বড় হই। সেই বড় হওয়াটা লক্ষ্মীও চায় বুঝি। কলেজে যাবার দিন দেখলাম, আমার একটা মাত্র ফুলপ্যান্ট ধুয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। আমি কি পরে যাব না যাব, আমার চেয়ে লক্ষ্মী সেটা যেন বেশি জানে। কে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে! বৌদি, বদরিদা না সে নিজেই এভাবে মানুষের দায়িত্ব নিতে ভালোবাসে। অন্যমনস্ক হলেই দেখছি লক্ষ্মী কখন এসে আমার জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে গেছে। বুঝতে পারছি সাপের খোলস ছাড়ার মতো আমার পুরনো খোলসটা এবার শরীর থেকে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে। নতুন খোলস—নতুন এক আশ্চর্য ছাপ এবং দারুচিনি গাছের মতো সুঘ্রাণ—কে যেন ধীরে ধীরে এসে একটা সঠিক আস্তানা গাড়তে চাইছে। তার জন্য প্রায় জানালায় অথবা জ্যোৎস্না রাত্রে, কোন নিরিবিলি আকাশের নিচে নক্ষত্র দেখতে দেখতে ভাবি সে কে! সে কোনো রহস্যময়ী নারী—যে আমায় কোনো ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। পিলু সেটা টের পেয়ে গেছে কিনা কে জানে। সে আর আসে না। প্রায়ই জানালায় মনে হয় সে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, দাদা আমি রে। সেই স্বর্গীয় হাসিটি লেগে থাকবে পিলুর মুখে। আমি বলব, আয় ভিতরে আয়। আজ তুই এখানেই খেয়ে যাবি। লক্ষ্মী টের পেয়ে বলেছিল, বাড়ি যাও না মাস্টার। ভাইয়ের জন্য মন কেমন করছে!

কেমন উদাস গলায় বললাম, অনেকের জন্যই মন কেমন করে। কিন্তু কাউকে বলতে পারি না। পিলু কেবল সেটা ধরে ফেলেছে। সে আর সে-ভাবে বুঝি আমার কাছে আসবে না। লক্ষ্মী কি বুঝে মাথা নিচু করে রাখল। যে মেয়েটা সারাদিন চোপা করে তার চোখও দেখলাম কেমন জলে ভার হয়ে উঠছে। ধরা পড়ে যাবে বলে, সে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল।

এরপর অনেকদিন লক্ষ্মী আমার সামনে আসেনি। তাকে আর আগের মতো কাছাকাছি দেখতে পাই না।

রাতে যখন খেতে যাই ভিতর বাড়িতে তখন সে বিছানা করে রাখে। কলেজ থেকে ফিরে দেখি আমার বইপত্র খাতা সব তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। সকালের খাবার নটু পটুকে নিয়ে আসতে হয়। আমারটাও তারাই নিয়ে আসে। লক্ষ্মীকে কাছে পাবার যা কিছু উপলক্ষ্য ছিল, সব থেকেই সে কেমন দূরে সরে থাকছে। লক্ষ্মী যত দূরে সরে যাচ্ছিল, তত ভিতরে এক আশ্চর্য টান বোধ করছি। সে দূরে থেকে আমার সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। আমার সব কিছুতেই তার অদৃশ্য হাত কাজ করে চলেছে। এমন কি সে আমার জন্য আলাদা স্নানের জলও তুলে রাখে। জামাপ্যান্ট ধুয়ে মেলে দেয়। তারপর যেখানে যা রাখবার রেখে দেয়। সাঁঝবেলায় জানি লক্ষ্মী জল আনতে যাবে ঝিলে। তাকে সেখানে একা পেতে পারি ভেবেই কেন যে গিয়ে সিঁড়ির চাতালে বসে থাকলাম। লক্ষ্মী এল, দুবার জল নিয়ে গেল। সে যেন আমাকে চিনতেই পারে না। মরিয়া হয়ে শেষ বেলায় বললাম, লক্ষ্মী, দাদাকে বলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছি। মজা বুঝবে। লক্ষ্মী কেমন আঁৎকে উঠল। লক্ষ্মী ভারি যুবতী নারীর মতো বলল, মাস্টার, কপালে আমার সয় না। সে মানুষটার অনিষ্ট হোক আমি চাই না। এই ভাল আছি। এইটুকু বলে সে চলে গেল। বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মী নিজেকে আর জড়াতে চায় না। তার ধারণা, সে মানুষের জন্য টান বোধ করলে জগৎ-জননী রাগ করে। তাকে কেড়ে নেয়। সে সারা জীবনের জন্য বোধহয় এইখানে সেবাদাসী হয়ে পড়ে থাকতে চায়। আর কিছু জীবনে তার কাম্য নয়।

ঝিলে কিছু পাখি উড়ে এল, ওপাড়ের বাঁশবনে কারা আগুন জ্বেলেছে। শীত শীত করছিল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আকাশে কিছু নক্ষত্র। নিরিবিলি এক জনশূন্য পৃথিবীর আমি বাসিন্দা। মানুষের কত রকমের সংস্কার গড়ে ওঠে বড় হয়ে উঠতে উঠতে। এক সময় দেখলাম, লক্ষ্মী লণ্ঠন হাতে চলে এসেছে। হাতে শীতের চাদর। শুধু বলল, বাড়ি চল মাস্টার। ঠান্ডা লাগবে। এটা গায়ে দাও। ঠান্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধালে কে দেখবে।

—কেন তুমি।

—আমি তোমার কে? কেউ না। আমার দায় পড়েছে দেখার। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলি বলল লক্ষ্মী। লণ্ঠনের আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী আমার অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ছে। কিছু একটা না আবার মাস্টারের হয়। সে তারপর বলল, বাড়ি চল মাস্টার। মানুষের মুখে আকথা কুকথা লেগেই থাকে। তুমি আর আমাকে জ্বালিও না। অনেক রাত হয়েছে। এবারে ওঠো। তারপর লক্ষ্মী আমাকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, ভারি ছেলেমানুষ তুমি।

এ কথায় কেন যে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। দৌড়ে গেলাম, সে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনটা কেড়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। —দেখি তোমার মুখ। আমি ছেলেমানুষ, তুমি কে! কেমন মাথাটা লক্ষ্মীর কথায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। প্রায় পাগলের মতোই কাণ্ডটা করে ফেলেছি। —দেখি মুখ, খোল। খোল বলছি। লক্ষ্মীর আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি।

লক্ষ্মী শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রেখেছে। না না দেখ না মাস্টার, পায়ে পড়ি। আমার মুখ দেখলে তোমার অনিষ্ট হবে মাস্টার। তারপরই কেমন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। সত্যি ভারি ছেলেমানুষী করে ফেলেছি। কেউ দেখে ফেললে কি ভাবত! চুপচাপ ঘরে এসে বসলাম। নটু পটুকে বললাম, আজ তোদের ছুটি।

আজ পড়াব না। ওরা চলে গেলে—রেল লাইন ধরে অনেকটা হেঁটে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত—আমার কেন জানি কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন ভিতরে চঞ্চল বালকের মতো এক তীব্র অস্থিরতায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তারপরই দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে সেই নবমী বুড়ির বনটার কাছে এসে গেছি। মানুষ বুঝি শেষ পর্যন্ত এখানেই এসে থামে। কখনও খর রোদ, কখনও জ্যোৎস্না, কখনও গাছপালার নিরন্তর ছায়া। মানুষ এভাবেই সামনে হেঁটে যায়। বনভূমির এক আশ্চর্য নিথর সৌন্দর্যে আমি কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার চাঞ্চল্য কমে গেল। ধীরে ধীরে ফের রেল লাইন ধরে হেঁটে ফিরতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল যেন কারা আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। তাদের পায়ের শব্দ আমাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেন যেতে বলছে। হাহাকার হাসিতে টের পাচ্ছিলাম। তারা আমায় কোন ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। আমি সব ছেড়ে, ঘরবাড়ি ফেলে, এখন সেদিকেই হাঁটছি। উপত্যকার দুই প্রান্তে আমি আর পিলু দাঁড়িয়ে। নির্জন সেই উপত্যকায় আমাদের দু'জনের মাঝখানে কেউ কেবল আঁচল উড়িয়ে নৃত্য করছে। পিলুর আর সেই ডাক 'দাদারে' শুনতে পাচ্ছি না। সে বার বার ডেকেও আমার সাড়া পাচ্ছে না।

এভাবেই আমি বড় হচ্ছিলাম। আমার মান-সম্মান বোধ এখন নানাভাবে আমাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। লক্ষ্মীর আঁচল নিয়ে কাঁড়াকাড়ির বিষয়টা মাঝে মাঝে আমাকে এখনও তাড়া করে। থিতু হয়ে কোথাও যেন বসতে পারি না। কেবল মনে হয়, ওটা আমি কী করতে যাচ্ছিলাম। আমরা দু'জনই এ বাড়ির আশ্রিত। কেউ দেখে ফেললে কী না জানি হত।

জানালায় বসে আছি। সামনে বড় একটা নিম গাছ। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সব। সামনের রেল-লাইনের ওপারটা দেখা যাচ্ছে না। সব আবছা মতো হয়ে আছে। আজকাল লক্ষ্মী আবার আমার ঘরে আসছে। সেদিনের সেই সব কথার পর লক্ষ্মী আমাকে কিছুদিন এড়িয়ে চলত। এমনকি ভিতর বাড়িতে জলখাবার দিলে, লক্ষ্মীর গলা পেতাম। মাস্টার তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। ভিতরে গেলে লক্ষ্মীকে দেখতে পেতাম না। সব সময় এদিক ওদিক সে অদৃশ্য হয়ে থাকত। কখনও

অভিমানবশে ভিতরে না গেলে নটু পটু আমার জলখাবার নিয়ে আসত। ভারি অভিমানে ভুগতাম। লক্ষ্মীর তো কত কাজ। সে হয়ত সময়ই পাচ্ছে না, দরজার ওপাশ থেকে আমাকে ডেকে দিয়েই অন্য কোন ঘরে ঢুকে গেছে। দেবস্থানে কত রকমের কাজ থাকে। মন্দিরের চাতাল থেকে রান্নাবাড়ি ধোওয়া-মোছার কাজটা লক্ষ্মীর। ঘরে ঘরে ঝাড়পোঁছ দেওয়া, সবার জামাকাপড় কাচা, মায় আমার স্নানের জল তোলার কাজটা সে ইচ্ছে করেই হাতে নিয়ে নিয়েছে। তাকে আমি সব সময় দেখতে পাব আশা করা ঠিক না। তবু আমার মনে হত লক্ষ্মী আমার চোখের সামনে আসতে চাইছে না। দেখা হলে চকিতে, একবার চোখ তুলেই খুব জরুরী কাজের ভান করে তার সরে পড়াটা আমার মান-সম্মানে বড় লাগত। লক্ষ্মীর কাছে বোধহয় আমি খুব ছোট হয়ে গেছি।

এর মধ্যে একদিন লক্ষ্মী আমাকে দেখে ফিক করে হেসে দিয়েছিল। লক্ষ্মীর চোখ এমনিতেই বড়। হাসলে আরও বড় দেখায়। এতে ওর নারী মহিমা বাড়ে সে বুঝতে পারে। আমার ভিতরের কাতর ভাবটা কি লক্ষ্মী টের পেয়ে গেছে! ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি। চোখে মুখে এমন কোন ভাব কি ফুটে উঠছে? না'লে মজা করে এমন হাসার কী দরকার লক্ষ্মীর। আজ যদি লক্ষ্মী জলখাবার দিতে আসে সেই আশায় বসে আছি।

নটু পটু বড়দিনের ছুটি বলে মাসির বাড়ি গেছে। সামনে পরীক্ষা। পড়ার চাপ খুব। এ-ক'দিন ছাত্র পড়াবার কাজটা সকালে নেই বলে নিজের পড়ায় একটু বেশি মনোযোগ দেব ভাবছি। কিন্তু মাথার মধ্যে লক্ষ্মীকে একা পাওয়ার সুযোগটা বড় বেশি দাপাদাপি করছে। পড়ায় মন দিতে পারছি না।

মনে মনে পড়ার চেষ্টা করছি। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। মাথায় কিছু ঢুকছে না। ঘরে ঢোকার আগে লক্ষ্মী বেশ দুপদাপ শব্দ করে। সে যে আসছে জানান দেয়।

জোরে পড়লে তার দুপদাপ শব্দ শুনতে পাব না। তাই মনে মনে পড়া। এমন একটা বিতিকিচ্ছি চিন্তা মাথায় থাকলে কিছুতেই পড়া হয় না। লক্ষ্মীকে কথাটা বলা দরকার। ও ভুল বুঝলে আমার মনুষ্যত্বে কোথায় যেন লাগে। বার বার লক্ষ্মীর সঙ্গে কিভাবে কথা শুরু করব, কিভাবে বলব, লক্ষ্মী আমি কিন্তু তোমার কথায় ভারি রেগে গিয়ে কাজটা করে ফেলেছিলাম। আমার অন্য কোন ইচ্ছে ছিল না। তুমি আমাকে খারাপ ভেব না। এইসব কথার মধ্যেই মনে হয় ভেতরে আমার কোন খারাপ ইচ্ছে ছিল। এ সময় কেমন অপরাধবোধে আরও ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। লক্ষ্মী জলখাবার দিতে এলেও কথাটা বলতে পারতাম না। সেই ঘটনার পর থেকে কতবার যে ভেবেছি লক্ষ্মীকে একা পেলে সব বুঝিয়ে বলব। দেখার সঙ্গে কী অন্য কোন ইঙ্গিত ছিল তার কথায়! লক্ষ্মী নিজেকে ছোটজাতের মেয়ে ভাবে। তার দু'বার বিয়ে এবং বৈধব্য দুই ঈশ্বর নির্দিষ্ট। কোন মানুষই তার কপালে সয় না। সে আর আমাকে তার সঙ্গে জড়াতে চায় না। মেয়েটা এখনও তার বালিকা বয়সই পার করতে পারেনি। চোখে মুখে বালিকা বয়সের ছাপ খুব বেশি একটা না থাকলেও বোঝা যায়, বয়সে ও আমার ছোটই হবে। এই বয়সেই লক্ষ্মী জীবনের সেই রহস্য জেনে গেছে। যা ভাবলে আমার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে।

মনে মনে বললাম, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে জড়াব কেন। তোমার এত আস্পর্ধা হয় কী করে। তারপরই মনে হল, কথাটা জোর করে বলছি। বাড়ির একজন গৃহশিক্ষকের পক্ষে একজন ঝি-মেয়ের সঙ্গে জড়ানোটা অসমীচীন। সে বোধ আমার প্রকট। ভাবলাম লক্ষ্মীকে সেভাবেই কথা বলব। —তুমি এতটা আশা করলে কী করে! তোমার আস্পর্ধা খুব দেখছি। তারপরই মনে হল, যাই বলি না কেন, ওকে এমন রূঢ় কথা কখনও বলতে পারব না। আমার সে সাহসই নেই। আস্পর্ধা কথাটা বার বার বিড় বিড় করে বকছি। আর বুঝতে পারছি লক্ষ্মীর প্রতি প্রবল এক আকর্ষণ বোধ করছি। মানুষের যে কী হয়! ও কখনও আমার জামা প্যান্ট ঠিকঠাক করে না রাখলে, বই খাতা তুলে তাকে সাজিয়ে না রাখলে কষ্ট পাই। লক্ষ্মী নিজেই যে কাজটা হাতে তুলে নিয়েছিল তা নিয়ে তার আবার অবহেলা কেন। আঁচল কাড়াকাড়ির পর থেকে রোজ কলেজ থেকে ফিরে ভেবেছি, আজ সব কিছু ঠিকঠাক দেখব। আমার পাজামা গেঞ্জি চেয়ারে ভাঁজ করা, আমার লন্ডভন্ড বইয়ের জঙ্গল আর নেই। সব সাজিয়ে গুছিয়ে লক্ষ্মী ছিমছাম করে রেখেছে। ফিরে এসে দেখতাম, না লক্ষ্মী এই ঘরেই ঢোকেনি।

লক্ষ্মীর কোন সাড়া শব্দ নেই বাড়িতে। যে মেয়েটা এত চোপা করত সব কাজে সে কেমন ভারি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছে।

আর তখনই মনে হল কেউ আসছে। তাড়াতাড়ি আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম এবং পাঠ্য বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। বড় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি, কোন বাহ্যজ্ঞান নেই এমন অভিনয় আর বুকে বড় ঢিপঢিপ শব্দ—লক্ষ্মীই হবে। লক্ষ্মী আমার জলখাবার হাতে ঘরে ঢুকছে। আমি তাকাচ্ছি না। কে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জানি না, পড়াটা ক্রমে আরও জোরে উচ্চস্বরে অন্য এক লয়ে উঠে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী ডাকল, মাস্টার তোমার জলখাবার।

—রাখ। এই পর্যন্ত। লক্ষ্মীকে দেখে যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছি এবং আমার কিছু কথা আছে ওর সঙ্গে ভুলেই গেছি। আসলে এটাই আমার স্বভাব। আবেগ বড় বেশি। যেন লক্ষ্মীকে এখন কিছু বললেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। পড়ার চেয়ে খাওয়াটা আমার বড় নয়, তুমি এখন যাও—অবশ্য সবটাই মনে মনে—লক্ষ্মী গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। হয়ত এক্ষুনি ঝামটা মেরে কথা বলবে, ওঠো ওঠো—কি ছিরি ঘরের। বাড়িতে কে দেখত। কিন্তু লক্ষ্মী কিছু বলছে না। দাঁড়িয়েই আছে। বললাম, লক্ষ্মী তুমি অতি তরলমতি বালিকা। কথাগুলি আমার কানেই কেমন যেন শোনাল। যেন আমি বলছি না, প্রৌঢ় কোন মানুষ কথাটা বলছে। সাধু ভাষা প্রয়োগে কি বেশি সুবিধা, এতে কী কথাবার্তার গুরুত্ব বাড়ে।

লক্ষ্মী বলল, বৌদি বলেছে, শরীর খারাপ, রান্না-বাড়িতেই আজ খেয়ে নেবে।

কেমন আচমকা ঠোক্কর খেলাম। দেবস্থানে দু'ভাবে রান্নার ব্যবস্থা। সরকারী, বেসরকারী। সরকারী রান্না তীর্থযাত্রীদের জন্য। যারা দেবস্থানে মানত দিতে আসে তারা টাকা দিয়ে প্রসাদ পায়। আর বাড়ির মানুষজনের রান্না বৌদি নিজ হাতে করেন। নটু-পটুর ছুটি। শুধু আমারই কলেজ—দশটায় ভাত-ডাল-মাছ।

বৌদির শরীর ভাল না কেন?

সে আমি জানব কি করে?

কি হয়েছে?

আমাকে তরলমতি বললে কেন, বলব না।

তরলমতি বালিকাই তো?

না বলবে না। আমি বালিকা নই।

তবে তুমি কি?

আমি লক্ষ্মী। কেমন গম্ভীর গলায় কথাটা বলল।

এতক্ষণে আমার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল, তা অনেকটা প্রশমন হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে থাকলে বুঝি সবই গুছিয়ে বলা যায়। বললাম, লক্ষ্মী সেদিন তুমি কী না ভাবলে! তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

লক্ষ্মী বলল, কোনদিন।

ঐ তো সেদিন। তুমি ঠিক কিছু ভেবেছ।

ভাবব না! ওভাবে কেউ আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। আমি মেয়েমানুষ না। তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে মাস্টার। কেউ দেখে ফেললে কী হ'ত।

তুমি আমাকে ছেলেমানুষ বললে কেন?

মাস্টার তোমার ভারি গুমর। এত গুমর ভাল না।

লক্ষ্মী কি মনে করিয়ে দিতে চায়, সে এ বাড়ির মাস্টার বলে যা তা করতে পারে না। বললাম, গুমরের কী দেখলে?

বৌদি কত করে বলল, তোমার ভাইটিকে নিয়ে আসতে, তুমি কিছুতেই আনলে না।

লক্ষ্মীকে কী করে বোঝাই আমরা খুব গরীব। আমার পোশাক-আশাক দেখেও তো বুঝতে পারে। ভাইটা যেভাবে এ বাড়িতে এসেছিল, তা দেখেও বুঝতে পারে। কিন্তু বুঝতে না চাইলে কী করতে পারি। ভাইটার খাবার বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান বড় কম। সুস্বাদু খাবার পেলে সে আর উঠতে চায় না।

লোভে পড়ে যায়। রোজই এসে তবে জানালায় উঁকি দিয়ে বলবে, দাদারে আমি। গরীব বলে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে কেউ টের পেলে আমার বড় লাগে।

—সেজন্য তুমি রাগ করেছ?

—রাগ। রাগের কী দেখলে।

—না এই যে তোমাকে আর দেখা যায় না।

—তোমার সামনে হাবার মতো সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি!

—তার মানে?

—তুমি মনে কর আমি কিছু বুঝি না। তোমার সঙ্গে আমার কথা বলাই অন্যায় হয়েছে।

—তুমি যাও লক্ষ্মী। আমার পড়া আছে।

—যাব কেন। যাব না। দাঁড়িয়ে থাকব! তোমার কথাতে যাব? তোমার বাড়ি?

—লক্ষ্মী তোমার চোপা করার স্বভাবটা গেল না।

আমার কোন কথাই সে গ্রাহ্য করে না। তক্তপোশে পা দুলিয়ে বসল। ওর খালি গা। প্রকৃতির সুষমা ওর শরীরে। শাড়ির আঁচল দিয়ে আশ্চর্যভাবে গা ঢেকে রাখে। এতটুকু আলগা স্বভাবের না। এ ঘরে এলে আরও বেশি! উঠতি বয়সে এ-সব বোধহয় হয়। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কোন শ্লথ আচরণ লক্ষ্মীকে আস্কারা দিতে পারে, আমি বললাম, তুমি যাবে না?

কী কথা আছে বললে!

এমনই হয়, কথা বড় হারিয়ে ফেলি। আমার কিছু বলা হয় না। কেবল বললাম তুমি আমাকে খারাপ ভেব না।

—তুমি কী মাস্টার! ওঠো, তোমার প্যানপ্যানে স্বভাব যাবে না। আমার অনেক কাজ। বলে লক্ষ্মী ঝাঁটা নিয়ে এল। ঘর-দোর ঝাঁট দেবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, খাও। না খেলে ঝাঁট দি কি করে?

সামনের রাস্তায় রিকশা যাচ্ছে। নিমগাছ থেকে পাতা ঝরছে। একটা ইঞ্জিন গেল হুশ শব্দ করে। তখন লক্ষ্মী বলল, তোমার এই কথা!

আর কি কথা আশা করে লক্ষ্মী। বললাম, তুমি এখানে কবে থেকে আছ?

—মনে নেই।

—আমি তোমাকে খুব কষ্ট দি। সেদিন সত্যি কী যে হ'ল।

—তোমার রামায়ণ পাঠ আমার ভাল্লাগে না। তাড়াতাড়ি খাও। দাদা পূজার ঘরে ঢুকবে। চান করবে। জল তোলা আছে।

পরে ঝাড়ু দিও।

না, এক্ষুণি দেব। তোমার কি ড্যাং ড্যাং করে কলেজে যাবে। আমার মতো খাটতে, বুঝতে ঠ্যালা।

—তুমি আর আমার জল তুলবে না। বিলে চান করে নেব।

—তুলব কি না পরে ভাবব। খাওয়া হ'ল। বাব্বা, মানুষ বটে একখানা। সব সময় গাড়ি রেডি। মনের মধ্যে কী আছে তোমার মাস্টার।

—তুমি জলখাবার নিয়ে আসতে না কেন। ঠিক আমাকে খারাপ ভেবেছ?

—এই তোমার বুদ্ধি মাস্টার। তুমি আমার কী করেছ। বল কী করেছ। খারাপ ভাবব কেন বল।

—ভাবনি তো।

না, না, না।

আমার মুখে এতক্ষণে কেমন প্রসন্ন হাসি খেলে গেল। বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, রাগ ছিল ঠিক।

—রাগ!

—বা রে কলেজ থেকে ফিরে দেখতাম, আমার ঘরে তুমি ঢোকইনি।

—ঢুকি আর চোরের দায়ে ধরা পড়ি।

—একথা কেন?

—তুমি জান না মাস্টার, নটুর দামী কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না।

—তার তুমি কী করবে?

—আমি তো সব করি। দিদি বৌদি ঠেস দিয়ে বলল, তুই করিস, তুই জানিস না, কে জানে?

—ঠিকই তো বলেছে।

—বারে চুরি গেলে আমি কী করব। সব দোষ আমার! বেশ তোমরা। বৌদিকে বলেছি, আর কুটো গাছটি নাড়ব না। সব নবাব। কেউ হাত নেড়ে খাবে না। বই আর গুছিয়ে দি তো আমার নামে কুকুর পুষ।

—তুমি নিয়েছ বৌদি ভাবতেই পারে না। তোমার ওটা ভুল।

—ভুল কি ঠিক সত্যি জানি না মাস্টার। আমরা ছোট জেতের মেয়ে। আমরা সব করতে পারি। আচ্ছা বল, কালীর থানে বাস করে কেউ চুরি করতে পারে। পাপ হবে না?

—এজন্য আসতে না?

—হ্যাঁ। বলে লক্ষ্মী চোখ তুলে তাকাল। শ্যামলা মেয়ের চোখে সেই মায়াবী দৃষ্টি। বললাম, ভিতরে গেছি, তুমি নেই। ডাক শুনি, তুমি নেই। ভাবতাম কী না জানি করে ফেললাম। কোথায় থাকতে?

—তোমার সামনে আসতে লজ্জা লাগত।

—কেন?

—বারে বৌদি যদি ভাবে আমি নিয়েছি তবে তুমি ভাববে না। মেয়েটার ছ্যাঁচড়া স্বভাব ভাববে না। লজ্জা করে না।

আমার ভীষণ হাসি পেল এ জন্য। বললাম, আর আমার মাথায় কত বিদ্‌ঘুটে চিন্তা তোমাকে নিয়ে। জান, ক'রাত আমার ঘুম হয়নি?

আসলে এত কথা লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার—কারণ, এই বাড়িতে লক্ষ্মীর সঙ্গে যেন কোথায় এক গোপন আত্মীয়তা আমার ক্রমে গড়ে উঠেছে। মন খুলে ওর সঙ্গে কথা বললে, কেমন হাল্কা বোধ করি। এ-ক'দিন কী যে গেছে! ভাইটা দুপুরে না খেয়ে চলে যাবার পর লক্ষ্মী আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করেছে। মাস্টার তোমার কাজটা ভাল হয়নি। ছেলেমানুষ কতটা পথ হেঁটে দাদাকে দেখতে এয়েচে আর তাকে তুমি না খাইয়ে পাঠিয়ে দিলে। বৌদি খুব রাগ করেছে। খেতে বসে আমি যে খেতে পারছিলাম না, লক্ষ্মী তাও টের পেয়েছে। এবং কখন দু'ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল, লক্ষ্মীর চোখ থেকে তাও এড়িয়ে যায়নি। একটা মেয়ে যখন এত আমার দেখে বেড়ায় তখন গভীর এক বন্ধুত্ব আপনা থেকেই বুঝি গড়ে ওঠে। লক্ষ্মী ক'দিন এড়িয়ে চলায় মনটা যে ভার হয়েছিল, সব জেনে কেমন হালকা হয়ে গেল। বললাম, ঠিক ভাইকে নিয়ে আসব! তুমি সামলিও। লক্ষ্মী কেমন ত্যারচা করে তাকাল। বলল, একটা আজগুবি দাদাকে সামলাচ্ছি, আর তার ভাইকে পারব না। দেখই না এনে।

ভাইটা সেই ঘটনার পর থেকে এদিকটায় আর একদিনও মাড়ায়নি। ইস্কুল নেই বলে তার অফুরন্ত সময়। বাড়িতে বই-খাতা-পেনসিল বাবা কিনে দিয়েছে এই পর্যন্ত। কাছে-পিঠে স্কুল নেই—শহরের স্কুলে ভর্তি করে দিতেও বাবা ভরসা পাচ্ছেন না। যেন ভাইটা দূরের রাস্তা চিনে ফেললে আর বাড়ি ফিরতে চাইবে না। ওর ওপর বাবার ভরসা কম। যেন বাবার আপ্তবাক্য, বড়টা আগে মানুষ হোক, পরে ছোটটার কথা ভাবা যাবে।

আসলে, আমার মনে হয়, বাবা ধরে নিয়েছেন, পিলুর যে বিদ্যা-বুদ্ধি ওতে করে যজন-যাজনের কাজটা ভালই চলে যাবে। সবাই চাকরি-বাকরি খুঁজলে পৈতৃক ধারাটা রক্ষা করবে কে। ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বাবার বড় প্রবল। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে পুজো-আর্চার লোক না থাকলে গেরস্থের মঙ্গল হবে কি করে। ফলে পিলু যা পড়ছে ওতেই বাবা খুশি। বাড়ির গৃহদেবতার পূজা এখন পিলু বেশ নিপুণভাবেই করতে পারে। উপনয়ন দেশেই হয়ে গেছিল বলে রক্ষা। বাবা পিলুকে তিনবেলা আহ্নিক পাঠেরও অভ্যাস করিয়েছেন। মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে উঠছে। বড়টারও ঈশ্বরপ্রীতির অভাব, মেজটাকে আর তিনি বোধহয় আলগা করে দিতে সাহস পাচ্ছেন না।

মাঝে এক রোববারে বাড়ি গিয়ে টের পেয়েছিলাম, পিলুর অভিমান হয়েছে। সে দাদাকে দেখে আগের মতো কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। সে ব্যাজার মুখে আমাদের খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে মাঠে চলে গেল। বাড়ি গেলে পিলু আমাকে অজস্র খবর দেয়। মা-বাবা কথা বললে রেগে যায় তখন। দাদাকে জরুরী খবর দেবার সময় বাবার সব প্রশ্নই তার কাছে অর্থহীন। মা'র মুখের উপর কথা বলার অভ্যাস তারই আছে। মা কিছু বললেই তার স্বভাব বলা, তুমি চুপ করতো মা। দাদা বুঝলি, ল্যাংরা বিবির হাতাতে সুধন্য ছিপ ফেলে এত বড় মাছ তুলেছে। বলে সে তার দু-হাত প্রসারিত করে বলত, আমিও ধরব। রাজবাড়ির পেয়াদাকে বলেছি, ওকে একটা টিয়ার বাচ্চা দেব। ও রাজি। তারপর সে কি করে হোতার সাঁকোর নিচ থেকে বড় একটা বেলে মাছ ধরেছিল, কবে নবমী বুড়ির খবর নিয়ে ফেরার সময় দুটো ঝুনো নারকেল পেয়েছিল এবং তালের শাঁস কাটতে গিয়ে হাত জখম করেছিল এই সব খবর।

সেদিন বেশিক্ষণ বাড়ি থাকতে পারিনি। বেলায় বেলায় ফিরতে হয়। বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে একা ফিরতে ভয় করে। ফেরার সময় পিলুর সঙ্গে দেখাই হয়নি। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছিল। কালীবাড়িতে ফিরে যাবার সময় ভাইটার সঙ্গে দেখা হবে না ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। গরু নিয়ে মাঠে কী করছে? ডাকাডাকি করেও সাড়া পাইনি। ফিরে আসার পর মনে হয়েছিল ইচ্ছে করেই পিলু লুকিয়ে আছে। বাড়ি থেকে দাদাটা চলে না গেলে সে ফিরবে না।

শীতের বিকেল। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আজ বাড়িতে রাতে থাকব। বেশি দূর না অথচ কদিন মা বাবা ভাইবোনদের দেখতে না পেলে কেমন মনমরা হয়ে যাই। আমার এই বিষণ্ণতা সবার আগে টের পায় লক্ষ্মী, রাতে হয়ত বিছানা করে দিচ্ছে মশারি টাঙাচ্ছে। আর ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে চুরি করে দেখছে। কখনও বলছে বাবাঠাকুর আজ মা কালীর থানে মুতে দিয়েছে।

বাবাঠাকুরের সম্পর্কে আগের মতো ভীতি আর আমার নেই। তিনি মন্দিরেই সারাদিন পড়ে থাকেন। নেংটি পরনে। নেপালী বুড়োর মতো দেখতে। রঙ ফর্সা। ধবধবে। কত বয়স কেউ জানে না। থুতনিতে গুণলে গোটা তিনচার দাড়ি। পূজো দেবার সময় দেবীর প্রতি পেছন ফিরে বসে থাকেন। আর হরদম দেবীর সঙ্গে বচসা, কখনও ছেলেমানুষের মতো কান্না, কখনও হাতে মণ্ডা নিয়ে দেবীর জিভে ঠেসে দেওয়া, খা মাগী খা, আর ঢং দেখাস না। বাবাঠাকুরের কৃপা আছে আমার প্রতি। ক্ষণে ক্ষণে মন্দির থেকে হাঁক আসে, মাস্টার। হাঁক এলে আর কথা নেই, ছুটে যেতে হবে। তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে হাতে মণ্ডা দেবেন। কখনও কুমারসম্ভব আউড়ে যাবেন, তিনি আমাকে কখনও জিভ ভেংচাবেন। আবার হাঁক, বদরি। সঙ্গে সঙ্গে বদরিদা হাজির। বদরিদা থানের সেবাইত তখন কে বলবে! ডাকবেন বউমা, তিনিও হাজির। সবাই হাজির হলে শীতের রাতেই সবাইকে নিয়ে রওনা। তিনি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। কার হিম্মত আছে মুখের উপর বাবাঠাকুরকে কোন প্রশ্ন করে। সেই বাবাঠাকুর দেবীর থানে মুতে দিয়েছে। মন্দিরের সামনে সারবন্দী গাড়ি দেখলেই বোঝা যায় মানুষটার কোথায় একটা বড় রকমের মাহাত্ম্য আছে। হাতে কঞ্চি নিয়ে তাড়া করছেন সব ক'টা ধনাঢ্য পরিবারকে। আমার তখন কেমন ভারি মজা লাগে। আমি আশ্রিত জেনে বাবাঠাকুর আমার প্রতি অন্যরকম। কখনও তিনি এমন ব্যবহার করেন যেন ইয়ার-দোস্ত। আমার তখন ভারি লজ্জা লাগে।

কথায় সাড়া না দিলে কখনও লক্ষ্মী বলেছে, মাস্টার তোমার মন ভাল না। মন ভাল না থাকলে পড়ায় মন বসবে কী করে। বাড়ি থেকে ঘুরে এস।

বাবাঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি যা টের পান না, লক্ষ্মী তা কত সহজে টের পায়। সব সময় ভয় বাড়ির কার না কিছু আবার হল। ভয় বেশি পিলুটার জন্য। যা স্বভাবের ছেলে। জঙ্গলটায় সাপখোপের বড় উপদ্রব। শীতকাল বলে সে ভয়টা কম। তবু সে যা একখানা ছেলে—কোথায় কি ধরতে গিয়ে কার গলা চেপে ধরবে—ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছাব।

এখানে সব গাছই বড় বেশি লম্বা এবং প্রাচীন। দেবদারু গাছের জঙ্গল। কোথাও বড় বড় শিশুগাছ, ডালপালা মেলে পথটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। বড় সুন্দর পথ। কোনো তরুণের পক্ষে এমন পথ ধরে হেঁটে যাওয়া বড় অভিজ্ঞতার বিষয়। বার বার পথটা অতিক্রম করে দেখেছি, সে প্রতিবার

নতুন হয়ে দেখা দেয়। পায়ের নিচে ঝরে পড়া পাতার খসখস শব্দ। ঝিঁঝি পোকার ডাক। কান পাতলে গভীরে আরও সব শব্দমালা উঠে আসে। কখনও কখনও থমকে দাঁড়িয়ে যাই। আশ্চর্য সব পাখির ডাক শুনি, ব্যাঙের ক্লপ ক্লপ শব্দ। কখনও অদূরে কাঠ কাটার একটানা বিচিত্র শব্দতরঙ্গ—সব মিলে এই বনভূমিতে বেঁচে থাকাটাকে রোমাঞ্চকর মনে হয়। এই বনভূমির এক পাশে আমরা যত বড় হয়ে উঠছি ততই জায়গাটার আকর্ষণে পড়ে যাচ্ছি।

বাড়ি ফিরে দেখলাম ঠিক পিলু বাড়ি নেই। মা কল থেকে জল আনতে গেছে। বাবা গেছেন নিবারণ দাসের বাড়ি। মায়া বলল, জানিস দাদা, নিবারণ দাসের মা-টা না মরে গেছে।

ছোট ভাইটা আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরল। কোলে উঠতে চায়। ওকে কোলে তুলে নিলে দেখলাম রাস্তায় ছুটে গেছে মায়া। আমাদের বাড়িটা পার হয়ে কিছুদূরে আরও দু-তিনটে বাড়ি হচ্ছে। লোকজনও এসে গেছে। এরাই প্রথম আমাদের প্রতিবেশী এখানে। মায়ার সঙ্গে কারো কারো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ভাইটাকে আমার জিম্মায় দিয়ে সে যেন কিছুটা হাল্কা হয়ে গেছে। রাস্তায় কি করে যে ওর সমবয়সী আরও দুটো মেয়ে জুটে গেল। ওরা এক্কাদোক্কা খেলছে। খেলার চেয়ে আমাকে দেখার ওদের বেশী আগ্রহ। এ-সময় মায়া যে বড় অহংকারী হয়ে উঠবে জানা কথা। তার দাদাটা কলেজে পড়ে— কত বড় কথা।

দাদা বাড়ি এলে সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মায়ার লাফানো, ছুটে যাওয়া এবং ঘুরে ফিরে গানের সুরে ছড়া কাটা সবটাই আজ একটু বেশি বেশি হবে। আমি বাড়ি ফিরলে মায়া পিলু কীভাবে যে সেটা প্রকাশ করবে ঠিক ওরা বুঝে উঠতে পারে না। যেমন মায়া এখন ছড়া কাটছে—উলু উলু মাদারের ফুল, বর এসেছে কতদূর, বর এসেছে বাঘনাপাড়া, ওলো বউ রান্না চড়া। এ-সব কথার সঠিক অর্থ মায়া হয়তো ভাল করে বোঝেই না—কিন্তু আমার কাছে এই ছন্দমালা, নতুন এক জগৎ তৈরি করে দেয়। নিরিবিলি আমি গোয়ালঘরের ধারে বকনা বাছুরটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। ভাইকে কোলে নিয়ে বাছুরটাকে আদর করি। মাকে দেখতে পাই কলসী কাঁখে ফিরছে পুলিশ ক্যাম্প থেকে। মায়া তার আগেই খবরটা দিতে ছুটে গেছে। এবং বুঝতে পারি মা'র জল নিয়ে ফেরার ছন্দ আরও আরও দ্রুত হয়ে উঠছে। তার বড় ছেলে বাড়ি এসেছে—এমন সুসংবাদে স্থির থাকতে পারছে না মা।

আমাকে দেখেই মা'র মুখ ভারি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা'র কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে। একটা সূতীর চাদর গায়ে। জলে কাঁখের কিছুটা অংশ ভিজে গেছে। চুল খোঁপা বাঁধা। কত চুল। শীতেও মার কপাল ঘামছে। জলের কলসি রেখেই হাঁক-ডাক শুরু করে দিল, মায়া তাড়াতাড়ি কর মা। সাঁজ লাগা। আলো জ্বাল। বাসন পড়ে আছে। পিলু আসে নি! তুই কতক্ষণ।

বললাম, এই ত এলাম। পিলু গেছে কোথায়?

—তোর বাবা বাড়ি না থাকলে এত বাড় বাড়ে।

—আবার কিছু করল নাকি?

বারান্দার জলচৌকিতে বসে কথাটা বললাম।

—দুপুরে বের হয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই। গরুটা কোন্ মাঠে দিয়েছে কে জানে।

—দেখে আসব?

—কোথায় খুঁজবি।

আসলে মা চায় তার বড় ছেলে বাড়িতেই থাক। ঘোরাঘুরি সহ্য হবে না। মা'র কত স্বপ্ন আমাকে নিয়ে। প্রতিবেশীদের কাছে আমার কথা মা'র মুখে লেগেই থাকে। আমার কাছে এসে পৈঁঠায় পা মেলে বসল মা। বলল, গোপাল করের মা তোকে দেখতে চেয়েছে। কাল একবার যাস। মায়া নিয়ে যাবে।

—আমাকে আবার দেখার কি হল।

—ঠাকুরকর্তার বড় ছেলেকে দেখবে দেখবে করছে।

বাবা বাড়িঘর বানাবার পর সেই কবে থেকেই গাঁয়ের লোক, আত্মীয়স্বজনদের চিঠি লিখে চলেছেন। চলে এস। সুমার একটা বনে মানুষজন ঘরবাড়ি বানিয়ে যাচ্ছে। জমি সস্তা। একশো টাকা দিলে এক বিঘা জমি। অনাবাদী উরাট, মানুষের হাত লাগলে কী না হয়। পাশে পুলিশ ক্যাম্প। পরে বাদশাহী সড়ক।

সড়কটা মুর্শিদাবাদের দিকে চলে গেছে! সেই মুর্শিদাবাদ, নবাব সিরাজ, মীরজাফরের দেশ। কিছু দূরে রেল লাইন। পরে শহর। পাশে ভাগীরথী। মা গঙ্গা। মরলেও শান্তি। গঙ্গার পাড়ে দাহ। জীবনের সর্ব সার জননী জাহ্নবী। চাল সবজি সস্তা। চালের মন চোদ্দ পনের টাকা। জলের অভাব নেই। পুলিশ ক্যাম্পে টিউবওয়েল আছে। পুনর্বাসন দপ্তর থেকে শুনতে পাচ্ছি আমাদের ঘরবাড়ির পাশে টিউকল করে দেওয়া হবে। সেই এক কথা, সঙ্গে জল হাওয়া মাটি ঈশ্বর থাকলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আর কী লাগে। গোপাল কর বাবার দেশ বাড়ির যজমান। খুব শৈশবে, একবার কার যেন বিয়ে উপলক্ষে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। রাত্রিবাস। আর ভালমন্দ খাওয়া। যে-জনই আসুক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকতাম। জল-চৌকিতে বসিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া, পাদোদক খাওয়া, এ সবের মধ্যে গোপাল করের মা, সংসারের মঙ্গল নিহিত আছে বুঝি ভাবত। আমার তখন প্রাণান্ত। গোপাল করের বাবার বাজারে ছিল বড় মসলাপাতির দোকান। চক মেলানো উঠোন। বড় পুকুর—বড় মাছ আর লক্ষ্মীর কৃপা সর্বত্র। সাদা ফরাসে নিয়ে বসানো, গুরুদেবের মতো ভক্তি এবং এই করে জীবনে কেবল সম্মান আদায়ের পালা। বাবাই জমি দেখে দিয়েছেন। গোপাল কর লোকজন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করছে। এখানটায় যেই আসে, দু-চারদিন আমাদের বাড়িতে অবস্থান, বাবা তখন খান না-খান, বুঝতে দেন না, অভাব অনটন আছে সংসারে। যে করেই হোক অতিথি সৎকারের কোনো ত্রুটি থাকত না।

সুতরাং সেই ছোট্ট ছেলেটি কত বড় হয়েছে দেখার আগ্রহ গোপাল করের মা'র হতেই পারে। আর এই করে নিজের মধ্যে কে যেন আরও বড় একটা সম্ভ্রমবোধ গড়ে দিয়ে যায়। পিলুটা বোঝে না, হা-ভাতের মতো গিললে বৌদি, লক্ষ্মী, এমন কি নটু পটু পর্যন্ত ভাববে—আমার বাবা সত্যি বড় অভাবী মানুষ!

তখনই মনে হল, পিলুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। গরুটা ছাড়া। গরুটাকে তাড়িয়ে আনছে। দড়ি মাটিতে সেচরাচ্ছে। পিলু হুটহাট করছে। চাদরের তলায় হাত। মা চিৎকার করছে, ওরে পিলু, গরুটা সব সাবাড় করবে। ফুলের গাছগুলির পাশে কঞ্চির বেড়া। সেখানে ডাঁটার চারা বড় হচ্ছে। ঢেঁড়সের বিছন লাগানো। দুটো পটলের লতা বাড়ছে। বাবার সবজির বাগান। যেভাবে গরুটাকে আল্গা করে দিয়েছে সব মুড়িয়ে খাবে।

মা'র চিৎকারে পিলুর মধ্যে কোন ত্রাসের সৃষ্টি হয় না। সে কি সামলাতে ব্যস্ত চাদরের নিচে। অগত্যা আমাকেই ছুটে যেতে হল গরুটাকে ধরতে। বাবার আর পিলুর সর্বক্ষণ সেবাযত্নে কে বলবে গরুটার এক সময় অস্থিচর্মসার ছিল।

সেই আদরের গরুটির প্রতি পিলুর অবহেলা, নির্ঘাত সে অন্য বড় কিছু হাতের কাছে পেয়ে গেছে। আমাকে ছুটে যেতে দেখেই বলল, দাদারে।

দাদারে এই শব্দ অনেক কিছুর অর্থ বহন করে। আমার সেদিকে এখন খেয়াল নেই। গরুটা বাবার সবজি বাগান আবার নষ্ট না করে দেয়! দিলে বাবা মনঃকষ্টে ভুগবেন। মুখে কিছু বলবেন না। সব কর্মফল ভেবে বাবা হুঁকো খেতে বসবেন। এই সব পরিচিত দৃশ্য থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলাম এবং গরুটাকে দড়ি ধরে টানতে টানতে যথাক্রমে বেঁধে দিলে, পিলু ফের ডাকল, দাদারে।

এই ধরনের ডাকে পিলুর কাছে কোন বিস্ময়কর খবর আছে বুঝতে পারি। আগেরবারের আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টা আর পিলুর মধ্যে নেই। বললাম, গরুটাকে ছেড়ে দিলি, যদি কিছুতে মুখ দিত!

পিলুর যেমন স্বভাব, সে আমার অভিযোগ এতটুকু মন দিয়ে শুনল না। চাদর সামান্য ফাঁক করে সন্তর্পণে কিছু গোপনে দেখাবার চেষ্টা করল। যা দেখলাম, তাতে কোনো প্রাণীর লেজটেজ বলে মনে হল। কাঠবিড়ালী হতে পারে। এর আগে একটা কুকুরছানা, এবং ছাগশিশু নিয়ে বাড়িতে মা বাবা বেশ অশান্তি করেছিলেন। প্রাণীমাত্রেই বাবার কাছে ঈশ্বরের অংশ। তাকে অযথা কষ্ট দিতে নেই। পিলুর পাল্লায় যে-কোন প্রাণীর জীবন সংশয় হতে পারে, বাবার এমন ধারণা।

বনবাদাড় থেকে আবার কি একটা ধরে আনল কে জানে।

বললাম, ওটা কিরে।

পিলু মুখে আঙুল দিল। অর্থাৎ খুব গোপন। সে চায় না মা'র কানে কিংবা অন্য কেউ শুনতে পাক।

প্রথম হেফা সামলাতে পারলে পিলু জানে তার আর ভয় নেই। শোরগোল একদিন দুদিন। পরে বাবা পর্যন্ত খোঁজখবর নেবেন, কেমন আছে তারা।

তখন শীতের হাওয়া বইছিল। কনকনে ঠাণ্ডা! পিলু কোন রকমে চাদর আর একটু ফাঁক করে যে বস্তুটি দেখাল তাতে তাজ্জব বনে গেলাম। ডাকলাম, মা মা!

—মাকে ডাকছিস কেন?

—কোথা থেকে ধরলি।

—লেংরি বিবির হাতা থেকে।

মা'র কাছে ছুটে গেলাম। মা ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। বললাম, দেখ এসে পিলু আবার কী একটা ধরে এনেছে!

আসলে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তবে ওটা যে পিলুর সগোত্র বুঝতে কষ্ট হয়নি। এতদিন সে যা যেখানে পেয়েছে তুলে এনেছে। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বুঝি এমনই হয়ে থাকে। বাইরের কুটোগাছটি পর্যন্ত সংসারের জন্য দরকার মনে হয়। পিলু এ সব বিষয়ে খুব সর্তক। কিন্তু হেন বস্তুটি সংসারে উপদ্রব বাড়াবে শুধু। মা বলল, কী আবার এনেছে!

—হনুমানের বাচ্চা ধরে এনেছে।

মায়া শোনামাত্র দু-লাফে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, কোথায় রে?

মা যেমন করে থাকে, আর্ত গলা—অ মা কী বলছিস তুই! কোথায় পেল!

—এস না, দেখ এসে।

বাচ্চাটা পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। পিলুর বুকের কাছে খামচে ধরে আছে।

যেন শত টানাটানি করলেও ওটাকে তুলে আনা যাবে না।

আর মা আমি মায়া যখন গোয়ালঘরের কাছে পিলুকে খুঁজতে গেলাম তখন দেখি সে নেই। নিমেষে হাওয়া।

—পিলু কোথায় গেলি!

দূরের বনঝোপ থেকে উঁকি মেরে বলল, মা আমাকে মারবে না তো।

মা বলল, আগে এস বাড়িতে, তারপর দেখছি।

—আমি যাব না।

—ওটা ওর মা'র কাছে দিয়ে আয়। আর অভিশাপ কুড়াস না বাবা।

পিলু সেখান থেকেই বলল, আমি পালব মা।

—পড়াশোনা নেই, ঐ নিয়েই থাক।

আমি ফের ডাকলাম, তুই আয় না। মা দেখবে।

মা'র দেখার আগ্রহ কতটা বুঝতে পারছি না। এ-অঞ্চলটায় হনুমানের বড় উপদ্রব। ধেড়ে সব হনুমান কখনও মানুষকে তাড়া করে। কামড়ে দেয়। পেঁপে, কলা কিংবা মটরশাক যা কিছুই বাবা লাগান না কেন, হনুমানের উৎপাতে কিছু রাখা যায় না। সব সময় উচাটনে থাকতে হয় মায়াকে। বাবা বাড়ি থাকলে বাবাকে। কোথায় কী খেল, কী তুলে নিল, সর্বক্ষণ সবার অস্বস্তি। লাউ, কুমড়ো কিছুই রাখা যায় না। একবার পাটের সব কচি ডগা খেয়ে জমি সাফ করে দিয়েছিল। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। পিলু গুলতি মেরে একবার একটা হনুর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল, বাবা এতেও ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে হনুমানের কি ভূমিকা ছিল সে প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, তোমাকে তাড়াতে বলেছি, খোঁড়া করে দিতে বলিনি। আজ তোমার ভাত নেই। দুপুরে সত্যি পিলুকে সেদিন খেতে দেওয়া হল না। বাবার কাছে এটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নাহলে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না, তাঁর মেজ পুত্রটিকে। সেই ছেলে একটা হনুমানের বাচ্চা কব্জা করে এনেছে ভাবতেই বাবার হয়তো মাথা গরম হয়ে যাবে। পিলু আগে থাকতেই সংসারে বাবা বাদে সবাইকে সপক্ষে টানতে চায়। নাহলে যেন এই বাচ্চাটা সম্বল করে যে দিকে দু'চোখ যায় সে চলে যাবে।

মা কী ভাবল কে জানে। মেজ পুত্রটির কী খেয়াল হবে শেষ পর্যন্ত ভাবতেই বোধ হয়, ডাকল, আয়, দেখি, কী করে ধরলি রে!

পিলু বোধ হয় এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। সে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। মা হারিকেন নিয়ে এল উঠোনে। পিলু চাদরের তলা থেকে বের করতেই একটা বৃহৎ আকারের গিরগিটির আকারে সেটা মা'র দৃষ্টিগোচর হল। মা বলল, ছিঃ ছিঃ তোর ঘেন্না-পিত্তি নেই। ছাড়, ছেড়ে দে।

ও আর ছাড়ে! বারান্দায় উঠে জলচৌকিতে বসে বলল, দুটো ধাড়িতে কামড়া কামড়ি করছিল। মা, হলুদবাটা আছে? সে বাচ্চাটাকে কিছুতেই আর চাদরের নিচ থেকে বের করছে না। ঠাণ্ডা লাগতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় সে আর বেরই করত না। কিন্তু মায়া, ছোট ভাইটা দেখার জন্য হামলে পড়েছে। আর তখনই মনে হল জামায় ক'ফোঁটা রক্তের দাগ।

—ও মা রক্ত! মায়া হতবাক হয়ে কথাটা বলল।

পিলু বলল, মারব। মারব বলছি। কোথায় রক্ত!

—এই যে।

মা আমি ঝুঁকে দেখলাম। খুব বেশী রক্তপাত না হলে এভাবে জামায় রক্তের দাগ লাগে না। পিলুর মুখে কোন বিকৃতি নেই। মা কিছুটা হতভম্ব। আমি বললাম, দেখি দেখি। বলে জামা টানাটানি করতে গেলে পিলু বলল, কামড়ে দিয়েছে। কী করব? বলছি হলুদবাটা আছে কিনা। সে তিরিক্ষি মেজাজে জামা জোরজার করে নামিয়ে নিলে মা'র যেন হুঁশ হল। ততক্ষণে আমরা ক্ষতস্থানটা দেখে ফেলেছি। এই নিয়ে সে কেমন নির্বিকারভাবে বসে আছে। হনুমান দেখা আমাদের মাথায় উঠে গেল। মা চুন-হলুদ গরম করতে গিয়ে শুরু করে দিয়েছে রামায়ণ পাঠ। আমার মরণ হয় না কেন? ভগবান আমাকে নেয় না কেন। তোরা মরতে পারিস না কেন! হাড় জুড়ায়, এত জ্বালা কার সহ্য হয়।

পিলুর এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বারান্দায় কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মনোযোগ অন্যদিকে। একটা কাপড়ের পাড় হাতের কাছে পেয়ে গেল। কিভাবে বাচ্চাটাকে কব্জা করেছে—কি ধরনের অভিযানে বের হলে একটা হনুমানের বাচ্চা সংগ্রহ করা যায়, তার বিস্তারিত গল্প আমাকে ও মায়াকে শুনিয়ে যাচ্ছে। কোথায় তারিফ করবে তা না, কেবল পেছনে লাগবে । বাচ্চাটা বড় হলে এমন ট্রেনিং দেবে, একটা হনু আর বাড়ি আসতে সাহস পাবে না। কুকুরের মতো। কুকুর চোর ছ্যাঁচোড় তাড়া করে—কুকুরের মতো প্রাতিশত্রু যেমন থাকে না, হনুর বেলাতেও তাই হবে। ঘর-বাড়ি রক্ষার্থেই সে এটা করেছে। মা কেন যে বোঝে না।

পিলুর এমন ধারণায় আমিও বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। আমাদের পোষা কুকুরটার জন্য কেউ বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না। কুকুরটা এখন বাড়ি নেই। ঠিক বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছে। পিলুই কুকুরটাকে সতর্ক করে দিয়েছে যেন—বাবা, কোথায় যান দেখে রেখ। কি করেন দেখে রেখ। কারণ বাবার মতো বাউণ্ডুলে মানুষের খোঁজখবর না রাখলে কোথায় আবার উধাও হবেন কে জানে। বাবার ঐ এক স্বভাব। শহরে গেল, মানুকাকা বলল, একটা ফর্দ করে দিতে হবে ধনদাদা। কার ফর্দ, কিসের ফর্দ এবং কোন যজমান, কি নাম, জাত কি, এসব জানাজানির জন্য সেদিন হয়তো ফিরলেনই না। ফর্দ করে দিয়ে শ্রাদ্ধ থাকলে, কি শুভকাজ থাকলে সব নিষ্পন্ন করে তাঁর বাড়ি ফেরা। বাড়িতে একটা খবর যে দিতে হয়, বাবার ধারণায় এটা আসে না। কুকুরটা বাড়ি ফিরে এলে, চুপচাপ এবং শান্ত থাকলে বুঝতে হবে, বাবা কোন কাজের খবর পেয়ে কোথাও গেছেন। আর ডাকাডাকি করলে ধন্দ আসবে মনে—তখন পিলুর কাজ বাবাকে খুঁজতে বের হওয়া। দাসের আড়তে, বাজারে, চন্দর দোকানে, অথবা মানিক সরকারের কুঠিতে খোঁজ—বাবা এয়েছিলেন? না ত' । আড়তে খোঁজ, বাবা এয়েছিলেন? হ্যাঁ এয়েছিল। মাকে বলবে, তিনি কাল সকালে ফিরবেন। গেছে আউসগ্রামে। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আছে। বাড়ি এসে পিলুর খবর দেওয়া—মা, বাবা আউসগ্রামে গেছেন। ওখানে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আছে। মা তখন বুঝতে পারে পিলুর আনা সেই বাচ্চা কুকুরটা এত বড় না হলে কে নজর রাখত এই বাউণ্ডুলে মানুষটার প্রতি। ঘরে তিষ্ঠতেই চায় না। পিলুর ওপর মা'র তখন মায়া বেড়ে যায়। বড় বিবেচক। বাপ যার বাউণ্ডুলে তার এমন সুপুত্র থাকবে একজন মা হয়তো আশাই করতে পারেনি। এখন তবু কমেছে। সেই দেশ থেকে আসার পর, বাবা কতবার যে একদিনের জন্য বের হচ্ছি বলে

মাসাধিককাল ঘরে ফিরতেন না! ফিরলে মা'র অভিযোগ, আমিও যাব বের হয়ে। তুমি পার, আমি পারি না। বাবা তখন কাঁচুমাচু মুখে বলতেন, আরে বোঝ না কেন, এ ক'দিন যে দেশ-বাড়ির মানুষজন খুঁজে বেড়িয়েছি, তা কি এমনি এমনি। ঐ তো বামন্দির প্রফুল্ল সরকার নবদ্বীপে বাড়ি করেছে। আমাকে দেখে কি খুশি। ছাড়তেই চায় না। কর্তা আর ক'টা দিন থেকে যান। ভাল-মন্দ খাওয়া। দেশ থেকে এসে তো সব ভুলেই গেছি।

মা'র উত্তর—তাই কর। সংসারটা উচ্ছন্নে যাক। এত লম্বা জিভ হলে হয়! বাড়ির কথা একবার ভাবলে না!

—ঐ তো ধনবৌ, তোমার বুদ্ধি কম। আমি খাই মানে তো একটা লোকের খাওয়া বেঁচে যায় সংসারে। দুর্দিনে একটা মানুষের আহার বেঁচে গেলে কত সুবিধা বল।

এখন আর বাবার এতটা ঘুরে বেড়াবার সখ নেই। ঘরবাড়ি হয়ে যাওয়ায় থিতু হয়েছেন কিছুটা। তবু পিলুর সংশয় থাকে বলে কুকুরটাকে বাবার নিরাপত্তার খাতিরে রেখে দিয়েছে। বাবা আর না বলে না কয়ে ভেগে যেতে পারবেন না। যার বাবা এমন পেটুক তার সন্তানেরা আর কতটা ভাল হতে পারে। পিলুকে কোন আশায় কালীবাড়ির সুস্বাদু খাবারের খোঁজ দেব সে তো তবে আর বাড়িমুখোই হতে চাইবে না। লক্ষ্মী বোঝে না। বৌদিও বলে দিয়েছে তোমার ভাইকে নিয়ে আসবে। মা'র প্রসাদ নেবে। একবার খেতে পেলে—সরু সুঘ্রাণ আতপ চালের ভাত, ছাঁকা তেলে বেগুন ভাজা—ভাজা সোনা মুগের ডাল, পাঁঠার মেটেচচ্চড়ি, মাংস, চাটনি, মণ্ডা, সন্দেশ, যেখানে প্রসাদে এই বরাদ্দ এবং তার আলাদা স্বাদ—পিলু কোন মুখে বাড়ি আসবে। দেবস্থানে কত উপরি লোক পড়ে থাকে, প্রসাদ পায়, সেও না হয়—আর সেতো নটু পটুর মাস্টার মশাইর ভাই। তার ইজ্জত আলাদা। বলা যায় না, একবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলে এবং পিলুর যা সংসারী বুদ্ধি, বৌদি হয়তো বলেই বসবেন, মাস্টার, তোমার ভাইটিও এখানে থাক। দেবস্থানে আহার নয়, প্রসাদ। কি যেন কথা আছে, যে খায় চিনি, যোগান চিন্তামণি, ভাববার কিছু নেই। পিলু কালীবাড়িতে উঠে এলে দেখা যাবে সেই এক নম্বর মানুষ হয়ে গেছে। আর বাবাঠাকুরের নজরে পড়ে গেলে তো হয়েই গেল। পিলুকে রাতারাতি আর এক বামাক্ষ্যাপা না বানিয়ে দেয়। এতসব ভেবে পিলুকে সবার আড়ালে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে আমার সেই মানসম্মান বোধ—বড় হতে হতে যে আমাকে ক্রমে গ্রাস করছে। আমার বাবা খেতে ভালবাসেন, আমার ভাই খাবার গন্ধ পেলে আর সেখান থেকে নড়তে চায় না—এসব জানাজানি হলে আমার মানসিক কষ্ট বাড়ে।

মা তখন পিলুর ক্ষতস্থানে চুন-হলুদ বাটা গরম করে লাগাচ্ছে। মায়া ঝুঁকে আছে। ক্ষতস্থানটা দেখে আমার মাথা ঘুরছে। আর পিলু সেই হনুর গলায় পাড় বেঁধে দিচ্ছে। বাচ্চাটা লাফাচ্ছে। চি চি করে ডাকছে। বাঁশ বেয়ে উপরে উঠছে আবার লাফিয়ে পিলুর ঘাড়ে পড়ছে। সামনে হারিকেন ছিল। সেটাতে আবার না লাফিয়ে পড়ে! ভয়ে হারিকেনটা সরিয়ে রাখতেই দেখি, একটা লম্বা ছায়া বারান্দায় উঠে আসছে। বাবা। বাবা বারান্দায় আস্ত একটা হনুর বাচ্চা দেখে বোধহয় কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেছিলেন। তারপর মগজের মধ্যে বিষয়টা একটু খেলে যেতেই বললেন, এটা কি পশুশালা?

বাবার গগনভেদী প্রশ্নে আমরা সবাই তাকালাম।

—এটা কি পশুশালা?

পিলু আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

—জবাব দিচ্ছ না কেন? যেন যারা হনুটাকে ঘিরে বসেছিল সবার কাছে প্রশ্নটা। মা যেন পাত্তাই দিচ্ছে না।—দাঁড়া, লাগানো হয়নি। লাগছে? লাগবে না। তুই মানুষ, না অপদেবতা।

বাবার দিকে আমি ভয়ে তাকাচ্ছি না। পিলু ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে। হনুর বাচ্চাটা বাবাকে দেখেই পিলুর জামার নিচে লুকিয়ে পড়েছে। বাচ্চাটা পিলুর জামার নিচটা কি করে যে নিরাপদ জায়গা ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না।

বাবার হুংকার, বাড়িটা আমার, না তোমাদের?

মা পিলুকে বলল, নে এবার ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখ! হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোস।

পিলুর সাহস এখন অনেক। সে মাতৃআজ্ঞা পালন করছে। মা সহায় থাকলে সংসারে তার ভাবনা

কম! এ কথার পর বাবাও কেমন নিজের অধিকার সম্পর্কে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মতো বললেন, পিলু বাবা একটু তামাক সাজ।

বাবা বারান্দার এককোণায় আসন পেতে বসলেন। দেখে মনে হয় সংসারে এ-মুহূর্তে তিনি খুবই আলগা মানুষ। যেন কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যাঁর স্ত্রী যা দেবী সর্বভূতেষু, তাঁর আর বেশি আশা করা ঠিক না। হনুর বাচ্চাটা সংসারে কি উপকারে আসতে পারে—পিলু কেন যে ওটাকে ধরে আনল! প্রাণিকুলের প্রতি পিলুর এই অহরহ নৃশংস ব্যবহার বাবাকে বোধহয় আপৎকালে পীড়া দিচ্ছে। হুঁকাটি এগিয়ে দিলে, বাবা বললেন, দেখছিস তো কী সুখে আছি?

আমি বাড়ি থাকি না, আমি কলেজে পড়ি, বাবা আমাকে মাঝে মাঝে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ভেবে থাকেন। আমার কাছে তাঁর এই অভিযোগ কাকে লক্ষ্য করে বুঝতে কষ্ট হয় না। বললাম, পিলুকে হনুতে কামড়েছে।

—কামড়েছে! বলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। কোথায় কোথায়, দেখি। পিলু এসময় বাবার সহানুভূতি কব্জা করতে দৌড়ে কাছে গেল। জামা তুলে দেখাল। বাবা হারিকেনের আলোতে ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর পিলুর নাড়ি দেখলেন। —জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে না ত'?

—না।

—বমি বমি ভাব?

—না।

—মাথা ধরেছে?

—না।

—ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

—ভাত, মাংস।

—ভাল। ভয় নেই। দেখি তোমার হনু কি বলে?

—ও তো কামড়ায়নি।

—তবে কে?

—ওর ধাড়িটা।

বাবার এত প্রশ্ন মা'র কাছে বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল। পিলু বাবার এত প্রশ্নে কিছুটা সম্মতি আদায় করতে পেরেছে ভেবে খুব খুশির সঙ্গে বলল, আর হনু আমাদের ফল-পাকুড় খেতে পারবে না বাবা।

মায়া বলল, তুমি যে বলেছিলে বাবা একটা কমলালেবুর গাছ লাগাবে।

বাড়িতে বাবা সব রকমের ফল-পাকুড়ের গাছ লাগিয়েছেন। এমন কি একটা আঙুরলতা পর্যন্ত। হলে কি হবে, হনুতে নষ্ট করে দিয়ে যায় বলে বাবার সব গাছ লাগানোর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বাবা বলেছিলেন, সবই তো হল, কেবল একটা কমলালেবুর গাছ, আখরোটের গাছ, আপেলের গাছ বাকি। যা মাটি, একেবারে সাক্ষাৎ জননী। যা লাগাবে তাই হবে। কতকালের পতিত জমি, জননী জন্মভূমি।

এবারে হনুটা আসায় মায়ার মনে হয়েছে আর সমস্যা নেই, হনুতে নষ্ট করবে না, বাবা ইচ্ছে করলেই কমলালেবু এবং আপেলের গাছ পুঁতে দিতে পারেন। জল, হাওয়া, মাটি—বড় কথা নয়, বাবার লাগানোটাই বড় কথা। বাবার হাতে গাছ বড় ফলবতী হয়। আমাদের ধারণা এমন এবং মাও বাবার এই সাফল্য সম্পর্কে কোনদিন ঠেস দিয়ে কথা বলেনি। বাবা বললেন, একবার আন দেখি, রামের দোসরকে।

পিলু সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো হনুটাকে বাবার সামনে ছেড়ে দিল। বেশ লম্ফঝম্ফ করছে। পিলুর মনে হচ্ছিল, যেন নাচ দেখাচ্ছে বাবাকে। তার মনে হল, বাবা ঠিক আগের মতো তার কাজের বুদ্ধিমত্তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। সে একটু বেশি খুশি হয়ে বলে ফেলল, বাবা ঘুঙুর এনে দেবে?

—ঘুঙুর?

—ঘুঙুর। মানে পায়ে বেঁধে দেব।

—কবে শুনব, তুমি একটা ভালুকের বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছ। তার জন্য চাই ডুগডুগি। তোমার জননীটি তোমার মাথা খাচ্ছে। তোমার এই দোসরটি সংসারে উপদ্রবের শামিল। এটা তোমার জননীর বোঝা উচিত।

পিলু বলল, মা শুনছ?

—তোমার মাকে বলিনি ত'? তোমাকে বলেছি। তাঁকে আবার ডাকছ কেন?

পিলু বলল, ছেড়ে দেব?

—তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর। আর শোন, বলবে—আমি কেবল আড্ডা দিই না।

নিবারণ দাসের মার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হবে। তার ফর্দ, তার বৃষকাঠ, তার বৃষ কেমন হবে সব জায় করে দিতে হল। দুপুরে বের হয়েছি, ফিরেছি রাত করে। কাজের মানুষের এটা হয়। সব সময় ঘরে এসে মা মনসা দেখলে কারো ভাল লাগে না।

মা রান্নাঘরে। ভাত বসিয়ে কিছু কাঠকুটো আনতে গেছে গোয়ালের চাল থেকে। মা শুনে গেল। কথা বলল না। মা কাঠকুটো নিয়ে গেল। কথা বলল না। এটা আমার ভাল লাগছিল না। হনুর বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রথম মা'র আর্তনাদ, পরে নিজের সংসারে আর একজন অতিথি ভেবে চুপচাপ, বাবা প্রথমে নারাজ, পরে মা'র মর্জির কথা ভেবে চুপচাপ—এখন দু'জনের একজন যা বলবে, অন্যজন তার বিপরীত। মা যদি বলে এক্ষুনি বিদায় কর, বাবা বলবে, আহা ছেলেমানুষ ধরে এনেছে, থাক না। আমি না হয় একজোড়া ঘুঙুর এনেই দেব।

মা বলবে, না আমার এত জ্বালা সহ্য হয় না। ছেলের জন্য আমি কথা শুনব কেন!

বাবা বলবেন, তুমি জননী! তুমি শুনবে না তো কে শুনবে। মার তখন গলায় ধার উঠবে। রাখ তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না।

—চিঁড়ে না ভিজুক, মুড়ি ভিজুক।

বাবার এমন কথায় মা আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আমাদের ডেকে বলবে, শোন তোর বাবা ঠাট্টা করছে। আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা! দিন রাত খেটে মরি, কেউ কুটোগাছটি নাড় না। যার যেখানে খুশি যাও। যখন খুশি ফের। একটা তো বাড়ির বাইরে বার হল, আর একটা সারাদিন বন-বাদাড়ে, আমি কি বাড়ির ঝি-বাঁদী। আমাকে ঠেস দিয়ে কথা। তারপর বাবা হয়ত বলবেন, চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে গেল রে।

মা'র তখন আরও উত্তপ্ত ভাব। বাবা মাকে রাগিয়ে দিয়ে যে মজা উপভোগ করেন, আমরা তা পারি না। আমার মনে হয় কেবল, মা বাবা কেন যে এত ঝগড়া করে। কোথাও গেলে ফিরতে একটু দেরি হতেই পারে। তা না, কেন দেরি। কেন বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না। আমরা তোমার কেউ না। দিনকাল খারাপ, কার মনে কি আছে কে জানে। কিছু হলে সব তো জলে ভাসবে।

অবশ্য এখনও মা চুপচাপ। কুরুক্ষেত্র শুরু হবার সূচনাপর্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আসলে মা কি আজ হনুর বাচ্চাটা আসায় প্রসন্ন। তখনই বোঝা যায় স্নেহ কত নিম্নগামী। ছোট ভাইটা এখন হাঁটতে পারে না শুধু, দৌড়াতেও পারে। হনুর বাচ্চাটা অবলা জীব, যেমন কুকুরের বেলায় কিংবা সেই ছাগশিশু —মা'র সেবা যত্নে ওরা বড় বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ে। আমরা খাই না-খাই, ওদের খাওয়া নিয়ে মা'র বড় চিন্তা। মা'র কাছে এরা আমাদের চেয়েও বড় কাছের। মা বলবে, সবাই উড়ে যাবে। এরা যায় না। কুকুরটা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ঠিক এ-সময়ে মায়ার আবার বাবাকে তাড়া, অ বাবা, বাবাগো কমলালেবুর গাছ একটা লাগাও না।

—সব হবে। হয়ে তো যাচ্ছে। কী বাকি থাকল।

বাবার এটা বাড়িঘর করার পর একটা আপ্তবাক্য। মাকে শুনিয়ে বলা। তোমার মা'র তো কেবল নাই নাই ভাব। সংসারে কার না অভাব থাকে। লাখপতিরও থাকে। তোমার বাবার তো থাকবেই।

তখনই মা'র গলা পাওয়া গেল। —এই আপ্তবাক্য সার করেই থাক। বাবার আগের আপ্তবাক্য

ছিল, সে কি দেশ ছিল মশাই। খাওয়ার ভাবনা নেই। শোয়ার ভাবনা নেই। দ্বিতীয় আপ্তবাক্য—রণসাজে আছি। রণসাজ মানে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে। এক পোড়োবাড়ি থেকে আর এক পোড়োবাড়ি। কখনও কোনো আত্মীয়ের আশ্রয়ে। জমি-জায়গা দেখার নাম করে উধাও। হাতের সম্বল শেষ। একটু জায়গা নেই ঘরবাড়ি বানাবার। হয়তো গোটা দিন নিরন্নই কেটে গেল, অভাবের জ্বালায় মা'র গঞ্জনা শুরু হলে, সোজা কথা, রণসাজে আছি। একদম নাই-নাই করবে না। মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার কখনও খালি থাকে না। সব হবে। একটু সবুর কর।

শেষে এই বন জঙ্গলে পতিত জমিতে মার শেষ সম্বল অবলম্বন করে উঠে আসা। গৃহদেবতা খুঁজে আনা থেকে ঘরবাড়ি সহ খোঁড়া গরুটা পর্যন্ত আমার কৃতী বাবার কর্মক্ষমতার সাক্ষ্য। সুতরাং মা'র কথাতে বাবা রুষ্ট হতেই পারেন। দুধ ঘি না হোক, ডাল ভাত সংসারে এখন রোজই হয়। গৃহদেবতার নামে যারা মাসোহারা পাঠায়, তাদের কেউ কেউ ইদানীং টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায় অভাবটা আবার জাঁকিয়ে বসেছে। বাবা বলেন, সবারই খরচ বাড়ছে, না পারলে দেবে কোত্থেকে! বাবার ঐ স্বভাব, কোন মানুষের ওপর তাঁর অভিমান নেই। মা বলবে, নির্বোধ হলে এমনই হয়।

—আমি নির্বোধ। শুনছিস কী বলছে!

—বলব না! যে যা দেবে তাই নেবে। এই তো শ্রাদ্ধ করাবে। সব হবে, শুধু ঠাকুরের দক্ষিণার বেলায় হাত সরে না। কত বলি এক পয়সা দু পয়সা নেবে না। কি আকাল চারদিকে! এক পয়সা দু পয়সার কোন দাম আছে?

এটা ঠিক, বাবার পুজো-আর্চার বিষয়টা জপতপের মতো। সাধনার মতো। ফললাভে কিঞ্চিৎ নির্মোহ। দক্ষিণা কে কি দিল বড় কথা নয়। নিষ্ঠাই বড় কথা। ধর্মবিমুখ মানুষেরা এই যে এখনও এতটা করছে, এটা যেন বাবার পুণ্যফলে।

—পয়সাটা বড় হল, ধর্মাধর্মের কথা ভাবলে না।

আপনে বাঁচলে বাপের নাম। ধর্মটাই তুমি দেখ। সারা জীবন এক ভড়ং। আমরা পুরোহিত বংশ। আমাদের অন্য কোন কাজ সাজে! —সাজে না তো বোঝ। বড়টা পরের বাড়িতে, ছোটটা বন-বাদাড়ে—আর দুটো কী হবে কে জানে। মা রান্নাঘরে বসে গজগজ করছিল।

আসলে এ দেশে আসার পর মানুকাকা বাবার দু-দুটো কাজ ঠিক করে খবর পাঠিয়েছিলেন। খাগড়ার বাজারে মল্লিকদের বড় মুর্শিদাবাদী সিল্কের দোকান। দোকানে খদ্দের সামলানোর কাজ। দ্বিতীয় কাজটা দোকানের খাতা লেখা। দুটো খবরেই বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মানু কী ভেবেছে, আমি জলে পড়েছি। বংশের একটা মান-ইজ্জত নেই।

সেই এককথা মা'র। সুযোগ এলেই খোঁটা দেবার স্বভাব। সুযোগ হাতছাড়া করতে মা রাজি না। মান-ইজ্জত ধুয়ে জল খাও। এত মান-ইজ্জতের কথা বলছ, বড়টাকে তো বাস কণ্ডাকটার করতে চেয়েছিলে।

—বাস কণ্ডাকটার! কে বলেছে বাস কণ্ডাকটার?

—বাসে ঘণ্টি তবে কে বাজায়? ভাগ্যিস পালিয়েছিল—না'লে বহরমপুর-জলঙ্গী-পাইটকাবাড়ি। তোমার মুখে বড় কথা সাজে না।

—মানুষ তো ছোট কাজ থেকেই বড় হয়। আলামোহন দাসের নাম শুনেছে কি-না তোর মাকে জিজ্ঞেস করত। বাবা এবার সরাসরি মাকে প্রশ্ন না করে আমাকে কথাটা বললেন।

পিলু বলল, আমি জিজ্ঞেস করে আসব বাবা?

—না। তুমি পড়তে বস। রামের দোসরের বেলায় মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য, পড়ার বেলায় ওটা হয় না কেন?

অগত্যা বললাম, তোমরা এবার থামবে কি-না বল। এমন করলে এক্ষুনি চলে যাব। আর আসব না। এই কি দিনরাত তোমরা ঝগড়া করবে। আগে না হয় আমরাই ছিলাম বনটায়, এখন তো সব দেশ থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছ। কত ভাল আছ চিঠিতে লিখেছ। এই যদি অবস্থা, তবে ওরা কি ভাববে?

—তোমার মা এটা বোঝে না। দেয় না, দেয় না করেও তো যজমানরা কম দেয় না। এই যে

নিবারণ দাসের বাড়িতে কাজ, তাতে একবেলা তোমার মা বাদে সবার ভোজন। একজনের ভোজনে কত লাগে। যোড়শ শ্রাদ্ধে দু-পাঁচ পয়সা করে দক্ষিণা দিলে কত হয়! পুরোহিত দক্ষিণা, ভোজন দক্ষিণা, ভোজ্যদ্রব্য মিলে কত হয়—কাঁচাকলা, কাঁচা হলুদ, আলু, বেগুন ভোজ্যপত্রে দিলে সব মিলে কত হয়?

মা আর কোন জবাব দিচ্ছে না। আসলে আজকাল মা আমাকে সমীহ করতে আরম্ভ করেছে। আমি পছন্দ করি না ভেবেই মা নিজে থেকেই রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাঠকুটো দিয়ে রান্না। এক হাতে মা রান্না বাটনা বাটা সব করে যাচ্ছে। বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আগুনের আভায় মা'র মুখ কেমন রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। মা কী কাঁদছে।

বাবাও বোধহয় সেটা লক্ষ্য করেছেন! বাবা সহসা কেমন বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দা থেকে উঠোনে নামলেন। কেমন জনান্তিকে বলা, কান্নার কী হল। আমি কি কোন রূঢ় কথা বলেছি! মা'র তখন ফুঁপিয়ে কান্না। আমি বুঝতে পারি, মা'র কষ্ট আমি পরের বাড়িতে পড়ে আছি। বাবার সাধ্য নেই, আমাকে কাছে রেখে পড়ায়। মা'র সাধ্য নেই কলেজে যাবার সময় রান্না ভাত আমার সামনে বেড়ে দেয়। কষ্টটা সেখানে। বাবা আর একটু সংসারী হলে মা'র বোধ হয় এতটা অভিমান থাকত না। বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য বোধ হয় মা আমার ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পৃথিবীতে বাবার মতো ভাল মানুষদের বুঝি এমন হয়। আমাকে হঠাৎ তখন বাবা ইশারায় ডাকলেন। কাছে গেলে বললেন, তুমি মা'র কাছে গিয়ে বস। কথা বল। তাতে কিছুটা হাল্কা বোধ করবে। বলে বাবা অন্ধকারে হাত-পা ধুতে কালীর পুকুরের দিকে হেঁটে গেলেন। সংসারে বাবাকে মনে হচ্ছিল তখন বড় একা। এ সংসারের জন্য মা'র কান্নাটা আমরা চোখে দেখি। বাবার কান্নাটা কখন কোথায়, আমরা সেটা টেরও করতে পারি না। আমার বাবা দেশ-ছাড়া হয়ে কত অসহায়—দিন যত যায় তত বুঝি।

আমাদের এই বনভূমিটায় আগে গাছপালা, জঙ্গল আর কত রকম লতানে গাছে ভর্তি ছিল। বছর তিনেকের মধ্যে কত ফাঁকা হয়ে গেছে! এখন নবমী বুড়ি'র বনটায় না গেলে বোঝা যায় না এখানে সত্যি কোন গভীর বন থাকতে পারে। বড় বড় আমবাগান, কোথাও মণীন্দ্র কাঁটার ঘন জঙ্গল, বাঁশের বন, কত রকমের সরীসৃপ আর পাখি। খরগোশ টিয়া আর নানা জাতের সাপ। সবই কেমন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবারে শীতটা যেন আরও বেশি। গাছপালার একটা ওম থাকে। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বলে, মাঠের ওপর দিয়ে শীতের কনকনে হাওয়া সহজেই বাড়িঘরে ঢুকে যেতে পারে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙলে এটা আজ যেন বেশি টের পেলাম। ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পিলু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাবা দু-বার ডেকে গেছেন, মা ডেকেছে। কিন্তু শীতের কাঁথা আমাদের ছাড়তে না চাইলে কী করি! ঘরের ওদিকের মাচানে মায়া কাঁথার ফাঁক দিয়ে হনুর বাচ্চাটা কী করছে দেখছে। পিলু ওর জন্য একটা বস্তা, কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং খড় বিছিয়ে রেখেছিল। সেগুলো এখন সারা মেঝেতে ছড়াছড়ি। সকালে যে মা উঠেই ক্ষেপে যায়নি রক্ষে। ডাকলাম, পিলু ওঠ। এই পিলু, দেখ কাণ্ড হনুটার।

হনুর কথায় ধড়ফড় করে উঠে বসল পিলু। সে নেমেই হনুটাকে ঘরের খুঁটি থেকে খুলে বারান্দায় বের হয়ে গেল। শীতে কাঁপছে হনুটা। পিলু উঠোনে নেমে গেল। দরজা দিয়ে সব দেখা যায়। কিছু খুঁজছে। রোদ ওঠেনি। রোদ উঠলে সে হয়তো হনুটাকে নিয়ে রোদ পোহাত। তারপরই সাদুল্লা আমগাছটার নীচে ধোঁয়া দেখতে পেলাম। পিলু আগুন জ্বেলেছে। এই শীতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার এমন জাদুমন্ত্র পিলুরই একমাত্র জানা। গুটি গুটি আমিও উঠে গেলে দেখতে পেলাম, বাবা কালীর পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছেন। বাবাকে দেখলে মনেই হবে না, এটা মাঘ মাসের শীতকাল। একজন সৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাতঃস্নান খুবই দরকার। এতে শরীর প্রফুল্ল থাকে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু কাছে আসতে ভয় পায়। আর ওংকারস্য ব্রহ্মঋষি এমন সব নাভি থেকে তুলে আনা মন্ত্রোচ্চারণে বাবা আমার এখন তগ্‌গদচিত্ত। কিন্তু এত সকালে স্নান কেন? নিবারণ দাসের মা'র শ্রাদ্ধের কাজ আগামীকাল। হাতে বড় কাজ এলে প্রাতঃস্নানের অভ্যাস আছে বাবার। মা'র কাছে গুরুত্ব পাবার অথবা আদায় করার এটা মোক্ষম অস্ত্র।

আসলে আমার মনে হয়, বাবা সকালে স্নান করে ভিজা গামছা পরে তারে যে কাপড় মেলে দিচ্ছেন, হুহু কনকনে শীতে বাবা যে এতোটুকু ঘাবড়ে যাচ্ছেন না, পুত্রদের দেখাবার প্রলোভনে, এই

দেখ, তোমরা আগুন জ্বেলেছ শীত থেকে আত্মরক্ষার্থে, আর আমি শীতের বুড়িকে কলা দেখিয়ে খালি গায়ে খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেন এটা এক ধরনের কৃচ্ছ্র সাধনার ফল। মা'র অবশ্য মাঝে মাঝে ইতিমধ্যে গলা পাওয়া যাচ্ছে। —ও মায়া, তোর বাবার কাপড়টা দে। চাদরটা দে। ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাবা কিছুতেই সেদিকে যাচ্ছেন না। ঠাকুরঘরে ঢুকে কোশাকুশি বের করে দিচ্ছেন। ভিজা গামছা পরেই ফুল তুলছেন। মায়া হাতে চাদর এবং কাপড় নিয়ে বাবার পিছু পিছু ঘুরছে।

মা ঘাট থেকে বাসি বাসন-কোসন মেজে যখন ফিরে এল তখনও বাবা ফুল তুলছেন। এত ফুলের কি দরকার বোঝা যাচ্ছে না। কাল রাতে আমার জননী এবং পিতৃদেব উভয়ে বেশ তর্কে মেতে গেছিল। আজ সকালে পিতৃদেব কত ধার্মিক এবং কর্মঠ তার প্রমাণ দেবার একটা প্রয়াস চলছে বোঝা যাচ্ছে। শরীরে দিব্য প্রভাব না থাকলে যে এমন হাফ নাঙ্গা সন্ন্যাসী হয়ে কনকনে শীতে ঘোরা যায় না, জননী আমার সেটা বুঝুক। জননী এবার সোজা কাঠমালতী গাছটার কাছে গিয়ে বলল, অনেক বাহাদুরী দেখেছি। এবারে দয়া করে কাপড়-জামা গায়ে দাও। এই মায়া, বাকি যা ফুল আছে তুলে রাখ। নাও। বলে চাদর এবং কাপড় দিলে বাবা সুড়সুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

বাসি বাসন-কোসন ধুয়ে মা'র হাত নীল। এক ঝটকায় বাবার বাহাদুরী ভেঙে মা আমার আগুন পোহাতে আসছে। দেশ-বাড়িতে যে সু-সময় ছিল, এখানে এসে তা কতটা হারিয়েছি, মায়ের রক্তশূন্য হাতই যেন তার প্রমাণ। মা বলল, ও পিলু, দেনা দুটো পাতা। আগুনের মধ্যে মা হাত ঢুকিয়ে অর্ধদগ্ধ পাতাগুলি নেড়েচেড়ে দিল। বোঝাই যায় ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে হাত।

মাকে বললাম, আজ প্রাতঃস্নান!

—বামুনের খোঁজে যাবে।

—বামুনের খোঁজে কোথায় যাবে?

—তোমার মানুকাকার কাছে।

পিলু বলল, কেন আমরা?

—তোমরা মিলে তিনজন।

—আমি যাচ্ছি না। ও-সব শ্রাদ্ধ-ফাদ্ধের নেমন্তন খেতে আমার ভাল লাগে না।

বাবা ঠিক শুনেছেন। —কী বললে!

—আমি যাব না বাবা।

—কেন যাবে না? না গেলে আমার মুখ থাকবে কি করে। বলে এসেছি তিনজন তো দাসমশাই হাতেই আছে। আর বাকি ন'-জন ঠিক যোগাড় করে আনব।

বাবা বলতে বলতে কাছে এলেন। কিন্তু আগুনটার কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন না। আগুনের কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে যেন ব্রাহ্মণত্বের অপমান। আগুনে রক্তের ঘনত্ব নষ্ট হয়। রক্ত তরল হয়ে যায়। বামুন নিজেই আগুন। সে মুখ হাঁ করলে আগুন বের হয়। অগ্নিদেবতা সর্বশাস্ত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই ভয় করেছে। আগুন এবং আমার বাবার মধ্যে যে রেষারেষি আছে তা এ সময়ে বেশ বোঝা গেল। বাবা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ। অগ্নিদেবতা বর্ণশ্রেষ্ঠ। যেন দুই কুলীনে লড়ালড়ি। মা বলল, আগুন পোহাও না। শীতে তো দাঁতকপাটি হচ্ছে।

বাবা যেমন অন্য সময়ে অগ্রাহ্য করেন মা'র কথা, এখনও তাই করলেন। বের হচ্ছেন শুভকাজে, বামুন খুঁজে বের করা বাবার কাছে শুভ কাজেরই শামিল। সকালবেলায় আর মা'র সঙ্গে শাস্ত্র আউড়ে কী হবে! তেল-নুন ছাড়া যে মহীয়সী কিছু বোঝে না, তাকে বুঝিয়েও লাভ নেই। বরং এ সময় লায়েক পুত্রটির সঙ্গে কথা বললে কাজে আসবে। আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, কাল নেমন্তন্ন রক্ষা করে কালীবাড়ি যাবে।

মা বলল, যাবি না কেন। ভাল-মন্দ খাবি। দক্ষিণা পাবি।

বাবা বললেন, নিবারণ দাসের মা তোমাদের জাত সাপের বাচ্চা মনে করত।

আমি বললাম, তা করত।

পিলু বলল, বুড়ি আমাকে মোয়া নারকেলের নাড়ু হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করত।

বাবা বললেন, কেন করত?

মা বলল, কেন করত ও কি করে বলবে?

—পুণ্য! পুণ্য সঞ্চয়! বিলু পিলু সবাইকে ভাবত এক একখানা সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর। ওরা না খেলে দাসের মা'র আত্মা শান্তি না পেলে মুক্তি পাবে কী করে। আত্মার সদ্‌গতি বলে কথা। তুমি যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বাবা কথাটা বললেন।

শেষ অস্ত্র এখন ছাড়া দরকার। বললাম, পড়ার ক্ষতি হবে!

হনুটা ঠিক সে সময় বাবার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল। বাবার কোঁচা ধরে টানতে থাকল। পিলু এতে মজা পায়। বাবা বললেন, ওতো দেখছি আমাকে নাঙ্গা করতে চায়। বলে বাবা আরও দু'পা পিছিয়ে বললেন, দু'দিনে তোমার পড়ার কতটা ক্ষতি হতে পারে। রাজসূয় যজ্ঞ তো নয়। যে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছ, দিগ্বিজয়ে বের হতেই হবে।

বাবা জানেন না, আমার কাছে এটা দিগ্বিজয়েরই শামিল। কিন্তু জানি বলে লাভ নেই। কিছু এদিক ওদিক বললেই, বাবার এক কথা—উড়তে শিখে গেছ, এখন আর আমরা তোমার কে?

আসলে এই শ্রাদ্ধ, শুভকাজে বাবার পিছু পিছু যেতে আমার কেমন লজ্জা লাগে। অথচ এই লজ্জার বিষয়টা কাউকে এখন বলতে পারি না। যেখানেই যাই, মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। ফ্রক পরা মেয়ে যদি সে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে কেমন ভ্যাবলাকান্ত হয়ে যাই। কাজের বাড়িতে ওরা ঠিক থাকে। আর আড়ালে ওরা আসবে দেখবে। কেউ জানালায় দাঁড়িয়ে দেখবে। বলবে, ঠাকুরমশাইর বড় ছেলে কলেজে পড়ে। আমার এসব ভাল লাগে না। অথচ আগে বাবার পিছু পিছু আমি কি না দৌড়েছি। কেবল মনে হত বাবা আমাদের না আবার একা ফেলে চলে যান। যা একখানা ভুলোমনের বাবা।

আগুন, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা, সোনালী রঙের নিস্তেজ রোদ আর গাছপালার মধ্যে পিলুর বোধ হয় সহসা পরলোক সম্পর্কে মনের মধ্যে প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে। এসব বিষয়ে সে বাবার চেয়ে কাউকে বড় মনে করে না। বছরকার পঞ্জিকা নিবারণ দাস দেয়! কালুবাবুর মা'র শ্রাদ্ধে একখানা গীতা পাওয়া গেছে। একবার কী কারণে, শম্ভু ঘোষের পুত্রের বিবাহে বাবা কিছু বেশী পুরোহিত বিদায় পেয়ে ছিলেন। ফেরার সময় শহর থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত কিনে এনেছিলেন। মা দেখলে অপচয় ভেবে গজগজ করবে ভয়ে বলেছিলেন, এও শম্ভু ঘোষ দিল। আমাদের ডেকে বলেছিলেন, মাকে বলতে যেও না, কিনে এনেছি। পুত্রদের সামনে বাবার মিছে কথা বলতে বোধহয় দ্বিধা দেখা দিয়েছিল মনে। মিছে বিষয়টা সংক্রামক ব্যাধির মতো। পিলুকে এত করেও বাবা সত্যবাদী করে তুলতে পারছেন না। এটা একটা আপসোস। এতে বোধহয় বাবার ঈশ্বরও কুপিত হন। নানা দিক ভেবেচিন্তেই আমাদের কথাটা বলেছিলেন। সামান্য দু-খানা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে সংসারে অশান্তি হোক বাবা বোধ হয় চাননি। তবু মাকে মিছে কথা বলার জন্য বাবার বোধহয় ভেতরটা খচখচ করছিল। আসল রহস্যটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিয়ে তিনি কিছুটা হাল্কা হয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন, তোমার মা'র মেজাজ বুঝে একসময় কথাটা পাড়া যাবে। তোমরা মাকে কিছু বলতে যেও না। বাবার হেনস্থা হবে ভেবে আমরা মাকে শেষ পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ কেনার বিষয়টা গোপন করে গেছিলাম।

সুতরাং পিলুর ধারণা বাবার অগাধ পাণ্ডিত্য। বাবা গীতা পাঠ করেন। নতুন চণ্ডী একখানা কে দেবে এমন বলে আসছেন বাবা। বাবার নিজস্ব একটা পুঁটুলি আছে। নতুন গামছা দিয়ে সেটা সব সময় বাঁধা থাকে। একমাত্র পুঁটুলিটা মা'র হাটকানোর অধিকার আছে। ওটা পুত্র সন্তানেরা ধরলে বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শুভকাজ, দিনক্ষণ দেখে দেওয়া বাবার নিত্য কাজ। যারা জানতে আসে কিছুক্ষণ ঠাকুরকর্তার পায়ের কাছে বসে যায়। বাবার ঈশ্বরতত্ত্ব শুনতে তারা ভালবাসে। মহীরাবণ বধে রামের পাতাল প্রবেশ, মহীরাবণের পুত্র আহীরাবণ আরও কী সব এবং সেই যুদ্ধের বর্ণনার সময় রামের দোসর হনুমানের একটা ক্ষুদ্রকায় মাছি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বোধহয় পিলুর মধ্যে পুলক সঞ্চার করে। সে তখন পড়ে না। বাবার গল্পপাঠ শোনে। তখন রান্নাঘরে মা'র মুখ থমথমে। সকালবেলায় মায়া পিলু পড়ছে, আর উনি ভক্তদের ধর্মপাঠ করাচ্ছেন। কি আক্কেল মানুষটার! মাঝে মাঝে মা ডাকবে, এই পিলু পড়। বাবা এক দণ্ডে চুপ মেরে যান, ভক্তরা উঠে যায়। পিলু বাবাকে ছাড়ে না, তারপর কী হল বাবা? বাবা বললেন, এখন পড়, পরে শুনবে।

পিলুর পড়ায় মন বসে না। বাবার কথাবার্তা সবাই এত গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে, আর মা'টা কী! মাঝে মাঝে পিলু ক্ষেপে গিয়ে বলবে, তুমি চুপ কর মা। কিচ্ছু তুমি বোঝ না।

মা'র এক কথা, ওরে পিলু কথায় চিড়া ভেজে না। পড় বাবা। জীবনটা তো নিজের বাপকে দিয়ে বুঝছিস।

এই সব কারণে বাবার প্রতি পিলুর ধর্ম বিষয়ে মৃত্যু বিষয়ে সম্ভ্রমবোধ গড়ে উঠেছে। সে বলল, বাবা নিবারণ দাসের মা এখন কোথায় আছে?

—কোথায় আছে মানে?

—এই মরে গিয়ে যাবে কোথায়? তুমি যে বল কিছুই বিনষ্ট হয় না।

—দাসের মা পঞ্চ ভূতে লীন হয়েছেন।

—পঞ্চ ভূতটা কি বাবা?

—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই হল গে তোমার পঞ্চ ভূত। মানুষ সেখানেই মরে গিয়ে মিলে যায়।

—ক্ষিতিটা কি বাবা?

এই যে বিশ্ব চরাচর দেখছ, শস্যক্ষেত্র দেখছ সব ক্ষিতি।

—অপ?

—অপ হচ্ছে জল।

—মা বলল, তুমি না বামুনের খোঁজে যাবে? কখন আহ্নিক করবে। কখন খাবে? দুপুরে ফিরবে, না রাতে?

বাবা বললেন, দেখলি ত। কোন জ্ঞানের কথা হলেই তোর মা'র চণ্ডী পাঠ শুরু হয়ে যায়। তোর মা'র দুঃখ স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই দূর করে।

—এক শিবের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ, আর এক শিবে শুধু দক্ষযজ্ঞ হবে। এবারে দয়া করে আহ্নিকে বস গিয়ে। দুটো মুখে দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর। কোথাও গেলে তো আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

বাবা অগত্যা হাঁটা দিলে পিলু ডাকল, বাবা।

—পিছু ডাকবে না শুভকাজে বের হচ্ছি।

—বাবা, শ্রাদ্ধ করলে কি হয়?

—মানুষের আত্মার সদ্‌গতি হয়।

—সদ্‌গতিটা কি বাবা?

—এই যে—মাকে উদ্দেশ্য করে বলা। তোমার সন্তানের দিব্যজ্ঞান সঞ্চার হচ্ছে। সামলাও।

—বল না বাবা।

—মানুষ মরে গেলে আত্মা ঘোরাঘুরি করে।

—কোথায়?

—এই চারপাশে।

—দাসের মা'র আত্মা কোথায়?

বাড়ি-ঘরের চারপাশেই ঘোরাফেরা করছে। মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। শ্রাদ্ধে অন্নদান, জল দান করা হয়। আত্মা সংসারের টানাটানি থেকে তবে মুক্তি পায়। পিলুর চোখমুখ দেখলে এখন কে বলবে, এই ছেলে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাখি সরীসৃপের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বনের গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। মৃত্যু বিষয়টা সাময়িকভাবে তাকে কেমন কাতর করে রেখেছে। এত সুন্দর ঘরবাড়ি, বনভূমি ছেড়ে চলে যায় মানুষ। সেও মানুষের পরিণতির কথা ভেবে খানিকক্ষণ কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকল।

আগুন নিভে গেছে। ঠাকুরঘরে বাবা আহ্নিক করছেন। মা উনুনে দুধ গরম করছে। মায়া বাটি নিয়ে হাজির।—আমি দুধ কলা দিয়ে মুড়ি খাব মা।

মা'র এক কথা, না। তেল মুড়ি মেখে দিচ্ছি খেয়ে নাও। খাওয়া ছাড়া তোমরা কিছু বোঝ না। তোমার বাবাকে দিয়ে কিছু থাকবে না।

—বাবাকে এতটা দুধ দেবে। আমাদের একটুকুন দেবে না?

—মানুষটা বের হবে, ফিরবে কখন ঠিক নেই। তোদের কষ্ট হয় না!

বাবা আহ্নিক করতে করতেই বললেন, দাও। ওরা খেলেই আমার খাওয়া হল। আত্মার কথায় আমারও কেমন একটা খটকা লাগল। আত্মা বুকের মধ্যে থাকে। ধুকধুক করে। মৃত্যুকালে ওটাই উড়ে যায়। আমার মা বাবা সবার আত্মা এক সময় উড়ে যাবে ভাবতেই জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য উদয় হল। আর নিজের কথা ভেবে কেমন ষোল আনা বৈরাগ্য উদয় হবার সময় দেখলাম পিলু হনুটাকে কাঁধে নিয়ে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে। চারপাশে তাকালাম। সব কিছুর মধ্যেই আত্মার অবস্থান। কাউকে হেলা করা ঠিক না। হনুটার সেবাযত্ন দরকার। পিলুকে ডেকে বললাম, খেতে দিলি না?

পিলু বলল, দেব।

পিলু দিক না দিক, আমার দেওয়া দরকার। আত্মা মানুষের মধ্যেও থাকে, হনুর মধ্যেও থাকে। আত্মা না থাকলে কোন কিছুই নড়েচড়ে না। আত্মাকে তোয়াজে রাখা দরকার ভেবে একখানা আস্ত গাছপাকা বর্তমান কলা হনুর বাচ্চাটার জন্য ঘর থেকে বের করে নিলাম। পিলু দু' একবার যে না ভেবেছে, ঘরের গাছপাকা কলার কথা তা নয়। কিন্তু সে জানে ধরলে মা তাকে আস্ত রাখবে না। দাদা দিলে মা কিছু বলবে না। সেই আশায় সে বোধহয় ঘোরাঘুরি করছে। আমার হাতে আস্ত পাকা মর্তমান কলা দেখে ওর কোনো বিশ্বাস জন্মায়নি। ও ভেবেছে, ওটা আমিই খাব। আমি খেলে, তারও খাওয়া দরকার। সে চিৎকার করে বলল, মা, দাদা কলা খাচ্ছে। আমিও খাব।

আসলে এই অজুহাতে সে আস্ত একটা পাকাকলা হস্তগত করতে চায়। ওর অধিকারের বস্তুটি সে খেল কী হনুতে খেল কারো কিছু বলার নেই।

আমি বললাম, আমি খাচ্ছি না। হনুটাকে দেব।

—সত্যি দিবি?

—হ্যাঁরে। বলে আমরা দু'জনে হনুটাকে মধ্যমণি করে বসলাম। কলা খাওয়ালাম। দুই ভাইয়ে দাসের মা'র মৃত্যু নিয়ে কথা বললাম।

পিলু, বলল, এই আছে এই নেই। কেমন লাগে নারে দাদা। বুকের মধ্যে থাকে। আবার থাকে না। আত্মাটা বুকের মধ্যে টিপটিপ করে।

আমি বললাম, আসলে, ওটা হার্ট।

—হার্ট মানে?

—বুকের মধ্যে থাকে। সব রক্ত ওতে ঢুকে যায় আবার বের হয়ে আসে।

—কেন যায় আসে?

এতটা অবশ্য জানা নেই। বললাম, আসে যায়, রক্ত শোধন করে।

—তুই জানিস না দাদা, ওখানে ওটা পাখি। মরে গেলে উড়ে যায়। চোখে দেখা যায় না। হাওয়া হয়ে যায়। আমি এমন একটা ঘর বানাব দেখবি, পাখিটা উড়ে যেতে পারবে না। ঠোক্কর খেতে খেতে আবার নিজের জায়গায় ঢুকে যাবে। একটুকু ফাঁক থাকবে না। হাওয়া ঢুকতে পারবে না। ঘরে হাওয়া ঢুকতে না পারলে ওটা বের হবে কোন্ পথ দিয়ে। কাউকে মরতে দেব না।

পিলুর ভাবনা ভারি আজগুবি। তবু জানি, সে এই ঘরবাড়ির মৃত্যু নিয়ে ভাবছে। বাবা, মা, মায়া, ছোট ভাই-এর জন্য ওর কেমন ভারি টান ধরে গেল। সবাইকে রক্ষা করার জন্য সে নিজের মতো করে একটা পৃথিবীর কথা ভাবছে। ওভাবে যে আটকানো যায় না, বলে কোন লাভ নেই। বড় হলে বুঝতে পারবে। তারপরই মনে হল কী বুঝতে পারবে? মৃত্যুই শেষ! তারপরে আর কিছু নেই। বাবার ঘরবাড়ি পড়ে থাকবে, গাছপালা বড় হবে,. আরও বড় হবে—বাবার সেই ছবিটা ভাবতে আমার মধ্যে কেমন ভয় ধরে গেল। যে কোন মানুষের মৃত্যুই বোধহয় শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনে এসে শেষ হয়। বাবা লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন, সাদা চাদরে বাবার শরীর ঢাকা—বাড়ির গাছপালা বাতাসে দুলছে, বাবা নেই অথচ বাড়িঘর গাছপালা এবং শস্যক্ষেত্র একইভাবে আকাশের নীচে জেগে থাকবে। পিলু তার নিজের মতো করে এখন বাড়িঘরের সব কিছুকে রক্ষার নিমিত্ত বেহুলা লখীন্দরের মতো

কোনো আবাসের কথা ভাবছে। আমার ভারি হাসি পেল। বললাম, ঘরটা কোথায় বানাবি ঠিক করেছিস? আসলে নিজের ভেতরের দুর্বলতা পরিহার করার জন্য ওকে এমন প্রশ্ন করলাম এবং হাসলাম। যেন পিলুকে চাঙ্গা করতে চাইছি। ও নিয়ে ভাবতে নেই। ও নিয়ে ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না।

ভাবলেই কি হয়। বাবা এখন বের হবেন। আমার ভিতরেও আত্মা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন। এই সময় প্রশ্নটা বাবাকে করলে রেগে যাবেন না তো? কেন জানি বাবার কাছে আজ আমার আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছে হল। বাবার কথাবার্তায় অদ্ভুত এক আত্মদর্শন আছে। এই আত্মদর্শনের জন্য বাবাকে বললাম, একটা কথা বলব?

—তোমার আবার কী কথা? বাবা বের হবার আগে মৌজ করে চোখ বুজে তামাকু সেবন করছেন।

—বললাম, মানুষ এত করছে, আত্মাকে ধরে রাখতে পারছে না কেন?

—বাবা কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, ওকে ধরে রাখার কী আছে?

—না এই যে মানুষ মরে যায় তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু থাকে না।

—কেন স্মৃতি থাকে।

—স্মৃতি সব নয়।

বাবা বললেন, কিছুই শেষ হয়ে যায় না। তারপর গম্ভীর গলায় শ্লোক উচ্চারণ করলেন, ন জায়তে ম্রিয়তে.....। বলে তিনি বোঝালেন, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা কোন কিছু হতে উদ্ভূত নয়। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, চিরবিদ্যমান। দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই।

তারপর বাবা দুর্গা দুর্গা বলে বামুন খুঁজতে বের হলেন। আত্মার যদি এই প্রকৃতি তবে দ্বাদশ বামুনের জন্য বাবার এই যাত্রা কেন বুঝে উঠতে পারলাম না। বাবাকে আজ কেন জানি ভারি রহস্যময় মানুষ বলে মনে হল। চুপচাপ, কিছুটা হেঁটে বাড়ি পার হয়ে একটা জলার ধারে গিয়ে বসলাম। সামনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। সেখানে চাষীরা শীতের সবজি লাগাবার জন্য হালচাষ করছে। বুঝলাম মৃত্যু জীবনের কাছে শেষ কথা নয়।

শস্যক্ষেত্র চাষ-আবাদ দেখতে দেখতে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আমি একদিন থাকব না। আমি থাকব না, মা থাকবে না, বাবা থাকবেন না, একদিন সবাইকে তীর্থযাত্রার মতো সব ছেড়েছুড়ে বের হয়ে পড়তে হবে। দাসের মা এখন কোন্ জায়গাটায় আছে। কেমন বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে হাওয়ার মধ্যে মিশে আছে। দাসের বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। অন্নদান, জলদান হলেই মুক্তি পাবে। মৃত্যুর পর আমি নিজেও বোধ হয় বনভূমিটা ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। ঘরবাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করব। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ আমি সবাইকে দেখতে পাব।

তখনই পেছনে এসে কেউ দাঁড়াল। তাকালাম। মা। —তোকে কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

বুঝলাম দাসের মা'র মৃত্যু, বাবার দেওয়া আত্মার পরিচয়, এই চাষ-আবাদ এবং মানুষের জীবনযাপন, তার শেষ পরিণতির কথা ভেবে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। এক ফাঁকে ছোড়দির মুখও উঁকি দিয়ে গেল। ছোড়দিটা কে, বাড়ির কেউ জানে না। লক্ষ্মী যে এত কথা বলে সেও জানে না। অবশ্য বাবাকে ছোড়দি চিঠি না দিলে আমার বোধহয় ফিরে আসা হত না। পরে ছোড়দির চিঠিটা পড়ে দেখেছি। বিলু এখানটায় আছে। আমাদের ড্রাইভার সামসুরের সঙ্গে পাশের একটা গ্যারেজে থাকে। ওকে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। বাবা চিঠি পেয়ে বর্ধমান গেলে ছোড়দিকে দেখিয়ে বললেন, এই তোমার ছোড়দি। ছোড়দি যে আমার বয়সী, ফ্রক পরে, আমাকে নিয়ে গাড়িতে হাওয়া খেতে বের হয় আবার কখনও সাইকেলের পেছনে নিয়ে মাঠে হারিয়ে যেতে ভালবাসে, বাবা জানত না। ছোড়দির কতটুকুন বয়স। অথচ কি পাকা কথা। না, না বিলু পড়বে। বিলু তুমি পড়াশোনা না করলে মানুষ হবে কী করে! বড় হবে কী করে। যেন সে ছোড়দির কথা রাখার জন্যই পড়াশোনা করবে। বড় হবে। নাহলে যা অবস্থা, তাতে কাজে লেগে পড়া দরকার। অভাবের তাড়নাতে মা'র কান্নাকাটি মাঝে মাঝে কেমন পড়াশোনার বিষয়ে উদাসীন করে তোলে।

মা বলল, বাড়ি আয়। খাবি। মার পিছু পিছু বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম।

মা আর কোন কথা বলছে না। মা যেন সেই কবে থেকে জেনে গেছে, তার সন্তান বিলু বড় হয়ে গেছে। বিলু এই যে মাঝে মাঝে চুপচাপ থাকে, জলার ধারে এসে বসে থাকে, তা অন্য এক সুদূর পৃথিবীর ঘ্রাণ। মা তার বালিকা বয়সে যা টের পেয়েছিল, বিলু তার বয়স বাড়তেই সেটা টের পেয়ে গেছে। মা'র মুখ দেখলেই টের পাই, পিলু যতটা মা'র কাছের, আমি যেন আর ততটা নই। কলেজে পড়ার জন্য বাড়িছাড়া হবার দিনটিতে মা'র কী কান্না। পিলু পর্যন্ত বুঝিয়েছে, তুমি মা কাঁদছ কেন! এইতো বনটা, তারপর কারবালা, কাশবন। কাশবন পার হলে রেল-লাইন। লাইনে উঠলেই মন্দিরের ত্রিশূল দেখতে পাবে। খবর নেবার জন্য আমি এক দৌড়ে যাব, আর এক দৌড়ে আসব।

আমি জানি মা'র কষ্টটা কোথায়। মা'র কাছ থেকে আমি আলগা হয়ে যাচ্ছি। ছোড়দি, লক্ষ্মী, আমার জগতে এসে গেছে। বড় হতে হতে আরও আসবে। শেষে আমি এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। নাড়ির টান ছিঁড়ে যাবে। আর এক নারীর ছবি আমার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে, মা সেটা বোধ হয় বুঝতে পারে।

মা বলল, কলা দিয়ে মেখে খা। পিলুকে শুধু মুড়ি তেল দিয়ে মেখে দিয়েছি। মায়াকেও। আমার জন্য বাবার বরাদ্দ দুধ থেকে সামান্য দুধ তুলে রেখেছিল। পিলু গাঁইগুঁই করছে মনে মনে। দাদাটা একদিন দু'দিন থাকবে। সব ভাল-মন্দ খাবে। আমি দেবস্থানে ভাল-মন্দ খাই মা'র বিশ্বাস হয় না। বললাম, পিলুকে একটু দাও। কলাটা ভেঙে পিলুকে দিলে সে বলল, নারে দাদা, তুই খা। তোকে তো মা এখন রোজ হাতে ধরে কিছু দিতে পারে না। পিলু মাঝে মাঝে সত্যি বড় বিবেকবান মানুষ হয়ে যায়। তখন মনে হয় সেই বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। আমি কনিষ্ঠ। বললাম, হয়েছে, নে খা তো।

মায়া বলল, আমাকে দে দাদা।

একটা কলা আমরা তিন ভাইবোনে ভাগ করে খেলাম। গাছের আস্ত একটা কলার কাঁদি নামানো আছে। সবটাই বিক্রি হবে। নরেশ কুণ্ডু দাম-দরও দিয়ে গেছে। দামটা পেলে বাজারের পয়সা হয়। এই করে আমাদের সংসার চলে। হনুটাকে আমি হাতে ধরে কলা খাইয়েছি বলে মা কিছু বলেনি। পিলু ধরলে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। কত অল্প বিষয় নিয়ে মা'র যে মাথা গরম হয়ে যায় কখনও কখনও—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

মা বলল, এই সেদিন, তোর দাসের মা এসেছিল। কত কথা।

মানুষ মরে গেলে বোধহয় তার কথা বলতে সবাই ভালবাসে। মা আমাদের খেতে দিয়ে নিজে একটুখানি মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল। খুবই ছোট রান্নাঘর ওপরে তালপাতার ছাউনি। প্রতি বছরই বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘরটা বানাতে হয় বাবাকে। মা লেপে মুছে তকতকে করে রাখে। গরুর দুধ ছোট ভাইটার জন্যও আলাদা করে তুলে রাখা হয়। বেশি দুধ হলে, বিক্রি হয়। এ-বিষয়ে বাবার সঙ্গে মা'র ভারি মতান্তর। বামুনের বাড়িতে দুধ কবে কে বিক্রি করেছে। মা'র কথা—রাখ তোমার বামুনের বাড়ি। দুধ বিক্রি হলে হাতে কিছু পয়সা হয়। মা মাছ না হলে খেতে পারে না।—এয়োতি মাছ না খেলে সংসারে অমঙ্গল ঢোকে। বাবা তখন আর টুঁ শব্দ করে না। কারণ এ বিষয়ে বাবারও সংস্কার আছে বড় রকমের। বামুনের গরু দুধ দেবে, সে দুধ বিক্রি হবে বড় কথা, না, বামুনের বউ মাছ ভাত খাবে বড় কথা। দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে বাবা দুধ বিক্রির বিষয়টা মেনে নিয়েছিলেন। এখন গরুটার দুধ কমে যাওয়ায় গাছের কলা, পেঁপে বিক্রি হয়। তালের দিনে তাল। কিংবা সবজি ভাল হলে তাও বিক্রি। লাউ, কুমড়ো বাবার হাতে খুব ফলে। পাঁচ বিঘের মতো জমিটার বিঘেখানেক বাদে আর সবই এখন সাফ। ওদিকে বড় বড় দুটো শিশু গাছ আছে। হাতে টাকা জমলে গাছ কেটে একটা তক্তপোশ আর দুটো জলচৌকি বানাবার ইচ্ছে আছে মা'র। বলতে গেলে মা'র জীবনে এখন এটা একটা বড় রকমের স্বপ্ন।

হঠাৎ মা'র দিকে তাকিয়ে কেমন সংকোচে পড়ে গেলাম। মা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আজকাল মা আমাকে গোপনে দেখে। গোপনে চুরি করে এই দেখাটার মধ্যে কোথায় যেন মা'র একটা অহংকার তৈরি হয়। আসলে আমার মধ্যে মা বোধহয় বাবার তরুণ বয়সের ছবিটা দেখতে পায়। মা চোখ নামিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল, তুই যেদিন হলি, কী বৃষ্টি। তোর বাবা বাড়ি নেই। শ্বশুরমশাই

শুকনো কাঠ সব তুলে রেখেছিলেন বারান্দায়। আঁতুড়ঘরে সব লাগে। আমার জন্মদিনটার কথা বলে মা কেমন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। একজন মানুষ পৃথিবীতে এভাবেই আসে। বড় হয়। মা না থাকলে আমার কী হত। আমি তো জন্মাতামই না। নিথর এক অন্ধকারে আমার আত্মা শুধু ঘোরাফেরা করত। জন্মরহস্য বড় গভীর। ছোড়দি কেন জানি ফের সামনে দিয়ে আঁচল উড়িয়ে চলে গেল। কী বড় হবে তো। আমার কথা মনে থাকবে তো। ছোড়দির চোখেও মা হবার গোপন আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করলাম। সব ভাবতে গিয়ে আমার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমি আর মা'র সামনে বসে থাকতে সাহস পেলাম না। যা এত পবিত্র, যা আমার পৃথিবী আগমনে সহায়তা করেছে সেই বিষয়টা এত অপরাধপ্রবণ করে তোলে কেন যেন কোন পাপ চিন্তা করছি। কোনরকমে খেয়ে মা'র কাছ থেকে দ্রুত দৌড়ে পালালাম।

এই ঘর-বাড়ির প্রতি বাবার মত আমারও কেমন একটা মোহ জন্মে যাচ্ছে। বাবার লাগানো গাছপালা বড় সজীব। ওরা ক্রমেই আকাশের দিকে মাথা তুলে দিচ্ছে। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ে ডাল নড়ে। যেন গাছপালাগুলি হাওয়ায় নড়েচড়ে তারাও আমাদের মতো বেঁচে আছে বড় হচ্ছে প্রমাণ করে। বেশি হাওয়া দিলে ডালপালা নুয়ে যায়। যেন বাবার কাছে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলতে চায়, আমরাও তোমার সন্তান-সন্ততি। সার জল দিচ্ছ, আগাছা সাফ করে দিচ্ছ, বড় হতে মানুষের যা লাগে, আমরাও তাই পাচ্ছি। আমরা বুঝতে পারি, গাছের ডালপালা ভাঙলে বাবা কেন এত রেগে যান। — দিই তোমার একটা হাত ভেঙে, দিই তোমার কান ছিঁড়ে। বুঝবে লাগে কিনা। বাবার এই তিরস্কারে টের পাই যারা বাড়ছে তারা সবাই এই ঘর-বাড়ির প্রিয়জন। আর এ-জন্যই বুঝি গাছপালাগুলি আমাদের ঘর-বাড়ির চারপাশে সবুজ এক অকৃপণ সমারোহ সৃষ্টি করে চলেছে। যে কেউ ঢুকে গেলে ভাবতে পারে একটা তপোবনে ঢুকে গেলাম। এখন এই গৃহে মায়া যেন শকুন্তলার মত ঘুরছে ফিরছে। তার কাজের শেষ নেই। সে সকাল হলে ফুল তোলে। স্থলপদ্ম গাছটা কত বড় হয়ে গেছে। শীতের সময় বাবা সূর্যমুখীর চারা লাগান। এত ফুল ফুটতে শুরু করে যে তখন মনে হয় হলুদ এক প্রজাপতির দেশ। কত রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ে আসে। বাবার খুব এতে আনন্দ হয়। প্রজাপতি ফড়িং কীটপতঙ্গ সব মিলে তখন বাবার একটা ভিন্ন গ্রহ। তবু বাবা কেন যে বাড়ি থেকে বের হলে সহজে আর ফিরতে চান না এটা আমার মাথায় আসে না।

সকালে বের হয়েছেন, এখনও ফেরার নাম নেই। শুধু বলা, নিবারণ দাসের মা'র আদ্যশ্রাদ্ধ। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন। নিবারণ দাস তাঁর মা'র আত্মার সদ্গতির জন্য ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। শহরে ন'জন বামুন মানুকাকাই ঠিক করে দেবে। মানুকাকা শহরটায় কতকাল থেকে আছে। সবার নাড়ী নক্ষত্র তার জানা। তবু বাবা দুপুরে ফিরলেন না। বাবা না এলে মাও খাবে না। কত বলেছেন, ধনবৌ আমার জন্য বসে থেক না। দেরি দেখলে খেয়ে নিও। মানুষের সঙ্গে দেখা হলে কুশল জিজ্ঞেস করতে হয়। পরিবারের খবরাখবর নিতে হয়। মানুষের ভাল-মন্দ জানার আগ্রহ না থাকলে টান জন্মাবে কেন। দুদিনের পান্থশালা, সবার সঙ্গে যত পার একটু গল্প-গুজব করে নাও। এতে জীবনের প্রসারতা বাড়ে। অভাব গায়ে এঁটুলির মতো আটকে থাকতে পারে না।

এ দেশে আসার পর মানুষকে খবর দেবার মতো তাঁর কিছুই ছিল না। এখন কত খবর তাঁর। দেখা হলেই বলা, বিলুটা তো কলেজে পড়ছে। মেজটা পূজা-আর্চা করতে পারে। বাড়িতে আমলকী গাছটা যে সারা বছর ফল দেয় সেটাও একটা বড় খবর। এবারে সূর্যমুখী ফুলের আকার-প্রকার নিয়েও কথা হবে। খোঁড়া গরুটার জাত ভাল। দুধ দুইয়ে সেটা তিনি টের পেয়েছেন। কারো কোনো জমি ফাঁকা পড়ে থাকলে নানারকমের গাছের কথা বলবেন। বাড়ি আছে গাছপালা নেই বাবা সেটা ভাবতে পারেন না। জমির কোন্ দিকটায় কী গাছ পোঁতা হবে তারও এক তালিকা দেবেন। ফলের গাছ বাড়ির উত্তরের দিকে, পশ্চিমে নারকেলের গাছ। সামনে ফুলের গাছ। দেশী ফুলের প্রতি বরাবর আগ্রহ বাবার। শ্বেত জবা, রাঙা জবার গাছ, ঝুমকোলতা কিংবা অপরাজিতার লতা কখন কি লাগাতে হয় বাবার চেয়ে যে কেউ বেশি ভাল জানে না তা প্রমাণ করতে দরকার হলে খাটাখাটনি করে কলম বানিয়ে পৌঁছে দেবেন। যেন বাড়িটা সুন্দর করে তোলার দায় লোকটার না, বাবার।

মা গজগজ করলে বলবেন, গাছটা যদ্দিন বাঁচবে, আমি তদ্দিন ও-বাড়িতে, বোঝ না কেন?

লোকে টের পায় আমার গাছ সত্যি কথা বলে।

মা বলবে, একেই বলে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

বাবা বলবেন, একেই বলে জীবন। জীবন কখনও একা থাকতে পারে না।

—রাখ তোমার আদিখ্যেতা। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, এতক্ষণ ওই করে এলে।

—না না। ওটা ঠিক না। দই চিঁড়া-মুড়ি খেয়েছি। কী খুশী রতনবাবু।

বাড়ির গাছগুলিতে বর্ষাকাল এলেই বাবার কলম ধরানো। ভাল জাতের আম, জাম, জামরুল যত গাছপালা সবার ডালে ডালে কলম বানাবার এক উৎসব লেগে যায় তখন। কে কোন্ গাছের কলম চেয়েছে বাবার কাছে একটা তালিকা থাকে। ভুল করে কেউ নিতে না এলে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। সেখানেই শেষ নয়। কলমটা লাগাবার প্রক্রিয়া কি, মাটিতে সবুজ সার দিতে হয়, কতটা গর্ত সব ঠিকঠাক করে তবে ফেরা। বাড়ি ফিরে গাছতলা দিয়ে যাবার সময় বলবেন, দিয়ে এলাম তোমার ছানাপোনাকে। খুব আদরযত্ন করছে। এই করেই শেষ হলে তবু কথা ছিল। তা না, ফাঁক পেলেই আবার ঘুরে দেখে আসেন। দেখে আসা, আদরযত্ন হচ্ছে কিনা, না রুগ্ন হয়ে গেল। এমন একজন যার বাবা তিনি যে বের হলে দুপুরে ফিরতে পারেন না সেটা আমাদের এতদিনে ঠেকে শেখা উচিত ছিল।

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বাবার পথ চেয়ে বসে আছে। পিলুকে একবার পাঠিয়েছে বাদশাহী সড়কে, যদি দূর থেকে দেখা যায়। শীতের বেলা পড়ে আসে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মা আঁচল পেতে বারান্দায় শুয়ে থাকে। মায়া বারবার ডাকে, ও মা ওঠো! খেয়ে নাও না। তুমি তো জানই বাবা এমন করে। খেয়ে নাও না।

ছোট ভাইটা মা'র শিয়রে বসে আছে। সেও মাকে ঠেলছে। মা এবং মায়া যতটা বোঝে আমরা ততটা বুঝি না। সেও বোধহয় ঠেলে ঠেলে মাকে বলছে, মা ওঠো। মা মা।

আসলে মা কেন খাচ্ছে না বুঝি। বাবার ওপর রাগ অভিমান এবং ক্ষোভে মা বিপর্যস্ত। ভেতর থেকেই খাবার ইচ্ছেটা থাকে না। রাস্তাঘাটে কত রকমের বিপদ ওঁত পেতে থাকে। যাবার সময় বলেও গেছে, এসে খাব। আর কিনা সাঁজ লেগে গেল তবু ফেরার নাম নেই। আমাকে ডেকে বলল, একটু এগিয়ে দেখ না বাবা। বলে উঠে বসল। পিলু কখনও কখনও সদয় হলে জল এনে দেয়, পুলিশ ক্যাম্প থেকে। আজ মা'র অবস্থা দেখে, সবই যে তাকে করতে হবে বুঝতে পারছে। পিলু কলসীটা মাথায় নিয়ে বলল, আয় দাদা, বাবাকে দেখে আসি। দেখে আসার জন্য যখন পুলিশ ক্যাম্প পার হয়ে যেতেই হবে, তখন জলটা নিয়ে এলে মা'র কাজে সামান্য সুরাহা হবে।

এছাড়া পিলুর ধারণা, বাবা বাড়ি না থাকলে মা'র যে বৈরাগ্য দেখা যায় সবকিছুতে পুত্রদের কাজেকর্মে উৎসাহ দেখলে তাতে ভাটা পড়তে পারে। বাবা বাড়ি না থাকলে পিলু খুবই সুপুত্র বনে যায়। নিজে থেকে জলটা নিয়ে আসার এটাই তার প্রেরণা। সে তার সব সময়ের সঙ্গী হনুটাকেও কাছ থেকে আলগা করে ফেলল। পেয়ারা গাছটার ডালে তাকে বেঁধে জলের কলসী নিয়ে ফের ডাকল আমাকে। —চল না দাদা। জল তুই পাম্প করে দিবি।

মা ফের বলল, বিলু যা না বাবা, এগিয়ে দেখ একটু। জল আনা না আনার বিষয়ে মা'র কোন এখন মাথাব্যথা নেই। মানুষটা এখনও ফিরল না—কি ভাবে! এতবার কথা খেলাপ কেউ করে! তারপরই কি ভেবে যেন মা'র মুখ ভারি বিষণ্ণ হয়ে যায়। বোধহয় কোন অমঙ্গল চিন্তা মাথায় ঢুকে যায় তখন। এ সময় মাকে প্রবোধ দেবার ভরসা আমার। যাবার সময় বললাম, পঞ্চানন তলায় খোঁজ নেব মা?

কেমন জলে পড়ে গেছে মতো বলল মা, যা ভাল মনে হয় কর।

ইদানীং বাবা বোধহয় একটু বেশি গৃহাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিলেন। অথবা এও হতে পারে অনেক দিন পর বাবা ফের বাড়ি ফেরার ব্যাপারে মা'র সঙ্গে কথা খেলাপ করেছেন। যে মানুষটা ভারি বিবেচক হয়ে উঠেছিল, সেই ফের এমন অদায়িত্বশীল হতে পারে ভেবে বোধহয় মা কষ্ট পাচ্ছে!

পঞ্চাননতলা গেলে কলসীটা সঙ্গে নেওয়া যায় না। বাদশাহী সড়কে উঠে করাত কল পার হয়ে গেলে বোর্ডের রাস্তা। রাস্তাটা রেল লাইন পার হয়ে শহরের দিকে গেছে। মোড়ে কয়েক ঘর উদ্বাস্তু

জমি-জমা কিনে বাড়ি করেছে। বাবার বলতে গেলে এটা দ্বিতীয় জমিদারী। সব ক'ঘরই বাবার যজমান। ওখানে গেলে বাবার কোন খবর পাওয়া যেতে পারে! অগত্যা দুই ভাই মিলে বাপের খোঁজে বের হলাম। রাস্তায় পিলু বলল,পঞ্চাননতলায় খোঁজ না পেলে মানুকাকার বাড়ি যাব। শীতের সন্ধ্যায় দু'ক্রোশ পথ অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায়। আর দু'জন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করি। এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এতবার শহরে গেছি, চোখ বেঁধে দিলেও বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না।

পুলিশ ক্যাম্পটা এখন প্রায় খালি। ম্যাগাজিন কোয়ার্টারে মাত্র একজন সেন্ট্রি পাহারা। কালীপুকুরের দক্ষিণ পাড়টায় অফিসারদের কিছু কোয়ার্টার। ওদের ছেলেপিলেরা বাগানে ছুট বসন্তি খেলছে। পিলু বাবার খোঁজে বের না-হলে এখন এদের মধ্যে রাজার মতো বিরাজ করত। ওকে দেখে কেউ কেউ দৌড়ে এল। সে ওদের পাত্তা দিল না। বলল, বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি।

—তোর বাবা আবার উধাও হল।

—উধাও হবে কেন!

—এই যে বলিস বাবাটাকে নিয়ে আমাদের হয়েছে মুশকিল। ক'দিন বাদে বাদে বেপাত্তা।

—বাবা তো কাজে যায়। কাজে গেলে দেরি হতেই পারে।

আমার সামনে পিলু এদের কথা বরদাস্ত করতে চায় না। সে আমাকে নিয়ে জোরজার করে রাস্তায় উঠে গেল। পুলিশের প্যারেড শেষ হয়ে যাবে এবার। বিউগিল বাজছে। এই বিউগিল বাজলেই আমরা আমাদের সময় ঠিক করে নি। পাঁচটা বাজে! আবার ফল-ইনের সময় বিউগিল বাজবে। আমরা শহরে গেলে ফিরতে ন'টা বেজে যেতে পারে। পুলিশ ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তখন সেন্ট্রি হাঁকে, হু কামস্ দেয়ার। পিলু বলবে, আমি, আমি পিলু। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রি ঠিক বুঝতে পারে, বন-জঙ্গলের মধ্যে যে ঠাকুরকর্তা বাড়ি ঘর বানিয়েছে, পিলু তার ছেলে। পিলু ফের বলবে, আমার সঙ্গে দাদা আছে। বাবাকে খুঁজতে শহরে গেছিলাম। এগুলো আমার পরিচিত দৃশ্য—কাজেই রাত হলেও খুব একটা ভয় থাকে না।

কিন্তু আমাদের বেশি দূর যেতে হল না। করাত কলটার কাছেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকটার মুখে দাঁড়ালে পঞ্চাননতলার বড় বটগাছটা দেখা যায়। তার নীচে রাস্তাটা বাঁক খেয়ে একটা গেছে শহরে অন্যটা ইস্টিশনে। সাইকেল রিকশাটা কিছুক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল মোড়টা, ওটা সরে যেতেই পিলু বলল, ঐ দেখ বাবা আসছে। সাঁঝবেলার একটা লাল আভা থাকে। অনেক দূরের বস্তু বোধহয় তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে! আমার নজরে আবছা মতো একটা মিছিল ভেসে উঠল। একদল মানুষ প্রায় মিছিল করে আসছে। এদের মধ্যে আমার বাবা আছেন, আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। বললাম, কী আন্দাজে বলছিস? কোথায় বাবা?

—ওদের মধ্যে ঠিক দেখবি বাবা আছে।

পিলু কী হাওয়ায় বাবার ঘ্রাণ পায়। আমি কিছুই ঠাওর করতে পারছি না, অথচ পিলু অনায়াসে পারছে। বাবার কাছ থেকেও আমি বোধহয় আলগা হয়ে যাচ্ছি। পিলুর এখনও সেটা হয়নি। পিলুর জীবনে কোন ছোড়দির আবির্ভাব হতে এখনও অনেক দেরি। এসব ভেবে পিলুর ওপর আমার খুব হিংসা হল। বললাম, তুই বড় আজেবাজে বকিস।

আর তক্ষুনি দুটো ট্রাক সাঁ সাঁ বেগে ধেয়ে আসছে। দানবের মতো কেমন খাব-খাব করতে করতে আসছে। পিলু আমার হাত ধরে টানতে টানতে জমিতে নেমে গেল। সে জানে এদের কোন মায়া দয়া নেই। কীট-পতঙ্গের মতো ওরা মানুষকে দেখে। তার দাদাটির হয় বাস ড্রাইভার, না হয় ট্রাক ড্রাইভার হবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত বাবার পরিকল্পনা মতো তার দাদাটি যে সে-রাস্তায় হাঁটেনি এতে এখন সে গর্বিত। কারণে অকারণে সে তার বন্ধুদের বলতে ভালবাসে, দাদা আমার কলেজে পড়ে। এই কলেজে পড়ার সঙ্গে পিলুর কোথায় যেন সম্ভ্রমবোধ জড়িত। ট্রাক দুটো ঠিক যখন আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, পিলু মুখ ভেংচে দিল। ওর ভারি রাগ ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর। কবে কাকে চাপা দিয়েছিল, সেই রাগ সে পৃথিবীর তাবৎ ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর পুষে রেখেছে। একটা কিছু হাতে নিয়ে সে ঢিল ছুঁড়তে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আমি হাত ধরে ফেললাম, এই কী করছিস। ওরা

যদি গাড়ি থামিয়ে আমাদের তাড়া করে।

—ধুস। পারবেই না।

কেন পারবে না বুঝতে পারি। পিলু শশকের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে। আমিও পারি। কিছুটা ছুটতে পারলেই নবমী বুড়ির বনটা পাওয়া যাবে। সেখানে ঢুকে গেলে কার সাধ্য নাগাল পায়। যেন বড় বড় গাছগুলি দাঁড়িয়ে সেই দানবের মতো ট্রাক ড্রাইভারদের হাত থেকে তাকে এবং তার দাদাকে রক্ষা করবে। চোখের পলকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে, সেটা সে ভালই জানে। তবু আমার কথায় যেন নিরস্ত হল। বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি, এ সময় উটকো ঝামেলা বাধানো যে ঠিক হবে না, পিলু সেটা বুঝে হাত থেকে ঢিলটা ফেলে দিল। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফের রাস্তায় উঠে বলল, ঐ দেখ। আমি মিছে কথা বলি না।

ট্রাক দুটো দেখে আমরা বেশ অনেকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রাক দুটো চলে যাবার পর রাস্তায় উঠতে গিয়ে তা ধরা গেল। আমি একা থাকলে বোধহয় এতটা হত না। কিন্তু পিলুর যে নিজের চেয়ে দাদার জীবনের জন্য বেশি মায়া। তার কিছু হলে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু দাদার কিছু হলে বাবার ঘর-বাড়ি নিঃস্ব হয়ে যাবে সে বোধ প্রবল। টানতে টানতে এতটা দূরত্ব তৈরী করার এটাই মোক্ষম কারণ। রাস্তায় উঠে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বাবার নাগালও পেতে পারি। পিলু আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল, মিছিলটা আরও কাছে এসে গেছে। পিলু তারপর দৌড়াতে থাকল। মিছিলটার মধ্যে আমার বাবা যে সত্যি আছেন এবার আর অবিশ্বাস করার উপায় রইল না। মিছিলের মধ্যে বাবাকে দাদার আগে আবিষ্কার করার নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে।

পিলু ঠিক আবিষ্কার করেছে। সে মিছিলের শেষের লোকটির হাত থেকে কী একটা যেন নিয়ে নিল। তারপর হাত তুলে ডাকল, দাদারে।

আমি হাত তুললাম না। পিলুর ছেলেমানুষী আমার সাজে না। রাস্তার এক পাশে খুব ধীর স্থির চিত্তে বাবা যে সত্যি আছেন দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলাম।

উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া আমার চাদর উড়িয়ে নিচ্ছিল। পিলুর একটা হাফ শার্ট গায়ে। ওর শীত কম। সে দৌড়ায় বলে শীত কম লাগতে পারে। এও হতে পারে সে শরীরে ঠাণ্ডা লাগলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কেবল লাফায়। এ-গাছের ও-গাছের পাতা ছেঁড়ে। ডাল ভাঙে। বাড়িতে যা করতে পায় না, রাস্তায় বের হলে সেটা পুষিয়ে নেয়।

কাছে এলে দেখলাম, পিলুর হাতে নতুন একটা গামছার পুঁটুলি। বাবা বামুন খুঁজতে গিয়ে নিজেও কিছু উপার্জন করে ফিরছেন। হয়তো চণ্ডীপাঠ, কিংবা কোনো বাড়িতে বামুনের অভাবে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, অথবা বিপদনাশিনীর ব্রত করে ফিরছেন। বাবার পুঁটুলিটা পিলুর অধিকার করার কারণ, ওতে চাল-ডাল কিছু আনাজপাতি সহ দক্ষিণার এক পয়সা দু'পয়সা লুকিয়ে থাকতে পারে। বাড়ি গেলে সে প্রথমে বারান্দায় ওটা খুলে হাঁটকাবে—যদি মিলে যায়। মিলে গেলে সে তামার পয়সাটা হস্তগত করবে। মা মায়াও উপুড় হয়ে পড়বে। যার হাতে ঠেকবে, সেই তার উত্তরাধিকারী। পয়সা দখলের জন্য তখন বাড়িতে হলুস্থূল কাণ্ড। বাবা, বারান্দায় বসে তখন প্রসন্ন চিত্তে হুঁকো খাবেন।

বাবা ডাকলেন, বিলু এদিকে এস।

মিছিলটা থেমে আছে।

বাবা বললেন, প্রণাম কর। পিলু প্রণাম কর।

বাবার এই এক বাই। বাড়িতে, রাস্তাঘাটে স্ববর্ণের কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, প্রণাম না করলে বাবা রাগ করেন। আমার এ-সব ভাল লাগে না। এই রাস্তায় কেন। বাড়ি গেলে করা যাবে। আমার পছন্দ নয় হুটহাট প্রণাম করা, কিন্তু বাবার অবাধ্য হতে বাধে। বামুনেরা দাঁড়িয়ে আছেন। ন'জন ন'রকমের। একজন আবার এত কুঁজো যে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। তিনি আমাকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলেন। যেন কিছুটা জিমনাস্টিকের খেলা দেখাচ্ছেন। কিম্ভূতকিমাকার সব মানুষ। একজন অনবরত খক্‌খক্‌ করে কাশছিলেন। খালি পা চারজনের। একজনের পায়ে খড়ম। তিনজনের টায়ারের চটি। একজনের কেডস জুতো। মাথায় লম্বা এবং নাতিদীর্ঘ টিকি। দু'জনের টিকিতে জবাফুল বাঁধা। বয়স সবারই আমার পিতৃদেবকে ছাড়িয়ে। ছেঁড়া নামাবলী, সাদা চাদর, তালিমারা

কালো পশমের সোয়েটার। কনকনে শীতে কুঁজো মানুষটার হাতের লাঠি কাঁপছে।

পিলু লাইনবন্দী বামুনদের প্রণাম করছে। সবাই রাস্তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। পিলুর সব কিছুতেই চট-জলদি ব্যাপার। সে দ্রুত প্রণাম সেরে হাতে পোঁটলা নিয়ে ছুটল। মাকে খবরটা দিতে যাচ্ছে। বাবা তো ফিরছেনই, সঙ্গে সেই বামুনের বাহিনী। কাল শ্রাদ্ধ। আজ শীতের রাতে এরা কোথায় থাকবে, খাবে কি, কোথায় বসতে দেওয়া হবে, বাবার মাথায় এ-সব আছে বলে আমার ধারণা হল না। ভয়, নিষ্ঠাবান বামুনের অভাবে দাসের মা'র আবার সদ্‌গতির না বিড়ম্বনা হয়। আত্মা নিয়ে বোধহয় বাবা বিড়ম্বনার মধ্যে আছেন। আত্মা না প্রেতাত্মা। আত্মার তুষ্টি বিধানে বড় কর্মতৎপর এখন তিনি। তুষ্ট না হলে এই আত্মাই প্রেতাত্মা হয়ে বাবার বাড়িঘরে ভর করতে পারে। এই ভয়ে বোধহয়, শুধু নেমতন্ন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি, সঙ্গে লোটা-কম্বলের মতো ঝুলিয়ে এনেছেন।

আমার প্রণামের পালা।

প্রশ্ন ঃ তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

—আমার না, ওঁর? বাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। বাবার স্বভাব এই। নিজের বললে পাছে ঈশ্বর কুপিত হন ভয়ে, ওঁর বলে রেহাই পান। এতেই যে যার সার কথা বুঝে নেয়। আশীর্বাদ, বেঁচে থাকো বাবা! দীর্ঘজীবী হও। পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল কর। কেউ মাথায় হাত রেখে মন্ত্র উচ্চারণও করলেন।

যাঁর পায়ে কেডস এবং পোশাকে একটু বেশি ধোপদুরস্ত অর্থাৎ যিনি এঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত দেখতে, প্রশ্ন করলেন—তুমি কলেজে পড়ছ?

বাবা তাহলে তাঁর বাহিনীকে পুত্রের গৌরবময় অধ্যায় শুনিয়ে রেখেছেন।

বললাম, হ্যাঁ।

তিনি আমার প্রতি হৃষ্টচিত্তে তাকিয়ে আছেন। বাবা বললেন, ইনি পঞ্চতীর্থ কুলদাচরণ। বিশিষ্ট পণ্ডিত। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাবার কর্মক্ষমতা জাহির করতে চাইলেন। তিনি শুধু ব্রাহ্মণ ভোজনে সাদামাটা বামুনই আনেননি। সঙ্গে একজন পঞ্চতীর্থও নিয়ে এসেছেন। বাবা কি আগে থাকতেই বাড়ির আবহাওয়া টের পেয়ে গেছেন। আগে থাকতেই আমাকে সতর্ক করে দিলেন, মাকে বুঝিও। তিনি যেন কলহে প্রবৃত্ত না হন।

বাবার বাহিনী হাঁটতে শুরু করেছে। দীর্ঘকায়, ক্ষীণকায় এবং অস্থিচর্মসার এই ব্রাহ্মণকুলকে নিয়ে বাবা আমাদের থাকবার ছোট ঘরটায় সামলাবেন কী করে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মা'র অপ্রসন্নতা বাড়বে। সেই ভয়েই বোধহয় বললেন, বিলু পা চালিয়ে যা। একটু দৌড়ে যা। তেনাদের হাত মুখ ধোবার জল তুলে রাখ। সন্ধ্যা-আহ্নিক জপতপ আছে।

আমি দৌড়ালাম। বাড়িতে এতগুলো লোকের আহারের কি ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। সারাদিন মা তো উপবাসেই আছে। এমত অবস্থায় এই বাহিনী, এমন প্রশ্ন করতে পারে। বলতে পারে, তোর বাবার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে। একটু জোরে বললেই কানে যেতে পারে। বিষয়টি বাবার কাছে খুব পরিষ্কার বলেই কেমন চোখে-মুখে শঙ্কা দেখতে পেলাম। বাবার জন্য এসময় কষ্টের উদ্রেক হতেই দেখলাম ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে গেছি। মা তো বুঝবে না, বাবা তাঁর বাড়িঘরের মঙ্গলার্থেই কোন ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে দাসের মা'র আত্মার মুক্তি ঘটবে না এমন বিশ্বাস যাঁর, সঙ্গে লোটা-কম্বলের মতো ঝুলিয়ে না এনে করেনটা কী। তিন চার ক্রোশ হেঁটে কেউ যদি শেষ পর্যন্ত আসতে রাজী না হয়! দাসের হয়ে যখন কাজটার ভার নিয়েছেন তখন তা নির্বিঘ্নে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাবার স্বস্তি নেই। বাড়ি ঢুকতে আমারও ভয় লাগছিল। পিলু ততক্ষণে বাহিনীর খবর ঠিক মাকে পৌঁছে দিয়েছে। এতগুলো মানুষ বিনা নোটিশে বাবা বাড়ি নিয়ে ঢুকলে জননীর পক্ষে যে প্রকৃতিস্থ থাকা দুরূহ বুঝতে আমার কষ্ট হল না। ঘরে চাল ডাল বাড়ন্ত থাকাটা একজন সংগ্রামী মানুষের লক্ষণ। বাবা কথাবার্তায় এটা মাকে বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন না। সেই সংগ্রামী মানুষ যে যখন তখন একটা বাহিনী নিয়ে ঢুকতেই পারে—তাঁর হক আছে, ঢুকবার মুখে বাবার এমন একটা হম্বিতম্বি চেহারা দেখতে পায় এবং এতেই যত অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বাড়ির এই অশান্তি বাইরের লোক টের পাক আমি পিলু কেউ চাই না। এখন কলসী কলসী জল আনা দরকার।

ক্যাম্পের কল। বেশ দূর। কত জল লাগবে কে জানে। জপতপে বসলে কী হবে! কোথায় বসবে। সরু বারান্দা—ন'জন বামুন আড়াআড়ি বসলে পাত পাতার জায়গা থাকবে না। উঠোনে—কিন্তু যা হিমেল হাওয়া, ঠাণ্ডাতে সেই কুঁজো লোকটা পর্যন্ত বাবার ঘরবাড়িতে শেষ নিশ্বাস না ত্যাগ করে। ভোজনের লোভেই এতটা হেঁটে আসা, চোখমুখ দেখে ঠিক টের পেয়ে গেছি।

বাড়িতে বারান্দায় একটা হারিকেন জ্বলছে। কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কী ব্যাপার। এমন একটা উদোম ঘরবাড়ি—হাট করে সব খোলা, মা, মায়া গেল কোথায়? পিলুটা। ডাকলাম, পিলু, পিলুরে। ডাকলাম মা, মায়া? কোন সাড়া নেই। ঘরে নেই, রান্নাঘরে নেই, গোয়ালে থাকতে পারে না। ঠাকুরঘরে নেই। গেল কোথায়! তখনই গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে বাড়ির দিকে যাবার পথটায় পিলুর গলা পেলাম। ছুটে গেলে দেখলাম অন্ধকারে মা মায়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে। মা'র পাশে ছোট ভাইটা। পিলুর খবর শোনার পরই মা যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে গেছে। গৃহত্যাগের হুমকি। পিলু সাধাসাধি করছে, মা তুমি যেও না। বাবা তো চিরটা দিন এমন। বাবা ফিরুক না। সব শুনে না হয় যেও। তুমি খেলে না মা?

আমি মা'র কাছে গিয়ে বললাম, বাড়ি চল। মা বলল, তোরা গিয়ে থাক। আমি থাকব না। আমার বুঝি শরীর না।

—আমরা সব করব। তবু চল।

—ঘরে এক মুষ্টি বেশি চাল নেই। কিচ্ছু নেই। এতগুলো লোককে কী খাওয়াবে তোর বাবা?

—বাবা আসুক তো। দেখ না কী হয়।

—কী হবে আবার। বলবে যাও না, ধীরেনের বাড়িতে, ধারকর্জ মানুষ কত করতে পারে। তোর বাবার কী সে বোধ আছে!

আমি জানি, মাকে কোনরকমে দুটো মুখে দেওয়াতে পারলে সব অভিমান রাগ জল হয়ে যাবে! বাবা ফিরে আসায় মা'র দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে, কিন্তু আক্রোশটা যায়নি। মা'র এটা হয়। বাবার উপর সব আক্রোশ মেটাবার একটাই পথ। মা অনশন করে বাবার উপর সব আক্রোশ মেটায়। যে-ভাবে হোক, বাহিনী ঢোকার আগে মাকে খেতে বসাতে হবে। বললাম যদি এক্ষুনি না ফের আমিও বাড়ি ছেড়ে পালাব।

আমার পালানোটাকে মা ভয় করে। ত্রাসের মধ্যে পড়ে যায়। একবার পালানোতেই মা তা টের পেয়েছে। মা'র বিশ্বাস এটা আমার স্বভাবে আছে। কোষ্ঠীতেও লেখা আছে। এমন কথায় মাকে খুব কাহিল দেখাল। বলল, যা যাচ্ছি।

—না, এক্ষুনি।

—আমার ভাল লাগছে নারে।

—তুমি এখন যাবে। যাবে কিনা বল?

—তোর বাবা খেল না!

—বাবা ঠিক খেয়েছে।

—কী করে বুঝলি।

—মুখ দেখে। মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি।

মা আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকল। বাড়ি ফিরে মাকে ঠেলতে ঠেলতে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। পিলু জল ভরে দিল। মায়া ভাত বেড়ে দিল। মা মাথা নিচু করে খাচ্ছে। বাইরে রাতের অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। গরুটা হাম্বা করে ডাক দিল। কুকুরটা রান্নাঘরের দরজায় বসে মা'র খাওয়া দেখছে। এ সময়েই রাস্তায় বাবার গলা খাকারি শোনা গেল। বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানান দিচ্ছেন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে হাজির। পিলু বারান্দার হারিকেনটা হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল। মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা এগিয়ে দ্যাখ। ওনাদের বসতে দে। আমি খেয়ে জল আনতে যাচ্ছি। আমার মা মুহূর্তে একেবারে অন্য নারী হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বাবা কত বড় কৃতী মানুষ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাবা ওনাদের বসতে দিয়ে বলল, জামা-কাপড় ছাড়ুন, হাত-পা ধোন। ক্লান্তি দূর করুন—আমি আসছি। পিলু খড়-বিচালি পেতে

তার উপর লম্বা তালপাতার চাটাই ফেলে দিয়েছে। সব বামুনেরই একখানা গামছার পুঁটুলি সঙ্গে। ওতে জামাকাপড়। পিলু মা'র সঙ্গে হারিকেন নিয়ে ক্যাম্পে যাচ্ছে। মাকে বললাম, আমি যাচ্ছি। তোমায় আর অসময়ে খেয়ে জল টানতে হবে না। বড় একটা মাটির জালাতে জল ভরা হচ্ছে। বাবা, মাকে একটা কথা না বলে চলে গেল। দু-পক্ষই তেতে আছে এখনও বোঝা যাচ্ছে।

বাবা যখন এলেন তখন একেবারে অন্য মানুষ। সঙ্গে নিবারণ দাস এসেছে। তার গৃহভৃত্য মাণিক এসেছে! মাণিকের মাথায় ন'জন বামুনের সিধা। মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কর্তামা, সামান্য ভোজনের আয়োজন কর্তাদের জন্য যদি করে দেন। মাথার সেই বড় বেতের কাঠাটা আমরা দু ভাইয়ে নামাতে পারছিলাম না, এত ভারি। মা'র মুখ ভারি প্রসন্ন হয়ে গেছে। ডাল, সবজি, তেল, নুন, শুকনো লঙ্কা যাবতীয় সব কিছু। পেল্লাই কাঠাটা টানতে টানতে দু-ভাই ঘরে নিয়ে গেলাম। মা বলল, পিলু বাবা বসে থাকিস না। মায়া ইদিকে আয়। এগুলো আলাদা করে নে।

বাবার তখন গম্ভীর গলা, পিলু তোমার মাকে বল, বেশি কিছু করতে হবে না। মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, ফুলকপির ডালনা, চাটনি। মাণিক দই নিয়ে আসছে। কী বলেন, রাতের ভোজন এতেই হয়ে যাবে। বাহিনীর দিকে তাকিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন। আবার ডাক, পিলু, দেখতো ব্যাগে তামাকের গোলা আছে।

পিলু বলল, দাদা যা না, বাবার কাছে থাক। কত কিছুর এখন দরকার পড়বে। আসলে মুহূর্তে ঘরবাড়ির ছবি কত পাল্টে যায়। মা এক হাতে সব্জি কাটছে। এক হাতে সরু চালের ভাত বসিয়ে দিয়েছে। কাঠের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। দুটো উনুনে রান্না। মায়া এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। বাবা তাঁর বাহিনীর সঙ্গে তখন শাস্ত্র আলোচনায় মত্ত। কে বলবে তিনি এ-বাড়ির মানুষ। অতিথি অভ্যাগতের মতো তিনিও হুঁকা খাচ্ছেন আর ধর্মশ্লোক নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। দেখে মনে হবে আবার না বামুনে বামুনে লাঠালাঠি লেগে যায়।

পিলু মাকে এক ফাঁকে এসে বলল, বাবার কত বুদ্ধি।

মা বলল, হ্যাঁ বুদ্ধি না ছাই।

—তুমি মা বোঝ না! ওরা না এলে আমরা এত ভাল খেতে পারতাম! ভোজ শুধু কাল নয়, আজও।

মা বলল, যা তো বাবা, ঠাকুরের বৈকালিটা দিয়ে আয়। তোর বাবা সময়ই পাবে না। সারাদিন মানুষটার বড় খাটাখাটনি গেছে। পিলু চলে যেতেই ফের ডাক। মা এ সময় বড় আস্তে কথা বলছেন। মা যে গলা চড়ালে রাস্তা থেকে শোনা যায়, এ মাকে দেখে কে আর বিশ্বাস করবে। পিলু এলে বলল, তোর বাবাকে একটু ডেকে দে।

পিলু বলল, বাবা ডাকছে।

বাবার গায়ে একটা খদ্দরের চাদর। পায়ে খড়ম। পুষ্ট গোঁফ। বাবা আমার বড় সুপুরুষ। কাছে এলে মা ফিসফিস করে বলল, তুমি একটু দই মুড়ি খাও। কখন রান্না হবে! পেটে তো কিছু নেই বুঝতে পারছি। বলেই মা বাবার দিকে চকিতে তাকাল। মাথার ঘোমটা সামান্য টেনে দিল। বুঝি মা'র এই সুন্দর চাউনি বাবাকে ঘরবাড়ির জন্য আরও দীর্ঘায়ু করবে। বাবার পৃথিবীটা কত ভরাট এ মুহূর্তে দু'জনের কাছাকাছি থাকার মধ্যে টের পেলাম। আমার মা, আমার বাবা সুখে-দুঃখে বড় কাছাকাছি। পিলুকে আজ আর পায় কে। বনভূমির মধ্যে এতগুলি মানুষের উপস্থিতি, ধর্ম আলোচনা, আকাশের অজস্র নক্ষত্র, এবং ফলপাকুড়ের গাছ সহ পেছনের বনভূমি নিয়ে আজ বড় বেশি চঞ্চল। এমন সুসময় মানুষের জীবনে বড় কম আছে। পিলুর কাজেকর্মে ছোটাছুটি দেখলে তা আজ বড় বেশি বোঝা যায়।

•

এভাবে বৈশাখ মাস এসে গেল।

মাঝে একদিন পিলুকে সঙ্গে এনেছিলাম। বৌদি, বদরিদা, নটু, পটু, লক্ষ্মী সবাই এতে খুশি। সারাটা সকাল আমাকে পড়তে দেয়নি। নটু পটুও পিলুকে অজুহাত খাড়া করে পড়া থেকে উঠে গেছে।

এই দেবস্থান অনেকটা জায়গা জুড়ে। সামনে রেললাইন, পাশে আমবাগান, পেছনে ঝিল। উত্তরে

বড় বড় সব অশ্বত্থের ছায়া। বটের ঝুরি নেমে জায়গাটাকে এক গভীর অরণ্য সৃষ্টি করেছে। পিলু যতক্ষণ ছিল এই সব বড় বৃক্ষের নিচে ঘুরে বেড়িয়েছে। সকালে মুড়ি, মণ্ডা, সন্দেশ কলা খেয়েছে। সকালের খাওয়াটা আমাদের লক্ষ্মীর জিম্মায়। এত দিয়েছিল যে পিলু যতই খেতে ভালবাসুক—এত খাওয়া কঠিন। কিন্তু লক্ষ্মী শুনবে না। পিলুর রাক্ষুসেপনা ধরা পড়বে ভয়ে সেবারে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম লক্ষ্মী এটা বোঝে। যাতে পিলুর কোন কারণে কম না হয় সেজন্য লক্ষ্মী সতর্কতার খাতিরে জামবাটি ভরে সব দিয়েছিল। লক্ষ্মীকে বলেছিলাম, অতটা দিলে, খেতে পারবে না। নষ্ট করবে।

লক্ষ্মী আমার কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। পিলুকে বলেছিল, খাও। লজ্জা কর না। দাদাটা তোমার খাওয়া পছন্দ করে না।

পিলু বড় বড় চোখে শুধু দেখছিল। খাওয়া পেলে সে খুব চুপচাপ খেতে ভালবাসে। বড় বড় চোখে তাকায় আর গোগ্রাসে খায়। রাস্তায় নিয়ে আসার সময় বলেছিলাম, রাক্ষসের মতো খাস না। রয়ে সয়ে খাস।

খাওয়ার প্রথমদিকে বোধহয় মনে ছিল কথাটা। কিন্তু খেতে খেতে কখন ভুলে গেছে। ভাল খাবার পাতে পড়লেই মনে হয় কেউ ওরটা কেড়ে নেবে। সে প্রায় বলতে গেলে গিলতে আরম্ভ করেছিল। লক্ষ্মী খেতে দিয়ে অন্য দিন চলে যায়। আজ গেল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিলুর খাওয়া দেখছিল। নটু পটুর এই সব মণ্ডা খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। মন্দিরে জমা থাকে সব। সকালে বৌদি দেবী দর্শনের সময় বের করে আনেন। সবার জলখাবার ও থেকেই হয়। নটু পটু মাঝে মাঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হল্লা জুড়ে দেয়। খাব না, রোজ রোজ এক খাবার, খাব না। তখন তেল-মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা দিলে ওরা বড় কৃতার্থ হয়ে যায়। পিলুর রোজ তেল-মুড়ি—আজ মিঠাই মণ্ডা। সে সত্যি বড় বেশি গিলছে। আমাদেরটা প্রায় পড়েই আছে, আর পিলুর ভরা জামবাটি শেষ। লক্ষ্মী আমার দিকে একবার ত্যারচা চোখে তাকাল। পিলুকে যে বারণ করব, এ-ভাবে খাস না, খেতে নেই, সে উপায়ও নেই।

লক্ষ্মী বোধহয় আবার কিছু আনতে গেল।

ভেতরে আমার প্রচণ্ড রাগ। তুই বুঝিস না কেন মাস্টারের ছোট ভাই তুই। কিন্তু রেগে গেলে খারাপ দেখাবে। শুধু বললাম, পিলু আর খাস না। দুপুরে যে বড় রকমের ভোজ আছে ও-কথা বলতে পারিনি। সামনে নটু পটু। ওদের কাছে পিলুর খাওয়াটা বড় নয়, পিলুকে নিয়ে কতক্ষণে আমার জিম্মা থেকে বের হয়ে যাবে। কী করে যে পিলুকে একা পাওয়া যায়। অগত্যা নটু পটুকে বললাম, দেখে আয় ত বদরিদা কী করছে।

ওরা চলে গেলে বললাম, মারব এক থাপ্পড়। পাজি হতভাগা এত খেলি।

পিলু বলল, বারে দিলে খাব না।

—দুপুরে কত বড় ভোজ। আর তুই....।

পিলু জিভ কামড়ে বলল, ইস, ভুলেই গেছি রে দাদা।

—লক্ষ্মী তোকে আবার মিঠাইমণ্ডা দেবে। খাস না কিন্তু।

—আর খাই। সে-যেন খুবই আহাম্মকের মতো খেয়েছে এমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

লক্ষ্মী এলে, পিলু ছুটে পালাল। খাব না বলতে তার লজ্জা লাগে। জীবনেও এ-কথা বলার সুযোগ পায়নি। ও চলে গেলে লক্ষ্মীকে বললাম, নিয়ে যাও। দুপুরের খাওয়াটা ওর আর মাটি কর না।

লক্ষ্মী কী বুঝল কে জানে। বলল, ছেলেমানুষ খাবে। ঘুরে বেড়ালেই হজম হয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়া মাটি করার জন্য ওকে এত দিইনি মাস্টার। লক্ষ্মী সব বাটি, গেলাস হুড়মুড় করে তুলে নিলে বুঝতে পারলাম, লক্ষণ ভাল না। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী শোন।

—কী তুমি কিছু ভাবলে না তো!

—কী ভাবব! বলে আর দাঁড়াল না। লক্ষ্মীকে নিয়ে এই এক মুশকিল। ও কোন ভুল করলে সেটা কিছুতেই শুধরে দেওয়া যাবে না। ওর একটা কারণ, সে বালবিধবা এবং দেবস্থানে পড়ে আছে বলে সবাই তাকে হেনস্থা করে। সব সময় ওর মধ্যে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের একটা প্রবল ইচ্ছে থাকে।

পিলু আসা মাত্রই সেটা শুরু হয়েছে। ভেতরে ওর কোথাও একটা খালি জায়গা আছে। সেখানে

কখন কে যে জায়গা করে নেবে বোঝা যায় না। বোধহয় পিলুকে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে চেয়েছিল। এ-কথার পর সে পিলুর আর কোন খোঁজখবরই করেনি। এমন কী আমি পিলু, বদরিদা, নটু, পটু যখন বারান্দায় খেতে বসলাম, লক্ষ্মী একবার ভুলেও এদিকটায় ঘুরে যায়নি। বৌদি এক হাতে সব করতে থাকলে, একবার শুধু বদরিদা বলেছিলেন, লক্ষ্মী কোথায়? বৌদি বলেছিলেন, গোলাঘরে আঁচল পেতে শুয়ে আছে। কে এখন ওর মুখ নাড়া শুনবে।

লক্ষ্মীর মুখনাড়াকে বৌদিও ভয় পায়। ডাকেননি। বদরিদা আর কিছু বলেন নি। আমার কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। দাসী বাঁদির কাজ করিস, তোর এত মুখনাড়া থাকবে কেন। বৌদির উপর রাগ হল, এত ভাল মানুষ হলে তোমার সংসার চলবে কী করে। তারপরই মনে হল, কারণটা কী পিলু? সেই খাওয়া নিয়ে কথা বলায় কী লক্ষ্মী অভিমান করে শুয়ে আছে? ওর এই মান অভিমান নিয়ে প্রশ্ন করার কেউ নেই। অসুখ বিসুখ হতে পারে—না সে প্রশ্ন করারও কেউ নেই। বৌদিও সাহস পায় না। ওর মুখনাড়ার ভয়ে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করলে বদরিদা যাবেন। এক ধমক, ওঠ, ওঠ বলছি। যাও খাওগে। তখন লক্ষ্মী সুড়সুড় করে উঠে পড়বে। খাবে আর কাঁদবে। এ দৃশ্য ওর আমি কতদিন দেখেছি। আমার কথায় কেউ আঁচল পেতে গোলাঘরে শুয়ে আছে ভাবতেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। এক অসহায় নারী অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার নিয়ে দেবস্থানে পড়ে আছে। কতবার তার প্রমাণ পেয়েছি। পিলুর খাওয়া নিয়ে লক্ষ্মীকে ও-ভাবে না বললেই ভাল হত। খাচ্ছি আর নিজেকে বার বার ধিক্কার দিচ্ছি। বৌদি শুধু একবার বলেছিলেন, এ কী বিলু তুমি কিছুই খাচ্ছ না। কী বলব! একদিন পিলুকে না খাইয়ে পাঠিয়ে দেবার পর খেতে পারছিলাম না, খেতে খেতে গোপনে কাঁদছিলাম। লক্ষ্মীর জন্য তেমনি এক আমার কষ্ট। দেবস্থানে এক মারমুখী নারীর ছবির মধ্যে কোনো গোপন সৌন্দর্য্য এ-ভাবে লুকিয়ে থাকে সেদিন টের পেয়েছিলাম। সবার অলক্ষ্যে সেই গোলাঘরে গিয়ে ডেকেছিলাম, এই লক্ষ্মী আজ আবার না খেয়ে থাকবে না তো?

সহসা দেখেছিলাম, লক্ষ্মী আঁচল তুলে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল আমার দায় পড়েছে না খেয়ে থাকতে। তারপর শাড়ি সামলে সুমুখে যাবার সময় মুখের উপর রেগে বলে গেছিল, তুমি আমাকে কী ভাব ঠাকুর।

লক্ষ্মীর আমাকে এই প্রথম ঠাকুর বলে সম্বোধন। এটা সম্মানের না অসম্মানের বুঝতে পারিনি। পরেও লক্ষ্মী আমাকে একা পেলে বলেছে, ঠাকুর, আর পড়ে আমায় উদ্ধার করতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে শুয়ে পড়। রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে।

অথবা বলত, ঠাকুর বিয়ে থা কর। সুন্দর মতো ঠাকরুণ আসুক, পুজো দেব।

—কাকে?

—তোমাকে না গো, আমার প্রাণের ঠাকুরকে।

মাঝে মাঝে মনে হত, লক্ষ্মীর কী মাথায় গোলমাল আছে। বড় বেশি বেপরোয়া। বয়স অনুযায়ী বেশি পাকা পাকা কথা বলে। লক্ষ্য করেছি, আমি বাড়ি যাব বললে, লক্ষ্মী কেমন জলে পড়ে যায়।

—আমাদের বুঝি পছন্দ না ঠাকুর।

—এ কথা কেন?

—এই যে ছুটি হলেই বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয়। আমাকে নিয়ে যাবে?

—যাবে তুমি?

—যাব না কেন! একদিনও তো বললে না যেতে!

পরে মনে হল, আমি লক্ষ্মীকে একটা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি না। কি যেন সংকোচ। অথচ লক্ষ্মী কত সহজে বলল, যাবে। আমি নিজেও না বুঝে কথাটা বলেছি। লক্ষ্মী আমার সঙ্গে যেতে চাইলেই নিয়ে যেতে পারি না। আর লক্ষ্মীর যা স্বভাব, হয়তো গিয়ে ভেতর বাড়িতে তখনই বলবে মাস্টারের সঙ্গে যাচ্ছি। আজ ফিরব না। জলটল যা লাগে তুলে নিও। লক্ষ্মী বললে দোষের হবে না। তার স্বভাব সবাই জানে। কিন্তু আমার উপর বাড়ির মানুষদের ভরসা নাও থাকতে পারে। কী আক্কেল তোমার মাস্টার, একটা সোমত্ত মেয়েকে একা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চাও। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললাম, চল না একদিন। বৌদি, দিদি, নটু, পটু, তুমি

সবাই। সবাইকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।

—সবার সঙ্গে কেন যাব ঠাকুর? যেতে হয় তোমার সঙ্গে যাব। যা কপালে থাকে হবে।

আমার চোখমুখ কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে। লক্ষ্মীর আকারে-ইঙ্গিতে কথাবার্তা কেমন আমাকে নাড়া দেয়। বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, সে হয় না।

—হয় না কেন!

—কিছু একটা হলে?

—কী হবে।

—হতেও তো পারে।

—তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে বুঝি?

—হতেও পারে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে থেকে আমি নিজেও পেকে যাচ্ছিলাম। লক্ষ্মী কি ধরতে পারে! আসলে আমার মুখ যতই নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখাক, আমি তা নই। আমিও বড় হয়ে গেছি। আমারও একটা ছোট্ট মত বালিকাকে সঙ্গী পেতে ইচ্ছে করে। এই বয়সটার কী ধর্ম লক্ষ্মীর বোধহয় তা নখদর্পণে। কলেজে আমার বয়সী একটা সুন্দর মেয়েকে দেখার জন্য কতদিন যে কলেজ টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। আবার চোখ তুলে যদি আমাকে দেখতে পায় মেয়েটা। নাম জানি না। নাম জানার সাহসও ছিল না। ওর সঙ্গে আমার কোন ক্লাস হয় না। কেন যে ওদের সেকসনে আমি ভর্তি হলাম না। কো-এডুকেশন কলেজ। মেয়েটিকে যখনই দেখি তখনই ভারি নতুন মনে হয়। আমার মতো লম্বা। পাতলা চেহারা। লালপেড়ে শাড়ি পরনে। পায়ে নীল রঙের চটি। শীতের দিনে র‍্যাপার গায়ে যখন সে সিঁড়ি ধরে কেয়াফুলের গাছটার পাশে হারিয়ে যায় তখন কেমন এক শূন্যতায় ভুগি। আমার মুখ দেখে লক্ষ্মী কী টের পায় তার ঠাকুর ভালবাসার কাঙাল।

লক্ষ্মী হঠাৎ জোরে হেসে দিল, সে সাহসই তোমার নেই।

আমি আর একটা কথা বলতে সাহস পেলাম না। লক্ষ্মী এর পর কী ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে বুঝতে পারছিলাম না। অথচ সেই একদিন, আমি ওর মুখ দেখতে গেলে, কি কাতর গলা, না মাস্টার না, আমার সঙ্গে জড়িয়ে যেও না। তোমার অমঙ্গল হবে।

আসলে আমার এই ঘরটা বিকেলের দিকে খালিই পড়ে থাকে। এ বাড়িতে সবারই দিবানিদ্রার অভ্যাস। রাতে শিবা-ভোগের জন্য বারটা পর্যন্ত জাগতে হয় এটা এ-বাড়িতে থাকার পরেই বুঝে গেছি। এখন বুঝে গেছি, কলেজ থেকে সকাল সকাল ফিরলে লক্ষ্মী খুশি হয়। সে যেন অপেক্ষা করে থাকে। সে কী সত্যি মনে মনে তার প্রাণের ঠাকুর ভেবে নিয়েছে। নাহলে এত সেবাযত্ন, আমার যে বাবুয়ানি, সব কিছু ফিটফাট, চুল লম্বা, এবং একদিন কী ভেবে দাড়ি কামাব কিনা ভাবতেই লক্ষ্মীর উদয়। লক্ষ্মীকে বললাম, নাপিত এলে বল ত। নাপিত মাঝে মাঝে আসে। বদরিদার দাড়ি কামিয়ে যায়। মন্দিরের চত্বর দিয়ে ঢোকে এবং দাড়ি কামিয়ে আবার ফিরে যায়। সাবান ব্রাশ, গরম জল, খুর, সব লক্ষ্মীর জিম্মায় থাকে। লক্ষ্মী আমাকে খবরটা দিতে পারে ইচ্ছে করলে। লক্ষ্মী বলল, এ-কিগো, তুমি কি বুড়ো হয়েছ?

—বুড়ো হলেই বুঝি দাড়ি কামায়।

—দাড়ি কামালে তোমাকে বিশ্রী দেখাবে। ঠাকুর তোমার এ-মতি কেন!

—আচ্ছা লক্ষ্মী, তুমি আমায় ঠাকুর ঠাকুর কর কেন?

—মানুষের ঠাকুর থাকে না?

—তুমি তো আমার সঙ্গে ঝগড়া কর কেবল।

—ঠাকুর আমিও তোমার মতো ভালবাসার কাঙাল। বলেই ছুট লাগিয়েছিল। সবাই ঘুমাচ্ছে। ভেতরের দুটো দরজা পার হয়ে লক্ষ্মী এখন কোথায় যেতে পারে জানি। সে ঝিলের ঘাটলায় গিয়ে বসে থাকবে। রান্নাবাড়ি পার হয়ে পেছনের মাঠটায় পড়লে ঝিলের ঘাটলা দেখা যায়। সেখানে লক্ষ্মী

নেই। সে ভালবাসার কাঙাল, আমিও। লক্ষ্মীর জন্য মায়া লাগে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, আবার কলেজের সেই সমবয়সী মেয়েটাও আমাকে কেমন মুহ্যমান করে রাখে। সে একবার চোখ তুলে দেখলেই সারাটা দিন আমার যে কী ভাল কাটে।

লক্ষ্মী ঝিলের ঘাটলায় নেই, অশ্বত্থের নিচে নেই, রেললাইন ধরে হেঁটে কোথাও যেতে পারে—লাইনে উঠে দেখলাম নেই, ফিরে এসে মন্দিরে ঢুকতে যাব, দেখি লক্ষ্মী মন্দিরের দরজার সামনে সিঁড়িতে মুখ নিচু করে বসে আছে। বাবাঠাকুর তাঁর ঘরে বসে পুরনো সব ধর্মপুস্তক ঘাঁটাঘাটি করছেন। লক্ষ্মীর প্রতি তাঁর স্নেহ প্রবল। লক্ষ্মীকে দেখলে তিনি মন্দিরের দরজা খুলে বসেন। বলেন, কী খেলি হারামজাদী। অথবা এমন অবস্থায় দেখলে, ভোগের প্রসাদ তুলে হাতেও দিতে পারেন। ভোগের প্রসাদ খেতে ইচ্ছে হলে লক্ষ্মী এখানটায় এসে বসে থাকে জানি। আজ তার কিছুই নেই। কেমন একা এই বিশ্বে লক্ষ্মীর এই নিমগ্ন স্বভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। এখানে কিছু বলাও যায় না। বাবাঠাকুর শুনতে পাবেন। কিসে কি রোষ জন্মায় বাবাঠাকুরের, এত দিন থেকেও টের পাইনি। বরং ভয়ে এড়িয়ে চলি মানুষটাকে।

আমি চলে যাচ্ছিলাম। তিনি কীভাবে যে সব টের পান। ডাকলেন এই বিলু কাকে খুঁজছিস?

—কাউকে না বাবাঠাকুর।

—মিছে কথা বলছিস?

—না বাবাঠাকুর কাউকে নয়।

লক্ষ্মী আমার দিকে তাকাল। আমার চোখে এক অসহায় তরুণের ছবি দেখে বুঝি মায়া হল তার। বলল, বাবাঠাকুর মন্দিরের শান কী ঠাণ্ডা গো। এখানে পড়ে থাকতে মন চায়।

বাবাঠাকুর বললেন, আরে বেটি তুই! বলেই তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে থাকলেন। এই মানুষটির এক এক সময় এক এক ভাব। যেন লক্ষ্মীর মুখে সাক্ষাৎ বিশ্বজননী দর্শন করছেন, ক্ষ্যাপা মা আমার বলে এমন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন যে আমাদের দু'জনের পক্ষেই সরে পড়ার এটা প্রকৃষ্ট সময়। লক্ষ্মী চোখ টিপে বলল, পালাও। পালাও। না'লে এক্ষুনি কে জানে বাবাঠাকুরের কী মতি হবে। হয়তো গঙ্গাস্নানে যাবেন বলবেন। কার সাধ্য আছে বলে, না যাব না। নতুবা নীলকুঠির মাঠে। মন্দির থেকে বের হয়ে গাছপালার নিচে অথবা মাঠের মধ্যে দিয়ে তিনিও হেঁটে যেতে বলবেন। কার সাধ্য আছে বলে, না যাব না।

তখন কুমারসম্ভব কিংবা কিংস লিয়ার থেকে আবৃত্তি। এমন গম্ভীর গলা যে বিশ্বচরাচরে মানুষের অস্তিত্ব বড় অর্থহীন লাগে। আমার ছোট হৃৎপিণ্ডে অথবা রক্তের ভেতরে যে সুন্দর তরুণী কেবল ভেসে বেড়ায়—সে কথা মনে থাকে না। অকিঞ্চিৎকর মনে হয় জীবন, সব কিছু অর্থহীন। মৃত্যু মানুষের আর এক নিবিড় বন্ধুত্ব, দূরের কথা বলে। মানুষটার কাছে গেলেই এমন টের পাই। বড় ভয় লাগে বাবাঠাকুরকে। বাবাঠাকুরের চোখ রক্তবর্ণ। চুল সাদা। নড়বড়ে দুটো দাঁত ঠোঁটের উপর ঝুলে থাকে। পরনে গেরুয়া কৌপিন। গায়ের চামড়া কোঁচকানো এবং শ্বেত চন্দনের মতো সাদা। কখনও গম্ভীর, কখনও উত্তাল, আবার কখনও ভারি ছেলেমানুষ। কোন এক উত্তরায়ণের সকালে বাবাঠাকুর যৌবনে গৃহত্যাগ করেছিলেন। ধন-সম্পদ সুন্দরী পত্নী বিশাল জমিদারি পরিত্যাগ করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বদরিদা তাঁর সাক্ষাৎ পান লক্ষ্মণঝোলায়। বদরিদা কফের ধাতের মানুষ। সেখানে মরণাপন্ন হলে বাবাঠাকুর শিয়রে হাজির এবং আরোগ্যলাভ।

বাবাঠাকুর সম্পর্কে এই দেবস্থানে এমন সব অলৌকিক কাহিনী কত আছে। লক্ষ্মী ফাঁক পেলে সেই সব কাহিনী শোনায়। মন্দিরে তিনি থাকেন না। রাত হলে নিমগাছটার নিচে শুয়ে থাকেন। শিবা ভোগের সময় উঠে যান। তখন তাঁর গলার সেই বিচিত্র ডাক—আয় আয় মা। সেই ডাকে দুটো সাদা রঙের শেয়াল ঝিল থেকে উঠে আসে এবং ভোগ খেয়ে চলে যায়। বাবাঠাকুরের কোন কাজে এ পরিবারের ত্রুটি থাকলে ক্ষেপে যান। দেবস্থান ত্যাগ করে দূরের ব্রহ্মময়ী কালীবাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন শিবাভোগ নিয়ে ভোগান্তির শেষ থাকে না। সেই অপার্থিব দুই প্রাণী, একমাত্র বাবাঠাকুরের আহ্বানেই সাড়া দেয়। অন্য কেউ ডাকলে তারা আসে না। বদরিদা সংসারের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েন। বাবাঠাকুরের পায়ের কাছে গিয়ে দিনের পর দিন হত্যে। বাবাঠাকুরের মর্জির বিরুদ্ধে

যাবার সাহস এ পরিবারের কারোর নেই। সুতরাং লক্ষ্মী চোখ টেপায় পা টিপে টিপে সরে পড়লাম। আর তখুনি সিংহের মতো গর্জন, পালাচ্ছিস বিলু!

থমকে গেলাম। চাতাল এবং বিশালকায় প্রাঙ্গণ জুড়ে মন্দিরের কারুকাজ করা ছাদের নিচে বাবাঠাকুরের কণ্ঠ বজ্রধ্বনির মতো শোনায়। আমি যে বাবার ছেলে, তার পক্ষে এই নিনাদ অবহেলা করা খুবই শক্ত। পা টিপে টিপে আবার এগিয়ে যেতে হল। বললেন, তোর ভাইটাকে দেখালি না।

আমার ভাইটা এ বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। নটু পটুর সঙ্গে কোথায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মীর খোঁজে গিয়ে ভাইয়ের কথা ভুলে গেছিলাম। বললাম, কোথায় যে গেল!

লক্ষ্মী বলল, দেখগে মাস্টার ছাড়াবাড়ির গাছে ওরা ওয়া ওয়া খেলছে।

দেবস্থানের দক্ষিণ দিকটায় একটা বড় ছাড়াবাড়ি। সেখানে শীতের সময় শহর থেকে লোকজন আসে বনভোজন করতে। রথও দেখা, কলাও বেচা। সেখানে যেতেই শুনতে পেলাম কে যেন গাইছে, গাঁয়ের ধারে শান্ত নদীটি। কে গায়, ভারি মিষ্টি গলা তো। নটু পটু কখনও গান গায় বলে জানি না। কোনও রাখাল বালকের মতো গলার স্বর চারপাশে ব্যাপ্ত। উদার, উদাস, মায়াবী। পিলু কখনও গান গায় বলে জানি না। তবে কে গায়। ডাকলাম, পিলু আছিস? সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাড়াবাড়ির কোনও অদৃশ্য স্থান থেকে যে গানের সুর ভেসে আসছিল তা থেমে গেল। আবার ডাকলাম, নটু পটু। এবারে জবাব, আমরা এখানে মাস্টারমশাই। গাছের উপর থেকে কেউ কথা বলছে। বড় বড় সব আম, জাম, জামরুলের গাছ। একটা গাছ মাটির সঙ্গে কিছুটা সমান্তরাল হয়ে উপরে উঠে গেছে। গাছটার কাণ্ডটার উপর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো উপরে উঠে যাওয়া যায়। গাছটার তিনটি ডাল তিন দিকে ডালপালা মেলে দিয়েছে। ওরা তিনজন গাছের ডালে বসে গাছপাকা আম সব সাবাড় করছে।

বললাম, কে গান গাইছিল রে?

নটু বলল, আমি না মাস্টারমশাই।

পটু বলল, আমি না।

পিলুও বলল, আমি গাইনি দাদা।

গান গাওয়াটা যে লায়েক হয়ে যাওয়ার শামিল, অপরাধ, ভব্যতার লক্ষণ না, তিনজনই সেটা বুঝে ফেলেছে। বয়সটাই এমন যে সবকিছু সহজেই অস্বীকার করা যায়। কিন্তু এত সব ভাববার সময় নেই। বাবাঠাকুর বসে আছেন। বললাম, পিলু চল, বাবাঠাকুরকে প্রণাম করবি। পিলু কেমন ভূত দেখে আঁতকে ওঠার মতো বলল, আমি যাব না দাদা। বাবাঠাকুর ইচ্ছে করলে চোখের পাকে সব ভস্ম করে দিতে পারে। আমি যাব না, ভয় করে।

—বাবাঠাকুর মানুষকে ছাগল ভেড়া গরু বানিয়ে দিতে পারে।

ওর হাত ধরে বললাম, আয়। বাবাঠাকুর সাধুসন্ত মানুষ। তোকে এ সব কে বলেছে।

—কে বলবে আবার। আমি জানি।

পিলুর মনের মধ্যেও নানারকম ভয় তবে বাসা বেঁধে থাকে। ফকির আউল বাউল দরবেশ সাধুসন্ত সবাই ভিন্ন মার্গের জীব। এরা খুশিমত সবকিছু করতে পারে। এরা না পারে এমন কিছু নেই। দেবস্থানে ছাড়া-পাঁঠা অনেক বিচরণ করে বেড়ায়। যাদের মানত থাকে, অথচ বলি দেবার প্রথা নেই, তারা মায়ের নামে পাঁঠা ছেড়ে দিয়ে যায়। পাঁঠার পাল ঘুরে বেড়ায় দেবস্থানের এই ছাড়াবাড়ি অথবা রেল লাইনের ধারে। সন্ধ্যা হলে চাতালে ফিরে আসে। সময় মতো বলি হয় না বলে ভোমরা পাঁঠার সংখ্যা অনেক। এইসব দেখেই পিলুর ধারণা, এই দেবস্থানে এত পাঁঠা যখন, বাবাঠাকুরের কাজ না হয়ে যায় না। কোপে পড়ে গেলেই পাঁঠা। তারপর ঢাক গুড় গুড়—ট্যাং ট্যাং ফাঁসির বাজনা, আর এক কোপে গলা ফাঁকা।

পিলু কিছুতেই যেতে চাইছে না। প্রায় হাড়িকাঠে পাঁঠা টেনে নিয়ে যাবার মতো ধরে নিয়ে যাচ্ছি। নটু বলছে, বাবাঠাকুর খুব ভাল। তুই যা। তোকে দেখবি হাত ভরে মণ্ডা দেবে।

পিলু, যে পিলু ভাল খাবারের নামে পাগল সেই কিনা, নিমগাছটার নিচে আসতেই আমার হাত কামড়ে দিল। আমি বললাম, এই কী করছিস! আঃ বলে হাত ছেড়ে দিতেই দু-লাফে সে রেল লাইন পার হয়ে ছুট লাগাল। যত ডাকি, তত সে দৌড়ায়। মাঠে নেমে ডাকলাম, পিলু যাস না। কে শোনে

কার কথা। আসলে সব নষ্টের গোড়া এই নটু পটু। বললাম, ঠিক তোরা বাবাঠাকুরের নামে লাগিয়েছিস।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনই একসঙ্গে এক বাক্যে বলে উঠল, আমি না আমি না, পটু। আমি না আমি না, নটু।

দাঁড়া দুটোকেই আজ মজা দেখাব। লক্ষ্মী দূরে দাঁড়িয়েছিল। বললাম, লক্ষ্মী একটা ভাল দেখে কঞ্চি নিয়ে এস ত। এরা বড্ড মিছে কথা বলতে শিখেছে।

ছিটকিলার ঝোপ থেকে সরু মতো একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এল লক্ষ্মী। মাস্টারের যা মর্জি, মুহূর্তে রাগ জল হয়ে যেতে পারে। সে দৌড়ে গেল। এবং নিমেষে পাতা ডাল ভেঙে লকলকে বেতের মতো বস্তুটি আমার হাতে দিয়ে বলল, ছাল-চামড়া তুলে দাও মাস্টার। জীবনেও যেন আর মিছে কথা না বলে।

পটু একটু গোঁয়ার প্রকৃতির। সে বলল, মারুক না মারুক। তোমাকে লক্ষ্মীদি দেখ কী করি!

লক্ষ্মীকে চোখ রাঙানোতে আমার কেমন ইজ্জতে লাগে। আমার সামনে লক্ষ্মীকে শাসানো হচ্ছে!

লক্ষ্মী বলল, কী আস্পর্ধা মাস্টার। তোমার সামনে আমাকে এ কথা বলল। এ ছোঁড়া বড় হলে কী হবে!

বলব না! আমি বলছি, বলিনি।

ওরা জানে, এ-ক'মাসে আমি ওদের উপর একদিনই মাত্র রোষে এলোপাথাড়ি মেরেছি। নটু পটু দেবস্থানে আসা এক পুণ্যার্থীর সন্তানকে কটু কথা বলে গালিগালাজ করেছিল এবং অভিযোগ দু'-একটি অশ্লীল কথাও সঙ্গে বলেছে। আমার ছাত্রের হেন অশালীনতা যেন আমাকেই বিদ্ধ করেছিল। ওরা আমার ছাত্র, ছাত্রের এই আচরণ, তার গৃহ-শিক্ষকটি না কী জানি। সেইহেতু আমি একজন বাউন্ডুলে বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রহার একটু মাত্রাতিরিক্ত করে ফেলেছিলাম। বদরিদা কিংবা বৌদি এ নিয়ে বরং আমাকেই পরে সমর্থন করেছেন। এই দুই চঞ্চল বালককে যে বশে আনতে পেরেছি তাতেই তাঁরা খুশি। কিন্তু পরে বড় কষ্ট হয়েছিল। নিজেই গেঁদাল পাতার রস লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এবং আরোগ্যলাভে যা সেবাযত্ন সবই আমি করেছি। এতে এই দুই বালক আমার প্রতি যেমন ভালবাসা বোধ করে, তেমনি আবদার রক্ষার্থে যখন তখন ছুটি চায়। আমার কথার উপর আর কারো কথা নেই। এই কম বয়সে এত বেশি শাসন করার অধিকার পাবার ফলেই বোধহয় নিজের মধ্যে কোন স্বৈরাচারী তৈরি হয়ে যায়। ভিতরটা আমার রাগে গোঁ গোঁ করছিল। কিন্তু ভয়, শুরুটা জানি, শেষটা জানি না। মাত্রাতিরিক্ত হয়ে না যায় এই ভয়ে অনেকদিন শাসনের নামে লকলকে বেতের ডগা মাথায় ছুঁয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করি, বেশি দূর এগোই না। বারবারই মনে রাখার চেষ্টা করি, শত হলেও আমি এদের আশ্রিত।

বললাম, তুই বলিসনি তো, কে বলেছে?

পটু চুপ।

লক্ষ্মী বলল, তুমি মাস্টার যেমন। এ ছোকরাই বলেছে। দেখছ না চোখ মুখ। চোখ মুখ দেখে আমার মনে হয় না পটু বলেছে। তা না হলে সে এতটা বেয়াড়া হয়ে উঠত না। লক্ষ্মী কিন্তু নাছোড়বান্দা। মাস্টারের সামনে তাকে শাসিয়েছে। যদি কিছু না বলি, আমি জানি লক্ষ্মী আমাকে নেবার জন্যও তৈরি হয়ে আছে। তোমার মাস্টার কিস্যু হবে না। একটা শয়তান এত্তটুকুন ছোঁড়াকে তুমি সামলাতে পার না, তোমার মুখের সামনে শাসায়, তুমি আবার করবে মাস্টারি। তোমারও আখের ঝরঝরে, এদেরও আখের ঝরঝরে।

সমূহ উভয়সংকট থেকে নিজেকে ত্রাণ করার কি উপায় ভাবছিলাম। বললাম, নটু তুই পিলুকে বাবাঠাকুরের নামে ভয় দেখিয়েছিস? পিলু যে চলে গেল বাবা ঠাকুরকে প্রণাম না করে, তিনি কী ভাববেন বল ত?

আমার নরম কথাবার্তা শুনে লক্ষ্মী মুহূর্তে ক্ষেপে গেল। বলল, নাও হয়েছে। দাও আমার কঞ্চিটা। বলে সে আমার হাত থেকে প্রায় হ্যাঁচকা মেরে সেই প্রহার দেবার বস্তুটি কেড়ে নিল। তারপর যেন আমাদের চেনেই না, এমন করে চারদিকে দেখতে দেখতে বলল, মাস্টারি ছেড়ে রাখালি করগে। যার যা মানায়।

লক্ষ্মীর কথায় আমার মাথা গরম হয়ে গেল।

—তাই করব।

—তাই কর না, কে বারণ করেছে। এখানে মরতে এলে কেন?

পটু বলল, লক্ষ্মীদি ভাল হচ্ছে না। তোমার বাড়ি? তুমি বলার কে? তুমি আর কখনও মাস্টারমশাইকে এমন কথা বলবে না। খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি। লক্ষ্মী ততোধিক ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোর বাড়ি? তোর খাই? তোর পরি? তুই বলার কেরে?

—আঃ লক্ষ্মী কী হচ্ছে।

—কী না, কী বলে! দাদাকে না বলেছি—তুই আমাকে এ কথা বলতে পারলি পটু। আমি দেবস্থানে পড়ে আছি বলে, যা মুখে আসে তাই বলবি। লক্ষ্মী আঁচল চাপা দিয়ে ঝরঝর করে কাঁদছে।

পটু বলল, দেখলেন মাস্টারমশাই—আমি কী বলেছি! আপনাকে কী না বলেছে, পটু বদরিদার ভয়ে চোখ-মুখ কেমন শুকনো করে ফেলেছে।

—লক্ষ্মী তুমি কিছু মনে কর না। ছেলেমানুষ।

—মনে করব না, একশোবার মনে করব। তোমার সামনে যা-তা কথা বলল, আর তুমি কিছু বললে না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাকেও জড়াচ্ছে। লক্ষণ ভাল না। লক্ষ্মীর চোপাকে সবাই ভয় পায়। আমিও পাই। বেশি আর এগোনো ঠিক না। —দুটো খেতে পরতে দিস বলে এত কথা। লক্ষ্মী গজগজ করছে। গাছকোমর বাঁধা ওর শাড়ি। গায়ে ব্লাউজ নেই। পায়ে সে কখনও কিছু পরে না। পরার নিয়ম নেই। সে বাড়ির একাই সব সামলায় বলে বৌদি বরং একটু বেশি তোয়াজেই রাখে। সুতরাং এ-হেন তাজা বাঘিনীকে শান্ত না করলে মাস্টার ছাত্র মিলে সবার উপরই কৈফিয়ত তলব হতে পারে।

লক্ষ্মীকে বুঝ দেবার জন্য বললাম, দেখ না দুটোকে আজ কী করি। তুমি যাও।

—আমি যাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। কি করতে পার, কর দেখি।

—আমি বলেছি কিছু করব?

—বললে না, এক্ষুনি তো বললে, যাও।

খুবই মুশকিল। কোন কথাই বলা যায় না। আমার উচিত ছিল, মারি না মারি দু-ঘা লাগাই। শুধু এটুকু হলেই লক্ষ্মী প্রসন্ন হবে। ওর প্রসন্নতা রক্ষার্থে অগত্যা বললাম, পটু তুই বড় বাড় বেড়েছিস। দাঁড়া। হাত পাত।

পটু এ সব বিষয়ে সব সময় প্রস্তুত থাকে বলে সে হাত পাততে বিন্দুমাত্র দেরি করল না।

লক্ষ্মী বলল, থাক হয়েছে। আর বলবি না তো?

পটু বলল, বলব।

লক্ষ্মী নিজেই আবার কি ভেবে বলল, মাস্টার আজ রাত বারটা তক পড়াবে। ঝিমুনি এলেই মার। ছোঁড়ার তেজ দেখ।

পটু এবারে উল্টো আক্রমণ করে বসল, তুমি মাস্টারমশাইকে অপমান করেছ।

—ও মা অপমান কি গ আবার!

বললে না, রাখালি করগে।

কথাটা লক্ষ্মীর বলা ঠিক হয়নি। লক্ষ্মী যে অন্যায় কথা বলেছে বোঝা উচিত। বাড়ির একজন গৃহশিক্ষককে এভাবে অপমান করলে ছাত্রদের লাগবার কথাই। বললাম, লক্ষ্মী তুমি অন্যায় করেছ। এটা তোমার ধৃষ্টতা।

—অন্যায় করেছি, বেশ করেছি। সত্যি কথা বললে তেনার রাগ। যা সত্যি ত্রিসংসার লয় পেলেও বলব। লক্ষ্মী কাউকে পরোয়া করে না। ধেষ্টতা! যত আদিখ্যেতা—কথার কি ছিরি!

লক্ষ্মী হার না মানায় মনে মনে খুবই দমে গেলাম। নটু পটুকে বললাম, চল আমরা বেড়িয়ে আসি। লক্ষ্মী বলল, যাও না। কোন্ চুলোয় যাবে যাও। একটু হেঁটে গেলে লক্ষ্মী দেখলাম পিছু পিছু আসছে।

নটু বলল, তুমি আসছ কেন?

—তোদের সঙ্গে যাচ্ছি না।

কিন্তু বিপদ, দুই ছাত্রকে নিয়ে যেদিকে গেলাম, লক্ষ্মীও সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গেল। সঙ্গ ছাড়ছে না।

পটু বলল, কি বেহায়া দেখছেন।

লক্ষ্মীকে বললাম, বাড়ি যাও। কত কাজ তোমার। বৌদি খোঁজাখুঁজি করবেন।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝতে পারলাম, কিছুতেই কাছছাড়া হবে না। যা বলব লক্ষ্মী তার বিপরীত কাজ করে প্রমাণ করবে, সে সব করতে পারে। এ-বাড়িতে তার জোর এই ভাবী উত্তরাধিকারীদের চেয়ে কম নয়।

আমার সঙ্গে লক্ষ্মীর এ-ভাবেই জীবন কাটছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই কথা বলব না, স্থির করেছি। লক্ষ্মী বড় কটু কথা সহজেই বলতে পারে। রাখালি করতে পার না কথাটা আমার খুব লেগেছে। লক্ষ্মীর মুখে এমন কথা সাজে না। ওর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ না করলে আরও মাথায় চড়ে বসবে। লক্ষ্মী আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কথা বললাম না। নটু পটু আজ লক্ষ্মীকে দেখেই বেশি পড়ায় মনোযোগ দিয়েছে. ওর বড় লাগানি-ভাঙানির স্বভাব। এখন দুপক্ষের মধ্যে চরম অবস্থা বিরাজ করছে। পড়াশোনায় এতটুকু গাফিলতি দেখলেই ভিতরবাড়িতে খবর পৌঁছে দেবে, পড়ছে না। গল্প করছে। তিনটেই ফাঁকিবাজ। শত হলেও বদরিদা মানুষ। নৃপ কর্ণেন পশ্যতি। এ-ভয়টা আমাদের তিনজনেরই আছে।

লক্ষ্মী একটা জগে খাবার জল রেখে গেল। কেউ আমরা তাকালাম না। সাঁজ লাগার পর থেকে লক্ষ্মীর কাজ থাকে না। সে বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আজ লক্ষ্মীর কী হয়েছে কে জানে, আমাদের মশারিটা নিয়ে নিচে বসল। আমরা তিনজন একই তক্তপোশে শুই, ঘুমাই, বিছানার চাদর থেকে বালিশের ওয়াড় কাচাকাচির কাজ লক্ষ্মীর। সে অন্য সব কাজের ফাঁকে এই কাজটা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে করে থাকে। সন্ধ্যার পর ভোঁসভোঁস করে ভেতর বাড়ির বারান্দায় পড়ে ঘুমোয় বলে রাতে ওকে বড় এ-ঘরটায় দেখা যায় না। আজ একটু ভিন্ন রকমের মতি দেখছি। আমাদের পাশেই ঠিক নিচে মেঝেতে মশারি রিপু করতে বসে গেল। নটু পটু একবার চোখ তুলে ওদের লক্ষ্মীদির ব্যাপার-স্যাপার দেখতে গেলে ধমক লাগালাম, পড়। কী দেখছিস! ওরা উচ্চস্বরে দুলে দুলে পড়ছে। আমি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে পড়েছি। কিছুতেই মিলছে না। লক্ষ্মী যেন এখানটায় বসে থেকে তার জোর দেখাচ্ছে। আসলে আমরা তিনজন কিছুই পড়তে পারছিলাম না। যতই মনোযোগী হবার চেষ্টা করি না কেন লক্ষ্মীর এই জেদ আমাদের তিনজনকেই পীড়া দিচ্ছে।

নটু বলল, স্যার বাইরে যাব।

ওদের এ-সময় একটু বেশি প্রকৃতির ডাক পড়ে। বললাম, যা।

তারপর কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, বৌদি দরজায় মুখ বাড়িয়েছেন। লক্ষ্মীকে দেখে বললেন, তোর এখানে কি! ভিতরে আয়। নটুর কাজ। সে মাকে দিয়ে লক্ষ্মীকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় লক্ষ্মী দাঁতে সূচের সুতো কাটতে গিয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকাল। যেন বলে গেল, ঠিক আছে। বাবুদের কত ধানে কত চাল দেখব। এ-ব্যাপারে পালের গোদাটি আসলে আমি তা বোধহয় মনে মনে ভেবে নিয়েছে লক্ষ্মী। আমার পরামর্শেই নটু ভেতর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছে। লক্ষ্মী চলে যাবার পর আমরা তিনজন গোল টেবিল বৈঠকে বসলাম। কী করা যায়! যে ভাবে বাড় বাড়ছে তাতে আমাদের মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন। ওর বোধহয় আমার উপর কী করে একটা দাবি জন্মে গেছে। সেই দাবি থেকেই হয়ত এমন কথা বলতে সাহস পায়।

নটু বলল, স্যার আমরা যদি লক্ষ্মীদিকে এ-ঘরে ঢুকতে বারণ করে দি।

বুকের মধ্যে কেমন একটা খোঁচা খেলাম।

পটু বলল, আমাদের কাজ আমরাই করে নেব।

পরদিন সকালে লক্ষ্মী এসে দেখল আমি মশারির দড়ি খুলছি। পটু ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। নটু বালিশ বিছানা ভাঁজ করে একপাশে রাখছে। যাও এবারে বোঝ। কোন কাজ নেই। বইখাতা সব ঠিকঠাক করে আমরা মাঠে নেমে গেলাম। আমাদের সকালের দাঁত মাজা হাত মুখ ধোওয়া সব ঝিলের ঘাটলায়।

লক্ষ্মীকে জল এনে রাখার কাজটা থেকেও রেহাই দিলাম 'মাপ্যান্ট নিজেই কাচাকাচি করে ভাত, ডাল, মাছভাজা খেয়ে যে যার কলেজ স্কুল। লক্ষ্মীকে যাবার সময় দেখলাম, মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা আকাশের মতো মুখ ভার করে রেখেছে।

আর কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম, ঘরটা ভণ্ডুল মামার বাড়ি হয়ে বসে আছে। সব ছত্রখান। মেজাজ কার ঠিক থাকে। গেঞ্জি পাচ্ছি না। তোয়ালে নেই। এ-সব না থাকলে লক্ষ্মীর কাছে খোঁজ করতে হয়। লক্ষ্মীর পাত্তা নেই। পটু বলল, দেখলেন কী করেছে!

—কে করছে?

—লক্ষ্মীদি, আবার কে?

—ওর এত সাহস!

—কেউ কিছু বলে না। না আর পারা যাচ্ছে না।

লক্ষ্মী ঠিক এ-সময় নগর নন্দিনীর মতো ঘরে ঢুকল। হাতে ঝাঁটা নিয়ে ঘর সাফ করল। বালিশ চাদর তোষক নিজের মতো গোছগাছ করে রাখল। বইপত্র তুলে তাকে সাজিয়ে রাখল। অর্থাৎ এ-সব কাজের অধিকার তার। অন্য কেউ করলে সহ্য করবে কেন। অধিকার বলে কথা। নটু পটু বোধহয় আমার উপর আস্থা হারিয়ে তাদের অভিভাবকের কাছে চলে গেল নালিশ করতে। লক্ষ্মীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বললাম, তুমি ভাল করলে না। বদরিদাকে কী বলব!

—যা বলবার আমি বলব। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

বদরিদা ডেকে পাঠালেন। বললেন, কী হয়েছে তোমাদের। লক্ষ্মী, তুই ওদের পেছনে কেন লেগেছিস?

—ওমা! কী বলেন গো দাদা! আমি কী করেছি। ওনারা নিজেরাই করবেন। ঘর ঝাড় দেবেন, বিছানা তুলবেন, ঘাটলায় গিয়ে দাঁত মাজবেন—আমার থাকা কেন তা'লে। কাজের নামে তেনারা ফাঁকি দেন। পড়ার নামে ফাঁকি আমি সইতে পারব না।

তার মানে লক্ষ্মী বদরিদাকে বোঝাতে চাইল, পড়ায় মন নেই আমাদের। এটা ওটা করে সময় কাটিয়ে দেওয়া। বদরিদা বললেন, এ-সব কাজ যদি তোমরাই কর, তা'লে লক্ষ্মীই স্কুলে যাক। তোমরা সাফসোফের কাজে লেগে পড়। উল্টো ফল। নটু পটু এদিকটা বোধহয় একেবারেই ভাবেনি। এবং আমরা তিনজনই মুখ শুকনো করে যখন বের হয়ে এলাম, তখন লক্ষ্মী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দায় হাসছে। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে নটু পটু জিভ ভেংচে দিল। লক্ষ্মী ওদের না ভেংচে আমাকে ভেংচাল। আমি ভাবলাম, আর কথা না। সত্যি কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল লক্ষ্মীর সঙ্গে। আমরা তিনজনের একটা ফ্রন্ট, লক্ষ্মী একা একলা একটা ফ্রন্ট। আমরা তিনজনই লক্ষ্মীকে আড়ি করে দিলাম। লক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত এমনভাবে জব্দ করবে যদি আগে জানতাম।

শনিবার বিকেলবেলাতে বাড়ি যাই। রোববারের বিকেলে ফিরে আসি। কলেজ থেকে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে বাড়ি যাব বলে জ্যামাপ্যান্ট পরছি। দেখি লক্ষ্মী হাজির। নিজে থেকেই বলল, তুমি কথা না বললে তো বয়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

—কোথায় যাবে?

—কেন তোমাদের বাড়িতে!

—তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। তোমাকে আমি নিতে পারব না সঙ্গে। আঁচলের তলা থেকে একটা পুঁটুলি বের করে লক্ষ্মী টেবিলে রাখল। না নাও, এটা সঙ্গে নাও। পিলুকে দেবে।

—কিছু নিতে পারব না। লক্ষ্মী বলল, ঠিক আছে। সে পুঁটুলিটা ফের আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

আমার সন্দেহ হল কেমন। পুঁটুলিতে কী আছে? যে-ভাবে আঁচলের নিচে লুকিয়ে রেখেছে তাতে সংশয় হবারই কথা। দাদা বৌদি জানলেন না, লক্ষ্মী গোপনে দিতে এসেছে, ফের প্রশ্ন না করে পারলাম না, ওতে কী আছে।

লক্ষ্মীও তেরিয়া হয়ে বলল, কী আছে বলব না।

—ধুস যত্ত সব, এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমে বাইরে বের হয়ে গেলাম। লক্ষ্মীকে বললাম, দরজা বন্ধ করে দাও। লক্ষ্মী কথা বলল না। সেও বাইরে বের হয়ে এল। ওর পায়ে তোড়া, হাতে

রুপোর চুড়ি। চুল সুন্দর করে পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধা। চুলে তেল বেশি দেওয়ায় মুখটা বড় বেশি চকচক করছে। উঁচু বারান্দা থেকে আমি লাফ দিয়ে রাস্তায় নামলাম, লক্ষ্মীও ঠিক আমার মতো লাফ দিয়ে নিচে নামল। এ তো আচ্ছা ঝামেলা।

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।

—যাব না।

তবু হাঁটছে। কী করি। সঙ্গে পুঁটুলি। মন্দিরের রাস্তা থেকেই এবার আর না পেরে বললাম, ডাকব বদরিদাকে? ডাকব বৌদিকে।

—ডাক না। আমি বলেই এয়েছি।

—তুমি বলে এয়েছ যাবে? আমাদের বাড়ি যাবে?

নটু পটুর মতো কিংবা পিলুর মতো লক্ষ্মীর যখন তখন ডাহা মিথ্যা কথা বলার স্বভাব। এ-মেয়ের কথায় আস্থা রাখা দায়। একবার বৌদিকে না হয় বদরিদাকে বলা দরকার। মন্দিরের দরজা দিয়ে চাতাল পার হয়ে ভেতরে বাড়িতে ঢুকে বৌদিকে বললাম, দেখুন লক্ষ্মী কী করছে। আমাকে জ্বালাচ্ছে।

—এই তো খুব ভাল মেয়ের মতো বলে গেল তোর সঙ্গে যাবে।

—আমি ওকে নিয়ে যেতে পারব না বৌদি!

—এ কী কথা বিলু। কেউ যেতে চাইলে নিতে হয় না? কবে থেকে বলছে, মাস্টারের বাড়ি দেখতে যাব। মাস্টারের মা বাবাকে দেখে আসব। আর কত যত্ন করে কত কিছু সঙ্গে নিয়েছে!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, যাক, হয়ে গেল।

—হয়ে গেল কি রে?

—হয়ে গেল। জ্বালাবে।

—তুই বড় স্বার্থপর বিলু। মেয়েটা তোর জন্য এত করে আর তুই....।

আমার সত্যি আর কিছু বলার নেই। বের হয়ে আসছি, বৌদি বলছেন, এতদিন আছিস, কৈ একদিনও তো বললি না, বৌদি আমাদের বাড়ি চলুন। তোর দাদাকে নিয়ে গেলি না। একদিন তোর মা বাবাকেও নিয়ে এলি না। তোর এত কিসের অহংকার রে।

লক্ষ্মীর নামে অভিযোগ করতে এসে এত কথা শুনতে হবে বুঝতে পারি নি। এটা ঠিক বৌদিকে বলা হয়নি, দাদাকেও না। মা বাবা কিংবা মায়াকে কোনদিন নিয়ে আসিনি। বৌদি বোঝেন না, ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? ঘরের মধ্যে দুটো বাঁশের মাচান, কিছু মেটে হাঁড়ি, কলসি, একটা পেতলের কলস, টিনের চাল আর চিড়িয়াখানার মতো যত সব জীবজন্তুর বাস। একটা হনুও ইদানীং পিলু আমদানি করেছে। আমার বাবার বাড়িঘরের সঙ্গে এই দেবস্থানের কত তফাত বৌদি একদিন গেলেই টের পেয়ে যাবেন। আমাদের দুরবস্থা কেউ টের পেলে, আমার কেমন লাগে। এমনকি গরুটাও আমাদের খোঁড়া। এই যে লক্ষ্মী যাবে, গিয়েই টের পাবে সত্যি আমার বাবা পৃথিবীর কত বড় উদ্বাস্তু। সে এসে সব বললেই হয়ে গেল। বাইরে এসে মাথাটা এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে কিছুই খেয়াল নেই। গোঁয়ারের মতো হেঁটে যাচ্ছি। কোন হুঁশ নেই। রেললাইনে উঠতেই মনে হল, লক্ষ্মীর যাবার কথা। না নিয়ে গেলে কথা হবে। পেছনে তাকালাম। দেখি লক্ষ্মী নিঃশব্দে ভীতু বালিকার মতো আমার পেছন পেছন আসছে। পুঁটুলিটা ভারি সযত্নে বুকের মধ্যে দু-হাতে চেপে রেখেছে। বড় করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

খুব গম্ভীর গলায় বললাম, হয়েছে। এবারে পা চালিয়ে হাঁট। পা চালিয়ে না হাঁটলে রাত হয়ে যাবে। নবমী বুড়ির বনটা সাঁজ লাগার আগে পার হতে হবে।

লক্ষ্মী মাথা নিচু করে বলল, আমি জানি।

—কী জান?

—জানি।

এখন রহস্যময় কথাবার্তা লক্ষ্মীর আমার একদম ভাল লাগছে না। কোনদিন একা কোনও সমবয়সী মেয়েকে নিয়ে খালি মাঠপ্রান্তর পার হয়ে যাবার অভ্যাস নেই। ছোড়দির সাইকেলের পেছনে বসে

একবার দামোদর নদ পার হয়েছিলাম। ছোড়দি ছিল অভিভাবকের মতো। তখন ভেতরটা এত অপরিষ্কার ছিল না। রেললাইন ধরে যেতে যেতে মনে হল, লক্ষ্মী নিজেও একটা পুঁটুলি। দেবস্থান ছাড়া তার আর কোথাও বোধহয় এ-ভাবে একা একজন উঠতি যুবকের সঙ্গে মাঠ পার হয়ে যাওয়া হয়নি! মন্দির চোখের আড়ালে পড়ে যেতেই দেখলাম লক্ষ্মী কেমন প্রকৃতির মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গরম ভাপ উঠছিল, সেটা কমে গিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে সেই কাশবন। মাইলখানেকের মতো এটার ভেতর দিয়ে দু'জনকে যেতে হবে। ভিতরে ঢুকতেই কেমন গা আমার শিরশির করছিল। লক্ষ্মী আগে আগে বেশ পা চালিয়ে হাঁটছে। ওর পায়ে রুপোর তোড়া। ঝমঝম করে বাজছিল। একবার ইচ্ছে হল, পুঁটুলিতে কি আছে দেখি। চাইলেই সযত্নে লক্ষ্মী পুঁটুলি খুলে সব এক এক করে দেখাবে। আমি দেখতে চাই, অথচ দেখাতে বলার সাহস নেই। জীবনে এই প্রথম নিজেকে ভয় পেতে শুরু করেছি। নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছি না! পুঁটুলি খুলে দেখার লোভ সংবরণ আমাকে করতেই হবে।

লক্ষ্মী হাঁটছে আর অজস্র কথা বলছে। দু'জন তাজা যুবকের সঙ্গে লক্ষ্মীর সহবাসের ছবির কথা কেবল মনে আসছে আমার। লক্ষ্মী বলছিল, দেখ, দেখ ঠাকুর, মেঘের টুকরো কেমন তালপাতার পাখা হয়ে যায়।

কাশবনের ফাঁকে মাথা তুলে তাকালে নিরন্তর এক আকাশ, টুকরো মেঘের ছবি। লক্ষ্মীর কাছে এই সব টুকরো মেঘ শীতল পাখা হয়ে গেছে। ভিতরে এক দাবদাহ এই নারীর, কোথায় যেন সবুজ এক অরণ্য খুঁজে মরছে। কত প্রশ্ন তার, মানুষ মরে যায় কেন? আকাশে তারারা কোথা থেকে আসে। এই ফুল, ফল সবুজ ঘ্রাণ কে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখে? এই অবোধ বালিকার কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। গোপনে এক অপার আনন্দ অনুভব করছিলাম। কেবল মনে হচ্ছিল, এমন নিরন্তর নির্জন গভীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে যেন অনন্তকাল হাঁটি। কিন্তু লক্ষ্মীর সেই রহস্যময় কথা, 'জানি' কি জানে লক্ষ্মী? লক্ষ্মী কি আমার সব ইচ্ছের কথা জানে। আমার চোখ-মুখ দেখে সব টের পায়। তার পুঁটুলিটা যে যথেষ্ট ভারি এতক্ষণে তা আমিও টের পেয়েছি। বললাম, ওটা দাও আমার হাতে।

লক্ষ্মী বলল, না। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

—কী আছে ওতে?

—কত কিছু।

—দেখাবে?

—দেখবে!

গরমে আমরা দু'জনেই ঘামছিলাম। লক্ষ্মী বলল, আর কতটা?

—বেশী দূর না। কারবালা রাস্তার কাছে এসে গেছি।

লক্ষ্মী চোখ তুলে আমাকে দেখল, তারপর পুঁটুলিটা নিচে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসল। লক্ষ্মীর এই বসাটা কেমন অভাগা রমণীর মতো। পুঁটুলিটা খোল, বলতে আর কেন জানি সাহস হল না।

লক্ষ্মী তবু নিজেই সব খুলে দেখাল। একটা ঠোঙায় প্রসাদ, দুটো কাগজী লেবু, একটা ছোট ইঁচড়, দুটো তার গাছের আম, কিছু করমচা ফুল, কয়েকটা পাকা তেঁতুল। পাশে কলাপাতায় মোড়া কিছু একটা।

—ওটার মধ্যে কী আছে?

লক্ষ্মী ওটা খুলতে ইতস্তত করছিল। ফের বললাম, দেখাও। এতটা যখন দেখালে, এটাও দেখাও।

লক্ষ্মী কলাপাতা খুলে ফেলতেই আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। একটা কচি ছাগশিশুর মুন্ডু। আজ শনিবার। বলির পাঁঠার মহাপ্রসাদ পিলুর জন্য বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে বোধহয়।

লক্ষ্মী বলল, এই নিয়েছি সঙ্গে।

পিলু কী দুঃখ করে লক্ষ্মীকে বলে গেছে আমাদের বাড়িতে মহাপ্রসাদ কতদিন হয় না। সেই কবে একবার পিলু দুটো খরগোশ মেরে এনেছিল, তারপর দু'বার বাবা দুটো পাঁঠার মাথা নিয়ে এসেছিলেন, এবং সে কবেকার কথা! আমরা এখানে সেখানে তবু ভালমন্দ খাই। মা, মায়ার ভাগ্যে তাও জোটে

না। লক্ষ্মী হয়তো তাই মনে রেখেছে। তবু এমন জনহীন একটা কাশের জঙ্গলের মধ্যে মুন্ডুটার ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকার মধ্যে যেন বড় অভিশাপের ভঙ্গী আছে।

বললাম, এটা না নিলেই পারতে।

লক্ষ্মী পোঁটলাটা বাঁধতে বাঁধতে হাসল।

—এই নিয়ে যাচ্ছি।

যেন বলতে যাচ্ছিল, এই আমি, টক, ঝাল, মিষ্টি। সঙ্গে ছোট্ট এক ছাগশিশুর মুন্ডু। আমার ভেতরেই এরা বাস করে ঠাকুর। তুমি আমাকে অবহেলা কর না।

আজকাল জানলায় বসে থাকলে কত কিছু টের পাই। আমার এই ছোট্ট জানলা এখন ভারি প্রিয়। মানুষের বুঝি এমনই হয়। যেখানে নিত্যদিন তার বসবাস, শোওয়া থাকা, এক রকমের অভ্যাসের দাস বলা চলে, আমার মধ্যে সেই দাসত্ব দানা বাঁধছে। সকালবেলা বই খুলে বসি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি—সামনের গাছপালা, রেল-লাইন এবং খড়ের ঘরবাড়ি—সবুজ পাতার গন্ধ পাই। বর্ষার জলভরা মেঘের মতো আমার মনটা কেমন এ-সময় সবুজ ঘ্রাণে ভরে থাকে। বুঝি, শরৎকাল এসে যাচ্ছে। আকাশে কখনও গভীর মেঘমালা, কখনও ঝলমলে রোদ। নিরন্তর পাখিদের ওড়া। নিজের মধ্যে টের পাই এক তরুণ যুবক সে তার আত্মপ্রকাশের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমার যেন কিছু আর ভাল লাগে না। কী যে চাই নিজেও বুঝি না। ছোড়দিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়। ছোড়দিকে ছেড়ে এসেছি যেন কতকাল আগে। সেই দুরন্ত বালিকা এখন না জানি কত বড় হয়েছে। এতদিনে মেয়েরা কত বড় হয়ে যেতে পারে আমি যেন অভিজ্ঞতায় আজকাল টের পাই। এ-বাড়ির লক্ষ্মীকে দিয়ে বুঝতে শিখে গেছি, ছোড়দিও আমার মতো জলভঁরা এক-খন্ড মেঘ। যে কোন মুহূর্তে ধারাপাত শুরু হতে পারে। নিজের সঙ্গে ছোড়দির সঙ্গে আমার তখন কথা হয়। কেউ দেখলে টেরই পাবে না ছোড়দি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা কোন মাঠে অথবা দামোদরের বালির চরে। আমরা দু'জনে দৌড়াই। চোখ বইয়ের পাতায়, অথচ ভেতরের কি এক গভীর গোপন রহস্য ছোড়দিকে ছুঁতে চায়। সে কেবল বন-বাদাড় পার হয়ে ছোটে। আমার এই অন্যমনস্কতা কেবল লক্ষ্মী টের পায়। সে জলখাবার দিতে এলেই, আমি ঠিক ঠিক পড়ছি কি না বুঝতে পারে। আশ্চর্য এই মেয়েটা! বড় বেশি সচেতন সব কিছু সম্পর্কে। লক্ষ্মীর ভয়ে কেমন জুজু বনে থাকি।

—তুমি ঠাকুর কি ভাবছ?

—কৈ কিছু না তো!

—ঘ্যানর ঘ্যানর করছ। পড়ছ না।

—লক্ষ্মী তুমি পড়ার কিছু বোঝ?

—সব বুঝি। আমি মুখ্যু মানুষ বলে মনে কর কিছু বুঝি না!

—তুমি বুঝবে না কেন। তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারি?

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার এমন ধরনের কথাই হয়। আজকাল আর আগের মতো এই দেবীস্থানে লক্ষ্মীর মতো আমিও আশ্রিত, মনে থাকে না।

মনে হয় ইহকাল বুঝি আমার এখানেই কেটে যাবে। এ আমার কোনো পান্থনিবাস বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। জানলায় ছোড়দি, পাশের দরজা দিয়ে লক্ষ্মীর যে-কোনো মুহূর্তে প্রবেশ—নিরুপায় হয়ে বলি, ছোড়দি তুমি যাও। আমার পড়ার বিঘ্ন ঘটছে।

বিঘ্ন কথাটাতে কেমন অবাক হয়ে গেলাম। আসলে, ছোড়দির বাড়ির আভিজাত্য বোধহয় আমাকে একটু বেশি সংস্কৃতিবান হতে শেখাচ্ছে। এই জন্য বিঘ্ন কথাটা উচ্চারণ।

ছোড়দি বলল, সাইকেলের পেছনে যাবি না?

—তুমি কবে নিয়ে যাবে বল?

—যেদিন মানুষ হবি।

কেমন যেন বুকের ভেতর একটা দুরুদুরু ভয়। যদি মানুষ না হই। মানুষ হওয়াটা কী! পড়াশুনা

করে বড় হওয়া। পুলিশ সাহেব কিংবা ডাক্তার হওয়া। কিংবা এম এ পাস, ফার্স্ট ক্লাস এই সব। বড় চাকরি। কিংবা কোনো আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বের করে মাঠের উপর দিয়ে ছোটা! কোনো পর্বত সানুতে ছোড়দির হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলা, কী এবারে মানুষ হয়েছি! দেখ না। হাত মাথার উপর তুলে বলা, কী দ্যাখ মানুষ সত্যি হয়েছি কি না! ছোড়দির খিলখিল হাসি—তুই বিলু না, তোর না, কিচ্ছু হবে না। আয় জলে সাঁতার কাটি।

পড়ার বইয়ের পাতা খোলা—আমার চোখ বইয়ের পাতায়, বিড়বিড় করে পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলে ঠোঁট বোধহয় আপনিই নড়ে। ছোড়দি আর আমি দুজনেই জলে সাঁতার কাটছি—সাঁতার কেটে একটা নদীর পাড়ে উঠে গেছি যেন। সামনে দীর্ঘকায় এক অরণ্য, তার ভেতর মহা অজগর পাক খাচ্ছে। ফোঁসফোঁস করছে। আমাদের টেনে নিতে চায়। ভয়ে ছোড়দিকে জড়িয়ে ধরলে ছোড়দিও আমাকে জড়িয়ে ধরে। এই ভয়টা কীসের? অজগরটা দেখলাম কেন! পড়তে পড়তে এত অন্যমনস্ক হয়ে গেলে আমি মানুষ হব কী করে। ছোড়দিকে বলি, আচ্ছা তুমি আজ যাও। কাল ডাকলে এস। আমি এখন পড়ব।

ছোড়দি বলল, তুই যে বলেছিলি বাড়ি গিয়ে চিঠি দিবি, দিলি না তো?

জান ছোড়দি, রোজই ভাবি একটা চিঠি লিখব। কিন্তু কেন যে পারি না। তোমাকে চিঠিতে কী লিখব ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন, লিখবি ছোড়দি তুমি কেমন আছ? তোমাকে খুব মনে পড়ে।

নিজের এই ভাবনাটুকুতেই আমার মধ্যে কেমন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এক বালিকা বড় হয়, ছোটে—এর মধ্যে আমার যে কী নাড়ির টান! অথচ ছোড়দিকে কিছুতেই চিঠি লেখা হল না। ছোড়দি যদি চিঠি দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কী যে সংকোচ খেলা করে বেড়ায়। ছোড়দি আমার নামে চিঠি লিখলে বাবা মা কী না ভাববে! আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠছে এমনও ভাবতে পারে। আমার যা বয়স তাতে কোনো বালিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে গুরুজনরা কিছু ভাবতে পারে। সবচেয়ে ভয় পিলুকে। বাবা মা পিলু মায়া আর ছোট ভাইটা বাদে আমার সঙ্গে আর কারো কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সে বিশ্বাসই করতে পারবে না। আর বিশ্বাস করলে ভাববে আমি সংসারের একজন মস্ত বড় বিশ্বাসঘাতক। আমার সঙ্গে পিলু তবে আর কথাই বলবে না। আগে পিওন এলে ভয় করত—ছোড়দি যা একখানা মেয়ে। লিখেই না ফেলে। কীরে চিঠি দিস না কেন! আমার বুঝি ইচ্ছে হয় না তোর চিঠি পাই। ছোড়দির চিঠি পাবার আগ্রহ যতই প্রবল হোক, মাথার উপর গুরুজনদের অস্বস্তির খাঁড়া ঝুলে থাকে বলে, মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতাম, ভগবান ছোড়দি যেন আমাকে কখনও চিঠি না দেয়। ছোড়দির জন্য টান বাড়ছে কী কমছে বুঝতে পারছি না, লক্ষ্মী ইতিমধ্যে মনের মধ্যে কতকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে।

সেদিন লক্ষ্মী আমাদের বাড়ি গিয়ে সব জেনে ফেলেছে। বাবা বলেছে, বিলুটার মতি গতি কখন কী যে হয়!

পিলু বলেছিল, লক্ষ্মীদি জান দাদা বাড়ি থেকে একবার চলে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীর স্বভাব, সবার সামনে কথা বললে, আমাকে মাস্টার ডাকে। দেবস্থানে আমি থাকি, সেবাইতের ছেলে আর ভাগ্নেকে পড়াই। দেবস্থানে সেবাইত বদরিদা আর বৌদি ছাড়া সবাই আমাকে মাস্টার ডাকলে, লক্ষ্মী না ডেকে থাকে কী করে? কিন্তু একা পেলেই অন্যরকম। ও ঠাকুর শুনছ, আজ ভাত হবে না। ডাক্তার বলে গেছে, কাল ভাত খাবে। এই নাও বার্লি আর কাগজিলেবু। ঐ খেয়ে পেট ভরে রাখ।

দেবস্থানে আমার উপর এই করে লক্ষ্মীর অধিকার জন্মে গেছে জোর খাটাবার। আগে লক্ষ্মীর চোপার ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না, আমার সমবয়সী একটা ঝি মেয়ের চোপা থাকতেই পারে—কিন্তু সঙ্গে টান থাকলে যা হয়। লক্ষ্মীর শাসন দিনকে দিন বাড়ছিল, সেই লক্ষ্মী বাড়ি থেকে সব শুনে এসে আমার সম্পর্কে নতুন একটা ধারণা নিয়ে কেমন কথাবার্তা কম বলছে। লক্ষ্মীর স্বভাবই এমন। সে কখন যে কীভাবে চটে থাকবে বোঝার উপায় নেই। ছোড়দির খবরটা মোটামুটি বাড়িতে গোপনই ছিল। বাবা জানত—কারণ ছোড়দির চিঠি পেয়েই বাবা আমার প্রবাসের ঠিকানাটা জেনে ফেলেন। তিনি নিজে না গেলে আমার বাড়ি ফেরা সহজ হত না। কারণ বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম মানুষ হব বলে। আর যাই করা যাক, বাবার মনমতো গ্যারেজে মেরামতির কাজ শিখলে এতদিনে

বাস-ড্রাইভার না হোক কনডাক্টরের কাজটা হয়ে যেত। অভাবী বাবার সন্তান এর চেয়ে বড় কাজ করবে, কে কখন ভাবে! বাবাই বলেছিলেন রহমানদাকে, ছেলেটার পড়ার বাই আছে। বাড়িতেও চায়, কলেজে পড়ুক। কিন্তু......বলেই থেমে গিয়েছিলেন বাবা।

ছোড়দি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে শেকল বাঁধা সেই বিশাল কুকুরটা। সাদা ফ্রক গায়। বাবা এয়েছে শুনে, সে স্কুলে যায়নি। বাবাকে দেখে ভারি তাজ্জব। বাবা সুপুরুষ মানুষ। খার কাচা ধুতি পরনে। গায়ে নামাবলী এবং পা খালি। সাদা ধবধবে পৈতা। রহমানদা বাবার পরিচয় পেয়েই ছোড়দিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ আর যাইহোক রহমানদা তো একজন বামুন মানুষকে আদর আপ্যায়ন করতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর মেয়েটির বড় দরকার পড়েছিল তার। আর ডাক্তারবাবুর মেয়েটি ঠিকানা লিখে চিঠি না দিলে এই নিষ্ঠাবান মানুষটির এমন শহরে আসারও প্রয়োজন পড়ত না। বাবার প্রশ্ন ছিল, বালিকাটি কে?

আমি বলেছিলাম, ছোড়দি।

ছোড়দি বলেছিল, আপনি আসুন।

বাবা এক সময় জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন বলে জাঁকজমকের কিছু খবর রাখতেন। সুন্দর ছবির মতো বাংলো বাড়িটায় উঠে বাবা আদৌ ঘাবড়ে যান নি। ছোড়দির মার সঙ্গে পরিচয়। একই গোত্রের জেনে তিনি সেখানে আহারও করেছিলেন। ফলে বাবা ছোড়দির খবরটা রাখতেন। কিন্তু বাড়ি এসে কেন জানি বাবা ছোড়দির সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। না করাই ভাল। কিন্তু লক্ষ্মী সেদিন গেলে বাবাই বলেছিলেন, ওর ছোড়দির চিঠি না পেলে কে জানত বিলুটা কোথায় আছে।

আর সেই থেকে ছোড়দিকে নিয়ে লক্ষ্মীর খোঁচা মারা কথা।

—হ্যাঁ ঠাকুর, তোমার ছোড়দিটা কে?

—ছোড়দি আবার কে? ছোড়দি!

—ছোড়দি আবার বালিকা হয় নাকি? বয়সে তোমার বড় না?

—আমি বলেছিলাম, না। বড় না। ছোটই হবে।

—তবে ছোড়দি ডাকত কেন?

—রহমানদা ডাকতে বলে।

—রহমানদা কে?

—উনিই আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন।

—ছোড়দি রহমানদার কে হয়?

—ছোড়দির বাবার ড্রাইভার।

—এ ত দেখছি বিশাল কথা গ।

অবাক হলে লক্ষ্মী এভাবেই কথা বলে।

—বিশালই।

—তোমার ছোড়দি কী করে?

—স্কুলে পড়ে।

—দেখতে কেমন?

—খুব সুন্দর।

লক্ষ্মী কেমন মনমরা হয়ে যেত কথাটা শুনে। জানে তার ভাগ্য অন্যরকম। তার বড় আশা শোভা পায় না। ছোট জাতের মেয়ে। দু'দুবার বিয়ে দু-বারই স্বামী হারা। শরীরে ভাল করে বয়স ধরতে না ধরতেই দু-দু'জন মরদ খেলে কে আর সাহস পায়! দেবস্থানে সেই থেকে আশ্রয়। ছোড়দির কথায় ওকে কখনও কেমন ম্রিয়মাণ দেখায়। কখনও ভারি উৎফুল্ল। বলে তোমার কলেজ ছুটি হলে চল না যাই, দেখে আসি ছোড়দিকে।

—সে অনেক দূর লক্ষ্মী।

—কতদূর আর হবে? রেলে চড়ে যাব।

—শুধু রেলে চড়ে যাওয়া যায় না।

আমার এই ঘরটায় দুটো তক্তপোশ মাঝখানে টেবিল—দেয়ালে বড় আয়না। জানালায় আলো

বেশি বলে পড়ার সময় টেবিলে বসি না। চেয়ারে আজকাল অধিকাংশ সময় নটু কিংবা পটু বসে। কারণ আমার কাছ থেকে যেমন ওদের এতে দূরত্ব বাড়ে, তেমনি মার খাওয়ার সুযোগটাও ওদের কম থাকে। লক্ষ্মীর স্বভাব চেয়ারে পিঠ ভর করে দাঁড়ানোর।

নটু পটু না থাকলেই লক্ষ্মী এ কথা সে কথায় ছোড়দির কথা টেনে আনবে। ছোড়দি দেখতে কেমন এমন প্রশ্নে বার বার নিজের মুখ আয়নায় দেখবে। রাস্তার দিকে মুখ করে পড়তে বসি বলে, লক্ষ্মী বোঝে, আমি কিছু দেখি না। সে তখন পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। শ্যামলা রঙ। এবং বয়স ধরছে বলে লাবণ্য উপচে পড়ছে। ওর পরনে থাকে কালো পাড়ের এবং সাদা জমিনের শাড়ি।

এই যে বই খুলে বসে আছি, পড়ায় মন দিতে পারছি না, এজন্য কেন জানি লক্ষ্মীর উপর রাগ জন্মাতে থাকল। ছোড়দির প্রসঙ্গ আজকাল এতবার উঠছে যে, আমি নিজেই কেমন অস্থির বোধ করছি। লক্ষ্মী কথা খুঁচিয়ে বের করার কৌশলটাও বড় বেশি আয়ত্তে রেখেছে। না হলে, আমি বলতে যাব কেন, মানুষ হব বলে পলাতকের জীবন বেছে নিয়েছিলাম। অভাবী বাবার পুত্রের দুঃসাহস না থাকলে বড় হওয়া যায় না। কোনও দুঃসাহসে ভর করেই যে গ্যারেজের বড় মিস্ত্রী গোবিন্দদার কৌটা থেকে কুড়ি টাকা চুরি করেছিলাম তাও লক্ষ্মী জেনে নিয়েছে। এও জেনেছে টাকা, মান, যশ হলে সব সুদসহ ফেরত। এতে করে লক্ষ্মী আমার উপর খবরদারি করার আরও যেন বেশি মৌকা পেয়ে গেছিল।

যেমন বলত, আসলে ছোড়দির বড় টান ছিল তোমার জন্য।

—টান মানে লক্ষ্মী?

—ও গো এও বোঝ না। কলেজে পড়ছ কেন? পড়া ছেড়ে দাও না। টান বোঝ না!

—না বুঝি না। যাও তুমি এখান থেকে।

—না যাব না। ও টান বোঝে না। দাড়ি গোঁফ উঠে গেছে টান বোঝে না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমি কখনও কথায় পারি না। বলি, ওতো সব সময় ত্রাসের মধ্যে রাখত। পুলিশে দেবে ভয়ও দেখিয়েছিল।

ওটি মুখের কথা গ। তুমি যাতে সেখান থেকে না পালাও সে জন্য ভয় দেখিয়ে রেখেছিল। নালে পয়সা ক'টা ছোড়দির গেলাপজাম পাড়তে গিয়ে হারালে সেই নিয়ে এত কাণ্ড করত না।

এটা ঠিক ছোড়দির সেই শেষ খারাপ আচরণ আমাকে এখন নতুন করে আবার তাড়া করছে। পয়সা ক'টা হারিয়েছি ছোড়দি আমাকে বাগানে দৌড় ঝাঁপ করিয়েছে বলে। গোলাপজাম পাড়তে গাছের ডগায় না উঠলে, কিংবা কখন যে কোথায় রহমানদার দেওয়া হোটেলের পয়সা ক'টা পকেট থেকে পড়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ছোড়দির মা সব জেনে পয়সা ক'টা আমাকে দিলে খুবই খুশি হয়েছিলাম। ও মা, শেষে কিনা ছোড়দি হাতের উপর হামলে পড়ে পয়সা ক'টা ছিনিয়ে নিল। বলল বিলু, তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দেব, তিনি যেন তোমাকে নিয়ে যান।

এখন বুঝতে পারি ছোড়দির কাছে আমার মর্যাদার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ছোড়দির মা'র দেওয়া পয়সা ক'টা নিলে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। শুধু আমি না, ছোড়দি নিজেও বুঝি। লক্ষ্মী যেন বিষয়টা এতদিন পর ধরিয়ে দিল—আসলে আমি কেমন একখানা মানুষ। এই সব করেই, লক্ষ্মী ছোড়দির ভূত আমার মাথায় আবার চাপিয়ে দিয়েছে ; সত্যি তো যে মেয়েটা আমার মর্যাদা নিয়ে এত ভাবত, বলত, বিলু তুমি কলেজে পড়বে, তুমি বড় হবে—কিসের আশায় এ-সব কথা। অথচ সেই ছোড়দি একটা চিঠি দিয়ে জানল না, আমি কী করছি। বোধ হয় ভুলে গেছে, ভাবলেই মনের কষ্টটা বাড়ে।

ক'দিন থেকে ছোড়দিকে একটা চিঠি লিখব ভাবছি। গোপনে লিখতে হবে। ঠিকানা থাকবে এই দেবস্থানের। কিন্তু কোনো খামে চিঠি এলে বদরিদা ভাববেন, কে দিল চিঠি, আমাকে চিঠি লেখার তো কেউ নেই। রেললাইন পার হয়ে বাঁশবনের ভিতরে ঢুকে কিছুটা কারবালার মধ্যে দিয়ে গেলেই আমার বাবার বাড়িঘর। সেখানেই শুধু আমার প্রিয়জনরা থাকে। আর কোনো প্রিয়জন থাকতে পারে বদরিদার মাথায়ই আসবে না। সংগত কারণে তিনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, বিলু কার চিঠিরে?

এমন প্রশ্নের উত্তরে সে তো বলতে পারবে না, ছোড়দির চিঠি, যদি বলে ছোড়দিটা কে?

হয়ে গেল! গলা কাঠ। আমতা আমতা করে সব যেমন লক্ষ্মীকে বলে ফেলেছি, বদরিদাকেও না আবার বলে ফেলি। তাহলে সব গেল। আশ্রিতজনের এমন বেয়াদপি তিনি সহ্য নাও করতে

পারেন। লক্ষ্মীর আর যাই হোক কোনো কারণে আমি অপদস্থ হই সে তা চায় না। ছোড়দির খবরাখবর ফলে লক্ষ্মী নিজের মধ্যেই গোপন করে রেখেছে।

জানালা পার হলে রাস্তা। নিমগাছের ডালপালা হাওয়ায় দুলছে। শরৎকাল আমার প্রিয় ঋতু বলে মনটা কেমন ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে থাকে। অল্পতেই সব কিছুতে বড় বেশি মগ্ন হয়ে পড়ি। বইয়ের পাতা উল্টানো আছে। পড়ছি না। গাছের ডালপালাগুলি দেখছি। দুটো ইষ্টিকুটুম পাখি বসে আছে গা লাগিয়ে—বড় নিবিড়ভাবে। ছোড়দিকে নিয়ে এ-ভাবে কোথাও কোনো নদী তীরে আমার আজকাল বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। কাশবনে ফুল ফুটতে দেখলে ছোড়দির কথা মনে হয়। রেললাইন ধরে হাঁটার সময় ছোড়দির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। যখনই একা থাকি, কিংবা কলেজে যাই মাথার মধ্যে ছোড়দি ভর করে থাকে। পড়তে বসলে জানালায় যেন ছোড়দি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ে কেডস জুতো, বব করা চুল সাদা ফ্রক গায়ে ছোড়দি। যেন নিচে আছে ছোড়দির সাইকেলটা। বের হলেই বলবে, ক্যারিয়ারে বোস। তারপর আশ্চর্য ভঙ্গীতে আমাকে পিছনে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। আমি আজকাল স্বপ্নেও ছোড়দিকে দেখতে পাই। স্বপ্নে ছোড়দি দেখা দিলে কী যে হয় তখন!

ছোড়দির কথা ইদানীং ভুলেই গেছিলাম। লক্ষ্মী আমাদের বাড়ি গিয়ে ছোড়দির খবর না পেলে, এবং রোজ রোজ না খোঁচালে ছোড়দির জন্য এ-ভাবে আকুল হতাম না। লক্ষ্মীই ছোড়দির একটা নতুন পরিচয় প্রকাশ করে আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। এও জানি জীবনেও আর ছোড়দিকে আমার চিঠি লেখা হবে না। বড় হলে স্বাধীন হলে ছোড়দিকে একটা চিঠি দিতে পারি। কিন্তু তা যেন কত দূর ভবিষ্যতের কথা। ততদিনে ছোড়দি আমার কথা ভুলে যাবে। আমার মতো কাঙাল মানুষকে তার মনে রাখার দায় পড়েছে। আসলে ওটা তার করুণা ছাড়া কিছুই ছিল না। সারাদিন না খেয়ে ছিলাম খবর পেয়ে ছোড়দির চোখ চকচক করে উঠেছিল, তা আমি দেখেছি। বেশি খাই বলে রহমানদার অতিথিকে বরাদ্দ পয়সায় খেতে দেয়নি খবরটা পেয়ে ছোড়দি কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছিল—তাও মনে পড়ে। তবু যেন ছোড়দির পৃথিবীতে আমি সব সময় একজন আগন্তুক। ছোড়দিকে নিয়ে এমন আকুলতা আমার শোভা পায় না। পড়াশোনার ক্ষতি করছি ভেবে আবার পড়ার চেষ্টা করলে দেখলাম মন বসছে না। লক্ষ্মীর উপর কেন জানি আমার ক্ষোভ জন্মাতে থাকল। সব অনিষ্টের মূলে লক্ষ্মী। এখানে আসার পর থেকেই সে আমাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মজা আবিষ্কার করতে ভালবাসে। এও তার একটা। আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে মজা দেখছে।

কিছুই ভাল লাগছিল না। বই-টই ফেলে উঠে পড়লাম। জামাটা গায়ে দিয়ে বের হতে যাব, দেখি লক্ষ্মী সামনে হাজির। ওকি এতক্ষণ দরজার ওপাশ থেকে আমার আচরণ লক্ষ্য করে মজা পাচ্ছিল। কারণ এতদিনে ওকে আমার চিনতে বাকি নেই। সে আমার মনের মধ্যে কি গোপন কথা লুকিয়ে থাকে সব ঠিক টের পায়। ওর সঙ্গে আমার কোন কথা বলার ইচ্ছে নেই। দরজা পার হয়ে রাস্তায় নামতে যাব তখন যেন না পেরে লক্ষ্মীর বলা, কলেজ যাবে না ঠাকুর?

—না, যাব না।

—দাঁড়াও বদরিদাকে বলছি।

—কী বলবে?

—বলব, মাস্টার বেড়াতে বের হয়ে গেল।

বদরিদাকে আমি সমীহ করি লক্ষ্মী জানে। যা কিছু ভয় এখন আমার এই মানুষটাকে। লক্ষ্মী তাঁরই কাছে নালিশ দিতে যাচ্ছে। পরীক্ষা পুজোর ছুটি শেষ হলে। এ সময় কলেজ কামাই করলে খুব ক্ষতি। বদরিদা এ-সব বলতে পারেন। এ-বাড়িতে বদরিদার ছেলে এবং ভাগ্নের যেমন আমি গার্জিয়ান, তেমনি বদরিদা আমার গার্জিয়ান। মানুকাকা একদিন এসে বলে গেছে, বিলুটা চাপা স্বভাবের। লক্ষ্য রেখ বদরী।

লক্ষ্মী কী দেখল আমার মুখে সেই জানে। বলল, যা খুশি করগে! আমার কী। তোমার ভালর জন্যই বলা!

—হ্যাঁ ভালর জন্য বলা! তোমাকে আমি চিনি না।

লক্ষ্মী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, ওমা, এ কি কথা গ। আমি তোমার কী করলাম!

—কিছু কর নি। যাও। দরজা থেকে সরে দাঁড়াও।

লক্ষ্মী সরে দাঁড়াল না। লক্ষ্মীর গোয়ার্তুমি আমি জানি। কিছু বলাও যায় না। আমার সঙ্গে সেদিন

বাড়ি যাবে বলে গোঁ ধরল, গিয়ে তবে ছাড়ল। বৌদিকে বলতে গিয়ে উল্টো ঝামেলা—তুই কীরে বিলু। পোড়াকপালী একটা মেয়ে, যার তিনকুলে কেউ নেই—সে তোর মা বাবাকে দেখতে যাবে—তুই নিয়ে যাবি না বলছিস! তুই এত স্বার্থপর বিলু।

বার বার লক্ষ্মীর কাছে হেরে গিয়ে আমার এখন আর কোনো নালিশ জানাতেও ভালো লাগে না। লক্ষ্মীর বিষয়ে আমি পটু নটু এক দলে। নানাভাবে ওর বিরুদ্ধে আমরা সত্যাগ্রহ করে থাকি! কখনও কথা না বলে, কখনও ওর সেবা যত্ন পরিহার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা যায় না। বার বার সেই এক হেরে যাওয়া। তার যা করার সে করে। আমরা নিজেরা করে রাখলে সে এক ফাঁকে এসে লণ্ডভণ্ড করে দেবেই। অভিজ্ঞতা থেকে যখন প্রমাণ হয়ে গেছে তখন জোরজার করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যে বের হয়ে যাব তারও উপায় নেই। বললাম, আমার কিছু ভাল লাগছে না লক্ষ্মী। সরে দাঁড়াও।

—কেন ভাল লাগছে না জানি।

—তুমি তো বাবাঠাকুর জানবে না কেন?

বাবাঠাকুরের কথা তোলায় লক্ষ্মী জীভ কাটল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। এ-দেবস্থানে যে মানুষটি কিংবদন্তীর শামিল তাকে নিয়ে ঠাট্টা! যার ঘর মার মন্দিরে। মন্দিরে যিনি থাকেন খান, শোন, যাঁর আশীর্বাদে সবার বেঁচে থাকা তেনার মতো মানুষকে টেনে আনা! লক্ষ্মীর শুধু না, এ-বাড়ির সবার, এমন কী শহরের সব অভিজাত পরিবারগুলো যাঁর শ্রীচরণ অবলম্বন করে বেঁচে আছে, ভূত ভবিষ্যৎ যিনি দেখতে পান চোখ বুজলে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা। লক্ষ্মী কেমন ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেছে মতো বলল, যাও। যা খুশি কর ঠাকুর। তবু বাবাঠাকুরকে টেনে এন না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

যেন লক্ষ্মী এই যে আমি বাবাঠাকুরকে নিয়ে বিদ্রূপ করছি এতে আমার অমঙ্গল হতে পারে! সবার জন্য সে করে না। আমার জন্য সে করে। আমার জন্যে তার ভাবনা—এতে আমার না আবার কিছু হয়। ফের বাবাঠাকুরকে নিয়ে কিছু বলব ভয়েই যেন সে দরজা থেকে সরে গেল।

আমার ঘরটা একেবারে বাইরের দিকে বলে কেউ টেরও পাবে না কখন আমি বের হয়ে গেছি। কোথায় যে যাব তাও জানি না। লক্ষ্মী শুধু দাঁড়িয়ে বলল, আর তোমার ছোড়দিকে নিয়ে খোঁচাব না! ছোড়দির জন্য তোমার এমন মাথা খারাপ হবে যদি আগে জানতাম।

লক্ষ্মী বলে কী! এই বয়সে মেয়েরা মানুষের সব কিছু টের পায় কী করে! আমার সমবয়সী মেয়েটা বুঝল কী করে, সত্যি শরৎকাল এসে যাওয়ায় আমার মধ্যে সেই বিবাগী মানুষটা ছোড়দির কথা ভাবতে ভাবতে উত্তাল হয়ে উঠেছে। তবু গোপন করার জন্য বললাম, তুমি তো দেখছি সব জেনে বসে আছ।

লক্ষ্মী শুধু বলল, তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই মাস্টার।

লক্ষ্মীর এই কথাটা অভিমানের। একা দুজনে কথা বললে, লক্ষ্মী ঠাকুর বলে আমাকে। অভিমান বশে সে আমাকে মাস্টার বলছে। বললাম, যখন চিনেই ফেলেছ তখন আর দরজায় দাঁড়িয়ে কেন। যাও ভিতরে যাও।

লক্ষ্মী আর একটা কথা বলল না। রাস্তায় নেমে মন্দিরের সদর দরজার দিকে চলে গেল। কলেজ যাব না কেন নিজেই বুঝতে পারলাম না। হয়তো রেললাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে কাপড়ের কলের সামনে যে আমবাগানটা আছে ওটার পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকতাম। অন্যমনস্কভাবে ঘাসপাতা ছিঁড়তাম। কিংবা ঘাসের উপর শুয়ে পাখি প্রজাপতি দেখতে দেখতে একসময় কলেজে যাওয়া দরকার খুব ভাবতাম। চলে আসতাম ঠিক সময়ে। কেন যে বলে ফেলেছি, কলেজ যাব না। জেদ আমারও কম নয়,যখন বলে ফেলেছি যাব না, তখন কে বাধ্য করে দেখি। কেমন নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। ছোড়দির কথা ভাবলে এত উদাস হয়ে যাই কেন বুঝতে পারি না।—শরীরের শিরা উপশিরায় বোধহয় এক ঝড় উঠে যায়। মন বিবাগী হয়ে ওঠে। কিছুটা হেঁটে বেড়ানো। শরতের আকাশ কী গভীর নীল। ঘুঘু পাখির ডাক কোন সুদূর থেকে যেন কেবল শুনে যাচ্ছি। মাঠে মাঠে ধান, সবুজের সমারোহ। আমার এই জীবনে সেই সমারোহ উথলে উঠছে বুঝতে পারি। এবং একসময় চুপচাপ গাছের ছায়ায় বসে থাকলে টের পাই, কেউ এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই চোপাবাজ এবং চঞ্চল মেয়েটা। বলছে, চল ঠাকুর বাড়ি যাবে। তোমার ছোড়দির আমি খোঁজ

পেয়ে গেছি। সে তোমাকে দেখবে বলে বসে আছে পড়ার ঘরে।

এমন কথায় বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে লক্ষ্মী আর যাই করুক কখনও কোন তঞ্চকতা করে না। বললাম, তার মানে?

—মানে সোজা গো। এ বয়সে এমনটা হয়! ভাল লাগা মানুষের জন্য মনে কষ্ট দেখা দেয়।

লক্ষ্মীর এত পাকা পাকা কথা আমার ভাল লাগে না। বলি, তুমি সব সার বুঝে বসে আছ।

এখন চল তো। শহর থেকে রায়বাহাদুর চাটুজ্যে বাবুরা এয়েছেন। বছরে বাবাঠাকুরকে একবার সবাই দর্শন করে যান। তোমার ছোড়দির মতো দেখতে কেউ গিয়ে দেখ এয়েছে।

—ছোড়দির মতো বলছ কেন? ওকে তো তুমি দেখনি......।

—না দেখলে বুঝি চেনা যায় না! ওঠো না! এ বয়সে সব ছোড়দিরাই সমান। কৌতূহল বাড়ছে। আমার পড়ার ঘরে কেউ বসে আছে তবে। সে কে? আমার সম্পর্কে তারই বা এত কৌতূহল কেন? বললাম, আমার জন্য বসে থাকবে কেন? দেখ অন্য কাউকে খুঁজছে।

—খুঁজলেই হল। আমি বুঝি জানি না। আমি বুঝি কিছু বুঝি না। তোমার ছোড়দির চেয়ে দেখতে খারাপ না! কত বড় মানুষ তেনারা! দুর্গাপূজার সময় কত পাঁঠা বলি হয়। কত লোক খায়। মিমিদি আমার খুব চেনা। নটু পটুর নতুন মাস্টারের কথাতেই লাফিয়ে তোমার ঘরে হাজির।

এ সময়ে আমি ভারি সংকোচে পড়ে যাই। কোনো মেয়ে পড়ার ঘরে আমাকে দেখবে বলে বসে আছে ভাবতেই কেমন ভেতরে রাগ জন্মে যায়। আমাকে দেখার কী আছে। আমি বাঘ না ভাল্লুক। আসলে মানুষ মনে করলে এত সহজে লাফিয়ে কেউ ঘরে ঢুকে যেতে পারে না। এ-ভাবে দেখবে বলে বসে থাকলে কেমন তরলমতি মনে হয় মেয়েদের। আর যাই ভাল লাগুক কোনো তরলমতি বালিকার দর্শনীয় বস্তু আমি হতে চাই না। বললাম, তুমি যাও আমি যাচ্ছি না।

আর ঠিক এ-সময় বাবাঠাকুরের ডাক শুনতে পেলাম। তিনি আমাকে খুঁজছেন। এমন মানুষের ডাক আমি অবহেলা করি সাধ্য কী। ভয় লেগে গেল। বাবাঠাকুর পর্যন্ত আমার ডাক খোঁজ করছেন। সহসা সবাই আমাকে খুঁজতে আরম্ভ করছে কেন? লক্ষ্মীর কোন কূট চাল নয়তো। তিনকুলে মেয়েটার কেউ নেই বলে বাবাঠাকুর লক্ষ্মীকে স্নেহ করেন। আমার কলেজ না যাওয়া, গম্ভীর হয়ে যাওয়া এসব কী লক্ষ্মীকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। সে বাবাঠাকুরকে পর্যন্ত লাগিয়ে এসেছে, দেখগে মাস্টারের কী হয়েছে। সকালে কিছু খায়নি, কলেজে যায়নি, রেলের ধারে চুপচাপ বসে আছে। এ-বয়সটা যে খুব খারাপ লক্ষ্মী নিজের জীবন দিয়ে হয়তো বুঝতে পারে। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম। সাড়া দিলাম, যাই।

তীর্থস্থান বলে শনি মঙ্গলবারে যাত্রীদের ভিড় বেশি। শহর থেকে রিকশায় আসে কেউ, কেউ দূরদেশ থেকে হেঁটে আসে আবার কেউ আসে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। ধর্মশালায় দু'চারদিন অনেকে থেকে যায়। নিমগাছটার নিচে বাবাঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, বেটা বাঙ্গাল কোথায় গেছিলি!

বিষয়টা বোধহয় লক্ষ্মীরও বোধগম্য হয়নি। বাবাঠাকুর সহসা মাস্টারকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন! তিনি তো খ্যাপা মানুষ। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেন। মন্দিরে তাঁর একমাত্র কথা বলার লোক পাথরের ঠাকুর। আর যা কথাবার্তা সে বড় কদাচিৎ। কখনও কোন কারণে রেগে গেলে সবাইকে বাড়ির বার করে দেন। বদরিদা, বৌদি, নটু, পটু, দিদি, ধনুদা ও কার্তিক সবাই তেনার ভয়ে তটস্থ থাকে তখন। গাছতলায় রাত্রিবাস করিয়ে ছাড়ে কখনও। সেই মানুষ মাস্টারকে খুঁজে বেড়ালে আশঙ্কা বৈকি।

বাবাঠাকুরের কৃপা আমার উপরে আছে এমন লক্ষ্মীর ধারণা। আমারও কেন জানি এমন মনে হয়। বাবাঠাকুর আমাকে স্নেহ করেন। মন্দিরে গেলে হাত পাততে বলেন। কখনও সন্দেশ, কখনও শুধু ফুল বেলপাতা—আর মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে কেন যে অপলক চেয়ে থাকেন। লক্ষ্মী দূর থেকে সেটা কখনও লক্ষ্য করে থাকতে পারে। কাছে গেলে লক্ষ্মীই বলল, বাবাঠাকুর, মাস্টারের মন ভাল না।

ধুস ছুঁড়ী। এই মাস্টার এদিকে আয়।

বাবাঠাকুরের পরনে সেই গেরুয়া নেংটি। যেন তিনি কবেই শতবর্ষ পার করে দিয়েছেন। গলায় কাচার মতো উপবীত ঝুলছে। এত যে বয়স হয়েছে, তবু কি সাবলীল হাঁটা চলায়। পড়ার ঘরের পাশে দেখলাম, দু'তিনখানা গাড়ি। বিদেশী আতরের গন্ধ নিমগাছটা পার হতে টের পেলাম। পড়ার

ঘরে কেউ যদি সত্যি বসে থাকে। যাবার সময় চোখ তুলে তাকালাম, কিন্তু তক্তপোশের খানিকটা অংশ বাদে আর কিছু চোখে পড়ল না।

বাবাঠাকুর আমাকে বললেন, খুলে দেখ কী আছে?

চাতালে আশ্চর্য সব সুন্দর রমণীরা লাল পেড়ে গরদ পরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন প্রবীণ সুপুরুষ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে হাতের আংটি থেকে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে। মুহূর্তে যেন চাতালটা কোন এক অন্য গ্রহ হয়ে গেছে। এমন সুন্দর পুরুষ রমণী আমি জীবনেও দেখিনি। কিছুটা হতবুদ্ধি যুবকের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। কী যে খুলতে বলছেন বুঝতে পারছি না। বাবাঠাকুর মন্দিরের দরজার দিকে হাত তুলে দেখালেন।

বুঝলাম তিনি মন্দিরের দরজা খুলতে বলছেন। ঠিক দরজা নয় বরং গ্রিল বলা চলে। চাতাল থেকে দেবী দর্শনে যাতে অসুবিধা না হয় সে-জন্য এ-ভাবে একটা গ্রিল এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রিলের হুকটা তুলে দরজা খুললে, বাবাঠাকুর বললেন, বোস, আসনে বসে মাকে অন্নদান কর ঃ আজ তোর পালা। ঠাকুরের অনেক খ্যাপামি আমি দেখেছি। কিছু শোনা। হাগা মোতা কাপড়ে দেবীকে বলেন, খা খা। এতে যে মানুষটার একটা বড় বিশ্বাসের জায়গা আছে সহজে ধরতে পারি। না হলে এমন জাগ্রত দেবীর অন্ন ভোগে না কোন মন্ত্রোচ্চারণ, না কোন ফুল, বেলপাতা, শুধু এক কথা খা খা। খা মাগি। সাধারণ মানুষ যে নন তিনি তাঁর কথাবার্তা এবং জাগ্রত দেবীর প্রতি তাঁর আচরণ দেখলেই বোঝা যায় সেটা। কিন্তু তাই বলে আমাকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন। পূজা আমি জানি না যে তা নয়। উপনয়নও হয়েছে খুব শৈশবে। বাবা বাড়ি না থাকলে যজনযাজন কখনও কখনও করতেও হয়েছে। কিন্তু এমন জাগ্রত দেবীকে নিয়ে বাবাঠাকুর যা খুশি করতে পারেন, আমি পারি না। কিছুটা ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখতে গিয়ে মনে হল বদরিদা চাতালের থামের আড়াল থেকে আমাকে ইশারায় কিছু বলছেন।

লক্ষ্মী দৌড়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, যা বলছে, কর মাস্টার।

বুঝতে পারছি, যে কোন কারণেই বাবাঠাকুর খেপে গেছেন। অগত্যা মন্দিরে ঢুকে আসনে বসতে হল। যে সব ভোগ পড়েছে, তাতে ফুল বেলপাতা দিতে হল। সেই অভিজাত পরিবারের পুরুষ নারীদের বাবাঠাকুর নির্দেশ দিলেন, চরণামৃত নিতে। তারা এসে হাঁটু গেড়ে বসল। একে একে সবাই মায়ের আশীর্বাদ ফুল বেলপাতা নেবার শেষ দিকটায় চমকে গেলাম। সেই মেয়েটা! আমার ছোড়দি না। তবে একে দেখলে আমার ছোড়দির কথা মনে হয়। যেন এতদিন পর শাড়ি পরলে এমনই দেখাত। কলেজে যায় আমাদের ইয়ারে পড়ে। বড় মেধাবী ছাত্রী। ছিমছাম লম্বা এবং সাদা জমিনের সিল্ক আর নীল রঙের ব্লাউজ গায়। কোনো দিকে তাকায় না। অভিজাত পরিবারের হলে বোধহয় মেয়েদের কোন দিকে তাকাবার নিয়ম নেই।

কলেজ টাওয়ারের নিচে কতদিন গোপনে মেয়েটাকে দেখেছি। জেলখানার পাঁচিলের পাশে এসে ওর গাড়িটা থামত। গাড়ি থেকে নেমে তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটা দিত। হাসনুহানা ফুলের গাছটা পার হয়ে সে সিঁড়ি ভাঙত ধীর পায়ে। বুঝতে পারতাম, সব ছেলেদের চোখ তখন ওর দিকে। যে কোনোদিকে তাকায় না সে জানে, সবাই তাকে দেখছে। সুতরাং তার পক্ষে অহংকারী হওয়া মানায়। ওদের পরিবার এই দেবস্থানে আসে, বাবাঠাকুরের প্রসন্নতা লাভে ওদের পরিবার যে ভিক্ষুকের শামিল আগে জানলে আমি লক্ষ্মীর মিমিদির সঙ্গে কলেজেই আলাপ করতাম। কলেজের প্রথম বছরটা কী যে মহার্ঘ ওকে না দেখলে যেন আমরা টের পেতাম না। ওর নামকরণ এত বেশি সংখ্যায় হয়েছে যে আসল নামটা আমাদের কাছে হারিয়ে গিয়েছিল। মিমি হাঁটু মুড়ে হাত পেতে বসে আছে। আমাকে চিনতে না পারারই কথা।

আমিও তাকাচ্ছি না। ছোড়দির জন্য যে আবেগ বোধ করছিলাম মিমির শরীর এবং সুন্দর ভঙ্গী দেখে তার অনেকটা উপশম হয়েছে। আসলে রক্তে নেশা ধরেছে—ভাল জাত হলেই হল। এখন তো শুধু বড় হওয়ার পালা। বড় হতে গেলে চারপাশের গাছপালার মতো চাই কোনো লাবণ্যময়ীর সাহচর্য। ওর শরীরে কোনো সুগন্ধী আঁতরের গন্ধ। সিল্কের ভাঁজ থেকে মনে হচ্ছিল এক্ষুনি সব প্রজাপতিরা উড়ে এসে আমার শরীর ঢেকে দেবে। ফুল বেলপাতা দেবার সময় কী বুঝে তাকাতে গিয়ে দেখলাম মিমি ফিকফিক করে হাসছে। কিছুটা যেন উপহাসের মতো।

বাবাঠাকুরের তখনই বিকট চিৎকার, ও-ভাবে না, ও-ভাবে না। লম্বা হয়ে যা মেয়েছেলে। কচি

আছিস, লম্বা হয়ে যা। মাথায় দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পা ধরে বল, ঠাকুর তুমিই আমার সব। বল বল। কিন্তু মিমি কিছুটা গোঁ ধরে আছে যেন! সেই অভিজাত পরিবারের নারী পুরুষ তখন বলছে, মিমি বাবাঠাকুর বললে করতে হয়।

আমি জানি, বাবাঠাকুর আজ আমাকে আসনে বসানোতে মিমির মধ্যে কোনো কৌতূহল দেখা দিয়েছে, আমি একই কলেজে ওর সঙ্গে পড়ি তাও হয়তো লক্ষ্মীর কাছে জেনেছে। কারণ সেতো কাউকে চেনে না, সবাই তাকে চেনে! তা একটা কলেজ ছোকরা এমন জাগ্রত দেবীর হয়ে-ফুল বেলপাতা দিচ্ছে, ভাবতে গিয়ে ফিক করে হেসে দিতেই পারে! অপরাধের কিছু না। বাবাঠাকুর বোধহয় লক্ষ্য করে কিছুটা অপমান বোধ করেছেন। তাঁর ইচ্ছেয় খড়কুটোও বাবাঠাকুর, তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর প্রতিভূ ভেবেছেন। আমার হাত থেকে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণের সময় হাল্কা পরিহাসের অর্থই হচ্ছে তাঁকে লঘু করা। যেন এই অপরাধে সংসার রসাতলে যাবে। এখন একমাত্র উপায়, এই প্রতিভূর দু-পায়ে জড়িয়ে ভিক্ষে চাওয়া, ঠাকুর তুমিই আমার সব।

বিদ্যুতের মতো আমার মাথার মধ্যে সব কারণগুলো শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকলে আমি ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। এবং এ হেন দুরবস্থায় কী যে করি! অভিজাত পুরুষ রমণীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মিমিকে বড় কাতর কণ্ঠে বলছে, ধর মা, বাবাঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করতে নেই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। বদরিদা বৌদি ধনুদা এবং অন্য সব তীর্থযাত্রীরা যেন ভাবছেন, বাবাঠাকুর এ-ভাবে আর কারো উপর করুণা বর্ষণ করেন না। মেয়েটা খেপী! কিছুই বুঝছে না! চোখ স্থির করে বসে আছে। হাসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এমন একটা ফ্যাসাদে পড়বে আগে যদি তার এতটুকু সে টের পেত।

মেয়েটির যত না ফ্যাসাদ তার চেয়ে বেশি আমার। ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। বড় বেশি বিব্রত বোধ করছি। বাবাঠাকুরের কাছে এর অর্থ কী দাঁড়ায় আমি ঠিক জানি না, আসলে তিনি হয়তো বিশ্বসংসারের সব কিছুর নিয়ামকের একটা হেতু আমার মধ্যে কিংবা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন। জন্ম মৃত্যু আধি ব্যাধি, শোক জরা সব কিছু সেই নিয়ামকের ইচ্ছা অনিচ্ছা, তিনিই মানুষের ঠাকুর কিংবা জাগ্রত দেবী অথবা এক মহিমময় করুণাময় ঈশ্বর! সেই অপার্থিব রোষ থেকে যেন মেয়েটির তরল হাসিজনিত পাপ, বা অবহেলার মুক্তির কথা ভাবছেন বাবাঠাকুর—মিমি তখন সত্যি সত্যি আমার দু-পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি ভাবছিলাম—ছিঃ ছিঃ এ কি পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! এমন অপ্রস্তুত হতে হবে জানলে বাবাঠাকুরের ডাকে সাড়াই দিতাম না। তার আগে ছুটে যেদিকে দুচোখ যায় পালাতাম।

তারপর এক সময় সব কেমন নিঝুম হয়ে গেল। আজ বলিদান হয়নি। শনি মঙ্গলবারে এই মন্দিরের চাতালে ছাগশিশুর আর্তনাদ কানে আসবেই। আজ সে সবের কিছু হয় নি। আমার মনে হতে থাকল, বলিদান হয়েছে, তবে সে কোন ছাগশিশুর নয়, এক মানবীর। আমিই সেই নিধনের হোতা। মনটা কুণ্ঠায় কেমন সংকোচিত হয়ে থাকল। দেবীর থান থেকে উঠে কোনদিকে যাব ভাবছিলাম! দেখলাম বাবাঠাকুর পরম নিশ্চিন্তে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে একটা কম্বলে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে ম্যাকবেথ বইখানা।—যা তিনি অনায়াসে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারেন। তাঁর কণ্ঠে সেই ইংরেজি শব্দমালা আমি কতদিন গোপনে কান পেতে শুনেছি। উপনিষদের কোন শ্লোক তার ব্যাখ্যা তিনি নিজে একা একা করেন এবং শোনেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় তাঁর দুচোখ বয়ে জল পড়ে। কোমল এক প্রাণ মনে হয় অথবা সেই উচ্চারণ—ফ্রেলটি দাই নেম ইজ ওম্যান যখন বলতে বলতে কেঁপে ওঠেন, তাঁর দিকে তখন ভয়ে তাকানো যায় না। গেরুয়া নেংটি পরা শীর্ণ হাত-পা-ওয়ালা মানুষটার লাল জবাফুলের মতো চোখ দেখলে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি ধরে চাতালে নেমে এলাম। বৌদি চাতালের একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় আমাকে ডাকছেন। কাছে গেলে বললেন, বাবাঠাকুরের কাছ থেকে স্নেহাই পেলি!

মাথা ঝাঁকালাম। আমাকে খুব বিমর্ষ দেখে বৌদি বললেন, ভিতরে যা। স্নান টান সেরে খেয়ে নে। তোর দাদা তোকে আবার কেন জানি খুঁজছে। ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম, বারান্দার এক পাশে নটু পটু লুডু খেলছে। বাবাঠাকুরের পাল্লায় পড়ে আমি জব্দ হওয়ায় ওরা যেন কিছুটা মনে মনে খুশি। বদরিদার ঘরে ঢুকে দেখলাম সেই অভিজাত পরিবারের সবাই বেশ হাসি গল্পে মশগুল। বাবাঠাকুর

প্রসন্ন না হলে তাঁর কৃপালাভ আজ ঘটত না। কতকাল থেকে যেন তারা বাবাঠাকুরের এমন বিচিত্র লীলা দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। যাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাদেরকেই নির্যাতন করেন এমন ধারণা চালু থাকলে আমি আর কী করতে পারি। ওরা আমাকে দেখে বলল, তুমি মিমির সঙ্গে পড়?

—পড়ি ঠিক না, এক কলেজে পড়ি। আমার কমার্স, ওর সাইন্স।

—বাবাঠাকুর দেখছি তোমার ওপর খুব প্রসন্ন।

—হবে।

এই সব কথা বলার ফাঁকে মিমিকে আমি খুঁজছিলাম। মেয়েটা কোথায়! এরা এত শিক্ষিত পরিবার অথচ গুরু মহিমা এদের এত কাতর করে রাখে কী করে! মিমিকে না নিয়ে এলেই যেন ভাল করত।

চোখে লম্বা কাজল টানা এবং যাকে নবীনাই বলা যায় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের বাড়ি এস। বৌটির কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। চুল কোঁকড়ানো। এবং ভ্রূ জোড়া যেন পাখির ডানার মতো। চোখে আশ্চর্য ধার। মিমির কেউ হয়। যেন এই পরিবারটি বংশের আভিজাত্য রক্ষার নিমিত্ত কোনো এক দূরাতীত গ্রহ থেকে অপ্সরীদের সংগ্রহ করে এনেছে।

বদরিদা বললেন, এই আমাদের বিলু। মাস্টারমশাইর ভাইপো।

মানুকাকাকে ওরা চেনে। প্রৌঢ় মতো মানুষটি বললেন, বাবাঠাকুরের খুবই স্নেহভাজন দেখছি। শহরে গেলে আমাদের বাড়িতে এস।

আসলে কী বাবাঠাকুর প্রসন্ন বলে তাঁর আশীর্বাদের ছোঁয়াচ আমার সঙ্গে এই পরিবারে প্রবেশ করবে। যেন বাবাঠাকুরের প্রতিনিধি একজন আমি। আমার সেবাযত্ন করলেই বাবাঠাকুর তৃপ্তি লাভ করবেন এমন ধারণা তাদের হতে পারে। কিছু বললাম না। কারণ যাকে খুঁজছি তাকে দেখতেই পাচ্ছি না। সে কোথায়! আমার এই বয়েসটা বুঝতে শিখিয়েছে, এতে একজন তরুণীর কত বড় অপমান এবং জ্বালা। তার কাছে দাঁড়িয়ে যদি বলি, আমার কিছু করার ছিল না মিমি। আমি নিমিত্ত মাত্র। আমি অভাবী বাবার সন্তান। মানুকাকা এই আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছেন। আমার বড় হবার সখ। যেমন তোমাকে দেখলে আমার মনে হয়, আমি ঠিক ঠিক বড় হতে না পারলে তোমার কাছে পৌঁছাতে পারব না। বাবাঠাকুরকে কেউ অমান্য করতে পারে না। তোমাদের মতো পরিবারও না। তোমার যে কী দরকার ছিল ঠোঁট টিপে ফিকফিক করে হাসার!

বারান্দায় বের হলেই দেখলাম কার্তিক মামার বৌ রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। কার্তিক মামা মামীর পেছনে যাচ্ছিল, বলিদানের সময় তার অন্য মেজাজ। এ কাজটি এ তীর্থস্থানে পাকাপাকিভাবে সে হাতে নিয়েছে। আজ তার কাজটা ছিল না এবং আমাকে নিয়ে আজ বাবাঠাকুর লীলা করেছেন জেনে, মামীর সঙ্গে অনুসরণ করা অনুচিত ভাবল। ঘুরে দেখল আমাকে। চোখ ট্যারা বলে বোঝা যায় না কোন দিকে তাকিয়ে আছে। আন্দাজে ধরে নিতে হয় আমাকেই বলছে, কী মামা আজ বাবা খুব নাকি খেপে গেছিল!

আমি বললাম, আর বলবেন না, কী ঝামেলা বলুন তো!

—আরে ঝামেলার কী হল। মার থানে কী কখন লীলা কেউ বলতে পারে! আমার দাদুর কথা জান?

দাদুটা কে বুঝতে পারলাম না। চোখমুখ দেখে ধরতে পেরে বলল, আরে বদরিদার বাবা। সিদ্ধাই মানুষ—কাপালিক। শব সাধনা করতেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক মানুষ। তাকে দেখলে তো তুমি ভিরমি খেতে। বদরিদার মাথার কাছে যে মানুষটির ছবি আছে তিনিই এই শর্মার দাদু। তা দেখলে ভয় পাবার মতো। হাতে চিমটা, ত্রিশূল এবং কমণ্ডলু। কম্বল গায়ে বাঘের ছালে মানুষটা ঢাকা।

কার্তিক বলল, দাদুর দেহত্যাগের পর এল নরেন খ্যাপা। বাবাঠাকুরের অলৌকিক এবং বিভূতির কিছু খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি—এখন কার্তিক মামা আবার নতুন কিছু খবর দেয় কিনা জানার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অথবা সে কী বলতে চায় জানারও আগ্রহ।

তোমার কপাল খুলে গেল—থানে বসার মানুষ তুমি। বাবাঠাকুর তাঁর কাজটা তোমাকে দিয়ে যেতে চান। তুমি কিন্তু মামা, তন্ত্রমন্ত্র সব ভাল করে জেনে নেবে। বাবাঠাকুরের কাছে অনেক গূঢ় সিদ্ধাই আছে। অবহেলা কর না।

কথাটাতে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি, কলেজে পড়ি, নটু পটুকে পড়াই। আমার ছোড়দিরা চারপাশে বড় হচ্ছে, কত আমার স্বপ্ন সামনে—আর কিনা বাবাঠাকুর গত হলে আমাকে বসিয়ে দিতে চায়।

বাবাঠাকুর মনে মনে এ-সব ভাবছে তবে! আমি বললাম, তুমি যে কি না, এ-সব আমি করবই না।

—এই চুপ। এ-ভাবে বলো না। বাবাঠাকুর শুনতে পেলে আবার খেপে যাবে। শেঁষে বিলের জলে নামিয়ে দেবে সবাইকে।

এ-সব খবর আমার জানা, আমি এখানে আসার মাসখানেক আগে বাবাঠাকুর সহসা ক্ষিপ্ত। ঠিক সহসা বলা যায় না। রাতে শিবাভোগের সময়, দুটো সাদা শেয়াল ঝিলের ধারে রোজ ডাকলেই ভোগ খেতে আসে। হাতে কলাপাতা, কাচা মাংস আর দুধ। এই দিয়ে শিবাভোগ। ঝড় তুফান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বন্যা যাই এই ইহসংসারকে গ্রাস করুক না কেন, নিশীথে শিবাভোগ তিনি সেই প্রাচীন অশ্বত্থের নিচে ঝিলের পাড়ে দিতে যাবেনই। আর ঝড় জল প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই থাকুক না, সেই শিবাভোগে যে দুটি প্রাণী রোজ আসে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তারা আসবেই। না এলেই ব্যাস— কোথাও কিছু ত্রুটি ঘটে গেছে। বাবাঠাকুর তখন সেবাইত বদরিদার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেবাইতের মনে কোন পাপ ঢুকেছে হয়তো ভাবেন। সে-কারণে সে-রাতে প্রাণী দুটো ভোগ খেতে না আসায় রাতের দ্বিপ্রহরে সবাইকে বলেছিলেন, এখনই গৃহত্যাগ! বাবাঠাকুরের উপর কোনো অলৌকিক প্রবাহ তবে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ। তারই নির্দেশে তিনি সবাইকে এই শীতের রাঁতে গৃহত্যাগ করতে বলছেন। মন্দির এবং পাশের সংলগ্ন কোঠাবাড়ি থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে ঝিলের ঘাটে গিয়েছিলেন। সারারাত গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সব কজনকে, শিবাভোগে ত্রুটি ঘটায় সংসারের উপর যে রোষ নেমে আসার কথা ছিল, এই করে তা থেকে বাবাঠাকুর নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বদরিদা এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের।

কার্তিক মামা দেখছি আগের চেয়ে একটু বেশি সমীহ করতে শুরু করেছেন আমাকে। মার থানে আমিই ভাবি পুরোহিত। কুলীন বামুন, তার উপর আমার নিষ্ঠাবান পিতার খবর এ-বাড়িতে আগেই পৌঁছে গেছে। যাজনে এত পটু যার বাবা তার পক্ষে কালীবাড়ির পুরোহিত হওয়া খুব স্বাভাবিক এবং গর্বের বস্তু। লক্ষ্মীকেও দেখছি আগের মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে না। বৌদির সেবাযত্ন আমার প্রতি এমনিতেই একটু বেশিমাত্রায় ছিল—এই ঘটনার পর কথাবার্তায় যেন তার শ্রদ্ধার ভাব এসে গেছে। এ-সব কারণে আমি আরও সংকোচের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ঠিক আবার পলাতক হব—কে আমাকে একটা মন্দিরে পুরোহিত বানায় দেখব। সাধ্য কি—কিন্তু যেটা এর চেয়ে দুঃখের, তা হচ্ছে মিমির অবমাননা। মিমির নরম হাত, কী সরু আর লম্বা চাঁপাফুলের মতো, হাতে হীরের আংটি, যেন পদ্মকলিতে কোন রুপোলি ভ্রমর এসে উড়ে বসেছে। মেয়েটাকে খুঁজছি মনে মনে।

গাড়ি দুটো আমার পড়ার ঘরের পাশে ঠিক আছে। ওরা ভোগের প্রসাদ খেয়ে তবে যাবে। বদরিদার ঘরে সবাই বসে আছে। বদরিদা ওদের একটু বেশিই খাতির যত্ন করছেন। চা আসছে, মন্দির থেকে সন্দেশ আসছে এবং বাবাঠাকুর এত প্রসন্ন হওয়ায় কপালে যার যা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল সব মুছে গেছে। ওরা কথায় কথায় হা হা করে হাসতেও পারছে।

শুধু এ তীর্থস্থানে বোধ হয় একজন তার অবমাননায় হাসতে পারছে না। সমবয়সী একটা ছোঁড়ার পা ধরে, তুমিই আমার সব ঠাকুর বলার পর সে উধাও। এই মেয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসেছিল, আমাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ মজা উপভোগ করবে বলে বোধ হয়। নাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে— আগে বুঝতে পারি নি, দেখার পর বুঝেছি, যে মেয়ের গুমর এত, কলেজে কারো দিকে চোখ তুলে তাকায় না সেই মেয়ের তার কলেজের এক আশ্রিত ছাত্রকে দেখার জন্য এত কৌতূহল। মনে মনে ভাবলাম, বেশ হয়েছে, এখন বোঝ—তারপরই আর এক দুর্বলতা এসে গ্রাস করতে থাকল। বাবাঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ। অন্তর্যামী। তিনি বোধ হয় আগেই টের পেয়ে গেছিলেন, তার বিলুকে নিয়ে মজা করার জন্য রায়বাহাদুরের নাতনি পড়ার ঘরে ঢুকে বসে আছে। রায়বাহাদুরের নাতনি বলেই তুমি সবাইকে অবজ্ঞা করতে পার না!

মিমি কোথায় আছে কাউকে বলতেও পারছি না। তোমার ছোকরা এমন রূপসীকে খুঁজে বেড়ানো

কেন? মনে মনে খোঁজা। নটুকে একবার দেখলাম দৌড়ে মন্দিরের চত্বরের দিকে গেল। তাকে বললে হয়, এই নটু জানিস, মিমি কোথায়। —মাস্টারমশাই আমাকে ডাকছেন? আমার বয়স আর ওদের বয়সের তফাত পাঁচ সাত বছরের। কিন্তু এঁড়ে বাছুরের মতো গুঁতাতে এখনই এরা শিখে গেছে। অকালপক্ক। আমার খোঁজাখুঁজির মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা আছে টের পায়! ধুস্ মরুকগে। দরকার নেই। পড়ার ঘরে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে থাকাই ভাল। না হয় স্নান-টান সেরে ফেলি। এক সঙ্গে পাত পড়বে লম্বা বারান্দায়। রায়বাহাদুর আর তার পরিবারবর্গের সঙ্গে এক সঙ্গে ভোজন। বৌদিও দু-বার তাড়া দিয়েছেন, এই বিলু স্নান করে নে। কলেজে গেলি না, তোর দাদার সঙ্গে খেতে বসবি।

আর আশ্চর্য মন্দির থেকে বের হয়ে লক্ষ্মীকেও দেখছি না। লক্ষ্মী আর মিমি কী তবে বাগানের দিকে গেছে। যাওয়া ঠিক হবে না—তবু টানে। দু'জন দু'রকমের। দুই মেরুর। একটা জায়গায় বোধ হয় ওরা এখন সমব্যথী। একজন অনাথ, অন্যজন আর এক অনাথের কৃপালাভে পা জড়িয়ে ধরেছে। তবে তুমিও অনাথ! এ-সব হিজিবিজি চিন্তা মাথায় খেলা করলে দেখতে পেলাম ওরা দু'জনেই খিড়কি দরজা দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে। সব ভেস্তে গেল। পায়ে ধরে বলাটাও যেন এক মজা। আমাকে দেখে গুম মেরে গেল। বাবাঠাকুরের চর সামনে।

হঠাৎ আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। রাগ চড়ে গেলেও নিজের সম্পর্কে সচেতন বলে, রাগ সামলেই কথা বলতে হল। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী শোন।

লক্ষ্মী থামলে মিমি দাঁড়াবে। আসলে যতই মাথা গরম হয়ে থাক, মিমিকে আমি সম্বোধন করতে পারি না। কারণ কলেজে যে মেয়ে উর্বশীর মতো ঘুরে বেড়ায় তাকে একজন বাউণ্ডুলে বাবার সন্তান নাম ধরে ডাকতে পারে না।

মিমি আর লক্ষ্মী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের চোখেই কৌতূহল—আমি কী বলব শোনার জন্য।

লক্ষ্মীকে বললাম, দেখ লক্ষ্মী তোমাদের মিমিকে বলে দিও আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই।

লক্ষ্মী স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলল, ওমা এ কি কথা মাস্টার। তোমাকে বাঘ ভাল্লুক আমরা ভাবব কেন?

আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমার কোন দোষ নেই মিমি। বাবাঠাকুর বললে কী করি তাই পা দুটো বাড়িয়ে না দিয়ে পারি নি।

মিমি এবার বেশ কিছুক্ষণ আঁচলে শরীর ঢেকে দাঁড়াল। বলল, আপনি আমাদের কলেজে পড়েন?

—পড়ি।

—কোন ইয়ার?

—সেকেণ্ড ইয়ার।

—মিছে কথা, কখনও তো দেখিনি।

—আপনি তো কাউকে দেখেন না।

—সবাইকে দেখি। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে না দেখে উপায় আছে!

তাহলে মিমি সব দেখে। শুধু আমাকে দেখেনি। সাহসই হয়নি কখনও মিমির কাছে যাবার। দূর থেকে দেখলে, মিমি তাকে লক্ষ্য করবে কী করে, কিন্তু আসল কথাটা যে বলা হল না। —মিমি বুঝলে। ঢোক গিললাম।

লক্ষ্মী কেমন মাষ্টারী গলায় বলল, বলেই ফেল না। ঢোক গিলছ কেন?

মিমির চোখ দুটো আরও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই দুষ্টু হাসি ঠোঁটে। আমাকে দেখলে এ-ভাবে হাসে কেন? আমি যে গোবিন্দদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পলাতক হয়েছিলাম, সে কথা কি লক্ষ্মী বলে দিয়েছে। ছোড়দি যে আমাকে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে দামোদরের বালিয়াড়িতে নিয়ে যেত তার কথাওকি...? যে ছেলে একটা মেয়ের সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে হাওয়া খেতে যায়, সে আবার পুরুষ মানুষ কী করে! এই অবজ্ঞা থেকেই হাসি। আমাদের দারিদ্র্যের কথাও জানতে পারে। মিমিকে কিছু বলার অর্থই হচ্ছে, আমার অধিকার সম্পর্কে আমি ঠিক সচেতন নই। কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার! পায়ে ধরে তুমি আমার সব ঠাকুর বলার সময় মুহূর্তে যে বিষণ্ণতা জেগে উঠেছিল চোখে, মন্দির থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলেছে দেখছি। একজন

খ্যাপা মানুষ দাদুর গুরুদেব, তার ইচ্ছে অনিচ্ছেতে দাদু ভয় পেলেও মিমি পায় না। দাদু ছোট না হয়ে যায় ভয়েই মিমি আমার চরণ দুখানি ধরে সবার সমানে নাটক করেছিল।

আমার আর কথা বলার সাহস থাকল না। ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। কেন যে কথা বলতে গেলাম। মেয়েদের সম্পর্কে আমার একটা ভয় কিংবা সংকোচ এমনিতেই এত প্রবল যে যা কিছু ইচ্ছে গোপনে। প্রকাশ করার ক্ষমতা কম। মিমি তখন যেন না বলে পারল না, কী চলে যাচ্ছেন।

—স্নান করতে যাব।

—কিছু বললেন না যে।

—না মানে।

আপনি ধন মান যশ হলে সবাইকে নাকি আবার সব ফিরিয়ে দেবেন।

লক্ষ্মী সাহসা কেমন ঠেলা দিয়ে বলল, এই মিমিদি....

লক্ষ্মী এই প্রথম আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সমবয়সী বলে আমার সব কথা মিমিকে বলে দেওয়া ঠিক হয়নি। আমি গুম মেরে গেলাম। চলে যাচ্ছিলাম, মিমি ডাকল, শুনুন। যেন আদেশ। আমাকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে।

মেয়েরা ডাকলে আমি চলে যেতে পারি না। খিড়কি দরজার দিকটায় তখন কেউ নেই। আমরা তিনজন। লক্ষ্মী যেন আমাকে দেখছে না। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য দেখছে এমন চোখে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ এরা তবে বাগানে বসে বসে আমাকে নিয়েই কথা বলেছে। লক্ষ্মী কাজটা ভাল করেনি। পিলুর কথাও বলে দিতে পারে—আমরা দেশ ছাড়া এবং উদ্বাস্তু এসবও বলে দিতে পারে। লক্ষ্মী তো আমাদের বাড়ি গিয়ে সবই দেখে এসেছে। কত গরীব আমরা মিমি টের পেয়ে গেছে।

আমরা খুব গরীব। এ-কথা টের পেলে আমি বড় ছোট হয়ে যাই। বাবার বিচিত্র খেয়ালের কথাও বলে দিতে পারে। অভিজাত পরিবার বিষয়টা কি আমার জানা হয়ে গেছে। ছোড়দির বাড়িতে তা টের পেয়েছি। দেশে বাবার জমিদার দীনেশবাবুর বাড়ি গেলে তা টের পেয়েছি। যেন ওরা মানুষ না। অন্য গ্রহের দেবদেবী। আমাদের কুঁড়েঘরে নিজেদের থাকবারই জায়গা হয় না, তার মধ্যে আবার শংকরাকে ডাকা। বাড়িতে এক পাল বেড়াল, হাঁস কবুতর একটা হনু পর্যন্ত পিলুর কৃপায় আশ্রয় লাভ করেছে। লক্ষ্মী সব বলে দিলে আমরা যে একটা মজার দেশের মানুষ মিমি ভাবতেই পারে। এখন যত রাগ গিয়ে আমার কেন জানি লক্ষ্মীর উপর পড়ল। কিছু বলারও উপায় নেই। নালিশ দিলে বদরিদা বলবেন, বিলু! লক্ষ্মীর সঙ্গে তোদের বনে না কেন বুঝি না। ও তোদের জন্য এত করে আর তোরা ওর পেছনে লাগলে খাপ্পা হবে না। তোদের অর্থে, আমি নটু পটু।

এ দেশের মানুষেরা উদ্বাস্তুদের যে কত করুণার চোখে দেখে! আমি যখন উদ্বাস্তু আর মিমি যখন তা টেরই পেয়ে গেছে তখন আর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং আমার বাবাঠাকুর সাজার বিষয়টা নিয়ে মিমি এখন কী বলে সেটা শোনাই ভাল।

মিমি সেদিকটায় একেবারেই গেল না। শুধু বলল, মাস্টার তোমার বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে? আপনি থেকে তুমি! লক্ষ্মী বাগানে বসে ঠিক সারাক্ষণ মাস্টার মাস্টার করেছিল, সব ধরে ফেলেছে।

—আমার বাড়ি কেন?

—বেড়াতে যাব।

—না না আপনি আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবেন কেন?

—বেড়াতে গেলে দোষের কিছু আছে?

—না, দোষের হবে কেন।

লক্ষ্মী টানতে থাকল মিমির হাত ধরে। চল মিমিদি। বলেছিলাম না, মাস্টার স্বার্থপর। ছোট ভাইটাকে পর্যন্ত এখানে দুরদার করে। আমি তো জোরজার করে গেছিলাম। তোমাকে যেতে হলে জোরজার করে যেতে হবে।

—তাই যাব ভাবছি। মিমি শুধু এইটুকু বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম।—আমাদের বাড়ি আপনি যাবেন কেন? বন জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। ঢোকাও যায় না।

—তোমরা ঢোক কী করে!

—অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাকে আমি নিয়ে যাব না! মনে মনে বললাম, মজা পেয়েছ না? বাড়ি গিয়ে দেখবে, মা হয়ত বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছে। পিলু হয়তো খালি গায়ে এক বোঝা ঘাস নিয়ে ঢুকছে বাড়িতে। বাবা তখন হয়ত হাঁটুর কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে হুকা খাচ্ছেন। মায়া হয়তো হনুটাকে

কাঁধে নিয়ে দুলে দুলে পড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোশ নেই। বাঁশের মাচান। বারান্দায় একটা চেয়ার নেই, মাদুর পাতা। রান্নাঘর বলতে শণ দিয়ে ছাওয়া ঝাঁপের বেড়া। হয়তো বাবা গামছা পরে স্নানে যাবার আগে পোষা কুকুরটার এঁটুলি বাছছেন। মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর প্রতি সেবাযত্ন লক্ষ্য করলেই ধরতে পারবে অবস্থা বিপাকে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। ও সব দেখে তুমি মজা পাও সে হতে দেব কেন। শুধু মজা, কলেজের আর মেয়েরা, শুনে আমার দিকে ঠিক যাবার সময় চোখ তুলে তাকাবে। তাকালেই বুঝতে পারব ওরাও জেনে গেছে। তুমি শ্রীময়ী কলেজে এত অহংকারী এখানে এসে এত মুখরা হয়ে উঠলে কী করে? বাবা বলেন, স্ত্রীজাতি যা দেবী সর্বভূতেষু—তোমরা কখন যে কী যদি ঈশ্বর বুঝতে পারতেন।

মিমি আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, শোনো মাস্টার তুমি নিয়ে না যাও, আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে যাব!

—লক্ষ্মী আমার সঙ্গে একবার গেছে। আর একবার গেলে এমন বনজঙ্গলে ঢুকে যাবে, যে সে আবার নবমী বুড়ি না হয়ে যায়।

—নবমী বুড়ি মানে?

—লক্ষ্মী জানে।

নবমী বুড়ির কথায় মিমি বোধহয় কিছুটা ঘাবড়ে গেল।

লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, নবমী বুড়িটা কেরে?

—আরে মাস্টারের বাড়ি যাবার পথে জঙ্গল পড়ে।

—তুমি বল লক্ষ্মী কী গভীর বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

—না মিমিদি, সুন্দর রাস্তা। একবার গেলে তোমার কতদিন যে রাস্তাটার কথা মনে থাকবে। বড় বড় গাছের ছায়া, কত রকমের পাখি, দু'পাশের ঝোপ জঙ্গলে কত অচেনা ফুল।

ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম, কবি হয়ে গেলে দেখছি।

—কবি মানে? লক্ষ্মী মিমির দিকে তাকিয়ে বলল, কবি কিগো মিমিদি!

—তুমি নিজেই কবি মাস্টার। ভীতু মানুষেরা কবি হয় জান। নারীর স্বভাবসুলভ সেই এক মুখ ঝামটা মিমির।

—আমি ভীতু মানুষ!

—তা ছাড়া কী।

যাই হোক আর যাওয়ার কথা উঠছে না বলে নিশ্চিন্ত। এবারে কেটে পড়লে হয়। বৌদি এসে এমন নিরিবিলি জায়গায় দুটো মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখলে খারাপ ভাবতে পারেন। পা বাড়াতেই আবার ডাক, বাবাঠাকুর আমরা কিন্তু যাব।

মিমির কাছে বাবাঠাকুর হয়ে গেলাম! আমাকে পায়ে ধরার সময় ঠাকুর বলেছিল। ঠাকুর না বাবাঠাকুর! আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেলাম। তাকালাম না। চলে যাওয়াই শ্রেয়। এখন দরকার আমার লক্ষ্মীকে একা পাওয়ার। রাত দশটা এগারটা নাগাদ পাওয়া যাবে। সে তখন আমার নটু পটুর বিছানা করতে আসে পড়ার ঘরে। নটু পটুকে সঙ্গে নিয়ে লাগতে হবে। তুমি শেষ পর্যন্ত আমার পেছনে এতটা লেগেছ। রায়বাহাদুরের নাতনিকে লেলিয়ে দিয়েছ। কলেজের দেখা আর এখানে দেখা একেবারে আলাদা রকমের। কত সম্মান দিতাম, কত মহিমময়ী ভাবতাম, দেবী মনে হত, শাড়ির খসখস শব্দ শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন করত। এখন দেখছি, তুমি আর লক্ষ্মী একরকমের। আমার পেছনে লেগে মজা খুঁজে বেড়াও। আমি তোমাদের কাছে বাবাঠাকুর!

—দেখুন আমাকে বাবাঠাকুর ডাকবেন না। আমি বিলু। কর্মাস নিয়ে পড়ি। কম্পার্টমেন্টালে পাস। বাবার কথায় দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতে পাস। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে। অবশ্য এ-সবই মনে মনে। যা বললাম, তা অন্যরকম।—বাবাঠাকুর হতে যাব কেন! বাবাঠাকুর নরেন খ্যাপা। তার ভক্ত আপনার পিতামহ।

—হাঁ মাস্টার, তুমি বাবাঠাকুর তবে! লক্ষ্মী গলা উঁচিয়ে কথাটা বলল।

—না, আমি বাবাঠাকুর না।

মিমি বলল, বাবাঠাকুর দ্য সেকেণ্ড।

ইস কেন যে সাড়া দিয়েছিলাম বাবাঠাকুরের ডাকে! তাঁর কাছে শরীর পবিত্র অপবিত্র বলে কিছু

নেই। মানুষের মন পবিত্র থাকলে সে সব সময় পবিত্র। হাগামোতা কাপড়ে পূজা আটকায় না। স্নান না করেও মায়ের মন্দিরে ঢোকা যায়। পূজা দেওয়া যায়। আমি শুধু তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করেছি। আমি বাবাঠাকুর দ্য সেকেণ্ড হতে যাব কেন। আসলে মিমি তাঁর অপমানের জ্বালা এভাবে মেটাতে চায়। মিমির এই ব্যবহারে নারী জাতির উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মাল। ছোড়দির জন্য যে ভাবালুতায় ভুগছিলাম তাও কেটে গেল। অবশ্য আমার মা'র অভাবে অনটনে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতার চেহারাটা জীবনে বার বার দেখা। দেখা সত্ত্বেও, একা থাকলেই কোনো ফুলের উপত্যকায় এক তরুণী কেবল দৌড়ায় এমন একটা ছবি মাথার মধ্যে কে যে গুঁজে দিয়ে যায়। আর এটা থাকে বলেই পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এটা আছে বলেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি। না হলে যেন সব ফাঁকা মাঠ, জীবন মৃত বৃক্ষের মতো। আবার সেই ধন মান যশের কথা মনে উঁকি দিল। ও-সব হলে কেউ আর মজা করতে পারবে না। তখন গাড়ি থেকে নেমে এ-শর্মার গলায় মালা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং এ-ভাবে কোনো এক উঁচু মঞ্চ থেকে আমি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেই, কখনও নিমগ্ন থাকি বই লেখায়, কখনও কবি হয়ে যাই। অথবা শিল্পী, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি—আয়ে না বালম—যা কিছু আমার নাগালের বাইরে সেই সব স্বপ্নে মনটা বিভোর হয়ে থাকে।

এদের সঙ্গে কথায় পারব না। মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না। আমার দৃঢ়তা কম। আমার মধ্যে নারীজাতির জন্য দুর্বলতাই বেশি। সব সুন্দরী কিশোরীকেই মনে হয় এদের ছুঁতে পারলেও পবিত্র হওয়া যায়। ছোড়দি নীল রঙের গাড়িতে যখন স্কুলে যেত, আমি রোয়াকে বসে দেখতাম। এই দেখার মধ্যে এক সৌন্দর্য আবিষ্কারের নেশা ছিল, তার পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, বব করা চুল রেশমের মতো, যেন আমার সামনে আস্ত তাজা ফুল হয়ে ফুটে থাকত। এ-সৌন্দর্যবোধ কোথায় রাখি! সৌন্দর্যবোধই আমাকে বড় বিপাকে ফেলে দেয়। কলেজে এই মিমিকেও সেই এক সৌন্দর্যবোধ থেকে আবিষ্কার। এখন দেখছি কত নিষ্ঠুর হতে পারে মিমি। সে আমাকে জব্দ করার জন্য বাড়ি পর্যন্ত যেতে চায়। বংশ যার এত দীন হীন তার আবার বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা কেন? বাবাঠাকুর দ্য সেকেণ্ড বলায় এত রাগ যে বলি, বাড়ি গেলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে পিলু। ওকে তো জানেন না। সে তার দাদার সঙ্গে কেউ মস্করা করছে জানলে আর রক্ষা রাখবে না। দাদাই হচ্ছে পৃথিবীতে দেখা তার বড় মানুষ। দাদা আর বিদ্যাসাগর তার কাছে সমান। দাদা তার কলেজে পড়ে সোজা কথা না!

সহসা খিড়কির বাগানের দিকটায় পটু হাজির। স্যার আপনি এখানে। মামা খুঁজছে।

তাড়াতাড়ি পালাতে হয়। মিমি আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা অশালীন ব্যাপার। বয়স তো হচ্ছে। আঠার বয়সটা কম না। বদরিদার বিবাহ ষোল বছরে। বৌদির বয়স নয়। বৌদির বার বছর বয়সে নটুর দাদা জন্মেই মরে গেল! নটু তার অনেক পরের। অনেক মানত তার জন্য। বদরিদা বোঝেন সব। আমার বয়সটা ভাল না। বৌদি অন্যরকমের। তাঁর কাছে বিলু সংসারে পাপ তাপ আছে বলে জানে না। নাহলে একা লক্ষ্মীকে আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে দেন! কিংবা রুচির প্রশ্নও থাকতে পারে। শত হলেও মাস্টারদার ভাইপো।

যাই হউক কারো দিকে না তাকিয়ে ধর্মশালা রান্নাবাড়ি পার হয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, তখনই মিমি বলছে, গেলে কী হবে। ছাড়া পাবে না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছোড়দি নাকি চিঠি লিখবে তোমাকে?

মাথাটা ঝাঁঝাঁ করতে থাকল। লক্ষ্মী আমাকে সত্যি ডুবিয়েছে। লক্ষ্মীকেই একমাত্র সেই পলাতক জীবনের কথা বলেছিলাম। ঠিক বলিনি, লক্ষ্মী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একা পেলেই বেশ সমব্যথীর মতো কথা তুলেছে ছোড়দির। যেন ছোড়দি তার একাই নয়, লক্ষ্মীরও। এখন বুঝতে পারছি আমি কত হাবা। যদি বদরিদার কানে যায়। ইস্ সত্যি কেন যে বলতে গেলাম বিশ্বাস করে। তুমি বিলু গরীবের ছেলে। তোমার এই ঘোড়ারোগ কেন।

আরে বিলু চান করবি না? সবার হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর পত্নীর এতক্ষণে চৈতন্য উদয়—মিমিটা কোথায়?

সঙ্গে তার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ—ছোট ছোট কাচ্চা-বাচ্চা, মিমি তোমাদের ছোট নেই। বাগানে বসে মাস্টারের মুণ্ডুপাত করছে দেখগে। বাবাঠাকুর দ্য সেকেণ্ড ভাবতে শুরু করেছে আমাকে।

রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ আপনি চান করে নিন।

এ-আবার কেমন কথা! আমাকে আপনি আজ্ঞে করছে। রায়বাহাদুরও কী আমাকে বাবাঠাকুর দ্য

সেকেণ্ড ভেবে ফেলেছে। যার হবার কথা নেতা, না হয় কবি, শিল্পী কিংবা সংগীত বিশারদ, তাকে নাঙ্গা সন্ন্যাসী বানিয়ে দেবার এই ষড়যন্ত্র কেন। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকাতেই যেন পরমগুরুর করুণা ভেবে বলা, আপনার উপর বাবাঠাকুরের অশেষ কৃপা। তিনি তাঁর যদি এক বিন্দু আমাদের দিতেন।

আমার জিভে শালা কথাটা এসে গেছিল—শালা আমি কি তোমাদের গুরু ভাই!

আপনি আজ্ঞে করায় মনটা তিক্ততায় ভরে গেল। বদরিদার উপর এদের প্রভাব, সীমাহীন খাতিরযত্ন দেখেই এটা টের পেয়েছি। যদি বদরিদাও বুঝে ফেলেন, কুলীন বামুনের ছেলে, তায় আবার দেখতে ব্রহ্মচারীর মতো, সহজেই মন্দিরের বলির পাঁঠা করে ফেলা যায়। আমার বাবা যা একখানা মানুষ, তাতে করে বদরিদার প্রস্তাব সহজেই লুফে নিতে পারে। যদি বলে, বাবাঠাকুরের বয়েস হয়ে গেল, যে কোনদিন দেহরক্ষা করতে পারেন, বিলুকে দিন মন্দিরে ঢুকিয়ে দিই। ইহজন্ম এবং পরজন্মের কাজ একই সঙ্গে সারা হয়ে যাবে। কত বড় কথা এমন জাগ্রত দেবীর থানের পুরোহিত হওয়া। সাত পুরুষের পুণ্যফল না থাকলে এমন সৌভাগ্য মানুষের জন্মায় না।

আসলে রায়বাহাদুর বোধহয় ভেবে ফেলেছেন, আমার আহার না হলে ওদের পাতে বসা অনুচিত। বাবাঠাকুর এদিকটায় খেতে আসেন না। তিনি আহার কখন করেন কেউ আমরা জানিও না। কাঁচা ফলমূল দই সন্দেশ এই তাঁর আহার। মন্দিরে বসেই তিনি নিজের খুশিমত খান, খেতে ইচ্ছে না হলে শুয়ে থাকেন। শুতে ইচ্ছে না হলে মন্দিরে প্রদক্ষিণ করেন, কিংবা তাঁর ঘরে পুঁথি ডাঁই করা আছে তা পাঠ করেন। সকালবেলায় হোতার সাঁকো পর্যন্ত যান। কারণ তখন প্রাতঃকৃত্যের দরকার হয়। দু'পাশের গরীব মানুষ-জন, ফড়ে, সাধু থেকে চোর বাটপাড়, পাটের মহাজন সবাই বাবাঠাকুরকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে! দেখলে পুণ্য। দিন ভাল যায়। একজন মানুষ দর্শনে শুভাশুভ যে এমন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এ অঞ্চলে না এলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

খেতে বসে বোঝা গেল, আমার প্রতি সবার নজর। ধর্মশালার বারান্দায় আজ পাত পড়েছে। রায়বাহাদুরের পরিবার সহ আমরা সবাই। নটু পটু কার্তিক মামা, ধনুদা এবং আমি। আমার দু'পাশে দু'জন, বদরিদা ডান পাশে, বাঁ পাশে রায়বাহাদুর। সবার খালি গা, সাদা উপবীত। ঠিক সামনে বসে আছে মিমি। লক্ষ্মীর এখন কাজ জল, পাতে লেবু এবং নুন দেওয়া। সে খেতে বসবে বৌদির সঙ্গে। মিমি আমার সামনে বসে। নির্বিঘ্নে যে খাব তারও উপায় নেই।

রায়বাহাদুর গদ্গদ হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার পিতৃদেব কী করেন?

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। শুধু বললাম, কিছু করেন না। বদরিদা জানেন আমি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। সেই মানুষ কোন কারণে অতিষ্ঠ না হয়ে উঠলে এমন জবাব দেয় না। বদরিদা গণ্ডুষ করার সময় আমার দিকে তাকালেন।

আমিও তখন পঞ্চদেবতাকে নিবেদন করে গণ্ডুষ করতে যাচ্ছি। দু'জনের চোখাচোখি হয়ে গেল। গণ্ডুষ সেরে বদরিদা বেশ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন, তোর হয়েছেটা কি? সকাল থেকে নাকি মেজাজ খারাপ করে আছিস। নটু পটুকে পড়াতে বসালি না। কলেজে গেলি না। রেললাইনে গিয়ে বসে থাকলি। স্থূলকায় রায়বাহাদুর সরু আতপ-চালের ভাত ঘি এবং সুকতোর ডাল দিয়ে মাখছিলেন, গন্ধরাজ লেবুর সুঘ্রাণ উঠছে—তিনি তাঁর খাওয়ার চেয়ে আমার সম্পর্কে বেশি কৌতূহল অনুভব করছেন বোধ হয়—কারণ ভোগের দিকে তাঁর মন নেই—বদরিদার কথার দিকে তাঁর মন। বদরিদা ঠিক বাবাঠাকুরের মহিমা বুঝে উঠতে পারছেন না—তাঁকে বিষয়টা অধিগত করানো দরকার ভেবেই যেন বলা, বাবাঠাকুরের ইচ্ছে! তুমি বদরি কেন যে বুঝছ না!

অর্থাৎ আমার আজকের মেজাজ মর্জি সবই বাবাঠাকুরের মহিমার ফলে হয়েছে। বাবাঠাকুরকে আমিও শ্রদ্ধা ভক্তি করি। বিষয় আশয় থেকে মুক্ত তিনি। তাঁর জ্ঞান অসীম। এ-সব এখানে থাকতে থাকতে টের পেয়েছি। কিন্তু তাঁকে পার্থিব জগতের বাইরের কোন শক্তি ভাবিনি।

বদরিদা বললেন, তা ঠিক।

—বাবাঠাকুরের অসুখের সময় বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে নিয়ে আসা হল মন্দিরে ফুল জল দেবার জন্য। ঢোকাতে পারলে! বাবাঠাকুর বলির খাঁড়া নিয়ে লোকটার পেছনে ছুটেছিলেন। তিনি সব বোঝেন। ধরতে পার বাবাঠাকুর তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী ঠিকই করে ফেলেছেন! তোমার মাস্টারের মুখখানি দেখেছ। নিষ্পাপ, পবিত্র, নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। নবীন সন্ন্যাসী কথাটি শুনে মিমি আমার

দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল।

আমি গালে হাত দিলাম। সোনালী রেশমের মতো গালে দাড়ি। এরই জন্য তবে যত হুজ্জুতি। আচ্ছা দেখা যাবে। কোনরকমে খেয়ে উঠে ঘরে এসে বসতে না বসতেই দেখি মিমি হাজির। ও আমাকে ছেড়ে দেবে না বলছে। না-ছাড়ার কাজটা বোধহয় এখন থেকেই শুরু করতে চায়।

খুব ভাল মানুষ হয়ে গেলাম। বিনীত কথাবার্তা—আপনারা কখন যাচ্ছেন।

—সে দিয়ে তোমার কী দরকার!

যখন জানার দরকার নেই বালিশটা টেনে শুয়ে পড়া যাক। চোখ বোজার চেষ্টা করি। ঘুমই এখন এর হাত থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। পাশ ফিরলাম।

—ছোড়দি নাকি তোমাকে পুলিশে দেবে বলেছিল?

—ভয় দেখিয়েছে। চোখ বুজেই বললাম। কারণ লক্ষ্মী যা ডোবাবার ডুবিয়েছে। এখন ভেসে উঠে লাভ নেই।

—কেন ভয় দেখাল?

—হুঁ। কিছু বলছেন। হাই তুললাম।

—কেন ভয় দেখাল!

—চুরি করেছিলাম।

—কী চুরি করেছিলে?

—টাকা। আমি আস্ত একটা চোর। হাই উঠতে থাকল। হাই তুলে যদি রেহাই পাই।

—কার টাকা?

—গোবিন্দদার। গ্যারেজে কাজ করতুম। মেট্রিকে কম্পার্টমেন্টালে পাস করে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না।

—এখানে উদয় হলে কী করে?

—সেও ভাগ্য।

—তোমাকে গ্যারেজেই মানায়।

—ঠিকই বলেছেন! হাই তুলেও দেখছি নিস্তার নেই।

—আমাদের গ্যারেজে কাজ করবে?

—না। আমি যে কথা দিয়েছি।

—কাকে কথা দিয়েছ?

—ছোড়দিকে!

—কী কথা!

—মানুষ হব। বাবাঠাকুর হব না! চোর জোচ্চোরকে বাবাঠাকুর মানায় না। তারপরেই উঠে সোজা মিমির কাছে হাতজোড় করে বললাম, দোহাই বলবেন না যেন, আমি চুরি করেছিলাম গোবিন্দদার কৌটো থেকে। টাকা চুরি করে পালিয়েছিলাম। আপনার পিতামহ জানলে দুঃখ পাবে।

—বয়ে গেছে দুঃখ পেতে।

—শুনলেন না, বলল, দেখতে নবীন সন্ন্যাসী!

—ঐটুকু তো তোমার সম্বল। শ্রীচরণ দুখানি বাড়িয়ে দিতে লজ্জা করল না। এক কলেজে পড়ি, এক ইয়ারের ছাত্র।

—মিমি কলেজে আপনাকে দূর থেকে দেখতাম। কী গম্ভীর। আমাদের সাহসই হত না আপনার কাছ দিয়ে যাবার। আপনি এখন আমার পেছনে লেগেছেন। একটা কাজ করবেন, বড় উপকার হয়।

—কী কাজ—?

—পিতামহকে নিবৃত্ত করুন। যা আজ্ঞে, আপনি করছে?

—ভাবছ তোমাকে করছে?

—না তা না। বাবাঠাকুরের ডামি আমি তিনি বুঝে ফেলেছেন। তবু যাই হোক অমন বুড়ো মানুষ আজ্ঞে আপনি করলে অস্বস্তি হয়।

—দাদুকে সব বলে দিলেই আজ্ঞে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

—কী বলবেন?

—তুমি একটা চোর।

—বলবেন ত!

—তার মানে।

যদি দয়া করে বলেন, জানাজানি হয়।

তুমি আমাকে আপনি আজ্ঞে করছ কেন? বলব না!

গেল সব, প্রথম ভেবেছিলাম দোহাই বলবেন না বললে, ঠিক বলে দেবে। পরে ভাবলাম কথা যদি রাখে, তাহলে আমি যে চোর ছ্যাঁচোড় জানাজানি হবে না। এটা এখন সত্যি দেখছি জানাজানি হওয়া দরকার। বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে ঢুকতে দেন নি বাবাঠাকুর, এক পঞ্চতীর্থ এসেছিল দেবীর পুরোহিত হবে বলে, বাবাঠাকুর তার গেরুয়া বসন এক হ্যাঁচকায় নাঙ্গা করে দিয়েছিলেন—আরও এভাবে দু-একজন এসে বাবাঠাকুরের কোপানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর মহিমা বোঝা দায়। এখন ভেবে ফেলেছে সবাই, আমিই সেই মানুষ বাবাঠাকুর যার সন্ধানে ছিলেন। একমাত্র চোর জোচ্চোর প্রতিপন্ন হলে যদি এই বিষম দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বললাম, দোহাই বলুন। সবাইকে বলুন, চোর ছ্যাঁচোড় দিয়ে কখনও থানে পূজা হয়! সব প্রণামীর পয়সা মেরে দেবে না!

মিমি কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেল। বলল, জানাজানি হলে ভাল হবে? এখান থেকে সটকে যেতে হবে না? বদরিদা একটা চোরকে জেনেশুনে রাখবে?

—মিমি আমার কাছে দুই সমান।

—তার মানে।

—তার মানে আপনি বুঝবেন না। আমার চোখ সত্যি বড় কাতর দেখাল। কাতর চোখ দেখলে বোধহয় মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাব জাগে। মিমির মধ্যেও মাতৃভাব জাগছে। এই সুযোগ। বললাম, আপনি আদুরে নাতনি। রায়বাহাদুরকে দিয়ে বলান, আমাকে দিয়ে ওসব কাজ হয় না। হবে না।

—তুমি দেখছি খুব ভয় পেয়ে গেছ?

—আপনি তো আমার বাবা কাকাকে জানেন না।

—মাস্টারমশাই তোমার কাকা না?

—হ্যাঁ, আমার মানুকাকা। তিনি কম্পার্টমেন্টাল পাস করেছিলাম বলে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের কাজ শিখলে নাকি অনেক পয়সা। তাঁর বন্ধু গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত করেছেন।

—তোমার বাবা মত দিলেন!

—বারে দেবেন না। গাড়ি চালাব। একটা আস্ত গাড়ি আমার হাতে। কত লোকের প্রাণ আমার হাতে। অফিস কাচারিতে ঠিকমতো হাজিরা আমার হাতে। বাবা তো একেবারে গদ্‌গদ। গ্যারেজে কাজ শিখলে একদিন গাড়ি চালাতেও শিখে যাব। আমার বাবার বড় স্বপ্ন ছিল আমি গাড়ি চালাই।

মাতৃভাবটা আরও দেখছি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মিমির!

—তোমার বাবা এটা ঠিক কাজ করেন নি। তুমি গাড়ির ড্রাইভার হবে, ছিঃ ভাবা যায় না।

—আচ্ছা বলুন তো ভাবা যায়। কেবল আমার ছোট ভাই পিলু বলত, দাদা কলেজে পড়বে। বোনটাও। মারও ইচ্ছে।

—তাই তো হওয়া উচিত।

—সে আর হচ্ছে! আপনার দাদু, বাবাঠাকুর, বদরিদা মিলে মানুকাকার কাছে যদি যায়—আমি মরেছি।

—ওরা যাবে কেন?

—বাবাঠাকুর বানাবার জন্য।

—ওরা বললেই তোমার বাবা মত দেবেন কেন।

—হায় ভগবান তুমি তো আমার বাবাকে চেন না। বাবা দেশ ছেড়ে এসে কতকাল যে জাতমান উদ্ধারের জন্য নামাবলি গায়ে ঘোরাফেরা করেছেন। তুমি তো জানো না, মানুকাকার ইচ্ছেই বাবার ইচ্ছে। মানুকাকার উপর আর কারো কথা নেই। হাতের কাছে এত বড় সুযোগ বাবা কী সহজে ছাড়বেন! এত বড় মন্দিরের বাবাঠাকুরের তিনি বাবা হবেন—মন্দিরের প্রণামী থেকে সব কিছুর বখরা তাঁর হবে—তিনি কী ছাড়তে পারবেন!

সহসা আমি কেন যে মিমিকে তুমি বলে ফেললাম। এটা ধৃষ্টতা হতে পারে। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকালাম। চোখে-মুখে মাতৃভাব আছে না মিলিয়ে গেছে লক্ষ্য করা দরকার। যদি দেখি বদল হয় নি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন। এই যে আপনি মানে আপনার পিতামহ মানে সবাই আমার কাছে স্বপ্নের দেশের মানুষ—লক্ষ্মী বলল, আপনাদের সামনের বাগানে নাকি একটা কাকাতুয়া বসে থাকে—একদিন নিয়ে যাবেন, দেখে আসব। এত সব মনের মধ্যে যখন ক্রিয়া করছে, তখনই লক্ষ্য করলাম, মাতৃভাব বদলে গিয়ে চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে কেমন সামান্য প্রেমিক-প্রেমিক মুখ। আমার দিকে আর সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। এতে প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হল আমার মধ্যে। বললাম, মিমি তুমিই পার আমাকে এ-বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

মিমি আঁচল সামলাচ্ছে। শরীর ঢাকছে। যাক আমি যে পুরুষমানুষ এ-বোধটা এতক্ষণে ভেসে উঠেছে মনের মধ্যে। এ-বোধটা একজন তরুণ এবং তরুণীর মধ্যে থাকা ভাল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বলের মতো পায়ে গড়াচ্ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে বল না হাতের বটুয়া। একেবারে পায়ে নিয়ে গিয়ে গোলের কাছে ফেলার আগেই হাতে তুলে বটুয়া করে ফেলেছে। মিমি বলল, তোমাদের সঙ্গে নিরঞ্জন পড়ে না?

—হ্যাঁ পড়ে।

—ও আমাদের পাড়ায় থাকে।

মিমি কি তাহলে এ-বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চায় না। মিমিকে বললাম, বোস না। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

আসল কথায় আসছে না। তবু বেশী চাপ দেওয়া ঠিক না। যখন একবার বশ মেনেছে এবং আমি কর্মাস নিলাম কেন, কম্পার্টমেণ্টালে পাস করলে হয় কমার্স না হয় আর্টস—তা বলতে পারে আর্টস নিতে পারতে—কিন্তু বোঝাই কী করে তিন চার মাস লেট করে ফেললে আমার জন্য কে জায়গা রাখবে? মিমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে। জেলা থেকে জলপানি পাওয়া মেয়ে। ও-মেয়েকে কে না দেখতে ভালবাসে। আর সাদা জমিন আর নীল পাড়ের শাড়ি পরে মিমি যে কত নীল হয়ে যায় গাছপালা পর্যন্ত তার সাক্ষী দিতে পারে। আমি তো সামান্য কম্পার্টমেণ্টাল পাস—আমার কথা না হয় বাদই দিলাম।

আমি বললাম, কর্মাস আমার ভাল লাগে।

—তোমাকে আর্টস নিয়ে পড়লে মানাত!

এ-কথা কেন! সায়েন্স নয় কেন? আর্টস মানে ত বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত, শেষ বিষয়টি বাবাঠাকুরকে মেরামত করতে বিশেষ সাহায্য করতে পারে। মিমি কি সত্যি চায় আমি মন্দিরে বাবাঠাকুর হই। বর্তমান বাবাঠাকুরের যা শারীরিক অবস্থা যে কোনোদিন টেঁসে যেতে পারেন। কেবল বড় রকমের কোনো কোপের বশবর্তী হয়ে চলেছেন বলে যেন বেঁচে আছেন। বাবাঠাকুর মরে গিয়েও যদি রেহাই না দেন। তাঁর পছন্দমতো উত্তরাধিকারী আবিষ্কার করতে পারলে বদরিদা কিংবা মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকদের বড় রকমের স্বস্তি।

বললাম, আর্টস ভাল লাগে না।

—তোমাকে কবি কবি লাগে দেখতে।

—তোমার দাদু যে বললেন, নবীন সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী না ছাই।

—কেন বললেন না! তুমি শুনলে না!

—শুনেছি। আমার পছন্দ না!

—কাল ভেবেছি ভৃগুর কাছে যাব। বলব, দাদা এবারের মতো বাঁচাও।

—ভৃগু আবার কে।

—দাড়ি কামায়। গাল সাফ করে দেব। গোঁফ ফেলব না। চুল খাটো করে কাটব। নবীন সন্ন্যাসী আর কবি দুই ছুটে যেতে তখন পথ পাবে না।

মিমি হিহি করে হাসল। বড় সুন্দর দাঁত। দাঁত কেন—কী নয়। যেদিকে চোখ সেদিকেই নয়নাভিরাম—আহা আমি কালিদাস নই—আমি মাইকেল নই—এ-বর্ণনা কী করে দিই। ওর হাতের আঙুল যেন

পদ্মকলি, পদ্মকলি না চাঁপাফুল, না কী সোনালী যবের শিষের মতো। ওর পা শকুন্তলার পতিগৃহের যাত্রার আগে যেমন সুচারু ছিল দেখতে তার চেয়ে প্রবল কিছু। আমার সেই ছোড়দি বড় হয়ে এখানে হাজির। সারাজীবন ভোগাবে। বললাম, মিমি আমাকে বাঁচাও। তুমি এত সুন্দর, তুমিই পার বাঁচাতে।

বাঁচানোর সঙ্গে সুন্দরের কী সম্পর্ক আমি নিজেও বুঝলাম না। তবু বলে ফেললাম।

মিমি বলল, দেখি আমি কী করতে পারি।

—কিছু করতে হবে না। শুধু পিতামহর কানে কথাটা তুলে দাও।

—কী কথা?

—বারে ভুলে গেলে! এত করে বলছি। আমি কবি নই, নবীন সন্যাসীও নই! একটা আস্ত চোর। যদি এটা বাবাঠাকুর কিংবা তোমার পিতামহ জানতে পারেন তবেই বেঁচে যাব।

—তুমি নিজেই গিয়ে বল না।

—আমি বললে বিশ্বাস করবে ভাবছ। ভাববে, বাবাঠাকুর হবার ভয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি।

—সে দেখব। তুমি কিন্তু কলেজ মেগাজিনে কবিতা লিখবে এবার।

মিমির ভাল নাম দীপান্বিতা। এ-নামে আবার কেউ ডাকে না। আমরা মিমির নাম যে যার নিজের মতো ঠিক করে নি। মিমি আমার কাছে ছোড়দি। ছোড়দিকে নিয়েই আমার প্রথম মনঃকষ্ট, অর্থাৎ যাকে সাদা বাংলায় বলে ভালবাসা—এক বছর পর টের পেয়েছি—এরই নাম ভালবাসা—এটি টের পাবার পর মিমি আমার কাছে ছোড়দি হয়েই আছে। যেমন নিরঞ্জনের কাছে মিমি বিশালাক্ষী। কেউ ডাকে হৈমন্তি যার যেমন—সেই মেয়ে কলেজ ম্যাগাজিনের সহ সম্পাদক— কে কবিতা লিখবে, কে গল্প লিখবে, কে প্রবন্ধ লিখবে তারই ঠিক করে দেবার কথা।

বললাম, মিমি দোহাই তোমার। আমি জীবনেও কবিতা লিখিনি। কবিতা রবিঠাকুর লিখেছেন জানি। নবীন সেন, রঙ্গলাল, আর কী যেন নাম, আমার মনেও থাকে না—জীবনানন্দ না যেন কী। দ্যাখ আমার উপর তুমি এ-গুরু দায়িত্ব অর্পণ কর না। দোহাই, তোমরা সবাই দেখছি আমাকে পাগল করবে না হয় আবার দেশ-ছাড়া করবে।

মিমি এবারে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, হবে। দাদুর কানে কথাটা তুলব। চোর ছ্যাঁচোড় দিয়ে হয় না তাও বলব। তবে শর্ত একটাই, তোমাকে কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতে হবে।

আপাতত মিমির শর্তে রাজি হওয়া উচিত। পারি না পারি চেষ্টা করব। যা হয় লিখে না হয় টুকে দিয়ে দেব। তবু যা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তাতে করে মিমি ছাড়া আমার অন্য কোন বাঁচার পথ খোলা নেই। মিমি যাবার সময় ডানার মতো চোখ তুলে তাকাল—ডানার মত চোখ তুলে। বেশ কাব্য আছে দেখছি, তাড়াতাড়ি মিমিকে ফের ডাকলাম, মিমি শোন পেয়ে গেছি—যদি এ-ভাবে শুরু করি কবিতাটা, ডানার মত চোখ তুলে—

—অন্যের, অন্যের কবিতা। মিমি চেঁচিয়ে উঠল। কে বলবে এখন মিমি কলেজের সেই মেয়ে। দৃঢ়তার ছবি, কারো দিকে না তাকানোর স্বভাব, শুধু ওর দাদা ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে, সে এবং তার বন্ধুবান্ধব ছাড়া যে কথা বলে না, আমরা যারা মিমিকে চোর ছ্যাঁচোড়ের মতো পালিয়ে দেখি সেই মিমির মধ্যে একি প্রগল্‌ভতার প্রকাশ। মিমি বলল, তুমি আস্ত একটি নকল নবীশ। ঠিক টুকতেও সেখনি—লাইনটা হবে, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে—

আমি বললাম, অঃ। কার কবিতা?

—জীবনানন্দ দাশের। নামটাও জানো না। কী গাঁইয়ারে।

আমি বলতে চাইলাম, আমাদের মতো তোমাদের তো আর ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে হয়নি। কবিতা-ফবিতা কোথায় উড়ে যেত। অন্নহীন মানুষের আবার কবিতা কি!

মিমি শেষপর্যন্ত সতর্ক করে দিয়ে গেল, ঐ কথা থাকলো।

আর তখনি লক্ষ্মী হাজির। বলল, বাবাঠাকুর মন্দিরে বসেছেন।

তা আমি কি করব?

ডাক পড়েছে, লক্ষ্মী বলল।

মিমি আমার মুখ দেখে বুঝল, আমি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছি। বলল, যাও, ভয় কী আমি তো আছি।

শার্ট গলিয়ে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের দরজায় তিনি উর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে আছেন। মন্দিরে যেতে

পাথরের মেঝেতে রায়বাহাদুর তাঁর পত্নী এবং পরিবারবর্গ বসে। মিমি আমার আগে এসে গুটি গুটি বসে পড়েছে। মিমির শরীরে কী রকম এক আশ্চর্য সুঘ্রাণ—গোলাপ না চাঁমেলি না জুঁইফুলের সুবাস—ঠিক বুঝতে পারি না! ওর শরীর বড় ঋজু। চুলের খোঁপায় সোনার প্রজাপতি ক্লিপ। পরনে মুর্শিদাবাদ সিল্ক। ডাঁটো সাপের মতো লকলক করছে সব সময়। সে আমার আগেই দু-লাফে হাজির। তার পক্ষে দুলাফে হাজির হওয়া সম্ভব। কারণ তার মজা উপভোগ করবার পালা। আমার যাওয়ার অর্থই হচ্ছে বিষয়টার ভিত গড়তে প্রথম দিকের খোঁড়াখুঁড়ি। বদরিদা বৌদি জানালার পাশটায় বসেছেন। আমাকে দেখেই বদরিদা বললেন, বাবাঠাকুর বিলু এসেছে।

চোখ নেমে এল তাঁর। মুখে মধুর হাসি জেগে গেল। যেন তপস্যা ভাঙার পর গিরিরাজ দর্শন।

রায়বাহাদুর উঠে জায়গা করে দিলেন ভিতরে-যাবার জন্য।

আমি বললাম, এখানেই বেশ। বলে মিমির পাশেই বসে পড়লাম। তাঁর এই বেলায় কী লীলাখেলা হবে আমার জানা নেই। মন্দিরে হরেকরকম আচার অনুষ্ঠান হয়, বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা এসে গানবাজনা করে যান বাবাঠাকুরকে মধ্যমণি করে। কখনও চণ্ডীপাঠ, তার ব্যাখ্যা করেন। আমার নটু পটুর পড়াশোনা থাকে বলে ওদিকটা আমরা মাড়াই না! তিনি কখনও শোনার জন্য ডাকেন। আমি বাইরের লোক, বাইরের মতোই ছিলাম। আজ সহসা তাঁর আসরে আমার আমন্ত্রণ খাঁড়া ঝুলে আছে বলেই। খাঁড়া কী ভাবে নামে দেখার জন্য বসে থাকলাম।

কারো কারো স্মৃতি প্রখর থাকে, অনেক কিছু মনে রাখতে পারে—কিন্তু বাবাঠাকুর এক জন্মে যা পড়েছেন, তাঁর অন্য জন্মে তা কী করে কণ্ঠস্থ থাকে আমি বুঝতে পারি না। তিনি আমাকে দেখেই শুরু করলেন, মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং/বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ। তিনি এভাবে গম্ভীর, যেন এক আদিগন্ত মাঠ পার হয়ে কোনো মহাপ্রাণ সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন! মুগ্ধ হবার বিষয় থাকে এতে। মিমিরও সেই উদাত্ত কণ্ঠ শুনতে শুনতে কেমন পলক পড়ছে না—আমার দিকে তাঁর চোখ, তিনি একবার থেমে বললেন, এদিকে আয়। ভুল হলে বলবি। বলেন কী! আমি কী জানি! তাঁর এই বিশ্বাস আসে কোত্থেকে। তিনি তাঁর সংলগ্ন হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি উঠবার আগেই রায়বাহাদুর এবং বদরিদা উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরে ঢুকে বসার জন্য পথ করে দিলেন। বুক আমার কাঁপছে। লক্ষ্মী দেখলাম খুব খুশি। সে ত এই চায়। এই মন্দিরে আমি পড়ে থাকি, আর আমাকে জ্বালাবার সুযোগ এতে তার চিরদিনের মতো হয়ে যাবে। তিনি আমাকে সামনে বসিয়ে একটা বই ঠেলে দিলেন। বাংলা হরফে সংস্কৃত শব্দমালা। পড়তে অসুবিধা হবে না। যেন অভিষেকের পয়লা কিস্তি। কিন্তু এতো কোন চণ্ডী কিংবা পুরাণ নয়। মেঘদূত। মেঘদূত থেকে তিনি শ্লোক উচ্চারণ করে তাঁর বাংলা বলে যাচ্ছেন—বুঝলে গর্বিত চাতক তোমার বাঁদিকে সুমধুর কূজনে মত্ত। আকাশে পাখা মেলে বলাকার দল মালার মতো সেজে থাকবে এবং তোমার নয়ন মনোহর সেবা করবে কেননা তোমার সঙ্গে তাদের ক্ষণ পরিচয়, তুমি আড়াল রচনা না করলে ওরা মিথুনে মিলিত হবার সুযোগ পেত না।

বাধাহীন গতিতে এগিয়ে গেলে আমার পতিব্রতা পত্নীকে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখতে পাবে। সে মিলনের আশায় এখন প্রতীক্ষায় আছে। সে জীবিত আছে কেন না, বৃন্ত যেমন ফুলকে ধরে রাখে, আশাও তেমন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। এই আশার বন্ধন বিরহকালে নারীর ভঙ্গুর হৃদয়কে ধরে রাখে। মেঘদূত বিষয়টি কী আমার জানা নেই। কবি কালিদাসের লেখা, মেঘদূত, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কথা বাবার কাছে শোনা এই পর্যন্ত। পুরাণ নয়, উপনিষদ নয়, চণ্ডীপাঠ নয়, একেবারে একজন মহাকবিকে নিয়ে পড়েছেন। কবিতার মতো করে তার উচ্চারণ এবং যক্ষের ক্রন্দন দুই মিলে আমাকে ধীরে ধীরে কিসের জন্য যে বিরহকাতর করে তুলছে। সেটা কী, সেটার নামই কী বড় হওয়া। মাঝে মাঝে মিথুন কিংবা এই সংক্রান্ত কথাবার্তায় এসে আমি দেখলাম, মিমির গম্ভীর মুখ লজ্জায় রক্তাভ হয়ে উঠছে। পেছনে দেবীমূর্তি—তিনি দণ্ডায়মান, গলায় মুণ্ডমালা এবং খাঁড়া উত্তোলন করে ধাবমান। মহাকাল তাঁর পায়ের নিচে। বাবাঠাকুর কুহক জানেন কি? না হলে মহাকাল এবং দেবীমূর্তির এই প্রকট বেশ আমার মধ্যে মুহূর্তে জীবন কত অনিত্য এমন ভাবাবেগে বিচলিত করে কী করে।

বাবাঠাকুর বললেন, আমি ভুল করেছি। তুমি অন্যমনস্ক বিলু। শুধরে দাও। আমার মনোযোগ ঠিক আছে কী না সেই দেখার জন্য হয়তো এমন বলা! অথবা তুমি বিলু ছোড়দির জন্য ভীষণ আবেগ বোধ করছিলে, এই মহাতীর্থে কিংবা পবিত্র স্থানে এলে তার সার্থকতা কোথায়! তুমি তো

সেই মহাকাল, তোমার বুকে তিনি দাপাদাপি করছেন।

কী হবে বিলু?

আমি ধরিয়ে দিলাম, স্থিত্বা তস্মিন বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং।

হ্যাঁ, ঐ আম্রকূটের কুঞ্জবনে বনচর বধূরা বাস করেন। মেঘ তুমি অল্পক্ষণ সেখানে অবস্থান করে কিঞ্চিৎ বর্ষণ কর। বর্ষণের পর তোমার ভার লঘু হবে, তখন তুমি ত্বরিতে অগ্রসর হও—তখন দেখবে বিন্ধ্যপর্বত মূলে বিশীর্ণা রেবা নদী প্রবাহিত। মেঘ তুমি সেখানে বর্ষণ করবেই। বর্ষণের পর হাল্কা হবে। তখন সুবাসিত রেবা নদীর জলধারা পান করে নেবে। তুমি সারবান হলে বায়ু তোমাকে খুশিমতো উড়িয়ে নিতে পারবে না।

এই মহাকাব্য পাঠ আমার মধ্যে আশ্চর্য ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে থাকে। নিজেই কখন যেন যক্ষ হয়ে যাই। অতি মধুর সেই স্মৃতিমালা আমাকে আনমনা করে তোলে। নারী সান্নিধ্য উত্তাপ সঞ্চার করে শরীরে। নারীর সহগমনই যেন একজন মানুষের বড় হওয়ার বিষয়। আমার সামনে মিমি, এবং লক্ষ্মী। বাড়ির সবাই এবং তীর্থস্থানে আগত আরও যাত্রীসমূহ। আমার মধ্যে এক নিদারুণ গদ্য খেলা করতে থাকে। সৃষ্টির উল্লাস আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই উল্লাসই মানুষকে কোথাও কোনো বড় জায়গায় নিয়ে যায়। এই যে আমার যাত্রা, ঘরবাড়ি ছেড়ে কখনও পলাতক, কখনও খালি মাঠে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা, এবং রোগ জরা ব্যাধি মৃত্যুর কথা ভাবা সেটাই কি সেই মহাকালের এক পলকের উল্লাস অথবা ক্রন্দন!

তিনি সেই সংস্কৃতশ্লোক উচ্চারণ করে চলেছেন এবং সঙ্গে তার ব্যাখ্যা—ওগো মেঘ পথে যেতে যেতে তোমার বর্ষণে কদম্বফুল ফুটে উঠবে, সবুজ এবং পাংশুবর্ণ মিলনে তাদের শোভা হবে অপূর্ব। অর্ধেক উদ্গত কেশর কোথাও—কোথাও নদী তীরে ভুঁইচাঁপা তোমার বর্ষণে মাটি থেকে মাথা বের করে উঁকি দেবে। কোথাও বনভূমি ছিল নিদাঘ তাপে দগ্ধ—তোমার বর্ষণে তা হবে স্নিগ্ধ—মাটি থেকে উদ্গত হবে এক মধুর গন্ধ। সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে চকিতে হরিণগুলি তোমার বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে—তারাই বলে দেবে সবাইকে, কোন পথে তুমি গিয়েছ।

তিনি ঋজু হয়ে বসে আছেন, চোখ বন্ধ। যেন তিনি নিজেই এখন সেই মেঘমালা। মানুষের সৃষ্ট কাব্যময় এই ধরণীর সৌন্দর্যের কথা শেষবারের মতো সবাইকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর খেয়ালি চরিত্র এবং খ্যাপামি যেন সবই এই বসুন্ধরার ক্ষণিক চঞ্চলতা। ঝড় অথবা বৃষ্টিপাতের মতো আগমন এবং ক্ষণিক স্থিতির পর তার প্রস্থান। তখন সামনে পড়ে থাকে শুধু আবহমানকালের এক মনুষ্যত্বের বিকাশ—যা অতি পবিত্র এবং সুন্দর এবং সুচারু গঠনভঙ্গী।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন, বিদিশা নগরীর উপকণ্ঠেই এক সুন্দর পাহাড়—নাম তার নীচৈ। সেই পাহাড়ে বিশ্রাম নেবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পার। তোমার অপেক্ষাতে আছে সব কদম্বফুল। তোমার আসার জন্য তারা উদ্গ্রীব। তারা তোমাকে দেখলে সংস্পর্শে বড়ই পুলকিত হবে। সেখানে নির্জন গিরিগুহায় যৌবনবিলাসী প্রেমিকের দল বিলাসী রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়—তাদের সুবাসিত অঙ্গের পরিমলে গিরিগুহাগুলি সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

কেন জানি মনে হল, গিরিগুহাকন্দরে আমিই সেই যৌবনবিলাসী। মিমির মতো ছোড়দিরা সেই বিলাসে অবগাহন করার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমার শরীর সহসা বড় রোমাঞ্চিত হল।

আমার দিকে মিমি অপলক তাকিয়ে আছে। জলভারে আনত মেঘমালার মতো তার মুখে সংকোচ এবং লজ্জা। নারীকে এ সময় বড় সুন্দর দেখায়। যৌবন বিলাসীর কথাতে এই নারীর মধ্যে জেগে গেছে উষ্ণ প্রস্রবণ—তার ধারা নেমে আসছে মিমির শিরা উপশিরায়। তার চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম ক্ষুরধার দৃষ্টি। যেন সে পারলে এই মুহূর্তে সেই গিরিকন্দরে প্রবিষ্ট হতে চায়। আমার মনের যে সামান্য ভীতি ছিল নারী সম্পর্কে, মিমির মধ্যে সেই রহস্য এবং বসুন্ধরার গর্ভবতী হবার আকাঙ্ক্ষা দেখে মুহূর্তে তা কেমন দূর হয়ে গেল। মিমিকে কেন জানি মনে হল নিজের কাছের এবং কতকালের চেনা। সৃষ্টির সেই আদিকালে যে জন্মপ্রবাহ এই গ্রহে অনুপ্রবেশ করেছিল মিমি যেন এখন তাই ধারণ করে বসে আছে।

তিনি বলছিলেন—উজ্জয়িনীর রমণীরা ধূপ জ্বেলে কেশ সংস্কার করে। সেই সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া জানালার পথে বাইরে এসে তোমার শরীরে বল সঞ্চার করবে। সেখানে ঘরে ঘরে পোষা ময়ূরগুলি তোমাকে দেখে আনন্দে নাচবে। প্রাসাদগুলিতে দেখতে পাবে বিরহকাতরা নারীর আলতার চিহ্ন। সেই

সব প্রাসাদের মাথায় ক্ষণিক দাঁড়িয়ে শ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করবে।

উজ্জয়িনীর গন্ধবতী নদীর তীরে চণ্ডিকাপতি মহেশ্বরের মন্দির। সেই মহাকালের মন্দিরে তুমি যাবে। মহেশ্বরের কণ্ঠ নীল, তিনি নীলকণ্ঠ, তুমিও নীল, মেঘমালা, তাই অনুচর প্রমথগণ তোমার দিকে সাগ্রহে তাকাবে। পাশেই আছে এক মায়াজাল ঘেরা উদ্যান। নদীর বায়ু তার উপর দিয়ে বয়ে যায়, উদ্যানের গাছপালা থরথর করে কাঁপে—কোনো নারীর মিথুন মিলনের মধ্যে। তুমি হয়তো জাননা সেই বায়ু গন্ধবতীর পদ্মগন্ধে আর জলকেলিরত তরুণীদের দেহগন্ধে সুবাসিত।

দেখলাম মিমি নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

এই বর্ণনার সঙ্গে মিমি নিজের সেই উষ্ণ প্রস্রবণে ডুবে যাচ্ছে। একবার জোরে ডাকতে ইচ্ছে হল, মিমি, তুমি কী অস্থির! তোমার শরীর কী অশান্ত হয়ে উঠছে—মেঘদূতের বর্ণনা শুনে!

তিনি তখনও বলে যাচ্ছেন, সেই চণ্ডিকাপতির মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করে। তালে তালে নূপুর ধ্বনিত হয়, মেঘমালার ঝংকার ওঠে, তারা ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করে—চামর বিচিত্র রত্নে ভূষিত। ক্রমে তাদের হাত শ্রমে অধীর হয়। শরীরে প্রিয়তমের মৃদু নখখতযুক্ত স্তনবৃন্তে বিন্দু বিন্দু বর্ষণ পেলে তৃপ্ত হয়ে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে।

আর তখনই সহসা দেখলাম, মিমি মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে দৌড়ে পালাল। ও আর এতটুকু স্থির হয়ে বসতে পারেনি।

পরে মিমিকে আবিষ্কার করলাম আমার পড়ার ঘরে। যেন ব্যথাতুর রমণী—চুপচাপ বসে আমার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

ঘরে ঢুকলে মিমি আমার দিকে তাকাল না। আরও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেল। লক্ষ্মী এসে বলল, মিমিদি ডাকছে।

মিমি আমার দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শাড়ি সামলে নিচে নেমে এল। মিমির শরীর যে কত মহার্ঘ ওর এই সতর্কতায় ধরা পড়লে আমি আজ বড় বিচলিত বোধ করলাম। আমার মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠুকতে থাকল কেউ। কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল। জ্বর আসার মতো এক নতুন অসুখ আমাকে আক্রমণ করল। ঠিক জ্বর নয়, তবু জ্বরের মতো—চোখ বড় জ্বালা করছে। মিমি যাবার সময়ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

বাবাঠাকুর যে আমার জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দিয়েছেন—বদরিদার কথাবার্তায় তা টের পেলাম। বৌদির কথাবার্তাতেও। কলেজ থেকে একদিন ফিরে এলে বদরিদা বললেন, মাস্টারদা এসেছিলেন।

আমি কিছু বললাম না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এলে বৌদি আমার জন্য আলাদা করে রাখা ভোগের প্রসাদ রেখে দেন। বড় সুস্বাদু। এবং কামিনীভোগের আতপে এত সুঘ্রাণ যে খাবারের লোভ ত্যাগ করাই কঠিন। ঠিক বুঝতে পারছি না, একজন ভাবী মন্দির পুরোহিতের জন্য তাঁদের এটা ষড়যন্ত্র কি না।

সেদিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কলেজ টাওয়ারের পাশটায় আমরা বসি। আমি, প্রশান্ত, নীরঞ্জন সেদিনও বসব বলে এগুচ্ছি, দেখছি ভাগীরথীর পাড় ধরে মিমি হাঁটছে। কলেজ পাঁচিল পার হলেই ভাগীরথীর বাঁধ। মিমি এবং তার বান্ধবীরা। এদিকটায় একবার তাকাবে জানি। তারপর এগিয়েও আসতে পারে। মিমির সঙ্গে আমার যে একটা গোপন পরিচয় গড়ে উঠেছে কেউ টের পায় না। যেন আগের মতোই আমরা বড় দূরের এবং চুরি করে দেখতে ভালবাসি তাকে।

মিমি একদিন কলেজের কমনরুমে আমাকে যেতে বলল। ওর কখন ক্লাস তা আমি জানি। মেয়েদের কমনরুম আলাদা। হাতে গোনা ক'জন মেয়ের জন্য আলাদা কমনরুম—এটা আমাদের মনে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটালেও মুখে কারো বলার সাহস নেই।

মেয়েরা ডেকে না পাঠালে তাদের কমনরুমে আমাদের যাওয়া বারণ। ওরা অবশ্য ইচ্ছে করলেই আমাদের কমনরুমে আসতে পারে। কেউ না ডাকলেও পারে কিন্তু এতদিন ক্লাস করছি, কোনদিন একটা মেয়েকেও আমাদের কমনরুমে ঢুকতে দেখিনি। আমরা যেন মানুষ নই, কিংবা মেয়েদের শ্লীলতাহানির জন্য যেন সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি—তা না হলে এটা কেন হয়, আমাদের কাছ থেকে তাদের সব সময় দূরে সরিয়ে রাখা কেন? ক্লাসে যখন ওরা আসে, অধ্যাপক সঙ্গে থাকেন, যখন অধ্যাপক বের হয়ে যান, তাঁর সঙ্গে মিমিরাও বের হয়ে যায়। আমরা সব সময় ওদের শত্রুপক্ষ। অথচ কলেজ ইউনিয়নে মিমি দাঁড়ালে, কেউ এসে আমাদের তার হয়ে না বলা সত্ত্বেও ভোট দিয়েছিলাম।

মিমিকে ভোট দিয়ে আমরা নিজেরাই কৃতার্থ হয়েছিলাম। কলেজ সোসালে অন্ততঃ মিমি আমাদের একটা ধন্যবাদ দিতে পারত, তাও দেয়নি। শুধু কলেজ ইউনিয়ন সেক্রেটারি সুহাসদার কাছে মিমি যখন তখন যেতে পারে—রোগা পটকা, বেঁটে এবং বক্তৃতাবাজ মানুষ। ভারি চশমা চোখে। শহরে একটা রাজনৈতিক দলের পান্ডা! সুহাসদাকে সবাই এক ডাকে চেনে। মান্য-গণ্য করে। সুহাসদা মিমির এবং তার দাদার অভিভাবকের মতো। সুহাসদার কাছে একলা গেলে মিমি কিংবা অন্য কোনো মেয়েরই গায়ে যেন কোনো আঁচ লাগে না। এজন্য মানুষটার উপর আমাদের ছেলে ছোকরাদের গোপন একটা রাগ ছিল।

মিমিকে আমারও খুব দরকার। কী হল শেষপর্যন্ত। হপ্তা পার হয়ে গেছে—মিমির সঙ্গে আর সুযোগই হয়নি কথা বলার। মাঝে জন্মাষ্টমী এবং আগস্টের ছুটিতে দু'দিন কলেজ বন্ধ। সোমবার মিমি কলেজে আসেনি। শুক্রবারও না। শনিবারে ওর দু'টো ক্লাস। আমার ক্লাস সেরে ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে উঠতে পারছি না। ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছে, জানলে, প্রশান্ত, নিরঞ্জন, নিখিল সবাই খেপে যাবে। কিংবা পেছনে এমন লাগবে যে শেষ পর্যন্ত না আবার মিমিকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

কলেজ করিডোরে দেখা হয়েছে, কেউ কথা বলিনি। কারণ চারপাশে সবার চোখ মিমিকে লক্ষ্য করছে। বললেই আমি চিহ্নিত হয়ে যাব। কোন সেকসানে পড়ে দেখ। খোঁজাখুঁজিও শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কলেজে আমাদের চাওয়াচায়ি সার। আজ ডেকে পাঠাল। খবরটা নিতে পারব।

মিমি টেবিল টেনিস খেলছিল। ভারি দুরন্ত হাত। কপালে ঘাম। এদিকটায় আমাদের আসা হয় না বলে জানি না, তারা কি করে এখানে। পাশেই অধ্যাপকদের বসার ঘর। তার পাশে অধ্যক্ষ মশাই বসেন। মিমিদের কমনরুমে ঢোকা ঠিক হচ্ছে কি না এটাও মনে একবার উদয় হয়েছিল। যা থাকে কপালে, এবং কিছুটা গোপনেই ঢুকে গেছি। আমাকে দেখেই মিমির হাত শিথিল হয়ে গেছে। কিছুটা নিস্তেজ। সাপুড়ে হয়ে গেলাম নাকি! ভাল কথা নয়। এমন বিষধর সাপ ফণা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে দেখছে! মিমি আঁচলে মুখের ঘাম মুছল! তারপর র‍্যাকেটটা হাতে নিয়েই যতটা দ্রুত সম্ভব কাছে এসে বলল, কাল সকালে আসবে।

—কোথায়!

—আমাদের বাড়ি।

—মারবে নাতো কেউ।

—মারবে কেন?

—তোমাদের বাড়িতে কাকাতুয়া আছে। দারোয়ান আছে।

—আমার নাম বললেই ছেড়ে দেবে।

—দাদুকে বলেছিলে?

—অত কথা বলবার সময় নয় এখন। কাল এস, বলব। বলেই মিমি আবার খেলতে আরম্ভ করে দিল। যেন তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই নেই। মিমিকে যে বলব, শেষপর্যন্ত বাড়ি, এখানে বলতে পারলে না। ফিরে যাচ্ছি, তখনই আবার ডাক, সঙ্গে ওটা নিয়ে যাবে।

—ওটা মানে। আমি ফিরে দাঁড়ালাম।

—কলেজ ম্যাগাজিন—বুঝতে পারছ।

—ও কবিতা!

মিমি আবার খেলায় ব্যস্ত। আমার কথা তার কানে গেল না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না, আমি আর মুহূর্ত দেরি করি! কিন্তু বলা যে দরকার, মিমি আমার কবিতা হবে না। কত চেষ্টা করেছি। কবিতার কথা ভাবলে রাতে ঘুম হয় না। আর নটু পটুর যা স্বভাব, কিছু গোপনে লিখতে বসলেই ঝুঁকে দেখা—স্যার কী লিখছেন?

কাল সকালে মানে রবিবার সকাল। রবিবার সকালে বাড়ি যাই। মা বাবা ভাই বোনেদের প্রতি টানটা এখনও যে আছে টের পাই। ছোড়দিরা শত চেষ্টা করেও টানটা আলগা করতে পারছে না।

ওদের বাড়িটা চিনতে কষ্ট হবে না। ডাকসাইটে জমিদার বাড়ি। শহরের কে না চেনে!

রাতে কবিতা নিয়ে বসা গেল। নটু পটুর ছুটি সকাল সকাল দেওয়া গেল। রাত বারোটার পর আমার আর বদরিদার খাবার সময়। শিবা ভোগ না হলে আমরা খেতে পারি না। আগে নটু পটুও দলে ছিল। রাত বারটা অবধি জেগে থাকা বড় কষ্ট। এখন আর নটু পটু জাগে না। আগেই খেয়ে নেয়। বাবাঠাকুরের নির্দেশে সব হয়। আমার বেলায় নির্দেশটা তিনি এখনও আলগা করছেন না। আর দু'জন জেগে থাকে। একজন বৌদি, অন্যজন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী অবশ্য ঠিক জেগে থাকে না। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে নিতে পারে। মশার কামড় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। আর আশ্চর্য শিক্ষা। একবার ডাকলেই উঠে পড়বে। বৌদির ফাই ফরমাস খাটার জন্য রাত বারোটার পরও তার দরকার হয়।

সুতরাং দেখা গেল লক্ষ্মী মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছে। নটু পটু না ঘুমালে বসতে পারছি না। আমার যে কত দায় এখন কবিতা লেখার তা যে কেউ অনুমান করতে পারবে। চোখে মুখে নিদ্রাহীনতার ছাপ। কবিতা লিখতে পারলে মন্দিরের কাজ থেকে মুক্তি। মিমি বলেছে, কবিতা লিখে দিলেই সে বাকি দায়িত্বটুকু হাতে নিয়ে নেবে। লক্ষ্মীর বড় দুঃস্বভাব। একবার এ-ঘরে ঢোকার অজুহাত পেলে আর সহজে যেতে চায় না। আমি চাইছিলাম, ঘরটা নিঝুম হোক। পাতা পড়ার শব্দ পাই। পাখির ডাক শুনি। এসব শুনতে শুনতে নাকি কবিতার লাইন হুস করে একটা রেলগাড়ির মতো মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। তা আস্ত একখানি রেলগাড়ি এতটুকু মগজে ঢুকে গেলে তার দোষ কি। ঘিলু ভারি হয়ে যাওয়ার অর্থই নড়বড়ে হয়ে যাওয়া। ঘিলু নড়বড়ে না হলে কবিতা নাকি লেখা যায় না। কবিতা লেখা সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরামর্শ নিতে গিয়ে এসব খবর পেয়েছি। এখন লক্ষ্মীর প্রস্থান আমার কবিতা লেখার পক্ষে জরুরী দরকার।

লক্ষ্মী নটুকে ঠ্যাং ধরে তক্তপোশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আর উঠতে চায় না। শত ঠেলাঠেলিতেও কথা কয় না। ঘুমে এমন কাতর হতে বড় দেখা যায় না। এ বিষয়ে লক্ষ্মীর অভিজ্ঞতা চরম বলে সে আর ওদের ডাকাডাকি করে না। তক্তপোশের একটা দিকে তোষক পেতে নেয়। তারপর আমায় দরকার হয় লক্ষ্মীর। যে দিকটায় তোষক পাতা হয়ে যায়, সেদিকটাতে আমরা দু'জনে দু'জনকে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলে রাখি। কাজটা দ্রুত করার পক্ষে এটাই মোক্ষম উপায়।

লক্ষ্মীকে বলতেও পারছি না, তুমি এখন যাও। যদি বলে ফেলি, তবে আর নড়বেই না। যা বলব তার বিপরীত কাজ করতে সে আজকাল পছন্দ করে। এ বাড়িতে সেও যে ইচ্ছে করলে জোর খাটাতে জানে, তা দু-একবার কেন, অনেকবারই প্রমাণ হয়ে গেছে। আমি নিবিষ্ট রয়েছি পড়াশোনায়, ট্রায়াল ব্যালেন্স কিছুতেই মেলাতে পারছি না, বইয়ের পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করছি—যেন দেখে বোঝে, মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেও পড়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন একটা ভাব নিয়ে যখন ডুবে আছি—তখনই লক্ষ্মী বলল, রাতে ঘুমাও না কেন? মাথায় কী ঢুকেছে! তুমি নাকি কবিতা লেখ!

—কে বলেছে!

—কে বলবে আবার, সব জানি।

—জানলে ত হয়ে গেল।

—ও-স্বভাব ভাল না মাস্টার। তুমি পড়তে এয়েছ। তোমার মাথায় এ-সব বাতিক কেন?

লক্ষ্মী আমার এত ভাল মন্দ বোঝে যে কিছু বলতেও পারি না। আমি যে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পাই সে লক্ষ্মীর দয়ায়। কি কাচতে হবে না হবে, সে ঠিক জানে। গেঞ্জি রোজ জলকাচা করে দেবে। শুকিয়ে জায়গারটা জায়গায় ভাঁজ করে রাখবে। একটা জিনিস এদিক ওদিক হবার জো নেই। সেই লক্ষ্মী যখন জেনে ফেলেছে আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি তখন বদরিদার কানেও কথাটা উঠবে। একজন মানুষের চারপাশ থেকে এত বিপদ দেখা দিলে সে স্থির থাকে কী করে? বললাম, দয়া করে যাও। আমি পড়ছি।

—পড়ছ না ছাই।

—তবে আমি কি করছি?

—কী করছ তুমিই জান!

—কী মুশকিল, দেখছ না ট্রায়াল ব্যালেন্স করছি। লক্ষ্মী এসবের কিছুই বোঝে না। কেবল আমার চোখ দেখলে সব টের পায়। এত যে অনুভূতিশীল তার কাছে আমার না ধরা পড়ে উপায় কী। এবারে না পেরে বললাম, লক্ষ্মী সবই যখন টের পাও মন্দিরে গিয়ে বস না কেন? তুমিও দেখবে শেষ পর্যন্ত মা সদানন্দময়ী টয়ি হয়ে যাবে।

—কী বললে?

—এই মা করুণাময়ী, তোমার ভড় উঠবে। মানুষের চোখ দেখে তার ভবিষ্যৎ বলে দেবে।

—দেখ ঠাকুর দেবতা নিয়ে তামাশা কর না। এতে মানুষের জিভ খসে পড়ে জান। তখনই দেখলাম, লক্ষ্মী কপালে হাত রেখে কার উদ্দেশে প্রণাম করছে। মা করুণাময়ীকে নিয়ে ঠাট্টা! এতে সে অমঙ্গল আশঙ্কায় কেমন কাতর হয়ে গেল। লক্ষ্মীর ধারণা, তার জীবনে মঙ্গল অমঙ্গল বলে আর কিছু নেই। আমার কোনো অমঙ্গল হবে ভেবেই যেন সে তার ঠাকুরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল। আর কথা বলল না, আবার কোন ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করব সেই ভয়ে লক্ষ্মী চলে গেল। লক্ষ্মীকে ঘর থেকে তাড়াতে হলে এমন সব অস্ত্রের সন্ধান থাকা ভাল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা জুড়ে দিলেই হল। লক্ষ্মী চলে গেল ঠিক, কিন্তু আমার মন বসল না। পদ্য লিখতে হলে গভীরে ডুব দিতে হয়। সে কতটা গভীর জানা নেই। পাখির কোনো ডাকও কানে আসছে না। নিঝুম। কেবল জানালার দিকে তাকালে দূরের একটা গভীর নীল সিগনালের আলো চোখে পড়ে—একটা লাইন লেখা যাক—

দূর তুমি সিগনালের আলো
বেশ কথা, আর আছে কাব্য।
আমার লেখা কিছুই হয় না,
না কবিতা না ছন্দ।

মন্দ লাগছে না। সন্দ করার কারণ নেই। এই আমার প্রথম কবিতা। আচ্ছা আবার শুরু করা যাক—

পাখির শব্দ শোনার জন্য
রাত জেগে থাকি বসে। অন্ধকার
অবিরাম। কখনও নীল জ্যোৎস্না
উদার আকাশে—দূরে সিগনালের বাতি,
ছোড়দির কথা আছে চিঠি লেখার।
জানালায় কেউ আজকাল রোজ
নীলখাম রেখে যায়। দূরাতীত
গ্রহ থেকে কারা আসে, ডাকে।
কীট পতঙ্গ ওড়ে বনে জঙ্গলে।
সাদা প্রজাপতি মুক্তোর ডিম পাড়ে
কোনো এক পদ্মকলি আঙুলে।

এটা আসলে কোনো কবিতা কিনা জানি না। কাল মিমির কাছে যাবার অন্তত পাসপোর্ট হয়ে গেল, এটা দিয়ে বলব, মিমি আমি আমার কথা রেখেছি, এবার তুমি তুলে দাও কানে, বিলুটা চোর ছ্যাঁচোড়। ও কি মুক্তির স্বাদ! এই লিখে দিলে যদি মুক্তি পাওয়া যায়! আমার চোখে মুক্তির আনন্দে জল এসে গেল। চোর ছ্যাঁচোড় জানলে আমাকে আর কেউ মন্দিরের পুরোহিত করতে ভরসা পাবে না।

সকালবেলাতেই রওনা দিলাম। বৌদি বললেন, বাড়ি যাচ্ছিস?

—বাড়ি আর কোথায়? যাব শহরে।

শহরে কাকার বাড়ি যেতে পারি ভেবে বদরিদা বললেন, মাস্টারমশাইকে আসতে বলবি, কথা আছে।

কী কথা! যাই কথা থাক ওটি আর হচ্ছে না। তারই গোড়া কাটতে যাচ্ছি মিমির কাছে। বললাম, বলব।

বারান্দা থেকে নামার সময় লক্ষ্মী বলল, যেখানেই যাও জলখাবার খেয়ে যেও।

এই এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে সব কাজে। খাওয়াটা সব সময় বড় কথা না। যেখানে যাচ্ছি সেখানেও আদরযত্ন কম পাব না। সংসারে আমার জন্য তুমি একাই ভাব, এমন মনে কর না। বললাম, এখন খাব না। দেরি হয়ে যাবে।

—কোথায় তোমার রাজসূয় যজ্ঞ আছে যে দেরি হবে!

লক্ষ্মীর ট্যারা কথা আমার একদম ভাল লাগে না। যাচ্ছি একটা শুভ কাজে তোর কী দরকার আগ বাড়িয়ে কথা বলার!

—তুমি লক্ষ্মী যা বোঝ না সে নিয়ে কথা বল না।

—আমার বয়েই গেছে কথা বলতে।

চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট উল্টে এমনভাবে বলল, যে একটা কথা বলার আর স্পৃহা থাকল না। ঘরে এসে জামা প্যান্ট পরছি। আর আয়নায় মুখ দেখছি। আজকাল এটা হয়েছে, চুল ঠিক আছে কিনা, কিংবা আমার মুখ দেখতে কেমন আয়নায় বার বার দেখা। নিজেকে বার বার দেখেও আশ মেটে না কেন? আর পাশে তখন আর একটা মুখ ভেসে ওঠে। সে কখনও ছোড়দি, কখনও মিমি কিংবা কখনও লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর মুখ ভেসে উঠলেই কেমন নিজেকে মনে হয় ছোট করে ভাবছি। বারবার আয়না থেকে লক্ষ্মীকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে মিমি কিংবা ছোড়দিকে লটকে দিই।

মুখ দেখছিলাম, এবারে বের হব। ভাল করে চুল পাট করলাম। চিরুনি একটা ছোট আকারের পকেটে ভরে নিলাম। ফাঁকে ফাঁকে আয়নায় মুখ দেখা। এক নাগাড়ে দেখতে পারি না—কে এসে আবার দেখে ফেলবে। সব চেয়ে ভয় লক্ষ্মীকে। আর লক্ষ্মীই তখন হাজির। জাম বাটিতে মুড়ি, কলা, সন্দেশ—কাঁচাগোল্লা। দেখেই বিগড়ে গেলাম।

—নিয়ে যাও। খাব না। সময় নেই।

—বৌদি বলেছে খেয়ে যেতে। পিত্তি পড়বে।

—বৌদি না, তুমি!

—আমার দায় পড়েছে।

এখন আমার মনে সংশয়, যদি সত্যি বৌদি পাঠিয়ে থাকেন, প্রায় জননীর মতো এই বৌদিটি আমার সম্পর্কে সব সময় সজাগ। মিমিদের বাড়ি খুব কাছে নয়। হোতার সাঁকো পার হয়ে তেলকলের পাশ দিয়ে গেলেও ঘন্টাখানেক লাগবে। সকালে মুখে কিছু না দিয়ে বের হলে পিত্তি পড়তেই পারে।

বললাম, রাখ।

—লক্ষ্মী ঠেলা মেরে বাটি গ্লাস রেখে দিল।

—তুমি যাও।

—কেন আমি থাকলে লজ্জা করবে খেতে?

—করবে।

—এত দিন তো করেনি!

লক্ষ্মী বলতেই পারে। তিনজনের তিন বাটি মুড়ি দিয়ে লক্ষ্মী বসবে তক্তপোশে। পা দোলাবে। রাজ্যের গল্প জুড়ে দেবে। এবং পাড়ায় কার হাঁস শিয়ালে নিয়ে গেল, কে পড়ে ঠ্যাঙ ভেঙেছে, কার ছেলে আমবাগানে ধরা পড়েছে, এবং বিলে যারা জাল ফেলে বসে আছে, তাদের নৌকায় কী আছে, তীর্থযাত্রীরা কোত্থেকে কে এসেছে—এমনি কত খবর। যেন লক্ষ্মী এই সব খবর আমাকে না দিতে পারলে শান্তি পায় না।

তাড়াতাড়ি আছে। জল ঢেলে মুড়ি ভিজিয়ে কলা সন্দেশ কাঁচাগোল্লা এক সঙ্গে মেখে গোটা পাঁচেক থাবায় সব শেষ করে দেবার সময় লক্ষ্মী বলল, এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? গলায় আটকালে কী হবে?

—তোমার তো কোন দায় নেই।

লক্ষ্মী এ সময় বড় করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। এ চোখ আমি চিনি। কে বলবে লক্ষ্মী মুখরা—মায়া দয়া নেই। লক্ষ্মীর মধ্যে যেন এক দূরের বাউল কোন এক করুণ স্বর তুলে মাঠে নেমে

যায়। এমন চোখ দেখলে আমারও কেমন রাগটা নিমেষে উবে যায়। লক্ষ্মী যেন কিছু বলবে বলে তাকিয়ে আছে।

আমি জল খাবার সময় লক্ষ্মীর মুখ, চোখ বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। লক্ষ্মী মাথা নিচু করে বসে আছে।

—কী হল তোমার?

লক্ষ্মী মুখ তুলল না।

—ঠিক আছে আর বলব না। তাড়াতাড়ি খাইনি। আস্তেই খেয়েছি।

লক্ষ্মী এবারে বলল, তুমি কার কাছে যাচ্ছ মাস্টার?

—মিমির কাছে।

—কেন যাচ্ছ?

লক্ষ্মী তো কখনও এভাবে আমাকে কোন প্রশ্ন করে না। কেমন বেসুরো ঠেকল। বললাম, কাজ আছে?

—কী কাজ?

ইচ্ছে করলে বলতে পারি, তোমার জানার কী দরকার এত। কিন্তু লক্ষ্মী আমার কাছে গোপনে তার ভান্ডার তুলে দিয়েছে—এই সব কথা বললে, সেটা বেশি মনে হবে। আমি কলেজ থেকে দেরি করে ফিরলে, ওর শুকনো মুখ। কখনও দেখেছি মন্দিরের দরজায় বসে আছে পথ চেয়ে। ঘরে ঢুকলেই বলবে, এত দেরি কেন মাস্টার?

ক্লাস থাকে, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে লালদিঘির ধারে আড্ডা, কখনও সাইকেল চড়া শিখি মাঠে—নানা কারণে দেরি হয়ে যায়। লক্ষ্মী কেমন তখন ব্যথাতুর রমণীর মতো গালে হাত দিয়ে মন্দিরের দরজায় বসে থাকে। এ-সব টের পাই বলেই তার প্রশ্নের সব জবাব দিতে এসময় বাধ্য থাকি। কিন্তু মিমির জন্য কবিতা লিখেছি ভাবলে লক্ষ্মী কষ্ট পেতে পারে। মিমির সঙ্গে তার যতই সখ্যতা থাকুক, কোথায় যেন টের পেয়েছে, মিমি তার ভ্রমরের কৌটোয় হাত দিয়েছে।

বললাম, এই একটু কাজ। মানে কলেজে বলল কি না কাল যেতে।

—যাও না মাস্টার। আমি কি বারণ করছি। তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

বাইরে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলাম। লক্ষ্মী এবং আমি পাশাপাশি কত দিন ধরে এখানে আছি। দু'জনই আশ্রিত। দু'জনই পান্থনিবাসের যাত্রী। আমার প্রতি লক্ষ্মীর গোপন একটা টান আছে, সেটা মাসখানেক না যেতেই একবার বুঝেছিলাম—আজ তাকে অন্যভাবে বুঝতে শিখেছি। মুখে যাই বলুক, যে কোন মিমি তার শত্রু পক্ষ। সে ভেতরে ভেতরে সব সয়ে যাবে। মুখ ফুটে কোনো কথা বলবে না।

আমি যে কী করি! আমার যে বড় হওয়ার কথা। লক্ষ্মীর মধ্যে আটকে থাকলে আমি বড় হব কী করে। আর যদি বাবা, মানুকাকা, রায়বাহাদুর এবং বদরিদা মিলে সত্যি মন্দিরের পুরোহিত বানিয়ে দেন তবে আমার বড় হওয়াটা যে এখানেই শেষ। মিমির কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মিমির কাছে আমার ভ্রমরের কৌটা গচ্ছিত আছে আপাতত, কারণ মিমিই পারে আমাকে এই বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিতে।

কখন যে হাঁটতে হাঁটতে হোতার সাঁকো পার হয়ে এসেছি। বয়স মানুষকে এ-সময় বোধহয় বেশি ভাবাবেগে তাড়িত করে। সব কিছু পরিপূর্ণ মনে হয়। পাখির ডাক শুনতে ভালবাসি। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। দূরে কোন সবুজ বনভূমি দেখলেই কেমন এক রহস্য টের পাই। মিমির সৌন্দর্য, আভিজাত্য এবং শরীরে আশ্চর্য মায়াবী সুবাসেও টের পাই সেই রহস্য খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে কিছুই চিরন্তন হয়ে থাকে না। কিংবা মনে হয় না, এখানেই শেষ। এই আবাসই আমার সব। নিত্য নতুন ছবির টানে একটা বিবাগী মন তৈরী হয়ে গেছে আমার ভেতর। আমি হাঁটি। কতকাল আমাকে এভাবে হাঁটতে হবে জানি না। তেলকল পার হতেই পুলিশ ফাঁড়ি, বাঁ পাশ দিয়ে গলিগুঁজি রাস্তা। নর্দমা, দুর্গন্ধ এবং শহরের পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ি ঘর পার হলেই বাজার।

বাজার পার হয়ে দুটো রাস্তা গেছে দুদিকে। কোন দিক দিয়ে এগোলে মিমিদের প্রাসাদতুল্য ভবন

ঠিক জানা নেই। জিজ্ঞাসাবাদ করে রাস্তাটা জেনে নেওয়া গেল। এ-দিকটায় আমি পিলুর সঙ্গে দু'চারবার এসেছি। গোটা শহরটা ভাগীরথীর পাড়ে পাড়ে—লম্বা। একটাই বড় সড়ক এ-মাথা থেকে ও-মাথা। নদীর ধারের রাস্তাটা এখনও ফাঁকা। ওখানটায় নদীর চরে বাবলা বন। বন পার হলে জেলখানার পাঁচিল। পাঁচিলের পাশ থেকে জঙ্গলটা দেখা যায়। কিছু সাদা ফুল ফুটে থাকে সব সময়। জায়গাটায় এলেই ফুলগুলি চোখে পড়ে। ভয় পাই। আমার মনে হয় সেই মৃত শহীদেরা হয়তো এখানটাতেই ফুল হয়ে ফুটে আছে। মনের মধ্যে কত সব চিন্তা যে কাজ করে। মিমির বাড়ি যেতে যেতে শহরটার সব কথাবার্তা যেন কানে আসে। নন্দকুমারের ফাঁসির কথা মনে হয়। সেই বাড়িটাও একদিন দেখা দরকার। তাঁর উত্তর-পুরুষের সঙ্গে মিমিদের জানাশোনা। বলেছিল, একদিন আলাপ করিয়ে দেবে। ইতিহাসের পাতায় যাঁরা আছেন, তাঁরা যেন এই শহরটায় ঢুকলে গা ঠেসাঠেসি করে হাঁটতে থাকেন। কেমন রোমাঞ্চ বোধ করি।

এগুলিই বোধ হয় আমার বড় হওয়ার লক্ষণ। আমি সব টের পাচ্ছি ধীরে ধীরে। এগুলোই গৌরব গাঁথা মানুষের। গৌরব গাঁথাই মানুষকে বড় হতে শেখায়। একটা সিনেমা হল সামনে। একজন রাজপুরুষ। ছবিটা কার আমি জানি। কোন নায়কের আমি জানি। দাঁড়িয়ে যাই। যে নায়ক, তাকে হিংসে হয়। তার টাকা মান যশ হয়েছে, সেও আমার মতো বড়ো হবে বলে বের হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই ছবিটায় এসে আটকে গেছে। যেমন আমার মন্দিরে আটকে যাবার কথা হচ্ছে।

আরে ব্বাস—এ-কী বাড়ি রে বাবা। সামনে ফুলের বাগান, কত রকমের ফুল। কেয়ারি করা ফুলের গাছ। দাঁড়ে কাকাতুয়া বসে। যেন ছবির মতো সব কিছু। নুড়ি পাথর বিছানো পথ। গেটে দারোয়ান। এসব দেখলেই সংকুচিত হয়ে পড়ার স্বভাব। বললাম, মিমি আছে?

—মিমি কোন আছে? গোঁফয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়াল।

—মিমি, মানে কলেজে পড়ে। মিমিকে চেন না।

—ও ছোড়দি!

আরে একী বলছে। সেই এক ছোড়দি এখানে-ও তবে।

গেট খুলে দিলে বাঁদিকে গ্যারেজ। ওপরে দো-তলায় লম্বা বারান্দা। চিক ফেলা। বাগানে মালী কিসের চারাগাছ পুঁতছে। একজন বামুনঠাকুর বের হয়ে এল। এক সৌদামিনী জল ছেটাচ্ছে। বোধহয় গঙ্গাজল। ভিতরে দাসদাসী এবং কলরব শোনা যাচ্ছে। একটা লোক খাঁচায় একদল মুনিয়া পাখিকে শিস দিয়ে কি যেন বলছে। আরে এই তো সেই লোকটা। বললাম, মিমি আসতে বলেছিল। আরে আপনি ঠাকুরমশাই!

এই রে, বলে কি। আমি ঠাকুরমশাই হতে যাব কোন দুঃখে। লোকটা গম্ভীর গলায় ডাকল, হরিচরণ। কোন অন্ধকার থেকে কে যেন জবাব দিল, যাই হুজুর।

হরিচরণ কাছে এলে বলল, বাবাকে খবর দে।

—শুনুন, বাবাকে না, মিমিকে। মিমি আমাকে আসতে বলেছিল।

—ঐ ঠিক আছে। বল কালীবাড়ি থেকে ঠাকুরমশাই এসেছেন।

এ কী ঝামেলা। এলাম মিমিকে কবিতা দেব বলে, এখন দেখছি আমি এখানকার ঠাকুরমশাই! একজন বামুনঠাকুর তো এইমাত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে বের হয়ে গেল! আমাকে আবার কেন!

তারপরই সেই দশাসই পুরুষ রায়বাহাদুরের আবির্ভাব। বোধহয় জপ-তপে বসেছিলেন। গলায় লম্বা সাদা ধবধবে উপবীত। রেশমের ধুতি পরনে। খালি গা। বুকভর্তি সাদা লোম। —আসুন আসুন। বাবাঠাকুর পাঠিয়েছেন?

—না-ত।

কেমন দমে গেল সেই দশাসই মানুষটা। বাবাঠাকুর বোধহয় সব সময় কৃপা করবে, এমন আশায় এঁরা বসে থাকেন। বাবাঠাকুরের প্রিয়জন আমি। আমার পদার্পণও কম সৌভাগ্য না তাঁদের পক্ষে। তবু বাবাঠাকুর কোন শুভবার্তা যদি পাঠান এ-পরিবারের সম্পর্কে সেই আশা। মানুষের অর্থ, মান, যশ হলে কী শেষ পর্যন্ত এই হয়। একজন বাবাঠাকুরের দরকার হয়ে পড়ে। এত প্রভাব প্রতিপত্তিও শেষপর্যন্ত বিন্দুমাত্র বড় হওয়ার কথা বলে না। বাবাঠাকুরের কৃপালাভই কী শেষ পর্যন্ত মানুষের

স্বপ্নের সেই বড় হওয়া। তবে আমি কার পেছনে ছুটছি! এ তো দেখছি শেষ পর্যন্ত সবটাই আলেয়া।

আর তখনই সেই আলেয়ার আবির্ভাব। —আরে বিলু। যা হোক তবে কথা রাখলে। তুমি আসবে ভাবিই নি।

—তার মানে।

—তুমি যা একখানা মানুষ। ভুলেই গেছ ভাবলাম। আমার ওটা এনেছ-তো?

রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে মিমির এমন কথাবার্তায় যেন কিছুটা খাবি খেতে শুরু করলেন। —বিলু কি রে!

—হ্যাঁ ওর নাম বিলু। জিজ্ঞেস কর না।

—নাম বিলু কখনও হতে পারে! কেমন চোখ দেখছিস। মা'র আর্শীবাদ পুষ্ট মন্দিরের নবীন সন্ন্যাসী।

আমি বললাম, দেখুন আপনি আমাকে আবার আজ্ঞে আপনি করছেন। আমার কেমন মাথাটা ঘুরছে।

মিমি বলল, তোমার না দাদু মাথায় ভীমরতি ধরেছে। বিলুকে তোমরা কী ভাব। তুমি যাও তো। বিলুর সঙ্গে আমার কথা আছে।

আদরের নাতনিরা মাথায় চড়বে বেশি কী! বোঝাই যাচ্ছে নাতনির বড় বেশি অনুগত তিনি। তিনি হাই তুললেন। তুড়ি দিলেন মুখের সামনে। পৈতায় হাত ঘষে ধার দিলেন। তারপর যাবার সময় বললেন, ঠিক আছে, তোরা কথা বল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলে যাবেন না। কথা আছে।

মহা মুশকিল, নাতনিরও কথা থাকে, দাদুরও থাকে। একজন মানুষের পক্ষে, এমন দুই বিপরীত মেরুর কথা থাকলে, তার কপালে যে দুর্ভোগ লেখা থাকে সেটা আমার মতো অপোগণ্ডও বুঝতে পারে। তিনি চলে গেলে, কিছুটা হাঁফ ছেড়ে সোফায় বসলাম। এবং এতক্ষণে মিমিদের বৈঠকখানা বলতে কী বোঝায় দেখার সুযোগ পেলাম। একখানা হলঘর। দাগ টেনে দিলে দু'পক্ষের হাডুডু খেলার জায়গা হয়ে যায়। হলঘরের এক পাশটায় পর্দা ফেলা। ওটা কি? ওখানে পর্দা কেন প্রশ্ন করার ইচ্ছে হল। পর্দাটা কালো রঙের। সোনালি বর্ডার। মারবেল পাথরের টেবিল মাঝখানটায়। দুই দেয়ালে কাচের দুটো বড় জার। ছাদে রঙিন কাচের ঝাড়লণ্ঠন। নিচে কার্পেট সবুজ। মাঝখানে নৃত্যপরায়ণা রমণীর ছবি। এ-সব আমি বাবার জমিদার দীনেশবাবুর বাড়িতে দেখেছি। ওরাও বাবার জমিদার দীনেশবাবুর গোত্রের। বললাম, মিমি কিছু হল?

—কী হবে!

—বারে সেই কথাটা।

—কবিতা এনেছ?

—দেখ মিমি আমি কবিতা কাকে বলে ঠিক বুঝি না। ছন্দ যতি মিল আমার জীবনে কোথাও ছিল না। কিছু ভাল ভাল কথা মনের ভেতর যদি ভেসে ওঠে আর তা যদি কবিতা হয়—তবে এটাও কবিতা।

—ভেসে ওঠে মানে?

—আরে বোঝ না কেন। কিছু তো ভাল লাগে না। কী যেন চাই—পাই না। এই কথায় মিমি আমার পাশে বসে পড়ল। আমাকে ঝুঁকে দেখল। বলল, বিলু কবিতা সেদিন শুনলে না?

—কবে শোনলাম?

—বাবাঠাকুর পড়ছিলেন।

—মেঘদূতের কথা বলছ?

মিমিকে কেমন কাতর দেখাচ্ছে। মিমি হাত বাড়িয়ে দিল, দাও।

পকেট থেকে সন্তর্পণে বের করতে যাচ্ছি তখনই রায়বাহাদুর হাজির, হুঁম। আপনার সেবায় যদি লাগে, পেছনে রাইকমলই হবে, কারণ এ-রকম চেহারার মানুষ দেখলে আমার কেন জানি রাইকমল নামটাই মনে হয়। সাদা পাথরে মিষ্টি সাজানো, সাদা পাথরের গেলাসে জল। তিনি হাত জোড় করে আছেন। রাইকমল সন্তর্পণে খাবার নামিয়ে রাখল। বললাম, আমি খেয়ে এয়েছি দাদু।

—দাদু না, দাদু না। বাবাঠাকুর বিরাগ হবেন।

অগত্যা বললাম, খাব না। খেয়ে বের হয়েছি। কপাল কাকে বলে। এক সময় না খেতে পেলে শসা চুরি করে এনেছে পিলু। দুজনে ভাগ করে খেয়েছি। এখন চারপাশে কত প্রাচুর্য! এতেও কেমন মাথাটা ঘুরে যায়। বললাম, খাব না। খেয়ে বের হয়েছি।

মিমি আমায় খোঁচা মারল তখন।

কী ব্যাপার বোঝলাম না। তাকালে মনে হল মিমি এই নিয়ে কথা বাড়াতে বারণ করছে। সে আমার হয়ে বলল, তুমি যাও না দাদু। ঠিক খাবে। আমি খাইয়ে ছাড়ব।

রায়বাহাদুর উঠে গেলেন সিঁড়ি ধরে।

—দাও দেখি।

—দেব? কিন্তু আমার কথাটা।

—হবে।

—আচ্ছা তোমার দাদু আমার সঙ্গে এমন কেন করেন বল তো?

বাড়ির গুরুদেবের তুমি চেলা। একটু করবে। আমাদের বাড়িতে ওঁর ফটো আছে। সন্ধ্যায় কীর্তন হয় জান। সবাইকে বসতে হয়। স্তোত্র পাঠ করতে হয়। তাঁর সন্দর্শনে বছরে এক দু'বার যাবার নিয়ম। কারণ দাদু এত বেশি যেতেন, যে বাবাঠাকুর কড়ার করে দিয়েছিলেন শুধু একদিন, যেদিন গান বাজনার আসর বসবে, সেদিন, অষ্টমীতে হয়। দেখবে বড় বড় ওস্তাদ আসবে মন্দিরে। সারা রাত গান। মাইক বাজবে।

পূজার পরে আমার আসা। আর এক পুজা এবারে এসে গেল। গতবারের অষ্টমী দেখা হয়নি। এবারে দেখা হবে, সেদিনই কী তবে আমার অভিষেকের পালা। বুকটা গুড়গুড় করতে থাকে। ডাকলাম, মিমি!

—বল।

—আমার কথাটা।

—বলেছি। কিন্তু মাস্টারমশাইর ইচ্ছে.....

—এই রে হয়ে গেল!

মাস্টারমশাই অর্থাৎ আমার মানুকাকার ইচ্ছে, তাঁর ইচ্ছে মানেই আমার বাবার ইচ্ছে, আমার মার ইচ্ছে, আমার আর নিজের ইচ্ছের বুঝি তবে দাম থাকল না।

—তাহলে তুমি আমাকে দিয়ে কবিতা লেখালে কেন?

—কবিতাটা দেখি আগে।

—এই দেখ না। আমি মিছে কথা বলছি ভাবছ।

—তা বলতেই পার। না বলে না কয়ে টাকা যে নিতে পারে, সে সব পারে।

কবিতাটা সাক্ষী প্রমাণের মতো তুলে ধরলাম—মিছে কথা বলি নি।

কবিতা পড়ে মিমি অবাক চোখে তাকাল। বলল, অসামান্য।

—অসামান্য মানে!

—অসামান্য মানে অসামান্য।

—এবারে বলবে ত!

—দেখি।

মিমি দোহাই আর দেখি না। কাজে নেমে পড়। আমার চোখ কাতর। কাতর চোখ দেখলে মিমির মধ্যে বোধহয় মেঘদূত উড়তে থাকে। সে ওঠার সময় বলল, বলব, বলব। তুমি প্রাণের ঠাকুর না বলে পারি।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমি সত্যি কি প্রাণের ঠাকুর। লক্ষ্মীও মাঝে মাঝে ঠাকুর বলে। ঠাকুর বলার মধ্যে যে এত বড় ম্যাজিক থাকে আগে যদি বুঝতে পারতাম। বললাম, মিমি তাহলে যাই।

মিমি আমার হস্তাক্ষর দেখছিল। কেমন মুহ্যমান অবস্থা। সেই যক্ষের বার্তাবহ, যেন কার স্তনবৃন্তের ক্ষত বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণে শান্তি লাভ। এরই মধ্যে কী সেই ইচ্ছেটা মিমির মধ্যে জাগছে।

উঠে পড়লে মিমি কাছে এল। বলল, তুমি এত সুন্দর বিলু। বলেই কথা নেই বার্তা নেই আমাকে চকাস করে চুমু খেল।

বললাম, ছিঃ ছিঃ এটা কী করলে!

—কী করেছি। কী সুন্দর কবিতা।

—কেউ দেখে ফেললে।

—দেখুক না। আমি অষ্টমীর দিনে যাব। জ্যোৎস্না রাত। দুজনে রেল-লাইন ধরে হেঁটে যাব। আর গান হবে, আয়ে না বালম।

আমারও কেমন একটা ইচ্ছে ইচ্ছে ভাব। না বলতে পারি না। চুরি করে খাবার সখ সব সময়— লোকলজ্জা মিমির নেই। বড়লোকের মেয়েদের বুঝি লোকলজ্জা থাকতে নেই। তা-ছাড়া আমি এ-বাড়ির এখন অন্দরের মানুষ। মিমি আমাকে নিয়ে উপরে গেল, সব দেখাল। মিমিদের দেয়ালে দেয়ালে হরিণের ছাল, বাঘের ছাল, মুণ্ডু, শিকারী রায়বাহাদুরের এক কালের শিকারের সাক্ষী এ সব। সেই শিকারী আমার মতো একটা ছিঁচকে চোরকে গুরুদেবের ডামি ভেবে মিমিকে নির্ভাবনায় ছেড়ে দিয়েছে। চোর ছ্যাঁচোড়ের লজ্জা থাকতে পারে না। মিমিও নিশ্চিন্তে তাই আমাকে জড়িয়ে চুমু খেল। পুষ্ট স্তনে মিমি টের পাবে সেই এক ক্ষত। মেঘদূত যদি বারিবর্ষণ করে তবে তার নিরাময় হবার সম্ভাবনা। তা আমার যৌবন তার সেই বারিবর্ষণ। আমি যত বড় হব তত মিমিরা আকুল হবে। বড় হওয়ার মানে বুঝি এই বারিবর্ষণ। তবে আমার বড় হওয়াটা এই একটা হেতুতে মিমির কাছে আটকে পড়েছে।

মিমির চুমু খাওয়ার আকস্মিকতায় আমি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। মিমি সহজেই লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারল, উপরে উঠে যেতে পারল। আমি পারলাম না। এত বিচলিত যে মিমি কী বলছে ঠিক কানে আসছে না। এইমাত্র সংগোপনে মিমি যা করল তাতে আমার চোখ জ্বালা করছে। আমি কেমন একটা ভ্যাবলুকান্ত বনে গেলাম। সে যা যা বলল সবই আমি করব এমনও স্বীকার করে ফেললাম। আমার সত্তা সহজে গ্রাস করে ফেলা মিমির পক্ষে সম্ভব। কারণ আমি একজন উঠতি তরুণ। তা-ছাড়া ছিন্নমূল পিতার সন্তান। পরের বাড়িতে আশ্রিত।

মিমি বলল, কী মনে থাকবে?

—থাকবে।

—অষ্টমীর দিন।

—হ্যাঁ অষ্টমীর দিন। আমার কথাটা।

—অষ্টমীর দিনটা যাক।

আমার এ-সময় আর কিছু মনে থাকল না। অষ্টমীর দিন, মিমির সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে ঘুরতে হবে পুজোমণ্ডপে না, রেলের ধারে! চারপাশে মানুষজন গিজগিজ করবে। ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে। আর মাইকে মন্দিরে গানের আসর চলবে। শহরের বনেদী লোকেরা আসবে পরিজনসহ গান শুনতে। মিমিরাও আসবে। ওর কথামত কাজ না করলে সে বিগড়ে যেতে পারে। রাজি না হওয়া ছাড়া আমার উপায় কি।

ফিরতে বেশ বেলা হল। এসময় বাড়িতে লক্ষ্মীর দেখা পেলাম না। রান্নাবাড়িতে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে পারে। নটু বলল, স্যার আপনার বাবা এয়েছিলেন?

—বাবা এয়েছিলেন। কেন?

—সে তো জানি না।

নটু ফের বলল, আপনার বাবার সঙ্গে কি-সব কথা হল।

—শুনিস নি?

—না।

বিষয়টা পাকাপোক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার রেহাই নেই। কবে যে অষ্টমী আসবে?

মন মেজাজ ভাল নেই। খেতে বসে ভাল মতো খেতে পারলাম না। বিকেলে বৌদিকে বললাম, বাড়ি যাব। আজ ফিরছি না।

বাড়িতে বাবাকে পাওয়া গেল না। না পাবারই কথা। সংসারে তাঁর মতো ব্যস্ত লোকের পক্ষে

বাড়িতে আটকে থাকা পোষায় না। মা বলল, কার নতুন গাছে বাতাবি লেবু হয়েছে, তাই খাওয়াবে বলে নিয়ে গেছে। গাছটার কলম বোধহয় তোমার বাবাই করে দিয়েছিলেন। গাছের প্রথম ফল, সেই সঙ্গে ফলাহার। মানুষের সঙ্গে তাঁর এত সদ্ভাব যে তিনি না করতে পারেন না। তিনি আজ ফিরবেন কিনা, এই প্রশ্ন করা দরকার।

পিলু বলল, বাবা নাও ফিরতে পারেন।

—পিলু তুই জানিস বাবা আজ কালীবাড়ি গেছিলেন সকালে।

মা বল্ল, গিয়েছে তো কী হয়েছে। রোজ খবর পাঠালে না গিয়ে পারে?

—কেন গেছিলেন জান? আর খবরই বা এত কিসের। মা বলল, কী জানি, তোর মানুকাকা এয়েছিল। কী সব পরামর্শ করছিল।

—যাই করুক, আমি বলে দিলাম, কিছু করব না।

মা খুব হতভম্ব হয়ে গেল। বাড়ি এলে কখনও মেজাজ দেখাই না, কিংবা এমনিতেও আমি নাকি চাপা স্বভাবের ছেলে, তার পক্ষে উগ্র মেজাজ দেখানোটা মার কাছে বিভ্রান্তিকর। মা বলল, তোর হয়েছেটা কী!

বলতে পারি না, কারণ বিষয়টা নিয়ে আসলে কেউ কোনো কথাবার্তা বলছে কি না তাও তো জানি না। কিন্তু হয়ে গেলে কিছু করারও থাকবে না। কারণ আমার নিজস্ব মত আছে একটা, বাবা, কাকা বিশ্বাসই করতে পারবেন না। ওঁরা অভিভাবক, আমার ভালমন্দ ওঁরাই বুঝবেন। আমি কী করব না করব ওঁরা ঠিক করবেন। আমার একটাই পথ, দেশান্তরী হওয়া তখন। কিন্তু বার বার দেশান্তরী হলে কিছুই ঠিকমতো করা যায় না। আর কিছু না হোক আমার গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা একান্ত দরকার। সেটা হলে কিছুটা মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। আর মিমি বলেছে, আমার ওটা নাকি সত্যি কবিতা হয়েছে। তবু আমি এমন একখানা মানুষ, নিজের চেয়ে পরের মতামতকে বেশি প্রশ্রয় দিই। মিমির মতামতকে অবিশ্বাস করতে পারি না। ফলে জীবনে কবিতা লেখার দুঃসাহস জেগে গেছে।

বাবা রাতেই ফিরলেন। আমাকে দেখে বললেন, কখন এলি।

—বিকেলে।

—গেছিলাম হরিষের বাড়ি।

কোথায় তিনি গেছিলেন আমি জানতে চাই না। কালীবাড়ি কেন হুট করে গিয়ে হাজির তাই জানতে চাই। শত হলেও বাবা, গুরুজন, কেন গেছিলেন প্রশ্ন করতে পারি না। কথাটাকে কিভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, কীভাবে শোভন হবে এমন ভাবতে ভাবতেই অনেকটা সময় কেটে গেল। সকালবেলায় কাজের মানুষ বাবা বের হয়ে যেতে কতক্ষণ। বললাম, আপনি কালীবাড়ি গেছিলেন?

—হ্যাঁ।

কী করতে বলি, কি করে। চুপ মেরে গেলাম।

বাবা তাঁর পুত্রের স্বভাব জানেন। পুত্র দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করতে দ্বিধা বোধ করছে ভেবেই যেন বলা, তোমার মানুকাকা বলে গেলেন একবার যেন যাই। শত হলেও তুমি ওখানটায় আছ, আমার একবারও যাওয়া হয়নি। গেলে তিনি খুব খুশি হবেন ভেবেই যাওয়া।

আপনাদের কি কথা হয়েছে বলি কি করে! বললে কতটা বেয়াদপি হবে আমি জানি। আমার চেয়ে পিলু সেটা বেশি জানে। দাদাটা কী। বাবা কী করতে গেছিলেন জানতে চায়। দাদা তো কখনও বাবার মুখের উপর কথা বলতে পারে না। পারে না বলেই ভীরু কাপুরুষের মতো কেবল পালায়!

বাবাই বললেন, আমাদের অনেক খবরাখবর নিলেন। তোর খুব প্রশংসা করলেন। তোকে নিয়ে আমি কী ভাবছি জানতে চাইলেন।

—আর কিছু না।

—আর তেমন কিছু তো বলেন নি। প্রসাদ এল খেলাম। বাড়ির জন্য দিয়েছে। মানুষটি বড় সজ্জন।

বাবা কেমন উদাস চোখে আমার দিকে তাকালেন এবার, তোমার কী কিছু হয়েছে?

—কী হবে?

—এই অসুখ বিসুখ!

বুঝলাম একটু সামান্য ট্যারা কথাতেই বাবা আমার মধ্যে কোন অসুখের খোঁজ পেয়েছেন। আর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে আরও কঠিন। চুপচাপ বাড়ি থেকে বের হয়ে নবমী বুড়ির জঙ্গলের দিকে এগোলাম। পিলু আমাকে বনটা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। কুকুরটা সঙ্গে আসে। নবমী বুড়ির বনটাই পিলু আর আমার মধ্যে বিচ্ছেদ টেনে দেয়। দুজন দু-পাশে থাকি। পিলু রহস্যময় খঁবর থাকলে আমাকে বলে। সেও এবারে তেমন বেশি কিছু বলল না। এখন মিমি ভরসা ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না।

সেদিন কলেজ করে বাড়ি ফিরছি। একটু দেরি হয়েছে ফিরতে। জানি লক্ষ্মী বার বার এসে দাঁড়াবে রাস্তায়। পূজার ছুটি হয়ে গেল বলে ঘুরে ফিরে এসেছি। নিরঞ্জন আজ চা খাওয়াল। নিরঞ্জন, নিখিল, প্রশান্ত ছুটি হয়ে গেল বলে একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছে। কারবালার দিকটায় আমরা চারজনেই গেছি। পকেটে আমাদের একটা সিগারেট এবং একটা কাঠিসহ দেশলাই। কার পকেটে থাকবে সেই নিয়ে কিছুক্ষণ দুশ্চিন্তা গেছে। নিখিল বরাবরই গোঁয়ার। সেই ভার নিয়েছিল শেষপর্যন্ত। ঘন বনের মধ্যে ঢুকে সিগারেটে টান এবং কিছুক্ষণ খকখক করে কাশি এবং এতবড় নিষিদ্ধ কাজ গোপনে সেরে ফেরা। কম কথা না। দেরি একটু বেশিই হয়েছে। সাঁজ লাগার সময়। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে দেখি লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। পুজোর নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। শাড়ি কুচি দিয়ে পরা। ব্লাউজ গায়ে। চুল খোঁপা করে বাঁধা। খুব কাছে গেলে লক্ষ্য করা যায় চুরি করে মুখে সামান্য পাউডারও মেখেছে।

আমি দেখে অবাক। বললাম, কী সুন্দর তুমি লক্ষ্মী। তারপরই মনে হল কথাটা বলা ঠিক না। মিমির আকস্মিক আচরণের পর কেমন একটা অপরাধ বোধে লক্ষ্মীর সঙ্গে এতদিন ভাল করে কথা বলতেও পারিনি। লক্ষ্মীও কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে যেন। আর চোপা করে না। চুপচাপ সারাদিন কাজ করে যায়।

সেই সুন্দর হাসিটিও লক্ষ্মীর মিলিয়ে গেছে। পুজোর আর বাকি নেই। শরৎ কালের আকাশ—এই বৃষ্টি, এই রোদ, এমনই ছিল তার মেজাজ। এখন শুধু মেঘটুকু আছে, রোদের উজ্জ্বলতা হারিয়েছে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কি আমার ভেতরের দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরেছে। সে তো আমার মুখ দেখে সব বুঝতে পারে বলেছে। মিমির আকস্মিক আচরণও কী লক্ষ্মী টের পেয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরে এমন একটা পাপবোধ খেলা করে বেড়ালে সহজভাবে কথাও বলা যায় না। আমিও যেন লক্ষ্মীকে কিছুটা এড়িয়ে যেতে থাকলাম। আগে ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে এড়িয়ে যাওয়া ছিল এক রকমের—এখন অন্য রকমের। লক্ষ্মীকে ক'দিন লক্ষ্য করলাম, বিকেলে সে আজকাল সাজগোজ করতে ভালবাসে। তার পক্ষে সাজগোজ করা বেমানান! সে যেন পারলে পায়ে আলতা পরতেও চায়। লোকনিন্দা ভয়ে সে সেটা পরে না। কখনও একা একা দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের সামনে।

একদিন বললাম, লক্ষ্মী অষ্টমীর দিন শুনছি গান বাজনা হবে। বড় বড় ওস্তাদরা আসবেন! সবাই বাবাঠাকুরের ভক্ত।

লক্ষ্মী বলল, হবে। আর কিছু না বলে তাকিয়ে থাকল মাটির দিকে।

—খুব আনন্দ করা যাবে, কী বল।

লক্ষ্মী তাকাল না আমার দিকে। যেন অন্য কাউকে বলছে, অষ্টমীর দিন আমাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে? আমি নটু পটু তোমার সঙ্গে ঠাকুর দেখব।

এইরে বলে কী মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, লক্ষ্মী তুমি জান আমার বাবার সঙ্গে বদরিদার কী কথা হয়েছে?

—না তো। আমি রান্নাবাড়িতে জল তুলছিলাম। তোমার বাবা এয়েছেন শুনে একবার ছুটে গিয়েছিলাম। দাদা যে ধমক লাগালো তোর এখানে কীরে! আর থাকা যায় মাস্টার বল!

এরপর সত্যি থাকা যায় কী করে। পুজো আসছে, অথচ মনটা ভালো নেই। সব বিস্বাদ লাগছে। বন্ধুদের সব খুলে বললে যেন ভাল হত। ওরা পরামর্শ দিতে পারত। ছুটি হয়ে গেছে, সবাইকে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে না। একমাত্র লালদিঘির ধারে প্রশান্তর কাছে যেতে পারি। কিন্তু যা নিয়ে পরামর্শ করব তার কোনো ভিত্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে এখন পর্যন্ত কেউ বলেইনি, তোমাকে মন্দিরের

পুরোহিত করা হবে। সবটাই আন্দাজে। পুজোর সময় এলে কী যে আনন্দ, চারপাশের গাছপালা মানুষজন দেখেই টের পাওয়া যায় পুজো এসে গেছে। এবারে ক্রমেই সেটা কেমন বিস্বাদে পরিণত হতে থাকল।

লক্ষ্মী ফের বলল, মাস্টার যাবে ত।

কী যে বলি। দু'জন দুরকমভাবে আমাকে কব্জা করতে চায়। মিমির সুযোগ বেশি। মন্দিরের চাতালে গানের আসর। লোকজন ভর্তি চারপাশটা। আলো জ্বলবে সারা রাস্তায়। মানুষজন গভীর রাত পর্যন্ত চলাচল করবে। মিমি অনায়াসে আমাকে নিয়ে এক ফাঁকে রেল-লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করতেই পারে। অষ্টমী পুজো বলে কথা। রাতে বিরেতে নারী পুরুষ একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করতে পারে। লক্ষ্মীকে কী বলব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

—বুঝতে পারছি তোমার ইচ্ছে নেই মাস্টার।

—থাকবে না কেন! তবে কি জান—

ঠিক আছে, জানতে চাই না। বলে লক্ষ্মী মন্দিরের চাতালে উঠে গেল।

আর অষ্টমী পুজোর দিনই সেই লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল। আসরে মানুষজন গিজগিজ করছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত—এর তাল লয় আমি কিছু ঠিক বুঝি না। নটু পটু ওদিকটায় যায় নি। তবু শহর থেকে এয়েছে সব বনেদি মানুষেরা। রাস্তার সামনে গাড়ি রিকশা সব দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে দোকানপাটও বসে গেছে। চিনাবাদাম ভাজা বিক্রি হচ্ছে। এবং হরেকরকম খাবার। লোকজন রেললাইন ধরে উঠে আসছে, ঠাকুর দেখতে বের হয়ে, একবার এখানটায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সবাই।

নটু পটু শুয়ে পড়েছে। ভিতর বাড়িতে কেউ নেই, ফাঁকা। কেবল, নটুর পিসি বারান্দায় বসে আছে। মন্দির চত্বরে ফরাস পাতা। তবলা ডুগি হারমোনিয়াম তানপুরা আরও কত সব বাদ্যযন্ত্র। মাথায় টুপি সিল্কের পাঞ্জাবি গায় মুখে পান সহ সব ওস্তাদ গাইয়েরা সামনে। আমি ওদিকটায় যাবই না ঠিক করেছি। কারণ ও-সব গান আমার ভাল লাগে না। মিমিরা এসেছে। সে যেন আমাকে দেখে প্রথম চিনতেই পারল না। ওর দাদু বরং বললেন, আসুন বসে পড়িগে। লোকটা আমার এমন পেছনে লাগল কেন বুঝতে পারি না। বাবাঠাকুর তো আমার খোঁজ করছেন না, তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?

গান খুব জমে উঠছে। খেয়াল হবে। ঠুংরিও হতে পারে। সে যাই হোক আমার কিছু আসে যায় না।

নিজের ঘরে মিমির অপেক্ষাতে বসে আছি। সে আসবে। এই কামনা আমাকে কেমন কিঞ্চিৎ উতলা করে তুলছে। অথচ এসে যে-ভাবে আমাকে অবজ্ঞা দেখাল, তাতে করে বেশি আশা করাও ভাল না। দুটো কারণে আমার প্রতীক্ষা, এক, মিমি কাজটার কতদূর এগোল, দুই, মিমি রেললাইন ধরে হেঁটে যাব বলতে কি বোঝাতে চায়। তা-ছাড়া ওর বাবা মা, দাদু লোকলজ্জা মান সম্মানের প্রশ্নও আছে। তবু কিসের লোভে যেন আমার চুপচাপ একা একা বসে থাকা। একবার মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম, লক্ষ্মী বৌদির পাশে বসে গান শুনছে। গান শুনছে না, মন্দিরে হত্যা দিয়েছে! চোখ দেখলেও বোঝা যায় যেন ইহজগতে নেই কিংবা কত যেন মগ্ন সে। দূরে দাঁড়িয়ে দরজা থেকে আর দেখলাম মিমি ওর দাদুর পাশে নেই। বুকটা আমার ছাঁত করে উঠল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে আমার ঘরের বারান্দায় উঠে এলাম। দেখলাম মিমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাঁপছিলাম।

মিমি বলল, এই মাস্টার যাবে?

মিমিকে বললাম, তুমি বলেছ?

মিমি বলল, এস না যাই। বলে লাফিয়ে রাস্তায় নামল।

আমার শরীরে কী যে কাঁপুনি। দাঁত ঠকঠক করছে। আমি কোনরকমে বললাম, মিমি, আমার কথার কী হল।

মিমি আবার আমার হাত টেনে ধরল, এস না।

আমি বললাম, শোন মিমি, তুমি কী চাও আমি জানি না। কিন্তু...

মিমি আমাকে কথা বলতে না দিয়ে সোজা রেললাইনে উঠে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা মেয়ের এত দুর্জয় সাহস হয় কী করে! পেছনে ছুটে গেলাম, শোনো মিমি, যেও না।

মিমি বলল, যাব। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। তুমি আস না আস যাব।

রেললাইন ধরে পূজা দেখতে যারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছিল। এত রাতে মিমি কিছু একটা যদি করে বসে। বাড়িতে এমন কী কিছু ঘটেছে, নাকি পাগলের মতো সে উদভ্রান্ত হয়ে গেছে। শরীরের শিরা উপশিরায় উষ্ণতা খেলা করে বেড়ালে এমন হতেই পারে। দৌড়ে গেলাম। পাশে যেতেই বলল, বোস মাস্টার।

—কিন্তু কেউ যদি খোঁজ করে?

—কেউ করবে না, সবাই জানে আমি ভিতর বাড়িতে শুতে চলে গেছি।

—কেউ তবু জানতে পারে। তুমি কি চাও বল! এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না।

—কী সুন্দর আকাশ।

—আচ্ছা মিমি, এতরাতে কাব্য করার সময়!

—মাস্টার, তোমার কিছু হয় না?

—কী হবে।

—এই যে সুন্দর রাত—এমন কিছু যা তোমাকে পাগল করে দেয় মাঝে মাঝে।

—মিমি, এখন ওঠ। আমার ভয় করছে। আমি আশ্রিত জন।

মিমি হা হা করে হেসে উঠল।

পাশাপাশি দুজনে বসে আছি। সামনে মন্দির। গান ভেসে আসছে। আর তার শব্দমালা তান লয় বড় মধুর। আমার মধ্যে যে কাঁপুনি ভাবটা ছিল সেটা কমে গেছে। এত আলো যে দিনের মত লাগছে। তবু নিরিবিলির কারণ যে রাত গভীর। মিমি কেমন শুয়ে পড়তে চাইছে। আমার হাত টেনে বলছে, কী ঠান্ডা হাত তোমার। তোমাকে মন্দিরের পুরোহিতই মানায়।

মিমির পাগলামি আমার ভাল লাগছিল না। বড়ঘরের মেয়েরা বরং পর্দার আড়ালেই থাকে। কিন্তু আধুনিকতা এক পুরুষের, বোধ হয় মিমিকে খ্যাপা বানিয়ে দিয়েছে। মিমির পক্ষে শোভা পেলেও আমার পক্ষে শোভা পায় না। মেয়েরা এক একজন এক এক রকমের। লক্ষ্মী কোনোদিন ও ধরনের জেদ ধরতে সাহসই পেত না।

সহসা মিমি উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখছ কে গেল!

—কে!

—দেখ না। ঐ যে চলে যাচ্ছে।

ছায়ার মতো কেউ জঙ্গলের মধ্যে নেমে গেল।

মিমি ওঠো আমি চললাম। মিমি হাত ধরে ফের হ্যাঁচকা টান মেরে আমাকে তার সংলগ্ন করে ফেলল। এবং আমার কী হল জানি না। আমিও কেমন পাগলের মতো মিমিকে পাশের একটা গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সেই যে ভাল লাগে না বোধ, আমার মধ্যে নতুন করে এক ঝড়ের সংকেত তুলে দিয়েছিল, মুহূর্তে তা মহাপ্রলয়ের রূপ নিতেই মিমির কাতর গলা, না মাস্টার না আর না। আমি পারব না। তুমি গাছের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। আমাকে লতার মতো জড়িয়ে রাখ। আর কিছু না।

এক হ্যাঁচকায় আমি ছুঁড়ে দিলাম মিমিকে। গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকার আমার সাধ্য নেই। মিমি কী চায়? আমাকে যা খুশি তাই করবে! কেমন এক ঘৃণাতে আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল। দৌড়ে সোজা জঙ্গলের পথ ধরে নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সেই হাহাকার খবর আমার কানে এসে পৌঁছাল। ভিতর বাড়িতে ছুটোছুটি—কে যেন কাকে ডাকতে যাচ্ছে। পটু এসে ডাকছে স্যার শিগ্‌গির আসুন। লক্ষ্মীদি বিষ খেয়েছে। সেই দাবদাহের মতন খবর কেমন আমাকে মুহূর্তে পঙ্গু করে ফেলল। আমি নড়তে পারছিলাম না। কেবল বললাম লক্ষ্মী এটা তুমি কী করলে! পটু খবরটা দিয়েই ভেতরে চলে গেল। আমার যেন কোনো দিশা নেই। হতভাগ্য যুবক আমি। লক্ষ্মীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় হচ্ছে। আমার মঙ্গল হবে ভেবেই কী সে চলে যাবে ঠিক করেছে। ছুটে গেলাম। ডাক্তার ডাকতে সুজন চলে গেছে সাইকেলে। লক্ষ্মীর দরজা ভাঙা। ভিতরে লক্ষ্মী পুজোর শাড়ি পরে শুয়ে আছে। পায়ে আলতা। মাথায় সিঁদুর।

চোখ দুটো আধবোজা। ঠোঁটের কোণে সেই বিষণ্ণ হাসিটুকু। আমার আর দাঁড়াবার সাহস থাকল না। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম ঠিক কিন্তু জানি পায়ে আমার আর এতটুকু জোর নেই। একটা মেয়ে একজন মানুষকে মরে গিয়ে এমন পঙ্গু করে দিতে পারে জীবনে এই প্রথম এটা টের পেলাম।

পুলিস, হাসপাতাল, মর্গ এবং দাহ এই নিয়ে দুটো দিন কেটে গেল আমার। লক্ষ্মী নেই। বদরিদার সঙ্গে আমিও যেখানে যাবার গেছি। বাবাঠাকুর দেবীর ঘরে শুয়ে থাকেন। বের হন না। দেবস্থান লক্ষ্মী বিহনে কেমন কাঙাল হয়ে গেল। ভেতরের শোকতাপ ধরা পড়ে যায় ভেবে খুব স্বাভাবিব থাকার চেষ্টা করছি। আমি তো লক্ষ্মীর কেউ না। লক্ষ্মীর জন্য আমার শোকতাপ শোভা পায় না। কিন্তু হলে কি হবে, খাবার সময় খেতে পারছি না, শোবার সময় শুতে পারছি না। নিজের ভেতরে নিজে ছটফট করে মরছি। শুলেও ঘুম আসছে না। আর কেমন ভয় ভয় লাগছে। জানালা বন্ধ করে শুই—তবু যেন রাতে লক্ষ্মী এসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘুম এলে ভেঙে যায়—দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে উঠে বসি। কেমন ঘামতে থাকি। ঘুমের মধ্যে লক্ষ্মী যেন আরও বেশি পেয়ে বসে আমাকে। সে আমকে পুঁটলি খুলে দেখায়—এই দেখ মাস্টার—দেখতে পাই, সেই ইঁচড়, করমচা, কাগজি লেবু আর তার পাশে কচি কলাপাতায় মোড়া কাটা এক ছাগশিশুর মুন্ডু। মুন্ডুটা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে আমার দিকে। চিৎকার করে উঠি, সরাও, সরাও ওগুলো। লক্ষ্মী হেসে বলে, কেন ভয় পাও? তারপর আরও জোরে হেসে ওঠে। —এই মিলে আমি মাস্টার। ভয় পাও কেন? আমি তো কারো কোন অনিষ্ট করি নি। তাহলে আমি কেন সারাজীবন একা হয়ে থাকব।

সকালে নটুই ভিতর বাড়িতে খবর দিল, মাস্টারমশায় ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বৌদি আমাকে ডেকে বললেন, তোর কি হয়েছে রে?

—কিছু হয়নি ত?

—রাতে নাকি চিৎকার করিস। কাঁদিস?

—কাঁদব কেন? মিছে কথা। হতেই পারে, দুঃস্বপ্ন দেখে আমি হয়তো চিৎকার করি। কিংবা বোবায় ধরতে পারে। দুঃস্বপ্নটা দেখার পর আমি যে আর ঘুমাতে পারি না কাউকে বলাও যায় না।

তখনই বৌদি বললেন, দুদিনে কি চেহারা করেছিস। খেতে বসলে খেতে পারিস না। তুই কি ভয় পাস!

আমি কিছু বলছি না দেখে বললেন, ভয়ের কি আছে। দেবস্থানে আছিস, কোন অশুভ প্রভাব এখানে ঢুকতে পারে না। তা-ছাড়া বাবাঠাকুর একা পড়ে থাকেন, কই তিনি তো ভয় পান না। তুই পুরুষ মানুষ, তোর এত ভয় থাকবে কেন।

আমি পুরুষ মানুষ, আমার ভয় থাকবে কেন—বৌদি ঠিকই বলেছেন। তা-ছাড়া দেবস্থানে অপমৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু সব সমান। তবু কি করে বোঝাই, অন্ধকার হলেই মনে হয় লক্ষ্মী আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। যত বলি, যাও, তত বলে, তোমার বাড়ি তোমার ঘর! আমি যাব কেন।

লক্ষ্মী মরে গিয়ে আমাকে ভারি ফ্যাসাদে ফেলে গেল। শোক প্রকাশ করতে পারলে মন হালকা হয়। সে সুযোগ নেই। ফলে আমি ঘুম নাওয়া খাওয়ার কথা কেমন ভুলে যেতে থাকলাম। বৌদি কেমন ভয় পেয়ে একদিন কাছে ডেকে বললেন, বিলু তুই বাড়ি যা। মা বাবার সঙ্গে থাকলে মনটা হালকা হবে।

এতদিন যেন মনেই ছিল না, আমার বাড়িঘর আছে। বাবা মা আছে। পিলুর মতো ভাই আছে। বিকেলেই বাড়ি রওনা হলাম। এই রাস্তা দিয়ে কতবার যাওয়া আসা করেছি। আগের মতো সবই ঠিকঠাক আছে। সেই কাশফুলের মাঠ, সেই কারবালার সড়ক, সেই দেবদারু গাছ, এবং ইঁটের ভাটা, নবমী বুড়ি—সব সব এক—তবু আমি যেন আলাদা মানুষ। বাড়ি ঢুকতেই মায়া কেমন ত্রাসের গলায় চিৎকার করে উঠল, মা দাদা কি হয়ে গেছে দ্যাখ।

মা ঘর থেকে বের হয়ে কেমন জলে পড়ে গেল। একি চেহারা করেছিস! বাবা বাড়ি নেই, পিলু বাড়ি নেই। আমি ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে বসে পড়লাম। পায়ে যেন এতটুকু আর শক্তি নেই।

মা পাশে বসে বলল, তোর কি হয়েছে? জ্বর। কপালে হাত রেখে বুঝল, জ্বর হয়নি। আবার

বলল, বলবি ত কি হয়েছে! চোখ মুখ শুকিয়ে করেছিস কি। মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, শিগগির তোর বাবাকে ডাক।

মা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর বলছিল, তোর কোনো অসুখ করেনি ত।

ধীরে ধীরে বললাম, না মা। আমি ভাল আছি।

—এই ভাল থাকার লক্ষণ। কেমন গুম মেরে গেছিস।

বললাম, জান লক্ষ্মীটা না মরে গেছে।

—লক্ষ্মী মরে গেছে। বলিস কি!

—বিষ খেয়ে মরে গেছে।

—কি বলছিস তুই। এমন মেয়ে কখনও বিষ খেয়ে মরতে পারে।

—মরল ত!

পিলু বাড়ি ঢুকছে। মা বলল, জানিস লক্ষ্মী নাকি বিষ খেয়ে মরে গেছে।

আমি হাসলাম। বললাম, নাকি বলছ কেন!

পিলু বলল, যা, হতেই পারে না। লক্ষ্মীদি বলেছে আবার আমাকে যেতে। ওদের গাছের কাঁচামিঠে আম রেখে দেবে। আমের দিনে আমি যাব বলে এয়েছি।

বলার ইচ্ছে হল, লক্ষ্মী সবাইকে কথা দিয়ে কথা রাখত। কিন্তু ওকে কথা দিয়ে কেউ কোনো কথা রাখেনি। তাই রাগ করে চলে গেল। বাবা এলেন, শুনলেন। বাবার সেই এক কথা, ভবিতব্য। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় তিনি আর বেশিক্ষণ ভবিতব্যের উপর ভরসা রাখতে সাহস পেলেন না। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, কতদিন মনে হয় তুমি চান খাওয়া করনি! ঘুমাও নি।

—করেছি ত!

মা বলল, ওর কিছু হয়েছে। এমনভাবে ও কখনও কথা বলে না।

বাবা কি ভাবলেন কে জানে। বললেন, লক্ষ্মীর প্রেতাত্মা কি তোমাকে তাড়া করছে! বাবা এ-সব বোঝেন কি করে জানি না। প্রেতাত্মা তাড়া না করলে, ওকে আমি অন্যমনস্ক হলেই দেখতে পাই কেন। রাতে শুলে মনে হয় মশারির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। সে পোঁটলা খুলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা বললেন, রাতে ঘুম হয় না তোমার। ঘুম হলে সব সেরে যাবে।

মা বলল, ওসব শুনছি না। তুমি ওকে শরৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

মাকে প্রবোধ দিলাম, মিছিমিছি এত ভাবছ কেন বুঝি না।

মা কেমন কেঁদে ফেলল কথা বলতে গিয়ে তুই তো এমন ছিলি নারে।

আমি উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে যাবার সময় শুনলাম, বাবা মাকে বলছেন, অত অধীর হলে চলে না ধনবৌ।

বাবা এবার ভিতরে ঢুকে আমার পাশে বসলেন। কি ভেবে বললেন, তুমি কি আজকাল কোন দুঃস্বপ্ন দেখছ। অপমৃত্যু তেমন ভয়ের কিছু নয়। তবে মানুষের উচিত না, আত্মঘাতী হওয়া। লক্ষ্মী বড় ভুল করেছে। বেঁচে থাকার মতো জীবনে বড় কিছু নেই। এ-জীবন তো আর তুমি দ্বিতীয়বার পাচ্ছ না।

বাবার কথার মধ্যে কেমন অসংগতি ধরা পড়ছে। বাবাই বলেছেন, আত্মার বিনাশ নেই, আবার আজ তিনিই বলছেন, এ-জীবন তো আর তুমি দ্বিতীয়বার পাচ্ছ না। কিন্তু আমার মন ভাল নেই। বাবার সঙ্গে তর্ক করার স্পৃহা নেই। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে গেলাম। বাবা ফের বললেন, কি হয়েছে খুলে বল। সব প্রকাশ করতে পারলে হালকা বোধ করবে। মা-বাবার কাছেই একমাত্র সব কথা খুলে বলা যায়।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার অবস্থা দেখে তাঁর মুখও কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। এতটা বাবাকে ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি। মা পিলু মায়া দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবা বললেন, এই তোরা যা। পিলু মায়া উঠোনে নেমে গেল। এখন পাশে মা বাবা। তবু আমি কিছু বলছি না দেখে

বাবা উঠে বের হয়ে গেলেন। মাকে যাবার সময় মনে হয় আমার সম্পর্কে কিছু বলে গেলেন। আর এলেন সন্ধ্যা করে। সঙ্গে নিয়ে এলেন, একটা নিমগাছের চারা। মা ডাকল, যা তোর বাবা ডাকছে।

আমার কিছু ভাল লাগছে না মা।

বাবা ফের ডাকলেন, বয়স হচ্ছে। একা পারি না। আয় না।

এরপর আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। বাবা এই প্রথম মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর বয়স হচ্ছে। উঠে গেলে বললেন, গাছটা এই কোণায় লাগিয়ে দে। গর্তটা হাঁটু সমান করবি। পিলু এসে আগ বাড়িয়ে করতে গেলে বাবা বাধা দিলেন—সবটাতেই তোর বাড়াবাড়ি। তুই তো অনেক গাছ লাগিয়েছিস। বিলুকে একটা অন্ততঃ গাছ লাগাতে দে। তারপর বাবা নিমগাছের গুণাগুণ বলতে থাকলেন। নিমের হাওয়া ভাল। বাতাসের বীজাণু নাশ করে। নিমপাতার গন্ধে মশার উপদ্রব বাড়তে পারে না। পাকা নিমফল খেতে নানা রকম পাখি উড়ে আসবে বাড়িটায়। নিমের বড় গুণ অশুভ কোন প্রভাব থেকে বাড়িঘরকে রক্ষা করে। তারপর বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যত্ন করে লাগাও। গাছটা যেন বাঁচে। এতে তোমার কর্মমোচন হবে। গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

এক হাঁটু গর্ত করার পর বাবাকে বললাম, হয়েছে?

—তুমিই বল হয়েছে কিনা?

—মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।

মা একটা হারিকেন নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই অসময়ে আমাকে দিয়ে কেন গাছটা লাগাচ্ছেন মা বুঝতে পারছে না। তবু আমার ত্রাসের চেহারা দেখে বোধহয় এখন বাবার সঙ্গে মা তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইছে না।

গাছটা লাগাবার পর বাবা বললেন, তোমার কিছু বলার থাকলে একে বল। যদি দুঃস্বপ্ন দেখে থাক, একে বল।

পরদিন ভোরে বাবা আমাকে একখন্ড জমি দেখিয়ে বললেন, জমিটা কুপিয়ে ফেল। আগাছা তুলে ফেল।

সারা সকাল আমি কাজটা করলাম। বাবা পিলুকে এদিকে একদম ঘেঁষতে দিতে চাইছেন না।

বাবা বললেন, পালংয়ের বীজ লাগিয়ে দাও। দু'দিন বাদ দিয়ে জল দেবে রোজ। মনে করে কাজটা করবে।

এই প্রথম বাবাকে দেখছি, আমাকে একদন্ড বসতে দিচ্ছেন না। বাড়িটায় যে আগাছা হয়েছে তাও আমাকে দিয়ে তিনি সাফ করালেন। জমিতে মুনিষ চাষ দিতে এলে আমি বাবার সঙ্গে জমির সব আগাছা সাফ করে দিলাম। বাবা এ-কথা সে-কথার ফাঁকে একসময় বললেন, মনে রেখ কাজই হল গে পরমায়ু। বাবা পরদিন আমাকে বললেন, যাও বাজারে। তোমার পছন্দ মতো মাছ কিনে এন। তোমার মা অনেকদিন থেকে বলছে আমসির ডাল খাবে। সেরখানেক মটর ডাল এন।

এ-ভাবে কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে এক সকালে আমার মনে হল, আমি আর দুঃস্বপ্ন দেখছি না। সেই প্রেতাত্মার ভয়ও আমার কেমন কেটে গেছে। চোখ মুখ আমার আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। বাবা খেতে বসে বললেন, বা সুন্দর বাজার করেছিস। তুই কি করে জানিস, আমি পটল ভাজা খেতে এত ভালবাসি। এখন তো পটলের সময়ও না।

বাবা পরদিন নিমগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে বললেন, গাছটা তোর লেগে গেছে। আর ভয় নেই। এখন আর জল দিতে হবে না। বাবা সেদিনই নিজের বাড়িতে প্রথম শনিপূজার জন্য সওদা করে ফিরলেন। দুধ, চাল কলা নারকেল সব আমি পিলু বাবা একসঙ্গে বাজার থেকে নিয়ে এলাম। মা মায়া এক এক করে সব ঘরে নিয়ে তুলে সাজিয়ে রাখছে। তারপরই পিলুর সেই ডাক—দাদারে...যাবি।

শেষ পর্যন্ত সাদুল্লা আমগাছটায় মুকুল আসায় বাবার গাছ লাগানো যেন ষোল আনা সার্থক। বাবার একটাই দুঃখ ছিল, গাছের কলমটা তাহলে সৈয়দ আলি ঠিক দেয় নি। সব গাছে মুকুল আসে, এটায় আসে না কেন—হাতের দোষ মনে করতে পারেন না। তবে তো সব গাছই বাঁজা থাকত। মাটির দোষ মনে করতে পারছেন না, তবে তো কোন গাছেরই এত বাড় বাড়ন্ত হত না। পরিচর্যার অভাব, তাই বা কি করে ভাবেন—গাছের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা তল্লাটের কে না জানে।

আমার কলেজের সহপাঠী মুকুল পর্যন্ত একখানা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে বাবাকে। গাছতলায় মাদুরে শুয়ে মুকুলের কেন জানি মনে হয়েছিল, এমন গাছপালা নিয়ে ঘরবাড়ি বাবার মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কথাটা বাবার কানে উঠতেই বলেছিলেন, এরা বেঁচে থাকে বলে মানুষ বেঁচে থাকে। পাখপাখালি উড়ে আসে। কীটপতঙ্গ ফড়িং প্রজাপতি কী নেই বাড়িটাতে। একটা বাড়ির এ সবই হ'ল গে শোভা। মানুষ কেন বোঝে না এটা, তিনি তার মানে ধরতে পারেন না।

নতুন গাছের প্রথম পাকা আমটি গৃহদেবতার ভোগে দেওয়া হয়। তারপর আমরা। আরও পরে প্রতিবেশীরা। এবং নতুন গাছের আম কেমন সুস্বাদু খেতে, সবাই না জানলে গাছটা লাগানোর সার্থকতা যেন তাঁর কাছে থাকে না।

ঘরবাড়ির বিষয়ে বাবা বড় সতর্ক থাকেন। মুকুল সাইকেলে আসে। সে শহরে থাকে। এই আসা-যাওয়াটা বাবার কাছে ভারি গর্বের বিষয়। বড় পুত্রের সহপাঠী এবং বন্ধু—তিনি তাকে নিজ হাতে আম কেটে না খাওয়াতে পারলে শান্তি পান না। থালায় সাজানো কাটা আম। লাল টকটকে আভা বের হচ্ছে। কাটার আগে তার নানাবিধ প্রক্রিয়া—অর্থাৎ আমটির বোঁটা কেটে ফেলে জলে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া, এতে ভেতরের কস মরে যায়। ঝাঁঝটি থাকে না। আম খাওয়ার নিয়মকানুন বাবা এত সময় ধরে বোঝাতে শুরু করেন যে মুকুল বিরক্ত না হলেও আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

এ সময় মুকুল বড় বেশি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে দুই সমবয়সী তরুণের তখন কথোপকথন এ রকমের—

—তুমি বিলু রাগ কর কেন বুঝি না। মেসোমশাই এতে এক ধরনের তৃপ্তি পান। আমার তো বেশ ভাল লাগে শুনতে। দেশ ছেড়ে এসে কত কষ্ট করে বাড়িঘর বানিয়েছেন, গাছপালা লাগিয়েছেন, তাঁর গর্ব তো হবেই।

আসলে মুকুল আমাকে প্রবোধ দেয়। বাবার ব্যবহারে কেউ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এটা সে চিন্তা করতেই পারে না।

চৈত্রের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। বৈশাখের খর রোদে কখনও আমরা সাইকেল চেপে বাদশাহী সড়কে উঠে যাই। ঘরবাড়ির আকর্ষণের চেয়েও কি এক বড় রহস্য আমাদের বাইরে টানে। বাদশাহী সড়কের দু-পাশে গাছপালা—কখনও ছায়া, কখনও রোদ্দুর—আমরা তার ভেতর দিয়ে ছুটি।

আমদের ছুটতে ভাল লাগে।

আমাদের কেউ দেখতে পায়, ধূ ধূ মাঠের উপর দিয়ে দুই সাইকেল আরোহী যাচ্ছে। কেউ দেখে, কোনো গাছের নিচে বসে আছি আমরা।

আবার কোনো নদী পার হয়ে যাই।

জ্যোৎস্না রাতে আমরা দুজন বন্ধু মিলে কখনও চলে যাই জিয়াগঞ্জে। গঙ্গার জল নেমে গেছে। বালির চরা জেগেছে। হাঁটু জল ভেঙে সেই চরায় উঠে রাতের জ্যোৎস্না দেখি। নক্ষত্র দেখি। দূরে শ্মশান।

আমাদের মধ্যে ক্রমে এক নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বোধহয় কোন গভীর রহস্যময় বনভূমিতে

ঢুকে যাবার আগে সবার এটা হয়।

অর্থহীন ঘোরা। লালদীঘির ধারে সাইকেলে চক্কর মারি। কথা আছে কেউ এই পথ দিয়ে যাবে। আমরা তাকে দেখব। সে নারী, তার নারী মহিমা ঝড়ো হাওয়ার মতো আমাদের কিছুক্ষণ বিহ্বল করে রাখে।

আসলে লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর আমি আর কালীবাড়িতে থাকতে পারি নি। একজন নারী জীবনের চারপাশে না থাকলে কত অর্থহীন, সেই দেবস্থানে তা প্রথম টের পাই। লক্ষ্মী আমার কে হয়, কি হয় জানি না, কিন্তু লক্ষ্মী না থাকলে দেবস্থানের গাছপালার পাতা নড়ে না, ঝিলের ঘাটটা বড় নির্জন, রেললাইন কোনো দূরের কথা বলে না, এটা টের পেয়েছিলাম। এক গভীর বিষণ্ণতা আমাকে তিলে তিলে গ্রাস করছিল। বাড়ি এলে বাবা মুখ দেখেই টের পেয়েছিলেন, কিছু একটা আমার হয়েছে। বাবা, মা, ঘরবাড়ি, ভাইবোন সবাই মিলে কত সহজে সেই গভীর অন্ধকার থেকে আবার আমাকে আলোয় পৌঁছে দিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, তবে বাড়িতেই থাক। আর যেয়ে কাজ নেই। দেখি মানুকে বলে দু' একটা টিউশন ঠিক করে দিতে পারি কিনা।

টিউশন ঠিক হল, তবে শহরে নয়। মিলের ম্যানেজারের কোয়ার্টারে। তার দুই মেয়ে—অষ্টম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রী। শহরের স্কুলে তারা ঘোড়ার গাড়িতে যায়। কুড়ি টাকা দেবে। রোজ সকালে তাদের এখন পড়াবার দায়িত্ব আমার। একটা পুরানো সাইকেল এখন আমার নিত্য সঙ্গী। দু-চার ক্রোশের দুরত্ব আমার কাছে কোন আর সমস্যাই নয়।

সাইকেলটার সঙ্গে আমার মেজ ভাই পিলুর বড় বেশি শত্রুতা। কোনো কারণে সাইকেল না নিয়ে বের হলে, পিলু তার উপর খবরদারি করবেই। সাইকেলটার কিছু না কিছু অঙ্গহানি না করে সে ছাড়বে না।

পিলু কেন বোঝে না এই সাইকেলটা আমাকে আবার নিরাময় করে তুলেছে। লক্ষ্মীর অপমৃত্যুতে সহসা আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম—যেন সে আমার সব শক্তি হরণ করে নিয়ে ঝিলের ওপারে উধাও হয়ে গেল। বাবা, নিবারণ দাসের আড়ত থেকে সাইকেলটা নিয়ে না এলে আমার মধ্যে আবার বেগের সঞ্চার হত না। সাইকেলটার খবর দিয়ে বাবা বলেছিলেন, তুমি দেখ সাইকেলটা চড়তে পারো কি না। আমার সঙ্গে অবশ্য পিলুও সাইকেলটা আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। সে বলত, দিবি দাদা তোর সাইকেলটা, চড়ব।

পিলু সাইকেলটার হ্যাণ্ডেল ধরে রাখত। আমি ওপরে উঠে চালাবার চেষ্টা করতাম। বাবা যজন যাজন সেরে ফেরার পথে আমার আবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে দেখলে শান্তি পেতেন। বলতেন, সাবধানে চালিও। হাত পা কেট না। হাত পা কাটলেও তেমন কিছু আসত যেত না। কারণ বাড়ির সীমানায় ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া। তার কষ ক্ষতস্থানে বড় উপকারী। বড় হতে হতে গাছপালার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদেরও অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে। সাইকেলটা যে আমার পিলু বোঝে। সে কারণে-অকারণে চড়তে পারলেই খুশি। বড় বেশি জোরে চালাবার স্বভাব। সাইকেলটা ওর নয় বলে কেমন মায়া দয়া কম। কখনও স্পোক ভেঙে রাখে, কখনও হ্যাণ্ডেল বাঁকিয়ে ফেলে। পুরানো লজঝরে সাইকেলে যে যত্ন নিয়ে চড়তে হয় সেটা সে বোঝে না।

সাইকেলটায় চড়ে বসতে পারলে কেন জানি মনে হয়, সামনের দূরত্ব বড় কম। রেল-লাইন, টাউন-হল, পুলিশ ব্যারাক, খেয়াঘাট সব বড় কাছে। গায়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। নিজেকে বড় হাল্কা মনে হয়। সারা আকাশ জুড়ে মেঘ সঞ্চার হতে শুরু করলে, সাইকেলটা ঘর থেকে বের করে নিই। তারপর যেদিকে চোখ যায় উধাও হয়ে গেলে টের পাই ভেতরের সব মেঘ কখন কেটে গেছে। বাবা কি করে যে টের পান সংসারে বেঁচে থাকতে হলে বিলুর এখন একখানা সাইকেলের দরকার, যে বয়সের যা।

মিলের টিউশনির খবরটা এনেছিলেন নরেশ মামা। বাবার দেশ-বাড়ির সঙ্গে নরেশ মামার কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। ওরা আমাদের জমিটা পার হলে যে আম বাগানটা ছিল সেখানে বাড়িঘর তুলে কিছুদিন ধরে আছেন। বনটা যথার্থই এখন একটা কলোনি হয়ে গেছে। চার পাঁচ বছর আগেকার

সেই নিরিবিলি ভাবটা একেবারেই নেই। রাস্তাঘাট হচ্ছে। পুলিশ ক্যাম্পের সামনে সারবন্দি সব ঘরবাড়ি উঠে গেছে। নিশি করেরা তিন ভাই। সবাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। বাবাই চিঠি দিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। জলের দরে জমি। চলে এস। পরে এলে আর ফাঁকা পড়ে থাকবে না। ফলে আমাদের বাড়ির লপ্তে পর পর সব বাড়িগুলি, বাবার দেশ-গাঁয়ের মানুষে ভরে যেতে শুরু করেছে।

জমির বিলি বন্দোবস্ত রাজবাড়ির উপেন আমিনকে দিয়ে করানো হচ্ছে। টাক মাথা মানুষটি। গোলগাল চেহারা। জামা কাপড় ফিটফাট। বিক্রমপুরে বাড়ি। কথায় কথায় বিক্রমপুরের মানুষ বলে এক ধরনের গর্ব দেখানোর চেষ্টা আছে। এদিকটায় এলে, একবার হাঁক দেবেনই, বাঁড়ুজ্যে মশাই আছেন।

সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ শুনলেই বোঝা যেত আমিন এসেছে। তার সঙ্গে থাকে যদুপতি বলে একজন পেয়াদা। মাথায় লম্বা জোকারের মতো টুপি। কোমরে বেল্ট। তাতে ছাপ মারা কাশিমবাজার রাজ এস্টেট। এই ছাপটি দেখিয়ে সে এখন বাড়তি পয়সা কামায়। গায়ে খাকি শার্ট, পায়ে কেডস্। হাফপ্যান্ট খাকি রঙের। চুল সজারুর মতো খাড়া। খ্যাংরা কাঠি আলুর দম হয়ে উপেন আমিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের হাসি পায়। চালচলনে রাশভারি, গম্ভীর কথাবার্তা—এ জমিতে কেন, এখানে কার গরু? এ গাছ কে কেটেছে! বাঁশঝাড়ে হাত দাও কেন? রাজবাড়িতে নালিশ ঠুকে দেব। জমি এখনও সব বিলিপত্তন হয় নি বলে, সবাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সীমানা বাড়িয়ে নেবার। যদুপতির বড় সতর্ক নজর। কাঠা, দুকাঠা বাড়তি জমি একটা বিড়ি খাইয়েও কেউ কেউ সীমানার মধ্যে টেনে নিয়েছে। যদুপতিকে কিছু দিলেই হল। একখানা পেঁপে। তাই সই। একফালি কুমড়ো, তাতেও খুশি। যদুপতির ব্যাগটায় উঁকি দিলে এমন সব নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে, পিলুর বড় ওর পাশে ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। পিলু বলবে, দেখি আজ তোমার কি আদায় হল।

যদুপতি বলবে, হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি আমার ঝোলা দেখছ কেন?

পিলু বলবে, ল্যাংরা বিবির হাতায় বসতে দেবে বল?

—মাছ নেই।

—হ্যাঁ আছে।

—ও তো দেড়মণি দু-মণি মাছ। তোমার কম্ম নয় তোলার।

—যদুপতিকা, তুমি একবার দিয়েই দেখ না।

যদুপতি একলা না যে দেবে। যদুপতির সঙ্গে আরও একজন পেয়াদা এই তল্লাটে ঘুরে বেড়ায়। রাজা না জানলেও, ওরা জানে এই সুমার আমবাগান এবং বনভূমি ছাড়া কোথায় কি হাতা আছে, পুকুর দীঘি আছে—কোনটায় কি মাছ বড় হচ্ছে—কাগে বগে সম্পত্তি ঠুকরে না খায়, সেজন্য দিনমান সাইকেলে চক্কর দিয়ে বেড়ানো। পাহারার কাজ যদুপতির।

এই যদুপতি আগেও এসেছে। তবে খুব কম। তখন সে আমার বাবার কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকত না। বনভূমির মধ্যে বাবা একলা সাহস করে বাড়ি ঘর বানাচ্ছে দেখে সে কিছুটা তাজ্জবই বনে গেছল। তার ভাবনা, এত বড় গভীর বনে কে যে বাবার মাথায় এমন একটা দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে! তবু রাজবাড়ির স্বার্থ বলে কথা—যার নুন খেতে হয় তার গুণ গাইতে হয়। জমি যে নিষ্ফলা নয় সেটাই ছিল বাবার কাছে যদুপতির একমাত্র সান্ত্বনা। সান্ত্বনা দিয়ে বলত, বসে যখন গেছেন, তখন আর ঠেকায় কে। দেখুন না কি হয়! পাকিস্তান একেবারে উজাড় করে সব বেটারা পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। শহরের এত কাছে এমন খোলামেলা জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে! যদুপতিও জানত, বাবা যা একখানা মানুষ, কখন না জানি আবার লোটা কম্বল নিয়ে গরুর গাড়িতে ফের উঠে বসেন। সেই ভয়ে সে সব কাজেই বাবাকে বাহবা দিত। একটা গাছ লাগালেও। তা আপনার হাত লেগেছে গাছ কথা না কয়ে পারে! একজন বাড়িঘর করে যখন বনটায় বসে গেছে তখন আবাসযোগ্য জায়গা অন্যের ভাবতে কষ্ট হয় না। বাবা চলে গেলে, সেটাও যাবে। ফলে যদুপতি এদিকটায় খুব কমই আসত। যেন ভয়, এসেই দেখবে আর ঘরবাড়ি নেই। বাড়ির মানুষজন সব চলে গেছে। কারণ যদুপতি এলেই বাবার তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন, আর কে নিল জমি?

—তিনখানা দরখাস্ত পড়েছে।

—কে নিল জমি?

—সন্তোষ সরকার পীলখানার পাশের জমিটা নিয়েছে।

—কে নিল জমি?

—টাঙ্গাইলের সরকাররা।

জমির বিলি বন্দোবস্তের কথা বলে একখানা পরচা বাবার চোখের সামনে মেলে ধরত। বলত, দেখেন, সোজা রাস্তাটি যাবে কারবালার সড়কে। বাদশাহী সড়ক থেকে আর একটা রাস্তা যাবে মিলে। এই যে আমবাগান দেখছেন, এখন দু'শ টাকা বিঘা প্রতি উঠেছে। এখানটায় বাজার হবে। এটা স্কুলের মাঠ। বাবা পরচা দেখে কেমন আবেগের সঙ্গে বলতেন, হলেই বাঁচি। বিলুটার যা হোক একটা গতি হল। পিলুটা না হয় যজমানি করবে। ছোটটাকে নিয়েই ভাবনা। কোথায় যে পড়াশোনা করবে!

যদুপতির কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক। নরেশ মামা এসে একটা স্কুলেরও গোড়াপত্তন করে ফেললেন। একা মানুষ। চুল ছোট করে ছাঁটা। হাঁটুর ওপর কাপড় পরেন। গায়ে ফতুয়া। রেওয়া রাজস্টেটে কাজ করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে চলে এসেছেন। স্ত্রী বেঁচে নেই। ছেলে আসানসোলে কোন এক কারখানায় কাজ করে। মেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ঝাড়া হাত পা। মানুষকে বসে থাকলে চলে না, কিছু একটা করতে হয়। তিনিই বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললেন, কিছু দাও। একটা ঘর খাড়া করি। নরেশ মামা একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। কলোনিতে তাঁর কথা কেউ ফেলতে পারে না। এমন একজন মানী ব্যক্তি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত পাতলে কে আর না দিয়ে থাকতে পারে। বাবাও দিলেন, জমির খড় এবং বাঁশ। বললেন, চৌধুরী মশাই, নগদ টাকা তো হবে না।

চৌধুরী মামা এতেই খুশি। তিল সঞ্চয় করলে তাল হয় সে কথাটিও বলে গেলেন। চৌধুরী মামাদের বাড়ির পরে একটা ডোবা এবং বাঁশের জঙ্গল এখনও চোখে পড়ে। ওটা কিনেছে পরাণ চক্রবর্তীরা। বামুনের বাড়ি হওয়ায় বাবার যে মৌরসীপাট্টা ছিল, সেটা যাবার ভয়ে কেমন তিনি কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ ছিলেন। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে, না নেই, সে সব খবর সংগ্রহ করে এনে একদিন বলেছিলেন, বুঝলে ধনবৌ, বাড়িতে ঠাকুর নেই সে আবার কেমন বামুন। মা-ও বলেছিল, দেখ কি জাত! এ দেশে এসে তো সবাই কায়েত বৈদ্য বামুন হয়ে গেল। জাতের আর বাছবিচার থাকল না।

নরেশ মামা আমাকে একটু কেন জানি অন্য চোখে দেখেন! আমাকে দেখলে দাঁড়িয়ে যান। পড়াশোনার খবর নেন। এবং আমি যে খুব মেধাবী এটাও তাঁর খুব কেন জানি মনে হয়। আচার-আচরণে আমার প্রতি তাঁর একটা কেমন স্নেহপ্রবণ মন আছে বুঝতে পারি। এটা হয়ত আমিই এই অঞ্চলটার একমাত্র কলেজ-পড়ুয়া বলে কিংবা আমার মধ্যে এমন কিছু গোপন বিনয় থাকতে পারে যা কোন বিদ্যোৎসাহীকে বিদ্যাদানের জন্য উৎসাহ যোগায়। আমাদের সংসারে যে বড় বেশি অভাব আছে তাও তিনি টের পান। তাঁর কাছেই খবর পাওয়া গেল, মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরীর বাবা নরেশ মামার গাঁয়ের লোক। খবরটা বাবাই নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, বুঝলে ধনবৌ, মহজুমপুরের মনমোহন চৌধুরীকে মনে আছে? রাসুর বিয়েতে গিয়েছিলেন।

মা মনে করার চেষ্টা করলে বাবা বললেন, মনে নেই জোয়ান মানুষটা হেই বড় একটা লম্বা চাইন মাছ বরদির হাট থেকে জেলেদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মার বোধহয় তখন বালিকা বয়স। বাবার বোধহয় তখন কৈশোর কাল—সে যাই হোক মা সহসা মনে করে বললেন, হ্যাঁ গালের একটা দিকে শ্বেতী আছে না।

—ওঁরই ছেলে মিলের ম্যানেজার। আমাদের দেশের লোক।

আমার তখন যথেষ্ট ক্ষেপে যাবার কারণ থাকে। এই একটা সমাচার—বাবার দেশের লোক মিলের ম্যানেজার—এখন এই সম্বল করে না আবার নিবারণ দাসের আড়তে চলে যান। যার এতদিন শুধুই পুত্র-গৌরব সম্বল ছিল, সে আর একটা গৌরবের হদিশ পেয়ে না আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে যান এটা আমি চাই না। তাঁর দেশের লোক একজন ম্যানেজার হয়েছে ত কি হাতি ঘোড়া হয়েছে!

বাবা স্নানে যাবার আগে কথা হচ্ছিল। শীতকাল এলে বাবা রোদে বসে বেশ সময় নিয়ে তেল মাখেন শরীরে। দিব্যকান্তি বাবার। শীতকালে এত তেল মাখেন যে শরীরের গাত্রবর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হয়ে ওঠে। তেলের বাটি সামনে। জলচৌকিতে বাবা বসে। শীতের রোদ্দুর গাছপালার জন্য বাড়িটাতে এমনিতে কম ঢোকে। আকাশের প্রান্তে ঘাড় হেলিয়ে সূর্যদেব তবু যে কিছুটা কিরণ দেন, সে উঠোনটা

বড় বেশি প্রশস্ত বলে। এই খানিকটা রোদের আশায়, রোদে বসে তেল মাখার আশায় বাবার শীতকালে স্নান করতে একটু বেশিই বেলা হয়ে যায়। মা'র গজগজ বাড়ে। তেলের বাটি সামনে নিয়ে প্রথমে নখাগ্রে তা ঈশ্বরেভ্যো নমঃ বলে ঊর্ধ্বগগনে পাঠাবেন। তারপর ঈশান নৈর্ঋত কোণে নখাগ্রে তেল সিঞ্চ ন এবং পরে বসুন্ধরার প্রতি এবং এভাবে বুড়ো আঙ্গুলের নখে, নাসিকা রন্ধ্রে, চোখের দুই কোণে, কর্ণকুহরে এবং নাভিমূলে তেল স্পর্শ করানোর পর তাঁর আসল মাখামাখিটা শুরু হয়। বাবার যে জীবনে সর্দি কাশি হয় না তার মূলে নাকি এই তৈল কূপাধার নামক মোক্ষম প্রয়োগের জের। সুতরাং আমার কথায় তাঁর নিরতিশয় মর্দনে মনসংযোগ বিনষ্ট হলে কেমন হতবাক হয়ে বললেন, কি বললে!

—না বলছিলাম, এই মানে ম্যানেজার কি হাতি ঘোড়া নাকি!

—হাতি ঘোড়া হতে যাবে কেন। ম্যানেজার সোজা কথা! দেশের ছেলে; মিলের ম্যানেজার কত বড় কথা!

আমি জানি বাবার পৃথিবী এক রকমের। আমার আর এক রকমের। কালীবাড়ি থাকতে রায়বাহাদুর থেকে সব ধনপতি কুবেরের সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। দূরত্ব না থাকলে কৌতূহল থাকে না। সমীহভাব গজায় না। কাছাকাছি এতসব ডাকসাইটে মানুষকে দেখেছি বলেই একজন ম্যানেজার আমার কাছে তেমন আর জীবনে গুরুত্ব পায় না। আর কি জানি কি হয়, সহজে কাউকে আর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে রাজি থাকি না। বরং কারো প্রশংসায় কেমন ভেতরে ক্ষুব্ধ ভাব জাগে।

বাবা বললেন, কটা লোক মিলের ম্যানেজার হতে পারে বল। আর কত বড় কাপড়ের মিল। যোগেশ সরকারকে তো চিনতে। মিলের কেরানীবাবু—কি দাপট ছিল গাঁয়ে।

যোগেশবাবুকে আমি চিনি। নারায়ণগঞ্জে থাকত বাসা করে। যোগেশ সরকারের ছেলে সুকেশ গ্রীষ্মের ছুটি-ছাটায় দেশের বাড়িতে আসত। টেরি কাটত। ইস্তিরি করা জামা প্যান্ট পরত। সুকেশের দিদি গন্ধ তেল মাখত। জানালায় বসে নীল খামে চিঠি লিখত। সব সময় পায়ে চটি পরে থাকত। এ সব আমাদের কাছে ছিল তখন ভিন্ন গ্রহের খবর। কতদিন সুকেশের দিদির নীল খামে চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দেবার জন্য, বিলের জল ভেঙে হাইজাদির কাছারি বাড়িতে উঠে গেছি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বললেন, কি চুপ করে থাকলে কেন। বল! একজন কেরানীর এত দাপট হলে ম্যানেজারের কত দাপট হতে পারে। একটা মিল চালানো সোজা কথা! হাজার লোক কাজ করে। সবার খবর রাখতে হয়। তার মর্জিতে মিলের ভোঁ শুনতে পাও। কটা বাজল টের পাও। সে না থাকলে সব ফাঁকা। কত দূর থেকে এই মিলের বাঁশি শোনা যায়। লোকটা তার দড়ি ধরে বসে থাকে। সে টানলে বাজবে, না টানলে বাজবে না।

বাবার সঙ্গে আজকাল আমার তর্ক করার স্বভাব জন্মেছে। আগে এটা একেবারে ছিল না। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথায় পেরে না উঠলে গুম মেরে যান। ছেলে লায়েক হয়ে গেছে মনে করেন। তখন কেন জানি আমাকেই হার মানতে হয় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। যেন আমি তর্ক করছি না, বাবার পিতৃত্বের অধিকার হরণ করে নিচ্ছি। বলেছিলাম, এগুলো কথা হল বাবা!

মাথার তালুতে হাতের তালু সহযোগে বাবা প্রায় তখন তবলা বাজাচ্ছিলেন। মুখের উপর কথা বলায় কিঞ্চিৎ রুষ্ট। রুষ্ট হলে, হাত পা এমনিতে মানুষের কাঁপে। বাবার তালুতে তালু সহযোগে তেলের ক্রিয়াকলাপ প্রসার লাভ করেছে মস্তিষ্কে, না তিনি ক্ষেপে গিয়ে এমন অধীর চিত্ত হয়ে পড়েছেন যে হাত নামাতে ভুলে গেছেন বুঝতে পারলাম না। বেগ থামাবার জন্য বললাম, তাই বলে আপনি একজন ম্যানেজারকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন না। তিনি তো আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নন।

—ঠিক। তবু যার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য দিতে হয়। সংসারে এতে সুখ আসে। বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয়। কোটিতে গুটি। ম্যানেজার লাখে এক। দাবার বড়ের মতো যার যেমন বল। তাই বলে কেউ ছোট নয়। মানুষকে বড় ভাবার মধ্যেও একটা মহত্ত্ব থাকে। এ সব সংসারে শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলো তোমার পরিচয়। তুমি শুধু আমার সন্তান এই পরিচয়ের সঙ্গে মিলের ম্যানেজার তোমার দেশের লোক কথাটা কত গুরুত্ব বাড়ে বুঝতে শেখ।

আসলে বাবা যা বলতে চান বুঝতে পারি। মানুষের এ ভাবে একটা ডাইমেনশান তৈরি হয়। ছিন্নমূল পিতা তাঁর পুত্রের এবং পরিবারের ডাইমেনশান খুঁজতে চান বলেই এত সব কথা। আমি অগত্যা মেনে নিয়ে বলেছিলাম, কখন পড়াতে যেতে হবে।

বাবা বলেছিলেন, সকালে যেতে পার, বিকালে যেতে পার, সন্ধ্যায় যেতে পার। যেমন তোমার সুবিধা। নরেশ চৌধুরীই তোমার হয়ে বলে এসেছেন।

—কবে থেকে যেতে হবে?

—পয়লা জ্যৈষ্ঠ। তবে আমি রাজি হইনি।

—রাজি হন নি মানে!

—দিনটা ভাল না। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ভাল না। তুমি বুধবার সকালে যাবে। তিথি নক্ষত্র ঠিক আছে।

এবং খবরটা নরেশ মামাকে দিতে হয়। আমার একটা টিউশন সত্যিই দরকার হয়ে পড়েছে। কলেজে পড়লে টিউশন করার হক জমে যায়। মাগ্যি গন্ডার বাজারে টাকাটা নেহাত কম না। কুড়ি টাকায় এক মণ চাল হয়ে যায়। মা-র সাদাসিধে হিসাব। সংসারে এক মণ চালের দাম বিলু রোজগার করে আনবে সোজা কথা না। টিউশনের প্রথম টাকায় কি কি হবে তারও একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল। পিলু বারান্দায় বসে বঁড়শির সুতো পাকাচ্ছিল। সে তালিকাটি শুনছিল বোধহয়। তার মনঃপূত হয় নি। ছিপ বঁড়শি সব একদিকে ঠেলা মেরে রেখে রান্নাঘরে হাজির। মা-র এলাকা এটা। মা পছন্দও করে না পিলু যখন তখন রান্নাঘরে ঢুকে যাক। কারণ রান্না না হতেই ওর এটা ওটা হাত বাড়িয়ে খাবার স্বভাব। —দাও না মা, তিলের বড়া একটা। দাও না মা একখানি ডিমের ওমলেট। মা তখন ভারি রেগে যায়। —খেতে বসলে দেব কি। সুতরাং পিলু রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ায়, মা তার রান্না করা তরিতরকারি সামলাতে থাকল। পিলু সেদিকে মোটেই গেল না। কেবল বলল, দাদা তোর দেখিস কিছু হবে না।

এমন কথায় মা খুব রেগে গেল। —তুই বড় অলুক্ষণে কথা বলিস পিলু, এমন বলতে নেই।

—ঠিকই বলেছি। দাদা কথা দিয়ে কথা রাখে না। রহমানদা এতগুলি টাকা দিল, সব সাবাড়। নবমীকে দাদা শীতের চাদর কিনে দেবে বলেছিল।

—দেওয়ার সময় তো যায় নি। পরে হবে।

পিলু বলল, কথা দিলে কথা রাখতে হয়।

আমি বললাম, কথা রাখা হবে। কথা রাখা হবে না কে বলেছে?

—কথা রাখা হয়নি, আমি বলছি। নবমী শীতে বড় কষ্ট পায়।

পিলুর সব মনে থাকে। নবমীকে আমি কথা দিয়েছিলাম, একটা চাদর দেব প্রথম উপার্জনের টাকায়। বদরিদা আমায় হাত খরচ দিতেন সামান্য। পিলুর মতে ওটিই আমার প্রথম রোজগার। সেখান থেকে সঞ্চয় করে উচিত ছিল নবমী বুড়িকে একটা চাদর কিনে দেওয়া। সেটা হয়ে ওঠেনি। পিলু এতে সংসারের অমঙ্গল হচ্ছে ভেবে থাকে। সে তালিকাটির সামান্য পরিবর্তন করে বলল, একটা চাদরের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মরে যাবে—সে হয় না। দাদা টাকা পেলেই সে একটা চাদর কিনে আনবে এই জেদ ধরে বসে থাকলে মা বলল, অত দান ধ্যান করবে কোত্থেকে। তোমাদের বাবার কি জমিদারি আছে। হুট করে কথা দিলেই হয়। হবে না। এখন হবে না যাও।

—একশ বার হবে। দাদার টাকা, তোমার টাকা না।

মা কেমন রোষে উঠল। —আমার টাকা না, কার টাকা। পেটে না ধরলে আসত কোত্থেকে। দাদাকে পেতে কোথায়। দাদার রোজগার হত কোত্থেকে!

বাবা বারান্দায় বসে সব শুনছিলেন। চোখ বুজে মা-ছেলের কথা কাটাকাটির মজা উপভোগ করছেন। বোঝ এবার। ছেলেরা বড় হচ্ছে, বোঝ এবার! আমিই তো কেবল দানছত্র খুলে বসে থাকি—এখন কে করে! গ্রহগুরু বাড়ি এলে ফলটল দিতে হয়, দিতে গেলেই তোমার বাজে। সংসারের কুটো গাছটি পর্যন্ত তোমার লাগে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর রমণী। বাবার মুখ দেখে টের পাই তিনি এ সবই চোখ বুজে ভাবছেন। একটা কথা বলছেন না। মায়া বলছে, দিক না মা। দাদার এতে খুব ভাল হবে।

—দিয়ে দাও না। সবই দিয়ে দাও। কে বারণ করেছে।

বাবা আর যেন পারলেন না। তিনি স্নানে যাবার আগে বললেন, পিলু যখন বলেছে দাও।

—বললেই দিতে হবে, ও কি বাড়ির কর্তা। বিলুটার একটা ভাল জামা নেই। কি পরে যাবে? ভেবেছ!

বাবা আর রা করলেন না। পিলু বুঝল সুবিধে হবে না তর্ক করে। মা একখানা যেন কিরীটেশ্বরী। হাতে খড়্গ তুলেই আছে। তবু মাকে জব্দ করার জন্য সে নিমেষে হাত বাড়িয়ে দুটো তিলের বড়া নিয়ে ছুট লাগাল। মাও আমার ক্ষেপে গেছে ততোধিক। হাতে খুন্তি নিয়ে ছুটছে মেজ পুত্রটির পিছু পিছু। মেজ পুত্রটির নাগাল পাওয়া কঠিন। সে যত দৌড়ায় না তার চোয়ে বেশী লাফায়। মাকে দেখিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে। মা'র চিৎকার, খেতে আসিস। দেব খেতে। শুধু ভাত দেব। গোনা গুনতির বড়া তোর এত নাল গড়ায় জিভে। তোর কোথাও জায়গা হবে না দেখিস।

পিলুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমি বললাম, ঠিক আছে আর বকো না। নবমীকে চাদর দিতে হবে না। তোমার কথা মতোই সব হবে।

—দিতে হবে না তো বলি নি, পরে দেবে। ম্যানেজারের বাসায় তোমার টিউশনি—এক জামা গায় দিয়ে গেলে ওরাই বা কি ভাববে!

—পিলুর দোষ নেই মা। আমি বলেছিলাম, ওকে দেব। এখনও দেওয়া হয়নি। কথা দিলে খেলাপ করতে নেই।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা যে হুট করে কথা দিস কেন বুঝি না। কথা যখন দিয়েছিস, দিবি। তবে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, পিলুকে আমি খেতে দিচ্ছি ত আমার নাম সুপ্রভা দেবী নয়।

সে তুমি দিও না। যেমন পাজি ছেলে, বুঝুক না খেয়ে থাকলে কেমন লাগে।

খেতে বসার সময় দেখলাম, মায়া আমার বাবার আর পুনুর আসন পেতেছে। পিলুকে যখন খেতে দেওয়া হবে না ঠিক হয়েছে তখন আর আসন পেতে কি হবে। মা দেখছিল মায়ার কান্ড। কিছু বলছে না। একবার উঠোনে বের হয়ে দেখল তার মেজ পুত্রটির সাড়া শব্দ পাওয়া যায় কি না। না নেই। মা'র রাগ পড়ে গেছে বুঝতে পারি। রাগ পড়লেও জেদ কমে না। পিলুর খোঁজ খবর দরকার। মা কিছু না বললেও এটা আমাদের যেন বোঝা উচিত। অথচ আমরাও পিলু সম্পর্কে উচ্চ বাচ্য করছি না দেখে কেমন গুম মেরে গেল। এবং এ সময় দেখেছি, মা'র রাগ যত বাবার উপর। বাবা আসনে বসলে বলল, নাও খেয়ে নাও। নিজেরটা ষোল আনা—আর কে খেল না খেল দেখার দরকার নেই। ভাতের থালা সামনে রেখে বলল, আর এক দন্ড বাড়িটাতে থাকতে ইচ্ছে হয় না। আমার হয়েছে মরণ। এক একজন এক এক রকমের। যাব যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে।

বাবা বললেন, বিলু যা তো বাবা ডেকে নিয়ে আয়। না এলে খেতে বসেও শান্তি পাবি না। এবং পিলুকে ডেকে এনে খেতে বসালে, মা আমাদের চেয়েও বেশি বেশি দিল পিলুকে। বলল, দেখিস, চাদরের একটা কত দাম দেখিস। কথা দিলে কথা রাখতে হয়। কবে মরে যাবে, না দিলে শেষে পাপ হবে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। ভয় লাগে বাবা।

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। মাথায় দুশ্চিন্তা থাকলে যা হয়। সকালে উঠে টিউশনিতে যেতে হবে। বাবা দিনক্ষণ দেখে রেখেছেন। অন্ধকার থাকতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি শুয়ে শুয়ে স্তোত্রপাঠ করছেন।

আমার আর পিলুর জন্য বাড়িতে একখানা তক্তপোষ হয়েছে। ওটায় আমরা শুই। রান্নাঘরের পাশে মাটির দেয়াল দিয়ে একখানা ঘর। ওটাতে আমরা থাকি। পুবের ঘরে মা, পুনু, মায়া আর বাবা থাকেন এখন। স্তোত্র পাঠ আজ একটু বেশি জোরে জোরেই হচ্ছে।

এখন একখান উঠোনের চার ভিটের চারখানা ঘর। একটা গোয়াল, একটা ঠাকুরের একটা আমাদের আর একটা বাবা-মার। উঠোনের কোণায় একটা পেয়ারা গাছ। পুবের ঘরের কোণে ডালিম গাছ। তার পাশে তুলসী মঞ্চ। টালির লম্বা বারান্দায় একখানা কাঠের চেয়ার থাকে। জলচৌকি থাকে। ঘরবাড়িতে বাস করতে হলে এগুলোর দরকার, বাবার ধীরে ধীরে এ সব বোধ জাগ্রত হচ্ছে দেখে মা খুব খুশি। রাতে চেয়ার এবং জলচৌকি ভিতরে তুলে রাখতে হয়। মানুষের আবাস হলে চোর-বাটপাড়েরও উপদ্রব বাড়ে। ইতিমধ্যে মা'র একখানা কাঁসার গ্লাস চুরি যাওয়ায় বাবা মাঝে মাঝে লন্ঠন জ্বেলে গভীর রাতে বারান্দায় বসে তামাক খান। অথবা শুয়ে থাকলেও শোনা যায় বাবার

গলা খাকারি। যেন, বাড়ির এই গাছপালা ইতর প্রাণীসহ সবাইকে জানিয়ে দেওয়া ঘরবাড়ির মানুষটা ঘুমান না। কোনো শব্দ হলেই টের পাবেন। বৃথা তোমাদের ঘোরাঘুরি।

মাথায় দুশ্চিন্তা এইজন্য, ম্যানেজারের দুই মেয়েকে আমি কতটা সামলাতে পারব। ছোটটি নাকি বড়ই চঞ্চল। টিউশনের অভিজ্ঞতা দেবস্থানে বছর দেড়েক ঝালিয়েছি। ওরা শত হলেও আমারই গোত্রের। দরকারে প্রহার কিংবা নীল ডাউন যখন যা খুশি করাতে পেরেছি—কিন্তু এখানে দুই বালিকা না বলে কিশোরী বলাই ভাল—তারা আমাকে কতটা সুনজরে দেখবে—ভয়টা এখানেই। পড়া ঠিকমতো করবে কিনা, কিংবা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য এমন সব কঠিন টাস্ক রেখে দেবে যাতে দুরবস্থার এক শেষ। আর অঙ্ক বিষয়টি এমনিতেই আমার কব্জার বাইরে। ইংরাজির পাংচুয়েশন কিংবা টেনস ভেতরে সব সময় কেমন টেনসান সৃষ্টি করে—শেষে না অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অধীত বিদ্যার তুলনায় একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে যেন টিউশনটা নিয়ে। রাতে দুশ্চিন্তাটা বেশ করেই মাথায় জাঁকিয়ে বসেছিল—শেষ রাতের দিকে ঘুম লেগে এলেও,বড় পাতলা ছিল ঘুম। বাবার স্তোত্রপাঠে তাও ভেঙে গেল।

মা রোজই খুব সকালে ওঠে। আজ যেন একটু বেশি সকালে উঠে পুকুরে বাসন মাজতে চলে গেছে। জমির শেষ লপ্তে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট পুকুরও আবিষ্কার করা গেছিল। এমন কি তার ঘাটটাও বাঁধানো। আমরা পুকুরটা আবিষ্কার করে তাজ্জব হয়ে গেছিলাম। ঘাটটার সানে অশ্বত্থের গাছ। আর এমন ঝোপঝাড় যে আমরা ওর ভিতরে ঢুকতেই সাহস পেতাম না। এমন কি পিলু পর্যন্ত একবার গভীর আগাছার এবং কাঁটা গাছের জঙ্গলে ঢুকে দেখেনি কি আছে। ঘাটলাটার বড় জীর্ণ অবস্থা। ভাঙাচোরা। অনেকটা পাড় ভেঙে যাওয়ায় সিঁড়ির ধাপ আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। মাটির ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে যেন। বাবা মাটি সরিয়ে জঙ্গল সাফ করে এবং আরও কিছুটা খুঁড়ে ফেললে, যে জলের দেখা মিলল, তাতে করে সম্বৎসর জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মা বাসন মাজে, কাপড় কাচে, এমন কি চানের জন্যও মা আর কালীর পুকুরে যায় না। পুকুর না বলে ডোবা বলাই ভাল। তবে বাবা এটাকে পুকুরই বলতে চান। টাকা পয়সা হাতে এলে পাড়ে আরও কিছুটা মাটি ভরাট করে দিলে পুকুরই হয়ে যাবে। যদিও এক কোণায় আছে বাঁশের ঝাড়, বাঁশপাতা পড়ে পুকুরের জল কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায় তবু বাবা আশা রাখেন এই জলে স্নান থেকে আরম্ভ করে গৃহদেবতার ভোগের রান্নার জলও মিলে যাবে।

এতদিনে যেন আমরা বুঝতে পারি বাবা কেন জমি সাফ করতে করতে সহসা সব থামিয়ে দিলেন। পাঁচ বিঘের মধ্যে বিঘে চারেক উদ্ধারের পরই বাবা আর এগোলেন না। বাবা কি মাকে ঘরবাড়ির শেষ খবর আচমকা দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন, তুমি আমাকে সোজা মনে কর না। জমি আমি চিনি। আমি কেন, সেই আদিকাল থেকেই এই জমির উপর মানুষের প্রলোভন। ঘরবাড়ি করেছে। ঘাটলা বাঁধিয়েছে। এখানে যে মাটির নিচে কোন নীল কুঠি কিংবা পর্তুগীজ লুটেরাদের গুপ্তধন পোঁতা নেই কে বলবে! ধীরে ধীরে সব তুমি পেয়ে যাবে।

বাবা অবশ্য পুকুরটার খবর পান গত পূজার পর। আমি বাড়ি এলে, বাবা টের পান, ভিতরে আমার বড় কষ্ট। লক্ষ্মী আত্মঘাতী হওয়ায় আমি কেমন ভেঙে পড়েছিলাম। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। যেন দেখতে পেতাম লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে এক শস্যক্ষেত্রে। বুকের কাছে একটা পুঁটুলি। সে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে পুঁটুলিটা খুলে দেখাবে বলে। তারপর খুলে দেখালেই সেই এক দৃশ্য, একটা ছাগশিশুর কাটা মুণ্ডু। চোখ স্থির। কান খাড়া। কলাপাতায় রক্তের দাগ। এমন একটা দুঃস্বপ্নের তাড়নাতেই আমাকে শেষ পর্যন্ত দেবস্থান ছাড়তে হয়। বাবা নানা প্রকার অমোঘ ভয় নিবারণী ওষুধ এবং টোটকা সংযোগে আমাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। বাবার একনম্বর টোটকা ছিল একটি নিমগাছ রোপণ। সেটি আমাকে দিয়ে রোপণ করালেন। আত্মঘাতী হলে আত্মার বড় স্পৃহা হয় বাতাসে ভেসে বেড়ানোর। সে মুক্তি চায়। নিমগাছটি যত বড় হবে, যত এর সেবায় আমার জীবন নিযুক্ত থাকবে তত লক্ষ্মীর মায়া কাটবে। ইহজীবনে সবই মায়া এমনও বোঝালেন। মন খারাপ লাগলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা কর। কথা বল, জীবনে দেখবে নতুন পাতা গজাচ্ছে। একজনের মৃত্যুতে সংসার আটকে থাকলে ঈশ্বরের লীলা খেলার মাহাত্ম্য কোথায়। তাঁরই ইচ্ছেতে সব। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। মহাকালের গর্ভে তুমি

আমি এই গাছপালা প্রাণীজগৎ এবং বসুন্ধরা কে নয়—সব হারিয়ে যাবে। তবে এত ভাবনা কেন!

এ বাবাকে আমি তখন চিনতে পারি না। বাবার টোটকা যে কত ফলদায়ক হপ্তাখানেক পার না হতেই বুঝেছিলাম।

বয়স মানুষকে কত প্রাজ্ঞ করে বাবাকে না দেখলে বোঝা যায় না। সবচেয়ে বিস্ময় লাগে বাবা যেন আগে থেকেই সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল টের পান। তাঁর অভয় আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনার জন্ম দেয়। সকালেই বাবা বললেন, যাবার আগে ঠাকুর প্রণাম করে যেও। প্রথম যাচ্ছ। সাবধানে যাবে।

এ সব কথা কেন—বুঝি! আশ্রয় এবং আত্মবিশ্বাস মানুষের বড় দরকার। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার এটাই একটা বড় সুবিধা। এবং ঠাকুর প্রণাম সেরে নরেশ মামার দেওয়া চিরকুটটি পকেটে পুরে যখন রওনা হলাম তখন কেন জানি মনে হল, আমি অনেকটা দুশ্চিন্তা-মুক্ত।

নরেশ মামার নির্দেশ মতো আমি মিলের একনম্বর গেটে গিয়ে চিরকুটটি দেখালেই গেট খুলে দেবে। মিলের ভেতরটা কি রকম জানি না। পিলুর ভারি ইচ্ছা ভেতরটায় ঢুকে দেখে। মা বলেছে, বিলু তো যাচ্ছে। একদিন তোকে নিবে যাবে।

আমার কেন জানি এ সব কথাতে পিলুর উপর বড় রাগ হয়। কেমন আদেখলা স্বভাব পিলুর। আমি একজন গৃহশিক্ষক মিল-ম্যানেজারের—যেন ম্যানেজারের চেয়ে আমার সম্মান কম না—সমানে সমানে যখন, তখন কিনা তুই আমার ভাই হয়ে একটা মিল দেখার বাসনা মনে মনে পুষে রেখেছিস! তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না! হলে কি হবে, গোঁয়ার হলে যা হয়, সে মাকে বলে রেখেছে, দাদা গেলে আমিও যাব। —তা যা না, কে বারণ করেছে। আমার সঙ্গে কেন! অবশ্য সবই মনে মনে—কারণ পিলুকেও জানি, অভিমান তার বড় বেশি। আজকাল অভিমান হলে সে আমাকে এড়িয়ে চলে। যেন আমার সঙ্গে সত্যি পিলুর একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। বলেছিলাম, আগে যাই তো, পরে দেখা যাবে।

পিলু বলেছিল, আমি জানি, দাদা আমাকে নেবে না!

—জানিস তো বেশ।

কথা-কাটাকাটির পর্বে বাবার উদয় হয়। —লেগে গেল খণ্ডযুদ্ধ। নিয়ে যেতে তোমার আপত্তিটা কিসের!

আপত্তি কেন, আমিও বুঝি না। কালীবাড়িতেও পিলু গেলে আমি রাগ করতাম। রাগের হেতু একটাই, পিলু গেলে যেন সবাই টের পেয়ে যাবে আমরা কত গরীব। কারণ পিলুর পোশাক-আশাক আচরণ সবই গরীব মানুষের মতো। বাইরে বের হয় নি। বের হলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে বুঝত ভিতরের দৈন্য ভাবটা সবাই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। পিলুর সেই সুযোগই হয় নি। সে হয় তো গিয়েই হামলে পড়ে বলবে, এটা কি, ওটা কি, ঐ তারের লাইনটা কোথায় গেছে! টিপে দিলে আলো জ্বলে—ওরে বাবা, রেডিওতে গান হলে সে তাজ্জব বনে যায়। একখানা যন্ত্র না দাদা—কি করে হয়! কি করে হয়, তার ব্যাখ্যা কম লোকই জানে। তাই বলে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকা কি যে বাজে ব্যাপার! পিলুটা তা বোঝে না।

রাস্তায় বের হলেই কেমন মৃদুমন্দ হাওয়া লাগে গায়ে। বেলা যত বাড়ে রোদের তাত তত বাড়ে। লু বয়। গরম হাওয়া বাড়িটার উপর দিয়ে বয়ে যায়। গাছপালাগুলির অন্তরালে থাকে ঠাণ্ডা এক জগৎ। দুপুরের গরম কেমন আটকে রাখে তারা। বিকালে এই গাছের ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকার মধ্যে আছে এক অশেষ আরাম।

কলোনি থেকে দুটো পথেই যাওয়া যায় মিলে। বাড়ি থেকে বের হয়ে চৌধুরী মামাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঢুকে গেলে পড়বে তেলির বাগান। জায়গাটায় কত বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে থাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আর তার ছায়া অনেকখানি পথ জুড়ে। গ্রীষ্মকাল বলে একটু বেলাতেই কেমন গরমে হাঁসফাঁস করে শরীর। ছায়ার লোভে সেই পথটাই আমায় টানে। সাইকেল যত চলে, তত ভেতরে এক গুঞ্জন। আমি বড় হয়ে যাচ্ছি। আমার অস্তিত্বের সংকট তৈরি হচ্ছে। আমি নিজেই একটা যেন আলাদা গ্রহ। আমার এই গ্রহে সুমার মাঠ যেমন আছে, আছে পাহাড় এবং ফুলের উপত্যকা এবং গভীরে দেখতে পাই হিংস্র শ্বাপদেরা চলাফেরা করে বেড়ায়। ছোড়দি এবং লক্ষ্মী আর রায়বাহাদুরের নাতনি মিলে আমার ভেতর বেঁচে থাকার বড় হবার সংকট সৃষ্টি করে গেছে। এই সংকটই আমাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে মারছে। গোপনে সব সুন্দরী তরুণীরাই আমার প্রেমিকা

হয়ে যায়। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার সময় দেখতে পাই, ওরা দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত তুলে দিয়েছে। ওদের অবাক করে দেব, আমার বাহাদুরিতে ওরা চোখ বিস্ফারিত করে তাকাবে, আমার মধ্যে গড়ে উঠবে কোন গৌরবময় অধ্যায়—এমনই যেন আমার আকাঙ্ক্ষা।

রাস্তাটা এসে কারবালার সড়কে মিশেছে। তারপর সোজা উত্তরে—দু তিনটে পাটের আড়ত পার হয়ে চৌমাথায়। বাঁ দিকে ঘুরে গেলে বড় লাল ইঁটের দালান, সামনে লন, পরে ঘাটলা বাঁধানো বিশাল পুকুর এবং তারপরই মিলের পাঁচিল আরম্ভ। রাস্তার ডান দিকটায় নিচু সমতল জমি। ধান পাটের চারা হাওয়ায় দুলছে। মিলের এক নম্বর গেটের পাশে টিনের শেড দেওয়া যামিনী পালের চায়ের দোকান। দুটো টুল, কেতলি, কাঁচের গ্লাস, টিন ভর্তি লেড়ো বিস্কুট। দু-একজন লোক ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে, চা খাচ্ছে। একটা লোক টুলে শুয়ে এই সাত সকালে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। একটা গুম গুম আওয়াজ ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

পাঁচিলটা এত উঁচু যে ভিতরে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। আমি, পিলু রাস্তাটায় আরও দু-একবার এসেছি। পাঁচিলটার ওপাশটায় এক রহস্যময় জগৎ আছে এমন কেবল মনে হত। একটা কাপড়ের মিল কত বড় হয় আমাদের জানা নেই।

গেটের দারোয়ানকে চিরকুটটা দেখাতেই আমাকে সেলাম করল। এটা খুবই আমার কাছে অভাবিত বিষয়। নিজের পোশাক-আশাক আর একবার ভাল করে দেখলাম। আয়না থাকলে এখানেও মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখতাম। আজকাল কু-অভ্যাস হয়ে গেছে, গোপনে আর্শিতে নিজের মুখ উবু হয়ে পড়ে দেখতে বড় ভালবাসি।

বাবার সামনে আর্শিতে মুখ দেখা যায় না। আর্শি নিয়ে টেরি কাটলে এবং বারবার মুখ দেখলে বাবা কেমন ক্ষুব্ধ হন। তাঁর কাছে এটা হয়ত বেয়াদপির সামিল। কারণ দু-একবার তাঁর চোখে পড়ে গেলে তিনি বলতেন, এ সব কু-অভ্যাস ছাড়। এগুলো ভাল না। এতে নিজেকে ছাড়া তোমার আর কিছু আছে ঘরবাড়িতে মনে হয় না। বাবা মা দুজনেই বিষয়টা পছন্দ করত না। ফলে এটা আমারও মনে হয়েছে মানুষের অনেক কুঅভ্যাসের মধ্যে একটা। যেমন বাবার কাছে, চা খাওয়া, সিগারেট খাওয়া কুঅভ্যাসের মধ্যে পড়ে এবং বাবা যে তামাক খান তাও খুব ভাল একটা অভ্যাস নয় তখন কথায় কথায় তা ধরিয়ে দিতে ভুলে যান না। এটা আমার হয়েছে রহমানদার কাছে থাকতে। তখন আমি বাড়ি থেকে পলাতক। সেখানে এক ছোড়দিকে আবিষ্কারের পরই কুঅভ্যাসটা গড়ে উঠেছে। ছোড়দিকে দেখার পরই মনে হয়েছে, আমার কিছু নিশ্চয়ই আছে যা ছোড়দিকে ক্ষেপিয়ে দেয়। সেই অভ্যাসটা দেবস্থানে বেড়েছিল। লক্ষ্মী দেখলে বলত, মাস্টার তুমি দেখতে খারাপ না গো। আয়নায় এত কি দেখছ হামলে পড়ে।

এ সবই বোধহয় বড় হওয়ার লক্ষণ। একদিন আমি আর মুকুল সেলুনে গিয়ে দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেললাম। নরম সবুজ দাড়িতে গাল ভরে থাকলে কেমন বেঢপ লাগে নিজেকে। এবং সেদিনটায় বাড়িতে বাবার কাছে প্রায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলাম। বাবা এ দরজা দিয়ে ঢোকে ত আমি ও দরজা দিয়ে বের হয়ে যাই। কুকর্ম করে ফেললে, পিতার কাছে পুত্রের যে অপরাধ ধরা পড়ে এও যেন অনেকটা তাই। মায়া তো চিৎকার করে বলেই ফেলেছিল, ওমা দাদাকে কেমন লাগছে দ্যাখ মা। দাদা তুই কিরে!—যা ভাগ বলে সরিয়ে দিয়েছিলাম মায়াকে। পিলুটার গোঁফ এখন উঠব উঠব করছে। দু-তিন বছরে পিলু হঠাৎ বেড়ে গিয়ে যেন আমার মাথা ছুঁয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝেই পাশে দাঁড়ালে, মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, মা দেখ, আমি দাদার সমান হয়ে গেছি না?

পিলু আমার সমান হবে লম্বায় কিছুতে সহ্য হত না। বলতাম, তুই আমার সমান লম্বা হবি, তা'লেই হয়েছে। নরেশ মামার স্কুলে পিলু ভর্তি হয়েছে। মায়া যায়। পুনু কলাপাতায় অ আ লেখে। সেও শ্লেট বগলে করে স্কুলে যাবার জন্য মাকে তাড়া লাগায়।

আসলে বুঝতে পারছি আমি অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করছি। ছিমছাম বাংলো বাড়ির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা সবুজ লন। বড় একটা নীল রঙের নেট টাঙানো। দু'পাশে নীল রঙের

বেতের চেয়ার সাজানো। ওটা পার হলেই সুন্দর একটা গোল ছাতার মতো গাছ। দেশী গাছ নয়। বিলিতি গাছ না হলে তার এমন পরিচর্যা হতে পারে আমার ধারণায় আসে না। সব যেন জ্যামিতিক মাপে তৈরি করা। এমন কি একটা বোগেনভেলিয়া গাছেরও যে এত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল সাদা ফুল হতে পারে এখানে না এলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গলা কিছুটা শুকিয়ে উঠেছে। তবে রক্ষা, এই বাংলো বাড়ির মালিক বাবার দেশ বাড়ির মানুষ। বাবা বলেছেন, কাজে কর্মে ম্যানেজারের বাবা মা আমাদের বাড়িতে এসেছেনও দু-একবার। বাবা না হোক আমার ঠাকুরদার কল্যাণে খুব একটা এখানে জলে পড়ে যাব না।

বিশাল বারান্দা। এখানেও সেই নানা কারুকাজ করা চেয়ার টেবিল। সিলিংয়ে ফ্যান। অজস্র ছবি দেয়ালে। সবই ম্যানেজার সাহেবের বোধহয়। কখনও শিকারীর বেশে, কখনও সভাপতির বেশে। হরেক রকম বেশভূষায় নিজেকে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছেন। যেন বারান্দায় উঠেই মানুষজন সতর্ক হয়ে যায় কত বড় মাপের মানুষ তিনি। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল দারোয়ান। তারপর ফ্যান চালিয়ে দিলে কেমন স্বস্তি বোধ করলাম। মুশকিল হল, টিউশনি সেরে বাড়ি গেলে, মা এবং বাবার, এমন কি পিলুরও কত রকমের খবর জানবার যে আগ্রহ জন্মাবে। একজন ম্যানেজারের বাড়িতে কি কি থাকে, কি ভাবে কথাবার্তা হয়, কেমন তার আচরণ সব জানার জন্য বাবা মা নানা প্রকারের প্রশ্ন করে ঠিক ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। মেঝেটাও কী মসৃণ। টাইল বসানো। লাল হলুদ ফুলের কল্কা আঁকা। আমি যে বসে আছি তারও প্রতিবিম্ব ভাসছে মেঝেতে। চক্চকে, যেন আর একখানা বিশাল আর্শি। যতবার খুশি এবার নিজেকে দেখে নাও। পায়ে স্যাণ্ডেল। খুব চক্চকে নয়। দু-চার জায়গায় সেলাই খেয়েছে। মেঝের পক্ষে আমি এবং আমার স্যাণ্ডেল দুই বেমানান। ততক্ষণে চিরকুটটি ভিতর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ধুতি পরা, ফতুয়া গায়, টাক মাথা, বেঁটে একজন বৃদ্ধ আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, নরেশ পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে এস।

একটা ঘর পার হয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেলাম। এই ঘরটায়ও বড় বড় সব ছবি। সবই ম্যানেজারের। ছবিতে তিনি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথাও টেনিস র‍্যাকেট হাতে কোথাও কোন সাহেবের পাশে তিনি দাঁড়ানো। সাহেবের সঙ্গে তাঁর করমর্দনের ছবিটা ধরে রাখা হয়েছে বেশ গর্বের সঙ্গে। অর্থাৎ এ বাড়ির মানুষজন যে সে ঘরানার নয় ছবিগুলি টাঙিয়ে রেখে তার প্রমাণ রাখার চেষ্টা চলছে।

—তুমি এবারে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অবশ্য বলতে ইচ্ছে হল, নরেশ মামা আপনাকে বলেনি কিছু? কিন্তু কুড়ি টাকার টিউশনি সোজা কথা না! কোন বাঁকা কথাই চলবে না কুড়ি টাকার টিউশনি রাখতে হলে। একজন ম্যানজারের পক্ষেই সম্ভব কুড়ি টাকা দিয়ে একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা। বাবা হাবে-ভাবে এসব অনেক আগেই আমাকে শুনিয়ে রেখেছেন। শুধু আমাকে কেন, বাড়ির সবাইকে। বাবার সবটাই সর্বজনীন ব্যাপার। বিষয়টা, বাড়িতে যে এসেছে তাকেই কদিন ধরে বোঝানোর কাজ চলছে বাবার। আমার শুনে শুনে এর গুরুত্ব উপলব্ধি ঘটেছে। ফলে বাড়তি কথা না বলে, শুধু আজ্ঞে আজ্ঞে করে যাচ্ছি।

—কলেজে হেঁটে যাও?

—আজ্ঞে না।

—কিসে যাও তবে?

—সাইকেলে।

তিনি বললেন, ভাল।

সাইকেলে যাই না, হেঁটে যাই এমন বেয়াড়া প্রশ্ন কেন বুঝলাম না। হেঁটে গেলে কি পত্রপাঠ বিদায় করে দিতেন। তা দিতেই পারেন। বাড়ি থেকে চার মাইল হেঁটে কলেজ ঠেঙিয়ে ফিরে এসে আবার এক ক্রোশ পথ হেঁটে ম্যানেজারের মেয়েদের পড়ানো চলে না। কুড়ি টাকা যে দেয় সব জেনে শুনে নেবার তার হক থাকতেই পারে।

আমাকে বসতে বলে বললেন, কোন্ ডিভিসনে পাশ করেছ।

আজ্ঞে এখনও পাশ করিনি।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছো বলছ, পাশ করনি মানে।

আজ্ঞে ম্যাট্রিকের কথা বলছেন? ঢোঁক গিললাম।

আর এ সময়েই হৈ হৈ করে দুই বালিকার প্রবেশ। দাদু তুমি জান, বাবা না, এত বড় দুটো পাখি শিকার করে এনেছে! ওরে বাবা, কত বড় চকা পাখি। মুরগির মতো দেখতে। পেটটা না সাদা। এস না, এস দেখবে। তারপর আমাকে দেখেই কিঞ্চিৎ চোখ উপরে তুলে দুজনেরই সহসা প্রস্থান।

মনমোহন চৌধুরী বিগলিত হাসলেন এবার—এই আমার দুই নাতনি। ভূপাল ভোর রাতে গঙ্গার চরে গেছিল পাখি শিকার করতে। অব্যর্থ হাত। পাখির মাংস বড় নরম। সুস্বাদু খেতে। তুমি কখনও পাখির মাংস খেয়েছ?

—আজ্ঞে না। খরগোশের খেয়েছি। তা একবারই। আর খাওয়া হয়নি। বাবা বলেন, সজারুর মাংস নাকি খুব খেতে ভাল। তবে আমরা খাই নি।

তিনি বোধহয় আমার এত কথা শুনতে আগ্রহী নন। আসলে আমিই চাইছি ফের তিনি ডিভিসনের কথায় না এসে পড়েন! কারণ তিনি কৃতী পুত্রের জনক। দেশ বাড়ি ছেড়ে তিনিও এ দেশে এসেছেন। তবে আমার বাবার মতো লোটাকম্বল সার করে নয়। তাঁর পুত্র যে কত কৃতী এবং তার জন্য তাঁর কত গর্ব পাখি শিকার দিয়েই সেটা শুরু করেছেন। অব্যর্থ হাত বলে শেষ করলে বাঁচতাম। কিন্তু তিনি এখানেই বোধহয় থামবার পাত্র নন। বললেন, দুই নাতনির ইচ্ছা ডাক্তারী পড়বে। ইংরাজির উপর একটু বেশি জোর দেবে। ছোটটির মাথা খুবই পরিষ্কার। বড়টি পড়তে চায় না। তা এ বয়সে সবাই এক-আধটু ফাঁকি দেয়। দেবেই। ভূপালেরও ইচ্ছে মেয়েরা ডাক্তার হোক। এখানে ভাল ডাক্তারের অভাব। নরেশ বলল, তার হাতে ভাল ছেলে আছে। পড়াশোনায় খুব ভাল। খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করছে। এতেই আমার মনে ধরে গেল। তোমার বাবা কি করেন?

বাবা কি করেন এমন প্রশ্ন আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। বাবার কাজটা আমার কাছে খুব সম্মানজনক মনে হয় না। যজন যাজন বললে, শুধু যে বাবাকেই তাঁরা খাটো চোখে দেখবেন না, সঙ্গে আমাকেও তার দায় বহন করতে হবে—অভাবী পিতার সন্তান এমন কেউ ভাবুক বিশেষ করে দুই বালিকা, ঠিক বালিকা একজনকে বললেও অন্যজনকে বলা চলে না, শ্যামলা রঙ, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, লম্বা ফ্রক হাঁটুর নিচে নামানো এবং এ বয়সে ফ্রক পরা অবস্থায় একজন তরুণী এমন তরুণ অর্বাচীন গৃহশিক্ষকের কাছে বসে থাকলে অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে, বলি কি করে! তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। না বলে দেখছি পার পাওয়া যাবে না। সমস্ত রাগ নরেশ মামার উপরে গিয়ে পড়ছে। কোথায় বলবেন, তোমার বাবা কেমন আছেন, তোমরাও ত আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হও, তোমাদের বাড়ির আম কাঁঠাল যে না খেয়েছে সে জানেই না, পৃথিবীতে এত রকমারি আম কাঁঠাল থাকতে পারে—সে সবের মধ্যে না গিয়ে বাবা কি করেন জানতে চাইছেন। একবার বলতে ইচ্ছে হল বাবা হাতি বেচাকেনা করেন। আসলে বাবা কি কাজ করলে মর্যাদা রক্ষা হবে এটাই এখন মাথায় আসছে না। একজন পিতৃদেব তাঁর সন্তানকে এ হেন বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন আমার দুরবস্থা না দেখলে কারো মাথায় আসবে না।

—আজ্ঞে কিছু করেন না।

—কিছু না করলে চলে কি করে?

—আজ্ঞে চলে যায়।

আর তখনই আবার ছোট নাতনি হাজির।—দাদু এস না। দেখবে না!

তিনি ওঠার সময় হাতের তাগাতে রুদ্রাক্ষটি স্বস্থানে আছে কিনা যেন পরখ করে দেখলেন। অর্থাৎ পাখি শিকার করে পুত্র ফিরে এসেছে এটা তাঁর কাছে বড় একটা স্বস্তি। রুদ্রাক্ষটি বোধহয় তাঁকে সাফল্যের চূড়ায় তুলে দিয়েছে। এটি ঠিকঠাক আছে কি না অভ্যাসবশত দেখা। ঠিক থাকলে, সংসারের চাকা ঠিক মতো গড়াবে। খানাখন্দে পড়ে হোঁচট খাবে না।

মুশকিল হল, একজন গৃহশিক্ষক বাড়িতে উপস্থিত হলে ছাত্রছাত্রীর মনে চাঞ্চল্য কিংবা ভয় ভীতি যাই হোক অথবা কৌতূহল অন্তত একটা কিছু থাকা দরকার। এদের দুজনের দেখছি কিছুই নেই। আমরা কলোনিতে থাকি এমন খবর ওরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। কলোনিতে তাদের গৃহশিক্ষক থাকে কিনা এই প্রশ্নে ঘোর আপত্তিও উঠতে পারে তাদের মধ্যে। তবু যখন আমার নিতান্ত পুণ্যফলে গৃহশিক্ষক

নিযুক্ত করা হয়েছে তখন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ হলেও সম্ভ্রম দেখান দরকার। ওদের চোখে মুখে তার বিন্দুমাত্র রেশ নেই। ঘরটাতে কেউ নেই। ম্যানেজার মানুষটি একবার উঁকি দিয়ে দেখলেও না কে বসে আছে, কেন বসে আছে। আমরা ত অন্যরকমের। কেউ বাড়ি এলে ঘিরে ধরার স্বভাব। উঁকি দেবার স্বভাব। মা মায়া পুনু পিলু কেউ বাদ যাবে না।

দেয়াল-ঘড়িতে পেণ্ডুলাম দুলছে। সব বড় বেশি ঝকঝকে। দেয়ালে একটা দাগ নেই। সংসারে কোন দাগ লেগে থাকুক এরা বোধহয় পছন্দ করে না। এমন কি মেঝেতে সুন্দর কারুকাজ করা কার্পেট পাতা। একটা ছোট গোল টেবিলের উপর রজনীগন্ধার ঝাড়। ঘরে ভারি সুগন্ধ। আমি কি করি আর— খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছি। মেঝের কিউবিকগুলি, কখনও চৌকোনো, কখনও পাশা খেলার ঘুঁটি হয়ে যাচ্ছে। সামনে জানলা, পরে পুকুর,—তারপর টিনের লম্বা প্ল্যাটফরমের মতো সারি সারি ঘর। কেমন ঝমঝম শব্দ হচ্ছে অদূরে। তাঁত চলছে।

কিছুক্ষণ এ ভাবে একা বসে থাকার পর ভিতরটা কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, উঠতেও পারছি না। চলে যেতেও পারছি না। যদিও এ অবস্থায় যে কোন সুস্থ মানুষের উঠে পড়া স্বাভাবিক। ভেতরের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলল, কলোনির লোক। দাদু আর লোক পেল না! তবে নারী কণ্ঠস্বর নয়। তাহলে সবই যেত। যাদের পড়ার কথা তারাই যদি কলোনির লোক বলে, তবে আর ইজ্জত থাকে কি করে! খুবই অবজ্ঞার সামিল।

যাবার সময় দাদুর বলে যাওয়া উচিত ছিল, বোস। ওরা আসছে। আর পছন্দ না হলেও বলা উচিত ছিল, পরে কথা বলব নরেশের সঙ্গে। বেকুফের মতো এ ভাবে কেউ কাউকে বসিয়ে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়! লোকটা একা মঞ্চে চুপচাপ বসে থাকলে দর্শকরা হাসাহাসি করবে না! এমন কি ঢিলও ছুঁড়তে পারে। একটা সূত্র থাকবে তো, পরের ঘটনা কি ঘটবে না জানলে চলে। কেন জানি মনে হল, আমি বসে থাকলেও খুব অরক্ষিত অবস্থায় বসে নেই। অন্তরালে এমন গোপন কোন স্থান আছে যেখান থেকে আমি কি করছি না করছি সব দেখা যায়। নিরাপত্তার খাতিরে তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে রেখেছে। টেবিলের কলম-দানিতে বেশ দামী কলম। নেড়ে চেড়ে দেখার শখ হলেও হাত দিতে সাহস পাচ্ছি না। একেবারে অতীব সজ্জন সাধুর মতো মুখ করে বসে আছি। আর ভিতরে দাঁত কটমট করছি।

এ সময় সেই মহামান্য বৃদ্ধ মানুষটি ফের এসে বললেন, ওরা খাচ্ছে। তুমি বরং কাগজটা দেখ।

যাক, কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম বোধ তবে জন্মেছে।

—শ্যামাপ্রসাদ শুনছি কলোনিতে আসবেন।

—তাই নাকি?

আমার অবাক হওয়া দেখে বুড়ো মানুষটি ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, শ্যামাপ্রসাদ কে জান?

—আজ্ঞে জানি। স্যার আশুতোষের ছেলে।

—বেশ তবে খবর রাখ দেখছি। হিন্দু মহাসভার মিটিং হবে কলোনিতে। আমরা তাড়া খেয়ে এসেছি। এ দেশ থেকেও তাড়া দিয়ে ওদের খেদাতে হবে।

কেন এ কথা বলছেন, বলতে ইচ্ছে হল। ওদের বলতে রহমানদা-দের কথা হচ্ছে। খেদাতে হবে। খেদানোর ইঙ্গিতটি বেশ তিক্ত শোনাল আমার কাছে। কোন কথা বললাম না।

এবার তিনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গুরুজন, তাছাড়া আমার পিতৃদেবের আবদার, এঁরা তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সুতরাং সম্মান দেখাতে হয়। নিজেও উঠে দাঁড়ালাম। তিনি প্রথমে দশম শ্রেণীর ইংরাজি বইটা আমার সামনে খুলে ধরে বললেন, লুসি কবিতার সহজ ইংরাজিতে একটা সাবস্ট্যান্স লিখে রাখ—এই খাতায়। বেশ ভাল করে। আমার নাতনি যেন দশে অন্তত আট পায়। নোট তো আর দশ রকমের পাওয়া যায় না। এম. সেন না হয় জে. এল. ব্যানার্জী। সবাই ঐ মুখস্থ করে লেখে। আমি চাই আমার নাতনির সারমর্ম একেবারে নাতনির মতোই হবে। কেউ আর তার মতো লিখতে পারবে না।

লুসি কবিতা আমার পড়া আছে। এম. সেনের নোট সর্বস্ব আমার পড়াশোনা অবশ্য এখন কিছুই মনে পড়ছে না। বড়ই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে দশম শ্রেণীর

লুসি কবিতার সারমর্ম বিদেশী ভাষায় লেখা সম্ভব কি না একবার বুড়োমানুষটিকেই প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে হল। এবং আমি বেশ ঘামছি। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে, কিন্তু কুড়ি টাকা—মার হিসেবে এক মণ চাল হয়ে যায়। বাবার সংসারে এটা কত বড় সুরাহা এরা তা বুঝবে না। পাতা উল্টে অন্য কি আর কবিতা এবং গদ্য আছে দেখছি। আসলে ভান করছি—এই লেখা শুরু হল বলে। তিনি ততক্ষণে ফের আরও দুটি বই টেনে, তার প্রশ্নোত্তর লিখে দিতে বলে আজকের মতো নিষ্ক্রান্ত হলেন। পরের প্রশ্নগুলি আমার পক্ষে খুবই সহজ। বিষয় বাংলা এবং ভূগোল। খাতায় যত্ন করে উত্তর লিখে, অন্য একটি কাগজে লুসি কবিতা টুকে পকেটে গোপনে পুরে ফেললাম। এবং দেখলাম ঘড়িতে নটা বাজে। ছাত্রীদের দেখা নেই। মুখ তুলতেই দেখি আবার রুদ্রাক্ষ জড়িত মহামান্য সফলকাম ম্যানেজারের পিতৃদেব হাজির। মনে মনে মহামান্য সফলকামই মনে হল দাদুকে। টেবিলের কাছে কোঁচা দুলিয়ে এলে, খাতা দুটো এগিয়ে দিয়ে বললাম, হয়েছে। লুসি কবিতা সম্পর্কে বললাম, বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসব।

—ঠিক আছে তাই নিয়ে এস। অর্থাৎ এবার আমি যেতে পারি। ছাত্রীরা এ মুখো হলই না। ঠিক বুঝলাম না, পড়াশোনা ওদের সরাসরি না, বুড়োর মাধ্যমে। এর আগেও দুজন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল—তারা তিষ্ঠোতে পারে নি। আমি তিন মাসের মধ্যে তৃতীয়। তৃতীয় গৃহশিক্ষক ঘর থেকে বের হলে মহামান্য সফলকাম দরজাটি অতি সযত্নে বন্ধ করে ফেললেন। আমি একা, কেমন এক নির্জন ভূখণ্ডের মানুষ, বাইরে এসে হাওয়া লাগতেই ঘাম শুকিয়ে গেল। কলার টেনে নিজেকে সাইকেলে করে নরেশ মামার কাছে। বললাম, মামা হবে না।

—হবে না কেন রে!

সব শুনে বললেন, মনমোহনদা কি ভাবে নিজেকে বুঝি না! আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এই হয়। কি করবি! টাকাটা তো দরকার। কবিতাটা রেখে যা, আমি সারমর্ম লিখে রাখব। এই করে চালিয়ে যা, দ্যাখ কি হয়।

বাড়ি এলে মা বলল, ম্যানেজার তোর সঙ্গে কথা বলল, প্রণাম করলি!

আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল মা'র কথায়। কিছু বললাম না।

মেজাজ আমার খুবই অপ্রসন্ন। মানুষ এমন হয় এর আগে আমি জানতাম না, ব্যবহার এমন হয় জানতাম না। কেমন যেন বলতে গেলে অপমানিত হয়েই ফিরে এসেছি। সফলকাম মহামান্য আমাদের কলোনির লোক ভেবে বড় বেশি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। মা'র প্রশ্নে আরও বেশি রুষ্ট হয়ে উঠেছি। আমি কথা বলছি না দেখে উঠে এল। বলল, কিরে ম্যানেজার তোর সঙ্গে কি কথা বলল!

—কথা বললে কি হাতি-ঘোড়াটা হবে মা!

আমার এমন তিক্ত জবাবে মা হতভম্ব হয়ে গেল।

মা কেমন কাঁচুমাচু গলায় বলল, না ভেবেছিলাম দেশের লোক। তোদের লতায় পাতায় আত্মীয়ও হয়। তোর বাবার কথা যদি কিছু বলে।

কেন জানি মা'র অসহায় মুখ দেখে আমার আর রাগ থাকল না। মা যাতে খুশি হয় সে ভেবেই জবাব দিলাম—বলেছেন বাবা কেমন আছে। কতদিন দেখা হয় নি। একবার যেতে বলেছেন। পরেই ভাবলাম, না যেতে বলেছেন বলা ঠিক হবে না। কারণ বাবা জানতে পারলে, সপরিবারে বেরিয়ে পড়বেন মিলের উদ্দেশে। একটু ঘুরিয়ে বললাম, যেতে বলেন নি ঠিক, গেলে খুশি হবেন এমন বলতে চেয়েছেন। আরে এ তো বাবার পক্ষে আরও মারাত্মক খবর। গেলে খুশি হবেন যখন, তখন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করতেই হয়। শেষে না পেরে বললাম, ওরা বড়লোক মা। আমরা কারা, বাবা কে, কোন খোঁজ-খবরই আর ওদের দরকার নেই। পড়ানো নিয়ে কথা. বাবা বাজার করে তখন হাজির বাড়িতে। বারান্দায় থলে রেখে বললেন, মনোমোহন কাকাকে বললি না বেড়িয়ে যেতে। সবাইকে প্রণাম করেছিস তো?

—তুমি থাম তো বাবা। তোমার মনোমোহন কাকা আর কাকা নেই—এমন বলার ইচ্ছে। হলে কি হবে, বাবাকেও এসব আর বলা যায় না। বললাম, আসবেন বেড়াতে। বৌমা সহ। নাতনিদের সহ।

আসবেন না মানে! আমাদের বাড়ি এলে তো যাবার নাম করত না। না এসে পারে! তোকে কি খেতে দিল!

—লুচি সন্দেশ বেগুনভাজা পরোটা রসগোল্লা।

—লুচি পরোটা দু'রকমেরই দিল!

—আরও কয়েক রকমের দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি। পেটে না ধরলে খাই কি করে!

মায়া বলল, দাদা আমি তোর সঙ্গে যাব একদিন।

—যাস। বলে আর দাঁড়ালাম না। সাইকেলটা নিয়ে জীবনের সব অপমান থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাদশাহী সড়কে উঠে গেলাম। রোদে ঘুরলাম। মাথাটা দিয়ে আগুন ছুটছে। ছুটুক। তবু আজ যত খুশি রোদে টো টো করে ঘুরব।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে/ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে/ উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে/তবুও কাউকে আমি পারি নি বোঝাতে/ সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়, আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

মুকুল বলল, কি বিস্ময় ছত্রে ছত্রে।

আমি বললাম, কার কবিতা?

মুকুল গাছের নিচে শুয়ে পড়ল। বলল, বল না কার হতে পারে।

কবিতা আমি ঠিক চর্চা করি না। অভাবী পিতার পুত্র বই পত্র কোথা পাব। তবু দু-একবার কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়েছে রায়বাহাদুরের নাতনি মিমির পীড়াপীড়িতে। মনেও রাখতে পারি না। মনের মধ্যে এত অপমানের জ্বালা বয়ে বেড়ালে বিলুরই বা দোষ কি! মুকুল পারে, তার খাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে সে কবিতা লিখে আমাকে শোনায়। মানুষের তরে এক মানুষের গভীর হৃদয়—এমন শব্দমালা আমার মধ্যে কেমন ঝড় তোলে। শহরের ইঁট কাঠ, ঘরবাড়ি, বালিকার নরম জানু এবং লতাপাতা আঁকা ফ্রকে যেন রয়ে যায় গভীর এক সুষমা। মুকুল সহসা উঠে বসল ফের, কিছু ভাল লাগে না। আমার কিছু ভাল লাগে না। কি যেন করতে হবে। কে যেন বলে, এই বসে আছ কেন, কিছু কর। তখন কবিতা পড়ি। যা কিছু এখন চারপাশে সবই যেন আমার হয়ে কথা বলছে, মুকুল, বসে আছ কেন? যাও, দেখ হৃদয়ের গভীরে সে তোমার অপেক্ষায় বসে। বলেই শেষে হতাশ গলায় বলল, চৈতালীর সঙ্গে আজও দেখা হল না।

—কী গভীর উন্মাদনা ছত্রে ছত্রে। আমি যদি এমন কবিতা লিখতে পারতাম। কথাটা বলে মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক। বড় ব্যর্থ প্রেমিকের মুখ।

তবু মুকুল আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য বলল, পারবে না কেন। কত সুন্দর তোমার সেই লাইনটা শহর ঘুমিয়ে আছে—আমি জানি একজন ঘুমায় নাই। শুয়ে আছে জানালায় মুখ রেখে। চাঁদের ওপিঠে কলঙ্ক কালি, সে দেখে একফালি রোদে।

মুকুল আবার আবৃত্তি করল, তবু অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—সিন্ধুর রাত্রের জল আনে—আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ; কেমন অনন্যোপায় হওয়ার আহ্বানে / আমরা আকুল হ'য়ে উঠে / মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে/ জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায় / যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

বিকেলের ঝড়ো হাওয়ায় আমরা বসে আছি। আমাদের চোখ বিস্ফারিত, কোথায় যেন যাওয়ার কথা আছে আমাদের। বিকেল হলেই সাইকেলে আমরা চলে যাই নিমতলা পার হয়ে। বাদশাহী সড়কের পাশে নিচু জমির ছায়ায় বসে প্রকাণ্ড এক ঝিলের ওপারে চাষীদের বীজ রোপণ দেখি। আমি বসে থাকি। মুকুল একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে যায়। সব দুঃখ অপমান আমাদের কে যেন নিমেষে হরণ করে নেয়।

তারপরই সহসা মুকুল বলল, কি ব্যাপার বল তো, কদিন থেকে মুখ ভার দেখছি তোমার?

আমিও এবার শুয়ে পড়লাম। ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। হাত পা ছড়ানো। দাঁতে ঘাস কাটছি। মাথার উপর নিরন্তর আকাশ। আর মনের মধ্যে অপমানের ঝড়। আত্মরক্ষার উপায় যেন খুঁজে পাচ্ছি না। মুকুলের সঙ্গে ঘুরলে আমার কেমন মনটা হাল্কা লাগে। কি ভাবে সে যেন আমার গোপন কষ্ট সব টের পায়। কলেজের শেষ দিকে সে আমার সঙ্গে একদিন যেচে আলাপ করতে এল। বলেছে, কলেজ ম্যাগাজিনে তোমার কবিতাটা দারুণ হয়েছে। ওকে বলতে পারি না—ওটা আমাকে ভয় দেখিয়ে লেখানো হয়েছে। ওটা না লিখলে কালীবাড়ির পুরোহিত করে আমাকে সবাই ছাড়ত। বলতে পারা যায় রায়বাহাদুরের নাতনি মিমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করে লিখিয়েছে। এতে আমার কোন হাত ছিল না। কিছুই জবাব না পেয়ে, সে কেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, তোমার হবে।

আমি বলেছিলাম, হবে মানে?

• —তোমার চোখ বলে হবে।

—হওয়ার কথা কি চোখে লেখা থাকে!

—লেখা থাকে। সেই থেকে আমার কি হয়েছিল, বাড়ি এসে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে বসেছিলাম। চোখে এমন কি আছে যা দেখে মুকুল বলতে পারে, হবে। আমি ঠিক বুঝি না। একদিন তারপর মুকুল আমাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে বলল, কথা আছে।

একটা দেবদারু গাছের নিচে সে আমি বসলাম। সে কেমন সংকোচের সঙ্গে বলল, দুটো কবিতা লিখেছি শুনবে!

আমি বললাম, তোমার ইচ্ছে হয় কবিতা লিখতে।

মুকুল হা হা করে হেসে দিয়েছিল। বলেছিল, যত অপমান সব মিছে, যদি পারি দিনান্তে কোনো অস্তগামী সূর্যের রঙ ফোটাতে।

কবিতা লিখলে সব অপমান মুছে যায়? আমার প্রশ্ন!

বারে, যায় না? যত দূর সেই অগাধ স্বার্থপরতা/ যত দূরেই যাক, একদিন থাকে না তার কোলাহল / সে হয় অবনত মৃত্যু তীক্ষ্ণ সুধা / ফুল যদি ফোটে, ফুটে থাকে সেই আমার ঈশ্বর / শেষ বিকেলে সে যদি হেঁটে যায়—আমার প্রতিমা/ প্রতিমার মতো দু হাতে তার থাকে করবদ্ধ অঞ্জলি / আমার সব অপমান মিছে / সে আছে বলেই বেঁচে থাকি/ বাঁচি—জীবন বড় দুরন্ত বালকের হাতছানি।

কী সুন্দর কবিতা। উচ্ছ্বাসে সেদিন ফেটে পড়েছিলাম।

তারপর থেকেই কী যে হল জানি না, মুকুল এক সকালে আমাদের বাড়ি চলে এল। থাকল খেল। গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াল। মাকে মাসিমা, বাবাকে মেসোমশাই এবং যেন কতদিন থেকে বাবার এমন বাড়িঘরে সে আসবে বলে প্রতীক্ষায় ছিল। কলেজের যখন যা নোট আমার জন্য করে রাখত। আমাদের অভাবের সংসারে বই কেনা বাড়তি খরচা সে সেটা টের পেয়ে যখনকার যে বই দরকার দিয়ে গেছে। বাড়িতে নিয়ে গেছে। তার দাদাকে বলেছে, জান, বিলু কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছে। কি আশ্চর্য মায়াবী কবিতা। এটা এমন একটা কাজ যেন আমি ছাড়া আর কেউ পারে না। বৌদিকে ডেকে বলেছে, তুমি দেখতে চেয়েছিলে—এই আমাদের বিলু।

মুকুল বোধহয় একটু বেশি বেশি করেই আমার সম্পর্কে তার বৌদিকে বলে রেখেছিল। দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। পি ডবলু ডির কোয়ার্টার। দাদা তার সরকারী অফিসে কাজ করে। বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। পাশে মাঠ। মাঠ পার হলে, স্টেশনে যাবার রাস্তা। চৈত্রের দুপুরে মাতাল হাওয়ায় আমরা তোলপাড় হতে থাকলে, বৌদি হাজির। কাপে চা। কখনও ডিমের ওমলেট। টোস্ট। যখনকার যা।

মুকুলের ঘরে বসে আড্ডা মারি। কত অর্থহীন কথা হয়। এরই মধ্যে একদিন বলেছিল মুকুল, জান একটা ভাল কবিতা লিখতে পারলে অনেক ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এ সব আমি ঠিক বুঝি না। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না। কেমন ফাঁপরে পড়ে যাই। কবিতা লেখার ব্যাপারে বলি, ও হবে না আমার। তোমাকে নিয়ে আমার ঘুরতে শুধু ভাল লাগে।

মুকুল বলেছিল, তবু লেখ কিছু।

টিউশনি করতে গিয়ে রোজ যে অপমানিত হচ্ছি আজ মুকুলকে সব খুলে বললাম।

মুকুল শুনে বলল, এই অপমানের জবাব একটাই। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। নানা রকম স্বপ্নের জলছবি বোনা হতে থাকে। চুপি চুপি মুকুল একদিন বলল, একটা কবিতা কলকাতার কাগজে পাঠিয়েছি। ওটা যদি ছাপা হয় কী না হবে! তুমি একটা লেখ। তোমারটাও পাঠিয়ে দেব।

—কি হবে পাঠালে!

—বা, কত লোক জানবে! কত লোকে আমাদের নাম জানবে!

জীবনের এ দিকটা আমি আদৌ ভেবে দেখিনি। বললাম, আচ্ছা তুমি বল, মেয়ে দুটোর সব টাসক দাদু দিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে পারলাম না ওদের সঙ্গে। রাগ হয় না!

—দেখতে কেমন!

—দেখার কথা বলছি না। এটা কত বড় অপমান বল।

মুকুল বলল, ওরা কি ভাবে, তুমি ওদের খেয়ে ফেলবে!

—ঠিক জানি না। আসলে দাদুটা নষ্টের গোড়া। বাড়িতে এমন হাল ফ্যাশন, আর উঠতি মেয়ে দুটোর বেলায় এত রক্ষণশীল।

মুকুল বলল, এক কাজ করবে?

—কি!

—একটা মাসিক পত্রিকা বের করব। তুমি সম্পাদক হবে। তুমি কাগজের সম্পাদক হলে ওরা আর হেলাফেলা করবে না।

—যা, হয় না। ওসব আমি বুঝি না।

—কাগজটা করতে বেশি খরচ পড়বে না। যারা লিখবে তারা পয়সা যোগাবে। বেশি তো লাগবে না। আমার বৌদি জান, কলেজে পড়ার সময় কবিতা লিখত। বৌদিকে পার্টনার করব। তোমাকে কিছু দিতে হবে না। রাম নিখিল ওদের কাছে প্রস্তাবটা রাখি চল। আর তোমার রায়বাহাদুরের নাতনি যদি রাজি হয় তবে ত কথাই নেই।

কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। বলি, ওর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। ওর দাদু আমাকে কালীবাড়ির পূজারী বানাবার তালে ছিল। সেটা না হওয়ায় তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। পরী আমার সঙ্গে শেষ দিকে কথাও বলত না।

আমি পরী বলি, মুকুল ডাকে রসময়ী। আসলে কলেজে রায়বাহাদুরের নাতনি নিজের নামটা হারিয়ে ফেলেছিল। জনে জনে আলাদা নামে ডাকত। আমি শেষ পর্যন্ত পরী নামটাই জুতসই মনে করেছি। যদিও ওর আসল নাম পরী নয়, মিমি, মৃন্ময়ী এবং দীপান্বিতা।

বললাম, পরীকে সঙ্গে পেলে ভাল হয়। তবে কি জান ওর কাছে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। তাছাড়া পত্রিকা বের করে হবেটা কি!

মুকুল বলল, হবে, সব হবে। একটা নামও ঠিক করেছি। বলব কি না ভাবছি।

—নাম ঠিক করেছ, বলবে না মানে!

—না, এই আর কি। চৈতালী নামটা কেমন।

চৈতালীকে মুকুল ভালবাসে। চৈতালী ভালবাসে কি না, সেটা আমাদের জানার বিষয় নয়। আমরা এখন সুন্দর মেয়ে দেখলে ভালবাসতে পারলেই খুশি। মুকুলও খুব খুশি। সে চৈতালীকে ভালবাসে। এত গুণ যে নারীর, তাকে না ভালবেসে থাকা যায় না। একবার নাকি চৈতালী তাকে চোখ তুলে দেখেছে। এই দেখা থেকেই তার ভালবাসার জন্ম। এবং কবিতার জন্ম।

একই পাড়ার না হলেও বেশি দূরে নয় চৈতালীদের বাড়ি। ওর দিদি স্কুল শিক্ষয়িত্রী। এক দিদি গার্লস কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপিকা। এক দিদি ল্যালা ক্ষ্যাপা। মুখ দিয়ে লালা ঝরে সব সময়। আমরা বিকেল হলে, একবার কি দুবার বাড়িটার পাশ দিয়ে সাইকেলে রাউণ্ড মারি। মুকুল অন্তত সারাদিনে একবার চৈতালীকে না দেখতে পেলে কেমন মনমরা থাকে। কিছুদিন থেকে এই দেখার কাজটিতে মুকুল আমাকে সঙ্গে নিতে পছন্দ করে। আমরা অধিকাংশ দিন চৈতালীকে দেখতে পাই না। লম্বা বারান্দায় ল্যালা ক্ষ্যাপা দিদিটা দাঁড়িয়ে কেবল দুলতে থাকে। গায়ে লম্বা সেমিজ পা পর্যন্ত। একজন সুন্দর তরুণীকে দেখতে এসে এমন কুৎসিত দৃশ্য দেখলে কার না ক্ষেপে যাবার কথা।

মুকুল ক্ষেপে গিয়ে বলে, চৈতালী আমাকে ভালবাসে না। ভালবাসলে দিদিটাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখে!

কখনও দেখা হয়ে গেলে মুকুল কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঐ আসছে। দাঁড়াও না।

মুকুল তখন কেমন দাঁড়াতেও ভয় পায়।

বলি, কোন কথা হল! ওর দিদি ত তোমার বৌদির বন্ধু। কি করে কথা হবে বল! সকালে রেয়াজ। টাউন হলের ফাংশানে কি মাইরি গাইল। সেই গানটা আজকাল মুকুল সব সময় গায়। মুকুলের সুর তাল লয় চমৎকার। সে গুন্‌গুন্ করে গায় যখন, তখন বোঝাই যায় না, তার ভালবাসায় দুঃখ আছে। তারপরই তার হাহাকার হাসি, চল, যত সব মন খারাপের ব্যাপার। আমার বয়ে গেছে। কথা তো আমার ভালবাসার। আমি যখন ভালবেসেছি তখন আর কথা কি। চৈতালী ভালবাসল না বাসল বয়ে গেল!

আমি বললাম, এ হয় না।

—হবে না কেন! তুমিও ভালবাস কাউকে। বুকে হাত দিয়ে বল। উপেন রায়ের ছোট মেয়েকে দেখে বলেছিলে না, কি লাভলি দেখতে! চোখে যেন সেই বিদিশার নিশা!

মুকুল টের পায়, এ বয়সে শুধু ভালবাসলেই পরমায়ু বাড়ে। আর এইটুকুই কখনও কোনো মাসিক কাগজ বের করা, কিংবা কবিতা লেখাতে পরিপূর্ণতা পায়। বললাম, চৈতালী নামটা সত্যি ভারি সুন্দর এ নামে কাগজ বের হলে শহরে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

দুজনে সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যাই তখন। মুকুল কেমন আনমনা গেয়ে ওঠে, দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

সাইকেল চলে। আমরা পাশাপাশি দু-জন। পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প পার হয়ে পঞ্চানন তলার দিকে যাই। আমাদের চুল ওড়ে। লাল সড়কে ধুলো ওড়ে। মুকুলের গলা ভারি হয়ে আসে—চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই....। ভাকুড়ির মোড়ে এসে আমাদের গতি স্তব্ধ হয়। সে নামে। আমিও নামি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রিয় নারীর সন্ধান চলে। মুকুল তখনও গায়, এত ভালবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই!

মুকুলের সেই বড় বড় চোখে কবিতার মতো তখন স্বপ্ন ঝুলে থাকে। ডাকি, মুকুল।

—হুঁ।

—কাগজটা যে করেই হোক বের করতে হবে।

সে আমার দিকে তাকায়। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, কাগজটাকে আমরা বাঁচাবই। কাগজ বের করা ছাড়া তাকে অবাক করে দেবার মতো আমাদের আর কোন সম্বল নেই।

তা ঠিক। কারণ আমাদের দুজনের পরীক্ষার নম্বর ভাল না। আমরা দুজনে থার্ড ডিভিসন সব কাজে। চৈতালী কিংবা অন্য তরুণীরা সব ফার্স্ট ডিভিসন, সব বিষয়ে। পড়ায়, গানে, রূপে। আমাদের হাতে এটাই যেন ক্ষুরধার অস্ত্র হয়ে ওঠে, একটা কাগজ বের করতে পারলে, মিলের ম্যানেজার সাহেব থেকে আরম্ভ করে চৈতালীর অহংকার কাচের বাসনের মতো টোকা মেরে ভেঙে দিতে পারব। মিনিরও। বললাম, কাগজ বিক্রির কি হবে?

—কেন আমরা নিজেরা করব। তমলুকে তরুণ আছে। ওকে লিখব। সে যেন বিশ ত্রিশ কপি বিক্রি করে দেয়। আমরা রোজ স্টেশনে দাঁড়িয়ে বলব, চৈতালী নিন। কবিতা গান নাটক সব এতে পাবেন। দাম করব চার আনা। সুন্দর মলাট—নিখিল মলাটে ছবি আঁকবে। মফঃস্বল শহরে এটা কত বড় খবর হবে বুঝতে পারছ না।

আমার সব অপমান নিমেষে কেমন উবে গেল। আত্মপ্রকাশের এই সুযোগ হেলায় ছাড়া যায় না। ভিতরে যে মিনি থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজারের অপমানের জ্বালা আগুন হয়ে বিশ্ব সংসার অর্থহীন করে তুলেছিল মুহূর্তে আমাদের কাছে তা নতুন এক গৌরবময় অধ্যায় খুলে ধরল।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাবা জেগে থাকেন। সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ শোনার জন্য তিনি উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। আমি ফিরলে মনে হয় বাবার ঘরবাড়ির আবার ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেছে। সাইকেল ঘরে তোলার সময় শুনতে পাই বাবার গলায় অভিযোগ, এত রাত করে ফিরিস না! রাস্তাঘাট

ভাল না। সেদিন টিকটিকি পাড়ার কাছে ছিনতাই হয়েছে। পঞ্চাননতলা জায়গাটা ভাল না। তোর মা সেই কখন থেকে জেগে আছে।

বাড়ি ফিরলে টের পাই কেউ ঘুমায়নি। মার গলা শুনতে পাই, তোদের এত কি যে বাইরে কাজ থাকে! রাত হয় না! এত রাতে ফিরলে চিন্তা হয় না। মাকে বাবাকে বোঝাই কি করে আমার ভেতরে অহরহ এক জ্বালা আমাকে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে মারছে। আমি তো আর তাঁদের আগের বিলু নেই। আমারও যে কিছু ভাল লাগে না, সব আছে অথচ কি যেন নেই, এর থেকে উদ্ধার পেতে চাই।

সকালে উঠে দেখি, মায়া একখানা পূজায় পাওয়া কোরা লালপেড়ে শাড়ি পরেছে। মায়াকে শাড়ি পরলে বেশ বড় বড় লাগে দেখতে। মায়া ফ্রক পরুক বাবার পছন্দ না। মা'র সঙ্গে এই নিয়ে বাবার কথা কাটাকাটি গেছে কদিন। বাবা মানতে রাজি না। শাড়ি পরলে বাবার ধারণা, মেয়েদের মধ্যে যে নারীত্ব আছে তা এক ধরনের মহিমা পায়। উজ্জ্বল, সপ্রতিভ এবং বড় হয়ে ওঠার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে যে নারী-মহিমা আছে তা প্রকাশ পায়। বাবা এ জন্য শুভদিন দেখে রেখেছেন। আজ বোধ হয় সেই শুভদিন। মায়ার বয়স ত বারোও পার হয়নি। এ বয়সে মেয়েরা শাড়ি পরলে মায়ার বয়সটা ধরা পড়ে যায় ভেবেই বোধ হয়, শাড়ি পরার ব্যাপারে মা'র মত পাওয়া যায় নি। তবু মা আজকাল বুঝেছে, বাড়ির একজন অভিভাবক না থাকলে সংসারে শৃংখলা থাকে না। বাবার কথাই শেষ কথা।

মায়া শাড়ি ভাল করে পরতে পারে না। মা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। কেমন জবু থবু দেখাচ্ছিল। সকালে স্নান করে শাড়ি পরায় ভিজা চুল জড়ান। ওর নাক তীক্ষ্ণ। শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখ, এক মাথা ঘন চুল। বিনুনি খোলা। ভিজা চুল ছড়ানো পিঠে। শাড়ি পরে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছিল। কেমন সব সময় আড়ালে থাকছে। আজ থেকে মায়া ঠাকুর ঘরের পূজার আয়োজনের ভার পেয়েছে। বাবা সকালে স্নান করে এসে মায়াকে বলল, মাকে প্রণাম করেছ?

কেমন আনত মুখে মায়া দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর যে তরলমতি এক বালিকা ছিল, শাড়ি পরায় তা নিমেষে উবে গেছে। ভারিক্কী এবং গম্ভীর লাগছিল দেখতে। শাড়ি পরলে মেয়েরা কি বুঝতে পারে—তারা এবারে মা হয়ে যাবে। মায়ার আচরণে কেমন তা ফুটে বের হচ্ছে। বাবা বললেন, প্রথম শাড়ি পরলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। মাকে, দাদাকে....।

মায়া মাকে প্রণাম করল, বাবাকে করল। তারপর আমার পায়ের কাছে টুপ করে গড় হল। আমরা কুলীন এবং পুরোহিত বংশ বলে প্রণামটা সেই কবে থেকে পেয়ে আসছি। এতে আমাদের কোন লজ্জা সংকোচ থাকে না। প্রাপ্য বলে ধরে নিই। মায়া উঠে দাঁড়ালে দেখলাম, কপালে সুন্দর লাল টিপ পরেছে। বড় পবিত্র এবং মায়াবী মুখ তার। যেন বলছে, দাদারে, আমরা সবাই কেমন বড় হয়ে যাচ্ছি দেখ। বাবা খুব প্রশান্ত গলায় আজ কথাবার্তা বলছেন।

মায়া শাড়ি পরে আছে বলে বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করছে না। গোপাল করের মা এসেছিল, শুভ দিন দেখতে। তার মেয়ে স্বামীর কাছে যাবে—একটা দিনক্ষণ দেখে না দিলে হয় না। বাবা থামে হেলান দিয়ে পঞ্জিকা দেখছেন। গোপাল করের মা মার সঙ্গে কথা বলছিল। বড় সহজ সরল কথা। কি কি রান্না হবে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল মাকে। মাও কি আজ রান্না করবে গোপাল করের মাকে বলে যাচ্ছিল। সংসারে রান্না যে সন্তান সন্ততির খাওয়ার তৃপ্তি সৃষ্টি করে—দু এক রকমের বেশি পদ করে খাওয়াতে পারলে যে ভেতরে এক অনাবিল সুখের সন্ধান পাওয়া যায়, এই দুই নারীর কথাবার্তা না শুনলে তা বোঝা যায় না। স্নেহ, মায়া মমতা সব এতে যেন উজাড় করে দিতে পারে মা।

একটা থালায় কিছু কচি পাটের ডগা। একটা থালায় দুধ কচু কাটা। কিছু গন্ধপাদালের পাতা, থানকুনি পাতা, কাঁচকলা আর বেগুন কাটা পেতলের গামলায়। মটর ডাল যত্ন করে ধোওয়া। কচি আম কাটা একটা পাথরবাটিতে। দেখলেই বোঝা যায় পাট পাতার বড়া, গরম মুচমুচে পাতে দেবে মা। শুকতোনি হবে। কচুর ডগা দিয়ে মটর ডাল। কাচকি মাছ সরষে বাটা দিয়ে, আর কি লাগে! এই রান্নার জন্য হয়ত রাতে মা শুয়ে শুয়ে কত ভেবেছে—কাল কি হবে! বাড়িতেই প্রায় সব পাওয়া যায়। কেবল সকাল বেলায় মা'র কাজ ঘুরে ঘুরে এ সব সংগ্রহ করা।

সকাল হলে মা'র সঙ্গে মায়াও ঘুরে বেড়ায়। শাক পাতা, কাঁচকলা, থোড় কিংবা মোচা সংগ্রহ। রোজ একই রকম খেতে দিলে সন্তান সন্ততি নিয়ে আর বাড়ি ঘরে থাকা কেন। আজ একরকম, কাল আর একরকম। মা তার জীবনের সার্থকতা এরই মধ্যে আবিষ্কার করে বড় বেশি তৃপ্তি পায়।

খেতে বসলে, আমরা চারজন। মায়ার কাজ নুন জল দেওয়া। মা পাতে দেবে আর লক্ষ্য রাখবে আমরা কতটা পরিতৃপ্ত হচ্ছি মা'র হাতের রান্না খেয়ে। কোন কারণে যদি নুন ঝাল একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় মা'র কি আপসোস। যেন দিনটিই তার মাটি হয়ে গেল। —আর একটু দিই। এই খেয়ে পেট ভরেনি! সেকি গো! আর দুটো পাট পাতার বড়া দেব? কাঁচা লংকাটা মেখে নাও না। সরষেটা জান ভাল না। ঠিক ঝাঁজ হয় না। খেতে বসলে মা'র এ সবই অভিযোগ থাকে শুধু। একজন মা যে কত দরকারি, সংসারে খেতে বসলে আমরা সবাই এটা বেশি যেন টের পাই।

খেতে খেতে মনে হয় জীবনে এমন মাধুর্য না থাকলে আমরা এত ঘরবাড়ির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতাম না। কোথাও দু-একদিনের জন্য গেলে কিংবা থাকলে সেটা আরও বেশি করে মনে হয়। কালীবাড়ি থাকতে, ছুটি ছাটায় কিছুতেই লক্ষ্মী কিংবা বৌদি আটকে রাখতে পারত না।

এখন গ্রীষ্মের দুপুর। কত রকমের পাখির কলরব বাড়িটাতে। গাছপালায় ঘেরা এই বাড়িঘর দেখে কে বলবে, আমরা প্রবাসে আছি। আমরা ছিন্নমূল। দেশবাড়ির স্মৃতি আমাদের কাছে যেন অন্যজন্মের কথা। খাওয়া হলে, মাদুর নিয়ে গাছতলায় গড়াগড়ি দেওয়ার হুটোপুটি পড়ে যায়। পুনুটা এসে আমার পিঠে এক পা তুলে শুয়ে থাকবে। পিলুটা বলবে, সর না দাদা, আমি একটু শুই। শুয়ে থেকেও স্বস্তি থাকে না। কখন টুপ করে হাওয়ায় আম পড়বে অপেক্ষায় থাকি। সারাদিনই চলে এমন। মা'র কান বড় সজাগ। পেছনের জমিটাতে বোম্বাই, রাণীপসন্দ আমগাছ থেকে টুপ করে আম পড়ে। মা ঠিক শুনতে পায়—যা মায়া দেখ, আম পড়েছে। সে কোঁচড়ে করে নিয়ে আসে। এত আম জামের খবর পেয়ে কোথাকার সব কাচ্চা বাচ্চা ঘুরে বেড়ায় বাড়িটার আনাচে কানাচে। পাখি, কাঠবেড়ালি, হনু, যেন প্রাণী জগতের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়—বড় ফলবতী সব বৃক্ষ। বাবা কাউকে তেড়ে যান না। শুধু হনুর উৎপাত বাড়লে কোটা নিয়ে পিলু এ-গাছ ও-গাছের নিচে ছুটে বেড়ায়। আর মা'র কাজ বাড়ে। সব আম সাজিয়ে রাখা তক্তপোষের নিচে। কোন্‌টা কোন্ গাছের, কেমন খেতে, সব মা'র মুখস্থ। বাবা বিকেল হলেই বারান্দায় বসবেন আমের ঝুড়ি নিয়ে। পাশে এক বালতি জল। আম কেটে সবার হাতে দেওয়া বাবার এক যেন আলাদা আনন্দ।

মাদুরে আমি শুয়ে, পিলু গাছে উঠে আম পাড়ছে। মায়া মা, আম ঝুড়িতে তুলে রাখছে—বাবা লিচু গাছের উপর জাল বিছিয়ে দিচ্ছেন যাতে হনুতে কচি লিচু নষ্ট না করে যায়। দুটো গাছেই ঝাঁপিয়ে লিচু এসেছে। আম শেষ হলে লিচু, লিচু শেষ হলে জাম, তারপর জামরুল। শেষে তাল। তালের কচি শাঁস বিকেলের প্রচণ্ড গরমে কে না খেতে ভালবাসে! ফলে এ কটা মাস আমাদের বাড়িটা কেমন আরও বেশি সকলের নজর কাড়ে। কেউ আসে দুটো আম নিতে টক খাবে বলে, কেউ আসে, পাকা আমের আশায়। বাবা দিয়ে থুয়ে খুশি থাকেন। মা কিন্তু এটা পছন্দ করে না। এমন কি একবার বাবার বেশি বাড়াবাড়ি দেখে মা আম মুখেই দিল না। আজকাল এর জন্য বাবা মাকে বলেই দেন। কখনও মা না থাকলে গোপনে দিয়ে বলবে, যা পালা। পাইকার আসে যদি গাছ বিক্রি হয়। বাবার এক কথা, সবাই খাবে বলে হয়েছে। এ তো বিক্রির জন্য লাগানো হয়নি বাপু।

আর এ-সময়েই পিলুর মগডাল থেকে চিৎকার, দাদা, মুকুলদা আসছে। সঙ্গে আরও কারা যেন। মায়া কথাটা শুনেই দৌড়ে ঘরে পালাল। ও শাড়ি পরেছে নতুন। ওদের সামনে বের হতে তার লজ্জা। মা বলল, মুকুলের জামাইবাবু কি একটা চাকরি দেবে বলেছিল, তার কিছু বলল।

মাকে বোঝাই কি করে চাকরি পাওয়া বড় কঠিন। জানা-শোনা না থাকলে হয় না। তবে এখন আমি একটা চাকরি নিতে পারি। মুকুলের জামাইবাবু বলেছেন স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নেবার একটা পরিকল্পনা সরকারের আছে। প্ল্যান এপ্রুভ হয়ে গেলে তিনি আমার জন্য চেষ্টা করবেন।

নিখিল রাম প্রণব সুধীন মুকুলের সঙ্গে আসতে পারে। মুকুল আমাদের ঘরবাড়ি এবং গাছপালার এমন এক অলৌকিক গল্প করেছে, যেন ওরা না এসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে তার মেসোমশাইটির। সে তো জানে না, পুত্রের বন্ধুরা সব অবস্থাপন্ন ঘরের—তারা এলে ঘরবাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এক

হাতে করা, পুত্র সুস্থিতি লাভ করেছে এটাই বাবার বড় সান্ত্বনা। পরিচয় মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আপদে কাজ দেয়। এই যে চাকরির কথা হচ্ছে, মুকুল তার জামাইবাবুকে ধরেছে, বিলুকে একটা চাকরি করে দিতেই হবে, এত, পরিচয়ের সূত্র থেকে। এই সূত্র থেকেই ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা। এটা না থাকলে স্ত্রী পুত্র ঘরবাড়ি নিয়ে বেঁচে থাকার মাহাত্ম্য কোথায়।

রাস্তা থেকেই চিৎকার, বিলু আমরা এসে গেছি। চার পাঁচটা সাইকেল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। এক পা মাটিতে, আর এক পা সাইকেলে। গাছের ছায়ায় আমি হেঁটে যাচ্ছি। কি রোদ! ওরা রাস্তায় রোদে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, ভিতরে এস।

—দেখ কারা এসেছে। বলে মুকুল হা হা করে হাসল।

আমি জানি মুকুল বড় সহজে সব কিছু তুচ্ছ করতে পারে। এত রোদে এসেও হাসিটুকু তার বড় সজীব।

নিখিল বলল, ব্যাটা তুমি এমন একটা আশ্রমের মতো বাড়িতে থাক ঘুণাক্ষরে তো বলনি।

আমি কি বলব। ওরা সাইকেলগুলি গাছে হেলান দিয়ে মাদুরে এসে বসল। বাবা বারান্দায় তামাক সাজছেন। আসলে তিনি তামাক সাজছেন না, পুত্র এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের কথা শুনছেন! কেমন পাট ভাঙ্গা প্যান্ট জামা সব পরনে। বিলুটার এদের তুলনায় কিছুই নেই, কিছুটা তার মনকষ্ট হতে পারে। উঠোনের এক কোণ থেকে গাছতলার সবটাই দেখা যায়।

রাম মুকুল এসেই মাদুরে শুয়ে পড়ল। বাবার আতিথেয়তা একটু বেশি। শক্ত তেল চিটচিটে গোটা দুই বালিস না আবার হাজির করেন বাবা। একবার উঠে গিয়ে বাবাকে সতর্কও করে দিয়ে এলাম। আর বাবার অদ্ভুত স্বভাব। বন্ধুরা কেউ এলেই, বাবাও সেখানে গুটি গুটি হাজির হবেন। তারপর চলবে, তোমার বাবার নাম কি? দেশ কোথায় ছিল? কি করেন তিনি? তোমরা ক ভাই বোন? বিশদ জানাজানির পর বাবা বলবেন, বাসা বাড়িতে থাক, না নিজের বাড়ি? একদিন মা বাবাকে নিয়ে বেড়িয়ে যাবে।

মুকুল মাঝে মাঝে আসে বলে, বাবার স্বভাব চরিত্র তার জানা। মাঝে মাঝে বাবার অহেতুক কৌতূহলে আমি ক্ষুণ্ণ হলে মুকুল বলবে, মেসোমশাই তো ঠিকই বলেছেন, তুমি রাগ কর কেন বুঝি না।

মুকুলের হাতে একটা কবিতার বই। সুদীনবাবুর হাতে রাজনারায়ণ বসুর একাল সেকাল। কোথাও গেলে হাতে কবিতা কিংবা গল্প প্রবন্ধের বই এখন আমাদের থাকা চাই। কারণ আমরা আলাদা গোত্রের এটা যেন চারপাশের মানুষকে বোঝানো দরকার। শুধু খাওয়া পরাটাই সব নয়, বাড়ি ঘরই সব নয়, জীবনে আরো কিছু দরকার।

নিখিল বলল, একেবারে বামুন ঠাকুর সেজে বসে আছিস। তোকে আমাদের কাগজের সম্পাদক মানাবে না।

মুকুল বলল, বিলুর বিদ্যাসাগর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গলায় পৈতা, পরনে কোরা ধুতি আর একটা চাদর গায়ে দিলেই একেবারে বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর। বিলুকে আমি আমাদের পত্রিকার জন্য নাটক লিখতে বলেছি।

প্রথমত আমাকে বিদ্যাসাগর বলে ঠাট্টা করায় একটু চটে গেছিলাম। এটা ঠিক, বাড়িতে প্যান্ট সার্ট কেউ আমরা পরি না। পাজামা গেঞ্জি কিংবা পাঞ্জাবি পরা যায়। ওদের বাড়ি গেলেই দেখি, ওরা কেউ খালি গায়ে কখনও থাকে না। পাজামা গেঞ্জি না হয় পাঞ্জাবি পরে আছে। এমন কি ঘরেও তারা চটি পরে থাকে। আমাদের স্বভাব অন্যরকম। কলোনির মানুষ হলে যা হয়। পুজোর কিংবা শ্রাদ্ধে দানের কাপড় দিয়ে আমাদের সব। এমন কি সেই কোরা কাপড় কেটে সার্টও বাবা তৈরি করে দেন আমাকে, পিলুকে। মার শেমিজ। বাড়িতে আমি খালি গায়ে থাকি। খালি পায়ে হাঁটি। সোডায় কাচা কোরা কাপড় পরে থাকি। একবার একটা কোরা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরলে বাবার কি ক্ষোভ! তোমরা বামুনের সন্তান, না চণ্ডালের সন্তান! বামুনের বাড়িতে ও সব চলবে না।

রাম নিখিল সুধীন সবার বাড়ি মুকুল আমাকে নিয়ে গেছে। বাইরে একটা সবার বসার ঘর থাকে। কারো ঘরে দেখেছি বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া। বাবার কাছে এ সবের কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। নীল রঙের ক্যালেণ্ডার। টেবিলে বাতিদান—কত সুন্দর কারুকাজ করা লেসের কাজ

পর্দায়। জীবনে এগুলি মোহ তৈরি করে বুঝি। বাবাও আমার এ সব দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে বাড়ির এ সব অর্থহীন, বরং জায়গা থাকলে একটা গাছ লাগাবার পরামর্শ দিয়ে আসেন। এমন কি বাড়িতে এসেও তাঁর আক্ষেপ—কত বড় বাড়ি—কি সব সুন্দর সাজানো ঘর ধনবৌ—সব মাটি বুঝলে না—বাড়িটাতে একটা ফলের গাছ নেই। পূজা আর্চার জন্য একটা ফুলের গাছ নেই। মানুষ এভাবে ধর্মহীন হয়ে বাঁচে কি করে! সুতরাং এরা আমাদের বাড়ি এলে একটা অন্য গ্রহে হাজির হয়েছে মনেই করতে পারে।

মুকুল বলল, তা হলে তুমি নাটকের ভার নিচ্ছ!

আমি বললাম, ক্ষেপেছ! নাটক কি করে লিখতে হয় আমি জানি না। কবিতা থেকে নাটকে! হয় না।

সুধীন বলল, সিরাজদৌল্লার নাটক তোমাকে পড়তে দেব। বুঝতে পারবে যথার্থ নাটক কাকে বলে!

নাটক আমার একখানাই পড়া আছে। আমাদের সিলেবাসে নাটকটি ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাম নাট্যকারের। তার টীকা এবং ব্যাখ্যা আমাকে এতো জ্বালাতন করেছে, নাটকের নাম শুনলেই ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিদ্যাবিনোদ মশাই আমাদের মতো পড়ুয়াদের যে অথৈ জলে ফেলে গেছেন, নতুন নাটক লিখে আবার আমি আগামী দিনের পড়ুয়াদের কাছে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে রাজি না। বললাম, হবে না।

—হবে। তুমি পারবে।

—আমি পারি না জান। কেন যে জোরজার কর বুঝি না। এমন করলে তোমাদের সঙ্গে আর নেই। কেন যে পত্রিকা বের করার ইচ্ছাটা মাথায় এসেছিল।

বেশ কঠিন শোনাল বোধ হয় কথাগুলি। ওরা চুপচাপ থাকল। বলল, কবিতা লেখার অনেক লোক পাওয়া যাচ্ছে। সুধীনবাবু বাংলা চলচ্চিত্রের উপর প্রবন্ধ লিখবে বলেছে। ছোটগল্পও দুটো একটা পাওয়া যাবে। প্রণবের বাবা বলেছে, প্রণবকে দিয়ে একটা ছোট গল্প লিখিয়ে দেবেন। সমালোচনা বিভাগে থাকবে। এটার ভার নেবে নিখিল। তুমি তা'লে......।

আমি তা'লে কিছু না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। খাটা-খাটনি আমাকে দিয়ে হবে। কিন্তু লেখা হবে না।

রাম বলল, ওকে বরং কবিতাই লিখতে দাও। ও যখন ওটা পারে ওকে দিয়ে তাই লেখানো উচিত।

তাতেও রাজি না দেখে সুধীনবাবু একটু ক্ষেপেই গেল। কলেজ ম্যাগাজিনে ত বেশ লিখেছিলে!

ওটা চাপে পড়ে লিখতে হয়েছে। ও কথা বাদ দিন।

অমন সুন্দর কবিতা কেউ চাপে পড়ে লেখে বিশ্বাস হয় না।

ওরা কিছুক্ষণ যেন দম নিল—পরে কি ভাবে আমাকে চাপ সৃষ্টি করা যায় ভাবছে। আমি হুট করে ওদের অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গেলাম। বললাম, প্রণব না বলে প্রণবের বাবা কেন বলল! প্রণবই তো বলতে পারে সে গল্প লিখবে।

প্রণবের বাবাকে আমরা জানি—বড় অমায়িক মানুষ, তিনি চান তাঁর পুত্র বড় লেখক হোক। মাঝে মাঝেই বলেন, প্রণব যাও, উপরে উঠে যাও, লেখগে। লিখতে লিখতে হাত খোলে।

প্রণব আমাদের আড্ডায় দু-একবার গল্প শুনিয়েছে। বাক্য বন্ধন শিথিল, প্রেম এবং আবেগ ছাড়া কিছু থাকে না! ওকে দিয়ে হবে না এটা আমাদের জানা। কিন্তু কাগজের একটা বড় খরচের বহর প্রণবের বাবা দিতে নাকি রাজি হয়েছেন। শর্ত একটাই তাঁর পুত্রের গল্প ছাপাতে হবে। সব বাবারাই দেখছি এক ধাতুতে গড়া। আমার বাবা অবশ্য শুনলে কিছুটা শংকাই বোধ করবেন। কারণ তাঁর কাছে লেখক কবি নাট্যকারের কোন দাম নেই সংসারে। উচ্ছন্নে না গেলে কেউ নাটক কবিতা গল্প লেখে না। এতে বাড়ি ঘরের অমঙ্গল হয়।

বাবা দেখছি তখন পিলুকে খোঁজাখুঁজি করছেন। একবার যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, তোমরা ভাল আছ তো? বাবা বোঝেন আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি আমি অপছন্দ করি। বিরক্ত বোধ করি। বাবা আজকাল আমার ভাল লাগা মন্দ লাগার বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিতে শিখেছেন। পিলু যে আমগাছে চুপচাপ বসে আমাদের কথা শুনছে বাবার খেয়াল নেই। আমিই বললাম, এই পিলু, বাবা তোকে

ডাকছে না!

সে তড় তড় করে গাছ থেকে নেমে পড়ে বলল, ডাকছ কেন?

বাছুর ধরবি। দুধ দোওয়াতে হবে।

বুঝতে পারছি, বাবা তাঁর পুত্রের উপস্থিত বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নের যোগাড় করছেন।

রাম বলল, গাছে কত আম! আমের কি মিষ্টি গন্ধ!

নিখিল ওদিকে গেল না। সে জানে আমি একজনকে বড় বেশি এড়িয়ে চলি, সে তারই কথা তুলে ফেলল।

সে বলল, শেষ পর্যন্ত দেখছি পরীকেই লাগাতে হবে।

—তার মানে?

মানে পরী বলছিল, আসবে।

—কোথায়?

—তোমার কাছে।

—কেন?

পরী তো কাগজে টাকা দিচ্ছে। পরী কবিতা লিখবে। তুমি কাগজে আছ শুনেই সে রাজি হয়ে গেল। পরী এলে আমাদের আর ভাবনা থাকবে না।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। পরী এ বাড়িতে এলে বিলুর ঠিকুজী কুষ্ঠী জানতে বাকি থাকবে না। যেন পরী এলে সে অপমানিত হবে আবার। বললাম, পরীকে আসতে বারণ কর। ওর আসা আমার বাবা পছন্দ নাও করতে পারেন। বাবার দোহাই দিয়ে পরীর এখানে উদয় হওয়া থেকে নিজের আত্মরক্ষার এটাই যেন আমার একমাত্র উপায় জানা। আমি বারণ করেছি শুনলে সে এখানে রোজ এসে হাজির হতে পারে। পরী বার বার শুনিয়েছে, সে যে-সে মেয়ে নয়। সে রায়বাহাদুরের নাতনি। সে সুহাসদার সঙ্গে মিছিল করে, মিটিং করে। সাইকেল চালিয়ে যতদূর খুশি চলে যেতে পারে। সকাল বিকালে তাকে পার্টি অফিসে পাওয়া যায়। সে মেয়ে এখানে এলে বাধা দেবে কে!

পরীকে কতদিন দেখেছি মিছিলের আগে ঝাণ্ডা হাতে। কতদিন দেখেছি, মিটিং-এ সে মাইকে নাম ঘোষণা করছে। পরী কী যে হবে, সে নিজেও বুঝতে পারে না। পার্টি অফিসে গেলে দেখা যায়, সে বসে বসে পোস্টার লিখছে। রাস্তায় দেখা যায় সে মিছিলের আগে আছে। নাটকে দেখা যায়, সে নায়িকার পাঠ করছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, চাঁদ যেন ঝলসান রুটি। একটা মেয়ে একা এত করতে পারে, সে আমার বাবার দোহাই কতটা মানবে বুঝতে পারছি না। বড় লোকের নাতনি, তা আদুরে হবে বেশি কি! গাড়ি চালিয়ে একদিন কালীবাড়ি হাজির। আবার গাড়ি চালিয়ে কলেজে হাজির! অথচ প্রথম দিকে, কী ধীর পায়ে কলেজের সিঁড়ি ভাঙত। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হেঁটে যেত—কারো দিকে তাকাত না। সুহাসদা কলেজ ইউনিয়নের পাণ্ডা। তার পাল্লায় পড়ে পরী একেবারে অন্য ধাতু হয়ে গেল। পরের দিকে গাড়িতে আসত না। এতে বোধহয় গণসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। সে আসত সাইকেলে। সুতরাং যদি পরী মনে করে আসবে, তবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না। বাবার দোহাই দিলেও না।

আমি বাধ্য হয়ে মনমরা হয়ে গেলাম। মুকুলের সঙ্গে পত্রিকা বের করা নিয়ে জড়িয়ে না পড়লেই হত। আসলে সেই ভায়া দাদু টিউশনিটাই আমার ঘিলুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

লক্ষ্মীর আত্মহত্যার কারণ এই পরী। পরীকে এ কথা বলা যায় না। বললে সে খারাপ ভাববে। সেদিন জ্যোৎস্না রাতে পরীকে নিয়ে রেল লাইন ধরে হেঁটে না গেলে লক্ষ্মী আত্মহত্যা করত না। একটি অন্ত্যজ কিশোরী বালবিধবা হয়ে দেবস্থানে যে মানুষটাকে সে নিজের মনে করে সারাদিন চোপা করত সেই মানুষটা এমন বেইমানি করবে সে কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সেই মুখ এখনও আমাকে তাড়া করে। পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা এবং কপালে সিঁদুর পরে সে শুয়ে আছে যেন। কে বলবে মেয়েটা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। লক্ষ্মী আমার উপর অভিমান বশে চলে গেল। নিরন্তর সেই জ্বালা মাঝে মাঝে আমাকে এখনও উদাস করে তোলে। সেই থেকে আমি পরীকে এড়িয়ে চলছি। পরী এলে আবার কোন্ আপদ এসে বাড়িটায় ভর করবে কে জানে!

পরী এলে বুঝতে পারছি এক অপমান থেকে আর এক অপমানের দরজায় আমি ঢুকে যাব। সে অপমান কি নতুন সংকট সৃষ্টি করবে কে জানে। একদিন মুকুলকে সোজাসুজি বললাম, পরীকে আমার পিছু লেলিয়ে দেবে না। ওকে আমি চিনি।

আমরা বিকাল হলে সাইকেলে সারা শহর চক্কর মারি। কখনও পুলিস মাঠে গাছের ছায়ায় বসে থাকি। শহরটা যেন আমাদের কাছে কত সব সুন্দর খবর বয়ে আনে। সূর্য অস্ত যাবার আগে সারা লালদীঘি কেমন আরও মায়াবী হয়ে ওঠে। কোনো তরুণী কিংবা যুবতী আসে হেঁটে। আমরা বড় দূর থেকে দেখি—পৃথিবীর কোন গ্রহ নক্ষত্রে এরা বড় হয় এমন প্রশ্ন জাগে মনে! পরীকে দেখলেও হত। কিন্তু পরীর প্রতি আমার আকর্ষণ অন্য রকমের। পরী আগেও ভয় দেখিয়েছে, বিলু একদিন তোমার বাড়ি যাব। তখন লক্ষ্মী বেঁচে। লক্ষ্মীই পরীকে বলেছিল, মাষ্টার তোমাকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে, তা'হলেই হয়েছে। কালীবাড়িতে তখন ছাত্র পড়াই। থাকি, খাই, কলেজ করি।

নিখিল বলল, পরী—কি করেছে?

—বললাম, কি করেছে বলা যাবে না। পীড়াপীড়ি করবে না। ওকে কবিতা দিতে গিয়ে যত ফ্যাসাদ। পরীর জন্যই তো লক্ষ্মীটা বিষ খেল।

—বলছ কি!

—কাউকে কিন্তু বোল না।

—তুমি যে কিনা! এত বড় খবরটা চেপে গেছ!

—তখন তো তোমার সঙ্গে আমার ভাল আলাপ হয় নি। জানতো পরীর মাথা খারাপ আছে। ওকে বাড়িতে মিমি বলে ডাকে। ওকে বেশি আস্কারা দিও না।

আমরা ঘাসের উপর শুয়ে আছি। এ দিকটা নির্জন। দূরে এগ্রিকালচারের মাঠ, পরে সাহেবদের কবরখানা। পাশে বিশাল ঝিল। রিকশার প্যাঁক প্যাঁক শব্দ। আর দূরের রেল-লাইন পার হয়ে গাছের ছায়ায় অনেকটা দূরে আমার বাড়ি। পরীর কথা ভাবলে, আমার কেন জানি বাড়িতে ফেরার ইচ্ছে থাকে না। তবে আর যাই মানাক, আমাদের বাড়িতে মিমিকে মানায় না। আমি বললাম, ওর বোধহয় সুন্দর ছেলে দেখলেই ভাল লাগে। বড় লোকের মেয়েদের কত শখ থাকে। আমি ওর শখের জিনিস। বরং মজা বলতে পার। আমাকে নিয়ে ও মজা করতে ভালবাসে। ওর মধ্যে আমি আর নেই।

পরী তো বলছে, তোমাকে সম্পাদক করতে।

—পরীকে বলবে, আমি রাজি না। ওকে দয়া করে আমাদের বাড়িও নিয়ে যাবে না। পরী আমার বাড়ি চেনে না।

—আমরা কে ওকে নিয়ে যাবার? সে ইচ্ছা করলে সব জায়গায় যেতে পারে। একা নাকি কানপুর যাচ্ছে, বাবার কাছে। সেখানে মাস খানেক থাকবে।

—বাঁচা গেল।

মুকুল তড়াক করে উঠে বসল, বাঁচা গেল মানে! তুমি কি বিলু, মেয়েটা তোমার জন্যই টাকা দিচ্ছে। তোমার কথা উঠতেই বলল, যা লাগে দেব। দাদুকে বলব। দাদু বিলুকে চেনে। ওকে সম্পাদক করতে হবে।

আসলে মুকুলকে কি করে বোঝাই, সেই ভায়া দাদু টিউশনিটাই যত নষ্টের মূলে। ম্যানেজার সাহেবের দুই মেয়ে অবশ্য এখন মাঝে মাঝে সামনের টেবিলে বসে পড়া দেখিয়ে নেয়। একেবারে পর্দার অন্তরালে আর থাকে না। বাবার গৌরবে মেয়েরাও গর্বিত। বাবার হয়ে তাদের গর্ব করার শেষ নেই—বাবা টেনিস খেলে, বাবা আবৃত্তি করে। বাবা নাটক করে। সব ছবি একদিন আমাকে দেখিয়েছিল। বাবার শেষ কৃতিত্বের ছবি বাবার একখানা কবিতা। কবিতাটি সাহেবের স্ত্রী সূচীশিল্পে ধরে রেখেছেন। এবং তাদের ভিতরের ঘরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। তাহলে ম্যানেজার সাব কবিতা লেখেন। আর সে কাগজের সম্পাদক, এখানে একটা যেন তার বড় অমোঘ জায়গা আছে। বিজ্ঞাপনের জন্য সাহেবকে অনুরোধ জানান হবে। এবং তার জন্য মিমিকে পাঠালে কাজে আসবে—শহরের বনেদী পরিবার, এক ডাকে সবাই তার দাদুর নাম জানে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আলাদা ইজ্জত। এবং আমি জানি, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ঠিক একটি কবিতা ধরিয়ে দেবে। এই আশা আমাকে কুহকে ফেলে দিচ্ছে।

সুতরাং বুঝতে পারছি, এই কুহকই আমাকে সম্পাদক না করে ছাড়ছে না। আমি বললে, মিমি দয়া করে ফোনে জানিয়ে দেবে, আর একটা কবিতা পাঠাবেন। বিলুর পছন্দ না। বিলু মানে আমাদের কাগজের সম্পাদক।

ঘাসের উপর শুয়ে যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। টিউশনিটা ছাড়তে পারছি না। অথচ বড় ইজ্জতে লাগছে। চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার। এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত দেয় না। সাহেবের বাপ কাছ থেকে নড়ে না। মেয়ে দুটো পড়ে, আমি বসে থাকি, অংক না পারলে বুঝিয়ে দিই, ইংরাজী ট্রান্সলেশন করবার সময় বুক কাঁপে। কোথায় কি ভুল করে না বসি। সব যে ঠিক হয়না বুঝতে পারি। তবে সাহেবের বাবাটির ইংরাজি জ্ঞান আমার চেয়ে প্রবল নয়। টাসক করাবার পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হয় সব ভুল না হয়ে যায়। একেবারে যে হয় না তা নয়। ছোটটির না হলেও বড়টির বেলায় হামেশাই হয়। বড়টির কেন জানি, মাষ্টার মশাইর প্রতি সামান্য মায়া জন্মেছে। স্কুলে ঠিকঠাক করে দিলে, স্কুলে বসেই ফেয়ার করে নেয়। দাদুকে বুঝতে দেয় না মাষ্টার মশাই ভুল শিখিয়ে গেছেন। দাদু খাতা দেখতে চাইলে ফেয়ার করা খাতাটি দেখায়। এই আকর্ষণটুকুর জন্যই এখনও টিউশনিটা ছাড়তে পারছি না। আর দেখছি বড় মেয়ে নমিতা মানে নমু, আমার দিকে চোখ তুলে কথা বলতে ভরসা পায় না। চোখে চোখ পড়ে গেলে নামিয়ে নেয়। দাদুটি কি বোঝেন কে জানে, নমুর দিকে তাকিয়ে বলেন, কোথাও অসুবিধা হলে বলবে। লজ্জার কি, ও তো কলোনির ছেলে!

আমিও বলি, সত্যি লজ্জার কি আছে। আমি তো তোমাদের মাষ্টার মশাই। কলোনিতে থাকি।

আসলে বুঝতে পারি, ফ্রক পরে সে আমার কাছে বসে থাকতে লজ্জা পায়। যতই আমি কলোনির ছেলে হই না কেন, তার কাছে আমার যেন কিছুটা মর্যাদা আছে। কেন যে এ বয়সে ফ্রক পরিয়ে রাখা তাও বুঝতে পারি না। একদিন দেখলাম নমিতা শাড়ি পরে সেজে গুজে আমার সামনে পড়তে বসেছে। এবং ক্রমে বেশ চোখে ধার উঠে যাচ্ছে। এতেও বুক কাঁপে। পরী অর্থাৎ মিমির চোখে এসব আমি লক্ষ্য করে জেনে গেছি—মেয়েদের চোখে একজন পুরুষের সম্পর্কে কখন কি দুর্বলতা দেখা দেয়—চোখের চাউনিতে তার আভাস থাকে। এসব কারণেও ভারি ডিপ্রেসড্ থাকি। মুকুল তা টের পায়।

সে বলে, কি হয়েছে তোমার। কেবল চুপচাপ থাক। মাসিমা তো সেদিন কান্নাকাটি করল। তুমি নাকি বলেছ, টিউশনি ছেড়ে দেবে।

—ধুস, ভাল্লাগে বল! আমি যেন বেটা চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। ওর দাদুটা কি ভাবে! কলোনিতে থাকি বলে আমরা কি মানুষ না! সব সময় সামনে বসে থাকে। নাতনিদের পাহারা দেয়। বল, খারাপ লাগে না?

—কিছু বলেছে?

—বলতে হয়! আমি কিছু বুঝি না মনে কর! দাদুটি সব সময় ঘরে থাকলে কেমন লাগে বল। মেয়ে দুটোই বা কি ভাবে। আমি তোর নাতনিকে ফুসলে ফাসলে পালাব ভাবছিস! অথচ দ্যাখ কি মজা, ছাড়িয়েও দিচ্ছে না।

—বাপটা কি বলে?

—উনি তো সাহেব মানুষ। পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে যান আসেন। কথা বলেন না। আমার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত সম্মানে তাঁর বাধে। সব সময় ব্যস্ত। বাড়িতে লম্বা আলখেল্লার মতো সিল্কের কি এক বিদ্‌ঘুটে পোশাক পরে থাকেন। মুখে চুরুট। আর দেখলে কি সব কথা। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই—যেন শুনিয়ে দেওয়া বোঝ আমি কত দরের।

—মা-টা আসে না?

—কখনও মুখ দেখিনি।

—মাসিমা যে বলল, তোমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

—ওটা মা-র কথা, বাবার কথা। বাদ দাও। লতাপাতায় কি সম্পর্ক আছে! মাস দুই হয়ে গেল,

একবারও জানতে চায়নি আমার বাবামশায়টি কেমন আছেন।

—অদ্ভুত তো। আগে মেসোমশাইকে চিনত।

—বাবা তো বলেন, মনোমোহন কাকা।

—কাকা হয়ে ভাইপো সম্পর্কে এত নীরব!

—আর নীরব। একদিন বলে কি জান?

—কি বলেন?

—তোমার বাবা কি করেন? আমার ইচ্ছে হয়েছিল বলি হাতি বেচা কেনা করেন। বলতে বাধল, শত হলেও বাবার খুড়োমশাই। আচ্ছা, কি বলা যায় বলত! বাবা তো যজন-যাজনে ব্যস্ত। বাবা পুরুতগিরি করে বলতে লজ্জা লাগে না! বাপ পুরুতগিরি করে জানলে মেয়ে দুটোই বা কি ভাববে!

মুকুল বলল, এ যে দেখছি খুবই বড় সংকট। সুতরাং সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার একটাই পথ। যে করেই হোক কাগজটা বের করতে হবে। পরী এলে তুমি যাও। পরীর সঙ্গে নিখিলেরও ভাব আছে। ওরা দুজনেই যখন পার্টি করে তখন সংকট থেকে তারাই আমাদের উদ্ধার করতে পারে।

আমরা বুঝতে পারি আসলে দু'জনেই আমরা ভালবাসার সংকটে পড়ে গেছি। আমার বেলায় মিমি, কিংবা ম্যানেজার সাহেবের বড় মেয়ে নমিতা। আর মুকুলের বেলায় চৈতালি। মিমি আমাকে ভালবাসে না, বরং আমাকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসে।

আর মুকুলের ভালবাসার সংকট আবার অন্যরকমের। চৈতালির সঙ্গে তার আলাপই নেই। আজ পর্যন্ত একদিনও সে কথা বলে নি। শুধু তার বৌদি চৈতালির দিদিকে চেনে। কলেজে একসঙ্গে পড়ত।

শহরের ফাংশানে চৈতালি নেই ভাবা যায় না। উদ্বোধন সঙ্গীত কিংবা রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ওর প্রোগ্রাম ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ওর গান শুধু শুনি। মুকুল কবিতা লেখে, চৈতালি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আর দেখতেও ভারি সুন্দর। এই একটা জায়গায় মুকুলের মনে হয়েছে, পৃথিবীতে একজন পুরুষই তার সঙ্গী হতে পারে। সে স্বপ্নেও চৈতালিকে দেখে। বিকাল হলেই সে আর ঘরে থাকতে পারে না। মন নাকি তার উদাস হয়ে যায়। যে করেই হোক চৈতালিকে একবার দেখতে না পেলে দিনটা তার মাটি।

মুকুল ঠিক টের পায়। বলে, না নেই। চল টাউন হলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রিক্সা করে ফিরতে পারে।

—কোথায় যায়?

—কে জানে! আসলে কি জান, ও ঠিক টের পেয়ে গেছে আমি ওকে ভালবাসি। চৈতালিকে লুকিয়ে রেখে মুকুলকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার কোনো মানে হয়! আমাদের এটাও ইজ্জতের প্রশ্ন এখন। একটা কাগজ বের করতে পারলে বোঝানো যাবে আমরা একেবারে ফ্যালনা লোক নই।

মুকুল বলল, প্রেসে গেছিলাম।

—প্রেস ঠিক করে ফেলেছ?

—ঠিক হয় নি। তুমি তো জান, দিলীপদের প্রেস আছে, ওকে বললে কেমন হয়।

দিলীপ আমাদের কলেজের সহপাঠী। ওর বাবাকে দেখেছি। খাগড়া যেতে প্রেসটা পড়ে। বান্ধব প্রেস। একটা টেবিলে ওর বাবা চশমা চোখে বসে থাকে। সকাল বিকাল সব সময়। সন্ধ্যায়ও। ঝাঁটা গোঁফ। গোলগাল চেহারা। লোকটাকে দেখে খুব আমার ভাল লাগেনি। দিলীপ কলেজ ম্যাগাজিনে একটা গল্প দিয়েছিল। পরী সেটা ছাপেনি। সুতরাং কতটা সুবিধা মিলবে বোঝা মুশকিল।

দেখি পেছনে কখন নিখিল এবং সুধীনবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়টা আমরা গাছের নিচে গোল হয়ে বসে আড্ডা মারি। শহরের উঠতি যুবা আমরা। সবাই ভালবাসার ব্যাপারে নানারকম জটিলতায় ভুগছি। সুধীনবাবু ব্যর্থ প্রেমিক। নিখিল তার এক দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোনের প্রেমে পড়ে গেছে। প্রণব পাশের বাড়ির মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে ভাবটাব করছে। প্রণবের বাবা, নিচের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বিকাল বেলাটায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন। যেমন লম্বা, তেমনি দশাসই চেহারা। মাসিমা এবং মেসোমশাই আমাদের দেখলেই বড় প্রীত হন। গেলেই, এক কথা, যাও, উপরে উঠে যাও। প্রণব আছে। ও লিখছে।

ছেলের জন্য এলাহি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দোতলায় একটা বিশাল ঘর প্রণবের একান্ত নিজস্ব! সেখানে গেলে প্রায়ই দেখি, রায়বাবুর বড় মেয়ে প্রণবের চেয়ার টেবিল বই পত্র এবং বিছানা ঠিকঠাক করছে। একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো। কিন্তু প্রণব মেয়েটি সম্পর্কে কোনো আভাসই আমাদের দেয় না। ভালবাসে, না, বাসে না তাও বলে না। আমরা যখন আমাদের সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করি সে তখন চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে শুধু অর্ডার, অপু যাও, নিচে গিয়ে বল চার কাপ চা। অপু তখন নিচে চলে যায়। আর উপরে ওঠে না। বড় রক্ষণশীল পরিবারের মতো ব্যবহার। তবু একটা জায়গায় আমাদের মিল—সাহিত্য-চর্চার আসর। সব এক একজন অংশীদার। গেলেই প্রণব, তার খাতা বের করে গল্প পাঠ করতে শুরু করবে। আমরা চায়ের লোভে, খাবারের লোভে গল্প পাঠ শেষ পর্যন্ত না শুনে উঠতে পারি না। ওঠার সময় বলি, চল—ঘুরব। বের হবার মুখে মেসোমশাইর একটাই কথা। টর্চটা নিয়ে যাও। জ্যোৎস্না রাত, রাস্তায় আলো, খুব দূর অন্ধকারে যাবারও কথা নেই, তবু মেসোমশাই প্রণবকে হাতে টর্চ না ধরিয়ে ছাড়বেন না। সুতরাং সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে প্রণব আছে, অথচ হাতে টর্চ নেই কোনদিন সেটা দেখিনি।

নিখিলের তখন এক কথা, তোর কিছু হবে না। জানিস তো লেখক কবিরা জীবনে খুব বেপরোয়া হয়। বেপরোয়া না হলে অভিজ্ঞতা হয় না। মহাস্থবির জাতক পড়ে ফেল। অসাধারণ, তুলনা নেই।

আমরা তখন কে কি পড়ছি, এটাও ছিল আড্ডার বিষয়। আমার অবশ্য কিছুই পড়া হয়ে ওঠে না। একটা চাকরির খুব দরকার। আর দরকার কলোনির গন্ধটা কিভাবে মুছে ফেলা যায়। পরী ঠিকই বলেছে, বিলু তুমি কবিতা লিখলে, গন্ধটা থাকবে না। তুমি একজন কবি। কবিরা কলোনিতেই থাকুক, আর শহরেই থাকুক তারা কবি।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। পায়ের কাছে নিখিল সুধীনবাবু বসে। মুকুল মাথার কাছে। আমার মন খারাপ। কলোনির ছেলে বললে, কাঁহাতক ভাল লাগে। কলোনিতে কোনো মানুষ থাকে না, এটা বোধহয় ওরা ভাবে। ওরা যত না ভাবে আমি তার চেয়ে বেশি ভাবি। সেদিন এই যে বলা, লজ্জা কি, ও তো কলোনির ছেলে,—সেটা আমাকে বড় কাবু করে রেখেছে।

সুধীনবাবুই বলল, কি, কতদূর এগোল!

আমি উঠে বসলাম। বললাম, পরী কানপুর থেকে কবে ফিরবে?

নিখিল বলল, কানপুর যায় নি। কাঁদি গেছে। 'মহেশ' নাটকে ওর পাঠ আছে। মুকুল বলল, যাই হোক কিছু করতে হবে। আর অপমান সহ্য করতে পারছি না।

—কিসের অপমান? বলে নিখিল একটা সিগারেট ধরাল।

—আছে, তোমরা বুঝবে না।

—কাগজের নাম ঠিক করে ফেলেছ?

আমি বললাম, ঠিক হয়ে গেছে!

—কি নাম হবে?

—চৈতালি।

সুধীনবাবু বলল, মন্দ না নামটা। এখন পরীর পছন্দ হয় কিনা দেখ।

পরীর পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। এই নামই থাকবে। কারণ বুঝতে পারছি, মুকুলের এ ছাড়া অন্য নাম পছন্দ হবে না। —তবে একটা কথা, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সম্পাদক আমি হতে পারব না। আমি সঙ্গে আছি।

মুকুল বলল, বেশ সঙ্গে থাকলেই হবে।

সুধীনবাবুই বলল, তোমার টিউশনির খবর কি? খুড়োমশাই তোমার বাবার কোনো খবর নিলেন?

—না।

ওরে বাপস্, দেখি পরী পেছনে। সাইকেল থেকে নেমে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে—তোমরা এখানে! আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বিলু, তোমার বাড়ি গেছিলাম।

—তুমি না কাঁদি গেছ!

—কে বলল?

—এই যে নিখিল বলল।

—যাঃ, আমি কখন বললাম। আমি জানিই না কিছু। নিখিল বেমালুম অস্বীকার করে ভাল মানুষ সেজে গেল।

—যাকগে, শোন। মেসোমশাই খুব দুঃখ করলেন। বিলুটার মতি গতি বুঝতে পারছি না। ওর যে কি হয়েছে। টিউশনিটা ছেড়ে দেবে বলছে কেবল।

ইস! বাবার কি মতিভ্রম হয়েছে—পরীকে সব কথা বলার কি দরকার। পরীকে তো বাবা এর আগে কখনও দেখেনি। নামও শোনে নি। আমি গুম মেরে থাকলাম।

পরী বলল, সত্যি টিউশনি ছেড়ে দিচ্ছ!

—জানি না।

—ছাড়লে ভাল হবে না। মেসোমশাই কি সুন্দর মানুষ। নিজে আম কেটে খাওয়ালেন। বললেন, বড় সৌভাগ্য মা, তুমি এয়েছ। তোমাকে তো দেখলে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মনে হয়। বিলু তোমার সঙ্গে পড়ে!

আমি মিমির সঙ্গে পড়ি এটা আমার বাবার কত বড় সৌভাগ্য কথায় বার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—শোনো!

পরী এলে আমরা আর কেউ কথা বলতে পারি না। এমন জাঁহাবাজ মেয়ের সঙ্গে কেউ কথা বলে পারেও না। পরী পার্টির কর্মী বলে, এক দঙ্গল যুবার সঙ্গে যতক্ষণ খুশী বসে থাকতে পারে। তবে পরীকে আমরা বলে দিয়েছিলাম, তুমি সব বলতে পার। কিন্তু বিপ্লব ফিপ্লব নিয়ে কোনো কথা বলবে না। পার্টির ইস্তাহার হয়ে কথা বললে, তক্ষুনি আমরা চলে যাব। ফলে মিমি আমাদের সঙ্গেই একটু প্রাণ খুলে অন্যরকম কথা বলতে অভ্যস্ত।

—কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না? পরী লাল রঙের লেডিজ সাইকেলটি এবারে ঝপাৎ করে মাটিতে ফেলে আমার মুখের সামনে এসে বলল, কি বলছি, শুনতে পাচ্ছ না! কেবল চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে জান। উঠে বসতে শেখনি।

—ধুস, ভাল্লাগে! উঠে বসলাম ঠিক, কিন্তু ভেতরের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। বললাম, তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি কেন গেছিলে বল। তোমাকে বলেছি না আমাদের বাড়িতে যাবে না।

—কবে বললে?

সত্যি কবে বলেছি মনে করতে পারি না। আদৌ বলেছি কিনা জানিও না। তবে পরী আমাদের বাড়ি গেলে আমরা কত হত দরিদ্র টের পাবে। একজন সহপাঠিনী শুধু কি সহপাঠিনী—জ্যোৎস্না রাতে মহা-অষ্টমীর দিনে পরী অমন একটা লোভে আমাকে ফেলে না দিলেই পারত। কালীবাড়িতে ওর কি যে দরকার ছিল জ্যোৎস্না রাতে রেল-লাইন ধরে হাঁটার।

নিখিল চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে বলল, তোরা কি! দেখা হলেই ঝগড়া। এ কি রে বাবা। তা গিয়েছে তো কি হয়েছে। আমরা যাই না!

পরী লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরেছে। হাত খালি। ডান হাতে সোনার ব্যান্ড দেওয়া ঘড়ি। পায়ে হলুদ রঙের স্লিপার। ওর রঙ শ্বেত চন্দনের মতো। বিকেলের লাল আভায় কোনো ফোটা পদ্মের মতো মনে হয়। পরীকে দেখলে, আমার মধ্যে বড় উষ্ণতার জন্ম হয়—কিন্তু পরী আমাকে বাড়ি গিয়ে আসলে হেয় করতে চেয়েছে, ওটাও কেন জানি ভুলতে পারছি না। কে জানে বাবা তখন গামছা পরে আমগাছ থেকে আম পাড়ছিলেন কি না। কে জানে পুনুটা কি করছিল। ওকে তো কিছুতেই প্যান্ট পরানো যায় না। উলঙ্গ হয়ে ঘোরে। আমি রাগ করলে বাবা বলবেন, ছেলেমানুষ, থাকুক। যতদিন শরীর খোলামেলা রাখা যায়। বন্ধন বড় কঠিন বিষয়। শরীর খোলামেলা থাকলে হাওয়া বাতাস লাগে। মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। বাবা বাড়িতে খালি গায়ে থাকেন। মা বাড়িতে কোনোদিন ব্লাউজ পরে না। মায়াটা শাড়ি পরতে শিখেছে। কিন্তু শাড়ির সঙ্গে সায়া ব্লাউজ দরকার মা কিংবা বাবা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। বাড়িতে আবার কে কবে সারা শরীর মুড়ে বসে থাকে। অসুস্থ হয়ে পরবে না। আর পিলুর কথা না বলাই ভাল। হাফ প্যান্ট পরে গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে সে হয়তো পরীকে দেখা মাত্র মাকে বলেছে, কে মা? আমাদের কে হয়? মা পিলুকে কি বলেছে কে জানে।

আমি গুম হয়ে আছি দেখে পরী বলল, অনেকদিন দেখা নেই। মনটা খারাপ লাগছিল তাই গেলাম। তুমি তো একবার দয়া করে যেতে পারতে। কোনো গুণ তো নেই। মুখ ভার করে বসে থাকা। বাপ জ্যাঠাদের মতো হুম! অত মুখ ভার করে থাকলে কাহাতক ভাল্লাগে।

আমি পায়ের উপর পা রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে আছি। পরীর কোন কথা শুনছি না এমন উদাস ভাব।

—মেসোমশাই দুঃখ করলেন, তোমার সঙ্গে পড়ে মা। ওকে একটু বুঝিয়ে বল! কুড়ি টাকা! সোজা কথা! কুড়ি টাকায় এক মণ চাল হয়। এভাবে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! তা খুড়োমশাই এ দেশে এসে আমাদের নাই চিনতে পারেন। ছেলে কত কৃতী বল! মিলের ম্যানেজার সোজা কথা। তাদের আত্মীয় কলোনিতে থাকে, এতে ওরা ছোট হয়ে যেতেই পারে। তুই গরীব বামুনের ছেলে, তোর কি এ সব নিয়ে মান-অভিমান সাজে! বলে পরী চুপ করে আমাকে কান্নি মেরে দেখল।

আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, থামলে কেন। চালিয়ে যাও। মোটরে কি তেল ফুরিয়ে গেছে।

—তেল ফুরাবে কেন! সব ঠিকই আছে। টিউশন তুমি ছাড়বে না বলে দিলাম।

—আদেশ!

—আদেশ উপদেশ বুঝি না। মেসোমশাই কী সরল সোজা মানুষ। তুমি তাঁর ছেলে ভাবতে অবাক লাগে! বুঝলে নিখিল, এক একটা আম কেটে দিচ্ছেন, আর বলছেন, এটা শা-দুল্লা, এটা রাণীপসন্দ, এটা বোম্বাই। সবই মা আমার হাতে লাগান। কেমন মিষ্টি না! সুস্বাদু না! গাছের কলম কোথা থেকে এনেছেন, মুর্শিদাবাদের কার বাগানের কলম, দশ ক্রোশ দূর থেকে নাকি একটা আমের কলম মাথায় বয়ে এনেছিলেন...

আর আমার সহ্য হচ্ছে না। বললাম, এই আমি উঠলাম।

সুধীনবাবু বলল, তার মানে! কথা ছিল, আজ কাগজের নাম, কে কি ভার নেবে ঠিক হবে—চলে গেলে হবে কেন!

—নাম ঠিক করে ফেলেছি বললাম তো। আমি উঠতে গেলে পরী খপ করে হাত চেপে ধরল। বলল, তোমার মাথা খারাপ আছে বিলু।

—হ্যাঁ আছে। আমার মাথা এখনও ঠিক আছে ভাবলেই বরং কষ্ট পাই। তারপর পরীকে আঘাত করবার জন্য বললাম, যতই গণসংযোগ কর, কোনো লাভ হবে না। বাবাটি গান্ধী মহারাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না।

—কি বললে!

—বললাম তো গণসংযোগে কোনো কাজ হবে না।

—আমি গণসংযোগ করতে তোমাদের বাড়ি গেছিলাম ভাবছ!

—তাছাড়া কি!

—তুমি বিলু এটা বলতে পারলে।

আমি আচরণে কেমন আরও রূঢ় হয়ে উঠলাম। বললাম, এটা তোমাদের বিলাস পরী!

—বিলাস!

—হ্যাঁ বিলাস! হাত ছাড়। আমি এখন যাব।

হঠাৎ দেখি পরীর চোখ চিক্‌চিক্ করছে। সে সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেন কেউ আমরা ওর মুখ দেখতে না পাই। সে আমার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। পরীর মুখ ভাল করে ফের দেখা না পর্যন্ত আমি কেমন অস্থির হয়ে পড়ছি। পরীকে এভাবে অপমান করা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি। এই নিয়ে পরী কতবার যে আমার অপমান সহ্য করেছে। অথচ পরী আজ পর্যন্ত আমাকে কোনোদিন অপমান করার চেষ্টা করেনি। বরং আমাকে বড় করে তোলার মধ্যে ওর কোথায় যেন একটা বিজয়ের ভাব আছে। অথচ আমি তাকে সব সময় পরাজিত দেখলে আনন্দ পাই।

মুকুল নিখিল প্রণব সবাই তটস্থ। সুধীনবাবু পরীকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে। সে বলল, এই মিমি, বোস, তোরা যে কি!

মুকুল বলল, বিলু বোস তো। বলে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। কিন্তু পরী তখনও দাঁড়িয়ে।

লালদীঘির দিকে মুখ। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

আমি একটা কথা বলতে পারছি না। বাবার সরল সহজ জীবন আমাকে এভাবে পীড়া দেবে বুঝতে পারিনি। বিশেষ করে পরীর কাছে এত সব বলার কী যে দরকার। বাবা কেন বুঝতে পারেন না, যারা আমাকে চাকর-বাকরের মতো দেখে, তাদের গুণগান পরীর কাছে কেন, কারো কাছেই করা ঠিক না। যারা আত্মীয় বলে আমাদের স্বীকার করে না, অথচ তাদেরই গর্বে বাবার মুখ কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভাবতে কষ্ট লাগে। মাথাটা এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। বার বার বলেছি, আপনি কখনও কারো কাছে মিলের ম্যানেজার আপনার আত্মীয় বলে পরিচয় দেবেন না। কে শোনে কার কথা! পরী যেতেই শুনিয়ে দিয়েছে, আমাদের দিন এমন ছিল না মা। গত জন্মের পাপ ভোগ। যেন বাবা ছিন্নমূল না হলে পরীকে বৌমা করেও আনার ক্ষমতা ছিল তাঁর! বাবা তো জানেন না, পরীদের কি বিশাল বাড়ি, সদর দরজায় দারোয়ান। পরীর দাদু এই শহরের চেয়ারম্যান। পরীর দাদা বৌদিরা সব যেন অন্য গ্রহের জীব। পরীকে দেখেই সেটা বাবার টের পাওয়া উচিত ছিল। পরী কী একবারও বলেছে, তার দাদুর নাম এই, তারা এই শহরের সবচেয়ে বনেদী পরিবার। আহাম্মক না হলে কে এত সব বলে! বাবার সারল্য কেন জানি আজকাল আমার একদম পছন্দ না। বাবাকে আহাম্মক ভাবতে কষ্ট লাগে। চোখে জল চলে আসে। আমিও গুম মেরে গেছি। কারণ সবার কাছে দারিদ্র্যের জ্বালা কত বড় চোখের জলে না আবার ধরা পড়ে যাই।

পরী আমার সামনে বসে। আমি আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। সবাই আজকাল একটু বেশি সাহিত্য-পাগল হয়ে উঠেছি কাগজের নামে। মুখে যতই বলি না, আমি এর মধ্যে নেই খাটাখাটনিতে আছি, তবু জানি গোপনে কবিতা লেখার বাসনায় ভুগছি। আর এই বাসনা, আর কাউকে খুশি করার জন্য যেন লেখা। আমরা কেউ কথা বলছি না। দু-একটা গাছের পাতা আমাদের সামনে হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। দূরে রেললাইন মাঠ পার হয়ে, একটা মালগাড়ি যাচ্ছে।

আমরা সবাই উসখুস করছি কথা বলার জন্য। কিন্তু কিভাবে আবার আড্ডার স্বাভাবিক প্রাণ ফিরে পাব বুঝতে পারছি না।

পরীই দেখলাম পারে। সহসা সে হেসে ফেলল।

পরীর হাসি আমাকে একেবারে হালকা করে দিল। আবার পরমুহূর্তেই মনে হল, এমন এক ঝড় ওঠার পর এত নির্মল আকাশ সহসা কে কবে আশা করে। পরী মুহূর্তে গম্ভীর, মুহূর্তে লঘু হয়ে যাওয়াটাও আমার কেন জানি পছন্দ না। বললাম, হাসির কি হল! এই প্রথম ওর দিকে ঝড়ের পরে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, চোখের জলের দাগ এখনও সজীব।

পরী বলল, হাসব না তো কি করব! কারো মুখে রা নেই। যেন সবাই বিষণ্ণ চিত্তে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ দেখছি। তোমাদের মুখ চোখ কি হয়ে গেছে!

মুকুল বলল, বিলুটা ও রকমই।

পরী বলল, শুধু বিলু হবে কেন, তোমরা সবাই। এত করে বললাম, কাগজের নাম ঠিক করে ফেল, বাকিটা আমি দেখছি। কাগজের নাম ঠিক করতেই দেখছি বাবুরা সব হিমসিম খাচ্ছেন।

আমি বললাম, কাগজের নাম ঠিক হয়ে গেছে।

—আমাকে জানাও নি তো! পরী আঁচল জড়িয়ে আরও পা ঢেকে বসল।

—শুনলাম তুমি কানপুর যাচ্ছ। বাড়ি থাকবে না।

—কানপুর যাবার কথা ছিল। তোমাদের কাগজের কথা ভেবেই যাইনি।

—তুমি কানপুর যাচ্ছ শুনেই, আমাদের আর তোমার কাছে যাওয়ার দরকার আছে মনে হয়নি।

—তোমার কবে আমাকে দরকার মনে হয়েছে জানি না তো।

মুকুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার! তোমরা এমন করলে এক্ষুনি উঠে পড়ব। পরীকে দেখলেই তুমি যে কেন এত রেগে যাও বুঝি না।

মুকুলের দিকে তাকিয়ে পরী বলল, বাদ দাও তো। ও ওরকমই। কবে থেকেই ঠাকুর চিনে বসে আছি। এখন যা বলছি শোনো—কি নাম ঠিক করলে? সুধীনদা তোমার মাথায় কোনো নাম আছে?

—আমি তো বলেছিলাম, 'ইংগিত' নাম হবে।

—আর পারা যায় না। বললাম, নাম ঠিক হয়ে গেছে বলছি না।

—কি নাম?

—চৈতালি নামটাই আমাদের পছন্দ।

মুকুল বলল, ইংগিত নামে একটা কাগজ মেদিনীপুর থেকে বের হয়।

প্রণব বলল, স্মরণ নামটা কিন্তু দারুণ।

এবারে সত্যি উঠতে হয়। কাগজ বের করার পরিকল্পনা মুকুলের। কাগজ বের করতে পারলে আর কিছু না হোক যাকে ভালবাসে তার একটা নিদর্শন থাকবে। নামের মধ্যে সেটা সে প্রকাশ করতে চায়। চৈতালির দিদিরা তাকে এত হেলাফেলা করে, কাগজ বের করতে পারলে বোঝাতে পারবে রুচি তার কত উঁচু। গোপন ভালবাসা কত মধুর মুকুলের মুখ না দেখলে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতালি নামটাই যদি না রাখা গেল তবে কাগজ বের করার দরকার কি। বললাম, আমি যাই। তোমরা নাম ঠিক কর।

মুকুলের মুখটা ভারি বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। পরী যখন কাগজের দায়িত্ব নিতে চাইছে, তখন কাগজ বের হবেই। কিন্তু যদি নামটাই বাতিল হয়ে যায় তবে আমরা এতে নেই। আমরা দু'জনে যে করে পারি, এক দেড় ফরমার কাগজ হলেও বের করব এবং তার নাম রাখব চৈতালি।

আমাকে উঠতে দেখে পরী বলল, তুমি যে বললে নাম ঠিক করে ফেলেছ। নামটা বলবে তো।

মুকুল চুপচাপ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সাঁজ লেগে গেছে কখন। চারপাশের আলোক উজ্জ্বল শহরের এই নিরিবিলি মাঠে বসে সে যেন একা এখন আকাশের তারা গুণছে।

—বললাম তো, আমার ইচ্ছে কাগজের নাম চৈতালি রাখি।

—বা সুন্দর নাম! সুধীনদা, তুমি কি বলছ?

—খারাপ না।

নিখিল বলল, এরা দুজনেই ক্ষ্যাপা আছে। চটিয়ে লাভ নেই। পরীরও যখন পছন্দ, চৈতালি নামই থাকুক।

রাত বাড়ছে।

পরী বলল, টাকার জন্য ভাবতে হবে না। আট-দশটা বিজ্ঞাপন যোগাড় হয়ে যাবে। ওতে কাগজের খরচ উঠেও কিছু থাকবে। এখন দয়া করে লেখাগুলি তোমরা দিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি, পরী উঠে দাঁড়াল।

আমরাও সবাই উঠে দাঁড়ালাম। পরী এই প্রথম আমাদের আড্ডায় এসেছে। পরীর সম্মানার্থেই যেন আমাদেরও এবার আড্ডা ভঙ্গের দরকার। আমার ভাঙ্গা সাইকেলখানায় পা রেখে যাবার সময় পরীকে কাছে ডাকলাম। কাছে এলে বললাম, তুমি আর আমাদের বাড়ি যাবে না।

—কেন! পরী কেমন বিস্ময়ের গলায় কথাটা বলল।

—গেলে অপমানিত বোধ করব। মনে রেখো। তারপরও বলতে পারতাম, আগে বাবার ছিল দিনেশবাবু। এখন মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরী। বিপদে আপদে কিংবা পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে, তখন দিনেশবাবুর দোহাই। দিনেশবাবুকে চেনেন না—ঢাকার এত বড় জমিদার, আমি তার সেরাস্তার লোক, কত বড় কথা! এখন এসে দাঁড়িয়েছে মিলের ম্যানেজারে। আমার ভয়, পরী গেলে বাবা যে দেশবাড়িতে গোমস্তা ছিলেন, সেটাও না প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলে ফেলেন, আমরা দেশে তো মা এমন ছিন্নমূল ছিলাম না। ঘর বাড়ি জমি জমা, তারপর জমিদার বাড়িতে আদায়ের কাজ, কত কিছু ছিল। কারণ আমার বাবার কাছে কিছুই হেলা ফেলার নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে পাশ করতে পারি নি, কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছি—তাতে আমি দমে গেলেও বাবা দমেন নি। বলেছিলেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে নটা বিষয়ে পাস সোজা কথা। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে। বুঝলে, পরী বিলু দশটা বিষয়ের মধ্যে নটা বিষয়ে পাস করেছে। সুতরাং এ হেন বাবাটি পরীর কাছে, তার পুত্র-গৌরব শেষ পর্যন্ত কোথায় কতদূর নিয়ে যাবে কে জানে। আমি কম্পার্টমেন্টালে পাস পরী জানলে আমার যে মাথা কাটা যাবে, তা আর ভালমানুষ বাবাটিকে বোঝাই কি করে।

পরী কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর দুম করে বলে বসল, আমি যাব। আমি

গেলে তোমার অপমান! দেখি সেটা কতদূর। বলেই সে বেগে সাইকেলে উঠে টাউন হলের রাস্তায় উঠে গেল। পরীকে আর দেখা গেল না। অন্ধকারে আমি একা। পরী আমার সঙ্গে কথা বলছে বলে মুকুল কাছে আসছে না। পরী চলে যেতেই সে এসে বলল, পরী চলে গেল!

আমি বললাম, না চলে যায় নি। আবার যাবে বলে গেল।

পৃথিবীতে কি যে দারুণ দাবদাহ—ক্রমে টের পাচ্ছি। বড় হওয়ার এই সংকট থেকে কি করে পরিত্রাণ পাব জানি না। বাড়ি ফিরে যেতে হয় যাই। কেমন ক্রমে স্বার্থপর হয়ে উঠছি। আগেকার সম্পর্কগুলি ক্রমে কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে একদম মন টেকে না। কেমন উড়ো স্বভাব গড়ে উঠছে আমার মধ্যে।

পরী যখন বলেছে, যাবে, সে যাবেই।

আমরা দুজনে সাইকেল চড়ে কারবালার রাস্তার দিকে যাচ্ছি। মুকুল আমাকে রেল-লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। অবশ্য রেল-লাইনের গুমটি ঘরের কাছে এলেই আমাদের মনে হয় এখনও ফেরার সময় হয়নি। ফিরে কিই বা করব। ফিরলেই দেখব বাবা বসে আছেন জলচৌকিতে—মা দরজায় ঠেস দিয়ে। আমি না ফিরে গেলে যে মা খাবে না, মা জেগে থাকবে—এটা যেন আর এখন কোনো ব্যাপারই না। বরং মা আমার জন্য জেগে থাকে বলে রাগ হয়। মা বাবা খেয়ে নেয় না বলে রাগ হয়। ওদের জন্যই আমার দেরি করা চলে না। মনটা উসখুস করে। মুকুলের অনুরোধ রাখতে পারি না।

এই আর একটু বোসো না। এমন বললে কেন জানি উঠতে ইচ্ছে হয় না। আশ্চর্য সব স্বপ্নের মধ্যে আমরা কাছাকাছি মানুষ। আমাদের স্বপ্নের কথা কেউ জানে না। আমরা নিজেরাও জানি না সেই স্বপ্নটা কি! যেখানে পরীরা ঘুরে বেড়ায় চৈতালিরা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে—সমবয়সী সব যুবতীরা তাড়া করছে আমাদের এটুকু শুধু বুঝতে পারি। ওদের নিয়ে আমরা কতদূর যেতে পারি জানি না। শেষ পর্যন্ত তো সেই মা বাবা, এবং জীবনে এত সব উদ্বেগের শরিক— যেমন আমার মা বাবা এখনও জেগে বসে আছেন।

মুকুল বলল, কি ব্যাপার একেবারে চুপ মেরে গেলে!

—না ভাবছি।

—কি ভাবছ?

—আচ্ছা পরী কেন যাবে?

—গেলে কি হয়! তুমি এই নিয়ে মাথা গরম করছ কেন বুঝি না। পরী তোমাকে ভালবাসে।

—ধুস ভালবাসা। ও আসলে আমাকে অপমান করতে চায়। তুমি একদম পরীর কথা বলবে না।

মুকুল বুঝতে পারে কোথায় আমার লেগেছে। আমরা গুমটি ঘরের কাছাকাছি এসে গেছি। এদিকটায় খুবই নির্জন। কেবল বোস্টাল জেলের আলো জ্বলছে রাস্তায়। বড় বড় সব রেন ট্রি রাস্তার দু-পাশে। দু-একজন সাঁওতাল বাদুড় ধরার জন্য গাছের নিচে ওৎ পেতে বসে আছে। হাতে সরু লম্বা বাঁশ। বাঁশের ডগায় পাখি ধরার খাঁচা।

সামনে ঘাসের একটি চটি মতো আছে। গরমকাল বলে সাপখোপের উপদ্রব। টর্চ জ্বেলে মুকুল এগিয়ে গেলে বললাম, আজ আর বসব না। চলি।

—গিয়েই তো মুখ ভার করে মেসোমশাইকে এক চোট নেবে।

—আচ্ছা তুমিই বল, বাবার কি দরকার বলার ম্যানেজার আমাদের আত্মীয় হয়। তুমি জান, এই যে যাই, একদিন বলে না, মাস্টারমশাই আপনার চা! পড়াই আর দেখি আমার সামনে দিয়ে চা জলখাবার যাচ্ছে বসার ঘরে। সব বন্ধু-বান্ধব ম্যানেজারের। ক্লাবের মেম্বার। শহরের এস ডি ও। পুলিশ সাহেব কত সব মহামান্য ব্যক্তি যে আসেন সকাল সন্ধ্যায়। নিজেকে তখন এত ছোট মনে হয় যে সব ভাঙচুর করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। সেই লোকটাকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে আমি লজ্জা বোধ করি। আর দেখ বাবা পরীকে পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে। বল, মাথা গরম হবে না!

মুকুল পাজামা পাঞ্জাবী পরে আছে। আমি পরেছি প্যান্ট শার্ট। বাড়িতে ঘটি গরম করে একই

জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করে নিই। মুকুলের জামা প্যান্ট ধোপা বাড়ি থেকে ধুয়ে আসে। আমার পাশে যেন কাউকেই মানায় না। এরা যে আমাকে এত কাছের ভাবে সে শুধু কলেজ ম্যাগাজিনে আমার লেখা অসাধারণ কবিতার জন্য। হবু সব কবি মহলে এই নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন চলছে। মুকুলকে বললাম, কাগজটা বের না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

মুকুল বলল, আমিও না।

—কিন্তু আমাকে যে দেখছি কবিতাই লিখতে হবে।

—কবিতাই লেখ না। কলেজ ম্যাগাজিনে তো তুমি দারুণ লিখেছিলে। পরী সবাইকে বলেছে আমার অবিষ্কার! পরীর এই নিয়ে একটা গর্ব আছে।

—তা'লে কবিতাই লিখছি। তবে শোন, মুকুলের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, তুমি দয়া করে পরীকে বলবে ...

—কি বলব?

—না, এই মানে, পরী না হলেও চলছে না। কি যে করি। আচ্ছা, পরী খুব ওকগুঁয়ে, না?

—সে তো তুমি আমার চেয়ে ভাল জানো।

—কিন্তু পরীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এতদিনেও ঠিক জানি না পরী আমার কাছে কি চায়।

—বললাম, পরী যখন দায়িত্ব নিয়েছে, তখন মনে হয় পত্রিকাটি আমাদের সত্যি বের হবে।

—বের করতেই হবে। বের না করলে ইজ্জত থাকবে না। চৈতালি জেনে গেছে আমরা কাগজ বের করছি। ঠাট্টা করে বলেছে, তা'লেই হয়েছে। মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করা যাদের স্বভাব—তারা বের করবে পত্রিকা। আমাদের চরিত্রে নাকি দৃঢ়তা নেই।

—কে বলল! অবাক হয়ে বললাম।

—অপু।

—মানে প্রণবের প্রণয়ী?

—হুঁ, সেই রানী। প্রণব আমায় বলেছে, কেউ যেন জানতে না পারে। চৈতালির দিদিরা মনে করে আমরা সব উচ্ছন্নে-যাওয়া ছেলে। আমাদের দিয়ে কিছু হবে না। কাগজ বের করছি শুনে কী হাসাহাসি! নীতার দেওরটার মাথা খারাপ আছে বলেছে। আর সঙ্গে যে থাকে তার তো আরও বেশি। আমরা নাকি লালু ভুলু। পরীকে আমাদের মক্ষীরানী বলেছে।

—আচ্ছা!

অন্ধকারেও দেখলাম, মুকুল গম্ভীর। চৈতালি প্রসঙ্গে আর বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। আমাদের তো আরও সংকট সামনে। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে কিছুই জানি না। রেজাল্ট বের হতেও খুব দেরি নেই। পাস করতে পারব কি না তা নিয়েও সংশয়। যদি ফেল করি তখন কি হবে। টিউশন কি তখনও চালিয়ে যেতে পারব। একজন ফেল ছাত্রের পক্ষে ম্যানেজারের দুই মেয়েকে পড়ানো কি যে মর্মান্তিক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত বাবার এক মণ চালের আয়টা যাবেই। তার আগে কাগজটা বের করতে পারলে বেশ হবে। ফেল করলে আমাদের কার কি মতি হবে কে জানে। তবে পরী পাশ করবেই। সে দু বিষয়ে লেটার পাওয়া ছাত্রী। আমার মতো কম্‌পার্টমেণ্টালে পাস নয়। ওর সায়েন্স, আমার কমার্স। পরিচয় কালীবাড়ির সূত্রে। কলেজে সে আমাকে কখনও দেখেছে প্রথম আলাপে বিশ্বাস করতে পারে নি।

নিখিল মুকুল এরা আমাকে তবু বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর ভাবে। সেটা যে পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, আমার কিছু আচার নিষ্ঠা, এবং বাড়িতে খালি গায়ে পৈতা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বুঝতে কষ্ট হয় না। আমাকে বিদ্যাসাগর বলে ওরা আনন্দ পায়। আমিও ওদের এক একজনের নাম দিয়ে ফেলেছি—যেমন মুকুলকে আমরা ডাকি [illegible]রীলাল। তার কাব্যে নাকি বিহারীলালের প্রভাব আছে। সুধীনবাবু আমাদের এ কালের মোহিতলাল। দেখা হলেই, সম্ভাষণ, এই যে মোহিতলাল মশাই, আধুনিক গদ্যরীতি সম্পর্কে আর কিছু ভাবলেন?

আসলে আমরা সামনের এক গভীর কুয়াশার দিকে হেঁটে যাচ্ছি—কিংবা প্রহেলিকা বলা যায়।

সংসারে যে নিশ্চিত আয়ের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে বুঝতে পারি। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় হওয়া কত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ভাই-বোনগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। তাদের পরবার মতো ভাল জামাকাপড় পর্যন্ত নেই। বললাম, জামাইবাবু আর কিছু বললেন?

—হবে। সারকুলার এলেই তুমি এপ্লাই করবে। হয়ে যাবে মনে হয়।

—বাড়ি থেকে দূরে হবে না তো।

—কাছাকাছি কোনো স্কুলে দিতে বলব। ছোড়দি বলেছে, বিলুটার জন্য কষ্ট হয়।

মুকুলের ছোড়দির আমার জন্য কষ্ট হবারই কথা। বিকেল বেলায় একবার ছোড়দির বাসায়ও আমরা রাউণ্ড দিয়ে আসি। অনেকদিন গেছে, ছোড়দির বাসায়ও আমাকে মুকুলকে থাকতে হয়েছে। জামাইবাবুর ট্যুর থাকে। মাঝে মাঝেই রাতে তাঁর ফেরা হয়ে ওঠে না। তখন আমাকে আর মুকুলকে ছোড়দির বাড়িতে রাত কাটাতে হয়। আমার জন্য সেদিন ছোড়দি বেশ ভাল মন্দ রান্না করে রাখে। আমরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলে, ছোড়দি খুব খুশি হয়। সুতরাং আমার জন্য ছোড়দির কষ্ট হতেই পারে। ছোড়দি নাকি বলেছে, আর কারো না হলেও যেন বিলুর কাজটা হয়। সুতরাং সার্কুলার এলে আমার চাকরি হয়ে যাবে এই একটা আশায় বুক বেঁধে আছি। তখন আর কে যায় টিউশনি করতে। আশি টাকা মাইনে—ভাবা যায়। বাবার হাতের কাছে স্বর্গ ঝুলে আছে বাড়ি গেলেই টের পাই। আমার চেয়ে বাবার বেশি উদ্বেগ এ ব্যাপারে। বাড়ি গেলেই বলবে, মুকুল কিছু বলল।

কিছু বলল, মানে, চাকরির কথা জানতে চান। বাবা তখন এমন নিরুপায় চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন যে তাঁকে নিরাশ করতে কষ্ট হয়। বলি, হবে। সার্কুলার এলেই হয়ে যাবে।

রাত বাড়ে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে থাকে। গাছপালা কেমন অন্ধকারে নিথর। সোজা পাকা সড়ক চলে গেছে। আগে এই বাদশাহী সড়কটা ছিল খোয়া বাঁধানো। এখন সরকার থেকে পিচ ঢেলে পাকা করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটা গেছে লালবাগের দিকে। রেল গুমটি পার হলে দু' দিকে দুটো সড়ক। কারবালা দিয়ে গেলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বড় বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কবরখানা পার হয়ে রাস্তাটা আমাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। আগে কালীবাড়ি থাকতে এই রাস্তায় কতবার গেছি। ইঁটের ভাটা পার হয়ে নবমী বুড়ির কুঁড়ে ঘর পার হয়ে ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুটা মাঠ ভাঙলে আমাদের বাড়ি। দিনের আলোয় সাহস পেলেও, রাতে ঐ রাস্তা ধরে একা যেতে ভয় করে। বাদশাহী সড়ক ধরে যাবারও একটা ল্যাটা আছে। সড়ক থেকে নেমে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে যেতে হয়। রাত বেশি হলে, সিপাই হল্ট বলে চিৎকার করবেই। তখন বলতে হয় আমি পিলুর দাদা। ব্যস, এই যে কথা, পিলুর দাদা, এতেই হয়ে যায়। পিলুর খ্যাতি সর্বত্র।

তারপরই ট্রেনিং ক্যাম্পের আর্মারি। আর্মারি পার হলে মাঠ। মাঠে কাঁটা তারের বেড়া। মাঠে নামলেই আমাদের পাড়াটা চোখে পড়ে। বেড়ার গেট পার হলে দেখতে পাই লম্ফ জ্বলছে ঘরে ঘরে। অন্ধকার রাতে এগোনো কঠিন। গাছপালার ছায়ায়, নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। তবু পথটা এত চেনা যে, যেতে কোনো কষ্ট হয় না। কুকুর বেড়াল কিংবা মানুষের গায়ে না পড়ি এ জন্য অনবরত ক্রিং ক্রিং বেল বাজাই। যারা আছে সরে যাও বলি। বাবা মা এমন কি পিলু দূর থেকেই তখন টের পায় তার কলেজে পড়া দাদাটি ফিরছে। দেশের জন্য আর কারো তেমন কোনো মায়া-মমতা নেই। যেন চলে এসে আত্মরক্ষা করা গেছে। এবং মান মর্যাদা বিপন্ন হবার আর ভয় নেই। আমাদেরও আর মনে হয় না, আমরা ছিন্নমূল। বরং এই যেন আমাদের দ্বিতীয় জন্মভূমি। এমন কি কোথাও গিয়ে আজকাল আর ভালও লাগে না। বাড়িতে মন টেকে না, সে অন্য কারণ। যদি কাজ হয়, বাড়ির কাছে হলে ভাল হয়। বাড়ির কাছে না হলে কাজটা নেওয়া ঠিক হবে কি! কারণ এই বাড়ি ঘরের সঙ্গে বাবার মতো আমিও এক গভীর মায়ায় জড়িয়ে গেছি। বাড়ির গাছপালা, সাইকেলে চেপে উধাও হওয়ার মধ্যে কি যেন এক গভীর আনন্দ খুঁজে পাই। কাজটা দূরে হলে বাড়ির সঙ্গে সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। মনে হয় বাড়ি ছেড়ে বেশিদূর কোথাও গিয়ে থাকতেই পারব না। আর এ হেন বাড়িতে, পরী এসে আমাকে কিছুটা বিপদে ফেলে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে মান অভিমান জন্মাতে কতক্ষণ। বাড়িতে ঢোকার মুখে এ সব ভাবছিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি মা বাবা শুধু জেগে নেই। সবাই জেগে বসে আছে। এত রাতে এমন তো হয় না।

সাইকেল তোলার সময় পিলু বলল, জানিস দাদা, আজ না কী সুন্দর একটা মেয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল সাইকেলে চেপে। এসেই বলল, বিলু আছে?

আমি গম্ভীর হয়ে আছি।

পিলুর সব বিষয়ে কৌতূহল একটু বেশি। বলল, মেয়েটা তোর সঙ্গে পড়ে বলল।

—মিছে কথা বলেছে।

বাবা বোধ হয় ও ঘর থেকে শুনতে পেয়েছেন কথাটা। পুত্রের সঙ্গে এমন এক আধুনিকার পরিচয় আছে ভাবতেই বোধহয় বাবার বুক গর্বে ভরে গেছে।

বাবা বললেন, মেয়েটি আচরণে বড় লক্ষ্মীমতী। মৃন্ময়ী তোমার সঙ্গে পড়ে বলনি তো!

—আমার সঙ্গে পড়বে কেন!

—মৃন্ময়ী তো তাই বলল।

—আমাদের কলেজে পড়ে।

—সে একই কথা। বাড়িটা দেখে কি খুশি!

—বলল, কী সুন্দর বাড়ি। একেবারে আশ্রমের মতো মেসোমশাই।

বাড়িটা আশ্রমের মতো বললে বাবা খুব খুশি হন। তা কিছুটা আশ্রমের মতোই বলা যায়। পরী বাবাকে খুশি করার জন্য বলেনি। রাস্তার ধারে বড় একটা আমলকি গাছ! পাশে স্থল-পদ্ম, শ্বেত জবা, রাঙ্গা জবা, অতসী-অপরাজিতা এবং গৃহদেবতার পূজার জন্য যতরকম ফুলের দরকার। বাবা বাড়িটার সামনে সবই লাগিয়েছেন। গাছগুলির যে পরিচর্যা একটু বেশি বেশিই বাবা করে থাকেন দেখলেই টের পাওয়া যায়। এক পাশে একটু আলগা জায়গায় গোয়াল ঘর। দক্ষিণের ভিটেতে একটা বাছারি ঘর। বাবা একটা কাঠের টেবিলও বানিয়েছেন। আরও একখানা চেয়ার বানাবার পরিকল্পনা আছে। আমার কাজ হয়ে গেলে এ সবে হাত দেবেন। মা'র রান্নাঘরটি খুব ছোট। মেটে হাঁড়ি কলসিতে ঘরটা ভর্তি। সংসার করতে গেলে কত কিছুর দরকার হয় মা'র রান্নাঘরে গেলে টের পাওয়া যায়। খড়কুটো থেকে আরম্ভ করে বাবা সব সংগ্রহ করে রেখেছেন। বর্ষায় এ সবে হাত দেওয়া হবে। গ্রীষ্মে রান্নার জন্য জ্বালানি, বাড়ির গাছপালার ঝরা পাতাই যথেষ্ট। গাছের নিচ থেকে শুধু ঝাঁট দিয়ে তুলে আনা। পরী মার রান্নাঘরটি না দেখে গেছে আমার মনে হয় না।

মা'র গলা পেলাম। আমি ঘরে ঢুকেই সাইকেল তুলে চুপচাপ আমার তক্তপোষে বসে আছি টের পেয়েছে। ঘরের টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। আমার আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মায়া দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, মিমিদি কি ভাল! আমাকে থুতনিতে ধরে আদর করল!

ভিতরে ক্ষোভ রয়েছে। অথচ বোনটার নিষ্পাপ চোখ আমাকে কেমন সহজ করে তুলেছে। বললাম, এত রাত অবদি জেগে আছিস! কি ব্যাপার!

মিমিদি বলেছে আবার আসবে। আমার হাত খালি দেখে বলেছে, তোমাকে সুন্দর কাঁচের চুড়ি এনে দেব। আমাকে একটা পুঁতির মালাও দেবে বলেছে।

মায়ার হাতে একগাছা করে পেতলের চুড়ি আছে। সেই কবে একবার রাজবাড়ির রাশ থেকে মা কিনে দিয়েছিল। রাজবাড়ির রাস মেলায় মা'র সঙ্গে মায়া গিয়েছে। আমরাও যাই রাসমেলায়। তবে আমি পাড়ার সুবোধ তাফুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পছন্দ করি। মা বাবার সঙ্গে কিংবা ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে যেতে কেন জানি না লজ্জা হয়। রাস থেকে কাঁচের চুড়ি কিনবে মায়া বায়না ধরেছিল, পুঁতির মালা, কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হয়নি। টাকা-পয়সার টানাটানি। মা বলেছিল পরে কিনে দেবে। মায়া মিমির আদর খেয়ে যদি আবদার করে থাকে—বিষয়টা মাথার মধ্যে কাজ করতেই ক্ষোভের গলায় বললাম, তুই আবার চাসনি তো!

মায়া চুপ করে থাকল।

মা ডাকছে, কিরে হাত মুখ ধুয়ে নে। কত রাত করবি। খাবি না।

আর খাওয়া! মিমি বাড়িতে এসে এইসব অভাব অনটনের মধ্যে আমরা বড় হচ্ছি টের পেয়ে গেছে। বললাম, খাব না, খেতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা এবার আর ও ঘরের বারান্দায় বোধ হয় চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। বললেন, কী

হয়েছে, খাবে না কেন, শরীর খারাপ। মিমি আবার আসবে বলে গেছে। বড় ভাল মেয়ে। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল। ও ঘরে কে থাকে? বললাম, ওটা ঠাকুর ঘর।

বাবা বলে যাচ্ছেন। আমি শুনছি না, জামা প্যাণ্ট ছাড়ছি। একটা দড়িতে জামা প্যাণ্ট ঝোলানো থাকে। ধুতি টেনে নিলাম একটা। খালি গা। খুব ঘামছি। ঘরের জানালা ঝাঁপের। সামান্য হাওয়া ঢুকছে ঘরে। বাবা ঝাঁপটা আরও তুলে দিয়ে বললেন, মিমি নিজেই শেকল খুলে ঠাকুর ঘর দেখল। চরণামৃত দিলাম। কি ভক্তিমতী মেয়ে! হাঁটু গেড়ে দু-হাতের অঞ্জলিতে চরণামৃত নিয়ে খেল, বুকে মাথায় মাখল। আজকাল তো শহরের মানুষজনদের মধ্যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কোনো নিষ্ঠা নেই। যা খেয়ে নে!

এবারে আর পারা গেল না। বললাম, আচ্ছা বাবা আপনি কেন বলতে যান, মিলের ম্যানেজার আপনার আত্মীয় হয়?

বাবা কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, কি হয়েছে তাতে। আত্মীয়কে অনাত্মীয় ভাবতে তোমাদের কষ্ট হয় না? এমনিতেই তো মানুষ আজকাল কেমন একা হয়ে যাচ্ছে। একা হয়ে যাওয়াটা সংসারের পক্ষে মঙ্গল নয় জান। সব মানুষই পরিচয় সূত্রে গাঁথা—তাকে ছিন্ন করতে হয় না। বেঁচে থাকার পথে এগুলো জরুরী। তোমরাও যে একদিন বড় হবে না কে বলতে পারে। তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পরিচয় দিলে, তুমি খাটো হয়ে যাবে, না তারা খাটো হয়ে যাবে।

আমি জানি বাবার সঙ্গে কথা বলা বৃথা। এতে যে মানুষ মজা পেতে পারে বাবা বুঝতেই পারেন না। বাবার কোনো খোঁজ-খবর নেয় না, এমন কি একবার আজ পর্যন্ত আমাদের পরিবার সম্পর্কে কোনো আগ্রহও প্রকাশ করে নি, এমন কি বাবার খুড়োমশায়টি তো আমাদের কলোনির লোক ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। না হলে বলতে পারে নাতনিকে, কলোনির ছেলে, লজ্জা কি! যেন মানুষ না। একজন উঠতি বয়সের কিশোরী একজন সদ্য যুবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পেতেই পারে। সেটাও খুঁড়োমশায়টির বিশ্বাস করতে কষ্ট। বললাম, মিমিকে আপনি চেনেন না। আমি চিনি।

বাবা অত্যন্ত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন কথাটাতে। বললেন, মিমির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে।

—সে কি আমাদের নিন্দা করেছে?

—না।

—তবে!

—তবে আবার কি। ওরা কত বড়লোক আপনি জানেন না। ম্যানেজার আত্মীয় বললে ও খুব আমাদের বড় মনে করবে না। আমরা যা আছি তাই।

—যাই বল, বড় সরল সাদাসিধে মেয়েটি। আমার বয়স হয়েছে, আমি দেখলে বুঝতে পারি কার মনে কি আছে। পরিচয় সূত্রে মিমি তোমার খুবই উপকারে আসতে পারে। এ দেশে এসে আমরা আগেকার সব হারিয়েছি—এখন আবার নতুন করে আমাদের জীবন শুরু। যেখানে যেটুকু পাবে সবটাই গ্রহণ করবে। অবহেলা করা ঠিক না। যাও হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে পড়ে মেয়েটি, তোমার প্রতি ওর টান আছে।

বাবা কি তবে সব টের পেয়ে গেছেন। বলতে ইচ্ছে হল, আচ্ছা বাবা, আপনি বোঝেন না কেন, এ সব বড় ঘরের মেয়েদের এগুলি এক ধরনের মজা। আমি বলতে পারলাম না, মিমি পার্টি করে, মিমি গণসংযোগ করে বেড়ায়। আমার মতো তার অজস্র পুরুষ বন্ধু আছে। সে আমাকে আর পাঁচজনের মতোই দেখে। তার বাইরে কিছু নয়। কথা বাড়ালে বাড়বে। পিলু আমাদের কথা চুপচাপ শুনছিল। সে দাদার মিমি-সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা বোধহয় পছন্দ করছে না। সে বলল, আমাকে মিমিদি বলে গেছে ওদের বাড়ি যেতে। মিমিদিদের বাড়ি আমি চিনি। একটা কাকাতুয়া আছে বাড়িটাতে।

—তা'লে আর কি! ড্যাং ড্যাং করে চলে যাও। তোর তো মান-সম্মান বোধ এতটুকু নেই। মিমি বলে গেছে বলেই যেতে হবে! একদম যাবে না।

—বারে, আমাকে যে বলল, পিলু তুমি সকালের দিকে যেও। অন্য সময় গেলে পাবে না।

—গিয়ে কি করবি শুনি।

—কি করব আবার। কাকাতুয়া পাখিটা দেখব। রাস্তা থেকে ভাল দেখা যায় না। ওটা নাকি কথা বলে!

পিলুর পাখি এবং জীবজন্তুর প্রতি এমনিতেই একটা আগ্রহ আছে। বাড়ির পোষা কুকুরটি পিলুরই সংগ্রহ করা। পিলু একটা বাঁদরের বাচ্চাও সংগ্রহ করে এনেছে। এটা এখন এ-বাড়ির আর একজন। কেউ এলেই পিলু ওটা কাঁধে নিয়ে হাজির। একটা ঠ্যাং খোঁড়া বাদরটার। পা টেনে টেনে হাঁটে। মার খুব ন্যাওটা। মিমিকে ঠিক পিলু বাঁদরটার কাছে নিয়ে গেছে। এ সব যত ভাবছি তত মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। খেতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। হাত মুখ ধুয়ে এসে বললাম, মায়াকে তো বলেছে, কাঁচের চুড়ি এনে দেবে, পুঁতির মালা দেবে। তোকে কিছু দেবে বলেনি?

—আমাকে দেবে বলেছে।

—কি দেবে?

—ওদের বাড়ির কাকাতুয়া দেবে।

—তার মানে!

—মানে কি আবার! মিমিদি বলল, খাগড়ার বাজারে যেতে বড় বাড়িটা দেখনি? সামনে বাগান দাঁড়ে একটা কাকাতুয়া, ওটাই আমাদের বাড়ি।

বাড়িটা আমি পিলু কবে থেকে চিনি! তখন জানতামই না মিমি বলে এক তরুণী এ বাড়িতে বড় হচ্ছে। কাজেই মিমি তার বাড়ির কথা বললে, এক নিমেষে পিলু টের পেয়ে গেছে সেই বাড়িটা, ওরে ব্বাস! তার একবার ইচ্ছেও হয়েছিল বাগানের ভিতর ঢুকে সাদা রঙের অতিকায় পাখিটা দেখে। কিন্তু সাহসে কুলায় নি। শত হলেও কলোনির লোক আমরা। বাড়ির কলাটা মূলোটা বাজারে বিক্রি করে ফেরার পথে ঢুকতে চাইলে, দারোয়ান যে তেড়ে আসবে না, সেটা সে বোঝে। এখন সাক্ষাৎ জননী নিজে হাজির। পিলুর অনেকদিনের বাসনার কথা জেনে কাকাতুয়াটি যে দেবে না সেটাও বলা যায় না। দিতে পারে। কারণ সে তো যতভাবে পারে আমাকে জব্দ করার তালে আছে। আমাকে জব্দ করার জন্য কাকাতুয়াটি উপহার দেবে সেটা আর বেশি কি। খেতে বসে বাবাকে বললাম, আপনি পিলুকে বারণ করে দেবেন, ও যেন মিমিদের বাড়ি না যায়। মিমিদের বাড়ির কাকাতুয়াটি নাকি ও নিয়ে আসবে বলেছে!

বাবা বললেন, ভালবেসে দিলে নিতে হয়।

আর পারলাম না। বললাম, তাহলে নেবেন। আমি তবে বাড়ি থাকব না। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।

বাবা এতে টের পেলেন, আমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছি। এর আগেও আমি একবার বাড়ি থেকে পলাতক হয়েছি বলে, বাবা খুব ঘাবড়ে গেলেন।

বাবা বললেন, তোমার আপত্তি থাকলে আনবে না। তোমরা বড় হয়েছ, যা ভাল বোঝ করবে। বাবা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে বাবা আগেই বুঝতে পেরেছেন, আজ যেন সেটা আরও বেশি অনুভব করলেন। বাইরে বের হয়ে দেখলাম, বাবা ঠাকুরঘরের দরজা খুলে শালগ্রামশিলাটি দেখছেন। প্রদীপের নিষ্প্রভ আলোতে বাবার মুখ খুবই করুণ দেখাচ্ছে। এরপর আর ক্ষুব্ধ থাকা যায় না। হাত মুখ ধুয়ে ডাকলাম, মা খেতে দাও।

খেতে বসলে মা বলল, তোমার বাবাকে ডাক।

হাত জলে ধুয়ে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে গণ্ডুষ করার আগে ডাকলাম, বাবা আপনার ভাত দিয়েছে।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে যেন হালকা বোধ করেন। মিমিকে নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল পুত্রের সেটা কেটে গেছে ভেবে তিনি হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন। গণ্ডুষ করার সময় আমাকে গোপনে দেখছেন তাও টের পাচ্ছি। কিন্তু আমি তাকাতে পারছি না। বাবা বড় সরল মানুষ। এদেশে এসে স্ত্রী পুত্র সন্তান-সন্ততি নিয়ে অথৈ জলে পড়ে গেছিলেন। এখন ঘর বাড়ি করে স্থিতি লাভ করায় কিছুটা 'সুখী গৃহকোণ বাজে গ্রামাফোন' ভাব তাঁর। তিনি আমাকে নিয়ে বড় কিছু স্বপ্ন দেখতেই পারেন। একবার শুধু বললেন, মুকুলের জামাইবাবু কিছু খবর দিল?

—বলেছে হবে।

বাবার যেন আর কোনো দুঃখ থাকল না। খাবার পর তিনি বারান্দায় কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে তামাক টানলেন। শোবার আগে তাঁর স্বভাব, গোয়াল ঘরে একবার ঢোকা, তারপর লণ্ঠন হাতে নিয়ে সারা বাড়ি প্রদক্ষিণ করা। সব ঘরের দরজা বন্ধ কিনা, কিংবা ঠাকুর ঘরে শেকল তোলা আছে কিনা, সব দেখে শুনে সবাই শুলে তিনি শুতে যান। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার সময় টের পেলাম, আমার বাবা সংসারের মঙ্গলার্থে এখন লণ্ঠন হাতে বাড়িটা প্রদক্ষিণ করছেন। কিছু স্তোত্র পাঠ করছেন। গভীর অন্ধকার নিশীথে বাড়িটা আবার কোনো অশুভ প্রভাবে না পড়ে যায়—এ সব কারণেই তাঁর এই স্তোত্র পাঠ। ঈশ্বর নির্ভর মানুষের এ ছাড়া যেন আর কোনো গতি নেই।

কটা দিন আমার খুবই অস্বস্তিতে কাটল। বাড়িতে কখন না মিমি এসে হাজির হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের গরম, খালি গায়েই থাকা যায় না, তার উপর যদি সারাদিন গায়ে জামা রাখি—কী যে কষ্ট! তবু উপায় নেই, হুট করে মিমি এসে হাজির হলে দেখতে পাবে আমি খালি গায়ে বারান্দায় কিংবা ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। কিংবা নিজের ঘরে চুপচাপ বসে কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। কখন হুট করে ঢুকে যাবে, কেউ বলতে পারে না। কাজেই সকালে উঠেই জামা গায়, চান করে এসেও জামা গায়, বিকেলে বের হবার আগেও জামা গায়—বাবা এক দু-দিন লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে!

বাবা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা দিতে রওনা হবার আগে এমন কথা বললেন। বাবার খালি গা। নামাবলী চাদরের মতো জড়ানো। হাতে একটা গামছা। গামছাখানা সঙ্গে রাখেন, পূজা আর্চা হয়ে যাবার পর যজমানদের দেওয়া প্রসাদ এবং ভোজ্য সব গামছায় পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আসেন। বাবা এখন যত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে চলে যান তত মঙ্গল। আমি চাই না, বাবার এই বামুন ঠাকুরের চেহারা মিমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করুক। পা খালি। বোধহয় ক্রোশখানেক পথ যেতে হবে, এ জন্যে খড়ম পায়ে এতটা পথ যাবার তাঁর সাহস নেই। খালি পায়ে রওনা হয়েছেন। বাবার ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ফেরার পর দেখা যাবে, ট্যাঁকে দুটো তামার পয়সা দক্ষিণা, আর গামছায় কিছু চাল কাঁচা হলুদ আলু এমন সব মিলে পোয়াটেক জিনিস। এরই জন্য সকাল সকাল স্নান সেরে গৃহদেবতার পূজা শেষ করে বের হয়ে পড়েছেন। পূজা আর্চার জন্য তিনি নিরম্বু উপবাসে অনেক কাল থেকে অভ্যস্ত। ফিরে এলে তাঁর আহার। মাও ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে। অসুখ-বিসুখ হয়নি বলেও পার পাওয়া যাবে না। আমার উত্তরের আশায় ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। হাঁটা দিতে পারছেন না। বলতেই হয়, অসুখের কি দেখলেন!

—জ্বর জ্বালা যদি হয়! তবে তোমার চোখ তো পরিষ্কার। তোমার কি শীত শীত করে?

—শীত করবে কেন!

—ঠাণ্ডা লাগেনি তো?

—না, ঠাণ্ডা লাগেনি। ভালই আছি। আমার কিছু হয় নি।

—কিছু হয়নি তো গায়ে সারাক্ষণ জামা রাখছ কেন?

মহামুশকিল আমার এই বাবাটিকে নিয়ে। গায়ে কেন জামা রাখছি তারও কৈফিয়ত দিতে হবে।

—গরমে হাঁসফাঁস আর তুমি কি না গা থেকে জামা খুলছ না। ঘাম বসে বুকে কফ-টফ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

—আমার কিছু হবে না। বলে ঘরে ঢুকে গেলে বাবা বুঝতে পারলেন, এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজি না। তিনি চলে যাবার সময় বললেন, যা খুশি করো। আমার কি! আমি আর ক'দিন? তোমরা বড় হয়েছ, এখন তোমাদের মেজাজ-মর্জি আমি বুঝব কি করে! আমার কোনো কাজই তোমাদের পছন্দ না।

এতটা পর্যন্ত শুনেছি, পরে কি বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন বুঝতে পারলাম না। পিলু পুকুর থেকে জল-শাক তুলে এনেছে এবং সঙ্গে যথেচ্ছ সাঁতার কাটা সহ, ডুব সাঁতারে পুকুর এ-পার ও-পার হওয়ার কাজটুকু সেরে আসায়, চোখ জবা ফুলের মতো লাল। বোধ হয় বাবা বাড়ি থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ঢুকতে সাহস পায়নি। চোখ দেখলেই বাবা টের পেতেন তাঁর মেজ সন্তানটি পুকুরের জলে সকাল থেকেই অদৃশ্য হয়েছিল। মাঠে গরু দিয়ে আসার নামে সে যে এতক্ষণ নিখোঁজ

ছিল, তার একটাই কারণ, জল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়া। গরম থেকে পরিত্রাণের এর চেয়ে যেন বড় উপায় তার হাতের নাগালে আর কিছু নেই।

জল-শাক তুলে এনেছে বলে মা'র কোনো আর অভিযোগ নেই পিলুর বিরুদ্ধে। মুসুরির ডালে বড়ি দিয়ে বাবা জল-শাক খেতে খুব পছন্দ করেন। সুতরাং পিলু মাকে কোঁচড় থেকে জল-শাক তুলে দেবার সময় বলল, মা, বাবা গজগজ করতে করতে যাচ্ছে। তুমি বাবাকে কিছু বলেছ?

মা বলল, আমি বলবার কে! আমার আর গুরুত্ব কি। আমি বললেই কে শোনে!

আসলে সবটাই আমাকে উপলক্ষ্য করে বলা।

—তা'লে দাদার সঙ্গে হয়েছে।

—জানি না। দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

পিলু মাথা মুছছিল গামছা দিয়ে। আর একটা গামছা পরনে। ভাল করে ঢাকাঢুকি নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, দাদা তুই বাবাকে কিছু বলেছিস?

—কী বলব? কিছু বলিনি। সব তো দেখা যাচ্ছে। তুই কি রে!

পিলু নিচের দিকে তাকিয়ে জিভ কামড়ে ছুটে বের হয়ে গেল।

এ বাড়িতে আমার কত সমস্যা বাবা মা কেউ বুঝতে পারবে না। পিলু দৌড়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে সত্যি একেবারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। ঢাকাঢুকির ব্যাপারে কোনো সতর্কতা নেই। আমাদের পরিবারের সব কিছুই বড় খোলামেলা। মিমিকে দেখলে বুঝতে পারি কোথায় আমাদের সঙ্গে তার কতটা দূরত্ব। সে যেন যোজন প্রমাণ। এত বড় দূরত্ব অতিক্রম করার সাহস কিংবা সামর্থ্য আমার নেই। সুতরাং সে গায়ে পড়ে এলে, বুঝতে হবে আমায় অপমান করা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। সে বোঝে আমি কেন তাকে এড়িয়ে চলি।

আশ্চর্য, চার-পাঁচ দিন হয়ে গেল মিমির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। নিখিল বলল, মিমি পার্টি অফিসেও যাচ্ছে না। আমরা রাউণ্ড মারতে বের হলে শুধু দেখি, চৈতালীর ন্যালা ক্ষ্যাপা দিদিটা বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা ম্যাকসি গায়ে। মুখ দিয়ে সেই লালা ঝরছে। দু' হাত ঝুলে আছে দু'দিকে। আর ঘাড় কাত করে একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে দুলছে। আড্ডায় পত্রিকা নিয়ে যা শেষে গড়াল তাতে কিছু করা যাচ্ছে না। মিমির বাড়ি গিয়ে যে খোঁজ করব তারও জোর নেই। আমি যখন বলতে পারি তুমি যাবে না, গেলে আমি অপমানিত হব, তখন মিমিও মনে করতে পারে তার বাড়ি গেলে সে অপমানিত হবে। আসলে মিমিদের বাড়ি যাবার জোরটাই যেন হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ একদিন সকালে মুকুল বাড়ি এসে হাজির। খুব হন্তদন্ত অবস্থা। সে আমার ঘরে ঢুকেই তক্তপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, খবর ভাল না।

—কিসের খবর?

—কাগজের নাম চৈতালী রাখা চলবে না।

—কেন, কি হল?

—চৈতালী ক্ষেপে গেছে। দিদিদের নালিশ দিয়েছে। তাকে ছোট করার জন্যই নাকি আমরা কাগজটার নাম চৈতালি রাখছি।

আমি টেবিলে পা গুটিয়ে বসি। বললাম, এদের তুমি কিছুতেই মহান করে তুলতে পারবে না। নারী জাতির কি যে ভাব বুঝি না ভাই। বাবা ঠিকই বলেন—যা দেবী সর্বভূতেষু দেবীরূপেন সংস্থিতা। কি নাম রাখবে তবে? এদিকে মিমির পাত্তা নেই। মিমি এ বাড়িতে এসে মাসিমা মেসোমশাই করে গেছে। সে এ বাড়িতে পরী নয়, মিমিও নয়, একেবারে মৃন্ময়ী। কখন উদয় হবে ভয়ে মরছি, আর এখন একেবারে বেপাত্তা। বল, ভাল্লাগে!

মুকুল চিৎকার করে বলল, মাসিমা জল। এক গ্লাস জল।

মায়া জল রেখে গেলে বলল, কিরে তুইও দেখছি বড় হয়ে গেলি। মায়া শাড়ি পরে এসেছিল,

মুকুলের কথায় দৌড়ে পালাল।

—তা'লে পরী এখন তোমাদের বাড়িতে মৃন্ময়ী।

—বোঝ তবে! বাবা তো মৃন্ময়ী বলতে অজ্ঞান। মৃন্ময়ী বড় ভক্তিমতী। কী লক্ষ্মী মেয়ে! হাঁটু গেড়ে ঠাকুর প্রণাম! চরণামৃত পান। বল কত সহ্য করা যায়।

—খুব বিপদ। বলে মুকুল হাই তুলল একটা। জলটা খেল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তা'লে কি হবে?

এমন প্রশ্ন করলে আমাদের দুজনেরই চুপ করে থাকার কথা। এমন অবসর বেলায় এখন আমাদের দুই বন্ধুতে সাইকেল চেপে উধাও হওয়ার কথা। কারণ চার পাশে রাস্তাঘাট শহর, বাড়ি, গাছপালা সব আমাদের টানে। আর এ সময়ই প্রশ্ন, তাহলে কি হবে! পরী কি আমাদের সঙ্গে নেই! না থাকুক, ভারি বয়ে গেল। নাম 'চৈতালী' হবে না। না হোক, অন্য নাম রাখব। ভয়ের কি আছে। সুধীন বাবুরা তো লিখেই খালাস। লেখা সংগ্রহ করা থেকে সব কিছু আমাদের। সবাই না হয় চাঁদা তুলে করব। একমাসের টিউশনির টাকা না হয় আমি দেব। আর কাজটা হয়ে গেলে তো কথাই নেই। কাজের টাকা বাবার। টিউশনির টাকা কাগজের। বললাম, একবার যখন নামা গেছে পিছিয়ে আসা যায় না। আমরা কাউকে অপমান করব বলে কাগজের নাম চৈতালী রাখিনি। নারীদের আমরা শ্রদ্ধা করি।

আমার মুখে রীতিমতো বক্তৃতা শুনে মুকুল ঘাবড়ে গেল। আগে আমিই কাগজ সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলাম, এখন আমিই কাগজ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছি দেখে মুকুল মনে মনে খানিক আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সে-ই আমাকে টেনে নামিয়েছে কাজে—আমার যা স্বভাব কিংবা গোঁ, কে জানে, কখন একেবারে হিতে বিপরীত করে বসতাম। ফলে সে আমার কাছে সাহস পেয়ে বলল, চৈতালী ছাড়া আর কি নাম রাখা যায় বল তো!

—প্রাংশু!

—ধুস! তুমি কি না!

—করালী!

—তুমি ঠাট্টা করছ কেন বিলু। এখন থেকে কাজের গুরুত্ব যদি আমরা বুঝতে না শিখি তবে কবে থেকে শিখব। জামাইবাবুর কানে কথাটা উঠেছে। তিনি ডেকে বলেছেন, কাগজ নিয়ে বেশি মাতামাতি করবে না। ওতে আখের নষ্ট। রেজাল্ট বের হলে, মন দিয়ে লেগে যাও। চাকরি-বাকরি পাওয়া খুব কঠিন। কাগজে পেট ভরবে না।

—ছোড়দি কিছু বলল না?

ছোড়দিই তো রক্ষা করল। —রাখ তোমার চাকরি-বাকরি। ছেলেমানুষ, এ বয়সে কত শখ থাকে। এরা তো ভারি নিষ্পাপ ছেলে। কোনো খারাপ স্বভাব আজ পর্যন্ত দেখিনি। আজকাল দেখি তো সব স্যাম্পেল।

—আচ্ছা মুকুল, ছোড়দির কাছে কিছু টাকা বাগানো যায় না। তা'লে পত্রিকাটা একেবারে মৃন্ময়ী-নির্ভর হয়ে থাকত না।

—যায়। মুসকিল কি জান, ছোড়দি লুকিয়ে দেবে। বললেই দেবে। কিন্তু জান তো জামাইবাবুটিকে। কি কঠিন প্রকৃতির। ধরা পড়লে অশান্তি হবে।

—কি যে করি! সত্যি আমাদের ছোড়দি এত সুন্দর আর আমাদের জন্য যদি কটু কথা শুনতে হয়, না, ঠিক হবে না। বললাম, থাক তবে—

—কিন্তু নামটা ঠিক করে ফেল। মুকুল উঠে বসল।

—তোমার মাথায় আসছে না?

—না। চৈতালী ছাড়া আমার মগজে কোনো নাম নেই।

আচ্ছা যদি 'অপরূপা' রাখি। দুই কুলই সামলে দেওয়া গেল! আমরা তো চৈতালী নামটা রেখে তোমার অপরূপাকে মহৎ করতে চেয়েছিলাম। যাকে বলে চিরস্মরণীয় চৈতালী বদলে অপরূপা। কারও কিছু বলার থাকবে না। তুমি আমি জানলাম আমাদের অপরূপাটি কে!

গ্র্যাণ্ড। ভাবা যায় না। একটা ডামি করে ফেলতে হবে। চল বের হয়ে পড়ি। সোজা দিলীপের

কাছে। প্রেসে সব কথাবার্তা হবে। সে একটা মোটামুটি চার পাঁচ ফর্মার কাগজ বের করতে কত লাগবে বলতে পারবে। ত্রৈমাসিক না ষাণ্মাসিক।

ষাণ্মাসিক খুব লং গ্যাপ। অত বড় গ্যাপ রাখা ঠিক হবে না।

তা'লে ত্রৈমাসিক! আর মনে হয় এর মধ্যে তোমার কাজটা হয়ে যাবে। আমারও ইচ্ছে ছিল কাজ নিই, দাদা একেবারে রাজি না। দু-দিক সামলানো নাকি আমার কম্ম নয়। আমি নাকি নিজে কি পরে বের হব তারও খবর রাখি না। আত্মনির্ভরশীলতার বড় অভাব। বৌদি-সর্বস্ব হয়ে আছি। কি জ্বালা বল, নিজে করতে গেলে বৌদি বলবে, আমি কি মরে গেছি। কিছু করারও উপায় নেই, অথচ হরদম খোঁচা সহ্য করতে হবে। পরীক্ষায় পাস করার পর ভাবা যাবে—দাদার এক কথা।

মুকুলের এটা সত্যি বড় সৌভাগ্য। বৌদির এমন মিষ্টি স্বভাব যে আমার মতো লাজুক ছেলেকেও হার মানিয়েছে। আড্ডা মারতে গিয়ে বেলা হয়ে গেল, বৌদি দাদার একখানা কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলবেন, চান করে এখানেই বাবুর দুটো খেয়ে নেওয়া হোক। রোদে আর বাড়ি ফিরতে হবে না। কতদিন এ ভাবে আর বাড়ি না ফিরে সারাটা দিন শুয়ে বসে ঘুরে ফিরে এক মুক্ত জীবনের স্বাদ বয়ে বেড়াচ্ছি। টিউশনি আর মিমি বাদে গলায় কোনো কাঁটা বিঁধে নেই।

বের হতে যাচ্ছি, দেখি রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে। বেশ সুপুরুষ মানুষটি। —বিলুবাবু এখানে কোন্ বাড়িটায় থাকেন?

—আমিই, বলুন।

—মিমি পাঠিয়েছে।

একটা প্যাকেট। যুবকটি বোধহয় রিকশায় কিংবা গাড়িতে এসেছে। আমাদের বাড়িতে সাইকেলে আসা যায়। তারপর আর কোনো যানের পক্ষেই অগম্য আমাদের রাস্তা। গরুর গাড়ি অবশ্য আসতে পারে। তাই বলে আমার বাড়ি আসার জন্য যুবকটির পক্ষে গাড়ি ভাড়া করা সমীচীন হবে না ভেবেই, পাকা সড়কে গাড়ি কিংবা রিকশা রেখে এসেছেন। আমি মুকুলের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোককে, ঠিক ভদ্রলোক বলা যায় না, আমাদের চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড়, কি আরও কিছু—কিন্তু তিনি যে মৃন্ময়ীর কে বুঝতে পারলাম না।

আমার নাম পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ও আপনি, মানে আমার মুখে কথা সরছিল না। এখানকার স্থানীয় এস ডি ও সাহেব। একবার যেন এঁকে মিলের ম্যানেজারের বাড়িতে দেখেওছি। গলায় টাই, একেবারে সুটেড বুটেড মানুষ। পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকলে চিনি কি করে! আর তখনই দেখি বাবা গরু বাছুর ছেড়ে দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে আসছেন। সর্বনাশ! কাছে এলেই হাজার প্রশ্ন, মহোদয় আপনার নিবাস। কি করা হয়। তাড়াতাড়ি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। পরেশচন্দ্রকে এগিয়ে দেওয়া দরকার। বাবা এসে পড়লে রক্ষা থাকবে না। বললাম, চলুন, আমরা বের হচ্ছিলাম।

সুপুরুষ মানুষটি চারপাশটা এখন খুব লক্ষ্য করে দেখছেন। কি ভেবে বললেন, প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে মিমি বলল, তুমি এটা দিয়ে এস। ট্রেনিং ক্যাম্প পার হলেই ওদের বাড়ি। নাম বললেই দেখিয়ে দেবে। কী যে এত জরুরী বুঝলাম না।

—মিমির তো পাত্তা নেই। ওকে বলবেন, ও না থাকলেও কাগজ আমরা ঠিক বের করব।

মুকুল বলল, না না ওসব বলতে যাবেন না। মিমির কি কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে। বাড়ি থেকে কোথাও যাচ্ছে না?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, না ভালই আছে। বাড়ি থেকে কিছুদিন বোধহয় ওর বের হওয়া বারণ।

আমি খুব করুণ গলায় বললাম, কেন, কি হয়েছে?

—ও এমনি। বলে ভদ্রলোক মজার হাসি হাসলেন।

আমাদের বাড়িতে খোদ এস ডি ও সাহেব, খুবই অভাবিত ব্যাপার। এবার যেন বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছি। যত অনুধাবন করছি তত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি। কি ভাবে একজন এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও জানি না। বাড়িতে বসতে বলা দরকার ছিল—এটা ভদ্রতা।

জানি বসতে দেবার মতো জায়গায়ও আমাদের নেই। যত সঙ্গে যাচ্ছি এগিয়ে দিতে তত ঘাবড়ে যাচ্ছি। প্যাকেটটা খুলে দেখাও হয়নি ভিতরে কি আছে।

বললাম, প্যাকেটে কি আছে?

—কি যেন বলল, কিসের একটা ডামি।

সে যাই হোক—রাস্তায় খুলে আর এস ডি ও সাহেবের প্রতি অমনোযোগী হতে পারি না। বাবা বাড়ি ফিরলে ঠিক জিজ্ঞেস করবেন, কে? বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে। বসতে বললে না। এটা তো পরিবারের নিয়ম না।

সুতরাং এখন আমি আর মুকুল, দুজনেই ক্রমে বিষয়টা অনুধাবন করে, আপনি আজ্ঞে শুরু করেছি। বলছি, মিমিটা যে কি। ও নিজেই দিয়ে গেলে পারত। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও পারত। আপনাকে অহেতুক....

আরে না না। ও কিছু ভাববেন না বিলুবাবু।

খুব সম্মান দিয়ে কথা বলছেন। স্বাভাবিকভাবেই সাহেবটিকে বড় বিনয়ী মনে হল। আমরা উঠতি যুবা, ফাংশান টাংশানে যাই, রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করি। আরও কত অনুষ্ঠান সূচী—ঠিক এক মুহূর্তেই মনে হল, এস ডি ও সাহেবের নামটি মিমি বলেছিল। কলেজ সোস্যালে মিমি, ডি এম, এস ডি ও এবং কলকাতা থেকে একজন বড় সাহিত্যিককেও নিয়ে এসেছিল। মিমির পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়।

ট্রেনিং ক্যাম্প পার হতেই আমগাছের ফাঁকে দেখলাম সড়কে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। শহরের গাড়ি বলতে মিমি এবং দুই রাজবাড়ির দুটো গাড়ি আছে। ছোট রাজার বুইক, আর বড় রাজার মার্সিডিজ। মিমিদের গাড়িটা খুবই চকচকে, নতুন। মিমি সাধারণত গাড়িতে কোথাও যায় না। একমাত্র কালীবাড়ীতে পূজা দিতে গেলে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে মিমিকে দেখা যেত। অবশ্য বিপ্লবী মেয়ের পক্ষে বোধহয় গাড়ি চড়া শোভাও পায় না। কাছে গিয়ে অবাক! দেখি সেই বিপ্লবী মেয়েটি দারুণ সেজে জিপ গাড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেও দেখল না। বুকটা সহসা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মিমি আমার পাশে মুকুলকে দেখে যেন কিছুটা স্বাভাবিক। বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। দয়া করে সম্পাদক মশাইকে বলবেন, কার লেখা কোথায় যাবে তার যেন একটা লে-আউট করে দেন। আর নিজের কবিতাটি যেন দয়া করে সঙ্গে পাঠান। গোটা দশেক বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে।

একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। কিন্তু খোদ এস ডি ও সাহেবের গাড়িতে যিনি বসে আছেন তাঁর সঙ্গে মতান্তর আছে ভাবাটাই যেন আমার অপরাধ।

পরেশচন্দ্র বললেন, চলি বিলুবাবু।

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মিমি একবার চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। অনেকক্ষণ স্তব্ধ আমরা দুজনেই। মুকুল বলল, আর দেখতে হবে না। চল। আগুন নিয়ে খেলছিলে। বোঝ মজা!

—আমি খেলতে যাব কেন। আমার সে দুঃসাহস নেই। খারাপ লাগছে মিমি একটা কথা বলল না।

আমি আর মুকুল সেদিন সারাটা বিকেল ঘুরলাম। কিছু ভাল লাগছিল না। এমন অর্থহীন নিজেকে কখনও মনে হয় নি। আমি তো আশা করি না। মিমি নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। প্রথমে ছিল ওটা ওর মজা। কালীবাড়িতে এসেই লক্ষ্মীর কাছে শুনেছিল, বদরিদা নটু পটুর জন্য বাচ্চা মাষ্টার রেখেছে। চিড়িয়াখানায় জীব যেভাবে দেখতে আসে, মিমি সেদিন সেভাবেই আমাকে দেখতে এসে আমাকে নিয়ে মজা করবে ভেবেছিল।

কালীবাড়িতে লক্ষ্মী কখন যে মাস্টার সম্বল ভেবে আমার সব কাজ, খাওয়া-দাওয়া, বিছানা করা, জামা প্যাণ্ট কেচে রাখা থেকে স্নানের জল তোলার কাজটা হাতে নিয়ে ফেলেছিল। কলেজ থেকে দেরি করে ফিরলে দেখতাম লক্ষ্মী নিম গাছের নিচে আমার ফেরার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই লক্ষ্মীও এক জ্যোৎস্না রাতে সব টের পেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার পাপের শেষ নেই।

আজ কেন জানি এটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, জীবনে অনেক ভোগান্তি আছে।

রেল লাইনের কাছে সেই গুমটি ঘর। তার পাশে ঘাসের চটান। নিরিবিলি জায়গা। এখানাটায় এসে মুকুলকে বললাম, চল বসি। প্যাকেটে কি আছে দেখি।

সাইকেল ঘাসের উপর ফেলে রেখে আমরা বসলাম। বললাম, তোমার কি মনে হয়?

মুকুল বুঝতে না পেরে বলল, প্যাকেটটা খুব ভারি। খুলে দেখি না।

—আরে না। মিমি পরেশচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরছে—আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

—ও একটু তরলমতি আছে। কখন কি করবে আমরা কেউ টের পাই না। বাড়ির মানুষজনও টের পায় কি না সন্দেহ আছে। ও নিয়ে ভেবো না।

—না, ভাববার কি আছে! ভাবব কেন। তারপর বলার ইচ্ছে হল ভাববার অধিকারই বা আমাদের কতটুকু। আফটার অল আমরা কলোনির ছেলে। জান, কলোনির বাইরের লোকের ধারণা আমরা মানুষ না।

মানুষ না ভাবলে মিমি তোমার কাছে যেত না।

মানুষ ভাবলে আমার সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে কেউ যেতে পারে না।

বারে, তুমি ওকে অপমান করতে পারলে রাজা আর সে তোমাকে অপমান করতে পারলে রাণী হবে না সে কেমন করে হয়।

আমি চুপ করে বসে থাকলাম। প্যাকেট খোলা হলে দেখলাম ওতে অনেকগুলো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা। একটা হাত চিঠি, মিমি লিখছে,

বিদ্যাসাগর মশাই, আপনার জন্য পাঠালাম। আপনার নির্বাচনই শেষ কথা। যেটা যাবে তার উপর আপনি দয়া করে একটা সই করে দেবেন। অমনোনীত লেখাগুলোতে ক্রশ চিহ্ন। সুধীন দা, দিলীপের সঙ্গে কথা হয়েছে। ডামির উপর কাগজের নাম লিখে দেবেন। ইতি মিমি।

তা'লে সুধীনবাবুর কাছে থেকে জেনে ফেলেছে, আমাকে তারা বিংশ শতাব্দির বিদ্যাসাগর মশাই বলে সম্বোধন করে। আমাদের আড্ডায় কে কাকে কি নামে ডাকে, মিমির মতো তরলমতি যুবতীর কাছে না বললেই হত। সে আমাকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি।

একা ফিরছি। রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণ মুকুল সঙ্গে থাকায় মনটা হালকা ছিল। একা হয়ে যেতেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ ঘাট ভেসে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও দূরে বৃষ্টিপাত হয়েছে টের পেলাম। উত্তাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিংবা দুঃখ কষ্ট মানুষের চিরজীবন থাকে না। ছিন্নমূল পিতার সন্তান—যেকোনভাবে পারি তার থেকে পরিত্রাণ চাইছি। অভাবের তাড়নায় একবার মেট্রিক পরীক্ষা দেবার পর পলাতকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম, মিমির জন্য আবার না পলাতক হতে হয়।

বাড়ি ফিরে অবাক।

পিলুই খবরটা দিল।

—দাদা মিমিদি এসেছিল।

—কখন?

—তুই বের হয়ে গেলি ঠিক তারপর।

—মানে!

পিলু মানেটা বুঝবে কি করে! মায়া লাফিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, এই দ্যাখ দাদা, আমার চুড়ি, পুঁতির মালা।

বাবা ঠাকুরঘরে বৈকালি দিচ্ছিলেন। ঘণ্টা নাড়ার শব্দ পেলাম। যেন দ্রুত তিনিও ঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা করে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছেন। এলেনও। বাইরে বের হয়ে বললেন, মৃন্ময়ী আমাদের একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে বলেছে। ওদের বাড়িতেও নাকি বিগ্রহের মন্দির আছে।

মিমি কি বাবাকে ওদের বাড়িতে পূজার বামুনের কাজটা দিতে চায়। ওরা ভাল মাইনে দেয়—বাবা যদি রাজী হয়ে যান। বললাম, না কেউ যাবে না।

—কি বলছিস তুই! মাও দেখলাম কেমন রুষ্ট গলায় কথাটা বলল।

বাবা বললেন, মৃন্ময়ী তো বলল, ওর ঠাকুরদা তোমার উপর খুব প্রীত।

—তাই নাকি!

আমার আচরণে আজকাল মা বাবা কোনো অর্থ খুঁজে পান না। হয়তো ভাবেন, বিলুটা দিন দিন কেমন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। কোন কথাই বলা যায় না। ওঁরা হতবাক হয়ে গেছেন। বাবা আর কিছু না বলে তামাক সাজতে বসলেন। সব ক্ষোভ দুঃখ যেন তিনি এক ছিলিম তামাক খেতে পারলে ভুলে যেতে পারেন।

টের পাচ্ছিলাম মাথাটা ধরেছে খুব। জলচৌকিতে বসে বললাম, আমার কাজ হয়ে যাবে। সার্কুলার এসেছে। কেউ কোনো কাজের কথা বললে, নেবেন না।

বাবা এবার কলকেতে তামাক টিপতে টিপতে বললেন, সে রকমের তো কোনো কথা হয়নি। মৃন্ময়ী বলল, মেসোমশাই, আপনাদের এসে নিয়ে যাব। ওদের বাড়িতে শ্রাবণে খুব ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা হয়। ওর দাদুরও ইচ্ছে তাই। দাদুকে বলেছে, কালীবাড়িতে বাবাঠাকুরের নাকি তুমি খুব প্রিয়জন ছিলে। বাবাঠাকুরের শরীর ভাল না। একবার তাঁকে তোমার দেখে আসা উচিত।

সত্যি তো, সেই যে কালীবাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম, আর ওদিকটায় আমার যাওয়া হয় নি। বৌদি, বদরিদা, বাবাঠাকুর কে কেমন আছেন খোঁজই নিইনি। আসলে, আমি যেতে ভয় পাই। কারণ যখনই যেখান থেকে কালীবাড়ি ফিরেছি, দেখেছি মন্দিরের দরজায় লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। এখন গেলে দেখব কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বড় ফাঁকা লাগবে, শূন্যতা এসে গ্রাস করবে। কেউ আর বলবে না, মাস্টার তোমার এত দেরি!

মাথার কাছে টেবিলে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। মৃদু আলো। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেওয়া যায়। আমার তাও ইচ্ছে করছে না। মিমির দেওয়া প্যাকেটটা পড়ে আছে। লেখাগুলো খুলে দেখেছি কিন্তু পড়া হয় নি। কী আছে ভিতরে! ইচ্ছেও করছে না পড়তে। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি। পরেশচন্দ্র এবং মিমির উধাও হয়ে যাওয়া এবং সে বের হয়ে গেলে মিমির একা বাড়িতে আসা বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার। সঙ্গে পরেশচন্দ্র থাকলে বাবা ঠিক বলতেন। মিমি কী তবে বাঁকের মুখে নিমতলায় গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে একা হেঁটে এসেছিল! এসে সারা বিকাল বাড়িতে কাটিয়ে গেছে। মেয়েটা দজ্জাল, তরলমতি না বিপ্লবী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চৈতালীর দিদিরা ওর নাম দিয়েছে মক্ষীরানী। তা ও কিছুটা পুরুষ-ঘেঁষা। পার্টি করলে যা হয়। মিছিলের আগে শুধু নয়, মিছিল পরিচালনা করতেও তাকে শহরের পথে দেখা গেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার জ্বালাময়ী ভাষণ বড় মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। আর হাতের কাছে এমন সব যুক্তি খাড়া করে রাখে যে মনেই হয় না সে এতটুকু অসত্য ভাষণ করছে। আসলে ভিতরে মিমি এখন চরম সংকটের মুখে। সেই এক আত্মপ্রকাশ। কিন্তু পরেশচন্দ্র যে একটা কাঁটা হয়ে গলায় গেঁথে আছে সেটা টের পেয়ে চোখ আরও জ্বালা করতে থাকল। ভিতরে আমারও এক আত্মপ্রকাশের জ্বালা—যার থেকে রেহাই নেই। একমাত্র কবিতা সৃষ্টি করে বুঝিয়ে দিতে পারি আমি তোমার চেয়ে কম কিসে।

সুতরাং আমার ঘুম নাও আসতে পারে। পিলু পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার কাকাতুয়া পাখি চাই। মিমি একদিন তাও দিয়ে যেতে পারে, কিংবা বলতে পারে, চল পিলু, কাকাতুয়া পাখিটা নিয়ে আসবি। সেই আনন্দেই আছে। মিমিদি সেই কাকাতুয়া বাড়িটায় থাকে জেনে চরম বিগলিত হয়ে গেছিল। কত বড় বাড়িরে দাদা! কি বিশাল বিশাল কারুকার্য করা থাম। ও! ভাবা যায় না! পিলু কেন, বাবাও ঠিক বাড়িটা দেখেছে। শহরে কাকাতুয়া তো ঐ একটা বাড়িতেই আছে। রিকশায় চড়ে কিংবা উঁচু বা লম্বা মানুষ হলে পাঁচিলের ও পাশে দাঁড়ে ঝোলানো কাকাতুয়াটা কারো চোখে পড়বে না কথা নয়। বাবা ঠিক বুঝতে পেরেছেন কোন্ বাড়ির মেয়ে মৃন্ময়ী। ওদের বৈভবই মৃন্ময়ীর প্রতি বাবার যত সম্ভ্রমের কারণ।

মনে হল, বাবাকে যেন ছোট করছি। বাবা তো আমার এমন মানুষ নন। বাবা কি তবে মৃন্ময়ীর আচরণে মুগ্ধ। কত বড় বাড়ির মেয়ে তাঁর বাড়ি নির্দ্বিধায় আসে। তাঁর ছেলের সঙ্গে এক কলেজে পড়ে। আসলে বাবার সেই এক পুত্র-গৌরব। পুত্রটি একদিন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি হবে এমনও আশা পোষণ করে থাকতে পারেন। আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠীতে এমনই নাকি লেখা আছে। বৈভব বাবাকে কোনোদিন

বিচলিত করে না। কারণ বাবার কাছে তাঁর এই বাড়িটুকু, গাছপালা, বিগ্রহ এবং গাভী সকল মিলে লক্ষ কোটি টাকার চেয়েও মূল্যবান। বাবা আমার এ দেশে এসে কত সহজে মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে দিতে পারলেন।

বুঝলাম ঘুম আসবে না। উঠে বসলাম। কিছু লেখা যায় কিনা চেষ্টা করলাম। না মাথা ফাঁকা। একটা লাইন আসছে না। শুধু সব লাইনে পরীর দুই ভরা চোখ, পুষ্ট স্তন, এবং ঋজু কোমর এবং নাভিমূলে এক পরমাশ্চর্য দ্বীপ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষাতে মরিয়া হয়ে উঠেছি। পরী সেদিন কালীবাড়িতে জ্যোৎস্না রাতে কেন যে বনের গভীরে নিয়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চেয়েছিল। সবটা দেয়নি। কিছুটা দিয়েছে। এই কিছুটাই আমাকে যে পাগল করে দিচ্ছে বুঝি।

লিখতে বসে কত সব স্মৃতি আমাকে পাগল করে তুলছে। একটা লাইন নেই মাথায়। দুই পাশে দুই নারী। মিমি আর লক্ষ্মী। আরও একজন, সেই ভায়া দাদু টিউশনির বড় মেয়ে। এই বয়সে মানুষ একা হয়ে যায়। সে নারীসঙ্গের জন্য পাগল হয়ে থাকে। বুঝতে পারি আমার লেখা লিখি সবই এই নারীসঙ্গ থেকে পরিত্রাণের পথ। ইচ্ছে করলেই তো কোনো নারী সম্ভোগে এখন তৃপ্ত হতে পারি না। কত রকমের পাঁচিল চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি, যতই চেষ্টা করি না কেন লেখা এখন হবে না। প্যাকেট খুলে কাগজগুলি দেখে রাখা ভাল। মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে এলাম।

তারপর প্যাকেট পুরো খুললে দেখলাম একটা কাগজের ডামি। ছয় ফর্মার কাগজ। সম্পাদকের নাম মিমিই সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে রেখেছে। এমন কি প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত। টাইটেল বিজ্ঞাপন সব সাজিয়ে কোথায় কোন্ গল্প যাবে, কারণ গল্প বেশি পাওয়া যায় নি, কেবল পাওয়া গেছে গুচ্ছের কবিতা। কবিতা নির্বাচন আমার। কবিতাগুলি পড়ে দেখা দরকার। আর কাগজের নাম পরী লেখেনি। আমি সম্পাদকের নামের মাথায় আরও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখলাম—অ প রূ পা। লিখে বার বার পড়লাম। অ.....প.....রূ.....পা। এ যে কী আনন্দ, কী আনন্দ! ডামিটা হঠাৎ ছুঁড়ে লুফে নিলাম, তারপর সহসা জোরে আচমকা ডেকে ফেললাম—অ প রূ পা।

পাশে দেখি তখন পিলু ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। চোখ রগড়ে বলছে, ও দাদা, তোর কি হয়েছে?

ভারি লজ্জায় পড়ে গেলাম। নিজেকে সংযত করে বললাম, না কিছু না। তুই ঘুমো।

পিলু, শুধু পিলু কেন, মায়া, মা বাবা আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যান। তাঁরা বোঝে না আমি কেন দিন দিন এত গম্ভীর হয়ে যাচ্ছি। আমার পছন্দ অপছন্দের প্রতি তাঁরা আজকাল খুবই গুরুত্ব দেন। এই যে বলেছি, না তোমরা যাবে না, এটা বাবা দিন কয়েক বাদে আর একবার জিজ্ঞেস করবেন আমাকে, যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে। তুমি ভেবে দেখ। অর্থাৎ বাবা বুঝতে পারেন আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে, খুবই নিরীহ এবং গোবেচারা স্বভাব আমার। সময় বুঝেই কথাটা তুলবেন।

পিলু আবার শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে। ওর জীবনে কোন সংকটই নেই। ওকে কেন জানি ভারি হিংসা হচ্ছে। ও তো বুঝতে পারে না ভাল একটা কবিতা লিখতে না পারলে কি জ্বালা বোধ করি!

কবিতাগুলি দেখতে গিয়ে অবাক। সবই অপাঠ্য। কবিতা গোটা দুই তিন ছাপা যায়। আরে, এ যে একটা পদ্য লিখেছেন তিনি। নিচে লেখা ভূপাল চৌধুরী। সুন্দর প্যাডে লেখা, উপরে নাম, কোয়ালিফেকেশন্। সব দেখে বুঝলাম, মিলের ম্যানেজার-প্রবর না হয়ে যায় না। উপরে ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেমন একটা জ্বালাবোধের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পর প্রতিশোধ নেওয়া গেল। অর্থাৎ অমনোনীত। কবিতা ছাপার উপযুক্ত নয়। কবিতার তুমি অ আ ক খ বোঝ না। তোমার জীবন অর্থহীন।

তোমার বাবার জীবনও। সঙ্গে সঙ্গে এখন আমার হাই উঠছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এতদিন পর ভিতরের যে অপমানবোধে পীড়িত হচ্ছিলাম, তা নিমেষে কেটে গেল। আমি জানি, মিমি ঠিক মিলের ম্যানেজারের কাছ থেকে কোনো বিজ্ঞাপন আদায় করেছে। সেই সূত্রে তিনি কবিতা গছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি সম্পাদক। এমন অপাঠ্য কবিতা ছেপে আর যাই করতে পারি অপরূপাকে হেয় করতে পারি না।

সকালে উঠে মনে হল দীর্ঘদিন পর আমি সারারাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। কী তৃপ্তি, কী আনন্দ।

কদিন থেকে জোর বর্ষা শুরু হয়েছে। আমাদের বাড়ির সামনের নালাটা জলে ভেসে গেছে। সামনের মাঠ ঘাট সব। রাস্তায় এসে দাঁড়ালে, দূরের বাদশাহী সড়ক আম জাম গাছের ফাঁকে দেখতে পাই। বর্ষার সময়টা বাড়িতে আটকা পড়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ বাড়ি থাকতে এখন কেন জানি আর ভাল লাগে না। বৃষ্টিটা কবে যে ধরবে। রাস্তাটা আমাকে টানে।

সেদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে ফর্সা। আশ্বিন-কার্তিকের আকাশের মতো। ভিতরটা কেমন আনন্দে রে রে করে উঠল। মা বলল, ওঠ বাবা ওঠ। একেবারে পচে গেলুম।

আমাদের এই বাড়িঘরে কাঠকুটোর বড় দরকার। বর্ষার সময়টায় মা'র খুবই কষ্ট। পাটকাঠি, না হয় শুকনো ডালপালা, খড়, এ-সব দু-বেলা খাবার ফুটিয়ে খেতে বড় দরকার। আমাদের উঠোনটা কচ্ছপের পিঠের মতো। জল দাঁড়ায় না। একটু রোদ পেতেই শুকনো খটখটে। যে ঘরটায় আমি আর পিলু থাকি, বৃষ্টির সময়, সব খড়কুটো ডালপালা সেখানে তুলে রাখা হয়।

এ-নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার মতান্তর চলছে। বাবাকে বলে বুঝেছি, লাভ নেই। মা'র সায় না থাকলে বাবা কিছুতেই মত দেবেন না।

বারান্দায় জলচৌকিতে বসে মনে হল, এ-সময়েই কথাটা তোলা দরকার।

পিলু, মায়া, মা সব খড়কুটো, শুকনো পাতা বাইরের উঠোনে মেলে দিচ্ছে। বাবা একটা লম্বা বাঁশ টেনে আনছেন। বাঁশটা দু-গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। পিলু একবার আমার দিকে তাকাল। আমার বসে থাকাটা বোধ হয় তার পছন্দ হচ্ছে না। তবে পিলু জানে, আমার মেজাজ খারাপ। পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য রোজই শহরে যাই। মুকুল, নিখিল, নিরঞ্জন আমার সঙ্গে পড়ে। পত্রিকায় যদি খবর বের হয়, ওরা বাড়িতে কাগজ রাখে। পরী অবশ্য অনেক আগেই আগাম খবর দিয়েছে আমাদের, রেজাল্ট বের হতে এ-মাসের শেষাশেষি, কেন যে এত হেদিয়ে মরছি বুঝি না।

ক'দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় শহরে যাওয়া হয়নি। রাস্তাটা যেমন টানে, শহরে যাওয়ার টানটাও আমার কম নয়। আমাদের ত্রৈমাসিক কাগজের অফিসটা মুকুলের বাড়িতে। ওর দাদার পি ডবলু ডির কোয়ার্টারের বসার ঘরটা 'অপরূপা' কাগজের অফিস। সামনে লম্বা বারান্দা, পরে লন, লোহার রেলিং দেওয়া পাঁচিল, পরে লাল ইঁট সুরকির পথ। দুটো বড় দেবদারু গাছ পার হলে, শহরের বিশাল মাঠ। মাঠ পার হয়ে সোজা স্টেশনে যাবার রাস্তা।

আমার একটাই ভয়, পরী আবার যে কোনোদিন চলে আসতে পারে। কিছু একটা উপলক্ষ খুঁজে চলে আসবে। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আমার যত না মাথাব্যথা, পরীর তার চেয়ে বেশি। মেয়েটা সত্যি আশ্চর্য। নিজের কথা ভাবে না। পাশ করলে, ফেল করলে কিছুতেই না। অবশ্য পরীকে আমরা ভালই জানি। ওর রেজাল্ট মিনিমাম ফার্স্ট ডিভিসন—আমরা ধরেই নিয়েছি। আমার দুশ্চিন্তা, আমার কী না জানি হবে, পরীর দুশ্চিন্তা বিলুটা যা স্বভাবের পরীক্ষার এদিক ওদিক হলে আবার না বাড়ি থেকে ভেগে পড়ে। সে জেনে গেছে, বাড়ি থেকে একবার উধাও হয়েছিলাম, আবার উধাও হওয়াটা বিচিত্র নয়।

বাবা দেখছি পাটকাঠির আঁটিগুলি গুনে বাঁশে হেলান দিয়ে রাখছেন। আমার ঘর থেকে ভেজা পাট তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিচ্ছেন। আর বসে থাকা যায় না। বাড়িতে আমি বাবার কলেজ পড়ুয়া ছেলে বলে, এ-সব কাজে হাত লাগাই এখন বাবারও পছন্দ না। মা অবশ্য গজগজ করে। মাকে খুশি রাখতে পারলে কাজটা উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। মা'র সঙ্গে কাজে লেগে পড়লাম। ঘর সাফ করে সব বের করে দিলাম। মা হঠাৎ বললে, তোর কী হয়েছে রে?

এ-সব কাজে হাত লাগিয়েছি দেখেই মা অবাক। বললাম, কৈ কিছু হয় নি তো।

মা এখন একটা চাটাইয়ে ধান ছড়িয়ে পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে। বড় পুত্রটির সুমতিতে বোধ হয় কিছুটা হতভম্ব। বললাম, মা আমার ঘরটায় পাট-ফাট রাখতে বাবাকে বারণ কর। কী পাটপচা গন্ধ! লোক এলে ভাববে কী!

—তোমাদের বাড়িতে আসেটা কে? এত যে ভাবনা!

বাবা বাড়ির বাইরের দিকে কাজ করলেও কথাটা বোধ হয় কানে গেছে। বাবার ইজ্জতে লেগেছে। বাবা সোজাসুজি উঠোনে এসে বললেন, এটা কেন বলছ ধনবৌ? আসে না কে?

—সেই তো। আমি বাবার কথায় সায় দিলাম।

মা'র হাতে অনেক কাজ। মায়া বলল, মা আজ ধান সেদ্ধ হবে?

—দেখি। আকাশের যা অবস্থা। বরুণ দেবের কি কৃপা হবে কে জানে।

বাবার কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না মা।

বাবা বারান্দায় উঠে এলেন। এত কষ্ট করে ঘরবাড়ি করা, গাছপালা লাগানো, সবই তো মানুষের জন্য। ধনবৌ বলছে কিনা, কে আসে!

—আরে আসে না কে? সকাল থেকেই তো আসতে শুরু করে। বাবা বেশ ঝাঁঝের গলায় কথাটা বললেন।

মা ধানের পাতি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, আসে ভজাতে।

বাবা ঠিক বুঝতে পারলেন না, মা'র মাথা সকাল বেলাতেই এত গরম কেন! চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। কয়েক মণ ধান বাবা মা'র পরামর্শ মতোই কিনেছেন। চাল এতে অনেক সস্তা হয়। তাছাড়া ধানের তুষ, চালের কুঁড়া সংসারে লাগে না হেন জিনিস নেই, কিন্তু এবারে এত বর্ষণ হবে, মার বোধ হয় ধারণা ছিল না। আমাদের পাঁচ বিঘা জমির বিঘাখানেক শুধু ঘরবাড়ি, গাছপালা, গোয়াল ঘর, ঠাকুর ঘর, রান্নার ঘর, আমার পিলুর জন্য থাকার আলাদা ঘর, তক্তপোষ। বাঁশের একটা জঙ্গল আছে জমির শেষ দিকটায়। সেখানটায় কিছু আবাদ হয় না। কিন্তু ঘরবাড়িতে বাঁশের কত দরকার আমরা এখন বুঝতে পারি। পাটকাঠির বেড়া পাটকাঠির চাল, তার কোণায় চারটে মজবুত বাঁশ। মাঝে তিন খানা করে পলকা বাঁশ, চাল দুটো উপরে তুলে বেড়া লাগিয়ে দিলেই ঘর। বাবা যজন-যাজনের কাজ সেরে, বাড়িটা নিয়েই পড়ে থাকেন।

সেই বাড়ি নিয়ে খোঁটা!

বাবাও কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মা'র গজ গজ তখনও চলছে। কে করে অত! আর ডাকলেই হল, কর্তা আমার বাড়ি শনি পূজা! তা জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে—তোমার দাম বাড়ে না! এ কি রে বাবা, এক পয়সা দু-পয়সা দক্ষিণা! ছটা পেট ওতে চলে! সেই এক কথা।

তাহলে গতকালের জের চলছে। মা'র আবার শুরু হয়েছে।

বাবা প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে এক ক্রোশ হেঁটে পূজা করতে গেছিলেন। কী দুর্যোগ! বার বার মা'র এক কথা, যেতে হবে না। অন্ধকারে কিসে কোথায় পা দেবে, তখন দেখবেটা কে?

বাবা বলেছিলেন, ধনবৌ, ও-কথা বলতে নেই। রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বাবা অন্ধকারেই দুর্যোগের মধ্যে মার কথা না শুনে বের হয়ে গেছিলেন। যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, বারের পূজা। আমার জন্য বিঘ্ন ঘটলে সংসারে অমঙ্গল হতে কতক্ষণ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।

মাও আর কিছু বলতে সাহস পায়নি। সত্যি তো—বারের পূজা, শনির কোপে শ্রীবৎস রাজার কথা কে না জানে। মা আর উচ্চবাচ্য করে নি। বেশ রাত করে বাবা একেবারে বৃষ্টির জলে নেয়ে ঘরে ফিরলেন খালি হাতে। দরজা বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সোঁসোঁ বাতাসের গর্জনে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাবা বাড়িতে ঢোকার আগেই মা কি করে যেন সব টের পায়। দরজা খুলে দিল। বাবা, শুধু বলেছিলেন, কুণ্ডু মশাইর আক্কেল ভারি কম। খবর দিলেই পারতিস। দুর্যোগের জন্য বাজার হাট করা যায় নি।

মা একটা কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, আগে সব ছেড়ে ফেল। পরে কুণ্ডুমশাইকে নিয়ে পড়বে। যেমন তুমি, তেমন তোমার যজমান। দু-জনেই সমান।

বাবার মুখে একটা কথা নেই তখন। আমরাও বাবার ফিরে আসার জন্য জেগে আছি। এমন দুর্যোগের রাতে বাবা শনিপূজা করে ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। সেই বাবা ফিরে আসায় ঘরবাড়ির সব ঠিকঠাক আছে এমন ভেবে শুয়ে পড়তে চলে গেছিলাম। রাতে দু'জনের মধ্যে আক্কেল নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে পারে। সকাল বেলায় তারই সম্ভবত জের চলছে।

মাথায় রাগ পুষে রাখা সংসারের পক্ষে অকল্যাণকর বাবা বোধহয় এটা বোঝেন। বোঝেন বলেই ক্রোধ নিবারণ করতে বাবা তাঁর জানা বিচিত্র সব ধন্বন্তরির আশ্রয় নেন। তার একটি বসে বসে নিবিষ্ট মনে তামাক সাজানো, কলকেয় আগুন দেওয়া, তারপর চোখ বুজে টেনে যাওয়া। তখন বাবার চোখ মুখ দেখলে কে বুঝবে মানুষটা এ-জগতে আছে। মা'র এ-হেন দৃশ্য সহ্য হয় না। একেবারে শিব ঠাকুর সেজে সংসারে কালাতিপাত, একটু যদি জ্ঞানগম্যি থাকে। হেন দৃশ্য চোখের সামনে কে দেখে! মা সোজা রান্নাঘরে।

বাবা টিপে টিপে কলকেয় তামাক ভরছিলেন। মা রান্নাঘরে উঠে গেছে। একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন বাবা, পরে আমার দিকে। বললেন, এই তো সেদিন এস ডি ও সাহেব ঘুরে গেলেন! তা তোমার মা জানে, এস ডি ও সাহেব বস্তুটি কি!

মা রান্নাঘরে ঠিক কান খাড়া করে রেখেছে—এবং আমরা বুঝতে পারি, এই কথা কাটাকাটির সময়, দু-পক্ষেরই কান বড় সজাগ। যে যেখানেই থাকুক না কেন সব শুনতে পায়।

—বিলু তোর বাবা কি সাহেব বলল—আমি বুঝি না!

আমি বললাম, এস ডি ও সাহেব।

—পরীর সঙ্গের লোকটার কথা বলছে!

বাবা বললেন, হ্যাঁ। লোকটা বল না, ভদ্রলোক বল। তিনি হলেন সদরের এস ডি ও। ধুতি শার্ট পরে এসেছিলেন বলে তুমি তার মূল্য বোঝ না। এই ঘরবাড়িতেই এসেছিলেন।

—তোমার খোঁজে?

—আমার খোঁজে হবে কেন! বিলুর খোঁজে।

মা রান্নাঘর থেকেই কথা চালাচালি করছে। বলছে—আমি ভাবছিলাম তোমার খোঁজে বোধ হয়।

ভারি অপমানবোধে বাবার মুখ কেমন পীড়িত দেখাল। মা'র এই খোঁচা দেওয়া কথা কি কঠিন বাবার দিকে তাকিয়ে টের পাচ্ছিলাম। বাবাকে প্রবোধ দেবার জন্য বললাম, আমার খোঁজে আসা বাবার খোঁজে আসা একই কথা। তুমি মা না, কি যে সব বল!

বাবা এতে বোধহয় ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। বললেন, তোমার মাকে বল, এই কলোনিতে কার ঘরবাড়িতে কবে সাক্ষাৎ এস ডি ও সাহেব এসেছিলেন। বোঝাও! আমি তো চোখ বুজে থাকি। সংসারের কিছু দেখি না। আমার বাড়িতে কেউ আসে না।

এই সুযোগ। এস ডি ও সাহেবের আসার বদান্যতায় বাবা যদি আমার ঘরটায় আর কাঁচা পাট, খড়কুটো সব না রাখেন। বন্ধু-বান্ধবরা আসে, আবার এস ডি ও সাহেব আসতে পারে—বললাম, ভাগ্যিস বাড়ির ভিতর ঢুকাই নি।

—এটা তোমার অন্যায় কাজ হয়েছে। কেউ এলেই মনে রাখবে বাড়ির অতিথি। তার আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি রাখতে নেই। তুমি তার সঙ্গে রাস্তাতেই কথা সেরে ছেড়ে দিলে।

—ও তো পরীর দেওয়া একটা খাম দিতে এসেছিল। ওর জিপ রাস্তায়। পরী ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল—যাবার পথে দিয়ে গেছে। বাবা পরী কথাটাতে একটু বিভ্রান্তিতে পড়লেন, তবে কিছু বললেন না।

—তবু এই বাড়িঘরে তিনি এসেছিলেন। তুমি এখানে আছ বলেই না এসেছিলেন। অন্যথায় আসতেন! বাড়িঘরের মাহাত্ম্য ভুললে চলবে কেন?

—এনে বসাবটা কোথায়! আমার ঘরটাতে পা ফেলা যায় না। ঢুকলেই পচা পাটের গন্ধ। এতে আপনার বাড়িঘরের সুনাম রক্ষা হত না।

বাবা কি বুঝলেন কে জানে। বাড়িতে আজকাল বড় পুত্রের বন্ধু-বান্ধবরা আসে। তারা সবাই সম্পন্ন ঘরের ছেলে। পুত্রের মর্যাদা বলে কথা। বললেন, দেখি পাট বিক্রি হলে, মুনিষ নিয়ে আর একটা ঘর করা যায় কি না! সবই তো আছে—শুধু মুনিষের খরচটা।

মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। বাবার সঙ্গে এত কথা আমার, তা ছাড়া বৃষ্টি বাদলার দিনে খড়কুটো, কাঁচা পাট রাখার জন্য একটা ঘর উঠবে, মা'র পরামর্শ নেওয়া হবে না—মা সহ্য করবে কেন, ঘর থেকেই স্বর ভেসে এল, আজও তুই বিলু টিউশনি কামাই করলি!

অর্থাৎ মা'র আর ইচ্ছে নয় বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলি। বললাম, যাব। কাল থেকে যাব। তুমিই তো যেতে দিলে না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরজ্বালা হলে কে দেখবে।

—আজ তো বৃষ্টিও নেই। দুর্যোগও নেই। ওরা কি ভাববে। কুড়িটা টাকা সোজা কথা!

আসলে আমি বারান্দায় বসে থাকি মা চায় না। বাবা আজকাল সব বিষয়েই আমার মতামতের গুরুত্ব দেন। মা যে আমার কত অবুঝ সেটা ধরিয়ে দেবার জন্যও আমি। বাবা এখন মাকে আমার মারফতে কি-ভাবে খোঁচা দেবেন, সেই ভয়ে বলা।

বাবা তখন হুঁকোয় টান দিয়ে খানিকটা বোধহয় স্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, তোমার মা তো এস ডি ও সাহেব কি, কেন, তাঁর ক্ষমতা কত কিছুই জানে না। আমাদের মহকুমার এস ডি ও ছিলেন বরদাবাবুর ছেলে। বরদাবাবু হল গে দীনেশবাবুর মাসতুতো ভাই। সোজা এস ডি ও হয়ে এল। মহকুমার মালিক। আর একটা সিঁড়ি ভাঙলেই ডি এম। তা কি তোমার মা বোঝে! ডি এম, এস ডি ও'র কত ক্ষমতা জানে! কি তফাৎ বোঝে!

মা'র পক্ষে অবশ্য এ সব জানার কথা না। বাবার পক্ষে জানার কথা। মামলা-মোকদ্দমায় নারায়ণগঞ্জ ঢাকা গেছেন। তিনি বুঝতেই পারেন। বাবাদের আমলে নাকি বাঙালী ডি এম হাতে গোনা যেত। এ-সবও বললেন।

মা হঠাৎ বোধহয় ক্ষেপে গিয়ে বলল, তা পরীর সঙ্গে কী সম্পর্ক! পরী তো কলেজে পড়ে। বাড়িতে ওর মা বাবা নেই! এমন একটা সোমত্ত মেয়েকে একলা ছেড়ে দেওয়া। বলি, আক্কেল কি বাড়ির।

মা ঠিক বোঝে না পরীকে সবই মানায়। পরী এখানকার এক বিপ্লবী পার্টির ক্যাডার। মিছিল করে মিটিং করে সরকারের বিরুদ্ধে। আবার এস ডি ও সাহেবের জিপেও চড়ে বেড়ায়। মার বোধ হয় আপত্তিটা সেখানে।

মা বলল, কী গেছো মেয়ে রে বাবা!

বাবা বললেন, গেছো মেয়ে বলছ কেন। ও তো সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। একেবারে দেবীর মতো চোখ মুখ। কত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। সেও এই বাড়িঘরে আসে। আসে না কে? এবারে তোমার মাকে বোঝাও।

আমার বাবাকে ইতিমধ্যে একবার এসে পরী তার ভাল নামটাও জানিয়ে গেছে।

বাবা হঠাৎ কেমন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, পরী পরী করছ কেন তোমরা বুঝি না! ওর নাম মৃন্ময়ী। বাড়ির লোকেরা মিমি বলে ডাকে। তা রায়বাহাদুরের এমন আদরের নাতনির নাম মিমি না হলে মানাবে কেন? আমার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, তুমিও দেখছি ওকে পরী বলেই ডাক।

বাবাকে তো আর বলতে পারি না, পরী নামটা আমিই কলেজে দিয়েছি। কালীবাড়িতে আলাপ হবার পর পরীকে কথাটা বলতেই সে কি হাসি। শরীর থেকে আঁচল খসে পড়েছিল। আঁচল সামলে বলেছিল, তুমি বিলু আমাকে কিন্তু পরী বলেই ডাকবে। না হলে ভীষণ রাগ করব।

নাও এবারে ঝামেলা পোহাও। বাবাকে বলি কী করে আমি ওর নাম দিয়েছি পরী। পরী নামে না ডাকলে ও রাগ করে। বাবা তখন বলতেই পারে, ওর নাম থাকতে আবার একটা নাম দেবার দায় কে তোমাকে দিল!

আমি চুপ করে আছি। নিজের এই দুর্বলতা পরিহার করা শ্রেয়। কিন্তু কি যে হয়েছে, পরী এখন আমার এত কাছের যে তাকে পরিহার করে চলাই কঠিন। আমাদের কাগজের সব সে। কাগজের সম্পাদক পরীর ইচ্ছেতেই আমাকে হতে হয়েছে। যত ভাবি বিদ্রোহ করব তত পরী যেন নানা ভাবে আমাকে কাবু করে ফেলছে। কাগজটাও যে বের হচ্ছে পরীর চেষ্টাতে, সে-ই বিজ্ঞাপন আদায়ের ভার নিয়েছে, সে-ই টাকা পয়সা সংগ্রহ থেকে প্রেস ঠিক করা সব তার।

বাবা ফের বললেন, মুকুল তো ওকে রাণী বলে ডাকে।

বাবা তাহলে সবই শুনতে পান। নিখিল, নিরঞ্জন, মুকুল সাইকেল চালিয়ে শহর থেকে কোনো বিকেলে চলে এলে আমার ঘরে জম্পেশ করে আড্ডা। পরীক্ষা হয়ে গেলে কি আর করার থাকে—

তবে আমরা বসে নেই। অপরূপা নিয়ে মেতে আছি। আসলে পরী বোধ হয় আমার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। দেখ, যাকে তুমি হেলা ফেলা কর—তারই আজ্ঞাবহ দাস একজন এস ডি ও।

বাবাকে বললাম, পরীকে আমি ও নামেই ডাকি।

—নামটা খারাপ না। তা দেখতে তো পরীই। ও রাগ করে না?

বললাম, না।

বাবা কথাটা শুনে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মুখে কিছুটা দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল দেখলাম।

বাবাকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। পরীর কথা আবার তুলবে ভেবেই সাইকেলটা বের করে জামা গলিয়ে বের হয়ে পড়লাম। মন ভাল না। রেজাল্টের দুঃশ্চিন্তায় ঘুমও আসে না।

মা বলল, কোথায় বের হচ্ছিস।

পিলু বলল, আজ দাদা তুই ঠাকুরপূজা করবি। আমি পারব না।

আমার কেন জানি সহসা মাথাটা গরম হয়ে গেল—বললাম, পারব না।

বাবার মুখে এমন দুশ্চিন্তার রেখা কখনও ফুটে উঠতে দেখি নি। বের হবার সময় শুধু বললেন, কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না।

মাও বের হয়ে এল। বলল, এখন বের হবার সময়?

—একটু ঘুরে আসছি। মাকে প্রবোধ দিলাম।

কিন্তু বাবা কেমন নাছোড়বান্দা। বললেন, শোন।

বাবার গলা এত গম্ভীর যে সাইকেল থেকে নেমে পড়তেই হল।

—কোথায় যাচ্ছ বলে যাও।

বাবা এ-ভাবে কখনও কথা বলেন না। বাবার স্বভাবও রাশভারি নয়। তবু না বলে পারলাম না, মানুকাকার কাছে যাচ্ছি।

—কেন!

—যদি রেজাল্টের খবর পাই।

—মানু দিতে পারবে?

—দেখি, না হয় বাজারের দিক থেকে ঘুরে আসি।

ক'বছরে এখানে একটা বাজারও হয়ে গেছে। চায়ের দোকান, মুদির দোকান, মাছ, কাঁচা আনাজ সবই পাওয়া যায়। চায়ের দোকানে কাগজ আসে। কলোনির লোকেরা চাও খায়, কাগজও পড়ে। ওদিকটায় আরও দু-একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলে আছে। কাগজ বের হচ্ছে শুনে, তাদের সঙ্গে আমার এই কলোনিতে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাদের একজন পালিয়ে কবিতাও লেখে। দুটো কবিতা রেখেও গেছে। ভাবলাম, ওখানেই তবে যাই। আসলে বাড়িতে একদন্ড থাকতে কেন জানি ইচ্ছে হচ্ছে না।

সাইকেলে চড়ে বসলেই কেমন নিজের এক অন্য জগৎ ফিরে পাই। রাস্তায় নেমে গেলে গাছপালার ছায়ায় কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কেন এটা হয়। বাড়িঘর এত প্রিয়, সেই বাড়িঘরেই মন বসে না। কেমন উড়ো উড়ো একটা ভাব মনের মধ্যে কাজ করে। কিছুটা এসেই বুঝতে পারলাম বাজারের দিকে যাওয়া যাবে না। কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালান মুশকিল। সাইকেলের মাডগার্ডের মধ্যে কাদা ঢুকে যাচ্ছে। কিছুটা হেঁটে সাইকেল নিয়ে পাকা সড়কে উঠে গেলাম। কোথায় যে যাব বুঝতে পারছি না। কালীবাড়ি গেলে কেমন হয়। কতদিন বৌদিকে দেখি না। বাবাঠাকুর কেমন আছেন খবর রাখি না। বাবা একদিন বলেওছিলেন, এতদিন সেখানে কাটালে, অথচ বাড়ি এসে সেখানে আর গেলে না।

আর যা হয়, মনের মধ্যে গভীর এক বেদনার জন্ম নেয়। লক্ষ্মী আমার উপর অভিমান করে চলে গেল। এসব মনে হলে আমার পীড়ন বাড়ে। কিছুই মনে থাকে না, আমার ঘরবাড়ি আছে বাবা মা আছে মনে থাকে না। কেমন উদাস হয়ে যাই এখনও। বাবার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। বাবা কি টের পেয়েছেন, আমি একটা ভাঙা লঝ্‌ঝরে সাইকেল নিয়ে, নতুন মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছি! আমাকে নির্ঘাত পেছনে ফেলে, গাড়িটা পলকে যে উধাও হয়ে যেতে পারে, আমার অপরিণত বুদ্ধির পরিণামে বাবা কি শংকিত?

দুটো কারণে পরীকে আমি অপছন্দ করি।

এক, পরীর রাজনীতি আমার বিলাস মনে হয়।

দুই, পরী লক্ষ্মীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে জোরজার করে সব কিছু আদায় করে নিতে চায়। বড়লোকের অহংকার নেই এমন একটা ছদ্মবেশকেও পরীর আমি ঘৃণা করি। চট করে সে সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারে, চট করে সে বলতেও পারে, বিলু তোমাদের বাড়ি আমি যাব।

আমি বলেছিলাম, না।

না বলেছিলাম এ-জন্য, আমরা কত গরীব, পরী আমাদের বাড়ি এলে টের পাবে।

পরী শোনে নি।

পরী সেই কালীবাড়ি থেকেই বায়না জুড়েছিল, বিলু আমরা ঠিক যাব। তোমার বাবা মাকে দেখে আসব।

পরীদের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে কে আর শখ করে যায়। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে কে যায়। আমার সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য পরী শেষ পর্যন্ত ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছিল বলেই যাওয়া। পরী আমাকে সেদিন একা পেয়ে হল-ঘর থেকে সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল। আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি পরীর ব্যবহারে। আমাকে একা পেলেই পরী এটা করে।

—এই পরী কি হচ্ছে। ছিঃ তুমি কী—

—আমি কিছু না। কেউ আসবে না।

—না আসুক, এমন করলে কোনোদিন আসছি না।

—না এলে আমার বয়েই গেল। আমার কচু, বলে ছেড়ে দিলে। দেখলাম সত্যি, বাড়ির এমন নির্জন এক এলাকায় নিয়ে এসেছে যে পরী যা কিছু করলেও দেখার নেই। তাই পরীর এত সাহস।

আমার ভিতরে কেমন একটি অপমানবোধ গর্জে উঠেছিল। পরীকে শিক্ষা দিতে হবে। কতটা পরী যেতে পারে দেখব। নেমে যাচ্ছিলাম সিঁড়ি ধরে। পরী সহসা পেছন থেকে নেমে হাত জড়িয়ে বলেছিল, আমাকে ক্ষমা কর বিলু। যাবে না। দাদুকে বলেছি, বিলুকে মন্দিরের পুরোহিত করা ঠিক হবে না। ও একবার কুড়িটা টাকা চুরি করেছিল। গ্যারেজে কাজ করত। ওখানকার গোবিন্দ কৌটোয় কুড়িটা টাকা রেখেছিল, তাই নিয়ে উধাও। আর যাই কর একজন চোর-ছ্যাঁচোড়কে মন্দিরের পুরোহিত করতে যেও না।

বুদ্ধিটা আমারই দেওয়া। অবশ্য পরী বানিয়েও বলে নি। এসব কারণে আমি পরীর প্রতি আবার খুবই কৃতজ্ঞ।

পরী তার লাল সাইকেলে ভর দিয়ে সেদিন কথা বলছিল, আমি যে খুবই ক্ষেপে আছি বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে আমি আর যাচ্ছি না। শোনো, লেখাগুলো প্রেসে দিতে হবে। দিলীপকে দিয়ে দিলেই হবে।

আমি উঠে পড়ার সময় বললাম, মুকুলের কাছে আছে। দিলীপকে নিয়ে যেতে বলবে।

—কেন দিয়ে আসতে পারবে না?

—না।

মুকুল বলল, তোমরা একেবারে দেখছি সাপে-নেউলে—অ্যাঁ, এ কিরে বাবা! ঠিক আছে মিমি, আমি দিয়ে আসব। আমার দিকে তাকিয়ে মুকুল বলল, পরী তোমাদের বাড়ি গেছে তো কী হয়েছে! এতে এত রাগেরই বা কী আছে!

আমি বলেছিলাম, না আর যাবে না। এ-সব বিলাস আমার পছন্দ নয়। সেই সব কথাও বার বার মনে হয়।

পরী সাপের মতো ফণা তুলে বলেছিল, বিলাস! বিলাস বলছ! ঠিক আছে, আমি যাব, আমি যাব। দেখি তুমি কী করতে পার।

পঞ্চাননতলা পার হয়ে ভাকুড়ির দিকে কখন এসে একটা বড় গাছের নিচে বসে পড়েছি খেয়াল নেই। সাইকেলটা গাছের নিচে, সামনে আদিগন্ত মাঠ। শস্যক্ষেত্র। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত

রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। সারাটাক্ষণ মাথায় পরী। কতবার ভেবেছি পরীকে নিয়ে মাথা গরম করব না, সে তো আমার কেউ না, আমাকে জড়িয়ে পরীর চুমো খাওয়াটাও বিলাস। বিলাস কথাটা ভাবলেই মাথা স্থির থাকে না। পরীর কথা ভাবলে আমার পরীক্ষার দুঃশ্চিন্তাও মাথায় থাকে না।

এ-সব মনে পড়লেই পরীর উপর আমি আরও কেন যে খাপ্পা হয়ে যাই। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ডাগর চোখের অনাথা মেয়ে লক্ষ্মী আমাকে নিয়ে নিভৃতে গোপন একটা স্বপ্নের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেদিনের ঘটনায় লক্ষ্মী এতই ভেঙে পড়েছিল, যে তার বেঁচে থাকার চেষ্টা বড় অর্থহীন—সে এ-জন্য মরে গেল। পরী এবং আমি দুজনে মিলে লক্ষ্মীকে আত্মঘাতী করেছি।

এ-সবই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। মানুকাকার কাছেও যাওয়া হয়নি, বাজারের দিকেও যাইনি—পরীর কথা ভাবতে ভাবতে পরীক্ষার দুঃশ্চিন্তা একেবারে উধাও। কখন বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। কতটা বেলা হয়েছে খেয়াল নেই। গাছের নিচে ঘাসের ভিতর শুয়ে জীবনের বিচিত্র ঘটনায় যখন মুহ্যমান, তখনই পিলুর গলা, এই দাদা, তুই কিরে। এখানে একা শুয়ে আছিস। মা বাবা বসে আছে। খায় নি।

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

পিলুর চোখে বিস্ময়। দাদাটি তার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। —এই চল। বসে থাকলি কেন!

—তুই যা। আমি যাচ্ছি।

—না আমার সঙ্গে যেতে হবে। তুই কিরে, মা বাবার কষ্ট বুঝিস না!

তবু বসে আছি। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সত্যি তো আমি এমন হয়ে যাচ্ছি কেন। পিলুর চোখ মুখ শুকনো। দাদাকে নিয়ে তার ভারি চিন্তা। কম কথা বলে। কখন আবার ফেরার হয়, এই ভয়ে সে সব সময় দাদার সম্পর্কে বড় সতর্ক থাকে। আমি সঙ্গে না গেলে সে যে যাবে না বোঝাই যাচ্ছে। সাইকেলে উঠে বললাম, চল।

পিলু পাড়ার কারো সাইকেল নিয়ে আমাকে খুঁজতে বের হয়েছে। সে মুকুলের বাড়িতে গেছে, পরীদের বাড়ী গেছে, কালীবাড়ি গেছে সবাইকে ঠিক খবর দিয়েছে, দাদা সকালে কিছু না খেয়ে কোথায় যে বের হয়ে গেল। পিলু পেছনে আসছে। যেন আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাবা তামাক সাজছেন। বাবার এটা স্বভাব। সংসারে বড় রকমের গরমিলের আঁচ পেলে, খেপে খেপে ঘন্টায় তিন চারবার তামাক খান। আমার ফিরতে দেরি হওয়ায় তাঁর এখন সেই তামাক খাবার পর্ব চলছে।

পিলু বলল, জান বাবা, দাদা না...

ওকে আর বলতে দিলাম না। —এই থামবি! দাদা না...! দাদা কী করেছে!

—করেছিস তো।

—করেছি ভাল করেছি। তুই বলে দ্যাখ না।

পিলু কী ভাবল কে জানে। সে বোধ হয় বুঝতে পারে গাছতলায় শুয়ে থাকাটা মানুষের স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। বাবাকে বললে, আমার রাগ হতে পারে। আমি আবার কোন এক বিচিত্র কান্ড বাধিয়ে বসব ভয়েই পিলু আর কিছু বলল না।

মায়া গামছা তেলের বাটি এনে সামনে রাখল।

বাবা বললেন, বিশ্রাম করে স্নানটান সেরে নাও। তুমি স্নান করলে আমরা একসঙ্গে খেতে বসব।

তাহলে বাবা পিলু মা মায়া এখনও খায়নি। আমার ফেরার অপেক্ষাতে বসে আছে। নিজের উপরই তখন কেমন ক্ষেপে যাই। আমার হয়েছেটা কি! আমার তো এখন দরকার অভাব অনটন থেকে গোটা সংসারটাকে বাঁচানো। আমি একটা কাজ পেলে বাবা হাতে স্বর্গ পাবেন। বাবার চাল-চলনে, কথাবার্তায় এমন একটা আভাস আমি সেই কবে থেকে পেয়ে আসছি। মানুকাকা বাবাকে সাফ বলে দিয়েছে, আমাকে বিলুর কাজ সম্পর্কে কিছু বলবেন না। শ্যামাপদর কাছে আমার মাথা হেঁট। বছর দুই আগে শ্যামাপদবাবুর গ্যারেজ থেকেই আমি যে পালিয়ে গেছিলাম তাতে তিনি রুষ্ট। ফের কাজের ব্যবস্থা করে বিশ্বাস-ভঙ্গের দায়ে তিনি আর পড়তে চান না। ভাবলাম, খেয়ে দেয়ে একবার মুকুলের জামাইবাবুর কাছে যাব।

আসলে পাশের খবরের চেয়ে আমার কাছে কাজের খবরের গুরুত্ব বেশি। বেকার যুবকের মতো ভিতরে হাহাকার জেগে উঠছে। মার ইচ্ছে নয়, আমি পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিই। পিলুও চায় না। মায়ারও ইচ্ছে দাদা বি কম পাশ করবে। দাদা এম কম পাশ করবে। দাদার গৌরবে এই বাড়ি ঘর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমি জানি, যা সময়কাল বি এ এম এ পাশ করাটা সহজ। কাজ পাওয়াটা কঠিন। যাদের ধরা করার কেউ নেই, তাদের জন্য কাজও নেই।

বাবার গলা পেলাম। যাও স্নানে যাও।

মায়া দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, যা দাদা। বসে থাকলি কেন!

পিলু এখন এত বাধ্যের যে সে এসে বলল, দাদা, তোর সাইকেলটা তুলে রাখি?

—রাখ।

—দাদা, পরীদি না বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছে?

—'জাগরণ' নাটক হবে। নাটকের রিহারসেলে গেছে।

আসলে পরী আমাদের বাড়ি এলে যে আমি খুশি হই না, পিলু বোঝে। পরীদের বাড়িতে আমাকে খোঁজ করতে যাওয়ায় খুবই যে আমি অপ্রসন্ন পিলু তাও বোঝে। কারণ পরী এই অজুহাতে ঠিক আমাদের বাড়ি চলে আসতে পারে। —বিলুকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি ভাববেন না মেসোমশাই—আমরা দেখছি। কোথায় যায় দেখব। পরীর আশ্বাস পেলে বাবা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বিরক্ত হব, পিলু এটা বোঝে বলেই বলা, পরীর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। বাড়ির দারোয়নই খবরটা দিয়েছে। সুতরাং দাদার খবর সে জানে না। দাদার খোঁজেও সে আসবে না।

আমি স্নান করতে বের হয়ে যাচ্ছি। মা আমার সঙ্গে এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। কেমন বোকার মতো মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার এই আচরণ মা'র কাছে খুব অস্বাভাবিক ঠেকে। মা কি গোপনে এখন চোখের জল ফেলে আমার জন্য। পৃথিবীতে সব মায়েরাই কি সন্তান-সন্ততির এই বয়সটা নিয়ে বিমর্ষ থাকে। মাকে খুশি করার জন্য বললাম, মা আমি দৌড়ে ডুব দিয়ে আসছি। খুব খিদে পেয়েছে। ভাত বেড়ে ফেল।

সামান্য এই আশ্বাসে মা'র চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি খেলে গেল। সারা বাড়িটায় যে এতক্ষণ এক অপার বিষণ্ণতা বিরাজ করছিল, স্নানে যাবার আগে টের পেলাম সব কেটে গেছে।

স্নান সেরে ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। মায়া ছুটে এসে আমার ভেজা গেঞ্জি এবং কাপড় হাত থেকে নিয়ে নিল। রোদে মেলে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি পিলু আয়না চিরুনি এগিয়ে দিয়ে বলছে, চুলটা আঁচড়ে নে দাদা।

আমাদের এই ঘরটায় শুধু কাঠের দরজা হয়েছে। বাবা আমার টিউশনির টাকাটা মাকেই দিয়ে দেন। মা টাকাটা বড় যত্ন করে তুলে রাখে। টাকাটা মা চায় বাড়ির আসবাবপত্র তৈরিতে খরচ করা হবে। শেষ পর্যন্ত আর তা হয়ে ওঠে না। সংসারে দু-বেলা আহার জোটাতে যখন বাবার প্রাণান্ত তখনই টাকাটা মা বের না করে দিয়ে পারে না। মা-র আশা ছিল আমার টাকাটা দিয়ে একটা তক্তপোষ বানানো যায় কি না, সেটা আর হয়ে উঠছে না। এবারে ধান কিনতে গিয়ে আমার উপার্জিত টাকা খরচ হয়ে গেছে বলে বাবার উপর মা'র বিশেষ ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভ থেকেই বাবার সঙ্গে কত অকারণে যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় যা আমার মা-বাবাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। এ-ঘরের কাঠের দরজাটা হয়েছে মা খুব হিসেবী বলে। পূজার দানের কাপড় মা তুলে রাখে। চার পাঁচটা কাপড় একসঙ্গে বিক্রী করে মা কাঠের দরজা বানাবার টাকা বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল। এতে বাবা বোঝেন মা'র প্রয়োজনটা এই সংসারে কত বেশি।

খেতে বসলে মা পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, মিমি কোথায় গেছে যেন বললি।

—রিহারসেলে গেছে।

—রিহারসেল জায়গাটা আবার কোথায়?

পিলু খবু বিরক্ত গলায় বলল, ওফ্, মা তুমি না কিচ্ছু বোঝ না।

—না আমি বুঝব কেন, সব তোমরা বোঝ। এই 'বোঝ' কথাতে বাবার প্রতি যে কিছুটা কটাক্ষ আছে তা বাবা বুঝতে পারেন। একবার শুধু মা'র দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তারপর গণ্ডুষ করে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিছু বললেন না।

এখানে বাড়িঘর করার পর মা বছরে একবার যাত্রা দেখার সুযোগ পায়। মিলে ধুমধাম করে কালীপূজা হয়। তখন যাত্রা হয়। সেদিন মিলের দরজা সবার জন্য খোলা থাকে। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে মা যাত্রা দেখতে যায়। পিলু মায়া সঙ্গে থাকে। আমি যাই না। বাবাও না। মা যাত্রা দেখেছে। নাটক দেখে নি। এখানে আসার পর মানুকাকার দৌলতে দু-বার মা মায়া পিলু সিনেমাও দেখেছে। রামের সুমতি বই দেখে এসে মা'র সে কি আনন্দ। —বুঝলি বিলু একেবারে সত্যি ঘটনা রে! আহা মাছ দুটোর জন্য জানিস আমারও মায়া হয়। মায়া তো ভ্যাক করে কেঁদেই ফেলেছে।

এত সব জানা সত্ত্বেও রিহারসেল বস্তুটি মার জানা নেই এতে পিলু বিরক্ত। তার মা'টা যদি এ-সব না বোঝে তবে যেন তার দাদাটিরও আত্মসম্মান থাকে না। পরীদি এলে কথাটা উঠলে, মা'র এমন কথায় দাদার ইজ্জত যেতে পারে বলেই বুঝিয়ে বলা, রিহারসেল দিতে হয়। নাটক করার আগে রিহারসেল দিতে হয়। পার্ট মুখস্থ করতে হয় না! প্রম্পটার থাকে না! রিহারসেল দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়, কোথায় রাগ করতে হবে, কোথায় শান্ত থাকতে হবে, কোথায় কাঁদতে হবে। রিহারসেল দিয়ে দিয়ে সব মুখস্থ করতে হয়। পরীক্ষার আগে পড়া মুখস্থ করার মতো। বুঝলে। মিমিদি নাটকের সেই রিহারসেল দিতে গেছে।

—মিমি নাটক করে?

—বারে মিমিদি নাটক করে শুধু! মিটিং মিছিল করে। আমি ওদের অফিসে গেছি। পুরানো ভাঙা বাড়ি। দোতলায় ওদের পার্টির অফিস ঘর। মিমিদি পোস্টারে ছবি আঁকে কী সুন্দর।

—তাই বলে মেয়েমানুষ নাটক করবে সে কেমন কথা।

আমার এ-সব সময়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমারও পছন্দ নয়, পরী নাটক করে। ভিতরে কোথায় যেন একটা কূট মানুষ আছে আমার যে সব কিছু সংশয়ের চোখে দেখে। পরীর এত স্বাধীনতা আমার পছন্দ নয়। এই স্বাধীনতা না থাকলে কাগজে তাকে এ-ভাবে পেতামও না। যেন কাগজটা বের করা আমাদের চেয়ে পরীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। তার মূল কারণ কি তাও বুঝি। ভায়া দাদু টিউশনিতে আমার প্রতি মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরী এবং তার বাবা অবহেলা দেখিয়েছে, আমাকে কাগজের সম্পাদক করে, এবং আমার কবিতা দেখিয়ে পরী তার যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

মিলের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভূপাল চৌধুরী একজোড়া কবিতাও পরীকে ধরিয়ে দিয়েছিল। শহরের খোদ চেয়ারম্যানের নাতনি কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন চাইতে গেলে না দিয়ে থাকে কি করে! এই সঙ্গে তিনিও যে কাব্যচর্চা করেন, তার নমুনা হিসাবে এক জোড়া কবিতা দিয়েছিলেন মিমির হাতে। বিজ্ঞাপনের অর্ডার ফর্মে সই হয়ে যাবার পর মিমি বলে এসেছে, কবিতা নির্বাচনের ভার সম্পাদকের। তিনিই বলতে পারবেন ছাপা হবে কি হবে না।

দুটোই বাতিলের খাতায় পড়েছে। আমি যে কাগজের সম্পাদক, ম্যানেজার সাহেব এখনও জানেন কিনা জানি না। কবিতা দুটো ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে। ফোনে বলেও দিতে পারে। বাবার কানে কি করে কথাটা উঠেছিল, পিলু বলতে পারে, মাও খবরটা জেনে খুব দুঃখ পেয়েছে। বাবা বলেছেন, ভূপালের দুই মেয়েকে তুমি পড়াও। নরেশ চৌধুরীমশাই তোমাকে ভালবাসেন বলে, টিউশনিটা ঠিক করে দিয়েছেন। মাস গেলে সংসারে কুড়িটা টাকা আসে। তারই লেখা তুমি ছাপছো না, ভূপাল জানলে রাগ করতে পারে।

খাওয়া হয়ে গেলে উঠে পড়লাম। মা দুটো ডালের বড়া বেশি দিয়ে বলেছে, এ-কটা ভাত খেলি। তোর খিদে পায় না। কিছুই তো খেলি না।

আমি একটু কম খেলেও মা-বাবার মনে শংকা। বললাম, খেলাম তো। আর কত খাব।

—কি খেলি? শালগমের ডালনা দিই। আর দুটো ভাত খা।

বাবা বললেন, তোমাদের বয়সে আমাদের কি রাক্ষুসে খিদে ছিল। তুমি তো দেখছি, কিছুই খেতে চাও না। তোমার মা কত যত্ন করে রান্না করে, তোমরা দুটো তৃপ্তি করে খাবে বলে। আর তাই

যদি না খাও, তোমার মা'র কত কষ্ট বোঝ না।

আসলে বাবা তো জানেন না, তাঁর বয়সকালে পরী বলে কোনো মেয়ে তাঁকে ধাওয়া করে নি। পরী নাটক করতে যাবে। রিহারসেল দিতে যায়। পরী কি খুব পুরুষ ঘেঁষা নারী? পুরুষ ছাড়া থাকতে পারে না? 'জাগরণ' নাটক হবে পার্টির তরফে। ভোট আসছে। 'জাগরণ' এবং 'মহেশ' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে পার্টি থেকে। তবে নাটকে পরী থাকবে সে-কথা আমাকে বলে নি। কেন গোপনে করে গেল!

এই নিয়েই আমার মাথায় একটা কেমন জ্বালা ধরে গেল। বিকেল বেলায় সাইকেলে চড়ে শহরে চলে গেলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল পরীর কাছে যাই। কিন্তু আমার যা মেজাজ তাতে পরীর সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা হলে তিক্ততা বাড়বে। আমার কথা সে গ্রাহ্য করবে কেন। আমি তার কে! পরীর পুরুষ ঘেঁষা স্বভাব আমার মধ্যে যে আজকাল জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারলে সে আরও বেশি মজা পাবে। অগত্যা টাউন-হলের মোড় থেকে ফিরে এলাম। লালদীঘির ধারে মুকুলের কাছে ঘুরে গেলে হয়। কাগজের প্রুফ আসতে পারে। একবার খবর নিলে হয়। তাছাড়া, মাথায় যখন জ্বালা ধরে যায়, তখন মুকুলের সঙ্গে বসে কথা বললে, মনটা হাল্কা হয়ে যায়।

কারণ আমরা একই অসুখে ভুগছি। মুকুল চৈতালি পাগল। তবে সে এবারে ভেবেছে বি এ পড়ার সময় চৈতালির কাছ থেকে বাংলা অনার্সের নোট নেবার অজুহাতে আলাপ করবে। চৈতালি বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বে, এটা শোনার পরই মুকুল ঠিক করে ফেলেছে সেও বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বে। চৈতালি আমাদের কলেজে পড়ে না। মেয়েদের একটা কলেজ আছে ওটাতে পড়ে। আমাদের কলেজে পড়লেও একটা সুযোগ তৈরি করে নেওয়া যেত—আর চৈতালির জন্য মুকুল তো মেয়েদের কলেজে ভর্তি হতে পারে না। সে এত মরিয়া যে সুযোগ থাকলে বুঝি তাও করত।

আসলে, চৈতালিদের বাড়ি থেকে টের পেয়েছে, ছোঁড়া দুটো এদিক দিয়ে যে সাইকেলে যায়—সে একটাই কারণ। ওর দিদিরা বোধহয় টের পেয়েই সাবধান করে দিয়েছে। ওকে আজকাল বাড়ির জানালায়ও দেখা যায় না। এমন কতদিন হয়েছে, রাশি রাশি রিকশা আরোহীর মধ্যে কখন যেন দূর থেকে মনে হয়েছে, ঐ ওখানে আছে। আমরা দ্রুত সেদিকে ছুটে গিয়ে দু-একবার হতাশও হয়েছি। আবার কখনও ধোবিখানার মাঠে বসে, চোখ আমাদের চৈতালিদের বাড়ির দিকে। কে বের হল! সে যদি আসে মুকুলের চোখ মুখ উন্মুখ হয়ে থাকে তখন। কখনও সত্যি দেবী দর্শন হয়ে যায়। দেবী দর্শন হয়ে গেলেই মুকুল যেন কি এক মুক্তির আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। তবু আমরা বুঝি, একটা বড় রকমের অবহেলা আছে—ওর দিদিরা টের পায়, তখন একটা কিছু করতেই হয়। যেন দেখিয়ে দেওয়া, তুই গাইয়ে, আমরা কবি, লেখক। তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম না।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ি। মুকুল দরজা খুলে প্রাণখোলা হাসিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। জানালা থেকেই দেখা যায়। সাইকেলটা বারান্দায় তুলে ফেললে, মুকুল বলল, আরও একটা বিজ্ঞাপন এসেছে। মিমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তক্তপোষে বসে বললাম, কেন মিমি দিয়ে যেতে পারল না।

প্রশান্তও উঠে পড়েছে। সে ও-কথায় গেল না। বলল, দেখ ডামিটা। প্রথমে সম্পাদকীয়। তুমি তো লিখলে না। আমাকে লিখতে হল। শোন, সুধীনবাবুরা যদি বলে কে লিখেছে, তুমি কিন্তু বলবে, তুমি লিখেছ।

—আমি লিখি নি, অথচ বলতে হবে আমি লিখেছি।

—বললে ক্ষতি কি! পরীরও ইচ্ছে তাই।

—পরী কি আমার গার্জিয়ান। তোমরা সব কথায় পরীর দোহাই দাও কেন বুঝি না।

—পরী যে বলল, আমার কথা বললে ও ফেলতে পারবে না।

এত অধিকার জন্মায় কী করে! পরীর কি ধারণা বাড়িতে তার জেদের কাছে সবাই হার মেনেছে বলে আমিও হার মানব। তা না হলে, পরী যে বাড়ির মেয়ে তাকে তো রাস্তাতেই দেখার কথা না। তবে পরীদের বংশে রাজনীতির রক্ত সবার গায়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে পরীর দাদু থেকে বাবা কাকারা

অনেকেই জেল খেটেছে। পরী অন্য ধাতের হয়ে গেল। সে কংগ্রেসকে বুর্জোয়াদের পার্টি মনে করে। এত বড় গরীব দেশে, পরীর ধারণা, দাদু বাবা কাকারা রাজনীতি করেছেন নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। বাড়িতে নাকি সবার মুখের উপরই আজকাল তর্ক করে।

আমি বললাম, সম্পাদকীয় খুব জম্পেশ করে লিখেছ। ওটার কৃতিত্ব আমার নাই থাকল।

—তুমি সম্পাদক, এটা কিন্তু ঠিক হবে না।

—আরে আমি নাম কা ওয়াস্তে।

—তোমার কবিতা প্রথমে থাকছে। মুকুল প্রুফ তুলে বলল, কবিতার ফর্মাটা চোখ বুলিয়ে নাও। সুধীনবাবু প্রবন্ধ দেখছে। 'সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি'-পর্ব দারুণ লেখা। এটা পরের সংখ্যায় দেব। বলে আর একটা প্রবন্ধ টেনে বের করে দেখাল। ওপরে নাম লেখা, 'হালফিলের গদ্য কবিতা'। নামটা বেশ, না!

তারপরই মুকুল, র‍্যাক থেকে আর একটা লেখার বান্ডিল বরে করে বলল, এটা দিতে চাই।

দেখলাম, শহরের গত তিনমাসের অনুষ্ঠান সূচী। কে কে গান গেয়েছে, কবিতা আবৃত্তি করেছে, নাটক হয়েছে কোথায়—তার সমালোচনা সহ বিবরণ।

আমি বললাম, নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবু দেখেছে?

—ওদের বলি নি।

—সবাইকে বলে নেওয়া ভাল।

কারণ আমি চাই না, এটা করতে গিয়ে চৈতালির প্রশংসা কাগজের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠুক। এতে সুধীনবাবুরা চৈতালি সম্পর্কে মুকুলের যে দুর্বলতা আছে টের পেতে পারে। ভালবাসলে বোধ হয় মানুষ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মুকুল প্রথমে কাগজটারই তো নাম চৈতালি দিতে চেয়েছিল। এখনও মুকুলের মাথায় শুধু একটা বিষয়ই বেশি নড়ানড়ি করে। এত বড় কর্মযজ্ঞের মধ্যে চৈতালি থাকবে না কী করে হয়। সে এটা মানতে পারছে না। এ-জন্য প্রায় এক ফর্মা জুড়ে শহরের তিনমাসের অনুষ্ঠান সূচী এবং তার আলোচনা রেখেছে। আমি রাজী হলে, অন্যরা আপত্তি করবে না মুকুল জানে। আমার রাজী হওয়া মানেই পরীকে আমাদের দিকে পাওয়া। মুকুল আমার দিকে এমন প্রত্যাশার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে যে আর না বলতে পারলাম না। বললাম ঠিক আছে থাকবে।

মুকুল উজ্জ্বল প্রাণবন্ত যুবক—সে মুখ গোমড়া করে রাখতে জানে না। দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

বললাম, চৈতালি কিছু মনে করবে না তো।

—কেন করবে। ওর তো প্রশংসাই আছে। প্রশংসা কে না চায়। তা-ছাড়া কি জান, যারা শহরের সাহিত্য শিল্প নাটক নিয়ে আছে তারা সবাই কাগজটা কিনতে রাজী হবে। আর একটা বড় আকর্ষণ, এই শহরে কে কে আগে গল্প কবিতা লিখে নাম করেছেন, তাদেরও একটা পরিচয় লিপি থাকবে। ভাল হবে না!

আমি বললাম, দারুণ। কাগজ আমাদের হট-কেকের মতো বিক্রি হয়ে যাবে।

কাগজ বিক্রি নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেই, মুকুলের হাঁক, বৌদি চা। বিলু এসেছে।

ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, এখন হবে না। করে খাওগে।

—বৌদি বিলু কি বলছে শোনো!

—কী বলবে জানি। বৌদি দেখতে পারে না। বৌদি খারাপ।

—না বৌদি এমন আমি কখনও ভাবি না।

ভেতর থেকেই কথা ভেসে আসছে।

—না ভাবে না। সেদিন এত করে বললাম দুপুরে আর নাই গেলে। এখানেই দুটো খেয়ে বসে যাও, না মা ভাববে! আমাদের আর বাবা-মা ছিল না।

আমি হেসে ফেললাম।

—না হাসার কথা নয়। খুব খারাপ বলেছি! আমরা তো তোমার কেউ না। কেন মাসিমাকে বলে আসতে পার না, দুপুরে ফিরতে পারবে না। রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে বৌদির বাড়িতে— ফেরা মুশকিল।

সত্যি রাজসূয় যজ্ঞ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুধীনবাবুরা এসে যাবে। পত্রিকার লেখা পাঠ করা হবে। মতামত দেওয়া হবে। পত্রিকার দ্বিতীয় ইসু থেকে ঠিক হয়েছে, সবাই মিলে মিশে পড়া হবে। তারপর বিতর্ক, তারপর লেখা ছাপা যেতে পারে, রায়, আর তারপর শেষ কথা বলার আমি। পরী তখনই নাকি বলে দিয়েছে। পরী বলে দিতেই পারে। প্রথম সংখ্যার সব লেখা আমাকে দেখতে পাঠালে বলে পাঠিয়েছিলাম—অত আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। একটা প্রাথমিক নির্বাচন থাকা দরকার। যে-ভাবে গাদা গাদা লেখা আসছে—পাগল হয়ে যাবার যোগাড়।

আমরা ত্রৈমাসিক কাগজ বের করছি। এটা শহরে এত প্রচার হলো কী ভাবে বুঝি না। এমনিতে গল্প কবিতা যারা লেখে তারা যে উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ধরেই নেওয়া হয়। চৈতালিদের বাড়ি থেকেও আমাদের প্রতি ভাল ধারণা নেই। আমরা নষ্ট চরিত্রের এমনও ধারণা হয়েছে। পরীকে সবাই এমনিতেই নষ্ট চরিত্রের ভেবে থাকে। অন্ততঃ চৈতালির দিদিরা তো বটেই। এত সব জানার পরও আমাদের কেন জানি মনে হয় আমরা অন্য সবার থেকে আলাদা। রাস্তায় দল বেঁধে বের হলে আজকাল কেউ কেউ লক্ষ্যও করে দেখছি। আমরা এমন গাম্ভীর্য নিয়ে থাকি যে দেখলে মনে হবে, আমাদের মতো চিন্তাশীল লোক হয় না। আসলে, মেয়েরা দল বেঁধে যখন যায় তখন সেটা একটু বেশি বেশি। ছোট শহর বলে, কে কোন বাড়ির কার ভাই, কোন পাড়ায় থাকে ভিতরে ভিতরে সব মহলেই মোটামুটি খবর জানা থাকে। আমরা যেমন সুন্দরী মেয়েদের খবর রাখি, তারাও আমাদের অনেকের খবর রাখে। কেবল চৈতালি এবং তার দিদিরা আমাদের দেখলে প্রসন্ন হয় না। চৈতালি এমন ভাবে পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, যেন সে আমাদের চেনেই না। চৈতালির দিদিরা বৌদির ক্লাশফ্রেন্ড বলে—দিদিরা বেড়াতে আসত—কিন্তু চৈতালির নামে কাগজ বের হচ্ছে শুনেই ওরা সেই যে খাপ্পা হয়ে গেল, তা আর মিটল না। এখন চৈতালির দিদিরা আসে না।

মাঝে মাঝে মুকুল একা থাকলে আমাকে ভারি করুণ গলায় বলে, কী করি বলত।

আমি সান্ত্বনা দিই, কাগজটা বের করি আগে তখন দেখবে চৈতালি নিজের গরজেই হাজির হবে।

—না না। যা অহংকারী, কখনও আসবে না।

আমি বলি, আসবে।

মুকুলের এক কথা, আসবে না।

—আলবাৎ আসবে।

—কি করে?

—প্রথম সংখ্যায় প্রশংসা।

—বেশ।

—দ্বিতীয় সংখ্যায় গানের সমঝদার দিয়ে আলোচনা।

—বেশ।

—তৃতীয় সংখ্যায় ছবি।

—বেশ।

—চতুর্থ সংখ্যায় হাজির।

মুকুল ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলল, দেখ একদিন সুচিত্রা মিত্রের মতো বড় গাইয়ে হবে। কী সুন্দর গলার কাজ। আমরা ওর এত ভক্ত আর আমাদের ও এমন অবহেলা করে।

আমি বললাম, অবহেলা আমাদের প্রাপ্য।

—কেন বলত।

—আসলে আমরা ভালবাসার কাঙাল। মেয়েরা খুব সেয়ানা হয় বুঝলে। ওরা দেখলেই বুঝতে পারে। —কি বলে তখন জান?

—কী বলে।

—দেখছিস কেমন হ্যাংলার মতো দেখছে।

—ওরা বুঝি দেখে না।

—কই কাছে এলে তো মনে হয় ওরা রাস্তার নুড়ি পাথর দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।

—দেখতে দেখতে না, শুঁকতে শুঁকতে।

—ওই হল আর কি।

মুকুল যেতে যেতেই তখন কত কথা বলে যায়। সে মেয়েদের মনস্তত্ত্বও ব্যাখ্যা করতে ভালবাসে। —জান বিলু, মেয়েরা অনেক দূর থেকে আগেই দেখে নেয়।

—কী করে বুঝলে।

—ওদের চোখের পাওয়ার বেশি। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মনে হবে, ওরা এতে নেই। কিছুই বোঝে না যেন। জান সবটাই কিন্তু ছলনা। আমি তো মেয়েরা পাশ দিয়ে গেলে ওদের ঘ্রাণ পর্যন্ত নিতে ভালবাসি। আহা, এক নারী তোমার পাশে শুয়ে রয়েছে। সে তোমার। তার সব কিছু তোমার। ভাবতে ভাল লাগে না।

আমি মুকুলের এমন কথায় কি বলব বুঝতে পারি না। পরীকে নিয়ে যে এভাবে ভাবি না, তা নয়। মন তখন ভারি উতলা হয়ে ওঠে। কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। যেন পরী, আমার সব অস্তিত্ব হরণ করে নিয়ে গেছে। আর ঠিক এ-সময়ই ও বলল, পরীকে বোঝা যায় না।

—কেন!

—ক'দিন দেখা নেই। একেবারে ডুব। ভাবলাম, আমাদের কাগজ সম্পর্কে ওর কোনো ভাবনা নেই। সকালে দিলীপদার কাছে গিয়ে শুনি, পরী কাগজ কে দেবে, কভার কোন কাগজে ছাপা হবে, সব দিলীপকে বলে এসেছে। প্রুফ উঠে গেলেই, দিলীপ একসঙ্গে ছেপে দেবে। ছ' ফর্মার তো কাগজ। শুধু দুটো আরও বিজ্ঞাপনের জন্য কভার ছাপার অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না।

—কভার কেমন হল দেখেছ?

—পরী বলেছে, ও কভার করবে।

—ও করবে কেন!

—করুক না। পরী তো সুন্দর ছবি আঁকে। এত করছে, এই সুযোগটা তাকে না হয় দিলেই।

—আমি রাজি না।

—তার মানে।

—না। পরী কী ছবি আঁকবে আমি জানি। পরীর জীবনযাপনের সঙ্গে ছবির কোনো মিল থাকবে না। পোস্টার মার্কা ছবি করবে। সে তার দলের হয়ে এই কাগজে ছবি আঁকলে, সে ছবি যাবে না।

মুকুল আমাকে জানে। পরীর অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়। সে খবরটা পরদিন দিয়েও এল। পরী জবাবে বলেছে, ওকে বল, আমি কভার এঁকে ফেলেছি। পরে না হয় ওর পছন্দমতো কভার হবে।

মুকুল আমার বাড়ি এসে খবরটা দিলে আমি গুম হয়ে থাকলাম।

মুকুল কেমন ক্ষেপেই গেল—আচ্ছা বিলু, যে সব করছে, এমন কি কাগজের দাম, ছাপার খরচ সব দিচ্ছে, কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে সে টাকাটা নেবে বলেছে—তার একটা কভার যাবে এতেও তোমার আপত্তি।

সেদিন আমি তক্তপোষে শুয়ে আছি। মুকুল আমার পাশে। কথা বলছি না দেখে বলল, এত কি ভাবছ।

সহসা আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। উঠে বসলাম,। বললাম, ও কী ছবি আঁকবে তুমি জান না। আমি জানি।

—কী ছবি আঁকবে।

—ঐ কোনো চাষীর উদ্যত হাত। কিংবা শ্রমিকের।

—বেশ ভাল তো। ক্ষতি কী।

—এটা সাহিত্যের কাগজ, রাজনীতির নয়। পরী কিন্তু আমাদের সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমি চাই না অমন ছবি থাকুক। পরীর জীবনের সঙ্গে একজন শ্রমিকের কী সম্পর্ক বল। কোনো

সম্পর্কই নেই। বই পড়ে সব জেনে ফেলেছে ভাব। বই পড়ে সব জানা যায় না। পরীর এ-সব আমার ছলনা মনে হয়।

—আমার মনে হয় না ও রকম ছবি আঁকবে।

—আঁকলেই বা ঠেকায় কে! ওর তো মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করা আছে। সেখান থেকে বের করে আনা সহজ হবে না। সুহাসদা ওর মাথাটি খেয়েছে।

মুকুল বোঝে আমার কষ্টটা কেন এত গভীর। ঘরের ভিতর বসে থাকলে সেটা আরও ভারি হয়ে ওঠে। পিলু এসে বলল, মুকুলদা বাবা তোমাকে ডেকেছেন।

মুকুল বলল, যাচ্ছি। বলেই উঠে গেল। বাবা বারান্দায় বসে। মা চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘরটা উঠোনের শেষ প্রান্তে। বারান্দার কোনো কথাবার্তাই কানে আসবে না। হঠাৎ মুকুলকে ডেকে বাবা কী জানতে চান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকুল ফিরে এল। বাবা মুকুলকে ডেকেছিলেন কেন, এ-সম্পর্কে আমার যেন কোনো কৌতূহলই নেই। আমি শুধু বললাম, জামাইবাবু ট্যুর থেকে ফিরেছে?

মুকুল জানে আমি তাকে কেন এমন প্রশ্ন করছি। সে বসে কি দেখল আমার চোখে মুখে। তারপর বলল, ওটা তোমার হয়ে যাবে। সার্কুলার এলেই হবে। তুমি একটা দরখাস্ত ছোড়দির হাতে দিয়ে আসতে পার। আমাকেও দিতে পার। টাইপ করে দিলে ভাল হয়। রিফিউজি কথাটার কিন্তু উল্লেখ করবে।

—কেন রিফিউজি না হলে হবে না!

—হবে না কেন! হবে। তবে রিফিউজি হলে জামাইবাবু সহজেই ডি আইকে দিয়ে এপ্রুভ করিয়ে নিতে পারবে। রিফিউজিদের জন্য আলাদা কোটা আছে।

টাইপ করে দেবার কথা বলছে! কোথায় করাব জানি না। হাতে লিখে দিলে অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাইলে, মুকুল বলল, ঠিক আছে ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আমি জামাইবাবুকে দিয়ে ড্রাফট করিয়ে নেব। টাইপ করে রাখব। সইটা করে দিও। তুমি নাকি সেদিন ভাকুরির কাছে কোন গাছতলায় শুয়েছিলে?

—বাবা বুঝি বললেন।

মুকুল বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। পাজামা সামান্য তুলে পায়ে কি দেখতে দেখতে বলল, জান আমার পায়ের চামড়া কি খসখসে! দেখ হাত দিয়ে! শীত আসার আগেই গোড়ালি ফাটতে শুরু করে। তোমার পা দুটো কী সুন্দর!

মুকুল এ-রকমেরই। হাত পা এবং চোখ মুখ সব মিলে মুকুলের মধ্যে একটা শান্তশ্রী আছে। উঁচু লম্বা। কালো রঙটা যেন এই চোহারার সঙ্গে ভারি খাপ খেয়ে গেছে। তার এক কথা, ভগবানই যাকে মেরে রেখেছেন, তার আর কিছু হবার নয় বিলু। চৈতালিকে আমার পাশে মানাবে কেন। ঘুরে ফিরে কী করে যে আমরা হয় চৈতালি না হয় পরীতে চলে আসি।

আমি উঠে বসলাম। মায়া দুধ রেখে গেছে দু-গ্লাস। মুকুলকে মা বাড়ির ছেলের মতোই ভেবে থাকে। মা বুঝতে পারে, মুকুল তার পুত্রের একজন প্রকৃত হিতৈষী। বাবাও এমন বোধহয় ভাবতে শুরু করেছেন। কত অসহায় হলে বাবা তার পুত্রের মতিগতি নিয়ে মুকুলের শরণাপন্ন হতে পারেন এই প্রথম আমি যেন টের পেলাম। বাবার জন্য কষ্টবোধ থেকেই যেন বলা, বাবা আর কিছু বললেন?

—বলেছেন।

—কী!

—ও-সব তোমাকে বলা যাবে না।

—ও-রকম বাবা বলতেই পারেন না। পুত্রের কোনো অগৌরবের কথাই বাবা কাউকে আজ পর্যন্ত বলেন নি। বলতে চান না। তুমি জান বাবাকে। বাবার এখন একটা চিন্তা, পরীক্ষায় আমি ফেল টেল করলে আবার না বাড়ি থেকে উধাও হই। দু-বছর আগের বিলু দু-বছরের পরের বিলুতে কত তফাৎ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তখন জীবনে পরী ছিল না। লক্ষ্মী ছিল না। পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করেছি বলতে গিয়ে চোখে জল এসে গেছিল। বাবা কত সহজে বলেছিলেন, জীবনে দশটা

বিষয়ের মধ্যে নটাতে পাশ করেছ—সোজা কথা! জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাশ করে। সব দুঃখ এক পলকে মুছে গেছিল। কিন্তু এখন, পরীক্ষায় ফেল করলে, গুম মেরে থাকব। বাবা কোনো সান্ত্বনার কথা বললে হয়তো রেগে যাব। দু-বছর আগে যে বিশ্বাস নিয়ে বাবার সব কিছু মাথা পেতে নিয়েছি, এখন আর তা নিতে পারব না। বুঝতে পারছি, কেউ আমার শেকড় আলগা করে দেবার চেষ্টা করছে।

দুধের গ্লাসটা ওকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, খাও। বাড়িতে গরু আছে, দুধটা এখনও পাবে। বাবা পরীকেও তাঁর গরুর দুধ খাইয়েছেন। বাবা আমার অদ্ভুত মানুষ। তুমি চলে গেলেই বলবেন, মুকুল কিছু বলল, মানে দুধটা যে শহরের জল মেশান দুধ নয় খাঁটি দুধ, তাই তিনি জানতে চান। কিন্তু আজ এমন কি বললেন, যা বলতে পারছ না।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে বকছি দেখে মুকুল উঠে দাঁড়াল। বলল, চল বের হই। বলে চুমুক মেরে দুধটা শেষ করে সাইকেলে ওঠার আগে বাবাকে বলল, দারুণ খেতে। আমাদের দুধ—সে আর বলবেন না। খাঁটি দুধের স্বাদই ভুলে গেছি। এতে বাবা ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মুকুল বলায় আমি ক্ষুব্ধ হই নি। কিন্তু পরী বললে, আমার রাগ হত। মনে হত সব তাতেই পরীর ছলনা। বাবাকে ভালমানুষ পেয়ে খুব চাল মেরে গেল।

বের হবার সময় বললাম, ফিরতে রাত হবে। ভেব না। টিউশনি সেরে ফিরব।

আমি আর মুকুল আর সেই চিরপরিচিত বাদশাহী সড়ক। আমরা দু'জনই এখন বড় হবার স্বপ্ন দেখছি। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু সেটা কি, দু'জনেই ভাল জানি না। আমার তো যা অবস্থা, তাতে শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হওয়া ছাড়া অন্য কি আর অবলম্বন থাকতে পারে। বাদশাহী সড়কে উঠে দু'জনে পাশাপাশি যাচ্ছি। বাবা মুকুলকে ডেকে কী বললেন, জানার কৌতূহল আছে, অথচ আমি নিজে আর কথাটা যেচে জানতে চাই না এমন এক ভাব দেখাচ্ছি। অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে, ফেল করলেও যা এখন, পাশ করলেও তাই। কারণ প্রাথমিক স্কুলের চাকরির জন্য যে পড়াশুনা থাকা দরকার সেটা আমার আছে। কাজেই কাজটা হয়ে গেলে এমনিতেই কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং এ-কারণেই পরীর সঙ্গে আর আমার কোনো সংযোগ থাকবে না। কষ্টটা যত বড়, তার চেয়েও বড় বাবাকে নিদারুণ অভাব থেকে রক্ষা করা। মা'র সঙ্গে বাবার আজকাল একদম বনাবনি হচ্ছে না। যেন দু'জনেই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আর্থিক অনটন এর মূলে বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না।

মুকুল এক সময় গলা ছেড়ে গান ধরেছিল। মুকুল ভারি সুন্দর গায়। গানের চর্চা করলে সেও চৈতালির চেয়ে কম নাম করতে পারত না এমন আমার মনে হয়। আসলে লেগে থাকা, সেটাই আমাদের মধ্যে নেই। কবিতা লিখি, মুকুল কিংবা সুধীনবাবুরা শোনে। আমি জানি কিচ্ছু হয় না, অথচ সবাই অসাধারণ বলে এক সঙ্গে হল্লা করতে থাকে। বুঝি না, এটা আমাকে খুশি করবার জন্য, না পরীকে। পরী আমার কবিতার অনুরাগী। পরী অখুশি হলে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাগজ নিয়ে পরীর উৎসাহ কমে গেলে ওটা বের করা আমাদের পক্ষে কত শক্ত কাজ বুঝি। তখনই যেন আরও ক্ষোভ বাড়ে।

আমরা ভাকুরি পার হয়ে সারগাছির দিকে যাচ্ছি। হু হু করে হাওয়া বইছে। চার পাঁচ দিন বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পুকুর নালা ডোবা জলে ভর্তি। কোথাও জমিতে জল জমে আছে। সেখানে চাষ-আবাদের কাজ চলছে। প্রকৃতি সবুজ সমারোহ নিয়ে যেন এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা চারপাশের গাছপালা মাঠ দেখতে দেখতে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতে চাইছি।

সামনে কালভার্ট একটা। মুকুল বলল, এস বসি। পাশে চায়ের দোকান। সে সাইকেলটা কালভার্টে দাঁড় করিয়ে দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে এল। এসেই বলল মেসোমশাই খুব ঘাবড়ে গেছেন।

আমি বললাম কেন?

—তুমি নাকি গাছতলায় শুয়েছিলে। পিলু তোমাকে খুঁজে এনেছে।

—বললেন!

—হ্যাঁ। বললেন, এখন কি করি বলতো মুকুল! তুমি কিছু জান?

—তুমি কি বললে?

—কি বলব! আমি বললাম, ও কিছু না। আপনি ভাববেন না।

—কিছু না। কী করে বুঝলে?

—ওটা এ-বয়সে হয়। আমারও হয়। তবে কী জান, আমার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই। থাকলে টের পেতেন। বৌদি বোঝে। বুঝে মজা পায়। বৌদির এক কথা। বি এ পাশ করলেই কাজে ঢুকিয়ে দেবে দাদা। তারপর কাঁধে জোয়াল তুলে দেবে। সব রোগ নাকি তখন আমার সেরে যাবে। কবিতা ফবিতা সব মাথায়। কাগজ নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ বন্ধ। বৌদি ঠাট্টা করে বলেন, তখন একটাই হোম। তাতে দু-পাশে দু-জন। মাঝে হোমের কাঠ প্রজ্বলিত। আমাদের মধ্যে তখন একটাই কথা—ওম অগ্নয়ে স্বাহা—হে অগ্নি তুমি সব গ্রহণ কর। তিনি হলেন অগ্নি, সর্বভূক—ঘি হবি যা ঢালবে সবই তিনি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং হজম করে ফেলবেন। বলেই মুকুল একটু বেশি সাধু ভাষায় কথা বলে হা হা করে হেসে উঠল। বৌদিটা বড্ড ফাজিল। আমার মুখ চোখ দেখে এখন বৌদি আরও মজা পায়।

—তুমি কি বল বৌদিকে।

—বলি ও-সব বিয়ে-ফিয়েতে আমি নেই। কবিতা-আহা—সুচারু সব সপ্নের সাধ / কখন কী যে বনভূমি হয়ে যায় / আমার তোমার মাঝখানে এক সুবিশাল প্রাচীর / গন্ধরাজ লেবুর ঘ্রাণের মতো আমার বাসনা / ক্রমে বিস্তারিত মাঠ পার হয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় দেখি / তুমি আছ নগ্ন হয়ে নতজানু আমি।

—বা সুন্দর তো! তোমার মুখে শুনলে মনেই হয় না আমার লেখা।

মুকুল চা খেতে খেতে হাসছে। বলল, জান, চৈতালীকে দেখলে আমি কেন জানি তোমার এই কবিতাটাই আওড়াই।

—দারুণ মানিয়ে গেছে।

মুকুল বলল, একটা কবিতা লিখতে পারলে মনে হয় না—সবই বড় অকিঞ্চন, আশা কুহকিনী, সব শেষে দু-লাইন কবিতার আর্শিতে পৃথিবী অতীব মায়াবী, মনে হয় না তোমার! আমার কি মনে হয় কি বলব। চুপ করে গেলাম।

হেসে বলল, তখন চৈতালিকে আমার জান ভিখারিণী মনে হয়। আমি সম্রাটের মতো সেই ভিখারিণীর পাশে দাঁড়িয়ে বলছি, ওঠো জাগো, হাত ধর। চল কোনো সাদা জ্যোৎস্নায় আলস্যের নদী অথবা সাগরে ডুব দিতে যাই।

আমি চা শেষ করে বললাম, এটাকে আলস্যের সাগর বলছ কেন? কী মিন করতে চাইছ!

—না মানে ...

মুকুলের আবার সেই গলা ছেড়ে হাসি। —কী এক রহস্য গোপন করে রেখেছ নারী / আমার গভীর ঘুম পাতলা হয়ে আসে / নক্ষত্রের মতো বিন্দু বিন্দু কুয়াশার জল টলটল করে রক্তে / এবং এই আমি তুমি গভীর সহবাসে লিপ্ত / যদি কোনো দিন কোন জন্মের ইশারা / কেউ হেঁকে যায় / আছ নাকি বেঁচে স্বপ্নের ভিতর।

আমি বললাম, শুধু তিক্ততা তার রক্তে / বিলাস তার স্বপ্ন, আধো ঘুমে আধো জাগরণে / কবিতা পাঠ করে কোনো এক নারী — যার দু-হাতে বিশাল থাবা / মরণ কামড়ে আমায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে ভালবাসে / তার বিলাস প্রেমে, বিলাস আগমনে / বিলাস শুধু নিঃসঙ্গ কোনো যুবকের চুম্বনে / তার হাড় মাসে মজ্জায় রক্ত তুফান / আমি ছিন্নভিন্ন ছেঁড়া পালে গলিত এক শব / পড়ে থাকি নদীর চড়ায় /

—দারুণ, দারুণ।

আমি বললাম, বয়েস আমার যন্ত্রণা / বয়েস আমার উধাও করা মাঠ / চাষ-আবাদ শেষে চাষীর প্রত্যাগমন হয় / বাড়ি ফেরে / জলে জলে নেয়ে তার হৃদয় শেষ বেলায় হতাশায় ডুবে থাকে / তাকে আমি চিনি সেও আমায় চেনে / হেসে বলে কেমন আছ / বলি, ভাল নেই / জীবনের শুভাশুভ সব খড়ের মাঠ—খরায় জলে / চিতার আগুনে পুড়ে সে শেষ হয়ে গেছে / তাকে আর জাগাতে যেও না—নাভিমূলে তোমার সোনালী রেশম / উষ্ণতায় ডুবে আছে জেনেও সে শুয়ে থাকে চিতার আগুনে।

মুকুল সহসা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ভালমন্দ কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে ভাকুরির মাঠে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়। আমরা দুই সাইকেল আরোহী বাড়ি ফিরি। আমরা কেউ আর কিছু বলছি না। উভয়ে কেমন ফেরারী আসামীর মতো নিজেদের গোপন করে রাখছি।

মুকুল এক সময় বলল, মেসোমশাই খুব ঘাবড়ে গেছেন বিলু। পরীকে নিয়ে তাঁর ভাবনা দেখা দিয়েছে। বললেন ...। বলেই চুপ করে গেল।

—কি বললেন?

—না, মানে তুমি পরীকে নিয়ে কোনো ফ্যাসাদে পড়ে গেছ তিনি ঠিক টের পেয়ে গেছেন।

—বাবা কি পরীর কথা কিছু বললেন?

—না।

—তবে?

—দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

—কিসের দ্বিধা?

—পরীকে নিয়ে তুমি খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছ।

—মোটেই না।

—পরী বাড়ি গেলে তবে রাগ কর কেন। আমরাও তো যাই। তুমি তো রাগ কর না!

—আমি রাগ করতে যাব কেন!

—কিন্তু পরী পালিয়ে যায় জান?

—দু-একবার গেছে।

—এখনও যায়।

—কবে গেছিল?

—কালও গেছে।

—কখন?

—তুমি কখন বাড়ি থাক না পরী ঠিক জানে। সকাল বেলায় টিউশনিতে যাও পরী সব খবর রাখে।

আমি সকাল বেলাতেই মিলে পড়াতে যাই। আজ সকালে যাওয়া হয় নি। সন্ধ্যায় যাব। কিন্তু পরী আসে, অথচ কোনো খবরই পাই না। পিলু পর্যন্ত বলে না। পরী কি বাড়িতে আমার চেয়েও বেশি তাদের নিজের হয়ে গেছে! পরীর জেদের কাছে এ-ভাবে পরাজিত হতে আমি রাজী না। আমার ভেতরটা সবার উপর কেমন ক্ষোভে হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মায়া মা, বাবা পিলুকে পরী হাত করে ফেলেছে। ভাবতেই কেন জানি মনে হল, পরীর ছলনা ভাঙতেই হবে। পরীকে আবার অপমান করতে হবে। কিন্তু মুশকিল, অপমানে পরীর চোখ যেমন জলে ভার হয়ে ওঠে, শুকিয়ে যেতেও তা সময় লাগে না। না হলে, গোপনে সে কিছুতেই আমার অবর্তমানে আমাদের বাড়ি ফের যেতে সাহস পেত না। আজই গিয়ে তুলতে হবে কথাটা। কেন আসে? আমার যা কিছু অপছন্দ তাই করে বেড়ায় পরী। আমরা গরীব বলে সে ভেবেছেটা কী!

কিন্তু মুকুল তখন বলছে, এই নিয়ে তুমি মেসোমশাইকে কিন্তু কিছু বলবে না। কথা দাও।

আমরা পঞ্চাননতলার কালীমন্দিরের কাছে এসে গেছি। এখান থেকে মুকুল রেল-লাইন পার হয়ে শহরে চলে যাবে। আমি যাব কলোনিতে। বেড়াতে বের হলে আমাদের এই জায়গাটাতে থামতে হয়। সাইকেল থেকে নেমে মন্দিরের চাতালে বসে কোনোদিন গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়। জায়গাটা বড় নির্জন। কোনো দোকান পাট নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস রাস্তা পার হলে জঙ্গলের মধ্যে। পুরানো আমলের বাড়ি। কোনোকালে, রাজরাজড়ার প্রাসাদ ছিল। সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস। সন্ধ্যা হলেই পরিত্যক্ত বাসভূমির মতো লাগে। শহর থেকে সাইকেলে কেউ ফিরে যায় রাস্তা ধরে। সাইকেল, রিকশা এবং গরুর গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। আর দু-পাশে গভীর জঙ্গল আর বিশাল সব আমবাগান। রাত হলে জোনাকি জ্বলে। দূরে দেখতে পাই লণ্ঠনের আলো। বাড়িটার দারোয়ানের কুঁড়েঘরে তখন একমাত্র আলো জ্বলে। মুকুলের বোধ হয় এখানটায় আরও কিছু সময় কাটিয়ে যাবার

ইচ্ছা। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বস।

আমার টিউশনি আছে। মনটাও ভাল নেই। পরীর জেদের কাছে বার বার হেরে যেতে আমি আর রাজী না। বললাম, আজ আর বসব না। চলি।

—মেসোমশাইকে কিছু কিন্তু বলবে না।

—ঠিক আছে বলব না।

—মেসোমশাইর অগাধ বিশ্বাস আমার উপর।

—জানি।

—বললে খুব দুঃখ পাবেন।

—বললাম তো কিছু বলব না।

—জান সেদিন পরী গঙ্গার ধারে কী সুন্দর গাইল!

আমি জানি ভোট আসছে বলে এখন শহরে গাঁয়ে গঞ্জে শুধু প্রচার চলছে। পরীর পার্টি এখানে সেখানে জনসভা করছে। পরী সে-সব সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। যেন এক একটা কথা আগুনের ফুলকি হয়ে ওড়ে। তারপরই আমি কেন যে অবাক হয়ে যাই—শুনি পরী এস ডি ও সাহেবের জিপে কোথায় গেছে। হাওয়া খেতে বের হয়। একবার সাহেবটি নিজের বাড়িতেই কবিতার আসর বসিয়েছিল। সঙ্গে রকমারি খাবারের ব্যবস্থা। সাহেবটির চেয়ে পরীরই যেন বাংলো বাড়িটাতে বেশি আধিপত্য। সে সেদিন, আমার কবিতা পর পর আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি সবার চেয়ে আলাদা তার কাছে। একপাশে আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম। পরীর দিকে ভাল করে তাকাতেও পারি নি সেদিন।

আমি বললাম, কি গাইল!

—কোরাস।

পরী গান গায় জানতাম না। বললাম, কোরাস মানে?

—পরীর সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে গাইল। মাইকের সামনে পরী। পাশে সব পার্টির ছেলেরা। নদীর বিশাল চরে মঞ্চ। মানুষজনে ভর্তি। পরী অবলীলায় সংগ্রামী গান গেয়ে গেল। হাত তুলে যখন ওর সেই সুন্দর গান মাইকে ভেসে আসছিল, তখন আমার যে কি গর্ব। পরী আমাদের। আমাদের পরী গাইছে—মাউন্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জহর কান্দে, প্যাটেল কান্দে, কান্দে মৌলানায়—মাউন্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জারিগানের সুর। সভার মানুষজন স্তব্ধ হয়ে শুনছে। লাল পাড়ের শাড়ি পরনে। নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সে এক বিশাল ব্যাপার। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তারপর যখন গাইল, এস মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার, তখন কি মনে হয়েছিল জান, পরী আমাদের নয়, পরী অন্য জগতের বাসিন্দা। যেন অলৌকিক মহিমা তার সারা গানে বিরাজ করছে।

মুকুল থামতে চাইছে না। পরীর প্রশংসা করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

সহসা আমি কেন যে চিৎকার করে উঠলাম, থাম থাম। রাবিশ, আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। পরী একটা বাজে মেয়ে। খারাপ মেয়ে। জেদী, অহংকারী—আমি পরীকে তোমার চেয়ে ভাল চিনি। একদম আর কোনো প্রশংসা না। আমাকে যেতে দাও। বলেই সাইকেলে উঠে পাগলের মতো কেমন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললাম। আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ এল মিলের গেটে এসে।

এত দ্রুত সাইকেল আমি চালাই না। অন্ধকার রাস্তায় আমি কেমন পাগলের মতো ছুটে এসেছি। হাঁপাচ্ছি। সাইকেল থেকে নেমে কিছুক্ষণ রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি কেমন নির্বিষ নিরুপায় এক মানুষ।

হুঁশ ফিরে এলে যেন মিলের ঘণ্টা পড়ল। সাতটার ঘণ্টা। আমি অসহায় মানুষের মতো কুড়ি টাকা মিলবে বলে টিউশনি করতে যাচ্ছি। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতেই মনে হল, শরীর থেকে এই সব পোকামাকড়ের বিষ ঝেড়ে ফেলা দরকার।

পরী আমার কেউ না। মুক্ত হতে চাইলাম। রুমালে মুখ মুছলাম। ঘামে জবজব করছে জামা প্যাণ্ট। সাইকেল ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাব, দেখি খোদ ম্যানেজার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই

বিগলিত হাসি, এই মাত্র মিমির সঙ্গে ফোনে কথা হল।

এখানেও মিমি! আর ম্যানেজার সাহেব তো আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেন নি। এ-ভাবে আমাকে দেখে বিগলিত হাসিও দেখি নি। আমার সম্পর্কে কাকা হয়। বাবা তো প্রথমে যখন টিউশনিতে আসি, বলে দিয়েছিলেন, ভূপাল সম্পর্কে তোমার কাকা হয়। প্রণাম করবে!

আমি ভূপাল কেন তাঁর বাবাকেও প্রণাম করি নি। আমরা যে তাঁদের আত্মীয় হই বিষয়টাই যেন বড় হাস্যকর। আমার সম্পর্কে তাঁরা কোনো খবর নেন নি। নরেশ মামা ভূপালের বাবার কাছের মানুষ, সেই সুবাদে আমার পড়াবার অনুমতি মিলেছে। আসলে একটা উদ্বাস্তু পরিবারকে কিছুটা যেন সাহায্য করার মতো। কিন্তু আজ নীলরঙের বেতের চেয়ার দেখিয়ে আমার কাকাবাবুটি বললেন, বোস, তুমি আমাদের দেশের ছেলে জানতামই না। তোমরা আমাদের আত্মীয় হও।

দেখি তখন তাঁর বাবাও হাজির।

যেন কত আপনার মানুষ, তুমি তো আচ্ছা ছেলে বিলু। তোমার বাবা আমার ভাইপো সম্পর্কে —অথচ এ-সব কিছুই তো বল নি।

বলে কি! নরেশমামা তো জানে, আমাদের সঙ্গে লতায় পাতায় আত্মীয়তা আছে।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেলে যা হয়। মিমির ফোন! আমার আত্মীয়! বসার ঘরে নিয়ে হাজির! —এত কেন হচ্ছে!

ভূপালের বাবাটি বলল, বোস। তোমার ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে কত গেছি। তা তোমার ঠাকুরদার বড় টোল ছিল—মহামহোপাধ্যায় তিনি। তোমার ঠাকুরদার নামডাক ছিল—এক ডাকে সবাই চিনত।

আমার বাবার নাম করে বলল, তোমার বাবা তো সেদিকে মাড়ালই না হাফ-ব্যাক খেলতে গিয়ে একবার মজুমপুরের স্কুলের মাঠে পা ভাঙল। এই ভূপাল, আরও সবাই মিলে তোমার বাবাকে বাড়ি দিয়ে এল।

আমার বাবা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন জানতাম না। বাবার কাছে কোনোদিন শুনিও নি। মাও বলে নি, বাবা ফুটবল খেলতেন। তবে বাবা এখন যে-ভাবে ফুটবল খেলছেন তাতে আমার চাকরির খুবই দরকার।

ম্যানেজার সাহেবের বাবা আমার বাবার কাকা হন এটুকু শুধু জানতাম! টিউশনি ঠিক হলে বাবা বলেছিলেন, ভূপাল মিলের ম্যানেজার। আমাদের আত্মীয়। মার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আরে মনে নেই, একবার এত বড় একটা চাইন মাছ নিয়ে এসেছিলেন, তুমি মনে করতে পারছ না! কারো বিয়ে কি অন্নপ্রাশন এমনই কিছু বলেছিলেন, তবে আমার ঠিকঠাক মনে নেই। দেশের কথা কোনোদিন ওঠে নি। আজ শুধু দেশের কথা না, আমি তাঁদের আত্মীয়, আমার ঠাকুরদা মহামহোপাধ্যায়, অনেক শিষ্য, বাড়িতে টোল ছিল, আরও কত খবর দিয়ে নিমেষে নিজের মানুষ করে ফেলতে চাইছেন। তাহলে কি মিমি ফোনে বলেছে সব? সাহেবের কবিতা দুটো যাচ্ছে না। সম্পাদক রাজী না।

আজ পড়াশোনার পাট উঠে গিয়ে বাড়ির অন্য চেহারা। সাহেবের পত্নী হাজির। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তুমি বিলু বড় মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। মিমি তো বলল, ও এ-রকমেরই।

মিমি আর কি বলেছে জানার ইচ্ছে। কিন্তু আমি চুপচাপ বসে আছি।

—একদিন আমরা যাব।

বললাম, যাবেন।

—তোমার বাবাকে বলবে, আমরা খুব রাগ করেছি। এতদিন আছি দিদি একবার বেড়িয়ে গেলেন না!

বললাম, বলব।

আমি জানি তিন মাসের মাথায় আমার এত আদর আপ্যায়নের মূলে মিমি। এখানেও মিমির প্রভাব। মিমি ভেবেছে কি?

ম্যানেজার সাহেব বললেন, চা খাও তো!

—খাই।

তারপর বললেন, মিমির সঙ্গে কি করে আলাপ?

—এক সঙ্গে পড়ি।

—ওদের বাড়ি গেছ?

মনে হল বলি, না গেলে কী চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে আমার মধ্যে একটা ভীতু মানুষ আছে—সে এ-সব কথায় সংকোচের মধ্যে পড়ে যায়। বললাম, গেছি।

—ওর দাদু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

—জানি।

—খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার!

—শুনেছি।

এ-সময় দুই ছাত্রী আমার হাজির। একজনের হাতে চায়ের কাপ। অন্যজন মিষ্টির প্লেট নিয়ে হাজির। আমার সামনে রাখছে।

বড় ছাত্রীটি আজ আবার শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরলে কত সুন্দর লাগে দেখতে। কেন যে পরে না। ফ্রক গায়ে আমার সামনে বসলে আমি ঠিক মুখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি যে একজন তরুণ যুবক, আমার মধ্যে বড় হবার স্বপ্ন আছে এতদিন এ-বাড়িতে এমন বিশ্বাস কারো ছিল না। মানুষ বলে গণ্য না করলে যা হয়। নরেশমামার কথা ফেলতে পারে না বলেই যেন রাখা।

চা, খাবার একটা টিপয়ে রাখলে তাদের পিতৃদেবের হুকুম—প্রণাম কর। কত বড় বংশের ছেলে জান না! ওর ঠাকুরদাকে দেশে সবাই এক ডাকে চিনত।

আমার ঠাকুরদা যে এত নামী মানুষ আমি এই প্রথম শুনলাম। আমার জন্মের আগেই ঠাকুরদা গত হয়েছেন। দুটো খবরই আমাকে আজ কেমন বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এক বাবা বড় ফুটবল খেলোয়াড়, দুই, আমার ঠাকুরদা মহামহোপাধ্যায়। বাবা তো এ-দেশে এসে কোথাও ঠেকে গেলে একমাত্র দীনেশবাবুর দোহাই দিতেন। বাবা কেন যে ঠাকুরদার নাম বলতেন না বুঝতে পারি না।

ওরা প্রণাম করে উঠে পাশের সোফায় বসে পড়ল। প্রণামে আমার কোনোদিন আপত্তি নেই। ছোট বয়েস থেকেই ওটা পেয়ে আসছি বামুন ঠাকুর বলে। পাশের সোফায় পায়ের উপর পা রেখে দাম্ভিক এবং গুরুগম্ভীর ম্যানেজার পাইপ নামিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, মিমি তো দেখছি এখানে এলে তোমার কথা ছাড়া কিছু বলে না। তুমি নাকি ছাইচাপা আগুন। তুমি বলছি বলে মনে কিছু কর না কিন্তু।

আমি প্রায় আর্তনাদ করতে যাচ্ছিলাম—না না, তাতে কী হয়েছে।

তারপর বলার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি তো আপনার ভাইপো। সেটা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে বলে চুপ করে গেলাম।

—খাও। কাকীমার গলায় স্নেহ ঝরে পড়ছে।

মিমি ভেবেছেটা কী! আমি ছাইচাপা আগুন! ও এখন ফু দিয়ে তা জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

এ-ঘরের দেয়াল যেন নতুন করে ফের দেখছি—কাকীমার কিছু সূচীশিল্পের নিদর্শন আছে। সূচীশিল্পে মহামান্য ম্যানেজারের পদ্য লেখা। পদ্যের নিচে নাম, ভূপাল চৌধুরী। পতীর পুণ্যে সতীর পুণ্য গোছের সব পদ্য। তার স্বামীটি শুধু এত বড় মিলের ম্যানেজারই নয়, একজন কবিও। তার সঙ্গে তিনি যে শিকারী সে ছবিও এই ঘরে! বসার ঘরটা জীবনের প্রশংসাপত্রে ভরে ফেলেছে। কোথাও কোনো বিদায় সম্বর্ধনার প্রশংসাবাক্য, কোথাও সাহেব মালিকের পাশে দণ্ডায়মান ছবি, কোথাও সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন তার ছবি। এই প্রথম বুঝতে পারলাম গোটা পরিবারটাই ভূপাল চৌধুরী নামক একজন কৃতী মানুষের অহঙ্কারে ভুগছে। সারা পরিবার এবং আগামী বংশধরেরাও এই মহান কৃতী পুরুষের জীবন নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে। তাই সব কিছুই বাঁধিয়ে রাখা।

—কিছু খাচ্ছ না যে!

—এত খাব না।

—আরে খাও। ছেলেমানুষ। তোমাদের বয়সে আমরা সব গোগ্রাসে খেতাম।

দাদুটি বললেন, তোমার ঠাকুরদা খুব খাইয়ে মানুষ ছিলেন। আস্ত পাঁঠা খেতে পারতেন। কী বিশাল

চেহারা। আর তেমনি সুপুরুষ। সাদা কদমছাঁট চুল—লম্বা টিকিতে লাল জবা। গায়ে শুধু রেশমের উত্তরীয়। পায়ে খড়ম।

ভূপাল চৌধুরী মশাই বললেন, ব্যাপার কি জান, আমিও একসময়ে কাব্যচর্চা করতাম। আমার কবিতা বাণী, রূপা, চম্পা কাগজে প্রকাশিত হত। নানা ঝামেলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুঝলে না একজন মানুষের পক্ষে সব দিক বজায় রাখা কত কঠিন।

আমি বললাম, তা ঠিক। বলার ইচ্ছা ছিল বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ কেন। ছাত্রী দুজন আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এতদিন তারা শুনে আসছে—ওরে তোরা কোথায়। মাস্টার এসে বসে আছে। এখন তারা ভাবছে, মিমিদি এই মানুষটিকে বড় সমীহ করে। মিমিদি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করা মেয়ে। মিমিদি নাটক করে। শহরে এমন লোক কমই আছে মিমিদের নাম জানে না। মিমিদির দাদুকে চেনে না। মিমিদিদের গাড়ি আছে। সেটাই এখন লেটেস্ট মডেলের। মিমিদিরা গাড়িতে এলে এই বাংলোর বাসিন্দাদের ইজ্জত বেড়ে যায়। সে-ই যখন বলে গেছে, ছাইচাপা আগুন, বিলুকে এমনিতে বোঝা যায় না, জেদী অহংকারী, মাথা নিচু করে কথা বলে কিন্তু যা ভাবে তা করবেই। ওর মধ্যে দারুণ তেজস্বিতা আছে। কবিতা দারুণ লেখে। কুঁড়ের হদ্দ। লেগে আছি। হয়তো মিমি তার দু-একটি কবিতাও এখানে আবৃত্তি করে যেতে পারে। এত বড় বংশের এমন সুন্দর তরুণীর সার্টিফিকেটের কত দাম মিষ্টি মুখে দিতে টের পেলাম। কিন্তু আমি কেন যে ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে মরছি বুঝতে পারছি না। মিমির পরিচয়ে আমার পরিচয়। মিমি বললে, আমি রাজা, না বললে আমি ভিখারী। কখ্খনও না। এ হতে দেওয়া যায় না।

ঢোক গিলে বললাম, মিমি মিছে কথা বলেছে।

সহসা কেমন সম্বিত ফিরে আসার মতো ভূপাল চৌধুরী মশাই মানে আমার এখনকার কাকাবাবুটি প্রায় অনেকটা নড়ে বসলেন। বললেন, না না, মিমি কখনও বাজে কথা বলে না।

আমারও মাথা গরম। বললাম, খুব বলে।

—তাহলে বলল যে অপরূপার সম্পাদক তুমি!—তুমি এর মধ্যে নেই?

—না।

মিমি যে বলল, বিলুর ইচ্ছে নয়। ও অপরূপার সম্পাদক। ও রাজী না হলে কিছু করা যাবে না।

—ঠিক বলে নি।

দাদুটি বললেন, আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে! আর অত ছেড়ে দিলে হবেই বা না কেন! এর ওর বাগানে মুখ তো দেবেই।

এই এক ফ্যাসাদ আমার। ওর প্রশংসা সহ্য হয় না। অপ্রশংসাও না। দাদুটির কথায় আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। মিমি খারাপ মেয়ে। এর বাগানে ওর বাগানে মুখ দেয়।

কাকাবাবুটির পাঁইপ টানা বন্ধ হয়ে গেছে। ইজ্জতে লেগেছে। তবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মিমির উৎসাহে আমি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছি।

তাহলে মিমির দিব্যি আছে মাথায়। আমার হাসি পাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে বসে আছি। হাসলেই গেল। এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, হাসা ঠিক না। অনেকদিনের সাধ লোকটাকে অপমান করার। কবিতা অমনোনীত—ব্যাস—তারপরই মিমির বাকি কাজ। এটা মিমি করবে আমি জানতাম। কারণ মিমি জানত আমার হেনস্থার কথা।

বললাম, মিমির এটা স্বভাব। ও সবাইকে উৎসাহ দেয়।

—মিমি না বললে, এ বয়সে কে আর সাধ করে কবিতা লেখে। দেয়ালের বাঁধানো কবিতা দেখেই বলল, বা কী সুন্দর হাত আপনার। ওটা ছেড়ে দিলেন কেন!

মিমি এমন বলতেই পারে না। সৌজন্যের খাতিরে বলতে হয়তো পারে। কাকাবাবুটি জীবনের সব প্রশংসাপত্র এই ঘরে লটকে রেখেছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার স্বভাব। হয়তো মিমিরা এলে সব দেখিয়েছেন। কোন ছবি কবে কোথায় তাও বলতে পারেন। কোন্ প্রশংসাপত্র কোন মিল থেকে বিদায় সম্বর্ধনায় পাওয়া। কোন বনে কোন হরিণ শিকার করেছেন। বাঘের চামড়াটি আছে। ওটাও

তাঁর শিকার করা। এত সব কৃতিত্বের সঙ্গে পদ্যের প্রশংসা না করলে অশোভন। মিমি তাই বলতে পারে, ছেড়ে দিলেন কেন! আসলে মিমি হয়তো বলতে চেয়েছিল, ছেড়ে দিয়ে ভাল করেছেন। নাহলে নিজেও ডুবতেন, অনেক সম্পাদককেও ডোবাতেন। তবে মিমি দেখেছি আমাকে ছাড়া রূঢ় কথা আর কাউকে বলে না। সবার সঙ্গেই মধুর ব্যবহার। আমি ছাড়া দেখছি ওর আর কোনো বড় প্রতিপক্ষ নেই। মিমিও আমার সঙ্গে ঝগড়া করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বাড়িতে গোপনে আঁসাটাও আমার কাছে কেন জানি এক রকমের শত্রুতা।

কাকাবাবুটি সোজাসুজি বললেন, তাহলে মিমি আমাকে ব্লাফ দিল! যেন স্বগতোক্তির মতো। কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না। ছাত্রী দু'জন পিতৃদেবের অপমান সহ্য করতে না পেরে বিমর্ষ— কিংবা পিতৃদেবের এমন করুণ মুখ হয়তো জীবনেও তারা দেখে নি, দাপটে যে মানুষ এত বড় মিল চালায়, সেই মানুষকে এতটা কাহিল দেখালে পরিবারের লোকজনদের কষ্ট হবারই কথা।

দাদুটি মুখে দোক্তা পাতার গুঁড়ো দু-আঙুলে ফেলে বললেন, এক্ষুনি ফোন কর। এসব কি ফাজলামি।

আর তক্ষুনি মনে হল, এই রে খেয়েছে। আমাকে বসিয়ে রেখে কথা বলতে চান। বলুক না। যেন মিমিকেও জব্দ করা যাবে এই ভেবে মজা পাচ্ছিলাম। স্রেফ অস্বীকার করব। বলব, না না আমি সম্পাদক নই। আমার টাকা কোথায়! আমাকে কে বিজ্ঞাপন দেবে! মিমির ইন্টারেস্ট কি আমাকে সম্পাদক করার। আমার এমন যুক্তির কাছে মিমি হেরে যেতে বাধ্য। কাজেই আদৌ ঘাবড়ে গেলাম না।

বললাম, দেখুন না ফোনে পান কি না! সত্যি তো এ-ভাবে ব্লাফ দেওয়া ঠিক না।

দাদুটি বলে উঠলেন, অসভ্য মেয়েছেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কী হয়ে যায়! আমি নিজেও জানি না। সব মিষ্টি যেন ভেতর থেকে উঠে আসছে। আমি জানি, এই টিউশনির আজ এখানেই ইতি। সব জেনেও চেপে আর যেতে পারলাম না।

বললাম, ওকে অসভ্য মেয়েছেলে বলবেন না। ও অমন মেয়ে নয়!

—কী বলছ তুমি! ভূপালের মতো মানুষের কাছে সরাসরি মিছে কথা বলে গেল!

—ও মিছে কথা বলে নি। আপনার পুত্রগৌরবের সামান্য হানিতেই এত ক্ষেপে গেলেন! দুটি পদ্য ছাপা হল কি হল না এই ভেবে ওকে অসভ্য মেয়েছেলে বলা ঠিক হয়নি।

—আলবাৎ হয়েছে। ওর দাদু ওর মাথা খেয়েছে। ও অসভ্য মেয়েছেলে ছাড়া কিছু না। যারা নাটক করে, পার্টি করে, সব পুরুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। স্বভাব ঠিক থাকে তাদের?

—একদম এ-রকম বলবেন না। ভূপালবাবুর পদ্য আমি বাতিল করেছি। কবিতা আর পদ্য আলাদা— আমার 'অপরূপা'য় কবিতা ছাপা হয়। পদ্য ছাপা হয় না। জীবনে সবার সব হয় না দাদুমশাই। মানুষকে ইজ্জত দিতে হয়। আগে মানুষকে ইজ্জত দিতে শিখুন, পরে অসভ্য মেয়েছেলে বলবেন। মিমি মানুষকে ইজ্জত দিতে জানে। সে কখনও ব্লাফ দেয় না। অপরূপার সম্পাদক আমি। হ্যাঁ আমি। মিমির কোনো রাইট নেই, আমি না বললে, সে ছাপতে পারে না! মিমিকে অসভ্য বলার আগে আপনারা কতটা অসভ্য ভেবে দেখবেন। উঠি।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। বাইরে বের হয়ে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। কুড়িটা টাকা। বাবা শুধু বলবেন, কুড়িটা টাকা সোজা কথা। দেড় মণ ধান হয়।

মা বলবে, কুড়ি টাকা টিউশনিতে কে দেয়। দশ টাকা পাঁচ টাকা দেয়। তুই এ-ভাবে সবাইকে অপমান করে চলে এলি! তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। সংসারের কী হাল বুঝতে পারিস না। মায়াটার একটা জামা নেই, পিলু ছেঁড়া প্যান্ট পরে স্কুলে যায়। আমার পরবার একটা ভাল শাড়ি নেই। তোর বাবা তো ন্যাংটা বাউণ্ডুলে। তার কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

তবু যেন অনেক দিনের অপমানের জ্বালা আজ শেষবারের মতো উগরে দিয়ে আশ্চর্য এক মুক্তির স্বাদ পেলাম। বাড়ি এসে খেলাম, নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম।

দু-দিন বাদে মুকুল এল। হাতে টাইপ করা খাম। সেই সব করে এনেছে। শুধু সই করে দিতে বলল।

বাড়িতে এ দু-দিন কারো সঙ্গে বড়ো একটা কথা বলছি না। মা সকাল হলেই তাড়া দিচ্ছে, কিরে

টিউশনিতে গেলি না!

—যাব।

সব কথা বলতেও সাহস পাচ্ছি না। কুড়িটা টাকা মাসান্তে সংসারে কত দাম বুঝি। বললেই মা ভেঙে পড়বে। বাবা হয়ত বলবেন, সব ভবিতব্য।

এই ভবিতব্য কথাটা নিয়ে ঝড় উঠবে। মা'র গলা পাওয়া যাবে, ভবিতব্য ধুয়েই এখন জল খাও। সারাটা জীবন আমাকে তুমি জ্বালিয়েছ। এমন নিষ্কর্মা মানুষের হাতে পড়ে আমার হাড় মাস জ্বলে গেল। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই কিছুতে। কাল কি খাবে, তার চিন্তা নেই। গাছপালা আর যজমান নিয়ে পড়ে থাকলেন। ঠাকুরপো এত করে বলল, দ্বারকা দাসের আড়তে খাতা লেখার কাজ নিতে। তাতে ওনার অপমান। ছয়কে নয় করতে পারবেন না। এখন বোঝ, ছেলের কি, সে তো বোঝে না কোথা দিয়ে কী হয়!

কিন্তু এ-সব ঘটনা চাপা থাকে না। নরেশ মামাই এসে খবরটা দিলেন। নরেশ মামা অবশ্য সব বলে শেষে বলেছেন, বিলু ঠিক করেছে। ওরা ভাবে কি? আরে বাবা দেশে থাকতে তোর মা তো মুড়ি ভাজত। স্কুলে কে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। মানুষের দিন সমান যায় না। বিলুটাকে শুনেছি মানুষ বলে গণ্যি করত না। আমি নিজেই ভাবছিলাম বলব, আর যেয়ে দরকার নেই।

সুতরাং এ-সব শোনার পর বাড়িতে যে ঝড়ের আশংকা করেছিলাম সেটা সহজেই কেটে গেল। এখন শুধু আমার জামাইবাবুর পেছনে লেগে থাকা। জামাইবাবুকে বলে স্পেশাল কেডারে যদি শিক্ষকতা পাওয়া যায়। এই আশাই এখন পরিবারের সবার কাছে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগাচ্ছে। মুকুল টাইপ করা দরখাস্ত নিয়ে যাবার পর, সংসারে সামান্য অভাব অনটন নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেই, বাবার এখন একটাই আপ্ত-বাক্য, আরে কটা দিন সবুর করতে তোমার কি হয় বুঝি না ধনবৌ!

আমার পড়া হবে না জেনে পিলু খুবই দমে গেছে। দাদাটার কত বড় হবার কথা। সে এখন প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার হয়ে যাবে। মাও মনের দিক থেকে ভাল নেই, সংসারে একজন নীলবাতি জ্বালাবার যাও চেষ্টা করে যাচ্ছিল, ইস্কুলের চাকরি হলে সেটাও যাবে। মানুষের ঘরবাড়িই তো সব নয়। সঙ্গে পুত্র কন্যার যশ খ্যাতি সবই দরকার।

বাবা ছাতা বগলে নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে একদিন খবরও দিয়ে এল, বিলু দরখাস্ত করেছে দাস মশাই। মনে হয় চাকরিটা হয়ে যাবে। চাকরিটা হলে সংসারে স্থিতি আসবে। আমার ব্রাহ্মণীকে তো জানেন। বিন্দুমাত্র সহ্য ক্ষমতা নেই। অভাব অনটন কার নেই। যার লাখ টাকা আছে তারও আছে, যার কিছু নেই তারও আছে। মাথা গরম করলে চলে!

একদিন বাড়ি এসে শুনলাম, মিমি এসেছিল। মিমি কলকাতা থেকে কাকে ধরে আমাদের কজনের পাশ ফেলের খবর নিয়ে এসেছে। ওদের প্রভাব আছে—আনাতেই পারে। সবার আগে আমাদের বাড়িতে এসে খবর দিয়ে গেছে, মাসিমা বিলু পাশ করেছে। মিমি নাকি আনন্দে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, তোমার দাদা পাশ করেছে—তোমাদের কী আনন্দ! দাদাকে বল, হ্যাঁ।

মায়াকে ঘরে ডেকে বললাম, ও কোন ডিভিসনে পাশ করেছে জিজ্ঞেস করলি না!

সেই তো! মায়া কেমন অবাক হয়ে গেল। মিমিদির খবরটা নেওয়া হয় নি। সে ছুটে গেল বাইরে, মাকে বলল, মিমিদি পাশ করেছে মা?

—জানি না তো!

বাবাকে বলল, মিমিদি পাশ করেছে বাবা?

—কিছু তো বলল না!

হঠাৎ পরিবারের সবাইকে কেন জানি আমার সহসা স্বার্থপর মনে হল। যে মেয়েটা বাড়ির ছেলের খবর বয়ে দিয়ে যায় তার পাশ ফেলের খবরটা নেওয়ার দরকার পর্যন্ত কেউ মনে করল না। মিমির পাশ ফেল নিয়ে কোনো কথা বলার অপেক্ষা সে-রাখে না। র‍্যাংক নিয়ে তার ভাবনা।

বাবা হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ বলেছে। ও নিজ থেকেই যেন একবার বলল, আমিও পাশ করেছি মেসোমশাই। এসেই মিমি আমাকে তোর মাকে প্রণাম করল। আসলে খেয়াল ছিল না।

খেয়াল না থাকারই কথা। বাবার কাছে এত বড় খবর কেউ কখনও আজ পর্যন্ত দিয়ে যায় নি। মিমি এসেই নাকি চলে গেছে। তোর মা বলল, একটু বস। মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়।

সে নাকি বলেছে, আর একদিন হবে।

তবু বাবা ছাড়েন নি—সে হয় না মা, তুমি এত বড় খবর নিয়ে এলে, একটু মিষ্টিমুখ করবে না হয় না। বস। বলেই নাকি মাকে বলল, দুধ দাও। দুটো মোয়া দাও। পূজার সন্দেশ আছে দাও। নাড়ু করেছিলে সেদিন, থাকলে দাও।

সব খবরই মায়ার। বলল, জানিস দাদা মিমিদিকে দেখলে আমার কেমন কষ্ট লাগে। তুই কখন এসে পড়বি ভয়ে তটস্থ থাকে। যতক্ষণ বসেছিল, কেবল রাস্তার দিকে চোখ। মিমিদি চোরের মতো আসে। তুই কিন্তু আবার মিমিদিকে বলতে যাস না। মিমিদি আমাদের বাড়ি এলে ক্ষেপে যাস কেন বুঝি না। ছোড়দা মিমিদিকে কিছুতেই ছাড়বে না। ছোড়দার এক কথা, মিমিদি কোথায় তুমি নাটক করছ বল না। আমি দেখতে যাব।

—মিমি কি বলল?

—বলল, না, ও তোমাকে দেখতে হবে না। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। দেখছ তো মেসোমশাই সারাদিন এক দণ্ড বসে থাকেন না। সব কিছুর প্রতি কি যত্ন। ঘরবাড়ি, গাছপালা সব। তোমরা যদি মানুষ হও তবে তাঁর এ-সব করা সার্থক।

আমার মনে হল, বেশ উপদেশ ঝাড়ছে মিমি। এ-বাড়ির সবার মানুষ হওয়া নিয়ে ভাবনা। কে তাকে এত দায় চাপিয়ে দিল।

আমার মুখ গোমড়া দেখে মায়া বলল, তোর কাগজ দু-একদিনের মধ্যে বের হবে। তোকে একবার মিমিদি যেতে বলেছে।

—কোথায় যাব! বাড়িতে পাওয়া যায় না।

—সে তো বলে যায় নি। কেবল বলল, দাদাকে বল, পাশের খবর দিয়ে গেলাম, দাদাটি যেন একবার দয়া করে দেখা করে।

মিমির সঙ্গে আমার যে দেখা হয় না তা নয়। আমাদের কাগজে অস্থায়ী অফিসে দেখা হয়। কখনও বিকালে টাউন হলের মাঠে বসে যখন সবাই আড্ডা মারি তখন দেখা হয়। ওর সঙ্গে চার পাঁচজন পার্টির ক্যাডার থাকে। জরুরী কাজের খবরটুকু দিয়েই উধাও। অস্থায়ী অফিসে লেখা নিয়ে কখনও কোনো বিতর্কে মিমি সহজে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কারণ জানে যত লেখা সম্পর্কে সে খুঁটিনাটি ত্রুটি উল্লেখ করবে, তত আমি ত্রুটিগুলো আদৌ ত্রুটি নয়, শিল্পের খাতিরে মানিয়ে গেছে, এমন বলে তার বিরোধিতায় নামব। কাজেই চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। আমার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই এমনও ভাবতে পারে হঠাৎ দেখলে কেউ। সে আমাকে একা পেতে চায়। কিন্তু এই একা পাওয়ার মধ্যে আমার দু দু-বার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ওকে সতীসাধ্বী ভাবতে কষ্ট হয়। এটা আবার হলে মাথা বিগড়ে যেতে পারে।

মায়া আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, জানিস দাদা, মিমিদি না যাবার সময় কেমন শুকনো মুখ করে চলে গেল।

—কেন বাবা কিছু বলেছে?

আমি জানি বাবা তো আমার কাউকে কোন রূঢ় কথা বলেন না। মিমিকে তো বলতেই পারেন না। মিমি বাবার কাছে মৃণ্ময়ী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। যে সংসারে যাবে ধনে জনে লক্ষ্মী বিরাজ করবে।

—নারে দাদা, বাবা কি বলবে! বাবা শুধু বললে, মিমি বিলুর আর একটা সুখবর আছে। তুমি জানলে খুবই খুশি হবে। ও একটা চাকরি পাচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি। মুকুলের জামাইবাবু করে দিচ্ছে। সংসারে এটা আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় খবর।

মায়া তারপর থেমে দরজার বাইরে উঁকি দিল। তারপর ফের আমার টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, শুনেই মিমিদির মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেল। মিমি কি চায় না, একটা প্রাইমারী স্কুলে আমি

মাস্টারি করি।

খুব সাহসী মানুষের মতো বললাম, বাদ দে। ওর শুকনো মুখ দেখলে তো আমাদের পেট ভরবে না। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি কি খারাপ কাজ! কত ছেলে লাইন দিয়ে আছে। নিজের লোক না থাকলে, এ-কাজও এখন কারো জোটে না। তারপর মনে হল মায়াকে এ-সব বলে লাভ নেই। আমি প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করি, তাতে কার কি পছন্দ অপছন্দ এ-সব ভাবলে চলবে না। আর এটাও ভেবে কূল পাই না, মিমিরা তো শ্রমিক দরদী, গরীব মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করতে চায়। তাদের কাছে মানুষের কাজ দিয়ে মনুষ্যত্বের বিচার হয় না। কেউ ছোট না, কেউ বড় না। সবাই সব কাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ছোট ভাববার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সে তবে কেন আমার এত বড় খবরে শুকনো মুখ করে চলে গেল! আসলে সে আমাদের ভাল চায় না।

মায়া বলল, মিমিদি কিন্তু বলে গেল তোকে যেতে। কোথাও আর যাবে না বলেছে। বাড়ি গেলেই দেখা পাবি।

—কেন, ও যে মহেশ নাটকে শুনছি আমিনার পাঠ করবে!

—সে তো কিছু বলল না। কেবল যাবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলে গেল, দাদাকে বলবে কিন্তু। বলবে আমি কোথাও আর যাচ্ছি না। সারাদিন বাড়িতেই থাকব। বলবে কিন্তু লক্ষ্মীটি।

মিমি আর কাউকে এ-কথা বলে যেতে পারে না। মায়া মেয়ে বলেই তাকে বলে যেতে পেরেছে। মায়া বোঝে সব। বোঝে বলেই বোধ হয় গোপনে এত কথা বলল। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখার মধ্যে টের পেলাম মায়ার মধ্যেও সেই নারী-মহিমা জেগে উঠছে। নারী বলেই সে বুঝতে পারে মিমিদির কষ্ট কত গভীর।

আমার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মায়া আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু আমি জানি ও কি বলবে। বলবে কবে যাচ্ছিস দাদা! পিলুকে দিয়ে খবর পাঠাতে বলেছে।

—সে আমি বুঝব। এখন যা তো! আসলে কেন জানি নিজেকে একা পাবার জন্য ছটফট করছিলাম। এটা কি মিমির আত্মসমর্পণ। মিমি কোথাও যাবে না বলে গেছে। ওর নাটক, মিছিল, ভাষণ আমার অপছন্দ বোঝে। মুখে প্রকাশ না করলেও আমার আচরণে সে টের পায়, তার গান, তার জনসভায় বক্তৃতা আমার অপছন্দ। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলে যা হয় এবং গরীব হলে তো কথাই নেই। সব মিলে মিমির আত্মপ্রকাশের প্রতি আমার বিরূপ ধারণাই গড়ে উঠেছে। মিমি কিছু একটা হতে চায়, কিছু করতে চায়। তার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠেছে। সহসা সেই আগুন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবার এত বড় কী কারণ থাকতে পারে! মিমির এ-সব ছলনা নয় তাই বা কে বলবে!

যাই যাই করেও সাত আট দিন হয়ে গেল মিমির বাড়িতে যাওয়া হয়ে উঠল না। আসলে একটা বড় ঝড়ের আশংকা করছি। এই ঝড়ে আমাদের দুজনকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে।

মুকুলের বাড়ি যাবার মুখে ভাবি, একবার ঘুরে আসা যাক। এত করে বলার কী আছে! মিমি যাই ভাবুক আমার পক্ষে এই কাজের সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না। মা বাবার মুখের দিকে তাকালে আমি আরও কেমন অসহায় বোধ করি। মাঝে মাঝে মনে হয় যে মেয়ে এস ডি ও সাহেবের গাড়িতে হাওয়া খেতে যায়, তার পক্ষে আমার সামান্য চাকরি নিয়ে ভাববারই বা কী থাকতে পারে। আসলে আমি একটু বেশি ভাবছি। মিমির উপর আমার অধিকারই বা কতটুকু। মিমি দুবার সামান্য দুর্বলতা প্রকাশ করেছে ঠিক—তাই বলে আমিই তার সব এমন কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠে নি। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসির কোনো কথাই হয় নি! ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা মিমির কাছে ন্যাকামি মনে হতে পারে। আমি নিজেও সে ভাবে কিছুই ভাবি নি। ভাববার সাহসও হয় নি। কটা দিন নিজের মধ্যে একটা প্রবল সংশয় নিয়ে ঘোরাফেরা করছি মা'র বুঝতে কষ্ট হলো না!

খেতে বসলে মা বলল, তোর কী হয়েছে বল তো!

—কী হবে আবার!

—কিছু খেতে চাস না। চোখ মুখ শুকনো। আয়নায় একবার নিজেকে দেখেছিস!

তা আয়নায় রোজই তো নিজেকে দেখি। একটু বেশি বেশিই দেখি। আমার প্রতিবিম্বের সঙ্গে

কথা হয়। সে বলে, কী বিলুবাবু এত কি দেখছ!

—কিছু দেখছি না।

—দেখছ বাবা, লুকিয়ে যাচ্ছ। যাও না ঘুরে এস। ভয় কি!

একটা ব্যাপারে আমি বেশ তাজ্জব বনে গেছি। মিমি বলে যাবার পরও সাত আট দিন হয়ে গেল, আমি যাই নি, মিমিও আসে নি—কেন গেলাম না জানতে! তবে মায়া কি নিজের অনুমান থেকে কথা বলেছে। দাদাকে যেতে বল। বলেই যেতে পারে—কিন্তু তার সঙ্গে যাবার সময় মুখ শুকনো—এ-সব বুঝল কি করে মায়া! ছেলেমানুষ সে। মিমির অন্য কোনো দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। সেটা কি আমি জানি না। চোখে চোখ পড়লে আজকাল সে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মিমির কিছু একটা হয়েছে। কেমন দায়সারা কথাবার্তা সেরে সাইকেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিন। চোখের নিচে কালি পড়েছে।

পরদিন দেখি মুকুল হাজির। সে এসেই বলল, প্যানেলে নাম উঠে গেছে। তারপর 'অপরূপা' কাগজের দু'কপি আমার হাতে দিয়ে বলল, মিমি দিয়েছে। আট দশ দিনের মধ্যেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে। কাছে কোথাও কোনো স্কুলে দিতে বলেছে ছোড়দি। বাড়ি থেকেই করতে পারবে।

আজকাল মুকুলকে বাড়ির ছেলে বলেই ধরে নিয়েছে মা বাবা। বাবা বললেন, এখানেই দুপুরে দুটো খেয়ে যেও।

মুকুল রাজী হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া সেরে সাইকেলে দু'জনে বের হব। সাধারণত দু'জনে বের হলে, আমাদের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রাণের সঞ্চার হয়। আজ মুকুল হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, আমি সকাল থেকেই খুব মনমরা হয়ে আছি। এত বড় একটা সুখবরের পরও আমি রে রে করে উঠতে পারছি না। কোথায় যেন কেবল কুণ্ঠাবোধ করছি। বের হবার মুখে মুকুল সহসা বলল, কি ব্যাপার বল তো, আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ।

—কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার জীবনে যে বড় একটা ঝড় উঠে গেছে মুকুলকে বলতেও পারছি না।

মুকুল বলল, মিমিকেও দেখছি কেমন হয়ে যাচ্ছে। দু-দিন এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গেছে।

—কিছু বলল?

—না তেমন কিছু না! তোমার কিছু হয়েছে কিনা জানতে এসেছিল।

—কিছু হয়েছে মানে!

—এই অসুখ-বিসুখ।

—অ! আর কিছু বলে নি?

—না।

এরপর থাকা গেল না।

বললাম, নাটক করতে যাচ্ছে না!

—না, বাড়িতে ওর কিছু একটা হয়েছে। কোথাও যাচ্ছে না।

ভিতরটা আমার কেমন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। মুকুলের সঙ্গে সাইকেলে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেলাম। সেখানে একটা পুলের নিচে ফাঁকা মতো জায়গায় দুজনে শুয়ে থাকলাম। মুকুল সারাক্ষণ চৈতালি প্রসঙ্গে কথা বলল । চৈতালি ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে। বাংলায় অনার্স নেবে। সে আমাদের এক বন্ধু মারফৎ একটি কাগজ চৈতালির বাড়িতেও পাঠিয়েছে। খুব সর্তক এই পাঠানোর ব্যাপারে মুকুল। যেন ও পাঠায় নি, বন্ধুটি হাতে করে নিয়ে গেছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছে সে। কেবল বলল, কি যে হবে!

আমি বললাম, কী আবার হবে, খুশিই হবে!

আসলে আমাদের বয়েসটা এমন যে আমরা শুধু স্বপ্নই দেখতে জানি। কিন্তু সেই স্বপ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। আমাদের জীবনের শুরুটাই ভাল করে হয় নি। অথচ রাজার মতো বেঁচে আছি মনে হয়। যুদ্ধ জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সেই যুদ্ধটা কি কেবল জানি না।

মুকুলকে বললাম, আমার একটু কাজ আছে। যাচ্ছি। মুকুলকে লালদীঘির ধারে ছেড়ে দিয়ে টাউন হলের দিকে চলে গেলাম। মিমিদের বাড়ি সোজা সামনে। মিমিদের বাড়ি আমি এই নিয়ে তৃতীয়বার যাচ্ছি। বাড়িতে ঢুকতেই কেমন অস্বস্তি লাগে। সদর দরজায় দারোয়ান। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। বললাম, মিমি বাড়ি আছে?

—আছে। যান।

মিমিদের বাড়ি মানুষের যাতায়াত একটু বেশিই। সামনেই ফুলের বাগানে সেই কাকাতুয়া পাখিটি আমাকে দেখে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, দিদিমণি, বিলু দাদা। আমি এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনে কাকাতুয়া পাখিটার সামনে দাঁড় করিয়ে মিমি বলেছিল, বিলু দাদা। পাখিটার আশ্চর্য স্মরণশক্তি। কাকাতুয়া পাখি এত সুন্দর কথা বলতে পারে আমি জানতাম না। সামনে বিশাল বারান্দা। বড় বড় থাম। শ্বেত পাথরের টাইল বসানো। উজ্জ্বল আলোতে গোটা বারান্দা ঝকঝক করছে। ভিতরে ঢুকতেই দেখি সিঁড়ির মুখে মিমি। আমার আসার খবর পাখিটার কাছে থেকে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন ছুঁটে এসেছে। এসেই আমাকে ভিতরের বসার ঘরে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সে তার সব রকমের যুদ্ধ জয় করায় যে অপার শক্তি বহন করে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখা মাত্র সব তার কে হরণ করে নিয়েছে। একেবারে স্থাণুবৎ। আমি নিচে। সিঁড়ির মুখে রেলিং ভর করে মিমি। দামী মুর্শিদাবাদ সিল্ক পরনে। লাল নীল রঙের লতাপাতা শাড়িতে। মিমি আশ্চর্য এক দেবী মহিমায় প্রকাশিত। কিছু বলছে না। বড় ধীরে ধীরে নেমে আসছে। সন্তর্পণে। এদিক ওদিক হলেই যেন টলে পড়ে যাবে।

মিমি রেলিং ধরে নেমে আসছে। খুব সর্তক পায়ে। আমাকে অপলক দেখছে।

আমিও কেমন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছি। উঠে গিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনলে যেন ভাল হয়। ওর কি কোনো বড় রকমের অসুখ করেছে। এত চঞ্চল ছিল ক'দিন আগে, আর কি হয়ে গেছে!

ধীরে ধীরে কাছে এসে বলল, বোস!

আমার উদ্বেগ সারা চোখে মুখে টের পেয়ে মিমি হাসল। বড় নির্জীব হাসি। বললাম, তোমার কী হয়েছে পরী?

পরী বড় আস্তে বলল, কিছু না। যাক তবু যে এলে। কবে থেকে আশায় আছি তুমি আসবে। সারাদিন বারান্দায় বসে থাকি। রাস্তায় মানুষজন দেখি। তোমাকে দেখতে পাই না। যেন মিমির খুব কষ্ট হচ্ছিল কথাগুলো বলতে।

আমি বললাম, তুমি বোস। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

সে সোফার হাতলে ভর করে বসল।

আমার হঠাৎ কি যেন হল। বললাম, কী হয়েছে তোমার। কী হয়েছে বলবে তো! না ভাল্লাগে না। কিছু বলছে না। কী মেয়ে রে বাবা।

—কিছু হয় নি। সত্যি বলছি কিছু হয়নি। সে এইটুকু বলে সোফায় মাথা এলিয়ে দিল। চোখ ছাদের দিকে। ছাদে ঝোলান ঝাড়লণ্ঠন, বাতাসে রিন রিন করে বাজছে। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র, মিমিদের পূর্বপুরুষদের সব বাঘা বাঘা ছবি। মোটা গোঁফ, মাথায় পাগড়ি। গলায় পাথরের মালা। দামী পোশাকে মানুষগুলো বংশগৌরব রক্ষা করে চলেছে। দেয়ালে ঝুলে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তোমার আস্পর্ধার শেষ নেই। ছবিগুলোর দিকে তাকাতে আমার কেন জানি ভয় করছিল। এত বড় প্রাসাদতুল্য বাড়িতে দু-একজন ঠাকুর চাকরের দেখা পাওয়া গেল। ওরা সিঁড়ি ধরে উঠে যাবার সময় আমাকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছে। কালী বাড়ির বাবাঠাকুরের বড় অনুগ্রহভাজন এই তরুণ যুবক। তারা বোঝে এ-বাড়িতে বাবাঠাকুরের সুবাদে আমার আলাদা মর্যাদা আছে। যাবার সময় দূর থেকেই গড় হয়ে ওরা উঠে যাচ্ছে।

মিমির দাদুকে দেখছি না। আমি যতবার এসেছি, দেখেছি তিনি বসার ঘরে কারো জন্য যেন অপেক্ষা করছেন। সিল্কের পাঞ্জাবি পাট করা ধুতি পরনে, পায়ে রুপোলি কাজ করা চটি। তিনিই ডেকে হেঁকে মিমিকে উপরে খবর পাঠিয়েছেন।

ওর বাবা কাকারা অবশ্য এতটা ডাকাডাকি করেন না। দেখলেই প্রশ্ন কেমন আছ? বাবাঠাকুর কেমন আছেন? আজ কাউকে দেখছি না।

মিমি বলল, কাগজটা দেখলে?

—দেখেছি।

—কভার?

—দেখেছি।

—কভার পছন্দ হয় নি?

—হয়েছে।

—আমি জানি তুমি কী পছন্দ কর। দুটো প্রজাপতি একটা ফুল এঁকেছি এজন্য। কোনো ঝাণ্ডামার্কা ছবি আঁকি নি। তোমার খুব ভয় ছিল ও-রকম ছবি হবে বলে।

—ভয় না। মুশকিল কি জান, আমার বাবা একরকমের, তোমরা একরকমের আবার তুমি আর এক রকমের। আচ্ছা পরী তুমি বিশ্বাস কর, আমরা এ-ভাবে মানুষকে শোষণ থেকে উদ্ধার করতে পারব? আমরা নিজেরা যদি কাজে এবং মননে ঠিক না থাকি—এই বাহ্যিক বিপ্লবের আড়ম্বরে আসল ইস্যুটাই হারিয়ে যাচ্ছে না। মানুষ যদি নিজের ঘর থেকে বিপ্লব শুরু না করে, বাইরের লোক এসে বিশেষ করে তোমাদের মতো মানুষেরা তাদের ভাল ভাল কথা বললেই শুনবে কেন। তাদের সঙ্গে তোমাদের জীবনের কোনো মিলই নেই।

—আজ না হয় এ-সব কথা থাক। আমি তোমাকে জানি অনেক পীড়ন করেছি। আজ আমার সঙ্গে এ-সব বলে শত্রুতা নাই করলে।

এ-সময় মনে হল সিঁড়ি ধরে কেউ আসছে। হাতে ট্রে। চা খাবার উপর থেকে আসছে।

মিমি উঠে গিয়ে ট্রেটা হাতে নিল। সন্তর্পণে টেবিলে রেখে দু-কাপ চা বানাল। একটা আমাকে দিল, মিষ্টির প্লেট, জল দিল। নিজে এক কাপ চা সামনে রেখে বসল। আঁচল দিয়ে গা ঢাকল ভাল করে। শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢেকে দিল।

মিমির এই বসার ভঙ্গি আমাকে এক আশ্চর্য সুষমার জগতে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি। ওর দীর্ঘ ঋজু চেহারা, দেবীর মতো চোখ মুখ, তিল ফুলের মতো নাক এবং এলোমেলো চুলের সুঘ্রাণ কোনো এক অলৌকিক মহিমার কথা যেন আমাকে কানে কানে বলছে।

মিমি বলল, খাও।

—আমি কিছু খাব না। তুমি এ-রকম কেন হয়ে গেলে! কেন! কেন! অসুখ করে নি বলছ, হয় মিছে কথা বলছ, নয় এড়িয়ে যাচ্ছ আমাকে।

—তুমি তো আমার কিছুই পছন্দ করতে না বিলু! আমি তো সব ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিতে তো বলি নি! তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তবু ভাল হয়ে যাও। আমি তোমার সব মেনে নেব।

—ঠিক বলছ মেনে নেবে?

—হ্যাঁ। আমি অপছন্দ করি বলে, পার্টি, নাটক মিছিল সব তুমি ছেড়ে দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে এ আমি কখনও চাই নি। সত্যি বলছি চাই নি।

—কিন্তু আমি যে সব ছেড়ে দিতে চাই। পায়ের নিচে মাটি থাকলে কিছুই ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে না। গাছ তো মাটিতে বেঁচে থাকে। আমার গোড়া উপড়ে নিতে চায় এখন সবাই।

—সবাই মানে।

—মা বাবা কাকা দাদু সবাই।

—তারা তোমার খারাপ করবে কেন!

—করছে।

হঠাৎ যেমন হয় ক্ষেপে যাবার স্বভাব আমার, চিৎকার করে বলে উঠি, কি হয়েছে খুলে বলবে তো!

—আগে কথা দাও।

—কি কথা!

—আমার পায়ের নিচেকার মাটি সবাই সরিয়ে নিলেও তুমি নেবে না।

—সবাই সরিয়ে নিলে, আমি একা কি করতে পারি।

—ওটুকু থাকলেও আমি ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারব।

এসব হেঁয়ালিপূর্ণ কথা আমার মাথায় ঠিক খেলছে না। মিমি কি বলতে চায়। মিমির কি বাসনা? বললাম,পরী প্লিজ, তুমি খুলে বল। খুলে বল কী হয়েছে। না হলে আমি এক্ষুনি চলে যাব।

সহসা পরী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, বিলু তুমি আমার চরম শত্রু। তুমি কেন এত বড় সর্বনাশ আমার করলে। কেন, কেন। কি করেছি আমি! আমার কি দোষ!

আমি হতবাক। আমি ওর সর্বনাশ করেছি! বড় নিচ মনে হলো নিজেকে। পরীর সম্পর্কে কোথাও তো কোনোদিন কোনো কুৎসা রটনা করেছি আমার মনে পড়ে না। আমার জন্য পরীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

আমি কথা বলছি না দেখে, মাথা নিচু করে রেখেছি দেখে পরী ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। সামনের বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিল। আঁচলে মুখ মুছে ফের এসে বসল। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমাদের দুজনের কারোরই মনে নেই সামনে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমরা কেমন দুজনেই অতলে ডুবে যাচ্ছিলাম। বিশেষ করে আমি। কিছু বলারও সাহস পাচ্ছি না। পরীর সর্বনাশ করতে আমি কোনো দিন চাই নি. পরীকে কেউ নিন্দা করলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। সেই পরী আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

উঠে পড়ে বললাম, জেনে শুনে কোনো সর্বনাশ আমি তোমার করি নি। না জেনে করলে ক্ষমা করে দিও।

সহসা মিমি তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল। কি ঠাণ্ডা হাত! কিছু বলছে না। আমারও মনে হল বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গেছি। নড়তে পারছি না। শরীর অবশ হয়ে আসছে। বসে পড়লাম। মিমি অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলল, তুমি চাকরিটা নিচ্ছ!

—না নিলে কি উপায়!

—পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছ?

—আপাতত তাই।

আর এ সময়েই দেখলাম মিমির দাদু সিঁড়ি ধরে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই যেন তিনি স্বর্গ হাতের কাছে পেয়ে গেছেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তিনি কাছে চলে এসে বললেন, কখন এসেছ?

—এই খানিকক্ষণ।

—ভাল হয়েছে। তুমি মিমিকে একটু বুঝিয়ে যাও তো—ও তোমার কথা শোনে। পরেশ চন্দ্রকে চেন! আরে আমাদের সদরের এস ডি ও। পাকা কথা দিতে পারছি না। বড় অশান্তি চলছে। ঝড়। দেখেছ তো কী চেহারা করেছে। অথচ পরেশের বাবার খুব আগ্রহ—এমন সুপাত্র কেউ হাতছাড়া করে! তুমি বল।

—করা উচিত নয়।

সহসা মিমি সাপের মতো ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। গেট আউট। আই সে গেট আউট। তুমি কে আমার। উচিত অনুচিত তুমি ঠিক করবে।

দাদু সহসা খুবই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন, ছি! মিমি কী হচ্ছে! তুই এটা কী বলছিস বিলুকে?

মিমি আবার ভেঙে পড়ল, দাদু তুমি জান না, ও আমার কত বড় শত্রু, দাদু তুমি জান না, ওর শত্রুতার শেষ নেই। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। মুখে আঁচল চেপে সে তার হাহাকার কান্না সমালাচ্ছে।

আমি এ সময় কি করব বুঝতে পারছি না। আমরা দুজনেই ধরা পড়ে গেছি। মাথা নিচু করে বসে ছিলাম। উঠে যে বের হয়ে যাব সে সাহসও নেই, শক্তিও নেই।

কেমন ঘাবড়ে গেছি খুব। মিমির দাদু এখন কী বুঝলেন কে জানে! পাশে বসে বললেন, ও কি! চা খাবার কিছু খেলে না।

—খাচ্ছি।

তিনি হাসলেন, নরেশ, ও নরেশ।

যেন সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকে—নরেশ হাঁক শুনেই নেমে আসছে।

—আর এক কাপ চা দে বিলুকে।

আমি বললাম, থাক। চা খাব না।

—তবে মিষ্টিগুলো খাও।

তারপরই তিনি বললেন, ওর কোনো ইচ্ছেই আমরা অপূর্ণ রাখি নি বিলু। কিন্তু মেয়েদের একটা বয়েস থাকে, যখন সব মানিয়ে যায়। পরে আর মানায় না। ও কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বাবাঠাকুরও বলেছেন, রাজযোটক। হাতছাড়া করবি না। কী ফ্যাসাদে পড়েছি বল। পরেশের দেবদ্বিজে ভক্তি প্রবল। বাবাঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে চলে যায়। তারপর কি ভাবলেন, তুমি তো জান বিলু আমরা সব অবহেলা করতে পারি কিন্তু বাবাঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। বাড়ির সব কাজে তাঁর অনুমতি না হলে চলে না।

আমি শুধু বললাম, যাই।

—না যাবে না। বোস। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

আসলে এই মানুষটি কালীবাড়িতে দেখেছেন, কথায় কথায় বাবাঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, নে তুই আমার পাশে বোস। বই খুলে রাখ। ভুল হলে ধরিয়ে দিবি। বাবাঠাকুরের ভুল ধরিয়ে দিতে আমিই পারি, কারণ বাবাঠাকুর হয়ত আমাকে খুব অনাথ ভেবেছিলেন। আমার বিষণ্নতা বাবাঠাকুরের মধ্যে কোনো অপত্য স্নেহেরও জন্ম দিতে পারে— যে কারণেই হোক মন্দিরে একমাত্র থানের ফুল বেলপাতা আমিই তুলে সবার হাতে দিতে পারতাম। আর কাউকে তিনি মন্দিরে ঢুকতে দেন না। অবশ্য বদরিদা এবং বৌদি ঢুকতে পারে। এ-সব পরীর দাদু জানেন বলেই হয়ত আমার পরামর্শ এই পরিবারে এত বেশি দরকার।

অথচ আমি বুঝতেই পারছি না—সংকট শুধু তো এ-পরিবারের নয়। আমারও।

কাজেই বলতেও পারলাম না, আমি ছেলেমানুষ—এত বড় সংকটে আমার পরামর্শে কী আসে যায়।

তবু বসে আছি। উঠতে পারছি না।

তিনি বললেন, তুমি মিমিকে বুঝিয়ে বল। এখন বলে লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা হোক। পরে বলবে। কবে আবার আসছ?

—দেখি।

—দেখি না, আমি ভেবেছিলাম নিজেই যাব। কিন্তু মিমির এক কথা। গিয়ে দেখ না! বিলু ওদের বাড়ি আমাদের যাওয়া পছন্দ করে না। গেলে খারাপ হবে বলে শাসিয়েছে। তুমি কাল সকালে আসবে। আসছ তো!

আমার কী হল কে জানে, বললাম, দাঁড়ান, আমি এখনই কথা বলছি।

দাদুর মুখটি কেমন শুকিয়ে গেল। এত বড় মানুষ, দাপট যাঁর সারা শহরে, সেই মানুষ মিমি সম্পর্কে এত দুর্বল এই প্রথম টের পেলাম।

তিনি বললেন, তোমাকে আবার অপমান করতে পারে।

বলার ইচ্ছে হল, অপমান আমার গা-সওয়া। দেশ ভাগের পর থেকেই নানাভাবে মান-অপমানে জ্বলছি। মিমি আমাকে আর কি অপমান করবে! ওর অপমান অমার কাছে কত মধুর যে এখন এই বুড়ো মানুষটিকে বোঝাই কী করে।

মিমির দাদু উপরে উঠে গেলেন।

মিমি আবার নেমে আসছে।

আমি হেসে ফেললাম। বড় অভিমানী বালিকা। মুখ থমথম করছে।

বললাম, বোস।

মিমি বসল।

—আমি মাস্টারি করি তুমি চাও না।

মিমি চুপ করে থাকল।

—মানুষ এতে ছোট হয়ে যায় না।

কেমন বালিকার মতো মিমি বলল, তুমি তাহলে যে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। তুমি জান না বিলু তুমি কি—তুমি জান না, জানলে পেটি একটা মাস্টারি করতে যেতে না।

—মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব। তুমি তো জান আমার বাড়ির অবস্থা।

—জানি।

—চাকরিটা অভাবের সংসারে পড়ার চেয়ে বেশি দরকার। আচ্ছা তুমি বুঝছ না কেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষ কী না করতে পারে।

—তা পারে।

—তবে।

মিমি এবার আমার দিকে তাকাল। বড় শান্ত চোখ। বলল, পারবে?

—পারতেই হবে। আমার স্বপ্নই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আগুন যখন জ্বালিয়ে দিয়েছ, দেখ না সে কতটা জ্বলতে পারে। সামান্য একটা চাকরি করলেই আমার ভেতরের আগুন নিভে যাবে তোমাকে কে বলল! অবোধ বালিকার মতো এ-সব ভাবলেই বা কী করে।

হঠাৎ মিমির চোখ কোমল হয়ে গেল। আমার হাত ধরে বলল, বিলু আমি যে তোমার আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালবাসি। আমার মরণ হল না কেন। তুমি যদি ছোট হয়ে যাও, সরু গলিতে ঢুকে পড় সেখান থেকে আমি তোমাকে কী করে বের করে আনব?

—সরু গলি তো শেষ পর্যন্ত বড় সড়কে গিয়ে মেশে।

পরী আজ এই যেন প্রথম বুঝতে পারল, আমি তার চেয়ে পৃথিবীর এই গাছপালা, মাঠ, নদী এবং বড় সড়কের কথা বেশি জানি। শুধু বলল, তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমার কিছু বলার নেই। তারপরই পরী বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বলল, দাদুর কাছে কিছু শুনলে?

—শুনেছি।

—কী করব বলে যাও।

আমি বললাম, একবার বাবাঠাকুরের কাছে আমাকে যেতে হবে আর কি। আমি জানি তিনি সাধক মানুষ। তিনি রাজযোটক বলতেই পারেন। কিন্তু তোমার যে অমত আছে তা তো তিনি জানেন না। শুধু বাবাঠাকুরকে এই খবরটাই দিতে হবে। ভেবো না।

আর সঙ্গে সঙ্গে পরী সত্যি যেন অবোধ বালিকা হয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে ধরল, বিলু, আমি তোমার পায়ে পড়ব। দোহাই তুমি আমাকে রক্ষা কর।

সেবারে মিমি গোটা পরিবারটিকে সংকট থেকে ত্রাণ করার জন্য আমার পা ছুঁয়েছিল অনিচ্ছায়। এবং তারই হেতুতে আমি প্রথমে মিমির কাছে মজার বিষয় হয়ে গেছিলাম। ফাঁক পেলে মিমি আমাকে আড়ালে আবডালে হেনস্থা করেছে। আজ সে নিজের ইচ্ছায় পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

বললাম, উঠি মিমি। মাথা খারাপ কর না। আমি আছি।

মিমি বলল, তুমি আছ বলেই আমি বেঁচে থাকব। তুমি আছ বলেই আমি আর নষ্ট হয়ে যেতে পারব না। তারপর মিমি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল। বলল, শুনবে না?

—কী শুনব?

—সেই কবিতাটা। 'জীবন বড় দুরন্ত বালকের হাতছানি।'

—এখন!

মিমি চোখ নামিয়ে নিল। আমি বুঝি, আমার কবিতা পাঠে সে কোথাও মুক্তির স্বাদ খোঁজে। কেন জানি মনে হল আজ সারাক্ষণ পরীর পাশে বসে থাকি। পরীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনের সঙ্গে আমার কথার এতটুকু যে মিল থাকে না মিমিই বোধ হয় সেটা সবার আগে টের পায়। বললাম, বল। শুনি।

পরী প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আমার কবিতা আবৃত্তি করে গেল— যতদূর যাই অগাধ স্বার্থপরতা/যত দূরেই যাক, একদিন থাকে না তার কোলাহল/ সে হয় অবনত বৃক্ষ মৃত্যু তীক্ষ্ণ সুধা/ফুল যদি ফোটে, ফুটে থাকে আমার ঈশ্বর/ শেষ বিকেলে সে যদি হেঁটে যায়—আমার প্রতিমা/প্রতিমার মতো দুই হাতে থাকে তার করবদ্ধ অঞ্জলি/ আমার সব অপমান মিছে/ সে আছে বলেই বেঁচে থাকি, বাঁচি/ জীবন

জীবন বড় এক দুরন্ত বালকের হাতছানি।

মিমি এবার চোখ খুলে আমাকে দেখল। উদ্ভাসিত চোখ। কুয়াশার জলে ধোয়া মুখ। সব বিবর্ণতা যেন নিমেষে কেটে গেছে। বললাম, বাবা ঠিকই বলেন।

পরী বলে, কী বলেন?

—ও মিমি হবে কেন, ও তো মৃণ্ময়ী। বাবা তোমাকে পরী বললে রাগ করেন। মিমি বললেও।

পরী আর কোনো কথা বলল না, শুধু বের হবার সময় বলল, সাবধানে যেও।

আমি বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। সাইকেলে চলে যাচ্ছি। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব, পরী বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখছে। পৃথিবীটা যেন অন্যভাবে আজ আমার সামনে হাজির। সরু রাস্তাটা বড় সড়কে কোথায় গিয়ে পড়েছে আমাকে তা আজ থেকে পরীর জন্য যেন খুঁজে বার করতেই হবে।

চার পাশের আলো ঘরবাড়ি পাকা সড়ক ধরে গাছপালার ছায়ায় চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি, না বার বার ফিরে আসছি! কার কাছে! পরীর কাছে! যত দূরেই যাই সে যেন টানে। পরীর উপর দিয়ে বড় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেই ঝড় থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তার আত্মরক্ষা না করতে পারি! নিজেকে খুব অসহায় লাগছে। শহর পার হয়ে গুমটি ঘরের কাছে আসতেই গভীর অন্ধকার। রেল-লাইন পার হয়ে পঞ্চানন তলার মাঠে আমি। মাথার উপর আকাশ আর অজস্র নক্ষত্র। ধরণী শান্ত। শস্যক্ষেত্রে আবাদের শুরু। কোথাও কীটপতঙ্গের আওয়াজ। জীবনে পরী না থাকলে আমি কত নিঃস্ব এই প্রথম টের পেলাম। এবং পরীর জন্য আশ্চর্য আবেগে ভেসে গেলাম। নিজের জন্য কেউ এ-ভাবে কাঁদে আগে জানতাম না। আমার চোখ পরীর কথা ভেবে জলে কেন যে ভেসে যাচ্ছিল।

বৃষ্টি বাদলার দিনে বাড়িঘরের চেহারা কেমন পালটে যায়। কদিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট ভেসে গেছে। বাড়ির সামনে এক চিলতে খাল। কবে এখানকার স্থানীয় মহারাজ—এই অঞ্চলে আখের চাষ করবেন বলে এই খাল কাটিয়েছিলেন, মহারাজদের খেয়াল—কে কী বোঝায়, আর তাতেই লেগে পড়া। দু-এক বছর চাষ আবাদে বানের জলের মতো টাকা কামাবার ধান্দা। তিনি চাষবাস বন্ধ করে দিতেই জায়গাটা ঝোপ জঙ্গল, বাঁশের বন, এবং বলতে গেলে ঘোর অরণ্য—এমন একটা অঞ্চলেই আমার বাবা জলের দরে জমি পেয়ে এখন বলতে গেলে থিতু হয়ে বসেছেন। প্রাইমারী স্কুলে চাকরি হয়ে যাওয়ায় বাবার অভাব অনটনও আর সেভাবে নেই। মোটামুটি আমরা ভালই আছি।

কেবল মা'র আপসোস আমার আর পড়াশোনা হল না। আর দুটো বছর পড়তে পারলেই গ্র্যাজুয়েট হওয়া যেত। ছিন্নমূল পরিবারের পক্ষে এটা যে কত বড় মর্যাদার প্রশ্ন বাবা বুঝলেন না। আমারও গোঁয়ার্তুমি কম নয়। পড়ার চেয়ে চাকরিটাই বেশি। মাঝে একদিন পরী এসে ক্ষোভে দুঃখে যা মুখে আসে বলে গেছে!

পরী বলে গেছে, আসলে মাসিমা ওর জেদ। মেসোমশাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কত করে বোঝালাম, আর তো দুটো বছর, তর সইল না। চাকরি না হলে ওর অন্ন জুটবে না। অন্নই সার বুঝেছে। আসলে আমি বুঝি পরী মনে প্রাণে চায় না, আমি একটা প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করি। এই নিয়ে পরীর সঙ্গে পরে আবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। দেখাশোনা বন্ধ হয়েছে। অবশ্য আমার দিক থেকে সাড়া না পেলে, সে বোধহয় স্থির থাকতে পারত না। বেহায়ার মতো সাইকেলে চলে এসেছে শহর থেকে। একটা কলোনিতে আমরা আছি। পরী এই কলোনিতে কেন বার বার আসে লোকের বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য সবাই বোঝে—ও বড় লোকের ঝি। কতরকমের খেয়াল—আমার মতো একটা খেলনা পেয়ে পরীর সাময়িক মতিভ্রম হয়েছে। বয়স বাড়লে কেটে যাবে। আমারও বিশ্বাস তাই। পরীকে পাত্তা না দেওয়াটা আমার কেমন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ইদানীং।

সকালবেলায় বাবা পাটের জমি থেকে উঠে এসে বললেন, তুমি একবার পরীদের বাড়ি যাবে। পরীর ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা, বললেন, বিলুকে আসতে বলবেন, বড় বিপাকে পড়েছি।

বিপাকে পড়ারই কথা। রায়বাহাদুরের একমাত্র নাতনি, আদরে আদরে মাথাটি গেছে। একসঙ্গে

কলেজে পড়ার সময় সেটা ক্রমে বুঝেছি। বিপাক থেকে আমিই এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশকে রক্ষা করতে পারি তিনি জানেন। কিন্তু সেদিন যেভাবে পরী তাদের বিশাল বৈঠকখানা ঘরে সহসা চিৎকার করে উঠেছিল, তাতে পরীর দাদুর ঘাবড়ে যাবারই কথা!

বাবা পাটের জমি থেকে উঠে এসেছেন তবে এই কারণে। আমাকে খবরটা দেবার জন্য।

স্কুলে বের হব। স্নান সারা। বারান্দায় মায়া আসন পেতে দিচ্ছে। আসনে বসে গণ্ডুষ করার সময় বললাম, কোথায় দেখা হল?

—কাদাইয়ে। মানুর বাসা থেকে বের হচ্ছি। দেখি গাড়ি থেকে তিনি নামছেন।

—তোমাকে দেখে নামলেন!

—তাই তো মনে হল!

—চিনলেন কী করে!

—কেন ওদের অন্নপূর্ণা পূজায় সেবারে গেলাম না।

আমি ভুলে গেছি। পরীই সবাইকে দাদুর হয়ে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। আমার বারণ ছিল, না, না যাবে না। তোমরা কিছুতেই যাবে না।

বাবার এক কথা—দেবদেবী নিয়ে তিনি খেলা করতে পারেন না। পিলু বলেছিল, দাদাটা যে কী! পরীদি কত করে বলে গেছে!

মা'র কথা, সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল আছে না!

সতুরাং সবাই গেলেও আমি যাইনি। পরী আমার বাবা-মাকে তাদের বৈভব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে অন্নপূর্ণার পূজা একটা অজুহাত। এসব কারণে পরীর উপর আমার যত ক্ষোভ। বাবা হাঁটুর উপর কাপড় পরেন। পায়ে জুতো পরেন না। বিশাল টিকি রেখেছেন। তাতে আমাদের গৃহদেবতার পূজা শেষে লাল জবা বেঁধে দেন। সবই করা সংসারে অশুভ প্রভাব যাতে পড়তে না পারে। মা'র ভাল একখানা শাড়ি নেই। পিলুর জামা প্যান্ট ক্ষারে কাচা। সুতরাং বাবা তার লটবহর নিয়ে অন্নপূর্ণার প্রসাদ নিতে গেলে, বিলুর মান-সম্মান কতটা পরীদের বাড়ি বজায় থাকে, বাবা যদি বুঝতেন।

—কী বলল!

মুসুরির ডাল দিয়ে ভাত মাখছি। বৃষ্টি ধরে এসেছে। দুটো গরম কুমড়ো ফুলের বড়া মা খুন্তিতে তুলে দিয়ে গেল। গ্রাস তুলব মুখে—বাবা বললেন, তোমার কথা জিগ্যেস করল।

—আমার কথা!

—হ্যাঁ, বলল, তুমি সত্যি সত্যি প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারিটা করছ কিনা! বাবা কলকেয় টিকে গুঁজে দুবার গুড়ুক গুড়ুক টানলেন। বাবার কথা এরকমেরই। বিশেষ করে তামাক খাবার সময় বাক্য অসমাপ্ত রেখেই মনোযোগ সহকারে হুঁকায় নিমগ্ন হওয়া—দেখলে মনে হবে আর তাঁর কথা নেই, উঠে পড়া যাক—তখনই আবার কথা শুরু—বললাম, ঈশ্বরের কৃপায় বিলুর কাজটা হয়েছে। বললাম আর্শীবাদ করবেন, সুনামের সঙ্গে যেন কাজটা করতে পারে। সরকার মাইনে দিচ্ছে, একরকমের সরকারি কাজই বলতে পারেন।

বাবার সঙ্গে কেন যে রায়বাহাদুরের দেখা হয়ে যায়। এটাও যেন একটা কাকতালীয় ব্যাপার। বলার ইচ্ছে হল, শুনে বোধহয় তিনি খুবই প্রীত হলেন। কত বড় সরকারি কাজ, প্রীত হবারই কথা। কিন্তু আমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না। কলেজ ছেড়েছি বলে, পরীর জ্বালা আছে। পরীর এই জ্বালাই যেন আমার মধ্যে জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে—আমি তোমার গোলাম! তোমার পছন্দমতো আমি সব করব! আমরা কত গরিব তোমরা বোঝ না! চাকরিটা হাতছাড়া হলে আবার কবে চাকরি পাব ঠিক আছে! পড়াশোনায় আমার নম্বরও খুব ভাল নয়। পাশ করে যাচ্ছি কোনরকমে। তাই এর চেয়ে আর কী ভাল চাকরি হতে পারে! আমি যা তাই। চাকরি করব, কলেজ যাব না। দেখি তুমি কী করতে পার! তুমি অর্নাস নিয়ে পড়বে। জেলার সেরা ছাত্রী, জলপানি পেয়েছ, পড়াশোনা তোমাকে সাজে। সেদিন পরীর খোঁজ করতে গিয়ে এ-সবই ছিল দু-পক্ষের মধ্যে বিতর্কের বিষয়। এবং আরও বড় বিষয় যেটা, সেটাই বেশি আমাকে ভাবাচ্ছে। পরীর বাবা কাকারা সম্বন্ধ ঠিক করছে এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে। পরীর চেয়ে সাত আট কি দশও হতে পারে বড়। পরী রাজি হচ্ছে না। পরীদের

সংসারে এই নিয়ে অশান্তি। নিজের উপরই ক্ষোভ হয়, কেন যে ওদের অশান্তিতে আমাকে জড়াচ্ছে!

আমি বললাম, পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন, আমার সময় হবে না!

বাবা আমার ঔদ্ধত্যে অবাক হয়ে গেলেন! —কী বলছে বিলু। কত বড় মানী মানুষ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—সোজা কথা। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রোজই তো বিকেলে শহরে যাও। মৃন্ময়ীদের বাড়ি যেতে তোমার এত আপত্তি কেন?

আপত্তি কেন বোঝাই কী করে!

বাবা তো জানেন না, সেদিন পরী আমাকে কী বলেছে! জানলে বাবারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আমি বাবাকে এড়িয়ে যাবার জন্য মিছে কথা বললাম, পরী পছন্দ করে না।

বাবা হুকোটা বেড়ায় ঝুলিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, মৃন্ময়ী তো এমন স্বভাবের মেয়ে নয়। সে যা ভাল বোঝে করবে। বাবা কী বুঝলেন কে জানে। উঠোনে নেমে পাটের জমির দিকে রওনা হলেন। পাট কাটা হচ্ছে। কাছে না থাকলে জনমজুর দিয়ে কাজ করানো যায় না। কাজেই বাবা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলে, জামা প্যাণ্ট পরে সাইকেলে চেপে বসলাম।

পরীর এখন এক কথা, দুটো তো বছর। এতদিন চলেছে, দুটো বছর চলবে না! না হয় আর একটু কষ্ট করবে সবাই।

আমি বলেছি, না। তা হয় না কষ্টের সীমা আছে।

—তাহলে ঠিকই করে ফেলেছ পড়া ছেড়ে দেবে! আমার কথা রাখবে না।

—ঠিক করে ফেলেছি!

তারপর আমরা দু'জনই চুপচাপ। অন্যদিকে আমি তাকিয়েছিলাম। পরীর এক কথা, তুমি পড়া ছেড়ে দিলে আমার কোনো সম্বল থাকবে না বিলু। আমি ভারী একা হয়ে যাব।

আমি হাঁ! বলে কী! শুনে বলেছিলাম, প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি তোমার অপছন্দ বুঝি। তোমার পছন্দ নিয়ে আমার ভাবলে চলবে না পরী। আমার নিজেরও পছন্দ-অপছন্দ আছে। একা হয়ে গেলেও কিছু করার নেই।

সহসা পরী সেদিন কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল, তোমাকে দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না। তোমার কোনো স্বপ্ন নেই। স্বপ্ন না থাকলে বড় হওয়া যায় না। সব তোমার মরে যাবে। তারপরই উঠে চলে গিয়েছিল। আবার কী ভেবে ফিরে এসে বলল, স্বপ্ন না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। তুমি কী সেটা বোঝ!

আমি বলেছিলাম, বুঝে দরকার নেই। অনেক বোঝা হয়ে গেছে। মাথায় কবিতা ঢুকিয়ে জীবনটাকে আমার জগাখিচুড়ি কেন বানাতে চাও বুঝি না! ও করে কিচ্ছু হয় না। আমার তো নয়ই।

আসলে সবই জেদের বশে বলা। ও যদি আমার চাকরিটাকে এত অপছন্দ না করত আমি হয়তো, এসব বলতাম না। কবিতা লেখার মধ্যে যে আশ্চর্য মুক্তি আছে—একটা ভাল কবিতা লিখতে পারলে মনে হয় আমি রাজার মত বেঁচে আছি—পরীই আমাকে কবিতার পোকা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং আমার কবিতা নিয়ে ওর গর্বের শেষ নেই—সুতরাং বুঝতে পারি পরীকে একমাত্র মোক্ষম আঘাত হানতে পারি শুধু কবিতাকে অপমান করে। আমি তাই করেছিলাম। —দেখ পরী যাকে যা সাজে। আমাকে সাজে না। কবিতা তো নয়ই।

সাইকেলে যাচ্ছি, আর ভাবছি।

সাইকেলে চাপলেই আমি কেমন যেন এক ঘোড়সওয়ার মানুষ। দ্রুত গাছপালা, মাঠ পার হয়ে যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য এক আনন্দ আছে। কিন্তু এখন যেন কেমন লাগছে! কোনো আনন্দ নেই। ভিতরে ভিতরে আমিও ঠিক নেই। আড্ডায় কথাবার্তা কম। পরীদের বাড়ির সেই ঘটনার পর কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না। অপরূপা কাগজ বের হবে কি হবে না তা নিয়ে গরজ নেই। এবং বাড়িতে থাকলেই আমার মাথা গরম থাকে, মা'র এমন অভিযোগ। সাইকেলে উঠলে সেটা থাকে না।

পরীর দাদু উপরে উঠে ফের পরীকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন, তুমি একটু বোস বিলু।

পরী ধীরে ধীরে নেমে এসে আমার সামনে বসেছিল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি পার বিলু।

—কী পারি?

—পরেশচন্দ্র এঁটুলির মত লেগে আছে।

পরী নিজের স্বভাবদোষেই মরেছে। তোর কী দরকার ছিল এস ডি ও সাহেবকে আশকারা দেবার। না দিলে সে এত পাগল হয় কী করে—পরেশচন্দ্র তার বাবা-মাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে—ঘন ঘন যাতায়াত। এমন সুপাত্র পরীর দাদুই বা হাতছাড়া করে কী করে! কেন জানি মনে হয় পরীর আশকারা না থাকলে পরেশচন্দ্র এত পাগল হত না। নিজের দোষে নিজে মরেছে, আমি কেন তার সঙ্গে মরতে যাব!

বলেছিলাম, দোষ তোমার।

—মানছি সব দোষ আমার। আচ্ছা বিলু মানুষ ভুল করে না? আমি কী জানতাম এটা এতদূর গড়াবে। বন্ধুর মতো মিশলে কী দোষের।

—দোষের-অদোষের বলছি না।

—তবে কী বলছ?

বলেছিলাম, পরেশচন্দ্র খারাপ কী! তোমার এত অমতের কী থাকতে পারে বুঝি না। বিয়ে হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরী ফোঁস করে উঠেছিল, আমি যা বলছি পারবে কিনা বল। অত কথা আমি শুনতে চাই না। তোমরা আমাকে জান না। আমি সব করতে পারি। বিয়ে হলে ঠিক হবে কি বেঠিক হবে সেটা আমি বুঝব।

বলে কী! আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে কী করতে বলছ।

পরীকে এতদিন দেখে বুঝেছি, সে সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়। পরীদের সংসারে ঝড় উঠেছে, পরীর বাইরে ঘোরাঘুরি আর বাপ-কাকারা পছন্দ করছেন না, কারণ পরেশচন্দ্রের ইচ্ছে নয়, পরী মিছিল করে, পরী ইউনিয়ন করে, পরী অপরূপা কাগজ করে। পরী এখন ঘরে থাকবে—যেমন দশটা মেয়ে বিয়ের আগে কোথাও বের হয় না, পরীও সে-ভাবে থাকবে, পরেশচন্দ্র এমন চায়।

পরেশচন্দ্রের সবই ভাল। জাঁদরেল মানুষ। অল্প বয়সে কত বড় দায়িত্বশীল কাজ করছেন সরকারের। মাথায় কবিতার পোকা না থাকলে পরেশচন্দ্রের মতো ব্যক্তি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা জায়গায় পরেশচন্দ্র হেরে বসে আছে—সে সেটা জানে না। জানে না বলেই পরীর মতো মেয়েকেও জীবনে আর দশটা বিষয়ের মতো অর্জন করা যায় ভেবে ফেলেছে।

আমি বলেছিলাম, আমাকে কী করতে হবে বল। যদিও আমি জানি পরী দুম করে এমন কথা বলতে পারে যাতে আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে আসতে পারে। কিন্তু পরীর কাতর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, জীবনে সে এত বড় সর্বনাশের মুখোমুখি কখনও হয়নি। আমার তো ধারণা ছিল, পরী এস ডি ও সাহেবের জিপে যখন ঘুরে বেড়ায়—কোথাও কিছু একটা কিন্তু আছে। আছে বলেই পরীর প্রতি সংশয়। আমি সহজে তাকে কোনো আশকারা দিতে রাজি না।

পরী মাথা নিচু করে বসেছিল। কিছু বলছিল না।

—বল।

—রাখার মতো হলে রাখব।

—তুমি একবার বাবাঠাকুরের কাছে যদি যাও। সেই এক কথা!

কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিলাম। ভাগ্যিস বলেনি, আমাকে নিয়ে পালাও। কারণ পরী পারে না এমন কাজ নেই। বলেছিলাম, কেন?

—তুমি তো জান বাবাঠাকুর পারেন—

আরে এ যে দেখছি আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি। আসলে আমি নিরুপায়। যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না। পরীকে কেন যে কথা দিতে গেলাম। এখন বুঝতে পারছি, বিষয়টা খুব সহজ নয়। কতদিন হয়ে গেল কালীবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। বাবার অভিযোগ, মার অভিযোগ, তুমি একবার

গেলে না। তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে, খবরটা দিতে হয়। তোমার বদরিদা, বউদি, বাবাঠাকুর কত খুশি হতেন।

সত্যি যাওয়া দরকার। সেবাইত বদরিদা, আর বউদির মতো মানুষ হয় না। আমার পড়াশোনার খরচ তিনিই দিতেন। থাকা খাওয়া সব। এবং প্রায় বাড়ির আর একজন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যে একটা বেইমান বাস করে টের পাই। তোমার হাত ধরে বলছি, তুমি যাও। বাবাঠাকুরকে তুমি বললে বুঝবেন। বলবে, মৃন্ময়ীর ইচ্ছে নয় এখন বিয়ে করে। পড়াশোনা করছে। বাবাঠাকুর তো পড়াশোনা পছন্দ করেন। আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, তোর হবে।

পরীর কাতর মুখ দেখে কথা দিয়ে এসেছিলাম, যাব। বাবাঠাকুরকে বুঝিয়ে যে করেই হোক পরীর গলার কাঁটা তুলে ফেলতে হবে।

—কথা দিচ্ছ।

না পরীর দিকে তাকানো যায় না। কার আশায় এই সজল চোখ। প্রাইমারী ইস্কুলের একজন মাস্টারকে নিয়ে তার কোনো স্বপ্ন থাকতে পারে না। ভাল লাগা আর ভালবাসা দুটো তো এক নয়। আমাকে তার ভাল লাগতে পারে—এ পর্যন্ত। এর বেশি নয়। কথা দিয়ে এসেছি, যাব।

সেই যাওয়াটা আজও হয়নি। কী যে করি।

সাইকেল থেকে নেমে ইস্কুলের মাঠে হেঁটে যাচ্ছি। পাশে মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন মাটির দেওয়াল ঘেরা লম্বা চালাঘর। ছোট ছোট সব বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে। সামনে বড় সড়ক। দু-পাশেই বাড়িঘর। গরিব মুসলমান মানুষজন চারপাশে। স্কুলের হেড স্যার জাহির সাহেব। চালাঘরের দরজা নেই। টেবিল চেয়ার রাখার জন্য শেষ দিকটায় একটা ঘরের দরজার বন্দোবস্ত হয়েছে। স্কুল ছুটি হলে সব ঘর থেকে টেবিল বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ড ও ঘরটায় নিয়ে গিয়ে তুলে রাখা হয়। ইস্কুলের খাতাপত্র জাহির সাহেবের বাড়িতে থাকে। আমাকে নিয়ে পাঁচজন শিক্ষক। জাহির সাহেব লুঙ্গি পরেন। মাথায় দেন ফেজ টুপি। লম্বা আলখাল্লার মতো পাঞ্জাবি গায়ে দেন। পায়ে জুতো পরেন না। তিনি চাবি নিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদের পাশে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তখন মাঠে ছোটাছুটি করে। দৌড়ে বেড়ায়। তাদের নতুন মাস্টার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পেরেই দু-একজন দৌড় লাগাল। জাহির সাহেবের বাড়ি কিছু জমি পার হয়ে গাছপালা ঘেরা গাঁয়ের মধ্যে। এত কাছে বাড়ি অথচ একদিনও বলেন নি, চলুন বাড়ি। একটু বসবেন। কাউকেই বলেন না। ওরা দু'একজন কেন ছুটছে বুঝতে পারছি। আমার ঘড়ি নেই, থাকার কথাও নয়। মিলের ভোঁ শুনে আমরা সময় ঠিক করি। দশটায় ভোঁ পড়ে। ওই শুনে চানে যাওয়া, খেতে বসা। তারপর সাইকেল চালিয়ে আসা। এগারটা বেজে যাবার কথা। রোজই দেখি, দেরি হয়ে গেছে ভেবে যতই দ্রুত সাইকেল চালাই না কেন, স্কুলের দরজা তখনও বন্ধ।

যারা ছুটে গিয়েছিল, তারাই আবার ফিরে আসছে। এসেই তালা খুলছে। ওরা বুঝতে পারে তালা খুললেই, আমি সাইকেল ঘরে তুলে ফেলব। আমি দাঁড়িয়ে থাকলে ওদের দৌড়ঝাঁপ করতে অসুবিধা হয় বুঝি। সেজন্য কিনা, এটা প্রায় রোজকার ঘটনা, সময়মত ইস্কুলের দরজা খোলা হয় না। আমি বুঝতে পারি, জাহির সাহেবই হোক আর কল্যাণ, বসিরুদ্দিন যেই হোক—ইস্কুলের কাজটা ফাউ। জোতজমি ঘরবাড়ির আর দশটা কাজ সেরে, একটু সময় করে ইস্কুলে এসে কিছুক্ষণ দয়া করে থেকে যাওয়া। আমার এত তাড়াতাড়ি আসাটা জাহির সাহেবের খুব একটা পছন্দ নয়। কিছু বলতে পারেন না, খোদ একজন স্কুল ইন্সপেক্টর আমার এই চাকরির মূলে। এমনিতে সমীহ করেন। আগেকার কালের গুরু ট্রেনিং পাশ। স্কুলের গোড়ার দিক থেকে আছেন। গাঁয়ের মান্যগণ্য মানুষ।

স্কুল করে ফিরতে তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে। এসে ভাত খেয়ে নিজের ঘরে খানিকক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকি। চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে আমার ওজন আরও বেড়ে গেছে। আগের মত আর পিলু যখন-তখন ঘরে ঢুকে ষাঁড়ের মতো কাউকে ডাকাডাকি করে না। সে ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে ফিরে খুব সন্তর্পণে বইখাতা টেবিলে রাখে। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে আছি দেখতে পায়। মুখের উপর হাত ফেলা। ফলে চোখ ঢাকা থাকে। আমি যে ঘুমাইনি, জেগেই আছি সে টের পায়।

ঘুম আসার কথাও নয়।

কেন জানি আশঙ্কা হয় যে-কোনোদিন, যে-কোনো বিকেলে পরীর দাদু গাড়ি নিয়ে বাবার বাড়িঘরে হাজির হবে। কেন যে পরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল—এটা আমাকে ভাবায়। বড়লোকদের মর্জি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বাবা সকালে বলেছেন, যা ভাল বোঝ কর। অর্থাৎ বাবাও আমাকে আর ঘাঁটাতে চান না।

কিন্তু টের পাই ভিতরে আমিও কম অস্থির হয়ে উঠিনি। যে করেই হোক বাবাঠাকুরকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু বোঝাই কী করে। একেবারে বেটা ন্যাংটা সন্ন্যাসী। গেরুয়া নেংটি পরে থাকেন। মন্দির সংলগ্ন তাঁর ঘর। মেঝের উপর কম্বল পাতা থাকে শীত-গ্রীষ্মে। মন্দিরে সকালে ঢোকেন। ঢোকেন এই পর্যন্ত। পূজা আর্চা তাঁর নিজের পছন্দ মাফিক। ইচ্ছে হলে ফুল জল দেন, ইচ্ছা না হলে দেন না। বড় জাগ্রত দেবী। পূজার সময় দেবীকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠের চেয়ে বেশি খিস্তিখাস্তা করেন। সেবাইত বদরিদা সবসময় তটস্থ থাকেন। এহেন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোই কঠিন।

আমার মাঝে মাঝে এসব মনে হয়—যা ভবিতব্য তাই ঘটছে। ঘটবে। কিন্তু এটা কী আমার শরশয্যা...। রাতে ভাল ঘুম হয় না। প্রাইমারি ইস্কুলে মাস্টারি নিচ্ছি শুনে পরী মহাখাপ্পা। বলেছিল, বিলু আসলে তুমি অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ!

আমি তখন হাঁ। বলেছিলাম, আমি প্রতিশোধপরায়ণ!

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে খাটো করতে পারলে আর কিছু চাও না।

আমি প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করলে ওর খাটো হবার কী কারণ থাকতে পারে বুঝি না।

পরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, আমিও জানি তোমাকে কী করে শায়েস্তা করতে হয়।

এস.ডি ও পরেশচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশাটা তারপরেই বাড়িয়ে দিয়েছিল ফের। এতটা ভাল দেখায় না ভেবেই হয়তো বাড়ি থেকে হতে পারে কিংবা পরেশচন্দ্র নিজেও বাপ মাকে আনিয়ে পরীর দাদুর কাছে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। পরেশচন্দ্র তো জানে না, আমাকে শাস্তি দিয়ে পরী নিজে জ্বলছে। আর সেই থেকে মহাফাঁপরে। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে।

কিছুই ভাল লাগছে না। শুয়ে থাকতে না, বসে থাকতে না—কেমন এক গুঞ্জন ভেতরে—গুঞ্জন না গঞ্জনা, জামা গায় দিয়ে সেই বাদশাহি সড়কে উঠে যাব বলে বের হচ্ছি, মা বলল, সাবধানে যাস। বাবা বললেন, সকাল সকাল ফিরবি। রাস্তাঘাট ভাল না। ট্রাকগুলো যা যমদূতের মতো ছোটে।

সাইকেল ঘর থেকে বের করার সময় বাবা বললেন, যাচ্ছ যখন, মৃন্ময়ীদের বাড়ি ঘুরে এস। বুড়ো মানুষ, বারবার বললেন, যাক ভালই হয়েছে দেখা হয়ে, বিলুকে একবার আসতে বলবেন। না হলে আমি যেতাম পরীকে নিয়ে।

পরী আমাদের ঘরবাড়ি দেখেছে, পরী কী শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, তার দাদুকে আমাদের ঘরবাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

এসব মনে হলে আমি কেমন যেন একটা মজাও পাই—তুমি আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই এখন জালে জড়িয়ে পড়েছ। বোঝ এবার।

মুকুলের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু মুকুলের কাছে গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে। মুকুল সহজে ছাড়বে না। চৈতালি একদিন নাকি ওর কাছে নিজেই হাজির। চৈতালি প্রসঙ্গ উঠলে মুকুল আর থামতে চায় না।

পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে বাদশাহি সড়কে উঠলেই আগে আমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। এই রাস্তা যেন আমার আজন্মকালের সঙ্গী। হাজার বছর আগেও মনে হয় এমন এক সড়ক ধরে সমানে ছুটছি। আমি এক অশ্বারোহী। খটাখট আওয়াজ উঠছে ঘোড়ার ক্ষুরের। আমার উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে ঝলমল করছে। বড় বড় গাছের ছায়া পার হয়ে দ্রুতবেগে ছুটছি। সেই আমি আজ বিলু। আমার অশ্ব নেই, উষ্ণীষ খুলে নেওয়া হয়েছে। ভাঙা তরবারি। অবশ্য বাবার ভাষায়, যেদিন যায়, তাই সুদিন। যেদিন অনাগত, তা দুঃসময়।

সত্যি কি আমার দুঃসময় উপস্থিত! আমার তো মানসিক যন্ত্রণার জন্য হলে কবিতা মাথায় আসে—কবে যেন সেদিন এক গভীর অন্ধকারে / দেখি মাথার উপরে আকাশ, এক অলৌকিক নক্ষত্র জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়/নীহারিকার খবর কে আর কতটা রাখে / কে জ্বলে, কে নেভে, কোথায় দগ্ধ আত্মা

করে লুকোচুরি—তুমি আমি সব তার ছাইভস্ম, উড়ে যায়/নিরন্তর মাঠ পার হয়ে ও কার অনুসন্ধান/ব্যাপ্ত বেদনা অস্থির চকমকি কাঠ—শুধু সে জানে আগুন জ্বালাতে। আমি তার আগুনে পুড়ে মরি বারবার/ যেমত অস্থির পতঙ্গ ধায় প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

আমিও ধেয়ে যাচ্ছি।

রেলগুমটি পার হয়ে জেলের পাঁচিল, ঝাউগাছের বন অতিক্রম করে শহরের দিকে উঠে যাচ্ছি।

কী মনে হল কে জানে। গেলেই পরী নেমে এসে বলবে, বিলু! দেখে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারপর চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকলে একসময় বলবে, গিয়েছিলে! আর কতদিন লড়ব! তোমরা কী চাও আমি মরে যাই। বিয়ে হলে কেউ মরে যায় পরীই বলতে পারে। তার স্বাধীন জীবন শেষ হয়ে যাবে। এ জীবন থেকে সে নড়তে চায় না। আর আশ্চর্য হাবে ভাবে বুঝিয়ে দেবে আমি তার ভরসা। বাবাঠাকুরই একমাত্র পরীর বিয়ে রদ করতে পারেন। তিনি পরীদের পরিবারে সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। তিনি যদি বলেন, পরীর বিয়ে এখানে দিও না, আমার মনে খটকা লাগছে, তবেই সব উল্টে যাবে। পরীকে কথা দিয়ে এসেছি যাব। যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি। পরীকে পক্ষকালের উপর এড়িয়ে চলছি।

আজও সেই এক—বারবার কেন জানি অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। পরী আশায় রয়েছে, আমার যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে, বলি কী করে! —পরীর জন্য তোর এত মাথাব্যথা কেন বিলু! পরী তোর কে? তার ভালমন্দ তুই কতটা বুঝিস? তার বাবা-মা আছে, বিনয়েন্দ্র আছে, তারা বোঝে না, তুই বুঝিস। যদি বলে ভাগ। দূর হ।

কী যে করি!

কখন আমি লালদীঘির পাড় ধরে যাচ্ছি, নিজেই টের পাইনি। এ পথটা পরীদের বাড়ি যাবার পথ নয়। আমি আমার অজ্ঞাত ইচ্ছের তাড়নায় পি ডবলু ডি-র কোয়ার্টারের দিকে এগুচ্ছি। সাইকেল নিয়ে ঢুকতেই মুকুল দরজা খুলে বারান্দায়। পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। ভারী প্রসন্ন মুখে ভেতরে ঢুকে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। বউদি বিলু এসেছে। বউদি বউদি।

বউদি দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, আর কি, এবারে বসে পড়। দুজনের যে এত কী কথা থাকে বুঝি না। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না পর্যন্ত!

সত্যি আমরা দুজনে যখন ঘরে ঢুকে যাই, পৃথিবীর অন্য জানালা আমাদের কাছে বন্ধ হয়ে যায়।

মুকুল বলল, ভিতরে গিয়ে বস। আমি সাইকেলটা তুলে রাখছি। ঘরে ঢুকে বললাম, বউদি এক গ্লাস জল।

বউদি বলল, এত তেষ্টা পায় কেন?

—কী গরম!

—শুধু গরম। তা গরমই বলতে পার। আমারই খেয়াল নেই, ভাদ্র মাস এটা। শরতের আকাশ পরিষ্কার।

বলতে ইচ্ছে হল, বউদি আকাশ পরিষ্কার নয়। বড়ই ঘোলা। আমার মুখ দেখে টের পাও না। বউদি আমাদের জননীর মতো। কখনও দিদির মতো, রঙ্গরসিকতা করলে বউদি।

মুকুল ঘরে ঢুকে বলল, আঃ কী মজা! আজ আমরা ঘুরব।

—কোথায়?

—সন্ধ্যার পর বালির ঘাটের দিকে চলে যাব। আজ পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াব।

—হঠাৎ!

—আঃ কী মজা। চৈতালি এসেছিল।

—সে তো জানি। বলেছ।

—চৈতালি খুব খুশি। বলল, মুকুলদা তুমি এত সুন্দর লিখতে পার?

—কী লিখতে পার?

—কেন কবিতা, আমার কবিতা ওর ভারী পছন্দ বলেছে।

—ওর ওপর লেখাটার কথা কিছু বলল না।

—না!

—ওকে তো সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দিয়েছ।

—কী গায় বল! টাউন হলের ফাংশনে সেই গানটা—দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় থাকি...অপূর্ব। অসাধারণ। কী গলা! যেন এরই প্রতীক্ষায় সে অনন্তকাল বসে আছে। ও গাইবে আমি শুনব। আমাদের থাকবে ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ি।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই কোন পাহাড়ী উপত্যকায়।

—ঠিক বলেছ। বাংলোর চারপাশে গভীর বনজঙ্গল। ফুল-ফলের গাছ। রঙিন প্রজাপতি উড়বে।

আমি বললাম, পাশে একটা ঝর্ণা থাকলে ভাল হয়।

—ঝর্ণা কেন?

—বা অমন সুন্দর মেয়ে আর তুমি—সারা দিন সারা বেলা শুধু গাছপালা ফুলফুল দেখবে? ঝর্ণার জলের শব্দ শুনবে না?

—শব্দ!

—কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে।

—তুমি ঠাট্টা করছ বিলু?

—না ঠাট্টা নয়। শুধু ভাবছি, এইটুকু প্রশংসাতেই এই। বুঝতেই পারছ, মেয়েরা একটুকুন প্রশংসাতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বউদি এক গ্লাস জল রেখে বলল, আমার হয়েছে জ্বালা।

এ কথা কেন! ভাবলাম।

বললাম, তোমার আবার জ্বালা কিসের! দাদা থাকতে তোমার জ্বালা হবার তো কথা নয়।

—এই ফাজিল ছেলে!

—বারে ফাজলামিটা দেখলে কোথায়? জ্বালা আমাদের।

ও সবারই হয়। বয়স হলে জ্বালা হয়, জ্বালা থেকে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা থেকে ঘা হয়। তারপর সংসারে সেই ঘা-টা আর শুকায় না।

বউদি আজ কোনো ক্ষোভে জ্বলছে তবে। বউদির মুখ ব্যাজার। বললাম, কী ব্যাপার! কী হয়েছে বলবে তো?

মুকুল আগ বাড়িয়ে বলল, ব্যাপার আবার কী! আমাকে ইকনমিক্স-এ অনার্স নিতে বলছে।

মুকুল ইচ্ছে করলে ইকনমিক্সে অনার্স নিতে পারে। ম্যাট্রিকে টেনেটুনে সেকেণ্ড ডিভিসন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ই চৈতালির প্রেমে পড়ে যায়। চৈতালির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। পরীক্ষার ভাল ফলটাও চৈতালির প্রতি গোপন প্রেম, ইমপেটাসের কাজ করেছে। এবং এসব কারণে পরীক্ষার নম্বর তার আশাতীত ভাল। সে আমাকে বলেছে, মেসোমশাই জান ঠিকই বলেন—যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

আমি বললাম, সে তো বাবা মা'র সঙ্গে ঝগড়ায় পেরে না উঠলে চণ্ডীপাঠ শুরু করে দেন। মা তো এতে আরও ক্ষেপে যায়।

সে বলেছিল, চৈতালির প্রেমে না পড়লে আমি এত ভাল নম্বর পেতাম না। চৈতালির দিদিরা আমাদের বাঁদর বলেছে—এখন বুঝেছে আমরা কে?

তারপরই থেমে বলল, বড় হবার সময় কেউ পাশে না থাকলে সাহস পাওয়া যায় না। একজন এসেই যায়। সেই একজনের জন্যই তো বিলু আমরা সব করি। ঠিক কি না বল! এই যে বড় হওয়া, কবিতা লেখা, পরীক্ষার ভাল নম্বর তোলা, শুধু সে একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে। কী বল, তাই না।

আমি কিছু বললাম না। জল খেয়ে গ্লাসটা রাখার জন্য রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি। দেখি বউদি বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে, বলল, বিলু শোন।

সহসা যিনি বিকেলে গা ধুতে যাবার জন্য শাড়ি সায়া পরে ঘর থেকে বের হয়ে আসছিল, সেই আমাকে কেন যে অভিভাবকের মতো ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। আমি কিছুটা হতভম্বই হয়ে গেছি। আবার কেউ কোনো নালিশ-টালিশ করেনি তো!

বউদিকে আমরা এমনিতে খুব সমীহ করি। এক সন্তানের জননী বাপের এক মেয়ে। আদুরে। টুনি বাড়িতে নেই। বোঝাই যায়। থাকলে আমার সাড়া পেলে ছুটে আসত। লতাপাতা ফ্রক গায়ে দিয়ে টুনি আমাকে দেখলেই স্কিপিং করতে শুরু করে দেয়। সে কত ভাল স্কিপিং করতে পারে এটা দেখানোর মধ্যে ভারী আনন্দ পায়। বোধহয় ওর দাদু-দিদিমার কাছে এখন আছে। সৈদাবাদের দিকে বউদির বাপের বাড়ি। বউদির দুঃখ, এমন আংটা পরিয়ে দিয়েছে সংসার যে, এক রাত বাপের বাড়িতে থাকার সময় নেই তার। সারাটা দিন, এই বাসাবাড়িটি ছিমছাম রাখতে ব্যস্ত। একদণ্ড বসে থাকার যদি ফুরসত মেলে। আমার এসব দেখলে কেন যে মনে হয়, সংসারে এত দায় যে কে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে! কেউ তো বলেনি, সারাক্ষণ এই সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। জানালার পর্দা থেকে গ্রিল কোথাও এতটুকু ধুলোবালির চিহ্ন থাকে না। আসলে এটাই বোধহয় বউদির স্বপ্নের পৃথিবী। সেই স্বপ্নের পৃথিবীতে কে আবার নখের আঁচড় কাটল। এসব যখন ভাবছিলাম তখনই বউদি বলল, বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে বল বিলু। আমরা জানি তুমি বললে ও কথা রাখবে। জামাইবাবু পর্যন্ত রেগে গেছেন।

কী নিয়ে এত জটিলতা বুঝতে পারছি না। সংসারে তবে কী কেউ ভাল থাকে না। যেখানেই যাব আমাকে জড়ানো হবে।

বললাম, কী হয়েছে?

—আর কী হবে। সকালে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

মুকুল এমনিতে খুবই শান্ত স্বভাবের, কিছুটা প্রকৃতি প্রেমিক। আসলে আমরা সবাই। ভীরু প্রকৃতির না হলে কবিতা গল্প কেউ লেখে না এটাও কেন জানি আমার মনে হয়। আমরা যা চাই, স্বপ্ন দেখি—তা সোজাসুজি বলতে পারি না বলেই বোধহয় এই একটা নরম জায়গা আছে যেখানে সহজেই আশ্রয় পেতে পারি।

বউদি বলল, বোস। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

ভিতরে ডবল খাট। মাথার দিকে দুটো জানালা। জানালায় পেলমেট— রঙিন পর্দা, খাটের বিপরীত দিকে ড্রেসিং টেবিল—মাথা সমান আয়না। বিবাহিত জীবনে এই আয়নাটা মানুষের বড় দরকার। আমি নিজের পুরো ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। আসলে ওটা আমার বাইরের ছবি। ভেতরে আর একটা ছবি আছে—যা আয়নায় আমার কোনোদিন ভাল করে দেখা হয়নি। পরী এমন আয়নার সামনেই আমাকে নিয়ে দাঁড়াতে চায়।

বললাম, কী হয়েছে বলবে তো! কী নিয়ে কথা কাটাকাটি!

—আর কী নিয়ে। বাবু ঠিক করেছেন, বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বেন।

—ভাল তো।

—তুমিও ভাল বলছ? বৌদি জ্বলে উঠল।

—বাংলা অনার্স নিয়ে পড়লে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নয়! বউদির মুখ ভারী গম্ভীর।

বললাম, কী ক্ষতি?

—এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

সত্যিই বিষয়টা আমি তলিয়ে দেখিনি।

বউদি ফের বলল, সব ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলায় এম পড়বেন। বাংলায় ডক্টরেট করবেন। দাদারা তো শুনে হাঁ। বাংলা নিয়ে পাশ করলে কী হয় তোমরা ভালই জান।

বউদির গম্ভীর মুখ দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমরা দল বেঁধে আসি। আমাদের কাগজের অস্থায়ী ঠিকানা এই বাড়ি। অস্থায়ী অফিস, মুকুলের ঘর। কাজেই কোনো কোনো দিন বেশ রাত হয়ে যায় আমাদের আড্ডা ভাঙতে। মুকুলের দাদাকে আমরা সবাই বড়দা বলি। তাঁর তাস খেলার আড্ডা আছে সন্ধ্যায়। চেককাটা লুঙ্গি পরে ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে তাসের আড্ডায়। যাবার মুখে দরজায় উঁকি দিয়ে একবার দেখবেন, কে কে আছি আমরা। তারপর হেসে বলবেন, বউদির মেজাজ ঠিক আছে, আর এক রাউণ্ড চা মেরে দিতে পার। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আমরা আর এক রাউণ্ড চায়ের অর্ডার

দিতে পারি। যেন উসকে দিয়ে যাওয়া। সেই মানুষের সঙ্গে সকালে মুকুলের কথা কাটাকাটি হয়েছে। ভাবতে খারাপ লাগছে। বললাম, আমি বুঝিয়ে বলব। বউদি বড় হালকা বোধ করল।

তারপরই মনে হল, কী বুঝিয়ে বলব।

আমি বললাম, কী বলতে হবে বল তো? ও ইকনমিকস-এ অনার্স নিয়ে পড়ুক এটা তোমরা চাও?

বউদি বলল, আমি তোমার দাদা আমরা সবাই চাই ও ইকনমিকস-এ অনার্স নিক। এখন যাও বোঝাওগে। তুমি বোঝালে বুঝবে।

—দেখছি।

আমার উপর খুব নির্ভর—বিশেষ করে তার দেবরটির ব্যাপারে।

বউদি ফের বলল, আমি তোমার দাদাকে বলেছি, রাগারাগি কর না। বিলুকে আসতে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি হুঁ-হাঁ কিছু না বলে বের হয়ে এলাম।

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি মুকুল লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সামনের জানালার পর্দা সরানো। ওর চোখ জানালা পার হয়ে রাস্তায়। ওর স্বভাব শুয়ে শুয়ে পা নাড়ানো। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, বউদির সঙ্গে নিভৃতে এত আলাপন—ভাল ঠেকছে না। চৈত্রের ঝরাপাতার বড় ওড়াওড়ি। হেমন্তের অপেক্ষায় থাকি— সোনালি ধানের গুচ্ছ, সবুজ ঘাসের মাঠ পার হয়ে যায় দেখ—উদাসী বাউল একতারা বাজায়। তারপরই ঝটকা মেরে উঠে বসে বলল, আমি আমার মতো বাঁচতে চাই। এত ব্যাগড়া দিলে চলে!

বুঝতে পারি মুকুল আজ ভাল নেই—সে তার কবিতার দু-একটা লাইন আউড়ে মনে প্রশান্তি আনার চেষ্টা করেও পারেনি, তাই ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি কী নিয়ে পড়ব না পড়ব তাও বাড়ি থেকে ঠিক হবে। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম নেই! বলে আর একটা বালিশ সে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি যাতে আয়েস করে বসতে পারি কিংবা পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পারি সেজন্যে সে একটা বালিশ আমার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমি বিছানায় না বসে পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। কিছু বললাম না। শুধু জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই জানালাটা আমারও ভারী প্রিয়। রাস্তার পর মাঠ, তারপর পুলিশ সাহেবের বড় বাংলো, বিশাল এলাকা জুড়ে পাঁচিল। কতরকমের গাছপালা—বাড়ির পাশ দিয়ে জজ কোর্ট যাবার রাস্তা—অনেক দূরের এইসব দৃশ্য এবং মানুষজনের পাশাপাশি মনে করিয়ে দেয় পরীর সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ লাল রঙের লেডিজ সাইকেল। বড় শৌখিন সাইকেলে চেপে পরী কোনো বিকেলে সহসা আমাদের আড্ডায় হাজির। কত বিকেল এমন অপেক্ষায় কেটেছে। তারপর কোনোদিন সে এলে, আমি বোবা বনে গেছি। পরী এলে আমি কিভাবে কথা বলব বুঝতে পারতাম না। পরী বড় চঞ্চল, পরিহাসপ্রিয় এবং এক অদম্য উৎসাহের ভাণ্ডার। পরী এলে কেন যে গম্ভীর হয়ে যেতাম—সবাই মিলে একশটা কথা বললে, আমার একটা দুটো কথা। তার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিত পরী। আমি হাঁ বললে হাঁ, না বললে না।

আমি চুপচাপ থাকলে মুকুলের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়। সে জানে, স্কুলের মাস্টারি নিয়ে পরীর সঙ্গে আমার রেষারেষি চলছে। পরী একদিন মুকুলকে বলে গেছে, বন্ধুটিকে শেষ পর্যন্ত প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার বানিয়ে ছাড়লে। এই তোমার বন্ধুকৃত্য! এটা মুকুলকেও বোধহয় ভাবিয়েছে। কাজটা শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ হল বুঝতে পারছে না। সে তার জামাইবাবুকে ধরাধরি না করলে কাজটা আমার হতই না। পরী এমনও নাকি শাসিয়ে গেছে, তোমাদের কাগজে আর আমি নেই। ফলে কাগজের ভবিষ্যৎ নিয়েও আমরা সংকটের মধ্যে আছি।

অপরূপা কাগজ তো আর কাগজ নয়—আমাদের কিছু হবু গল্পকারদের প্রাণ। ওটা না বের হলে আমাদের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি। পরীর যে বিয়ে ঠিক। বাড়ি থেকে পরীর বের হওয়া বন্ধ। কিন্তু পরীর এক কথা। এখন বিয়ে-ফিয়ে আমি করব না। পড়ব। এর চেয়ে পরী বেশী কিছু বলে না।

পরেশচন্দ্র পরীর দাদুকে বলেছে, মিমি পড়তে চায়—পড়ুক না। পরেশচন্দ্রের বাবা বলেছেন, নিশ্চয় পড়বে। আমরা পড়াব। এমন ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রী না পড়লে চলবে কেন। শুভ কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে

যাওয়াই ভাল।

এখন সব কিছুতেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পরীর বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না। গেলেই পরীর এক কথা, গিয়েছিলে!

যাই কী করে। যাওয়া হয়নি।

আমার মাস্টারি নিয়ে রেষারেষি পরীর সঙ্গে। পরী শেষ পর্যন্ত হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসে আমাকে রক্ষা করতে পারে। দেখ এবার, তুমি প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি করতে পার আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারি না! আমি সব পারি। মিছিলে যেতে পারি, পার্টির পোস্টার লিখতে পারি, আর 'মাউন্টব্যাটন, সাধের ব্যাটন কারে দিয়া গ্যালা' গাইতে পারি, নাটকে নায়িকার পার্ট করতে পারি—আর বিয়ের পিঁড়িতে টুক করে বসেও যেতে পারি। তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। লক্ষ্মী ঠিকই বলেছে, তোমাকে মাস্টারি মানায় না, রাখালি করগে, যেন পরী বলতে চায়, আমি সব পারি, তুমি কিছুই পার না।

এখানে এসে আর এক জট। মুকুলের সঙ্গে ওর বড়দার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

মুকুলকে বললাম, দাদা, বউদি, জামাইবাবুর যখন ইচ্ছে ইকনমিকস-এ অনার্স নিয়ে পড়ার, তাই পড়।

—তার মানে!

—মানে একটাই বাংলায় অনার্স নিলে ভবিষ্যত ঝরঝরে। আমার মাস্টারির মতো।

—বাংলায় অনার্স আমার বিধিলিপি।

—বিধিলিপি মানে?

—বিধিলিপি বোঝ না? নিয়তি। বুঝলে নিয়তি! বাংলায় অনার্স আমাকে নিতেই হবে।

—নিতেই হবে।

—নিতেই হবে। বলে মুকুল ফের চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, যেন বড়ই অসহায়। কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

—চৈতালির দিব্যি নাকি?

আর তখনই রাস্তায় কাকে দেখে মুকুল ধড়ফড় করে উঠে বসল। বলল, এই শিগগির। তাড়াতাড়ি কর। দেখ কে আসছে?

দেখলাম যিনি আসছেন, তিনি আর কেউ নন—চৈতালির দিদি। প্রচণ্ড মোটা, মাথার সামনের দিকটায় টাকের মতো, লাল রঙের সিল্ক পরা। রিকশা থেকে নেমে, দরজার কাছে এসে বউদির নাম ধরে ডাকছে।

বউদি বাথরুমে। মুকুল দু-লাফে তক্তপোষ থেকে নেমে ওদিকের দরজা খুলে আড়ালে কথাটা বলে এদিকে আবার চলে এল। ভদ্রমহিলা বুঝতেই পারল না, কে দরজা খুলে দিল। এক দরজা দিয়ে তিনি ঢুকলেন, অন্য দরজা দিয়ে মুকুল আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। তারপর দেখছি মুকুল ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছে। আমি পিছিয়ে পড়লে বলেছে, ইস শিগগির।

কী কারণ বুঝতে পারছি না।

—কী হয়েছে? ছুটছ কেন!

—চলে এস, শিগগির চলে এস।

বাড়ির আড়ালে পড়ে যেতেই কিছুটা যেন স্বস্তিবোধ করছে মুকুল। একবার পেছন ফিরে তাকায় আবার হাঁটে।

—আরে হলটা কী?

—আর হল।

এদিকটায় বড় মাঠ, ইস্টিশনে যেতে হলে এই বড় মাঠ পার হয়ে যেতে হয়। না পেরে বললাম, আমরা কি ট্রেনে করে পালাচ্ছি?

—প্রায় তাই বলতে পার!

বুঝতে পারছি না চৈতালির দিদিকে দেখে মুকুল এহেন আচরণ করছে কেন! চৈতালি নিজে এসে মুকুলের কবিতার সুখ্যাতি করে গেছে! দিদির পারমিশন না পেলে চৈতালির এক পাও নড়বার উপায়

নেই। সেই দিদিকে দেখে এত ভয়? ভয় হবার তো কথা নয়। বাড়ি থেকে ছাড়পত্র না পেলে মুকুলের কাছে চৈতালি আসতেই পারে না। কারণ এর আগে কম ঝক্কি যায়নি —মুকুল ফাঁক পেলেই সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দিত। মুকুল দিলে আমি না দিয়ে থাকি কী করে। মাধ্যাকর্ষণের টান। মুকুল এই টানে কোথায় যাবে জানি, আর গিয়ে কি দেখবে তাও জানি। বড়দি ছাড়পত্র না দিলে চৈতালি মুকুলের কাছে আসে কী করে। না কি গোপনে এসে দেখা করে গেছে! গোপনে এসে দেখা করেছে ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ বোধ করলাম।

আমি ডাকলাম, এই মুকুল শোন। কোথায় যাচ্ছ?

—পালাচ্ছি।

—পালাচ্ছি মানে! চৈতালির দিদি কি ধাওয়া করবে ভাবছ?

—করতে পারে।

মুকুল আসলে কত ভীরু প্রকৃতির বুঝতে কষ্ট হয় না। ওকে সাহস দেবার জন্য বললাম, রাখ তো—দেখা আছে সব। তুমি কী অন্যায় করেছ যে ভয় পাবে। বলে দৌড়ে হাত ধরে ফেললাম।

এখানে কিছু বড় গাছ আছে। মাঠে সবুজ ঘাস। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। দুজন উঠতি যুবকের পক্ষে মাঝে মাঝে এ-সব জায়গা খুবই মনোরম। প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। ওকে হাত টেনে বসালাম। বললাম, ব্যাপার কী বল তো!

মুকুল পা ছড়িয়ে বসেছে। গাছের কাণ্ডে শরীর হেলানো। পাঁচটার ট্রেন চলে যাচ্ছে। আকাশ নীল এবং স্বচ্ছ। শরতের আকাশ। আজ জ্যোৎস্না উঠবে।

তখন মুকুল বলল, রুদ্রাক্ষ ধরা পড়ে গেছে।

রুদ্রাক্ষ মুকুলের ছদ্মনাম। সে নিজের নামে কবিতা লেখে। শহরের অনুষ্ঠান নিয়ে যে আলোচনার পাতা বরাদ্দ করা আছে সেটাও সে লেখে। ছদ্মনামে না লিখলে চলে না। অনুষ্ঠানের সমালোচনাও থাকতে পারে—সবাই সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, পথেঘাটে ধরে ধোলাই দিলে কে কাকে রক্ষা করবে ভেবেই মুকুল ছদ্মনামটি নিয়েছে। অপরূপার প্রথম সংখ্যায় শহরের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিন-চতুর্থাংশ জায়গা চৈতালির জন্য দিয়েছে। এতে চৈতালির খুশি হবার কথা—কোনো বিপাকেই পড়ার কথা নয়, তাছাড়া চৈতালি মুকুলের সঙ্গে কথা বলেছে, এরপর আর কী হুজ্জতি হতে পারে—ভেবে পেলাম না।

বললাম, কার কাছে?

—আর কার কাছে! ওর দিদিরা টের পেয়েছে ওটা আমি লিখেছি।

—খারাপ কিছু তো লেখনি!

—খারাপ লিখব কেন? চৈতালির খারাপ হয় এমন কিছু আমি লিখতে পারি? তুমিই বল!

—না কিছু বুঝছি না! চৈতালি তো তোমার কবিতার প্রশংসা করে গেছে। তুমিই বলেছ!

—না করেনি।

—তবে যে সেদিন বললে, চৈতালি কী খুশি!

—ওটা আমার ধারণা। জান, বিলু আজকাল আমার যে কী হয়েছে! মনে মনে যা ভাবি, সেটা কেন জানি মনে হয় সত্যি ঘটেছে। চৈতালি আসবে, ঠিক আশা করেছিলাম সে আলোচনা পড়ে খোঁজ করতে আসবে, কে লিখেছে?

—সমালোচনা পড়ে ও আসবে ভাবলে কী করে? না আসারই তো কথা।

—বুঝলে না, মনের উপর তো আমার হাত নেই। আমি ভাবলাম, ব্যস হয়ে গেল। মনে হল সত্যি সে এসেছে। আমার সঙ্গে কথা বলেছে। মুকুলদা তুমি কী সুন্দর কবিতা লিখেছ বলেছে। এই ভাবনাটাই আমার কাছে সত্যের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বলেছিলাম। জান সে আসেনি! জান বউদিকে ওর দিদিরা বলেছে, তোর বাঁদর দেওর এটা লিখছে। চৈতালিকে নিয়ে এত পাঁচ কাহন করার কী আছে। কী কারণ। কী সূত্র। বলবি আমি একদিন যাব। ধুইয়ে দিয়ে আসব। জীবনে ও আর চৈতালিকে নিয়ে যেন লিখতে সাহস না পায়। এ কী রে বাবা, নাক টিপলে দুধ গলবে, এখনই এই ভাষা—কী যাদু বাংলা গানে, চৈতালির সেই উচ্চকিত কণ্ঠ—যেন সেতারের মূর্ছনা, শেষ হয়েও

শেষ হয় না। যা অনন্ত, যা অসীম, চৈতালির গান শুনলে তা টের পাওয়া যায়। যেন আকাশ মাটি গাছপালা কীটপতঙ্গ সব স্তব্ধ। ঝড়ের পর প্রকৃতির সেই নিরুপম সৌন্দর্য তার সঙ্গীতে। এত কাব্য করা হয়েছে কেন! তোর রুদ্রাক্ষকে বলবি, আর যেন চৈতালিকে নিয়ে বাঁদরামি না করে!

—বউদি বলল!

—হ্যাঁ সেই তো। দাদাও জেনে গেছে।

—কী জেনে গেছে?

—আমি চৈতিকে নিয়ে একটু ইয়েতে আছি।

—এটাই আমাদের গেরো। যাকে ভালবাসি সেই কেমন শত্রুপক্ষ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে পরীর সম্পর্কটা ভালবাসার পর্যায়ে পড়ে না—বরং সবাই জানে, পরীকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। সংসারে আমরা উভয়ে উভয়ের চরম শত্রু। পরীর কোনো কাজই আমার পছন্দ নয়। বেহায়া বলে পরী মেশে!

ভাবলাম, সত্যি রুদ্রাক্ষ চৈতিকে নিয়ে একটু বেশি কাব্য করে ফেলেছে।

আমি বললাম, আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

—গিয়ে যদি দেখি বসে আছে!

—থাকুক বসে। বসে থাকল তো বয়ে গেল। ভালবাসা অন্যায় নয়। আমাদের ইচ্ছে আমরা ভালবাসব। ভালবাসা মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট তুমি জান?

—সে তো জানি।

—আমরা তো বলছি না, চৈতিকেও এজন্য তোমাকে ভালবাসতে হবে, কী বল? তুমি কখনও জোর খাটিয়েছ? আমাদের ইচ্ছে আমরা ভালবাসব। কার কি বলার আছে?

—কারও কিছু বলার নেই।

—তুমি বলেছ, আমি ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসতে হবে? না ভালবাসলে হুজ্জতি হবে? এমন তো দাবি করনি।

—না।

—তা হলে মামলা দাঁড় করাবে কার ভিত্তিতে?

—চৈতালির দিদিরা সব পারে। হেডমিসট্রেস বলে কথা।

—ভয় পেলে চলে না। এক কাজ করব?

—কী করতে চাও?

—প্রণবের মারফত কাজটা করা যায় না?

—না, না। ও করতে যেও না। হিতে বিপরীত হবে। ও করতে যাবে না। দাদা পর্যন্ত বলল!

—কী বলল?

—তোরা চৈতির পেছনে লেগেছিস! চৈতিকে না দেখলে আমাদের মন মানে না, সেজন্য যাওয়া। পেছনে লাগার কী হল!

—তুমিই বল বিলু, শুধু দেখি। আমরা শিস মারি না, মাস্তানি করি না, শুধু দেখি। চৈতিকে না দেখলে মনে হয় দিনটা মাঠে মারা গেল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দেবী চলে যাচ্ছেন। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ব চৈতির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে বলে।

মেয়েদের কলেজে এখনও অনার্স ক্লাস খোলা হয়নি। বাংলায় অনার্স নিতে হলে চৈতালিকে আমাদের কলেজেই ভর্তি হতে হবে। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার বাসনা তবে মুকুলের সেই জন্য। এক সঙ্গে ক্লাস, এক সঙ্গে বের হয়ে আসা; করিডোর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। নোট টুকে নেবার ছল করে, কথা বলার সুযোগ—এত সব ভেবে মুকুল বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়বে বলে ঠিক করেছে। আর সেই নিয়ে মুকুলের বাড়িতে ঝড় উঠে গেছে।

ক্রমে সাঁঝ নেমে এল। ইস্টিশনে আলো জ্বলছে। শহরের রাস্তায় আলো। আজ আর তবে দু বন্ধুতে সাইকেলে বালিরঘাটে জ্যোৎস্না দেখতে যাওয়া হল না। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে নেমে জ্যোৎস্নায় ডুবে

যাওয়া আমাদের বিলাস। আমি চুপ মেরে বসে থাকি, মুকুল গলা ছেড়ে গান ধরে—দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি। আমি তখন আর বিলু থাকি না, মুকুল তখন আর মুকুল থাকে না। এক রাজার পৃথিবী আমাদের সামনে। মাথায় উষ্ণীষ, এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম—পেছনে বসে আছে রাজকন্যা সংযুক্তা। পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করে পালাচ্ছে।

সব যুগেই এই পৃথ্বিরাজদের কপালে দুঃখ থাকে।

বললাম, এবারে ওঠো। আমাদের সাহসী হওয়া দরকার।

—তুমি বলছ সাহসী হতে?

—আলবত।

আমার মধ্যে মুকুল নুতন কিছু যেন আবিষ্কার করে মনমরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলল। আমি এভাবে কখনও কথা বলি না। কথা সব আমার মনের সঙ্গে। বাইরের লোক দেখলে ভাবে আমি এক বিষণ্ণ মানুষ। মুকুল নিজেও এ অনুযোগ করেছে বার বার। বিলু তুমি এত বিষণ্ণ থাক কেন? এত কম কথা বল কেন? আজ আমার মধ্যে সেই বিষণ্ণতা টের না পেয়ে সে অবাকই হয়ে গেছে। এ যেন অন্য এক বিলু তার সঙ্গে কথা বলছে। দারিদ্র্য বিলুকে তবে আর পঙ্গু করে রাখতে পারছে না। দুর্জয় সাহসের অধিকারী বিলু। বলল, বিলু পারবে ফেস করতে?

—দেখ পারি কি না?

মুকুল বলল, তুমি পারবে। চল। নো কম্প্রোমাইজ। যদি বলে, রুদ্রাক্ষ ছদ্মনাম তোমার? বলব, হ্যাঁ! যদি বলে তুমি চৈতিকে নিয়ে কাব্য করেছ? বলব, হ্যাঁ। যদি বলে চৈতিকে নিয়ে তোমার এত কাব্য করার বাসনা কেন? বলব হ্যাঁ, বাসনা থাকে। আপনারও ছিল। মাস্টারি করে করে সব হারিয়েছেন। বিয়ে থা করলেন না। সময়ে বিয়ে না করে পস্তালেন। চৈতির জীবন আমি নষ্ট হতে দেব না।

আমরা ফিরছি। মুকুলের আবেগ এসে গেছে। আমার বলার ইচ্ছে ছিল, এত বলার দরকার হবে না।

তার আগেই কাট।

হঠাৎ মুকুল থেমে গেল। —কী ব্যাপার বিলু তুমি কিছু বলছ না? যা বললাম, ঠিক বলিনি? মনের কথা ফস করে বেরিয়ে গেল—এত বলার দরকার হবে না। তার আগেই কাট।

—কাট মানে?

—চিত্রনাট্য দেখছিলাম। তাতে কাট কথাটার খুব ব্যবহার।

—চিত্রনাট্য দেখছিলে মানে?

—আরে সেদিন বিমল কলকাতা থেকে নাটকের কাগজ নিয়ে এল না।

বিমলই আমাদের মধ্যে একমাত্র নাটকের চর্চা করে। সে কলকাতায় গেলে নাটক সম্পর্কিত যত কাগজ পায় নিয়ে আসে। সেই আমার কাছে কাগজটা দেখার জন্য রেখে গিয়েছিল। কী সুন্দর ছাপা! পরিচ্ছন্ন কাগজ। আমাদের অপরূপার কোনো অঙ্গসজ্জা নেই। কাগজটার পাশে অপরূপা খুবই ম্যাড়মেড়ে। ইচ্ছে ছিল কাগজটা পরীকে দেখাব। পরী দেখলেই তার বাসনা হবে অপরূপাকেও সেভাবে সাজানো যায় কি না! কারণ কাগজটা তো আমাদের প্রাণ। কাগজের সম্পাদক আমি, কাগজের তিন-চতুর্থাংশের ইজ্জত আমার। আমার ইজ্জত বাড়লে পরী কেন জানি গর্ববোধ করে। কিন্তু একে একে এমন সব জটিলতা এসে জুটবে, কে জানত! যে-পরী কাগজের সব, তাকে নিয়েই বাড়িতে চরম অশান্তি।

পরীর দাদু যেতে বলেছে। মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়। কিন্তু মুকুল গেলে পরীর দাদু কিছু নাও বলতে পারেন। অবশ্য উপরে নিয়ে যেতে পারেন তিনি। মুকুলকে একা নিচে রেখে উপরে যাওয়া ঠিক শোভন হবে না। মুকুল বড় সেনসিটিভ। একা যেতেও ভয় করছে। এই ভয় থেকে মুকুলের কাছে চলে আসা। অথচ বলতে পারছি না, জান পরীর বিয়ে নিয়ে অশান্তি দেখা দিয়েছে। পরীর বিয়ে শুনলে, সবাই সটকে পড়বে।—বল কী! পরীর বিয়ে! কার সঙ্গে! পরী রাজি! পড়বে না! কলেজ করবে না! আমাদের কাগজের কী হবে!

আমার প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি করায় পরীর যাই ক্ষোভ থাকুক যতই ভয় দেখিয়ে যাক, তোমাদের

কাগজে পরী আর নেই—কিন্তু মুকুল প্রণব সুধীনবাবুরা জানে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পরীর সব ক্ষোভ জল হয়ে যাবে। ওরা বোঝে বিলুর চরিত্রে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা পরীর মতো মেয়েকেও ভাবায়। কাগজের আর্থিক দিকটায় কোনো জটিলতা দেখা দিলেই পরীর সামনে ওরা আমাকে ঠেলে দেয়।

সেই পরীর বিয়ে ঠিক, পরী রাজি নয়, পরীর চোখ বসে গেছে, যেন বড় একটা অসুখ থেকে উঠেছে দেখলে মনে হয়—আর সেই চিৎকার, দাদু জান না, তুমি জান না, ও আমার কত বড় শত্রু। সেই হাহাকারের ছবি চোখে ভেসে উঠলেই আমি স্থির থাকতে পারি না। রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। কাউকে বলতেও পারি না।

আমার বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে—বলি, পরী সত্যি আমি তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু। আমার শত্রুতার শেষ নেই।

বাবাঠাকুরের কাছে যাইনি, এও এক ধরনের শত্রুতা। সব দায়ভার আমার উপর অর্পণ করে বসে আছ, আমার উপর তোমার প্রবল বিশ্বাস—কথা যখন দিয়েছি বাবাঠাকুরের কাছে যাব। আমি না গিয়ে থাকতে পারব না। এখন বুঝতে পারছি এ যাওয়াটা আমার পক্ষে কত কঠিন। —আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

আমরা কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ হাঁটছিলাম। কথা বলছিলাম না। 'কাট' চিত্রনাট্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। পরিচালক তার কাহিনী বিন্যাস অনেকগুলো দৃশ্যে ভাগ করে নেয়। অর্থাৎ এক একটা শট তোলার পরই কাট। আমার কাছে 'কাট' এই শব্দটি অনেকভাবে এখন প্রযোজ্য। মনের মধ্যে 'কাট' রয়ে গেছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না—কথাগুলি পরী সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা থেকে মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। মুকুল বুঝল চৈতালি সম্পর্কে কোনো নুতন পন্থা মাথায় আমার এসেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, কী কাজ করলে হয় না বিলু?

আমি কী বলি!

এটা যে আমার নিজেরই সলিলকি বোঝাই কী করে! মুকুলের এমন সঙ্কট মুহূর্তে নিজের জটিলতা নিয়ে অস্থির হয়ে উঠছি তাও তো বলতে পারছি না। মুকুল তবে ভাববে বিলুটা বড় স্বার্থপর। সে নিজেকে ছাড়া কিছু ভাবে না। নিজের মান অপমান ক্ষোভ নিয়ে ব্যস্ত।

বললাম, না। মানে আমরা যদি এখন গিয়ে বলি, দেখুন আমরা সত্যি বাজে ছেলে নই। বাঁদর নই। কারণ আমরা এখন জ্যোৎস্নায় হেঁটে যেতে চাই। জ্যোৎস্না আমাদের চারপাশে এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। কত রকমের প্রজাপতি উড়ছে আমাদের চারপাশে। কত রকমের গাছ আমাদের ছায়া দেয়। আমরা তারই সৌন্দর্যে বিভোর। নারী আমাদের কাছে এখন দেবী ছাড়া কিছু নয়। সব তরুণীই আরাধ্যা দেবী। এখন আমাদের কোনো বাসনা নেই। বরং চৈতালির যে কোনো অপমান আমাদের অপমান। চৈতালিকে খাটো করলে আমরাই খাটো হয়ে যাব। রুদ্রাক্ষ চৈতালির সৌন্দর্যের পূজারী।

মুকুল অবাক হয়ে বলল, পারবে বলতে?

—পারব না কেন?

মুকুল সহসা যেন আলোর খোঁজ পেয়ে গেছে। ওর মধ্যে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছে কেউ। সে ঘুসি পাকিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল তার দুঃখ। সে বলল, পারতে হবে। হাতের তালুতে আর এক ঘুসি মেরে বলল, সত্যের বিনাশ নেই। বিলু আমাদের পারতেই হবে। কিছুতেই হেরে যাব না।

তারপর থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল কে জানে! সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমরা হেরে যাবার জন্য জন্মাইনি। আমরা হারব না।

সে আমার হাত তুলে ইস্তাহার দেখাবার মতো অথবা শ্লোগান দেবার মতো বলল, বল, আমরা হারব না, হারব না।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, আমরা হারব না, হারব না।

আবার সে বলল, আমরা ভয় পাব না, ভয় পাব না।

কিছুটা ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে ভেবে বললাম, ভয় পাবার কী আছে?

—না তবু বল হাত তুলে, বজ্রমুষ্টি তুলে বল, আমরা ভয় পাব না, ভয় পাব না।

পি ডব্লু ডি-র কোয়ার্টার্স থেকে ইস্টিশনের পথ অনেক দূরে। ক্রোশব্যাপী এই মাঠ— উত্তরে শহরের রাস্তা লালবাগের দিকে চলে গেছে। দক্ষিণে শহরের রাস্তা জেলের পাঁচিল ঘেঁসে মোহন সিনেমার পাশ দিয়ে ইস্টিশনের দিকে গেছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন কেউ শুনতে পাবে না। জ্যোৎস্নায় কিছু জীব এখনও মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো ধোপাদের গাধা। আমরা দুজন এবং কিছু গাধা বাদে, এই মাঠে অন্য কোনো প্রাণীর সাড়া নেই।

মুকুল আবার বলল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

আমি চুপ করে আছি দেখে বলল, বল, একসঙ্গে বল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

বুঝতে পারছি মুকুল কী সাংঘাতিক নার্ভাস ফিল করছে। এখন না বলেও উপায় নেই। এমন বন্ধু না থাকলে আমার ইস্কুলের মাস্টারিটাই হত না। মিলের টিউশনি করতে গিয়ে কী অপমানের বোঝা না বইতে হত!

ইস্কুলের মাস্টারিটা হয়ে যাওয়ায় কত বড় নিষ্কৃতি পরী যদি বুঝত।

আমি কিছু না বলায় মুকুল বোধহয় আহত হয়েছে। আমি যে আমার মধ্যে থাকি না, মানুষের চিন্তা ভাবনার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না, আমরা ভালবাসার শ্লোগান আমার মাথায় ঢোকেনি, ক্ষণিকের মধ্যে কত স্মৃতি ভিড় করে এসেছিল মুকুলকে বোঝাই কি করে?

বললাম, কী বলতে বলছ?

—বল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

দুজনে সমস্বরে বললাম, আমরা ভালবাসব, বাসব।

—আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

—কিসের অধিকার মুকুল?

—কেন ভালবাসার অধিকার।

—কাকে?

—চৈতালিকে।

আমি আর পারলাম না। বললাম, এ তো অর্জন করতে হয়। অধিকার অর্জন করতে হয়।

—কী করে করব বুঝতে পারছি না।

—আমিও ঠিক জানি না! তবে নিজেকে বড় করে তোলার মধ্যেই এই অর্জনের অধিকার জন্মায়। বড় অর্থে মুকুল আমি কৃতী হতে বলছি না, একজন গরিব মানুষও খুব বড় হতে পারেন—তাঁর চরিত্রই তাঁকে বড় করে। এত অধীর হলে চলবে কেন। নারীমহিমা সব মেয়েদের মধ্যেই আছে। বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে হ্যাংলামিটা একটু বেশি। চৈতালিকে নিয়ে আর একটি লাইনও নয়। এবার থেকে অন্য যারা আছে, তাদের কথা থাকবে। চৈতালিকে নিয়ে অপরূপায় আর একটি লাইনও নয়।

—তবে এত খাটাখাটনি কার জন্য?

—কেন নিজের জন্য!

—ধুস আমার বয়ে গেছে।

আমি বোঝালাম, শোন মুকুল, ভেবে দেখ—শহরে লীলা রত্না কম ভাল গায় না?

—ভাল গায়।

—সমর অধীরও জলসায় গায়।

—গায়।

—এরাই শহরের সব অনুষ্ঠানের মণি।

—চৈতালিকে বাদ দিচ্ছ কেন?

—চৈতালিও আছে। থাক না। একবার চৈতালিকে নিয়ে লেখা গেল, এবারে রত্নাকে নিয়ে। প্রফেশনাল জেলাসি বুঝলে না? তুমি রুদ্রাক্ষ একবার দয়া করে প্রমাণ কর, সব লেখাতেই তোমার কাব্য থাকে। আমি চাই কাব্যটা রত্নার বেলায় আর একটু বেশি থাকুক। আমরা খুবই নিরপেক্ষ এটা প্রমাণ করা দরকার।

—নিরপেক্ষ প্রমাণ করব, কাগজ কী আর বের হবে? ওর গলায় ভারী হতাশার সুর।

—কাগজ ঠিক বের হবে। কাগজ আমরা কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না। কাগজ আমাদের কাছে এখন মর্যাদার প্রশ্ন।

আমরা এসে গেছি। দেবদারু গাছের ছায়া পার হলেই ওদের কোয়ার্টার্সের সামনেকার বাগান। মুকুলের দাদার ফুলের শখ। জবা, জুঁই বেলফুলের গাছ। গাছগুলিতে বেলফুল ফুটেছে। জ্যোৎস্নায় গাছে খই হয়ে ফুটে আছে। বেলফুলের সুগন্ধে সারাটা বাগান ম ম করছে। মুকুল থমকে গেছে। বাগানে ঢুকছে না। আমাকে ঠেলে দিচ্ছে।

চৈতালির প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। তবু কেন জানি মনে হয় চৈতালি আমাদের সঙ্গে খুবই বেমানান—ঠিক যেমন পরী, সব সুন্দরী তরুণীরাই অন্য কারো জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে। আমরা ফালতু। যত নিজেদের ফালতু মনে হয় তত কাব্যচর্চার প্রতি কেন জানি অনুরাগ জন্মায়। মাথায় এই অনুরাগের ঠেলা খেলে অনেক সাহসী কাগজ বের করে ফেলতে পারি। আর পারি বলেই লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে গেলাম। চৈতালির দিদিকে পরোয়া করি না। দেখলাম, বউদি একা বসে কী একটা বই পড়ছে। চৈতালির দিদি নেই।

খুব সর্তক পায়ে ঢুকে বললাম, চলে গেছে?

—কে?

—মানে যে এসেছিল?

বউদি হাহা করে হেসে দিল। তোমরা ওকে এত ভয় পাও কেন বল তো?

—ভয়, না ভয় নয়। মানে—

—মানে আর বোঝাতে হবে না। বন্ধুটি কোথায়।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

—ডাক।

আমি ডাকলাম, মুকুল ভয় নেই। চলে এস।

মুকুল যেন কথাটার অর্থই ধরতে পারেনি—একেবারে তাজ্জব। সে বারান্দায় উঠে বলল, কে নেই! কার কথা বলছ!

—যার থাকবার কথা ছিল!

—তিনি কে? থাকলে আমার কী, না থাকলেই বা আমার কী। আমরা কারোর দাস নই।

বউদি শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়ালেন—বইয়ের ভাঁজে একটা কাগজ রেখে বললেন, তোমাদের কোকিলকণ্ঠী কলকাতায় চলে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবে। আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে গেল। বড়দার কাছে চিঠি লিখতে হল।

শুনে মুকুল আমি হতভম্ব।

মুকুল কখন ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেছে খেয়াল করিনি।

—চিঠি কেন?

—সুপারিশ।

বউদির বড়দা প্রেসিডেন্সিতে পড়ায় জানি। নিজের দাদা নয়। বউদির বড় পিসিমার ছেলে। এটা বউদি আমাদের অনেক সময়ই শুনিয়েছেন। বউদির সুপারিশ তাহলে দরকার হয়। আর বউদির দেবরটি বাঁদর! বাড়িতে বাপু সুপারিশ চাইতে আসা কেন! কীরকম রাগ এবং বিদ্বেষ জন্মাল—স্বার্থপর—আমরা যা করি তাই অপছন্দ। বললাম, তুমি চিঠি দিলে কেন?

বউদি আমার দিকে না তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, গেলে বাঁচি বাপু যা চলছে।

তবে কী বউদিও চায় চৈতালি শহর ছেড়ে চলে যাক। চৈতালি মুকুলের মাথাটি চিবোচ্ছে। চৈতালি মুকুলের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে ছাড়বে। সব পক্ষই সমান। বউদি বুঝল না, আমাদের এই ভালবাসা বেঁচে থাকার রসদ। কবিতা লেখার রসদ। মুকুলের সব অনুপ্রেরণা এই মেয়েটি। সে চলে গেলে মুকুল ভারী ভেঙে পড়তে পারে। দিনে অন্তত একবার যাকে না দেখলে দিনটা বিফলে গেল এমন মনে করে—তার পক্ষে চৈতালির শহর ছেড়ে যাওয়া বড়ই হতাশা সৃষ্টি করবে। কাগজের জন্য মুকুলের

খাটাখাটনি বৃথা মনে হবে। কাকে যে এখন চাঙ্গা করি। মুকুলকে না পরীকে। পরীকেও তো কথা দেওয়া আছে। না কোনোদিকে পথ পাচ্ছি না।

ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। আমাদের হয়ে কেউ ভাবে না। বউদিকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললাম, চৈতালি চলে গেলেও মুকুল যা ভেবেছে তাই করবে।

ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বউদি আমাকে দেখল। বলল, কী বললে?

—না মানে, ও তো বলছে বাংলায় অর্নাস নেবেই।

—নিক না। কে বারণ করেছে! আমরা আর কতদিন! বাবুর এখন পাখা গজিয়েছে। বাবুকে বলে দিও, জীবনটা এত সহজ নয়।

আসলে বউদি তো মুকুলকে ছোট থেকে বড় করেছে। সন্তান-স্নেহ। বুঝি সব। সবসময় ভয় জীবনটা না মাটি হয়ে যায়। দুর্ভাবনা। দুর্ভাবনা কেবল দেখছি আমার বাবারই নেই। যা কপালে লেখা আছে তা নাকি খণ্ডাবার ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই।

পরীর দাদুর অনুগ্রহ লাভে বাবা খুবই খুশি। শহরের এমন জাঁদরেল মানুষ বাবাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে এসেছেন, এটা বাবার ইহজীবনে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাঁরই ইচ্ছে সব। না হলে একজন ছিন্নমূল মানুষের শেকড় চালিয়ে দেবার সময় এতসব সৌভাগ্যলাভ হয় কী করে। শুধু কী নেমে আসা! বাড়ির সবাইকার খোঁজখবর নিয়েছেন। পিলু পড়াশোনা করছে কিনা জানতে চেয়েছেন। দু-এক বছর বাদে পিলুর যে একটা হিল্লে হয়ে যাবে বাবা পরীর দাদুর কথাবার্তায় এমনও অনুমান করে এসেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষে মাথার উপর এত বড় মানুষের কৃপাদৃষ্টি পড়বে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

ও-ঘর থেকে মুকুলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বউদি কখন এক কাপ চা, কিছু নোনতা বিস্কুট রেখে গেছে টেরই পাইনি। চোখ বুজে সোফায় গা এলিয়ে বসে আছি। আসলে মানুষ একসময় বড় হয় স্বপ্ন দেখতে দেখতে। স্বপ্নে সে রেলগাড়ি চালিয়ে দেয়। এক একটা ইস্টিশনে থামে, যাত্রী ওঠে, নেমে যায়, তারপর একসময় শেষ স্টেশনে গেলে, কেউ আর থাকে না। গাড়িটা আর সে। এখন আমি সেই রেলের চালক। বাবা-মা ভাইবোন নিয়ে রওনা হয়েছি —একটা নির্জন স্টেশনে কেউ দাঁড়িয়ে। তার আঁচল উড়ছে। নীল বাতির মতো জ্বলছে। সিগনালিং। গাড়িতে আর একজন উঠবে বলে স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে। তাকে এবার তুলে নাও।

বউদি ডাকল, এই বিলু চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! কার ধ্যানে মগ্ন হলে!

তাকালাম।

বউদি হাসল। বলল, বাবুকে ডাক।

চেয়ে দেখি টেবিলে দু-কাপ চা। ডাকলাম, এই মুকুল, এস। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি খাও।

—আরে এস। বাংলায় অর্নাস নিয়েই পড়বে। দাদা বউদি কিছু আর বলবে না!

সহসা মুকুল লাফ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, আমি কী নিয়ে পড়ব না পড়ব কাউকে ভাবতে হবে না। বলে চা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

বসে বসে চা-টুকু শেষ করলাম। পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা না করে গেলে বাবার অনুযোগ শুনতে হবে। বাবা বলবেন, আমি ঠিক তোমাদের বুঝতে পারি না। নামী মানুষকে সম্মান দিতে তোমরা শেখনি। সম্মান দেখালে কেউ ছোট হয়ে যায় না। নিজেকে নিজে ছোট না করলে, কেউ তাকে ছোট করতে পারে না। তোমাদের মতিগতি আমি ঠিক বুঝতে পারি না! কী ভাববে মানুষটা! ভাবতে পারে, তোমার বাবার সংসারে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা নেই। ভাবতে পারে, খবরটা আমি তোমাকে দিইনি। তোমার বাবার দায়িত্বজ্ঞান কম। এ-সবও তো তিনি ভাবতে পারেন। একবার দেখা করতে দোষ কোথায়।

চটপট উঠে পড়লাম। —না যাওয়া দরকার। আমার জন্য না হলেও বাবার সম্মানের কথা ভেবে যাওয়া দরকার। মুকুলের ঘরে ঢুকে বললাম, যাচ্ছি। নতুন কপি সব ঠিক করে রেখ। প্রেসে দিয়ে দেব।

মুকুল শুনল কী শুনল না বুঝলাম না। সে বলল, বউদি কী বলল? চৈতালির দিদি কেন এসেছিল? প্রেসিডেন্সিতে সত্যি ভর্তি হবে!

—সুপারিশ পত্র নিতে।

—কার জন্য সুপারিশ?

—চৈতালি সেনের হয়ে সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন বউদি!

—কার কাছে?

—প্রেসিডেন্সির তোমাদের সেই আত্মীয়ের কাছে।

—কেন? বউদি লিখতে গেল কেন?

—সে তুমি জিজ্ঞেস করগে।

চৈতালি সেন চলে গেলে এই শহরের জ্যোৎস্না মরে যাবে। চৈতালি সেন চলে গেলে, এই শহরে আর ফুল ফুটবে না। চৈতালি সেন চলে গেলে, লালদীঘির ধার, শহরের সদর রাস্তা, টাউন হল, সব নির্জন পরিত্যক্ত নগরী হয়ে যাবে। অন্তত একটা মানুষের কাছে এই শহর মৃতের শহর বলে মনে হবে। কথাটা বলি কী করে!

মুকুল চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, তুমি তবে বলবে না!

কী আর করি! কেমন অসহায় চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মুকুল, মনে হয় কিছুটা শুনেছে—সবটা শোনেনি। কিংবা সবটাই শুনেছে, আমার কাছে আবার জানতে চায় বউদির এটি ঠাট্টা কিনা। চৈতালি সেনকে নিয়ে বউদির ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। বললাম, চৈতালি সত্যি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

—আমাদের জন্য?

—কী জানি! আমরা তো শিস্‌ও দিইনি, টিজও করিনি। কেন যে চলে যাচ্ছে!

—ঠিক জান চলে যাচ্ছে?

—তাই তো বউদি বলল। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবে।

মুকুল মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা বিলু এক কাজ করলে হয় না?

—কী কাজ!

—আমি চৈতালি সেনের কাঁটা!

—তুমি কাঁটা হবে কেন!

—না হলে চলে যাবে কেন। ভাবছি আমিই বরং চলে যাব। এ শহরে চৈতালি না থাকলে শহরটা অর্থহীন হয়ে যাবে।

—কী আজেবাজে বকছ?

—আজেবাজে বকছি না। একটা শহর/বাঁচে, বেঁচে থাকে/ সেই নারী যবে হেঁটে যায় অকুস্থলে। কী কারণ জানি না/ বাঁচি না আমি/ আমার আত্মা খাঁচায় আছে জানি/ সেই আত্মার জন্য, নীল আকাশ চাই চাই ঘরবাড়ি/ বাড়ি আছে গাছ নাই, ফুল আছে পাখি নাই, নদী আছে জল নাই—সব শূন্য/অন্ধকারে ডুবে আছে গভীর নক্ষত্র।

মুকুল তার একটি প্রিয় কবিতা বলে শুয়ে পড়ল। পাশ ফিরে মুখ লুকাল।

আমি ওর পাশে বসলাম, বললাম, মুকুল চৈতালি না থাকুক আমরা তো আছি। ছেলেমানুষী করতে যেও না। তুমি চলে গেলে বালির ঘাটে গিয়ে আমার সঙ্গে কে তবে জ্যোৎস্না দেখবে। ভেবে দেখ তো সেই জ্যোৎস্না, বালিরঘাট, বাদশাহি সড়ক, বাঁশের সাঁকো কত কবিতার জন্মই না দিয়েছে। একা চৈতালি সেন সব কবিতার জন্ম দেয় না মুকুল! আমরাও আছি। তুমি না থাকলে আমি কত একা হয়ে যাব।

মুকুল কী ভেবে বলল, সারাটা দিন আমি ভাল ছিলাম না। দাদা বউদির সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একটা স্বার্থপর মেয়েকে না ভালবাসাই ভাল।

—এই তো চাই।

মুকুল উঠে বসল। দীর্ঘকায় মনে হচ্ছে মুকুলকে। ভরাট গাল, রেশমের মত নরম দাড়ি গালে,

একমাথা ঘন চুল ব্যাকব্রাশ করা, পাঞ্জাবি গায়ে গেরুয়া রঙের—বাহার যাকে বলে, এমন সুপুরুষ যেন আমার চোখে কমই ঠেকেছে। মুকুলের স্বভাব, আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবার জন্য ঘুসি পাকিয়ে কথা বলা—সে বলল, আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। আমরা দূরে যাবই। সেই বহুদূরে, যেখানে অচলা পার্বতী সব বিষপান করে শিবের সঙ্গিনী। সেখানে আমরা যাবই।

—আমাদের যেতেই হবে।

এই যেতেই হবে বলে বেরিয়ে পড়ার সময় বললাম, তাহলে বলে যাই।

—কী বলবে?

—বউদিকে বলে যাই তুমি ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়বে।

—আমার না হয় হল, তোমার কী হবে?

—কেন মাস্টারি করব। প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার। দারুণ। ভাবা যায় না। কোনো দায় নেই, শুধু পড়িয়ে খালাস। তারপর মুক্ত স্বাধীন। তারপর আমার সাইকেল, আর বাদশাহি সড়ক। তারপর, শহরে বিকেল নেমে আসবে, গাছপালার ছায়ায় আমি চলে আসব তোমার কাছে। তারপর আমরা যাব, ধোবিখানার মাঠে। সেখানে সবাই মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্যচর্চা। আর অপরূপা তো থাকলই। সে আমাদের সব। আর কিছু না পারি একটা কাগজকে ভালবাসা কম কথা নয়। কাগজ তো নয়, লিটল ম্যাগাজিন। সব নতুন কথা, নতুন খবর মানুষের ঠিকানায় পৌঁছে দেব। পুরনো সব ঝেড়ে ফেলতে হবে। নতুন জেনারেশন তৈরী হচ্ছে, আমাদের কাগজটা হবে তারই মুখপত্র। কোথাও বেঁচে না থাকতে পারি, কাগজটার মধ্যে অন্তত বেঁচে থাকতে পারব।

আসলে মুকুল বুঝতে পারছে, ওর ভেতরে যে ঝড় উঠেছিল তার প্রশমন হওয়ায় সে দারুণ খুশি। আমার আর কোনো সম্বল নেই—বাবার দীনেশবাবু আছেন, মানুকাকা আছেন, ইদানীং পরীর দাদু সম্বল হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মতো করে আমাকে দেখার পাশে কেউ নেই—একমাত্র মুকুল, মুকুল সেটা জানে, বোঝে। বোঝে বলেই আবেগের চোটে এত কথা বলে যাচ্ছি তা ধরতে পারি। এমনিতে আমি খুব কম কথা বলি, সাহিত্যচর্চার আসরেও একমাত্র মুকুল আর আমি এক সঙ্গে থাকলে কখন প্রগলভতা দেখা দেয়। মুকুল সব সময় মেনে নেয় আমার এই প্রগলভতা।

মুকুল বলল, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু মিমি তো মিছে বলেনি! ইস্কুলের মাস্টারি জামাইবাবুকে ধরপাকড় করে না দিলেই ভাল ছিল। সত্যি বোধহয় তোমার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিলাম।

হাহা করে হেসে ফেললাম—হেসে ফেললাম জোর করে। বিষয়টাকে উড়িয়ে দেবার অথবা হালকা করার আর কোনো পথ জানা ছিল না। বললাম, বাদ দাও মিমির কথা।

—কি বলছ! মিমি তোমার জন্য কত ভাবে! আর তুমি একথা বলছ!

—মিমি আর কদ্দিন!

—কেন, কদ্দিন মানে!

একটু রসিকতা করার প্রলোভনে, আসলে রসিকতা নয়, কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না প্রমাণ করার জন্য বলা, যদিদং হৃদয়ং মম...তারপর কী যেন ... আর সহসাই মনে হল এ কী ছলনা করছি নিজের সঙ্গে!

—তার মানে!

কোনো জবাব দিতে পারছি না। সব কেমন বিস্বাদ ঠেকছে। বললাম, ও কিছু না। যাই।

মুকুল আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য সাইকেল বের করছে। সে আমাকে রোজ রেল গুমটি পর্যন্ত রাতে এগিয়ে দিয়ে আসে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাইকেল বের করার আগে দরজায় উঁকি মেরে বললাম, বউদি যাই।

বউদির সেই কথা, সাবধানে যেও।

মুকুল বারান্দার নিচে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা পথ আমরা পাশাপাশি হাঁটব। দুজনের হাতে সাইকেল। কিছুটা পথ দুজনে সাইকেলে পাশপাশি, কিছুক্ষণ আবার গাছের ছায়ায় বসে থাকা কিংবা সাহেবদের কবরখানার কালভার্টে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হয় না। বাড়িতে মা-বাবা চিন্তা করে, পিলুটা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে—এ সবের টান না থাকলে আমি যেন ফেরার কথা

ভুলেই যেতাম।

সাইকেল বের করার সময় মুকুলই মনে করিয়ে দিল, বউদিকে বললে না!

—ওঃ ভুলেই গেছি। ও বউদি, বউদি শোনো।

বউদি বোধহয় মুকুলের ঘরের বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছিল—কিংবা বিছানার লণ্ডভণ্ড অবস্থা ঠিকঠাক করছিল—আসতে পারছে না —ঘর থেকেই বলল, এত চেঁচাচ্ছ কেন! বলতে পার না। আমি কালা না কিরে বাবা!

—বউদি, মুকুল ইকনমিক্স-এ অনার্স নেবে। দুজনে বসে অনেক আলোচনার পর এটাই ঠিক হল!

বউদির ভারী গম্ভীর গলা—সে বাবু যা ভাল বুঝবেন, করবেন। তোমরা যা ভাল বুঝবে করবে।

আসলে সংসারে যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, কী খাবে, পরবে সব ঠিক রাখে, তারই কোনো গুরুত্ব নেই। দু'বছরের মধ্যে কোথাকার এক বিলু এসে মাথার উপর বসে গেছে।

বউদির অভিমানটা কোথায় টের পাই। বউদি কী জানে না—একটা বয়সে মা-বাবা, ভাইবোন, একটা বয়সে সমবয়সী বন্ধুবান্ধব, আর একটা বয়সে চৈতালি সেন। চৈতালি সেন এলেই জীবনের একটা মহৎ পর্ব শেষ। এই পর্বটার কথা মানুষ কোথাও গিয়ে ভুলতে পারে না—এই পর্বটা বড় রহস্যময়, এই পর্বটা আছে বলেই পৃথিবীটা মানুষের কছে চিরদিন বেঁচে থাকার কথা বলে। সে যখন সব হারায়, তার এই পর্বটা, নদীর পারে কোন দূরবর্তী খেয়ার মতো থেকে যায়।

বউদির কোথায় লেগেছে বুঝি! বউদির ধারণা, আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে মত পাল্টেছি। আসলে তো অন্য ব্যাপার। চৈতালি কলকাতায় চলে গেলে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার আর কোনো মানে থাকছে না। আসল কারণ সেটাই। কিন্তু এসব কথা তো আর বউদিকে বলা যায় না।

রাস্তায় নেমে আসতেই শরতের এক আকাশ নক্ষত্র আর জ্যোৎস্না ঝপ করে মাথার উপর নেমে এল। লালদীঘির ধারে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। কত রকম ফ্যাশানের বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। শৌখিন মানুষেরা এখানে থাকে। জানালায় লাল নীল রঙের পর্দা। ভিতরে নিয়ন আলো। কোনো জানালায় সদ্য যুবতী হবে বলে বসে আছে মেয়ের মেঘলা করুণ মুখ। সবই আমাদের চোখে পড়ে। বিশাল দীঘির জল নিস্তরঙ্গ। নির্জন জ্যোৎস্না সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমরা দুই সদ্য যুবক হয়ে-ওঠা পুরুষ চারপাশে নারী অন্বেষণে থাকি। স্বপ্নে তারা আসে। কখনও কোনো ফুলের উপত্যকায় হাত ধরে নিয়ে যায়। সহবাসের হাহাকার ভেতরে। এই হাহাকার নারীকে অপার মহিমায় আমাদের কাছে সাজিয়ে তুলছেন এক অদৃশ্য শক্তি—যেতে যেতে টের পাই। আমাদের যা কিছু আমাদের বড় হওয়া তারই জন্য এমন মনে হয়। যে-পথে সে হাঁটে বড় পবিত্র মনে হয়।

তখনই মুকুল বলল, যেখানেই যাক ছাড়া পাবে না। আমরা তাকে ছাড়ব না! তাকে ভালবাসবই।

কার সম্পর্কে মুকুলের এই ক্ষোভ বুঝি। সব কথাতেই মুকুল আমি না বলে আমরা বলে। আমরা যেন একটা কোড। আমরা অর্থাৎ এই যারা আমাদের মতো বয়সী মানুষেরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে চৈতালি সেনদের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই।

'আমরা' আরও নতুন অর্থ বয়ে আনে আমাদের কাছে। আমরা চৈতালি সেনকে ভালবাসব। এই 'আমরা' অর্থে আমি এবং মুকুল। মুকুল মাঝে মাঝেই বলবে চৈতালিকে আমরা দুজনেই ভালবাসব। কী বল! যেন চৈতালির মতো মেয়ের পক্ষে একজনের ভালবাসা যথেষ্ট নয়। তার জন্য দুজন পুরুষ দরকার।

ঠাট্টা করে বলতাম, কিন্তু এক ঘরে দুজনে ঢুকব কী করে?

—কেন, দ্রৌপদী যদি পঞ্চপাণ্ডব সামলাতে পারে, চৈতালি আমাদের দুজনকে সামলাতে পারবে না।

—পারবে তবে অসুবিধা আছে।

—না কোনো অসুবিধা নেই। তোমার জুতো দেখলেই বুঝব, ঘরের ভেতর তুমি আছ। আমার দেখলে বুঝবে আমি আছি।

—তা হলে বলছ, দু-রকমের দু জোড়া।

—তাই। তবে আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। কী ঠিক বলিনি।

—ঠিক না বলে আমার উপায় থাকে না। যে মেয়ে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে , তার জন্য দু জোড়া কেন, পাঁচ জোড়া থাকলেও অসুবিধা হবার কথা না

মুকুল ভারী তৃপ্তি পেত এমন সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা করে। পুরুষের কাছে মেয়েদের এই নারীমহিমার কথা চৈতালির দিদিরা টেরই পেল না। আইবুড়ো হয়ে থাকল—কিসের অপেক্ষাতে আমাদের মাথায় সেটা কিছুতেই আসে না।

লালদীঘির পাড় ধরে আমরা হেঁটে যাই। কিছু মানুষজনের চলাফেরা, একটা রিকশা চলে গেল, আমরা এত অন্যমনস্ক থাকি যে রাস্তাটার ধার ধরে হাঁটতে হয়। সাইকেলে উঠি না। সাইকেলে উঠলেই রাস্তাটা কেমন খুব ছোট হয়ে যায়। যেন উঠতে না উঠতেই রাস্তা শেষ। শহর থেকে রেল-লাইনের দিকে যে রাস্তা গেছে, সেখানে এলে আমরা সাইকেলে চাপি। ধীরে ধীরে, হাওয়া খেতে খেতে এগোনো। আসলে বুঝতে পারি, বাড়ি গেলেই কেন জানি একা হয়ে যাই। কারো পাশে থাকার কথা যেন। সে না থাকায় অর্থহীন মনে হয় সব কিছু।

বাড়ি যেতেই দেখলাম পিলু দৌড়ে আসছে। পিলু দৌড়ে এলেই বুঝি, বাড়িতে আমাদের জন্য কেউ সুখবর বয়ে এনেছে। খবরটা আগে পিলু দিতে না পারলে শান্তি পায় না। কতক্ষণে দাদাকে বলবে, জানিস দাদা, আজ না.....।

পিলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দাদা আজ না....

—আজ কি?

—আজ না, মিমিদির দাদু এসেছিল।

বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। আমার যাবার কথা ছিল, যাইনি বলে নিজেই হাজির! পরীর কিছু হয়নি তো! শহরের এতবড় মানী মানুষ, এমন একটা জঙ্গলের মধ্যে হাজির হয়েছিল!

বললাম, কেন এসেছিল? পরী পাঠিয়েছে?

—পরীদি পাঠাবে কেন? পরীদি কিছু জানেই না। বাবাকে বলল, দশ কান করবেন না। চেষ্টা করছি, মনে হয় হয়ে যাবে।

সাইকেল থেকে নামতে লণ্ঠনের আলোয় বারান্দায় বাবাকে দেখা গেল। মা পাশে বসে আছে। দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পুত্রের ফেরার আশায় থাকতে কোনোদিন দেখিনি। বাবাকে মা তালপাতার পাখায় হাওয়া করছে।

বুঝতে পারছি, আমাদের পরিবারের পক্ষে বড়ই সুখবর কেউ দিয়ে গেছে আজ। মা বাবা সবাই বড় বেশি প্রসন্ন। আমাকে দেখেই বাবা বলবেন, সাইকেলটা রেখে বিশ্রাম কর। পিলু তোর দাদার সাইকেলটা তুলে রাখ। মায়া যা, দাদাকে এক বালতি হাতমুখ ধোবার জল এনে দে।

বারান্দায় একটা জলচৌকি, কাঠের চেয়ার। মার তাগাদাতেই এসব করা। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর আরও কত কাজ বাকি থাকে বাবাকে দেখে বুঝতে পারছি। যজন-যাজনে সংসার চলে, যজমানরা কেউ কেউ বেশ সচ্ছল। শুভদিন, শুভযাত্রা, পূজা-আর্চ্চার বিধি এসব জানতে তারা আসে। বসতে দেবার কিছু না থাকলে ঘরবাড়ির সুনাম নষ্ট। মা লেগে থেকে হালে এ দুটো মূল্যবান জিনিস মিস্ত্রি লাগিয়ে করে নিয়েছে। প্রতিবেশীদের কার বাড়িতে কী নতুন জিনিস এল মার কানে পিলু তুলবেই। কিংবা বিকালে মা এর-ওর বাড়ি গেলে দেখতে পায় বালতি, পেতলের হাঁড়ি। কবে কিনলি আকাশীর মা। সের দুই চালের খিচুড়ি ধরবে। মার কাছে পেতলের ডেগ, পেতলের বালতি, পেতলের ঘটি সোনার চেয়েও দামী। বাড়ি ফিরে অপ্রসন্ন মুখে শুধু অভিযোগ, কিছু নেই, এই যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আসছে, একটা পেতলের ডেগ লাগে না। চেয়ে চিনতে কাহাতক আনা যায়। বাবা তখনই বুঝতে পারেন হয়ে গেল, কিনে না আনা পর্যন্ত সময়ে অসময়ে মার চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে যাবে।

আজ অন্যরকম। জলচৌকিতে বসতেই বাবা বললেন, ঈশ্বরের করুণাই সব। তাঁর কী মর্জি কেউ বুঝতে পারে না।

বাবা আমাকে কিছু বলবেন, তারই প্রস্তুতিতে এসব ভাষণ। আমি চুপচাপ আছি। পরীর দাদু কেন এসেছিল, জানার যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বড়লোকদের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই। মনে হয় এই অর্থ প্রতিপত্তির পেছনে বড় রকমের কোনো অনাচার কাজ করছে। এঁরা সাধু পুরুষ নন।

মানুষ তার পরিশ্রমের বিনিময়ে কতটা উপার্জন করতে পারে আমি বুঝি। পরীদের যা বৈভব, তা রক্ষা করতে কোথাও কারও চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে না, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। শহরের রাস্তাঘাট ধরে যাবার সময় বিশাল বিশাল বাড়িঘর দেখলেও এটা মনে হয়। এরা কেউ সৎভাবে বেঁচে নেই। সৎভাবে একজন মানুষের উপার্জন এত প্রাচুর্য এনে দেয় না—এটা আমার বিশ্বাস। পরীদের বাড়ি গেলে এটা আমার আরও বেশি মনে হয়। দাবার কূট চালে এরা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ঘোড়া হাতি সব কেড়ে নিয়েছেন। সেই মানুষ আমাদের কলোনিতে এলে, বাবার গর্ব বোধ হতে পারে, আমার কেন জানি হয় না। বাবার প্রচণ্ড ঈশ্বর বিশ্বাসও মাঝে মাঝে আমাকে ক্ষোভের শিকার করে তোলে। ভেতরে চটে যাই—বাবা কষ্ট পাবেন বলে কিছু প্রকাশ করি না। যতটা পারি কম কথা বলি। হ্যাঁ হুঁ—এই পর্যন্ত।

মায়া বারান্দার নিচে এক বালতি জল রেখে ঘরে গামছা আনতে গেল। চিরদিনই কিছুটা গম্ভীর এবং কম কথার মানুষ আমি। বাবার জন্যই যেন এটা হয়েছে আমার। আমার বাবা একজন অপরিচিত মানুষের কাছে যে ভাবে ঘরবাড়ির কথা খোলাখুলি বলে দেন—আমার তা পছন্দ নয়। আমার সম্পর্কেই তাঁর বেশি গৌরব। এই যে বিলুটা আই এ পাশ করল সোজা কথা! আই এ পাশ করলে সরকারি কাজ পাবেই। পাবে না মানে—প্রাথমিক ইস্কুলের মাস্টারি বেশিদিন করবে না। ঠেকা দেওয়া, চেষ্টা-চরিত্র চলছে, মানুও চেষ্টা-চরিত্র করছে। লোকের কাছে এমন শুনলেই আমার মাথা আর ঠিক রাখতে পারতাম না। —রাখেন তো আপনার মানু! তিনি আমাকে বাসের কনডাকটার করতে পারলেন না এটাই তাঁর জ্বালা! আমি সব বুঝি বাবা। নিজের ছেলেগুলো সব চোর বাটপাড় হচ্ছে, আপনার ছেলের ভাল তিনি চাইবেন কেন! না হলে একটা গ্যারেজে আমাকে ঢোকায়!

এ-সব কথাবার্তা রাতে খেতে বসলেই বেশি হয়।

বাবা বলতেন, মানু কী জানত গোবিন্দ তোকে মারধর করবে।

—গ্যারেজে কী হয় আপনি জানেন না বাবা! আর বাবাকে তো বলাও যায় না, কত রকমের কুৎসিত কথাবার্তা হয়। আমাকে যার তার বাচ্চা বলে গাল দেয়। বাবাকে এইসব খিস্তিখাস্তার কথা বলতেও পারি না, অথচ বাবার মানুপ্রীতি আমার মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার করে। সেই জ্বালায় দেশান্তরী হয়েছিলাম। ভাগ্যিস ছোড়দি ছিল! না হলে হয়ত এ-জীবনে আর ফেরাই হত না, পড়াও হত না, পরীর সঙ্গে দেখাও হত না।

বাবার এই এক স্বভাব, কারো কাছে এতটুকু উপকার পেলে বর্তে যান। আমরা ছিন্নমূল হবার পর নানা জায়গায় ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত বাবার খুবই নিকট আত্মীয় মানুকাকার বাসায় এসে উঠেছিলাম। চার-পাঁচ বছর আগে বাবা এই উঠতে পারার কৃতজ্ঞতায়, এখনও এক কথা, মানুটা না থাকলে কী যে হত!

—দোষ নেই। গুণই বা কী আছে। ক্যাম্পে যান দাদা—ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে দিচ্ছি। সোনার হারটা বন্ধক ছিল, সেটা নাকি সুদেই উশুল হয়ে গেল। দু-ভরির হার। ভাগ্যিস আর তোমার ভাইয়ের বুদ্ধিতে পড়িনি। সব বিক্রি করে এই জমি। থাকলে আমাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত।

বাবার তখন আপ্তবাক্য—কেউ কাউকে সর্বস্বান্ত করতে পারে না ধনবউ। নিজে সর্বস্বান্ত না হলে, কেউ কাউকে সর্বস্বান্ত করতে পারে না।

এখন আর বাবার সেই চরম আপ্তবাক্যটি আমাদের শুনতে হয় না। নতুন নতুন আপ্তবাক্য বাবা এখন ঝোলায় সংগ্রহ করে রাখছেন।

একদিন কী কারণে মা'র ক্ষোভ বাবার উপরে চরমে উঠলে, কেঁদে ফেলেছিল মা—তোমার মানুভাই, বুঝলে তোমার পরম আত্মীয় আমার দু-ভরির হারটি বন্ধকই দেয়নি। তুমি ফুসলালে বলে দিয়েছিলাম। তুমিই তো বললে,—মানুর বাসায় উঠেছি, একা এতগুলি পেট চালাবে কী করে, কিছু থাকলে দাও। ওর হাতে দিই। বন্ধক দিয়ে কিছু যদি মেলে। ও টাকাটা ওকে হাতে ধরে দিতে পারলে, সময় পাওয়া যাবে—ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমরা জানতাম, মা'র স্বর্ণালঙ্কার নেই। ইস্টিশনে পড়ে থেকেছি, ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি, দু-একটা অলঙ্কার যে মা বাবার হাতে তুলে দেয়নি অন্ন সংস্থানের জন্য তা নয়, তবে মা দিয়েই

বলত, আর কিছু নেই। এই নেই নেই করেও মা তার শেষ সম্বল বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল এই জঙ্গলের মধ্যে জমি কেনার জন্য। তার আগে মা'র দু-ভরির হারটি মানুকাকা সুদের নাম করে গস্ত করেছে। মানুকাকার বাড়িতে গিয়ে মা একদিন দেখে এসেছে হারটি কাকিমার গলায় শোভা পাচ্ছে।

এখন আবার পরীর দাদু হাজির। তাঁর কী মর্জি বুঝতে পারছি না। তিনি কেন এই কলোনিতে হাজির বুঝতে পারছি না। আমাকে তাঁর এত কী দরকার, যে কারণে এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। হাতমুখ ধুয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছি রান্নাঘরে—মা থালা সাজিয়ে দিচ্ছে, মায়া পাতে পাতে নুন দিচ্ছে, জল দিচ্ছে, বাবা গণ্ডুষ করছেন, আমি পিলু গণ্ডুষ করছি—অথচ কেউ কোনো কথা বলছি না।

বোধহয় বাবা পরীর দাদুর আগমনবার্তাটি আমাকে কীভাবে দেবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

বাবা খাচ্ছেন। গাছার উপর একটা কুপি জ্বলছে। শেয়াল ডাকছিল। কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। মা ভারী প্রসন্ন—বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবাই বলবেন বোধহয় এমন ঠিক হয়ে আছে। পিলু যে পিলু রাস্তায় গিয়ে রায়বাহাদুরের আগমনবার্তাটি দিয়েছিল সেও চুপ।

বাবা ভাত থেকে একটি ধান বেছে থালার বাইরে ফেলে দেবার সময় বললেন, বুঝলে মানুষই মানুষের সম্বল।

আমি জানি, কিছু না বললেও বাবা তাঁর কথা বলে যাবেন।

—বুঝলে, শুধু মানুষ হবে কেন, এই যে কীটপতঙ্গ, প্রাণিজগৎ, গাছপালা, মাটি জল হাওয়া সবই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য। তাঁরই অশেষ করুণা না থাকলে, রায়বাহাদুরের মতো মানুষ তোমাদের ঘরবাড়িতে আসবেন কেন!

বাবা তাঁর ঘরবাড়ি বানাবার পর, কোনো বিশিষ্ট মানুষ এলে খুবই খুশি হন। যেন বলা, দেখ এই যে ঘরবাড়ি বানিয়েছি, ও শুধু তোমার আমার আশ্রয় নয়—ঘরবাড়ির সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নও থাকে। মানুষজন এলে সেটা বাড়ে।

বাবা কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলছেন ঠিক যেন এখন বুঝতে পারছি না। পরীর সঙ্গে একবার বাদশাহি সড়ক দিয়ে জিপে এস ডি ও পরেশচন্দ্র আমাদের বাড়ি হেঁটে এসেছিল—একটা ম্যানাস্ক্রিপ্টের প্যাকেট দিয়ে পরী পাঠিয়েছে। এস ডি ও সাহেব আমাদের বাড়ি আসায় বাড়িঘরের মর্যাদা বাবার কাছে কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, টের পেয়েছিলাম পরে। নিবারণ দাসের সঙ্গে দেখা, কী বিলু, তোমাদের বাড়িতে নাকি সদরের এস ডি ও এসেছিলেন।

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

জীবন পরানের সঙ্গে দেখা, তাদেরও এক কথা।

কলোনির ঘরে ঘরে বাবা খবরটা পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। আসলে তাঁর পুত্রগৌরব কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সেটাই প্রমাণ করার উদ্দেশ্য। নরেশমামা পর্যন্ত তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন শুনে। তিনি নিজে একটা মেয়েদের প্রাথমিক ইস্কুল খুলেছেন, তাঁর অনুমোদন যদি এস ডি ও সাহেবকে ধরে করিয়ে দিই—এই মানুষটির প্রতি কেন জানি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। পরীকে কথাটা বলতেই, সে বলেছিল হবে। এবং হয়েও গেছে।

বাবা ফের বললেন, তোমার তাঁর কাছে যাবার কথা, তুমি গেলে না। তোমাদের মান-সম্মান বড়ই ঠুনকো। বড়লোক কেউ এমনিতে হয় না। ভিতরে কিছু না থাকলে অত উপরে ওঠা যায় না। পূর্বজন্মের পুণ্যফল। তুমি গেলে ছোট হয়ে যেতে না। তিনি যে এলেন তাতেও তিনি ছোট হয়ে যাননি। তোমার প্রতি তাঁর কত আগ্রহ যদি বুঝতে! তোমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।

আগ্রহ থাকারই কথা। পরীর দাদুর এখন মহাসঙ্কট। তিনি পরী ছাড়া সংসারে কিছু বোঝেন না। পরীর বাবা রেলে খুবই বড় কাজ করেন। এখন মোকামাঘাটে আছেন। পরীর মাও সেখানে। রেলে খুবই বড় কাজ করলে, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। পরী সেজন্য দাদুর কাছেই মানুষ। পরীর মাকে একবারই দেখেছি কালীবাড়িতে। পরীর বাবাও গিয়েছিলেন। রায়বাহাদুর মানুষটি পূজা উপলক্ষে বাড়ির ছেলেরা প্রবাস থেকে ফিরলে বাবাঠাকুরের কাছে সবাইকে নিয়ে যান। সেই উপলক্ষেই দেখা।

বাবা বললেন, আই এ পাশ করে তুমি মাস্টারি করছ—এতে নাকি কোনো উন্নতি নেই?

আমি বললাম, কী বলেছে বলুন না। কারণ ধৈর্য রক্ষা করতে পারছি না।

বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন।

—খুবই সুখবর। ঠাকুর চোখ তুলে তাকিয়েছেন।

সুখবরটা কী বুঝতে পারছি না। পিলুর দিকে তাকিয়ে আছি সে যদি সুখবর দুম করে দিয়ে দেয়। কিন্তু পিলু এতবড় সুখবর দিতে সাহস পাচ্ছে না কেন বুঝি না। রায়বাহাদুরের সঙ্গে বাবার কথাবার্তার সময় পিলু কাছে থাকবে না, হয় না।

বাবার দাঁতের ফাঁকে কুমড়োর ডাঁটার ছিবড়ে ঢুকে গেছে। বাবা এখন যা, দু-আঙুলে বের করার চেষ্টা করছেন। খুবই উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন, আবার কোথাও একটা যেন গলায় কাঁটা ফুটে আছে। সুখবর অথচ বাবার এহেন অবস্থায় আমি কিছুটা বিপাকে। ধৈর্য রাখা গেল না। পাত থেকে উঠে পড়লাম। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বাবার সুখবরের প্রত্যাশায় কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়।

বাবা খুব নিরুত্তাপ গলায় বললেন, বোস।

আবার বসে পড়তে হল।

—রায়বাহাদুর একটা চিঠি টাইপ করিয়ে রাখবেন। তুমি কাল গিয়ে সই করে দিয়ে এস।

—কী চিঠি!

—রেলে তোমার চাকরি। বললেন, বিলু ইস্কুলের মাস্টারি কী করবে! খুবই ধীর স্থির ছেলে। বিচারবুদ্ধি আছে। ঠিক জায়গায় পড়লে চড়চড় করে উন্নতি।

—রেলে চাকরি!

—তাই। বললেন, দরখাস্তটা তিনি তাঁর বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। রেলের হোমরাচোমরা হতে তোমার সময় লাগবে না।

বাবার ধারণা, পরীর বাবা রেলের হোমরাচোমরা এবং আমারও সেই সম্ভাবনা যখন আছে, তাছাড়া এমন মন্তব্য পরীর দাদু যখন করে গেছেন—তখন আমরা পরীদের প্রায় সমপর্যায়ের। বাবার গৌরব রাখার দেখছি এখন জায়গা নেই।

বাবা বললেন, সবই গ্রহরাজের কৃপা বুঝলে। গ্রহরাজ প্রসন্ন থাকলে কেউ আটকাতে পারে না। গ্রহের ফেরে আমরা এতদিন দারিদ্র্য ভোগ করছি। গ্রহ প্রসন্ন, সুতরাং আমাদের সুদিন সমাগত। বাবা যেন পারলে এমনও বলতেন।

খবরটা আমার খুবই সুখবর সন্দেহ নেই। এতটা আশা করতে পারিনি। পরী তবে সত্যি আমার জন্য ভাবে। পরেশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ ঠিক, পরীর মত নেই বলে শুভ কাজ হচ্ছে না, আমার উপর দায় ছিল, বাবাঠাকুরকে ধরে বিয়ে ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করা—কিন্তু বাবাঠাকুরের কাছে আমার যাও-য়াই হয়নি, এসব সত্ত্বেও পরী আমার জন্য ভাবে, তার সঙ্গে আমার যত বিরোধ ইস্কুলের মাস্টারি নিয়ে, সে চায় না, চায় না বললেই তো হবে না—অন্য কিছু একটা বন্দোবস্ত না করলে বাবার সংসারই বা চলবে কী করে। পরী এত বোঝে। অথচ পরীকে অপমান করার চেয়ে বড় সুখ আর আমার কিছু নেই।

—বিলু এ লেখাটা দেখ ছাপা যায় কি না। ভদ্রলোক বলেছেন, একটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দেবেন।

—রেখে যাও। দেখব।

—না রেখে যাব না। তোমাকে কথা দিতে হবে বিলু।

—কথা দেওয়া যাবে না। পাঠ্য হতে হবে। অপাঠ্য হলে কী করে ছাপব? দয়া করে তোমার আমাদের কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ না করলেও চলবে। বিজ্ঞাপনের জন্যে কাগজে ছাই-পাঁশ ছাপতে আমি রাজি না।

পরী সহসা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেই কেন জানি আমি আরও বেশি মজা পাই।

পরীর তখন এক কথা, আমি বেহায়া বলে আসি। অন্য মেয়ে হলে তোমার মুখ দর্শন করত না। স্বার্থপর।

—কে আসতে বলেছে! তুমি না থাকলেও কাগজ ঠিক চালাব।

আমি জানি পরী না থাকলে কাগজ চালাবার মুরোদ আমাদের থাকবে না। কিন্তু পরীর কাছে আর সবই করতে রাজি কিন্তু খাটো হতে রাজি না। আসলে এদেশে আসার পর সচ্ছল পরিবারের প্রতি আমার কেন জানি বড় রাগ জন্মে গেছে। বড়লোক হলে তো কথাই নেই। পরী আমাদের ঠেকে ভিড়ে যেতেই, হাতের কাছে একটা চরম সুযোগ পাওয়া গেছে যেন। পরী কী বোঝে কে জানে, মাঝে মাঝে একা থাকলে, বিরোধের সময় চোখ জলে ভেসে যায়। আর পরী এটা জানে, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু চোখে জল সহ্য করতে পারি না। তখন পরী যা বলবে, আমি গোলামের মতো সব করে যাব। পরীর কথাই শেষ কথা।

নিজেকে বড়ই অকৃতজ্ঞ ঠেকছে। পরী এত করছে। অথচ আমি একবার বাবাঠাকুরের কাছে গেলাম না। আমি গেলে তিনি বালকের মতো চঞ্চল হয়ে পড়বেন জানি। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে, ওরে বদরি, ও বউমা, দেখ বিলু এসেছে। আমার দিকে তাকিয়ে হয় তো বলবেন, এই ছোঁড়া না বলে না কয়ে ভেগে গেলি। বেটা লক্ষ্মীকে ভজাতে চেয়েছিলি—লক্ষ্মী ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। কিছুই মুখে আটকায় না। আর এ সময় যদি পায়ে গড় হই, বলি বাবাঠাকুর পরী আমাকে পাঠিয়েছে। অবশ্য পরী বললে তিনি চিনবেন না, সুতরাং বলতে হবে, বাবাঠাকুর মৃন্ময়ী আমাকে পাঠিয়েছে। পরীর দাদু আপনার অনুমতি নিতে আসবে বাবাঠাকুর। আপনি অনুমতি না দিলে মিমিদের সংসারে কুটোগাছটি নড়ে না, বাবাঠাকুর আপনি অনুমতি দেবেন না, বাবাঠাকুর মিমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে বিয়ের কথা ভেবে। পরীর বিয়ে হয়ে গেলে, কোথায় এস. ডি ও সাহেব বদলি হয়ে যাবেন, আমরা পরীকে আর দেখতে পাব না, পরী আমাদের দেখতে পাবে না—পরীর কষ্ট, পড়া ছেড়ে দিতে হবে—পরীর কষ্ট, সে মিছিল করতে পারবে না, নাটক করতে পারবে না, পরী না থাকলে আমাদের অপরূপা কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের কবিতা ছাপবার জায়গা থাকবে না। কবিতা ছাপা না হলে আমরা কী নিয়ে থাকব। কী নিয়ে বাঁচব। এসব যে কতবার ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে রাত কাবার করে দিয়েছি, ঘুম আসেনি। পরী আমি সমবয়সী, পরী কেন বোঝে না, আমার পক্ষে এমন কথা শোভন নয়। বাবাঠাকুর বলতেই পারেন, তুই ক্যারে, ভাগ। ওর দাদু ভাল বোঝে, না তুই ভাল বুঝিস। মিমির বিয়ে হবে কি হবে না, সে ঠিক করবে ওর বাবা কাকারা। তোর কথায় আমি বলব! আমি একটা চ্যাংড়া ভেবেছিস। বের হ। এই বদরি শোন, বিলু কী বলছে! মিমির নাকি ইচ্ছে নয় বিয়েতে বসার। মিমির ইচ্ছে অনিচ্ছে কি। বাবা-মার ইচ্ছে অনিচ্ছেই সব। এ কি অনাসৃষ্টি কথা! তুই দেখছি মিমির সর্বনাশ করতে চাস্। তুই মিমির ঘোর শত্রু। ভাগ ভাগ! পরেশচন্দ্র রত্ন বিশেষ।

সবার কাছেই পরেশচন্দ্র রত্ন বিশেষ। আমার বাবার কাছেও। এইটুকুন ছেলে সদরের এস.ডি ও। ত্রিশও হয়নি মনে হয়। কী সৌম্য আচরণ!

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, কী সৌম্য আচরণ দেখলেন। আপনার সঙ্গে তো কথাই হয়নি।

—তোমার সঙ্গে কথা বলার ধরন দেখে বুঝেছি।

পিলু তখন বলল, বাবা, দাদা রেলে কী চাকরি করবে?

—শিক্ষানবিসীর কাজ। ট্র্যাফিক ইনসপেক্টর হয়ে যাবে পরে—এরকমই কী যেন বলল। ইস্কুলের ডাবল মাইনে হাতে পাবে। সংসারের খাওয়াপরা নিয়ে আর আমাদের ভাবতে হবে না। আসলে বুঝতে পারছি, বাবার চোখে কৃতী পুত্রের ছবি ভেসে উঠছে। যজমানি বামুনের পুত্রটি কত লায়েক বাবা পূজাআর্চা করতে গিয়ে গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন।

বাবা বারান্দায় উঠে যাবার সময় বললেন, কত দেশ তোমার ঘোরা হবে। রেলের পাশ পাবে। রেলের পাশ পেলে ভাবছি তোমার মাকে নিয়ে তীর্থ করতে যাব।

আমার বাবা এরকমেরই। এখনও কিছু ঠিকই হয়নি—অথচ ভেবে ফেলেছেন, চাকরিটা আমার হয়ে গেছে।

বাবা এখন জলচৌকিতে বসে তামাক খাবেন।

মা আজ এতই প্রসন্ন যে, মায়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবাকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্য।

রান্নাঘর থেকেই বললে—হ্যাঁগো আমরা আগে তারকেশ্বরে যাব। জাগ্রত ঠাকুর। মানত করেছিলাম, বিলুটার ভাল কাজটাজ হলে শিবের মাথায় বেলপাতা দেব।

—শুধু তারকেশ্বর কেন ধনবউ। কামাক্ষ্যা বল, কাশীর বিশ্বনাথ বল সব তোমার পুত্রের কল্যাণে দর্শন হয়ে যাবে। গ্রহাচার্য বলেছে, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বৃহস্পতি এখন একাদশ স্থানে—যা কিছু হবার এই সময়। বড় সুসময় আমাদের।

এই কাজটা হলে আমি সত্যি তবে বর্তে যাব। স্বপ্নের দেশে যেন চলে যাচ্ছি। এখনই কাউকে বলা যাবে না। আগে একবার যাই, দেখা করি পরীর দাদুর সঙ্গে। দরখাস্তে সইসাঁবুদ হয়ে গেলে তিনি তাঁর বড় পুত্রের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি চাকরির পাকা বন্দোবস্ত করছেন এমনও বলে গেছেন পরীর দাদু। কিন্তু পরীর সঙ্গে দেখা হলে কী বলব!

মনে হল পরীকে সোজাসুজি বলে দেওয়াই ভাল হবে, না যাইনি। বাবাঠাকুরের কাছে আমার যাওয়া হয়নি। সাহসে কুলাচ্ছে না।

কিন্তু জানি, এমন কথা শুনলে, পরীর দু চোখে তিক্ততা ফুটে উঠবে। কাতর চোখে সহসা আগুন জ্বলে উঠবে—তুমি বিলু নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝো না। তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। তুমি আমার শত্রুতা করতে পার, কিন্তু কোনোদিন আমি তোমার শত্রুতা করব না। তোমার মাস্টারি আমার ভাল লাগছিল না, তোমার মতো ছেলে একটা প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ে থাকলে, আমার কোনো আর অবলম্বন থাকে না। রেলে বড় চাকরি হলে, আমার সাহস বাড়বে।

এই সুখস্বপ্নটা আমাকে কাতর করছিল। রেলের চাকরিটা হলে পরীর মর্যাদা নষ্ট হবে না। কিন্তু কোথায় সদরের এস ডি ও আর কোথায় রেলের একজন শিক্ষানবিসী! তার আগেই পরী চলে যাবে। নিজেকে কেন জানি বড় অসহায় লাগছিল। দূরে চাকরি নিয়ে চলে গেলে পরীকে আর দেখতে পাব না এও একটা কষ্ট। এই বাড়িঘরের প্রতিও টান ধরে গেছে, মাঠ পার হলে বাদশাহি সড়ক, দুই বন্ধুর সাইকেল আরোহীর অলৌকিক ভ্রমণ, বালিরঘাটে বসে জ্যোৎস্নায় ডুবে যাওয়া সব আমার হারিয়ে যাবে। আমি খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে যাব।

এতগুলি বিষয় আমাকে ভাবাচ্ছে।

পিলু দরজা বন্ধ করে মশারি টানিয়ে আমার পাশে এসে শুল। বলল, দাদা আমি তোর সঙ্গে যাব।

—যাবি। আগে কাজটা হোক।

—কাজটা হবে।

—কী করে বুঝলি?

—মিমিদির বাবার হাতেই সব। মনে হয় মিমিদিরই ইচ্ছে। না হলে মিমিদির দাদু ছুটে আসতেন না।

পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, হবে হয়ত!

—তুই ছুটিতে আসতে পারবি।

—তাও বলে গেছে?

—হ্যাঁ, সবই তো বলল, অনেক ছুটি আছে। রেলের পাশ, উপরি রোজগার কত কী!

—উপরি রোজগার! সে আবার কী!

পিলু বলল, বাবাও অবাক। বললেন, উপরি রোজগার মানে?

—এ কাজে অনেক উপরি রোজগার। সে আপনি বুঝবেন না! আপনার ছেলে কাজে ঢুকলে বুঝতে পারবে।

উপরি রোজগারটা ঠিক ধরতে পারছি না। ঘুষের কথা বলছেন। ঘুষ না নিলে বড় হওয়া যায় না। মর্যাদা রক্ষা হয় না পরিবারের।

কিন্তু বাবা ঘুণাক্ষরে টের পেলে, সোজা বলবেন, দরকার নেই—মানুষের অসাধু জীবন, সংসারে মঙ্গলজনক হয় না। পাপ। কত পাপে না জানি দেশছাড়া হয়েছি, পাপ বাড়িয়ে লাভ নেই। জীবন তো একটাই। পরজন্মে, কীটপতঙ্গ হয়ে কে বেঁচে থাকতে চায়।

অর্থাৎ এই পাপ বাবার জীবনে শুধু ইহকালের দায় নয় পরকালেরও। এমন বাবার পুত্রের পক্ষে উপরি রোজগার খুবই বিপজ্জনক বিষয়। বাবা হয়তো কথাটার অর্থ ধরতে পারেননি, অথবা ভেবেছেন,

অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হবে এমন ইন্দ্রিয়াধীন তাঁর পুত্র নয়। না হলে এই একটা কথাই বাবার সব প্রসন্নতা নিমেষে হরণ করে নিত।

শুয়ে পাশ ফিরছি। এ-পাশ ও-পাশ করছি। ঘরের বেড়াতে খোপকাটা দরমার জানালা। হাওয়া একদম ঢোকে না। বাবা এই গরমে বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। মা-ও। মাঝরাতের দিকে গরমের তাপ কমলে ঘরে উঠে যান। আমি ঘামছিলাম। শিয়রে তালপাতার পাখা থাকে। মাঝে মাঝে হাওয়া করছি। বাইরে জ্যোৎস্না। ঘুম আসছিল না। পিলু বেশ ঘুমোচ্ছে। শরীরে এত তাপ নিয়ে বাঁচা যায় না। দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলাম। বারান্দায় দেখছি মা বাবা কেউ নেই। শুধু গাছপালাগুলি বাড়িটাকে এখন পাহারা দিচ্ছে। সাপের উপদ্রব আছে। তবে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি ভাসমান বলে সব দেখা যায়। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে খাল। জলে ভরে গেছে। দু একটা মাছের নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। জোনাকি উড়ছিল। বাদশাহি সড়কে গরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। কোথাও কুকুর ডাকছে। কটা ডাহুক পাখি তারস্বরে ডেকে উঠল। সবই কেমন বিস্ময়ের সঞ্চার করছে। রেলের চাকরি হয়ে গেলে—এই জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়ে যাব। কোন সুদূরে চলে যাব কে জানে।

এই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে কী এক অপার রহস্য মানুষের জীবনে, ভাবছিলাম—মানুষ নিরন্তর স্থানান্তরে চলে যাচ্ছে। তার শেকড় এক জায়গায় ঢুকে যায়, অন্য প্রজন্মে সেই শেকড় আবার আলগা হয়ে যায়। আমি চলে গেলে, বাবার এই ঘরবাড়িতে আমার জন্য রাতে কেউ আর অপেক্ষা করে থাকবে না। হুটহাট পরী চলে আসবে না। মুকুল নিখিল নিরঞ্জন সাঁঝবেলায় জ্যোৎস্নায় সাইকেলে এসে হাজির হবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকবে না, বিলু আমরা। অযথা একসঙ্গে সাইকেলগুলির বেল বেজে উঠবে না। কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে আম গাছের ছায়ায় আমি আর মুকুল শুয়ে বসে কবিতা পাঠ করব না। আমার কবিতা মাথায় উঠে যাবে। আসলে মানুষ সঙ্গদোষে বোধহয় কবি হয়, গল্পকার হয়—পরী মাথার মধ্যে কবিতা ঢুকিয়েছিল, সঙ্গদোষে তার বাড়াবাড়ি ঘটেছে। আসলে জীবনে বাহবা অর্জনই এই কবিতাচর্চার দিকে আমায় টানছে। আর এই বাহবা পরী যখন দেয়, তখন আমি রাজার মতো বেঁচে থাকি।

অথচ সেই পরীর খোঁজ নিইনি। তার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। কাল আমাকে পরীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। পরীকে দেখার জন্য মনটা কেন এই গভীর রাতে এত আকুল হয়ে উঠল বুঝতে পারছি না। যেন পারলে এক্ষুনি সাইকেল নিয়ে ছুটে গেলে ভাল হয়। পরী কী রোজ দোতলার বারান্দায় আমার জন্য সকাল বিকাল অপেক্ষা করে থাকে। পরীর দাদু কী পরীর কোনো খবর দিয়ে যাননি! পরীর যে বিয়ে হবে—কথাবার্তা চলছে, বাবা কী তা জানেন! এ সময় নিজের উপরই কেমন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একবারও আমি পিলুকে ডেকে বলিনি, পরীর কথা কিছু বলল। পরী তো চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। পরী খোলামেলা, বেপরোয়া, অথচ মেয়েটার মধ্যে কোনো অতি চালাকি নেই—এমন যার স্বভাব, সে কেন একবার অন্তত খোঁজ নিতে এল না, বাবাঠাকুরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটাতে আমি কী করলাম!

তাহলে কী পরী ভেবে ফেলেছে, বিলুটা কর্মের নয়। পরী আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। যে পরীর জন্য এতটুকু সাহস দেখাতে পারে না, তার উপর নির্ভর করা নিছক পাগলামি। পরেশচন্দ্র অনেক বেশি নির্ভরশীল। ভাবতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। পরী হয়ত সবই মেনে নিয়েছে। তবু আমি থাকলে পরীদের পরিবারে কাঁটা হয়ে থাকব, সেই ভেবে কী পরীর দাদু আমাকে দেশান্তরী করতে চাইছেন। ঠিক কিছুই বুঝছি না।

যত এ-সব ভাবছিলাম, তত কেমন তলিয়ে যাচ্ছি। গাছের গুঁড়িতে চুপচাপ হেলান নিয়ে বসে আছি। দরজা ভেজিয়ে বাড়ির বাইরের রাস্তায় শা-দুল্লা আমগাছের নিচে এক অসহায় তরুণ কোনো এক রাজকন্যার স্বপ্নে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। আমার কেন জানি, পরীর জন্য চোখে জল এসে যাচ্ছিল। পরী জানেই না, তার জন্য গোপনে আমি কখনও কাঁদতে পারি। জানলে পরী না এসে থাকতে পারত না। সামনা-সামনি সব সময় পরীকে ছোট করা আমার স্বভাব। পরী সেটাই সত্য জেনে বসে আছে।

তখনই গলা পেলাম কার!

দেখি পেছনে, পিলু, বাবা-মা।

ওরা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাবার প্রশ্ন, এত রাতে এখানে বসে আছ?

—গরম। ঘরে শোওয়া যাচ্ছে না।

পিলুর কী মনে হল কে জানে—আমাকে নিয়ে মা-বাবার যেমন দুশ্চিন্তার শেষ নেই, পিলুরও তেমনি। সে আমার হাত ধরে টানতে থাকলে, বললাম, যাচ্ছি।

মনে হল ওরা আমার আচরণে খুবই ভয় পেয়ে গেছে। আমি কখন কী করে বসব, এই ভয়ে পিলু আমার পাশে রাতে শোয়।

পিলুকে বললাম, হাত ছাড়। যাচ্ছি।

—যাচ্ছি না, এক্ষুনি ওঠ।

বাবা বললেন, তোমার কী হয়েছে! ক'দিন থেকে আবার মনমরা দেখছি। বলবে তো। না বললে বুঝব কী করে?

কী করে বোঝাই, পরীর বিয়ের কথা হচ্ছে। পরীকে কথা দিয়েছিলাম, বাবাঠাকুরের কাছে যাব—কিন্তু যেতে পারছি না। —কেন যে কথা দিতে গেলাম। পরী যদি বিশ্বাস করে থাকে, কথা যখন দিয়েছি, আমি ঠিক যাবই, যদি বিশ্বাস করে থাকে বিলুর স্বভাব নয় কথা দিয়ে কথা না রাখার। কিন্তু পরী তো বুঝছে না, কী বিপাকে পড়ে বলেছিলাম, আমি যাব।—তুমি এই নিয়ে মন খারাপ করবে না। কী চেহারা করেছ? তারপরও যদি না যেতে পারি মন মানবে কেন! তারপর সব যদি ছেড়ে চলে যেতে হয়, না গিয়েও কী উপায়! যে-ভাবে ট্রেনে, রেল স্টেশনে পড়ে থেকেছি মাসের পর মাস, যে-ভাবে চেকারবাবুদের দেখলে বাবা সাক্ষাৎ ভগবান হাজির ভেবেছেন, যে-ভাবে স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে সবুজ বাতি, সবুজ বাতি দোলালে ট্রেন চলবে, না দোলালে চলবে না, একটা ট্রেনের এই স্বপ্ন এখন সত্যি হতে যাচ্ছে—অথচ সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হবে—এতসব কষ্ট আমাকে বিচলিত করে তুলছে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি আমার এখন এই অবস্থা। সেখানে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কী উপায়।

ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লে, দেখলাম পিলু দরজা ভাল করে বন্ধ করে দিচ্ছে। মশারির নিচে ঢুকে সে পাখা তুলে এমনভাবে হাওয়া করছে, যেন সবটা হাওয়া আমার গায়েই লাগে।

আমি হেসে বললাম, এই পিলু তোর কী হয়েছে রে?

পিলু অবাক। ওর হাতপাখা বন্ধ।

পিলু হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল, তুই দাদা কেন বের হয়ে গেছিলি? বল কেন বের হয়ে গেলি।

—আরে এমনি। তুই কী রে!

—আমার ভয় করছে। তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস দাদা।

হঠাৎ মনে হল, আমি আর, পিলু কিংবা মায়ার জন্য, মা-বাবার জন্য, এমনকি সংসারের ভালমন্দের জন্য যেন খুশি অখুশি কিছুই হচ্ছি না। পিলু এটা বুঝতে পেরেই আশঙ্কা করছে, আমি কিছু করে না বসি। বাবা-মাও কি এমন আশঙ্কায় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। সন্তান বড় হলে জটিলতা যে কত রকমের। আমরা তো এখন বলতে গেলে বেশ মোটামুটি খেয়েপরে বেঁচে আছি—কিন্তু ভিতরে যে আমি ভাল নেই। একসময়ে শুধু পেট ভরে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ পেয়েছি, এখন আর তা পাই না কেন। খাওয়াটাই সব নয়। এরপরও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য বুঝি উত্তাপের দরকার হয়। আমার মধ্যে যে উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কবিতা, পরী, প্রেম, রেলের নীল বাতি। এসব না থাকলে জীবন অর্থহীন। কিন্তু এসব কথা পিলুকে বলি কী করে, বললেই বা বুঝবে কেন?

তখনই পিলু বলল, পরীদি আর আসে না। আমি কাল যাব।

—কী করতে যাবি?

—পরীদি আসে না কেন?

—পরীদির বিয়ে। আসবে কী করে?

হঠাৎ পিলু উত্তেজনায় উঠে বসল, কবে বিয়ে রে দাদা। আমাদের খেতে বলবে না!

—বলবে, বিয়ে ঠিক হলে বলবে। এখনও বোধহয় হয়নি। পরীর কথা তোলায় সুযোগ এসে গেল। বললাম, ওর দাদু পরীর কথা কিছু বলল?

—না।

—গাড়ি নিয়ে এসেছিল?

—রাস্তায় গাড়ি রেখে হেঁটে এসেছে।

—তুই কোথায় ছিলি?

—আমি কালীর পুকুরে গরু আনতে যাচ্ছি, দেখি পরীদির দাদু আসছে। হাতে সেই রুপোর লাঠি।

—আর কেউ ছিল?

—সেই লোকটা!

সেই লোকটা কে বুঝি। ওঁর খাস চাকর। উঠতে বসতে যে একটা লাঠির মতো সঙ্গে থাকে।

পিলু বসেই আছে।—জানিস দাদা এসেই আমাদের বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখলেন। আমগাছের কোনটা কী আম বাবা বললেন। পরীদির দাদু কী খুশি! বললেন, এ তো একটা আশ্রম বানিয়ে ফেলেছেন। বাবা জানিস ঠাকুরঘর খুলে নারায়ণ শিলা দেখালেন। চরণামৃত দিলে তিনি হাত পেতে নিলেন। বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেবতা নিয়ে কথা হল। মা মায়া তো ঘর থেকে বেরই হল না। চেয়ারে বসে আমাকে ডেকে বললেন, কী খবর পিলুবাবুর?

এমন ডাকসাইটে একজন মানুষের পক্ষে পিলুর নাম মনে রাখা সহজ নয়। কিন্তু পিলুর স্বভাবে মানুষকে আত্মীয় ভাবার এমন একটা সহজ কৌশল আছে যার জন্য একবার আলাপ জমে উঠলে তাকে ভোলবার কথা নয়। পরীদের কাকাতুয়াটি আনতে পিলু একদিন সত্যি তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। আমাদের বাড়িতে, খোঁড়া গরু, খোঁড়া বাঁদর, হাঁস, কবুতর, ছাগল, গোটা তিনেক বিড়াল এবং দুটো কুকুরের সঙ্গে কাকাতুয়াটি বেশ মানিয়ে যাবে মনে হয়েছিল তার। পরী সেদিন আমাদের বাড়ি, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে হাজির। যে যা চেয়েছে পরী সেদিন দিতে রাজি হয়েছিল। সেই বাড়ির মেয়ে যদি বলে, পিলু তুই কি নিবি? পিলুর কাকাতুয়া ছাড়া আর কী চাইবার থাকতে পারে। সে সোজা বলেছিল, পরীদি তোমাদের কাকাতুয়াটি দেবে? আমি পালব। তা পিলু পালতে পারে। ওর জীবজন্তুর প্রতি আলাদা একটা মায়া আছে। সেই কাকাতুয়াটি সত্যি পিলু আনতে যাবে পরী ভাবতে পারেনি। পরী বলেছিল, পারবি পুষতে? তোদের বাড়ির হুলো বেড়াল দুটোকে না তাড়ালে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে। ওর দাদু সামনে। দাদুকে বলেছিল, বিলুর ছোটভাই। কী মিষ্টি দেখতে না দাদু! কাকাতুয়া নিতে এসেছে।

আসলে পিলু কৃত সরল সহজ, এটা ভেবে দাদুটি বলেছিলেন, নিয়ে গিয়ে পুষতে পারবি তো?

পিলুর সোজা জবাব, হ্যাঁ পারব। কী খায়?

— কী যে খায় আমরা জানি না। আমাদের রঘু টের পায়। ওর সঙ্গে পাখিটার খাওয়া নিয়ে কথা হয়। রঘু সকাল থেকে লেগে পড়ে।

—আমাকে বলবে না!

—দ্যাখ না গিয়ে বলে কিনা! রঘুকে ছাড়া সে কাউকে বলে না জানি।

পরী নাকি হাসছিল পিলুর কান্ড দেখে। সে পাখিটার সামনে দাঁড়িয়ে শিস দিয়েছে, হাতে তুড়ি মেরেছে। পাখিটা ওকে দু-বার তেড়ে গেছে, তাতেও ঘাবড়ায়নি। সে পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। সুন্দর কথা বলে। পিলু বলেছিল, আমার নাম পিলু, আমার দাদার সঙ্গেই পরীদি পড়ে। এই সম্পর্কের খাতিরেই পাখিটার উচিত পিলুকে মান্য করা। কিন্তু পিলু পাখিটার কাছেই যেতে পারছিল না, দাঁড়ে ঝাপটাচ্ছিল। ধরতে গেলে ঠোকর খাচ্ছিল। পরী আর দাদু পিলুর কান্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

পিলুর স্বভাব বেপরোয়া, সে ছাড়বে কেন, একবার জোর করে পাখিটার দাঁড়ে হাত দিতে গেলেই এমন ঠুকরে দিল যে হাত থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। পরী ছুটে গেছে, পরীর দাদুও।—ইস কী

ছেলে রে তুই! আয়। রক্ত বের হচ্ছে!

পরী বলেছিল, দস্যি বটে তুই।

পিলু হাত ছাড়িয়ে বলেছিল, কিছু হয়নি।

—হয়নি তো হয়নি। আয় বলছি। আমরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিয়ে আসব।

তারপর হাতে ডেটল তুলো ব্যান্ডেজ বেঁধে একপেট খাইয়ে রিকশায় তুলে দিয়েছিল। কাজেই পরীর দাদু যত ডাকসাইটে হোক, এমন ছেলের নাম ভুলে যেতে পারে না।

পিলুকে বললাম, শুয়ে পড়। আমাকে হাওয়া করতে হবে না। ফের বেহায়ার মতো বললাম, পরীর কথা কিছুই বলল না?

—না!

—তুই পরীর কাছে যাবি কেন?

—পরীদি মনে হয় রাগ করেছে।

—রাগ করবে কেন? আমরা পরীর কে?

পিলু আমার এমন কথায় কেমন ঘাবড়ে গেল। পরীদির জন্যই রেলে চাকরি, পরীদি না থাকলে এতবড় চাকরি কে দিত, পরীদি আছে বলেই আমার কাগজ অপরূপা—অথচ তার দাদাটা বলছে কী না পরী আমাদের কে!

পিলু এবারে শুয়ে পড়ল। আমরা দু-জনেই দু-পাশে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। পরী আমাদের কে, বলার পর পিলু তার পরীদির উপর সব অধিকার যেন হারিয়ে ফেলেছে। পিলুও বোঝে পরী এলে আমাদের বাড়িটা মুহূর্তে কেমন বদলে যায়। পরীর ছোটাছুটি, পিলুকে হাঁকডাক করে বাইরে নিয়ে যাওয়া, মার রান্নাঘরে বসে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করা সবটাই পরীর আলাদা এক মহিমা যেন। পিলু পর্যন্ত সেটা টের পেয়ে বুঝেছে, তার যাওয়া দরকার।

আমি বললাম, কাল তো যাচ্ছি। দেখা হবে।

—কাল সত্যি যাচ্ছিস?

—যাব না! কত বড় চাকরি।

পিলু কেন জানি আমার এত বড় চাকরি নিয়ে এই মুহূর্তে উচ্ছাস প্রকাশ করতে পারল না। আমি আর কোনো কথা বলছি না দেখে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। কী কথা বলব! পরী ছাড়া আমার যে আর কোনো কথা নেই।

সকালবেলায় বাবা বললেন, যাবার আগে ঠাকুর প্রণাম করে যেও। শুভ কাজে যাচ্ছ।

পিলু সাইকেল বের করে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছিল। মুড়ি দুধ কলা খেয়ে সাইকেলে বের হয়ে পড়লাম। দরখাস্তে সই করতে যেতে হবে। সইসাবুদ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা, চান খাওয়া সেরে স্কুল—খবরটা বন্ধুদের আগাম দিতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। অথচ মনে হচ্ছে খবরটা দেব, শেষে যদি কাজটা না হয়—কতরকমের শঙ্কা আছে, তবে পরী যদি চায়, কাজটা আমার হবেই। পরীকেও দেখে আসা হবে। বাবাঠাকুরের কাছে যেতে পারিনি, এই সুযোগে সেই খবরটাও দেওয়া যাবে।

আর আশ্চর্য, সদর দিয়ে ঢুকতেই দেখি পরী ওদের দোতলার বারান্দায় মাথা এলিয়ে বসে আছে। আমি যে ঢুকলাম, সে তা লক্ষ্য পর্যন্ত করেনি। অনেক দূরের আকাশে তার চোখ। যেন সে আমাকে চেনেই না। এই হল গিয়ে মানুষের গেরো। আমি ঢুকলাম, অথচ কোনো সাড়া নেই, কেমন জটিল সব চিন্তা-ভাবনায় মাথাটা আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। তবে কি সে আমাকে সত্যি বাড়ির আর দশজন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির মতো ভাবছে। দয়া চাই—এস। চাকরি চাই—এস। কাগজের বিজ্ঞাপন—এস। অনুগ্রহ করে সে কি মাথা কিনে নিয়েছে ভেবেছে। না কি সে লক্ষ্যই করেনি আমি এসেছি। কোন্‌টা!

এতসব ভাববার আমার অবকাশই ছিল না। বিরাট সেই হলঘরে বুড়ো মানুষটি যেন আমার প্রত্যাশায় বসেই ছিলেন। দরজা পর্যন্ত যেতে পারিনি, তার আগেই তিনি প্রায় ছুটে এসেছেন। আমি যেতে পারি, এটা বোধহয় তাঁর বিশ্বাসের বাইরে ছিল। তিনি একটা বড় রকমের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেছেন। তাঁর চোখমুখ দেখে আমার এমনই মনে হল। এই বিপর্যয় থেকে আমিই তাঁদের উদ্ধার করতে পারি—কারণ তিনি তাঁর আচরণে যেন কিছুটা বালকসুলভ, আর কেমন গোপন, খুব ধীরে

এবং লঘুস্বরে কথাবার্তা-আপ্যায়ন।

—এলে! বোস।

বিরাট হলঘর। আর কেউ নেই। এমনকি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সেও না। কত রকমের মানুষজন সকাল থেকে তাঁর কাছে আসে। বাইরের বারান্দায় বসার মতো পনের-বিশজনের জায়গা করা আছে। এক একজনের ডাক পড়ে, তিনি তাদের অভিযোগ দাবিদাওয়া সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে ছেড়ে দেন। যতবার এসেছি, দেখেছি একজন ব্যস্ত মানুষ—অন্তত সকালের দিকটাতে তিনি শহরের মানুষজন নিয়ে ভারী ব্যস্ত থাকেন। আরও সকালে তাঁর পূজা-আর্চ্চার পাট থাকে, তখন বামুনঠাকুর এই বাড়ির সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। পরনে গরদ, খালি গা, গৌরবর্ণ মানুষ, ঘন চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা। গায়ে নামাবলী। হলঘরের বড় দেওয়ালে বাবাঠাকুরের বড় তৈলচিত্র। এবং সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে দেখেছি লম্বা করিডোর পার হয়ে তাঁর পূজার ঘর। সেখানেও সিংহাসনে বাবাঠাকুরের ছবি। পরী আমাকে গোটা বাড়িটা একদিন ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। কার কোন মহল, তার বাবা-কাকারা কেউ কেউ চাকরিজীবী—জমিদারি চলে যাবার পর যেন এই বৈভব রক্ষার্থেই সবাই বের হয়ে পড়েছেন।

তিনি আমাকে বসিয়ে সন্তর্পণে একটা দেওয়াল আলমারি খুলে একটা ফাইল বের করলেন। এসব বের করে দেবার লোকটিকে পর্যন্ত কাছে রাখেননি। ফাইল বের করে আমার সামনে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে বললেন, সই কর।

আমি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সই করলাম।

মাথার উপর ঝাড়-লণ্ঠন, হাওয়ায় তখন রিনরিন করে বেজে উঠল। ঘরে আতরবাতির সুঘ্রাণ।

তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ কেন যে তাকিয়ে থাকলেন বুঝলাম না। শেষে কী ভেবে বললেন, তোমার বাবাকে বলবে, তিনি যেন তোমার সার্টিফিকেট দুটো দেন। অ্যাটেস্টেড কপির দরকার হবে। কাল সকালে দিয়ে যাবে।

আমি মার্কশিট পেয়েছি শেষ পরীক্ষার। সার্টিফিকেট এখনও পাইনি জানালাম।

তিনি বললেন, মার্কশিট হলেই চলবে।

কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ হাঁপাচ্ছিলেন। পায়ে তাঁর নাগরাই জুতো। তিনি পাখার হাওয়াতেও ঘামছিলেন।

—কাল কোথায় গিয়েছিলে? আমি সব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। না এলে আমাকে ফের যেতে হত।

আমার প্রতি এত সদয়! সবটাই পরী হেতু এমন ভাবলাম। সেই পরীর সামান্য কাজ আমি করে উঠতে পারিনি। বললাম, মিমির সঙ্গে একটু দেখা করব।

তিনি চমকে উঠলেন। আমি এ বাড়িতে এলে রঘু বিনোদ সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিত—বিলু দাদাবাবু এসেছেন। বিলু দাদাবাবু শুধু পরীর সঙ্গে পড়ে না, বাবাঠাকুরের প্রিয়জন। যে মানুষটি এই বাড়ির শুভাশুভের দায় ঘাড়ে বহন করছেন, আমি সেই মানুষের বড় আপনজন। বাড়িতে এজন্য আমার আলাদা খাতির। অথচ আশ্চর্য, আজ বাড়িটা কেমন নিঝুম।

ঠিক এইসময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেতেই উপরের দিকে তাকালাম। আমি এলে পরী ধীরে ধীরে লঘু পায়ে সেদিন নেমে এসেছিল। আজও সে আসতে পারে। কিন্তু না—দেখছি রঘু বড় রেকাবিতে ফলমূল মিষ্টি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। আসলে আমার এই সমাদর আর কিছুর জন্য নয়—বাবাঠাকুর প্রসন্ন হবেন এই বোধ থেকে করা। আমাকে যে ঘাঁটাতে সাহস করছেন না, এটাও তার কারণ। আসলে বুঝতে পারি এই পরিবারে আমাকে কেন্দ্র করেই বিপর্যয় নেমে এসেছে। পরীর একগুঁয়েমি এবং সেদিনের হাহাকার কান্না থেকে গোটা পরিবারটি জেনে ফেলেছে, গেরো কোথায়। সেটা খুলে ফেলার জন্য রায়বাহাদুর মাথা ঠান্ডা রেখে এগোচ্ছেন। পরীরও হয়ত সায় আছে। সে চায় না, আমার জীবন একটা প্রাথমিক ইস্কুলে আটকে থাকুক। তোমরা বিলুর জন্য কিছু একটা কর। বিলুর জন্য কিছু একটা করলে, তোমরা যা বলবে, আমি তাই করব। বিলুর হয়ে সত্যিকারের কিছু করতে পারলে পরী বোধহয় বিষও খেতে রাজি।

ক্রমেই আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলাম।

আমার সামনে রকমারি জলখাবার। রায়বাহাদুর নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন। তিনি পরীর কথায় চমকে উঠেছিলেন, পরী সম্পর্কে একটা কথাও বললেন না। বরং এই চাকরিতে আমি যে একদিন খুবই বড় জায়গায় চলে যাব—এটা তাঁর স্থির বিশ্বাস। তিনি আমাকে আমার চাকরির বিষয়ে নানারকমের লোভনীয় কথাবার্তা বলে পরী সম্পর্কে উদাসীন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না।

রঘু সাদা পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস ঠান্ডা জল রেখে গেল।

পরীর দাদু বললেন, খাও।

আমার যে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝতে পেরে বললেন, খাও। আমি বুড়ো মানুষ। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আসে, সহ্য করতে হয়। সবই জানবে বাবাঠাকুরের কৃপা। তুমি তো পরম সৌভাগ্যবান, বাবাঠাকুরের কৃপা লাভ করেছ। সেদিন বাবাঠাকুরের কাছে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম—কথায় কথায় তিনি বললেন, বিলুটার কোনো খবর নেই। বদরিকে ভাবছি পাঠাব। ছোঁড়াটা কী! না বলে না কয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মনটা জানিস মাঝে মাঝে বিলুটার জন্য বড় খারাপ লাগে। বাবা গরিব, বিলুর খুবই পড়ার আগ্রহ। দুটো বছর বিলু ছিল, দু-বছরেই কেমন আমার মধ্যে টান ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি মাথা নিচু করে মিষ্টি এক-আধটু খাচ্ছি আর ওঁর কথা শুনছি।

রায়বাহাদুর কোঁচা মাটি থেকে তুলে কোলের উপর রাখার সময় বললেন, তোমার সব খবর দিয়েছি। বলেছি, বিলুর জন্য আপনি ভাববেন না। ও ভালই আছে। ওকে সমীরণ রেলের শিক্ষানবিসীতে ঢুকিয়ে দেবে। ও পাশ করেছে। ওর জীবনে অনেক উন্নতি হবে।

আমি কিছু বলছিলাম না। কেবল একটা কথাই বার বার এখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে—পরী গিয়েছিল আপনাদের সঙ্গে! পরীকে নিয়ে গিয়েছিলেন? কিংবা কেন গিয়েছিলেন! শুভকাজ, তাঁর অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন। তিনি কি অনুমতি দিলেন। অনুমতি দিয়ে ফেললে আমার আর কিছু করার থাকবে না জানি। আমার ইচ্ছে থাকলেও আর বলতে পারব না, বললেও তিনি শুনবেন না। তাঁর মুখ থেকে বাক্য বের করা এমনিতেই বড় কঠিন কাজ। বাক্য না, যেন আগুন। সে আগুন একবার জ্বলে উঠলে নেবানো যায় না।

এ-সব কী করে জিজ্ঞেস করি! তবু ভেতরে এত তোলপাড় শুরু হয়েছে পরীকে দোতলার বারান্দায় দেখার পর, যে বেহায়ার মতো না বলে থাকতে পারলাম না, মিমি গিয়েছিল আপনাদের সঙ্গে?

—গিয়েছিল।

তারপরের প্রশ্ন যে খুবই কঠিন। বলি কী করে! পরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরীর শুভকাজে তিনি অনুমতি দিয়েছেন—অর্থাৎ এই অনুমতি নেবার জন্যই যাওয়া কিনা! যদি বিষয়টা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—হয়ে যাবারই কথা, দোতলার বেতের সাদা চেয়ারে পরী যে-ভাবে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে মনে হয় বাবাঠাকুর পরীর ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিয়েছেন! শেষ আশ্রয় বলতে পরীর ছিল, বাবাঠাকুর। নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত এমনকি তার ওপরের আদালতের রায় হয়ে গেছে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই পারেন ফাঁসির হুকুম বাতিল করতে। যদি সেখানেও সেই রায় বের হয়ে গিয়ে থাকে।

ভিতরে এত জ্বালা অনুভব করছি কেন! আমি সত্যি অমানুষ। পরীদের বৈভবের প্রতি আমার ঘৃণা আছে, পরীর এই বৈভবের জন্য সে দায়ী হবে কেন! সে তো বোঝে, মানুষকে না ঠকালে, একজন মানুষ, অন্যের চেয়ে বেশি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে না। সে নিজে মিছিলে, ভোটের প্রচারে তার দলের হয়ে বার বার এই কথাই বলে গেছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এমন ডানপিটে মেয়ে, খোলামেলা বেপরোয়া মেয়ে কদিনে কী হয়ে গেল! এ জীবন তো পরীর পক্ষে আত্মহত্যার শামিল। পরী কি তার পরিবারের মর্যাদা রক্ষায় নিজে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে!

খাওয়া আমার মাথায় উঠে গেল। বললাম, মিমিকে একবার ডেকে দেবেন। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। জীবনেও হয়ত এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কেউ কখনো তাঁকে হুকুম করেছে তিনি জানেন না। তার মুখচোখ কেমন সহসা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। উত্তেজনায় তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। যেন এই মুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন, বের হও, বের হয়ে যাও। রাস্তার কুকুর! কিন্তু এ কি দেখছি—

তিনি সহসা আমার দু-হাত চেপে ধরে অনুনয় করছেন, সব রাগ বিদ্বেষ, জ্বালা তাঁর উবে গেছে, অসহায় বালকের মতো হাত ধরে অনুরোধ করছেন, তুমি যা চাও আমি দেব, তুমি যা বলবে আমি করব। কিন্তু দোহাই মিমিকে বলবে না, রেলের চাকরি হচ্ছে তোমার। বিলাসপুর তোমাকে চলে যেতে হবে।

কিছু বলছি না আমি। কী বলব!

সামনাসামনি দু-জন টেবিলের দু-পাশে। শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। সব অহঙ্কার এই একটি টেবিল এক নিমেষে উল্টে দিতে পারে।

—বিলু তোমার দু-হাত ধরে বলছি।

তিনি আমাকে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকলেন।

মাথা নিচু করে বললাম, কথা দিচ্ছি ওকে আমার কাজের কথা বলব না। রেলে কাজ পেয়েছি বলব না। এখান থেকে চলে যাচ্ছি বলব না।

তা হলে পরী জানে না, আমার রেলে চাকরি হচ্ছে। পরী কিছুই জানে না। আমার অনুমানই ঠিক, আমাকে দূরে বনবাসে পাঠিয়ে দেবার জন্য পরীর দাদুর এই চক্রান্ত। মানুষটা কত অসহায়, কোথাকার কে এক বিলু এসে এই পরিবারে ঝড় তুলে দিয়েছে। এই প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিশোধ নিতে পারছি ভেবে ভারী মজা অনুভব করলাম আর তারপরই আমি কেমন পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠলাম।

—বিলু! বিলু! তিনি চিৎকার করছেন।

আমি হাসছি

আমার সেই হাসির প্রচন্ড আওয়াজে ঝড় উঠে গেছে বাড়িটাতে। সবাই দৌড়ে নেমে আসছে। দেখতে পাচ্ছি পরীও এসে রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হয়ে দেখছে আমাকে।

দেখলাম পরী দ্রুত দৌড়ে নেমে আসছে।

দেখলাম পরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এই বিলু কী হয়েছে! কী হয়েছে তোমার! বিলু বিলু, পাগলের মতো হাসছ কেন? আমার ভয় করছে! প্লিজ বিলু!

পরী নার্ভাস হয়ে পড়ছে। এও এক মজা। এ পরিবার সম্পর্কে আমার কৌতূহলের শেষ ছিল না। এ বাড়িতে এলেই মনে হত এরা সব যেন ভিন্ন গ্রহের মানুষ। লম্বা দীর্ঘকায় সব পুরুষ, সৌম্য। এবং আভিজাত্য চলাফেরায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকলে সুঘ্রাণ। সব তকতকে ঝকঝকে। মারবেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে ভয় লাগত। পা পিছলে পড়ে যেতে পারি। পরী কত সহজে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাবার সময় বলত, এস না ভয় কী! সেই পরিবারে আমার সামান্য হাহাকার হাসি ঝড় তুলে দিয়েছে।

পরী নার্ভাস হয়ে পড়লেই পরীর চোখে জল চলে আসে। আসলে পরী বড় হয়েছে এক সুন্দর ফুলের উপত্যকায়—সে জানেই না, এই পৃথিবীতে বনজঙ্গল কাঁটাগাছই বেশি। সে জানে না, এ পৃথিবীতে বড় হতে গেলে পার হতে হয় অনেক উঁচু টিলা, গিরিখাত। আমি আর হাসতে পারলাম না। কতদিন পর যেন পরীর সঙ্গে দেখা। পরীকে বললাম, তোমার কোনো পাত্তা নেই। কী ব্যাপার?

—কোনো ব্যাপার নেই। তুমি বোস। আর একদম হাসবে না।

পরী কী আমার মধ্যে টের পায় এক ভালবাসার পাগল কাঙাল হয়ে আছে। অথচ ভীরু বলে চাইবার সাহস নেই। ভীরু বলে জোরজার করার ক্ষমতা নেই। সবসময় অহঙ্কার নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে পরীর প্রতি আমার ছলনা আছে। ওটা আমার বর্ম। পরী কি ধরতে পেরেছে, আমার সব বিরূপতা আসলে দুর্বলতা থেকে!

পরী আমার অস্বাভাবিক আচরণে ঘাবড়ে যেতে পারে ভেবে আমি আর হাসলাম না। আসলে পরীর দাদু আমাকে কত ভয় পান, আমি তাঁর গলার কত বড় কাঁটা, সেই ভেবে হাসা। সামান্য এক বিলু, প্রাথমিক ইস্কুলের মাস্টারি পেয়ে যে বর্তে গেছে, সেই বিলু এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—সেই ভেবে হাসা!

পরীকে বললাম, জান আমার যাওয়া হয়নি।

—হয়নি তো বেশ। ও নিয়ে তোমায় আর ভাবতে হবে না। সে এবার পেছনের দিকে তাকালে দেখলাম—যে যার মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ওর দাদু পর্যন্ত। পরী এতদিন নিজে মুষড়ে পড়েছিল, আজ আমার অস্বাভাবিক ব্যবহারে সে ভেবেছে, তাকে শক্ত হতে হবে।

পরী বলল, চল বের হব।

—কোথায়?

—চলই না।

পরী যেন এই কারাগার থেকে বের হয়ে মুক্তি পেতে চায়। আবেগের বশে এসব চলে, কিন্তু জীবনের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে আমি তার অচল পয়সা।

দাদু সিঁড়ি থেকে ফিরে এলেন, কোথায় যাবে?

—বাবাঠাকুরের কাছে।

তার তখনই চিৎকার, রঘু, রঘু।

বুড়ো মানুষটার কী ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলা। সবাই দৌড়ে আসছে।—মিমি কালীবাড়ি যাবে। গাড়ি বের করতে বল।

মিমি বলল, দাদু গাড়ি লাগবে না। আমি বিলুর সঙ্গে সাইকেলে যাব। বাবাঠাকুর বললেন না, বিলুকে পেলে ধরে আনবি তো!

বাবাঠাকুরের কথায় দেখলাম তিনি একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলেন।

পরীকে বললাম, বাবাঠাকুর সত্যি ধরে নিয়ে যেতে বলল?

—হ্যাঁ বিলু, বলেই সে দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। কত অস্বাভাবিক দেখেছি পরীকে কিছুক্ষণ আগে, মুহূর্তে পরী আবার কত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে কি বুঝে ফেলেছে, আত্মহত্যা করার অধিকার তার আছে, কিন্তু বিলুকে গলা টিপে মারার অধিকার তার নেই। সে কি সেই ভেবে এত সহজ হয়ে গেল। ঠিক আগেকার পরী। সিঁড়ি ধরে নেমে এল খুব সাদামাটা পোশাকে। আমার সঙ্গে সাইকেলে বের হবার সময় দারোয়ানকে বলল, পরেশচন্দ্র এলে বলবে দিদিমণি বাড়ি নেই। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

আর অবাক, কিছুটা এগিয়ে টাউন হলের কাছে এসে এক পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে সাইকেল থামিয়ে বলল, চল আগে পরেশচন্দ্রের কোয়ার্টারেই যাওয়া যাক। তারপর কেমন অসহায় গলায় বলল, দাদুর কষ্টটা বুঝি। দাদুর কাছেই আমি মানুষ। দাদু বাবা সবাই চায় আমার ভাল হোক। আমি বুঝি বিলু—কিন্তু মানুষের কী ভাল কী মন্দ কেউ বলতে পারে! কোথায় সে তার ভালমন্দ খুঁজে পায় কেউ জানে না!

পরী আমার সঙ্গে বের হয়ে আমায় কিছুটা সঙ্কোচের মধ্যে ফেলেছিল। আমার চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হবে কিনা কে জানে। পরীর বের হয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। যখন বিয়ে ঠিক। তাছাড়া এতবড় চাকরির খবর পরীকেও দিতে পারছি না—খুবই সুখবর। পরী বাড়ি গেলে জেনে ফেলতে পারে। বাড়ির কেউ বলে দিতেই পারে। আর কেউ না বললেও পিলু বাহবা নিতে ছাড়বে কেন!

পরেশচন্দ্রের বাংলোর কাছে এসে পরী বলল, ধুস যত সব। চল তো!

—কোথায়?

—চলই না।

ভাবলাম তবে পরী কালীবাড়ি যাবে। বললাম, পরেশচন্দ্রের সঙ্গে দরকার ছিল!

—কিসের দরকার?

—না মানে......এই যে এলে, এসে ফিরে যাচ্ছ।

—কোনো দরকার নেই। ওর বোঝা উচিত, আমি কী চাই।

—তুমি কী সত্যি চাও কেউ জানে না।

—জানে না তো বেশ।

তারপর পরী কেমন অকপটে বলে গেল, বিলু আমার বিয়ে হলে তোমার কষ্ট হবে না?

—হ্যাঁ, তা একটু হবে।

—একটু হবে?

—বেশি হলে তোমার ভাল লাগবে?

পরী জবাব দিল না। সে সাইকেল ঘুরিয়ে দিল—কালীবাড়ির কাছে এসে বলল, সত্যি বেচারা লক্ষ্মী!

কালীবাড়ি এলেই আমার কাছে লক্ষ্মীর স্মৃতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ভেবেই, কেমন ভয় ছিল, কালীবাড়ি আর আসা হয়নি। লক্ষ্মীর আত্মহত্যার পর এখান থেকে চলে গেছি—এই আত্মহত্যার মূলে আমি আর পরী। সেদিন জ্যোৎস্না রাতে পরীকে বাগানের মধ্যে আমার সঙ্গে ঘুরতে না দেখলে মেয়েটা হয়তো নিজেকে বিনাশ করত না। এসব মনে পড়লে বিষণ্ণ হয়ে যাই। মন্দিরের দরজায় লক্ষ্মীর সেই আমার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকা, কলেজ থেকে ফিরলে হাতমুখ ধোওয়ার জল, পাজামা গেঞ্জি এগিয়ে দেওয়া—এসবই ছিল তার কাজ। কথায় কথায় বলত, দেবস্থানে মিছা কথা বলতে নাই। তা'হলে মা-কালীর অভিশাপে জিব খসে পড়বে।

লক্ষ্মীর ধারণা সে যাকে ভালবাসে, তার পরমায়ু কমে যায়। দেড়-দু বছর একজন সমবয়সী শ্যামলা মেয়ে কাছাকাছি থাকলে টান ধরেই যায়—লক্ষ্মীই প্রথম খবর দিয়েছিল, বাড়ির নতুন মাস্টারের। পরী সেই খবর পেয়ে চিড়িয়াটিকে দেখার জন্য বাইরের ঘরে হাজির সেদিন। সেই থেকে আজ আমরা সেখানেই যাচ্ছি যেখানে পরী আছে আমি আছি, বাবাঠাকুর, বদরিদা, বউদি সবাই আছেন—নেই শুধু লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মরার আগে নিজেকে নববধূর মতো সাজিয়েছিল। কপালে সিঁদুরের টিপ, লালপেড়ে শাড়ি, পায়ে আলতা। সিঁথিতে সূর্যাস্তের শেষ আলো—এক লম্বা লাল সড়ক—আমরা দুজনে এখন তার উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি।

পরী কালীবাড়ি যাবার রাস্তাটায় ঢুকে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। আমরা পাশাপাশি দু'জন সাইকেল চালিয়ে এসেছি। দু'জনের মধ্যে একটা কথাও হয় নি। হবার কথাও নয়।

শহরটা কেমন ক্রমেই ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। শহরের ভেতর নিরিবিলি সাইকেল চালিয়ে আসা কঠিন। সরকারি খামারের পাশে এসে পড়লে দু-পাশে মাঠ দেখা যায়। রিকশা কিংবা মানুষের চলাচল কম বলে, খামারের পাশ দিয়ে আসার সময় ইচ্ছে করলে আমরা দু'জনে দু-একটা কথা যে বলতে পারতাম না তা নয়। তবু কেমন আমরা দু'জনেই নিজের মধ্যে ডুবে ছিলাম।

ডুবে ছিলাম বললে ঠিক হবে না। আসলে পরীর কথা আমি ভাবছিলাম। আমার কথা পরী ভাবছিল।

পরী এ-ভাবে অকপটে কথাটা বলতে পারবে ভাবিনি। ও যত অকপটে বলেছিল, আমি তার চেয়ে আরও সহজে জবাব দিতে পেরেছি। এটা কী করে বুঝি না! আমার তো জ্বালা হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য যেন এমন কোনো ঘটনাই নয় এটা। আর দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মতোই পরীর বিয়ে হবে। এতে অবাক হবার কী আছে!

আমার মধ্যে আসলে ঘটনার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় অনেক পরে। এই যে সাইকেল চালিয়ে পাশাপাশি এসেছি, পরী একটা কথা বলেনি আমি একটা কথা বলিনি, দেখলে মনে হবে কেউ কাউকে আমরা চিনি না। এখন বুঝতে পারছি পরীর কথাগুলিই আমাকে এতক্ষণ ভাবিয়েছে।

শুধু পরী কেন, তার দাদুর কথাও।

যেন একটা সামান্য কথা জীবনে এমন মারাত্মক আলোড়ন তুলবে তখন যেন টেরই পাইনি। কত অনায়াসে বলতে পেরেছিলাম, হ্যাঁ, তা একটু হবে।

পরী কেমন বিস্ময়ে চোখ তুলে দেখছিল। অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে বলেছিল? একটু হবে?

আমি হেসে ফেলেছিলাম। এখন ভাবছি, এমন কথা শোনার পর কেউ হাসতে পারে! আমি মানুষ! অথচ কত অনায়াসে বলেছি, বেশি হলে তোমার ভাল লাগবে?

কালী বাড়ির রাস্তায় ঢুকেও আমরা কথা বলতে পারি নি। সাইকেল থেকে নেমে পরীর কথাও

যেন আমার কানে যায় নি। কিংবা এতক্ষণে যেন মনে করতে পারছি পরী লক্ষ্মী সম্পর্কে কী একটা মন্তব্য করেছিল। কী বলেছিল পরী! আমার মাথায় কী কোন গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে! বেচারা লক্ষ্মী। এমন কিছু বলেছিল! যেন এক দূর অতীত থেকে কথা ভেসে আসছে।

এই পথটা আমার চেনা কত কালের। এই রাস্তায় কিছু ইতস্তত বাড়িঘর উঠেছে। শহর ছাড়িয়ে রেল-লাইনের পাশে বেশ নির্জন জায়গা। সকালের রোদ গাছের মাথায় উঠে এসেছে। পরী লাল রঙের সৌখিন লেডিজ সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার কালীবাড়িতে বাবাঠাকুরের কাছেও যাবার ইচ্ছে নেই। আমাকে তার একা পাওয়া দরকার। একা পাওয়া দরকার তাই বা মনে করছি কী করে। বললাম, কী হল! যাবে না!

—ভাবছি।

—ভাববার কি হল!

—ভাবছি আমি একাই যাব। দু'জনে গেলে ভাববে, তুমি আমার গেরো। তাই বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইছি, তিনি বুঝতে পারবেন।

—না গেলে বুঝি বুঝতে পারবেন না।

—কী করে বুঝবেন!

—কেন তোমাদের পরিবারে তিনি তো অন্তর্যামী। তোমার দাদু যে আমাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছেন, নিশ্চয়ই চোখ বুজলে টের পান বাবাঠাকুর—আমি গেলেও টের পাবেন, না গেলেও টের পাবেন।

হাওয়া দিচ্ছিল। শরৎকাল এসে গেছে, ঠান্ডা আমেজ। পরীর রেশমের মতো ববকরা চুল উড়ছিল। সাদা সিল্ক পরনে। আঁচল একটু হাওয়াতেই খসে পড়ছে। পরী শাড়ী ঠিকঠাক করতে করতে বলল, দাদুকে ঠেস দিয়ে কথা বলছ কেন? বয়স হলে হয়। বৈভব থাকলে এটা আরও বেশি হয়। আমার দাদুর দুটোই আছে। তার একজন বাবাঠাকুর না থাকলে নির্বিঘ্নে বাঁচবেন কী করে! বাবাঠাকুর যে অন্তর্যামী নন, সেটা তুমিও বোঝো আমিও বুঝি। তুমিও কম প্রিয় নও বাবাঠাকুরের। তুমি একা গেলেই হত। কত করে বলেছি, যাও নি। আসলে তুমি স্বার্থপর। পরের জন্য কিছু করার দায় তোমার থাকবে কেন!

আমি স্বার্থপর। পরী যেন ঠিকই বলেছে, স্বার্থপর না হলে কালীবাড়ি ছাড়ার পর একদিনও যাইনি কেন! কতবার বাবা বলেছেন যা একবার বাবাঠাকুরের কাছে। তাঁর অসীম করুণা না থাকলে চাকরিটা হত? মুকুলের জামাইবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।

বাবাকেও দেখেছি, কালীবাড়ির সেই আধ ন্যাংটা সাধুর প্রতি একটা অসীম ভরসা আছে।

বাবা একদিন বলেছিলেন, বদরিই বা কী না ভাবছে। কালীবাড়িতে বদরি থাকতে না দিলে কী করে পড়তিস! বৌমাও তোকে পুত্রস্নেহে লালন করেছে। তোর ছাত্ররাই বা কী না ভাবছে। না বলে না কয়ে সেই যে চলে এলি, আর গেলি না। লক্ষ্মী অপঘাতে মারা গেল, এটা তার নিয়তি। তোর যে কী হয়! সংসারে নিজেকে নিয়ে কেবল ভাবলে চলে না। এতে জীবনের মন্দ দিকটাই ফুটে ওঠে।

আর পরী তো বলবেই, যে বার বার বলেছে, এ বিয়ে একমাত্র ভেঙে দিতে পারেন বাবাঠাকুর। তুমি তো জান বিলু, দাদুর শেষ ভরসা বলতে তিনি। তিনি হ্যাঁ করলে হবে, না করলে হবে না। বাবাঠাকুর কত আক্ষেপ করেছে, বিলুটা সেই যে গেল আর এল না। ওর হয়েছেটা কী!

কী হয়েছে বোঝাই কী করে! কালীবাড়ির রাস্তাটা শহরে যেতে আসতে পড়ে। ভিতরে ঢুকে আধ মাইল খানেক রাস্তা পার হলে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে মন্দির, বটতলা, সেবাইত, বদরিদার ঘরবাড়ি। খুবই নির্জন। মন্দিরের পিছনে বিশাল ঝিল। ও-পারে যতদূর দেখা যায় শুধু বাঁশের জঙ্গল। মন্দিরের সামনে রেল-লাইন, দু-পাশে যতদূর দেখা যায় শুধু আমের বাগিচা। রোজ শহরে যাই আসি। অপরূপা কাগজ বের করি। ইস্কুল করি, মুকুল, নিখিল, নিরঞ্জনের সঙ্গে আড্ডা দিই।

রাস্তায় জড়বৎ দু'জন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের চোখে পড়ারই কথা। কেউ আমরা কথা বলছি না। যেন কালীবাড়ির রাস্তায় ঢুকে আমাদের দু'জনেরই মনে হয়েছে, পথ ভুল করেছি।

শহরের লোকজন পরীকে চেনে না, এমন কেউ আছে আমি জানি না। এই সেই মেয়ে—এখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবকের সামনে। দু'চারজন যুবক থাকবে, এটাও তাদের কল্পনার বাইরে নয়। দঙ্গল নিয়ে পরীর ঘোরার অভ্যাস। কারো হাতে ফেস্টুন, কারো হাতে পোস্টার। পরী দাঁড়িয়ে আছে, ওরা পোস্টার মারছে।

পরীর আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক না। অস্বাভাবিক আমার হাতে কোনো ফেস্টুন নেই, কোনো পোস্টার নেই। পরী যে আজ মাসখানেক হল বড়ই বিপাকে পড়েছে কেঁউ জানে না। এমন কী আমাদের অপরূপা কাগজের কবি লেখকরাও না। এজন্যে পরী আমাদের অস্থায়ী কাগজের অফিসে আসতে পারছে না কিংবা তাকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

আমার কিছুই ভাল লাগছে না।

পরী বলল, এস হাঁটি।

আমরা দু'জনে পাশাপাশি সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। মনে হয় পরী কোনো নির্জন জায়গায় আমাকে আজ নিয়ে যেতে চায়। পরীর দাদু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন জানতে চাইতে পারে। পরীর দাদু যে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে আমার খোঁজে, সেটা শুনলে আরও হতবাক হয়ে যাবে। পরী আর শ্রীময়ী থাকবে না। ওর লাবণ্য ঝরে পড়বে সহসা, সে কঠিন রুক্ষ গলায় বলবে, বিলু তোমার আত্মসম্মান বোধটুকুও গেছে। তুমি ফাঁদে পা দিলে। তোমার কাছে চাকরিটাই বড়। অপরূপার জন্য আমার এত খাটাখাটনি তুমি এক দণ্ডে বিসর্জন দিতে পারলে। তোমার কষ্ট হল না?

যেতে যেতে পরী বলল, কী, কথা বলছ না কেন?

—তুমিও তো কথা বলছ না।

—আমার আবার কথা কী।

—তোমারই তো কথা।

—না। আমার কোনো কথা নেই। তুমি জেনে রাখ আমি রাজি না হলে কারো ক্ষমতা নেই কিছু করে।

—তবে তুমি এত ভেঙে পড়েছ কেন?

—ভেঙে পড়েছি তোমার কথা ভেবে। দাদুকে আমি জানি। বলেই পরী কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—কী জান?

—দাদুর আত্মসম্মানে লেগেছে। একটা রিফুজি ছেলে তার বনেদি পরিবারে ঝড় তুলে দেবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। পরেশচন্দ্রকে আমি সোজা বলে আসতে পারি আমাদের বাড়ি ফের গেলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

—তা তুমি পার, বিশ্বাস করি। তবে আমি তা চাই না। পরেশচন্দ্র ভাল মানুষ। তোমার রূপে সে মজেছে। অপরূপার জন্য সেও কম করছে না।

—করছে, আমি আছি বলে।

—কেন ওর কবিতা!

—ও তো আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য! ওটা পরেশের ছলনা।

—আগে লিখত না?

—জানি না লিখত কি না।

আমি এবারে হেসে দিলাম। বললাম, সত্যি তোমাকে সে ভালবাসে পরী। দেখতেও খারাপ না। তাছাড়া শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাবার পর ক্লাশ করতে পারবে। পড়ায় বাধা দেবে না। ওর বাবা তোমার দাদুকে কথা দিয়ে গেছে।

—বিলু!

দেখলাম পরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওর ভেতর এতদিন অস্থিরতা কাজ করেছে, অর্থাৎ কী করবে ঠিক করতে পারছিল না, কারণ পরী তো তার দাদুকে নিজের চেয়ে বেশি ভালবাসে। তার

বাবা কাকারাও কম না। সবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস যেন তার এতদিন ছিল না। আজ তাদের হলঘরে আমার হাহাকার হাসি শুনে সে ঠিক করে ফেলেছে সব। কেন যে মনে হল বাবাঠাকুরের কাছে যাবে বলে বাড়ি থেকে যে পরী বের হয়ে এল, এটা তার আর এক ছলনা।

বললাম, পরী অবুঝ হবে না। তোমার দাদু ভাল চান তোমার। তাকে আর যাই কর, ছলনা কর না। আমি তার কষ্ট বুঝি। আমি সত্যি দেখছি তোমার মাথাটি খেয়েছি।

পরী কিছু বলল না। আমার দিকে শুধু একবার আড়চোখে তাকাল। এই তাকানো আমাকে এত দুর্বল করে দেয় যে আমি আর নিজের মধ্যে ঠিক থাকি না। কেমন উতলা হয়ে পড়ি। পরীর চোখে এত ধার আছে, এর আগে যেন আর টের পাই নি।

পরী সামনের খোলা একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল। পাশের একটা আমগাছে সাইকেলটা তার দাঁড় করানো! পরী আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। এই রাস্তার পাশে খোলা মাঠে পরীকে নিয়ে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কারণ এই রাস্তায় রিকশার চলাচল আছে। মানুষজনেরও। দুপুর না হোক, শরতের এই না দুপুর না সকাল এমন একটা অসময়ে যে কোনো নারীকে সামনে নিয়ে বসে থাকতে অস্বস্তি হয়। পরীর না হতে পারে আমার হয়। আমি তো পার্টি করি না, যে গণসংযোগ করতে বের হয়ে পড়েছি, ক্লান্ত হয়ে পার্টির কোনো কর্মীকে নিয়ে গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই বললাম, কালীবাড়ি তা হলে যাচ্ছ না।

পরী জবাব দিল না।

পরীর এই একগুঁয়েমি বড় বেশি আমাকে রূঢ় করে তোলে। কিন্তু আজ কেন যে তাকে একটাও রূঢ় কথা বলতে পারছি না।

পরী বসে বসে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছে। কার জেদ কত প্রবল সে যেন এখন যাচাই করতে বসে গেছে। আমার না তার।

আমি আর পারলাম না। ওর পাশে গিয়ে সাইকেলে ভর করে দাঁড়ালাম। নিজেকে খুবই বুদ্ধু মনে হচ্ছে। কী বলব। তবু কথা না বললে, স্বাভাবিক না থাকলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে ভেবে বললাম, তোমার দাদুকে বললেই পারতে বিলুকে নিয়ে বের হচ্ছি। কালীবাড়ি যাবে বললে কেন। কালীবাড়ি যাবে তো এখানে বসে থাকলে কেন। গাড়ি বের করতে বললেন, বললে কেন, না সাইকেলে চলে যাব। এ-সময় আমাদের দু'জনকে এভাবে দেখলে লোকেই বা কী ভাববে! তোমার দাদুর কানে উঠলে তিনিই বা আমার সম্পর্কে কী ভাববেন। ফুসলে বের করে এনেছি এমনও ভাবতে পারেন।

পরী নির্বিকার। যেন আমি দাঁড়িয়ে যতক্ষণ কথা বলব, ততক্ষণ সে একটা কথারও জবাব দেবে না।

এবার বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বললাম, কী বলছি শুনতে পাচ্ছ।

পরীও পাগলের মত চিৎকার করে বলল, না, শুনতে পাচ্ছি না।

এরপর আর কী করা যায়! পরীকে ফেলে বাড়ি চলে যেতে পারি। কেন যে সকালে মরতে পরীদের বাড়ি গেছিলাম! বাবা ঠিকই বলেন গ্রহ বিরূপ হলে এসব হয়। আমার গ্রহের অবস্থান ভাল না। বাবা আমাকে প্রায়ই বলেন, যেন সাবধানে চলাফেরা করি।

কিন্তু বাবাই তো ঠেলে পাঠালেন। রায়বাহাদুর নিজে এসেছিলেন, তোমার যাওয়া উচিত। তোমার সার্টিফিকেটগুলো নিতে ভুলো না। নারায়ণের কৃপায় রেলে কাজটা হয়ে গেলে গ্রহ শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বাবা গরীব বলেই ধর্মভীরু মানুষ। মানুষের সব কিছুতেই তিনি। তাঁর কৃপা না থাকলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা আছে বলেই শহরের এমন প্রভাবশালী মানুষ যেচে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পচে মরি, তিনি চান না।

তিনি কী চান, আমার চাইতে বাবা বেশি কী বুঝবেন! এ-সময় বাবার উপর ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল। বড় প্রলোভনে ফেলে তিনি যে আমাকে দেশছাড়া করতে চাইছেন, বাবা যদি বুঝতেন! পরী কী তবে সব টের পেয়েছে। টের পেয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে। আমার সব ক্ষোভ পরীর উপর নিমেষে জল হয়ে গেল। সাইকেলটা পাশে রেখে মুখোমুখি বসলাম। একজন এতবড়

ঘরের নারীর যদি অসম্মান না হয় আমার মতো গরীব বামুনের অস্বস্তির কী কারণ থাকতে পারে!

বসে একবার আমিও আড়চোখে দেখলাম পরীকে। পরীর চোখে চোখ পড়ে গেল। পরীর দু চোখ জলে ভারী। পরী শুধু বলল, বিলু, তুমি আমার অহংকার। তুমি ভেঙ্গে পড়লে আমি দাঁড়াব কোথায়। বল দাদুর সঙ্গে তোমার কী কথা হয়েছে? কেন ডেকেছিলেন। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য তুমি হাত পেতে নিলে, আমার কষ্টের শেষ থাকবে না। বল, চুপ করে আছ কেন!

আমি মাথা নিচু করে বললাম, পরী, পাগলামি কর না। আবার বলছি, তিনি তোমার ভাল চান। তুমি তাঁর কাছে মানুষ! তোমার ভাল হয়, এমন করে আর কেউ চাইতে পারে না!

—বিলু!

আমি চুপ করে গেলাম।। পরী তার দাদুর কোনো প্রশংসাই শুনতে চাইছে না। জেদি বালিকার মতো গোঁ ধরে আছে।

আমরা দু'জনে আবার চুপচাপ। স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে। তার শব্দ কানে আসছিল। কেমন এক দূরাতীত শব্দের মতো ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। ও-পাশের মাঠ পার হয়ে চলেও গেল তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমরা দু'জনে গভীর কোনো নৈঃশব্দের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছিল পরীর অসহায় মুখ দেখে। এক আশ্চর্য সুন্দর শ্রীভূমি যেন দৃশ্যের অন্তরালে উঁকি দিল। আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। বললাম, আমি উঠি পরী। স্কুলে যেতে হবে।

উঠে পড়লে দেখলাম পরী একইভাবে মাথা গোঁজ করে বসে আছে। যেন আমার কথা তার কানে যায়নি। তার দাদু আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কী এমন গুরুতর খবর যে সকালবেলায় তাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ির হলঘরে হাজির হতে বাধ্য হলাম, না জানা পর্যন্ত পরী স্বস্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু বুড়ো মানুষটার আর্ত মুখ চোখে ভেসে উঠতেই কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। এমন অসহায় মুখ আমি জীবনেও দেখিনি। যেন আমি বিলু লক্ষের মতো এক ফুঁয়ে তার জীবনের রোশনাই নিভিয়ে দিতে পারি। এখন আমার দরকার পরীকে স্বাভাবিক করে তোলা। কারণ তার চোখ মুখ বড় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বললাম, পরী শুনেছ, চৈতালী কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

পরীর কোনো আগ্রহ নেই চৈতালী সম্পর্কে। চৈতালীর প্রতি মুকুলের দুর্বলতা আছে জানে। দু-একবার পরী নিজেও চৈতালীকে নিয়ে মুকুলের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেছে। চৈতালী চলে গেলে মুকুল এই শহরে খুব একা হয়ে যাবে, এও জানে পরী। অথচ নির্বিকার।

আমাকেই কথা বলতে হবে। ওকে এখন অন্যমনস্ক না করতে পারলে, আমি চলে গেলে অপমান বোধ করবে। আমার সামান্য স্কুলের চাকরিটা এমনিতেই ওর পছন্দ নয়। এ-নিয়ে দু-পক্ষই আমরা লড়ালড়ি করছি। আমি অন্তত ডিগ্রিটা নিই পরী এটা চায়। যেন পরী চায়, ও যতদিন কলেজে পড়ছে, ততদিন অন্তত পড়াশোনা চালিয়ে যাই। পরীর সঙ্গে আর কোথাও না হোক কলেজে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য দু'জনের মেশার সুযোগ থাকবে। পরী আমাকে তার নিজের মতো করে বড় করে তুলতে চায়। নিজের মতো তৈরি করে কোনো নিরুপম পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চায়।

অথচ তার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতাই নেই আমার। পরী কেন যে এটা বোঝে না। পরেশচন্দ্র মানুষটি মার্জিত বিনীত এবং ভদ্র। আমাকে তাঁর ব্যবহার মুগ্ধ করে। তাঁর বাংলোয় গিয়ে বসলে আমার গর্ব হয়। নীল রংয়ের বেতের চেয়ারে বসলে মনে হয় আমি এক রহস্যময় সমুদ্রের বাসিন্দা। কবিতা পাঠের আসরেই দেখেছি, কেমন তিনি কিছুটা সংকোচ বোধ করেন। কবিতার বাতিক না থাকলে তিনি আমাদের বড় দূরের মানুষ। দুর্বল কবিতা লেখেন। কবিতা পাঠের আসরে তিনি যখন কবিতা পড়েন আমরা কেউ কেউ মুচকি হাসি। একদিন পরীকেও দেখেছি হাসি সামলাতে না পেরে উঠে দৌড়ে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। পরীর উপর আমার সেদিন কী ক্ষোভ! বাইরে এসে পরীকে একা পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। বলেছি, এ কী অসভ্যতা,—সবার সব হয় না। তাঁর আন্তরিকতাকে ছোট করছ কেন!

আসলে এইসব কবিতা পাঠের আসরে আমি পরীর হিরো। আমার কবিতা সবাইকে শোনাবার জন্যই যেন, এই মাসিক কবিতা পাঠের আসর। শুধু কবিতা পাঠই হয় না। গল্প প্রবন্ধ পাঠও হয়। আমরা অপরূপা কাগজের লেখক কবিরা এই শহরে অন্য এক অহংকার নিয়ে বড় হবার মুখে পরী

যে আমাকে নিয়ে কোথায় যেতে চায় বুঝি না। মাঝে মাঝে মনে হয় পরীর পার্টি বিলাসের মতো আমিও তার এক ধরনের বিলাস। কোনো শিশুর খেলনার মতো। আর তখনই মনের মধ্যে পরীর বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মনে হয় এই কবিতার জগতে জোর করে পরীই আমাকে টেনে এনেছে। কবিতার ভূত মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সে মজা দেখছে। মজা দেখতে দেখতে কখন সে ভেবে ফেলেছে আমার উপর তার আজন্ম অধিকার। অধিকার কেউ কেড়ে নিলে তাকে সে ক্ষমা করবে না।

আমি হেসে বললাম, পরী তোমার ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগছে না। তুমি উঠবে কি না বল। তোমার দাদুর কাছে কেন গেছি তোমাকে বলতে পারব না। কেন হা হা করে হাসছিলাম বলতে পারব না।

আমি তো পরীকে বলতে পারি না, তোমার দাদুর কাছে আমি অবাঞ্ছিত। এই শহরে অবাঞ্ছিত। আমাকে তিনি রেলে চাকরীর লোভ দেখিয়ে দেশান্তরী করতে চান।

পরী বলল, তুমি যাও। আমার যখন খুশি যাব। তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে দাঁড়িয়ে থাকতে।

—দিব্যি কেউ দেয় না পরী। লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠো। চল তোমাকে এগিয়ে দিই।

—তুমি যাবে কিনা বল!

—না। তোমাকে এভাবে ফেলে আমি যেতে পারি না।

—কেন, ভয় করে?

—হ্যাঁ, করে।

—কেন এত ভয়?

—তোমাকে চিনি বলে।

—আমাকে তুমি চেন?

—চিনি। হেলায় তুমি যে কোন অঘটন ঘটাতে পার।

—বলছ কী! হেলায়!

—তা না হলে আমার সঙ্গে মজা করতে আসতে না।

—মজা!

—কালীবাড়ি তো ধর্মস্থান। তোমার দাদু বাবা কাকারা এসেছিলেন দেবীদর্শন করতে, বাবাঠাকুরের আশীর্বাদ নিতে। তুমি এসেছিলে চিড়িয়াটিকে দেখতে। মজা করতে।

—বেশ করেছি। তাতে তোমার কী।

পরীকে রাগিয়ে দিতে পারছি, এটাই এখন আমার লাভ। পরীকে অন্য খাতে বইয়ে দিতে পারছি, এটাই আমার সান্ত্বনা। পুরানো কথা বলে চটিয়ে দিতে পারলে পরী হয়ত আর জানতে চাইবে না, আমি কেন সাত সকালে তার দাদুর কাছে গেছিলাম।

পরীকে বললাম, আমার কিছুই না। তবু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। কথায় কথায় হাসি, মজা লোটা ভাল না। এটাই জীবনে তোমার কাল হয়েছে। তুমি সহজে মজা করতে পার, আবার সামান্য অভিমানে চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসে। দুটোই ক্ষতিকর।

—ক্ষতি তো আমার। তোমার ক্ষতি না হলেই হল। আসলে তুমি স্বার্থপর বিলু। তুমি আত্মকেন্দ্রিক। নিজের গোঁ নিয়ে আছ।

সাইকেলে ভর দিয়েই কথা বলছি।

পরী বসে থেকেই জবাব দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে। যে কোনো মানুষের কাছে এভাবে কোন নারীর সামনে উবু হয়ে থাকা অশোভন। অস্বস্তিটা আমার বাড়ছে। এবারে না পেরে ওর হাত ধরে টানলাম। বললাম, ওঠো বলছি। লোকে দেখলে কী ভাববে।

কারণ এই ছোট শহরে আমাকে কেউ না চিনলেও পরীকে ঠিক চিনে ফেলবে। পরীর যে কোনো অসম্মান কেন যে আমার নিজের অসম্মান মনে হয়। আমি স্থির থাকতে পারি না।

সে হাত টেনে নিল। যেন জোর করলে ধস্তাধস্তি হবে। তবু পরীকে ওঠানো যাবে না।

পরী বলল, তুমি সামান্য ক্ষতিও স্বীকার করতে চাও না বিলু।

—আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতে।

—কী বুঝতাম! তোমার চাকরি না হলে কী হত? তুমি পড়তে না!

—অগত্যা পড়তে হত।

—তোমাদের সংসার চলত না!

—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত।

—সেটা আর দু-পাঁচ বছর হলে ক্ষতি কী ছিল। মাসীমা তো বলেছেন, আমরা কী করব বল! অভাব কোন সংসারে না থাকে! বিলুটা আর পড়বে না। টিউশনি ছেড়ে দিল। বাঁধা মাইনের চাকরি দরকার সংসারে বুঝি।

—তুমি পরী মা'র দিকটা দেখছ। বাবার দিকটা দেখ। সংসারে দু-বেলা অন্নসংস্থান আমাদের কত দরকার বাবাকে দেখলে বুঝতে। তুমিই আমার কাল। তুমিই সেদিন বাবাঠাকুরের মেঘদূত পাঠের সময় মুচকি না হাসলে এতবড় অঘটন আমার জীবনে ঘটত না।

—আমার হাসি পেলে কী করব! আমার কী দোষ।

—এটাই দোষ। সবাই এত আগ্রহ নিয়ে শুনছে, আর তুমি তাকে মজা ভাবলে। আসলে বাবাঠাকুর আমাকে ডেকে পাশে না বসালে তোমারও আগ্রহ থাকত। কোথাকার একটা ছোকরা কিনা বাবাঠাকুরের দোসর। সে ভুল ধরে দেবে!

—তুমি অমন গম্ভীর মুখে বসেছিলে কেন! যেন একেবারে ছোট বাবাঠাকুর। যেন কিছু জান না বোঝ না! নবীন সন্ন্যাসী। আমার ছোট বাবাঠাকুর রে! পদ্মাসনে বসে বুড়োদের মতো মুখ করে রাখতে তোমার কষ্ট হচ্ছিল না। ইচ্ছেটাও আছে দেখার, আবার মুখ গম্ভীর করে রাখবে, হাসি পাবে না!

—কী ইচ্ছে আছে?

—কেন মনে নেই। চুরি করে আমাকে দেখছিলে কেন, হাসি পাবে না! ছোট বাবাঠাকুর আমার প্রেমে পড়ে গেল!

—তাকালেই প্রেমে পড়ে!

—পড়ে। বুঝতে পারছ না।

—না বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না বলেই চলে যাচ্ছি। বুঝতে পারলে কে যায় বল।

—চলে যাচ্ছ মানে? কোথায়? পরী সহসা উঠে দাঁড়াল।

—এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যেন বুঝিয়ে দিতে চাই পরীকে, আমার মতো গরীব বাবার ছেলের প্রেম হল বিলাস।

—তুমি কোথায় যাবে?

এবারে আর রায়বাহাদুরের মিনতির কথা মনে থাকল না। —বিলু, পরী যেন না জানে, আসলে পরী জানলে আমার আর কতটা ক্ষতি হবে। ক্ষতি হবে তার দাদুর। আমি জানি পরী আমার কোনো ক্ষতি করবে না। গেরো একটা, পরীর জেদ, না জেনে উঠবে না। এভাবে বসে থাকলে আমিই বা যাই কী করে। সব খুলে বললাম।

পরী শুনে কেমন হতবাক হয়ে গেছে। বিস্ময় ক্ষোভ সব মিলে পরীর চোখ এখন জ্বলছে।

—তুমি যাবে ঠিক করেছ? ঠোঁট চেপে পরী কথাটা বলল।

—এত ভাল চাকরি আমায় কে করে দেবে?

—আমাদের জন্য কষ্ট হবে না?

পরী আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছে।

—কষ্ট হলেই কী করা। রেলের চাকরি সোজা কথা।

—অপরূপার জন্য কষ্ট হবে না। তোমার কবিতার জন্য কষ্ট হবে না?

এবারে বললাম, ওগুলো শখ। বেকার থাকলে হয়।

—তাহলে সবটাই বেকার ছিলে বলে! কবিতা, অপরূপা, সব।

পরীকে বোঝাতে পারছি না আমি কত অবাঞ্ছিত পরীদের পরিবারে। আমার ভেতরে বড় অভিমান

এবং জ্বালা। আমি থাকলে পরী যে-করেই হোক বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। সে পারে। ওদের পরিবারের পক্ষে কত বেমানান আমি, নিজেও বুঝি। গোটা পরিবারে ঝড় উঠে গেছে। পরীর স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুরের মর্যাদা রাস্তায় লোটাবে, তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। পরীর রুচি এমন নিম্নমানের হবে, তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। এ-নিয়ে বাড়িতে বেশ লড়ালড়ি গেছে পরীর বিধ্বস্ত চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু কী যে থাকে, আমি যেন চোরের মতো ওদের বৈভবের মধ্যে ঢুকে গেছি। বেহায়ার মতো পরীর সঙ্গে মিশছি। কিংবা পরীকে গুণ্টুন করেছি, যে-জন্য পরী স্পষ্টই বলে দিয়েছে বোধহয়, আমি রাজি না। সে তোমরা যাই ভেবে থাক। আমি পড়ব।

না হলে পরীর দাদু আমার বাবার কাছে ছুটে যেতেন না। আমার ভাবনায় পরীর দাদুর ঘুম নেই, যেন আমাকে রেলে চাকরি দিয়ে আমার এবং বাবার দুজনেরই মর্যাদা রক্ষা করছেন। শত হলেও আমি তাঁর গুরুদেব বাবাঠাকুরের প্রিয়, পরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়তাম—আমি প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করলে সবার অসম্মান।

পরী এবার সাইকেল নিয়ে হাঁটতে থাকল। পরী ভিতরে ভিতরে যে ফুঁসছে ওর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছি। পরী রাস্তায় উঠে বলল, চাকরি ঠিক হয়ে গেছে?

—হয়নি। হবে।

—কোথায়? চোখ মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। আমি চুপ করে আছি দেখে ফের পরী তিক্ত গলায় বলল, কোথায় হচ্ছে? কোথায় যাবে। বলো! বলো!

—বিলাসপুরে শুনছি। ওখানেই ট্রেনিং। সামনে নাকি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

পরী এবারে হা হা করে হেসে উঠল। ঠিক আমি যেভাবে পরীদের বাড়িতে রায়বাহাদুর হাত ধরতেই হেসে উঠেছিলাম।

আমি এমন একজন জাঁদরেল মানুষের, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, যিনি সকাল হলে শহরের শতেক সমস্যা নিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করেন, মানুষজন লাইনবন্দী হয়ে তাঁদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, বাড়িতেই এই, অফিসে না জানি কত ইজ্জত,—সেই মানুষটা এত অসহায় তাঁর নাতনীকে নিয়ে ভাবতেই ভিতর থেকে জীবনের প্রবল তামাসার মতো হাহাকার হাসিতে ফেটে পড়েছিলাম। ওটা ছিল আমার জয়ের হাসি। বিশাল পরাজয়ে আমি যে কতটা ভেঙে পড়েছি তারও প্রকাশ।

পরী কেন হাসছে!

পরীকে বললাম, কী হয়েছে তোমার। এত হাসছ কেন!

—তোমার চাকরি হবে রেলে। হাসব না, কী আনন্দ।

—হবে বলেছেন। কাল সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে বলেছেন। এখনও হয়নি।

—আর কিছু নিয়ে যেতে বলেন নি?

—না।

—ঠিক আছে। বলেই সে সাইকেলে চড়ে সোজা চলে গেল। গাছের ছায়ার এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। একবারও আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি, আমি যে দাঁড়িয়েই আছি, আমার এ-দাঁড়িয়ে থাকা যে পরীর জন্য অনন্তকালের। পরী আমাকে ফেলে চলে গেল,—এমন কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এ-আবার আমার কেমন অভিমান!

আমিই তো চাইছিলাম পরী চলে যাক। শহর ছাড়িয়ে জেলখানার মাঠ পার হয়ে রেললাইনের পাশে বসে থাকা কত অশোভন, এটাই কেবল মনে হচ্ছিল। পরী চলে যাওয়ায় কেমন একা হয়ে গেলাম। পরী চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তখন গাছপালার ফাঁকে আমার মুখে রোদ পড়েছে। বনজঙ্গলের রাস্তাটা পার হয়ে গুমটি ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলাম। আমার ইস্কুল আছে, বাড়ির সবাই অপেক্ষা করছে।

এ সবই ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম।

আমার সঙ্গে সাইকেল আছে ভুলে গেছি। সাইকেল নিয়ে হাঁটছি। গুমটি পার হয়ে মনে হল, কী করব! পরী কেন যে আমার এত বড় সুখবরেও খুশি হল না! থার্ড ইয়ারে ভর্তি না হয়ে প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি নেওয়ায় পরীর ক্ষোভ আছে বুঝি, কিন্তু হাতের কাছে এত বড় চাকরির খবরেও পরী

খুশি নয়। আমি না হয় বুঝতে পারি, কেন রায়বাহাদুর চান আমি এখান থেকে চলে যাই।—কিন্তু পরী, সেও কী টের পায় দাদুর আসল উদ্দেশ্য বিলুকে ঘরছাড়া করা। শহর ছাড়া করা।

কখন বাড়ির রাস্তায় ঢুকে গেছি টের পাই নি। পিলু দৌড়ে আসছে। এবং আমার বাবা-মাও খবরটা পাবার আশায় প্রতীক্ষা করছে বুঝতে পারছি।

পিলু এসেই বলল, দাদারে!

এই দাদারে বললেই বুঝি আমার জীবনে পরীর অস্তিত্ব যত ঝড়ই তুলুক, এরাও আমার কম নয়। একদিকে পরী, আর একদিকে অভাবের সংসার থেকে আমার বাবা-মার মুক্তি। ভাইবোনদের বড় করে তোলা,—কত কাজ আমার।

পিলু আমার খবর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য দৌড়ে গেল। —দাদা আসছে।

এতটা রাস্তা সাইকেলে না এসে হেঁটেই চলে এসেছি টের পেতেই বুঝলাম পরী কতটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পিলুর 'দাদারে' কথায় যেন আমি জেগে গেছি। সত্যি বেলা হয়ে গেছে। নতুন চাকরি। স্কুলে না গেলে বাবা মনে মনে ক্ষুব্ধ হবেন। বলবেন, বিলু কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঠিক না। মানুষ কাজের মধ্যেই বাঁচে।

বাড়ি ঢুকে দেখলাম বাবা বাড়ি নেই।

মা'র পাশে খোঁড়া বাঁদরটা রান্নাঘরে বসে আছে। খোঁড়া বাঁদরটা মা'র ভারি ন্যাওটা। মায়া মাঠ থেকে ছাগল তাড়িয়ে আনছে। আমার ফিরে আসার অপেক্ষাতে হয়তো বাবা বসে আছেন এমন মনে হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে বাড়ি না দেখে মনে মনে খুশি হলাম। পিলু যে দাদারে বলেই চুপ মেরে গেছে, আর একটা কথাও বলেনি কেন, এখন বুঝেতে পারলাম। আমার চোখ মুখ দেখলে পিলুই আগে টের পায়, আমি ভাল নেই। দেখেই বুঝেছে, তার দাদাটির কিছু হয়েছে। চোখ মুখ ভাল ঠেকছে না।

পিলু তার দাদার বিষণ্ণ মুখ দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে। সে মাকে এসেও খুব একটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দাদা আসছে খবরটা বোধ হয় দিতে পারেনি। অথবা কিছুই বলেনি। সে তার নিজের কাজে মন দিয়েছে। এই সংসারে সে কিছু নিজের মতো কাজ, বাবার ঘরবাড়ি বানাবার সময়ই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এখনও সেটা সে করে।

সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রাখার আগে বললাম, কীরে ইস্কুলে গেলি না?

মা টের পেয়ে আঁচলে হাত মুছে বের হয়ে এল। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মা কেমন জলে পড়ে গেছে বলে মনে হল।

মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, চাকরিটা হবে। কাল সার্টিফিকেট মার্কসিট নিয়ে যেতে বলেছে।

মা কেমন ভাল বুঝল না। শুধু বলল, এত দেরি করলি কেন? কখন রান্না করে বসে আছি। তোর বাবা বলল, এত দেরি হবার তো কথা না। চাকরিটা কী তবে হচ্ছে না?

—না, হবে।

এতেও মা আশ্বস্ত না হলে বললাম, চাকরির জন্য ভেবো না। চাকরিটা হবেই। পরীর দাদু খুব উঠে পড়ে লেগেছে।

মা বলল, হলেই বাঁচি বাবা। রেলের চাকরি সোজা কথা। তোর বাবা তো বলল, চাকরিটা হলে তুই আমাদের যখন-তখন তীর্থ করাতে পারবি। রেলের পাশ পাবি। এক পয়সা ভাড়া লাগবে না।

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম। মা'র এত আশা!

সেই মা সহসা কেমন কাতর চোখে আমাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। বলল, কীরে মুখে তোর কালি পড়েছে কেন! এ কি চোখ মুখের চেহারা করেছিস?

রোদে হেঁটে এসেছি, চোখে ক্লান্তির ছাপ থাকতেই পারে। না কি মা বলেই টের পায়, ভিতরে আমার চরম সংকট। আমি অস্থির।

সাইকেল বারান্দায় তুলে স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমি তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে আসছি। ভাত বাড়। বলে আর দাঁড়ালাম না। মা সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে প্রায় তেড়ে এল। বলল, একটু ঠান্ডা হয়ে নে। এই মায়া। ছাগলগুলোকে জল দেখাস পরে। তোর দাদাকে তেল দে। গামছা বের করে দে। পিলু গেলি কোথায়। এখন ছাগলের জন্য তোমায় ঘাসপাতা কাটতে হবে না। স্কুলে যাবি না। দাদা

ফিরছে না কেন! এখনও তো স্কুলের ঘন্টা পড়েনি। তুইও বসে যা।

খেতে খেতে বললাম, বাবাকে দেখছি না। কোথায় গেলেন। যজনযাজনে যাবার কথা নয়। কোথাও শ্রাদ্ধশান্তি আছে তাও জানি না।

মা বলল, আর বলিস না, নবমীর কাছে গেছে।

নবমী বুড়ি বিশাল জঙ্গলের কারবলার দিকটায় পরিত্যক্ত ইঁটের ভাটাতে এখনও বেঁচে আছে। নবমীর কাছে আমারও অনেক দিন যাওয়া হয়নি। আমাদের দু-বেলা অন্ন সংস্থানের সঙ্গে নবমীও লেপ্টে গেছে। নবমীর দা-ঠাকুরটি আমার পাশে বসে খাচ্ছে। নবমী সম্পর্কে একটিও কথা বলছে না। সকাল বিকাল সে-ই নবমীর জন্য কলাই করা টিনে ভাত ডাল শাক নিয়ে যায়। নবমীর জন্য দানের কোরা ধুতি,—যখন যা লাগে সেই দিয়ে আসে। বাড়িতে গরুবাছুর আছে। মাঠ থেকে নিয়ে আসা, জাবনা দেওয়া তার কাজ। এই কাজগুলির মতো নবমীর কাজটাও সে নিজ থেকেই কাঁধে তুলে নিয়েছে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'—পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরুণের মতো বসে আছে পারের অপেক্ষায়। তবে বনজঙ্গল সাফ করে স্রোতের মতো ছিন্নমূল মানুষ এসে যাওয়ায় বনটার সে আদি ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আর নেই। কেবল নবমী বুড়ির ওদিকটায় এখনও কেউ ঢুকতে সাহস পায়নি। কারবালার কবরখানার পরেই জঙ্গলটা।

গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে নবমীর সাড়া পেতাম,—দাঠাকুর, ভয় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর বনের মধ্যে আমরা দু-ভাই সাহস ফিরে পেতাম।

সেই নবমীর কাছে বাবা গেছেন।

খেয়ে উঠে সাইকেলে উঠতে যাব, হঠাৎ পিলু কাছে এসে বলল, দাদা আমাকে স্কুলে দিয়ে যাবি?

পিলুর দেরি হয়ে গেছে বুঝতে পারি। বললাম ওঠ।

সে রডে বসলে সাইকেলে বের হয়ে রাস্তায় পড়লাম।

পিলু বলল, জানিস দাদা, নবমী না জঙ্গলটায় আর থাকতে চাইছে না।

বললাম, কেন। বনটা ছেড়ে আসতে পারবে?

—কে নাকি আজকাল রাতে এসে শিয়রে তার বসে থাকে।

—কে বসে থাকে?

—বলে না। কিছু বলে না। কে বসে থাকে বলে না। গেলেই বলবে, কিগো দা-ঠাকুর বাবাঠাকুরকে পাঠালেন না! বাবাঠাকুরকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে!

বাবাঠাকুর মানে আমার বাবাকে। বাবা গেলেই নবমী গড় হবে। বনের ফল-পাকুড়, নারকেল, বেল, কয়েতবেল যখনকার যা পায়ের কাছে রাখবে। যেন বাবাকে গড় হয়ে এ-সব ফলমূল দেবার মধ্যে জীবনের অন্য এক অজ্ঞাত নক্ষত্রের খোঁজ পায়। বনটায় নবমী কতকাল ধরে পড়ে আছে। তার স্বামী ইঁটের ভাটার সর্দার ছিল। সেই কবেকার কথা। নবমী হিসেব জানে না। কেবল বলে,—এই যে যুদ্ধ হল নাগো, তখন আমার সোয়ামীটা মরে গেল। আসলে এখানে থাকতে থাকতে নবমী তার দিনকাল তিথি নক্ষত্রের হিসাব ভুলে গেছে। কখনও মনে হত স্মৃতি। তার মরদের স্মৃতি সে ভুলতে পারছে না। আমরা কতদিন বলেছি, তোমার ভয় করে না। সে কী মধুর হাসি!—ভয় পাব কেন? তেনার কথা আমি শুনতে পাই। গাছপালার ভেতর ঘুরে বেড়ালে সবাই আমার সঙ্গে কথা বলে। সবাই বলতে বুঝি, গাছপালা, বনের প্রাণীসকল এবং পাখপাখালি।

সেই নবমী নাকি রাতে একা থাকতে ভয় পায়। বাবা কী বিধান দেবেন কে জানে!

পিলু বলতে পারে, নবমীকে বাড়ি নিয়ে এস বাবা। নবমীর জন্য পিলুর চার পাঁচ বছরে এক আশ্চর্য মায়া গড়ে উঠেছে বুঝি।

বললাম, কে এসে বসে থাকে জিজ্ঞেস করলি না?

আমরা আচার্য পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। নরেশ মামা এসে মাঠের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল খুলেছেন। এবারে সিক্স সেভেন এক সঙ্গে দুটি ক্লাশও খোলা হয়েছে। পিলু সেভেনে পড়ে। সে বলল, যাবি দাদা?

—কোথায়?

—নবমী বুড়ির কাছে। ও বেশিদিন আর বাঁচবে না।

তা নাই বাঁচতে পারে। এতদিন বেঁচে আছে ভাবতেই অবাক লাগে। আমার তো এক সময় মনে হত, পিলু যখন তখন ছুটে এসে খবর দেবে, জানিস দাদা নবমী না মরে গেছে। বাবাকেও দেবে। নবমীর সদ্‌গতি হয় এমন একটা বাসনা আগেই সে বাবার কাছে পেশ করে রেখেছে। যেন এই সদ্‌গতি না হলে নবমী পিলুর উপরই মরে গিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়বে। সে আর একা সাঁজবেলায় কিংবা রাত করে বাড়ি ফিরতে পারবে না।

—একটা লাঠি নিয়ে দরজায় বসে থাকে নবমী।

—লাঠি কেন?

—লাঠি না হলে তাড়াবে কী করে!

—কাকে তাড়াবে।

—একটা সাপ! জানিস! আজ তো তাই বলে ফেলল।

—সাপ?

—হ্যাঁরে, আলিসান ভুজঙ্গ। ইন্দুরখোমা সাপ বলল, ওটা নাকি যখ।

ইন্দোরখোমা এক ধরনের গোখরো। পদ্মনাগ বলে কেউ। ফণায় খড়মের ছাপ। ইঁদুর খেতে ভালবাসে বলে আমরা ইন্দোরখোমা বলি। অমন একটা বিষধর সাপ তাড়াবার জন্য লাঠি নিয়ে বসে থাকে,—ভাবতেই অবাক হয়ে গেলাম! নবমী তো কুঁজো হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। ভাল করে হাঁটতে পারে না। সাপখোপের মধ্যেই এতদিন-বাস করে এসেছে। কিছু বললে, এক কথা, কারো অনিষ্ট না করলে আমার অনিষ্ট করবে কেন কন দাঠাকুর।

সেই নবমী এখন সাপের আতঙ্কে মুষড়ে পড়েছে। আতঙ্ক হবারই কথা। রাতে আবার কে এসে বসে থাকে শিয়রে। বসে থাকে, না যখটা ফণা তুলে দুলতে থাকে। কেমন একটা রহস্যের গন্ধ। বাবা গিয়ে কী করবেন! একমাত্র বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন। বাড়িটা চিড়িয়াখানা। এবারে তবে ষোলকলা পূর্ণ হবে। খোঁড়া বাঁদর, হাঁস, কবুতর, টিয়াপাখি, বিড়াল, কুকুর, গাই বাছুর সবই আছে। ছিল না বয়সে জরাগ্রস্ত কোনো রমণী। পরী এলে এবার বুঝতে পারবে, বাবার বাড়িঘরে আরও একটি বিচিত্র জীব হাজির হয়েছে। পরীর মজার শেষ থাকবে না। যা মেয়ে, এসেই না নবমীর সেবা শুশ্রূষায় লেগে যায়! মানুষের সেবা বলে কথা! সে-জন্য তার পার্টি, মিছিল, ভোটের সময় গলা ছেড়ে হাঁক—ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। বাপ ঠাকুরদার প্রাসাদে, বাগানবাড়িতে সে লাল পতাকা তুলতে চায়।

স্কুলের সামনে পিলুকে নামিয়ে দিতেই বলল, দাদারে তোর কী হয়েছে!

এক ধমক লাগালাম, আমার কী হবে! যা দাঁড়িয়ে থাকিস না।

আসলে আমি ভাল নেই, পিলু টের পেয়ে গেছে। বাবার পরে পিলুরই আমাকে নিয়ে অহংকার বেশি।

বাবার অহংকার তার বাড়িতে পুত্রের সুবাদে এস ডি ও সাব পর্যন্ত ঘুরে গেছেন।

মা'র অহংকার তার পুত্রটি ভারি সুন্দর দেখতে।

আর পরীর অহংকার আমি কবিতা লিখি। আমি কবি। কবি ভাবলেই হাসি পায়। কবিতার যা ছিরি হাসি পেতেই পারে। আসলে নারীরা পুরুষের উপর জয়লাভ করতে চায়। পরী জয়লাভ করেছে। সে জোরজার না করলে এ-রাস্তায় কস্মিনকালেও হাঁটতাম না। রিফুজি বাবার ছেলের কবিতার বাই দুরারোগ্য ব্যাধির সামিল। বাবার আক্ষেপ, বিলুটার এই মতিচ্ছন্ন কেন। কিছু বলতেও পারেন না। মুকুল নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবুরা শহর থেকে আমার টানে যে কলোনিতে চলে আসে, আমি কবিতা চর্চা করি বলেই। বাবা এটা ঠিক বোঝেন। মুকুলের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মুকুলও কবিতা লেখে বলে। শহর থেকে সব কৃতী ছেলেরাই আসে এই টানে। পরী আসে। এস ডি ও আসেন। শেষ পর্যন্ত পরীর দাদু রায়বাহাদুর।

ফলে বাবা আমার কবিতা চর্চা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। মুখ ফুটে কিছু বলেন না। শুধু মাকে নাকি একদিন বলেছিলেন, তোমার পুত্রটি মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। পার তো রক্ষা কর।

মা বুঝতে না পেরে বলেছিল, মহাব্যাধি! বলছ কী।

—ঠিকই বলছি। উনি রাত জেগে কী করেন বুঝতে পার না?

কবিতা বিষয়টাই মা'র মাথায় নেই। মা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে পারে।

মা'র মুখে আতঙ্ক। মা বলেছিল, বিলুর কী হয়েছে!

—কী আবার হবে! কবিতা লেখেন। তুই গরীব বামুনের ছেলে, তোর এ-সব সাজে। তুই তো আর জমিদার নস,—যে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে কবিতা লিখবি!

পিলুই আমাকে এসব খবর দেয়। অসাক্ষাতে আমাকে নিয়ে মা'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে পিলু গোপনে সব বলে দেয়। বাবা কাকে ঠেস দিয়ে বলেন সেও বুঝি। আমার তখন নিজেরই হাসি পায়।

পরীর সেই মহাকবি এখন যাচ্ছেন প্রাইমারী ইস্কুলে পড়াতে। ভাঙা লঝ্ঝরে সাইকেলের ঝং ঝং শব্দে, দূর থেকেও মানুষজন টের পায়, আসছেন তিনি। আমাকে বেল বাজাতে হয় না। বেলটা খুলে রেখেছি অকেজো হয়ে যাওয়ায়। ব্রেক একদিকটা কোন রকমে ধরে, আর একদিকটা ধরেই না। কতবার যে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছি শুধু কপাল গুণে।

বাবা বলেছেন, এখন চালিয়ে নাও। দেখি শীত গেলে কিনে দিতে পারি কি না! অর্থাৎ শীত আসতে বাবার হাতে আমার মাইনের কিছুটা সঞ্চয় থেকে যেতে পারে,—সেই আশায় আছেন তিনি। পুরো মাইনেটাই বাবার হাতে তুলে দি। আট আনা এক টাকা চাইলেও প্রশ্ন, কী করবে?

আমি যে বড় হয়ে গেছি, আমার যে সামান্য হাত খরচের দরকার, আমার বাবা তা বুঝতেই পারেন না। ফলে দরকারে অদরকারে মা'র কাছেই হাত পাতি। মা গোপনে টাকাটা সিকিটা দিয়ে বলবেন, তোর বাবা যেন না জানে।

সুতরাং নিজেকেই বললাম, তাহলে বিলু তুমি চলে যাচ্ছ? তোমার কষ্ট হবে না সব ফেলে যেতে!

সব ফেলে চলে যাব। সব বলতে আমার কেন জানি এই রাস্তা, বিকেলের বাদশাহী সড়কে বন্ধুরা মিলে ঘুরে বেড়ানো, কখনও গাছের নিচে বসে কবিতা পাঠ, কে কি নতুন কবিতা লিখল জানার আগ্রহ এবং তখনই দূরে দেখতে পাই কেমন শাদা জ্যোৎস্নায় সে দাঁড়িয়ে আছে একা। পরীর দু-চোখে জল। তুমি চলে গেলে, বিলু, আমি একা হয়ে যাব।

ইস্কুলে কিছুতেই মন বসাতে পারলুম না। দু-পিরিয়ড করে চলে এলাম। হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরটায় ঢুকে গেলাম। আলগা ঘর, টালির চাল, বাঁশের বেড়া। একটা তক্তপোষ। মাদুর পাতা। মায়া এখন তার দাদার ঘর সাফসুতরো রাখে। একটা টেবিল। কোন ঢাকনা নেই। ঢাকনা লাগে এও মায়ার জানা নেই। দাদার এই ঘরটায় শহর থেকে ছিমছাম তরুণরা এসে বসে, এ জন্য মায়ার সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য ঘরটার দিকে। রোজ সকালে গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে রাখে। টেবিলে আমার পিলুর বইপত্র এলোমেলো হয়ে থাকলে সাজিয়ে রাখে। জানালায় ছেঁড়া শাড়ি কেটে পর্দা করে দিয়েছে। টেবিলে কাচের গ্লাসে যে দিনের যে ফুল সাজিয়ে রাখে।

আজ ফিরে এসে কিছুই ভাল লাগছিল না। অসময়ে ফিরে আসায় বাবাও উদ্বেগে পড়ে গেছেন। আসতেই বললেন, স্কুলে কিসের ছুটি?

বললাম, ছুটি না।

—তাহলে শরীর খারাপ?

—না।

বাবা বারান্দায় বসে কথা বলে যাচ্ছেন। জলচৌকিতে বসে আছেন। আমি আমার ঘরে। সাইকেলটা তোলার সময়ই তিনি চোখ তুলে তাকালেন। কী দেখলেন জানি না। অবেলায় বাবাও আজ তাঁর নিজের পোঁটলা-পুঁটলি কেন খুলে বসেছেন জানি না।

আজ ঘরে ঢোকার সময় বুঝতে পারলাম, বাবার নতুন করে কিছু খোঁজার পালা শুরু হয়েছে। এক নম্বর খোঁজার বিষয় হতে পারে, আমার রেলের চাকরি শেষ পর্যন্ত হবে কিনা। কাল যে আমি সার্টিফিকেট নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে যাচ্ছি, তার যাত্রা নাস্তি লেখা আছে কিনা। কখন কোন্ সময়ে বাড়ি থেকে বের হলে যাত্রা শুভ এসব দেখতে পারেন। দ্বিতীয়, নবমী বুড়ির কাল সমাগত কিনা। তাকে তিনি কি আশ্বাস দিয়ে এসেছেন জানি না। তৃতীয়, পরীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তা রাজযোটক

কিনা। এসব কাজের দায় কেউ চাপিয়ে দেয় না বাবাকে। বাবা নিজেই এসব কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে ভালবাসেন।

কিছুক্ষণ পর আবার কী যেন বললেন। আমি শুনতে পাইনি। মা রান্নাঘরে খাচ্ছে। বাবার কথাবার্তা মা-ও যে আগ্রহ নিয়ে শুনছে, এ-ঘর থেকে বুঝতে পারছি। মা কি খবরটা দিয়েছে, বিলু গোমড়া মুখে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে তো বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

আবার ডাক শোনা গেল, কী করছিস। শোন।

আমার এখন কিছু ভাল লাগছে না। তক্তপোষে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাবার এই ডাকাডাকি ভাল লাগছে না। বিরক্ত। কিন্তু বাবার ঐ এক স্বভাব, সাড়া না দিলে মানুষের কর্তব্য কী, কেন জন্ম, মানুষের সঙ্গে প্রাণীজগতের কী তফাৎ, তারপর অদৃষ্ট নিয়ে পড়বেন। বলবেন, এই আমার অদৃষ্ট। ছেলের এখন পাখা গজিয়েছে। আমাকে আর মানবে কেন।

আমার ঘরে বাবা এসে আবার হাজির না হন। এই ঘরটায় এখন যে তাঁর ছেলে নিষিদ্ধ বস্তু রাখে, বাবা জানে না। দু-একটা সিগারেট খাবার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। রাতে খাবার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, গোপনে সিগারেট ধরিয়ে কবিতা লিখি। আসলে আমার কেমন মনে হয়েছে,—নির্জনতার মধ্যে ডুবে না গেলে কবিতা লেখা যায় না। টেবিলের ড্রয়ারে তালাচাবি করে নিয়েছি। মা'র কাছ থেকে দু'-এক টাকা এজন্যই নিতে হয়। পিলু জানে। তবে পিলু দাদা লায়েক হয়ে গেছে ভেবেই খুশি। সে আর পাঁচ কান করেনি।

অগত্যা গেলাম।

বাবা বললেন, বোস।

তারপর তেমনি পুঁথির দিকে চোখ রেখে বললেন, শুনলাম কাল তোমাকে যেতে বলেছেন। সকাল পাঁচটার আগে রওনা হবে।

—এত সকালে গিয়ে কী করব!

—রাস্তায় বসে থাকবে।

বাবার এসব কথা মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত তুলে দেয়। বললাম, রাস্তায় বসে থাকব?

—পঞ্চাননতলায় গিয়ে বসে থাকবে রবির দোকানে।

বাবার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিশ্বাস মেলে না। বাবাকে জানি বলেই আর প্রশ্ন করিনি, কেন এত সকালে বের হব? এত সকালে আমি উঠতে পারব না। আমি তো বাইরে কোথাও যাচ্ছি না। শুভ সময়ে যাত্রা করতেই হবে! এসব বলা বৃথা জেনে উঠে পড়ব, ভাবছি, বাবার তখন প্রশ্ন, চাকরি কবে নাগাদ হচ্ছে কিছু বলেছেন মৃন্ময়ীর দাদু?

—না।

—তোমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তোমার আগ্রহ আছে—এটা তবে তিনি টের পেতেন। উদ্যমী হও। তোমরা মানুষের সঙ্গে দেখছি মিশতে জান না। তোমার স্বভাব দিনকে-দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

এ-সময়ে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যখন আরম্ভ করেছেন, শেষ না করে থামবেন না। আসল কথায় তাঁর আসতে অনেকটা ভূমিকার দরকার হয়। এখন বাবার ভূমিকা পর্ব চলছে।

—এত বেলা করে ফিরলে কেন? এত দেরি হবার তো কথা নয়।

—কাজ ছিল।

আমার গলায় দৃঢ়তার আভাস পেলেন। আমি যে রুষ্ট হয়ে উঠছি, তিনি বুঝতে পারছেন। আমি যে বড় হয়ে গেছি, আগেই টের পেয়ে গেছেন। কারণ, এখন আর বাবা যখন-তখন মানুষের সুখ্যাতি করতে গেলে দশবার ভাবেন। বাবার কাছে, পয়সাওয়ালা লোক মাত্রই উদ্যমী এবং উদ্যমী না হলে জীবনে বড় জায়গায় যাওয়া যায় না, এসব কথা তিনি বারবার শোনান। আমি জানি, আসলে মানুষগুলি চোর-বাটপাড়। লোককে না ঠকালে মানুষ এত বৈভবের অধিকারী হয় না।

তিনি খালি গায়ে বসে আছেন। গলায় শাদা উপবীত এবং বাবাকে এ-সময় খুবই ধার্মিক দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, নিবারণ দাস তো বলল, এ আপনার পূর্বজন্মের পুণ্যফল। এত বড় একজন মানুষ

বিলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে, বিলুর মত ছেলে প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ে থাকলে মানাবে কেন।

আমি আর পারছিলাম না। বললাম, আগ্রহ না দেখালেও কাজটা হবে। আপনি ভাববেন না। মুখ প্রায় ফসকে বলে ফেলেছিলাম, পরীর দাদুর গলার কাঁটা আমি।

—পরীর দাদুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে না যাতে তিনি আঘাত পান। কত করে বললেন, বিলুকে আসতে বলবেন, তুমি গেলে না। বাধ্য হয়ে নিজেই এলেন। তোমার মা-তো রোজ ঠাকুরকে বলছেন, চাকরিটা যেন হয়। এতে বাড়িঘরের সম্মান বাড়ে,—বুঝতে শিখো।

সহসা কেন যেন মনে হল, এক অন্ধকার প্ল্যাটফরমে আমি লালবাতি দোলাচ্ছি। পরীর ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

বাবা পোঁটলা পুঁটলি বাঁধতে থাকলেন। কেমন নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো বলে যাচ্ছেন, মানুষই মানুষের আশ্রয়, গাছের দুটো বড় পাকা পেঁপে তোমার মা রেখে দিয়েছেন। থলেয় করে ও-দুটো নিয়ে যাবে। বলবে, বাবা দিয়েছেন। আমাদের গাছের পেঁপে। এতে সম্পর্ক তৈরি হয়।

আর সত্যি পারা গেল না। বললাম, কিছু আমি নিতে-টিতে পারব না।

—ঠিক আছে, পিলুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—না, পাঠাবেন না।

আমি খুবই রুষ্ট হয়ে উঠেছি। বাবা কেমন হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, তিনি এত করছেন, আর তাঁর জন্য দুটো গাছের পাকা পেঁপে নিয়ে যেতে পারবে না! তারপর একটু থেমে বললেন, তোমার মান-সম্মান বড় ঠুনকো। পরীর দাদু এতে বুঝতে পারবেন, বাড়ির ভালমন্দ তিনি খেলে আমরা খুশি হই।

—তিনি তা ভাববেন না।

—কী ভাববেন তবে।

—ভাববেন আমার চাকরিটার জন্য ঘুষ দিচ্ছেন। কিছুতেই পাঠাবেন না। যদি পাঠান, আমি ও-চাকরি করব না। আপনার রায়বাহাদুর এলে আমি তাঁকে অপমান করব।

—কী বললি!

আমি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছি না বুঝতে পারছি। আমার এই রূঢ় আচরণে বাবা কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যেন এই অপমান রায়বাহাদুরকে নয়, বাবাকে করছি। হাতের কাছে এত বড় স্বর্গের সন্ধান যিনি এনেছেন, তাঁর প্রতি আমি এত ক্ষুব্ধ কেন বাবা তার বিন্দুমাত্র যদি আঁচ করতে পারতেন। আমার বাবার জন্য কষ্টে চোখে জল এসে গেল।

বাবা এবার আমার দিকে তাকালেন। ভিতরে কতটা ভেঙ্গে পড়েছি বাবা টের পাবেন। বলবেন, তোমার কী হয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। যেন বাড়ির গাছপালা দেখছি। শরৎকাল এসে গেছে। এটা আমার বড় প্রিয় কাল। পরীর সঙ্গে শরতের জ্যোৎস্নায় আমি রেল-লাইন ধরে কবে যেন হেঁটে গেছিলাম। কবে যেন পরী বলেছিল না না বিলু, তুমি পাগলামি কর না। আমি তবে মরে যাব। পরী অতটা আসকারা না দিলে বোধহয় আজ আমাকে এত বড় সংকটের মধ্যে পড়তে হত না।

বাবা আমার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। আমার রূঢ় ব্যবহারে তিনি বোধহয় ধরতে পেরেছেন, পেঁপে পাঠানো ঠিক হবে না। আমি পছন্দ করছি না। ঘুষ ভেবেছি। তিনি আমাকে শান্ত করার জন্য বললেন, ঘুষ মনে করছ কেন বুঝি না। আগেই বলেছি এতে সম্পর্ক তৈরি হয়। এই যে নবমীকে বাড়ি নিয়ে আসছি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে। ভেবে দেখ আমরা আসার আগে পৃথিবীর কেউ জানতই না, এই বনের মধ্যে নবমী বুড়ি একলা থাকে। পিলুই এসে খবর দিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে।

আমি কথা বলছি না। বাবা অজস্র কথা বলে যাবেন, শুনে যেতে হবে। আমাদের বাড়িতে বাবা কখনও তুইতুকারি করেন স্বাভাবিক কথা বলার সময়। আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার সময় তুমি সম্বোধন করেন। তেমনি আমরাও বাবাকে আপনি বলি আবার তুমিও বলি। সবটাই নির্ভর করে কোন কথার কতটুকু গুরুত্ব আছে তার উপর।

—মনে রাখবে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমার মতো গরীব বামুনের

সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে না উঠলে আসবেন কেন। পরী যে আসে, সেও কোনো সম্পর্ক থেকে। শুনেছি পরী বাড়ি এলে পর্যন্ত তুমি অখুশি হও।

আমি বোঝাই কী করে, পরী আমাদের দারিদ্র্য উপভোগ করতে আসে। আমি চাই না, আমাদের দুরবস্থা দেখে কেউ মজা পাক!

বাবা রামায়ণ পাঠের মতো বলে যাচ্ছেন, নবমীর স্বামী, তুমি জানো, ইঁটের ভাটায় সর্দার ছিল। পশ্চিমে কোথায় দেশ ছিল তাদের। স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। বলতে পারে না। তার স্বামী ইঁটের ভাটাতেই দেহরক্ষা করেছে। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে নবমী তার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিল। স্মৃতির সম্পর্ক। তারপর তাও তার হারিয়ে গেল। জঙ্গলের গাছপালা কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল। ভাটা উঠে গেল, নবমী গেল না। সে বনজঙ্গলের মধ্যে স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকল।

ভাবলাম হতেই পারে। নবমীর যৌবন বয়সের স্মৃতি, কত রাতে, লণ্ঠনের আলোর মুখোমুখি বসে, দু'জনের গভীর প্রেম, অথবা আকাশের নিচে বসে থাকতে থাকতে এক উষ্ণ জীবন দু'জনের— এবং নক্ষত্রমালার গভীরে টের পায় নবমী তার মানুষটি সেখানে কোথাও আছে। একজনের স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাকতেই পারে। একজনের পেট চালাবার আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা এই বনজঙ্গলই করেছে। শহরে নিয়ে গিয়ে কাঠ বিক্রি করতে পারে, কিংবা গাছের ফলমূলই ছিল তার বেঁচে থাকার উপায়।

বাবা বলে যাচ্ছেন—পিলুকে দা'ঠাকুর ডাকে। পিলু গেলে কী খুশি হয়, পিলুকে একটা ছাগলের বাচ্চাও দিয়েছে। এই দেওয়াটা ঘুষ ভাবলে দোষের। সম্পর্ক গড়ে তুলেছে নবমী। পিলু গেলে, নারকেল, বেল কতকিছু দিয়েছে। যেন সারাদিন সে বনজঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কী পড়ে আছে খোঁজার জন্য। তার দা'ঠাকুরের মুখে তবে হাসি ফুটে উঠবে। এই হাসিটুকু দেখার জন্য শরীরের জরাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে। তুমি তো দেখেছ, নবমীকে যখন পিলু আবিষ্কার করে তখনই জরা তাকে গ্রাস করেছে। নবমীর জন্য পিলু রোজ খাবার নিয়ে যায় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই। —কোথাকার কে, এখন বায়না সে জঙ্গলে থাকবে না। একা ভয় পায়। তার ঘরে নাকি যখ ঢুকতে চায়। যে কটা দিন বাঁচবে, সে তার দা-ঠাকুরের কাছে থাকতে চায়। পিলুও দেখছি নবমীকে নিয়ে আসার জন্য পাগল। সম্পর্ক গড়ে না উঠলে এসব হয় কী করে!

আমার বাবা এ-রকমেরই। তিনি যা বুঝবেন, তা থেকে নিবৃত্ত করা কঠিন। কেবল তিনি আমার মা'কেই সমীহ করেন, কিছুটা ভয়ও করেন।

মা'র খাওয়া হয়ে গেছে। হাতে এঁটো থালা নিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াল। খেতে খেতে পিতা-পুত্রের বিরোধ কী নিয়ে টের পেয়েছে। মা এবার আমার পক্ষ নিয়েই বলল, দরকার নেই পেঁপে পাঠাবার। চাকরিটা হয়ে যাক, তুমি নিজে গিয়েই একদিন বড় দুটো পেঁপে দিয়ে এস। তোমার গাছ লাগাবার হাত যশ তবে মৃন্ময়ীর দাদু টের পাবেন।

কেউ এলে একটাই প্রশ্ন। —কত বড় বেল!

একটাই প্রশ্ন, কী মিষ্টি আপনার গাছের আম!

প্রশ্ন, কত বড় পেঁপে! কী সুস্বাদু। বীজ রাখবেন। নেব।

বাবা হাসবেন তখন। আশ্চর্য তৃপ্তির হাসি। মুখে কিছু বলবেন না।

আমরা বুঝি বাবা কী বলতে চান। আজ যেন সেটা আরও বেশি বুঝেছি, —সম্পর্ক। গাছের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক। এরই খাতিরে তল্লাটের সবচেয়ে বড় পেঁপে আমাদের গাছে জন্মায়। বাবা পেঁপে পাঠিয়ে যেন বলতে চান, আপনি ধনবান, গুণবান, রাজধর্ম আপনার আয়ত্তে। আমার সম্পর্ক—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে গাছপালার প্রাণীজগতের। কোন অংশে আমি খাটো নই।

বাবা এবার সহসা উঠে দাঁড়ালেন। সামনে এসে দেখলেন আমাকে। আমার ভেতরে কষ্ট আবার না টের পেয়ে যান। —আমার বিয়ে হলে বিলু তোমার কষ্ট হবে না! সকাল থেকে বিচ্ছেদের এই বেদনা আমাকে কাতর করে রেখেছে। সকাল থেকে আমার বনবাসের খবর পেয়ে মুখে উদ্বেগের ছায়া। সকাল থেকে পরী আমাকে 'ঠিক আছে' এই বলে চলে গেছে। দুশ্চিন্তা। পরী কিছু না আবার করে বসে।

আমিও বাবার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এখন উঠে পালাব ভাবছি, তখনই বাবা কী বুঝে বললেন—আসক্তি, মোহ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও। পরমবুদ্ধি লাভ কর।

অগাধ জলে পড়ে না গেলে বাবা আমার এ হেন সাধুভাষার প্রয়োগ করেন না। যে জন্য বাবার কাছ থেকে সারা দুপুর পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত তা আর রক্ষা করা গেল না। বোধহয় লক্ষ্মীর আত্মহত্যার পর বাবা আমার এমন থমথমে মুখ দেখেছিলেন। শুকনো মুখ দেখেছিলেন।

আমি যে কী করি!

কাল আমার যাবার কথা।

বাবা মা'র স্বপ্ন এক রকমের, পরীর স্বপ্ন এক রকমের।

রায়বাহাদুর আমাকে দুঃস্বপ্নের শরীক ভাবছেন।

এ-হেন অবস্থায় যখন তক্তপোষে আশ্রয় নিয়েছি, তখনই টের পেলাম বাবা উঠোনে নেমে এসেছেন। গাছপালার ছায়া পড়েছে উঠোনে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলছেন, মনে রেখ মানুষের শেকড় এক জায়গায় লেগে যায় না। সে যাযাবর। আজ এখানে আছে, কাল আর এক জায়গায়। বুঝতে পারি দেশবাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট। ভাই বোন ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। পরে আর তা থাকবে না। ছুটি-ছাটায় বাড়ি আসবে। এই আসার প্রতীক্ষা কত মধুর, তখন টের পাবে। জীবনে প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি আছে। আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রতীক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকি। এটা না থাকলে জীবনে বেঁচে থাকার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় বিলু।

সহসা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, আপনি থামবেন কিনা? কিন্তু পারলাম না।

আসলে চিৎকার করলেই আমি আমার আবেগ সামলাতে পারব না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলব। আমি ধরা পড়ে যাব।

কারণ পরীর আভিজাত্য, পরীর লম্বা ঋজু অবয়ব, শরীরের সুঘ্রাণ, উলের মতো নরম উষ্ণ চুল এবং সারা শরীরের লাবণ্য আমাকে সেই কবে থেকে পাগল করে দিয়েছে। আজ এটা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। অথচ পরীর সঙ্গে আমার দুর্ব্যবহারের অন্ত ছিল না। পরীর বাড়ি আসা নিয়ে আমি কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পরীকে কতভাবে না মানসিক পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি আমার হীনমন্যতা থেকেই পরীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার। যত ভাবছি তত কষ্ট পাচ্ছি। কাল গিয়ে কী দেখব কে জানে।

রাতে আমার ভাল ঘুম হল না।

এ-পাশ ও-পাশ করলেই জানি পিলু বলবে, ও দাদা তোর কী হয়েছে রে।

পিলুকে নিয়ে আর এক জ্বালা। শুয়ে ঘুমের অভিনয় করলাম কিছুক্ষণ।

অন্য রাতে জেগে বসে থাকি।

এখন বুঝতে পারি আমার এই কবিতা লেখা পৃথিবীর একজন নারীকে শুধু অবাক করে দেবার জন্য।

আজ একবারও কোন একটা শব্দ কবিতার শরীরে আশ্রয় পাবার জন্য মাথায় আগুন জ্বালায়নি। মগজে কোন রক্তক্ষরণ হয়নি। কী যে হয়েছে।

চোখ জ্বালা করছে। দেখছি কেবল সামনে দাঁড়িয়ে আছে পরী। আর অনেক দূর দিয়ে কোনো নির্জন প্রান্তর ধরে হেঁটে যাচ্ছে লক্ষ্মী। দুই ভালবাসার পৃথিবীর মধ্যে পড়ে আমি হাঁসফাঁস করছি।

লক্ষ্মীর কথা ভাবতেই কেমন ভয়ের সঞ্চার হল। আমার শেষ দেখার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠল। পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, কপালে বড় ধরনের সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে লাল দগদগে একটা রেখা। এ সব সে পেল কোথায়। রান্নাবাড়িতে পড়ে থাকত। থান পরত। কখনও কালো পাড়ের ধুতি। বিধবা সে। নিজেকে বিনাশ করার আগে নববধূর এই বেশটাই আমাকে কাতর করে রেখেছিল। এখন দেখছি লক্ষ্মী আবার আমার কাছে স্বপ্নে, সেই বেশেই দেখা দিচ্ছে। আসলে আর একটা আতঙ্ক থেকেই এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি। সারাটা রাত এভাবে কখনও লক্ষ্মী, কখনও পরী স্বপ্নে হাজির হতে থাকলে অসহায়বোধ করতে থাকলাম।

রাত থাকতেই বাবা এসে ডেকে দিলেন। শুভ কাজে যাচ্ছি। বাবা বললেন, তুমি মুখ ধুয়ে বারান্দায়

এসে বোস। আকাশ ফর্সা হলে রওনা হবে।

যাবার সময় বাবা ঠাকুরের ফুল বেলপাতা দিলেন সঙ্গে। যাতে কোনো কারণে ত্রুটি না থাকে, —বাবার সব দিকে নজর। ঈশ্বর না আবার তাঁর রুষ্ট হন।

আমি কিছু বলতেও পারি না।

কারণ বাবার ধারণা দৈবই সব। তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু দায়িত্ব পালন করে যাবে।

বাবার এই ঈশ্বর বিশ্বাসই মাঝে মাঝে এত বিরক্তিকর, যে কখনও চটে গিয়ে রাস্তায় ফুল বেলপাতা সব ফেলে দিই। পরীক্ষা দিতে যাবার সময়, ইস্কুলের চাকরিতে যোগদানের সময় এই সব অবলম্বন আমার পকেটে ভরে দেন। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

সড়কের দু-ধারে বড় বড় সব গাছের ছায়া। সূর্য উঠে গেছে। পরীর দাদু সকাল আটটার আগে নিচে নামেন না। একবার ভাবলাম মুকুলের বাসায় চলে যাই। কিন্তু এত সকালে দেখলে সে অবাক হবে।

আমার মনে সব হিজিবিজি ভাবনা। মাথামুণ্ডু কিছুরই ঠিক থাকছে না। পঞ্চাননতলায় এসে সাইকেল রাখলাম গাছের ছায়ায়। তারপর বাবার চেনা দোকানে গিয়ে টুলে বসলাম। বাবার সে যজমান। গেলে আদর-যত্ন সে একটু বেশিই করে। অত সকালে দেখে সে অবাকই হল। উনুনে তার আঁচ দেওয়া হয়েছে। এদিকটায় এখন লোকালয় বাড়ছে। মানুষজন দেশ ছাড়া হয়ে যে-যেখানে পারছে বসে যাচ্ছে।

এতটা সময় কী করে কাটাই।

কতক্ষণে বেলা বাড়বে, সেই প্রতীক্ষায় ভিতরে ছটফট করছি। এবং এক সময় যখন শহরে ঢুকে গেলাম, —দেখলাম সবই ঠিকঠাক আছে। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে টের পেলাম না। পরী যে লক্ষ্মীর মতো ছেলেমানুষী করে বসতে পারে না, এটাও মনে হল এক সময়। সে আমার উপর বদলা নিতে পারে। সেটা কীভাবে!

এই ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই পরীদের সদর গেটে হাজির। দারোয়ান অন্যদিন আমাকে দেখলে উঠে দাঁড়ায়। সামনের লনে কাকাতুয়া পাখীটা দুবার পাখা ঝাপটাল। আমি যে হাজির পাখিটাও টের পেয়েছে। দারোয়ান বসেই বলল, ভিতরে গিয়ে বসুন। আমি দূর থেকেই লক্ষ্য রাখছিপরী দোতলার বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। কারণ পরী তো জানে আমি সকালে আসব। পরী শুধু বারান্দায় অপেক্ষা করে না, রাস্তায় দূর থেকে দেখলেই হাত নাড়ায়।

বারান্দায় পরী নেই।

বুকটা ধক করে উঠল।

দারোয়ান কেমন গম্ভীর মুখে আমাকে বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। আমি এলে এ-বাড়িতে সাড়া পড়ে যায়। আমি তো শুধু বিলু না। এই বাড়ির একমাত্র অবলম্বন বাবাঠাকুরের প্রিয়জন। আমার খাতিরই আলাদা।

কিন্তু আজ মনে হল কোথাও কোনো বড় রকমের অঘটন ঘটেছে। খাতির করা দূরে থাকুক আমি যে এত বড় বাড়িতে এসেছি সেটাই যে বেমানান।

এই প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ঢুকলেই ঠাকুর-চাকরের কোলাহল শোনা যায়। লোকজন রায়বাহাদুরের অনুগ্রহের অপেক্ষায় নিচে লোহার বেঞ্চিতে কখন তাঁর দর্শন পাবে সেই আশায় বসে থাকে। আজও তারা বসে আছে। জমিদারি গেলেও প্রভাব প্রতিপত্তির খামতি নেই। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, —প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র পরীদের ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরীর বাবা কাকারা বড় পদে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রেলের বড়কর্তা পরীর পিতাঠাকুর। এত সব বৈভবের মধ্যে পরী বড় হতে হতে কেন যে ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় শিখে গেল। পরীর এটাই হয়েছে কাল। দাদু বোধহয় ভেবেছিলেন ছেলেমানুষ, বাড়িতে রাজনীতির আবহাওয়া, দলছুট হতেই পারে। অবুঝ!

পরীদের বাড়ি ঢুকলে আমার এ সবই মনে হয়।

বারান্দায় এখন দুটো জালালি কবুতর কার্নিসে উড়ে এসে বসেছে। বক বকম করছিল। আমাকে দেখেও কেউ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না।

ভিতরে ঢুকতে যাব, একজন ষণ্ডামার্কা লোক বলল, কাকে চান?

পরীর দাদুর নাম বললাম।

বলল, বসুন। নামতে দেরি হবে।

আজ আমারও কেন যে এত দুর্বলতা বুঝি না। এই বাড়িতে আর যে-কবার এসেছি, নিজেকে এত অনুগ্রহভাজন মনে হয়নি। ছোট মনে হয়নি।

বললাম, মিমিকে ডেকে দিন।

লোকটি আমার অচেনা। নতুন আমদানি হতে পারে। মিমিকে ডেকে দেবার কথায় বেয়াদপির আভাস পেয়ে লোকটা ত্যারচা চোখে আমাকে দেখতে থাকল।

ধুস, এমন জড়তায় আমাকে পেয়ে বসল কেন! স্বাভাবিক থাকতে পারছি না। আমি তো হলঘরটায় ঢুকে যেতে পারি। কোনোদিন অনুমতির দরকার হয়নি। আজ দেখছি সব অন্য রকম। আসলে কৃপাপ্রার্থী বলেই হয়তো স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি আমার আজ কাজ করছে না। মনে মনে বেপরোয়া হয়ে উঠছি। আর তখনই মনে হল কেউ নামছে।

ভিতরে ঢুকে গেলাম।

পরীর দাদু আমাকে দেখেও দেখলেন না। আর এই লোকটাই কাল সকালে হাত ঝাঁকিয়ে বলেছিল, দোহাই বিলু তোমার চাকরিটার কথা মিমি যেন টের না পায়। আজ সেই মানুষটা কেমন ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বারান্দায় গিয়ে বস। ডেকে পাঠাব।

মগজে মনে হল কেউ ঠুক করে একটা পেরেক গুঁজে দিল। এক অসহ্য পীড়ন কিংবা অপমানের জ্বালা দগদগ করে ফুটে উঠছে সারা মুখে।

আমিও পাগলের মতো বললাম, উপরে যাচ্ছি। পরীর সঙ্গে দরকার আছে।

—পরী? সে কে?

আমার হুঁশ ফিরে এল। মিমিকে আমি পরী বলে ডাকি। মিমি কলেজের প্রথম দিন থেকেই যে আমার কাছে পরী, সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। পরীর কাছেও আমি সোনাবাবু নই, আমি বিল্ব।

হুঁশ ফিরে এলে বললাম, মিমির কাছে যাচ্ছি।

—ও তো এখন কোথায় বের হবে।

যাক পরী ভাল আছে। পরী শেষে লক্ষ্মীর মতো কিছু একটা না করে বসে। সেই আতঙ্কে রাতে ঘুম হয় নি। পরী বের হতেই পারে। সে পার্টি অফিসে যেতে পারে, কিংবা পার্টির হয়ে লড়ে যেতে পারে, কোনো নাটক থাকতে পারে পার্টির, তার রিহার্সেলে যেতে পারে—কিংবা প্রেসে খোঁজ নিতে যেতে পারে কভারের ব্লক হয়ে এসেছে কি না! পরী বসে থাকার মেয়ে নয়। কখন যে পড়ে আর এত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে আমরা ধরতেই পারতাম না।

পরী তার ঘরেও আমায় নিয়ে বসিয়েছে। ঘরটা সাদামাটা। একটা তক্তপোষ। আর একটা টেবিল। পরীর বেশবাসও সাধারণ। ওর পছন্দের মতো লতাপাতা আঁকা সাদা সিল্ক। খুব সাজগোজ করলে সে লাল রঙের ব্লাউজ, লাল পাড়ের শাড়ি পরে। ঘরে লেনিনের একটা বড় ফটো। আর কিছু নেই। এমন কি একটা বড় আয়নাও না। এই কৃচ্ছ্রতা বাড়ির আর দশজন পরীর ফ্যাসন ভেবে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। কাঠের চেয়ারে কোনো কভার পর্যন্ত নেই। একজন সাধারণ পার্টি কর্মির মতোই তার ঘরটা। আমার ভাল লাগত না। আসলে মনে হত পরীর এটাও এক ধরনের বিলাস।

পরীর দাদু কী দেখছিলেন আমার মুখে জানি না—তিনি বেশ শান্ত গলায় বললেন, পরেশ এসেছে।

পরেশচন্দ্র! সে কেন?

পরীর দাদু আবার বললেন, পরেশের সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। তুমি বরং আর একদিন এসে দেখা কর।

আমার সারা শরীরে মনে হল কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার তো পরীর সঙ্গে দেখা করার কথা না। পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা করার কথা। তিনিই তো অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনিই তো ছুটে আমাদের বাড়ি গেছেন। বাবাকে রেলের চাকরির লোভ দেখিয়ে এসেছেন। এক রাতের মধ্যে এত বড় গন্ডগোল হয়ে গেল! তিনি ভুলে গেলেন! আজ আমায় তিনি আসতে বলেছিলেন। সে কী করে হয়! পরী, পরেশচন্দ্র, তুমি আর একদিন এস—এ সবের মানে কী!

মনে হচ্ছিল লাথি মেরে সামনের সিঁড়ির রেলিং ভেঙে দি। কিংবা দেয়ালের সব বড় তৈলচিত্রে থুথু ছেটাই। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ থাকে। আমার বাবাকে এত বড় কুহকে ফেলে দেবার কী দরকার ছিল! সরল সাদাসিধে মানুষটা গেলেই বলবেন,—দিয়ে এলি। কবে আবার যেতে বললেন! বাবাকে আমি কী বলব! বাবার বিশ্বাস এত বড় মানুষেরা কখনও ঠকায় না।

মাথা নিচু করে বের হয়ে যাবার মুখেই মনে হল সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। উঁচুতে তাকিয়ে দেখলাম পরী, পাশে পরেশচন্দ্র, ওর সাদা ভুটিয়া কুকুরের চেন হাতে। পরী লাফিয়ে নামছে। উর্বশীর চেয়েও আজ বেশি সেজেছে। এমন কী দুর থেকেও মনে হল পরী আজ চোখে কাজল দিয়েছে। ঠোঁটে লিপস্টিক। পরীর এ-সাজ আমি দেখিনি। পরী কতটা আগুন হয়ে জ্বলতে পারে আজ যেন আমাকে দেখাল। লক্ষ্মীর আত্মহত্যার মতো অক্লেশে পরী আজ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। পরী নামছে অথচ আমাকে যেন দেখতে পাচ্ছে না। দুজনেই কথায় কথায় হাসছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে। নিচে নেমে হঠাৎ যেন পরী আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল, আরে বিলু। কী ব্যাপার। দাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসে কাজটা কিন্তু করিয়ে নিও। রেলের চাকরি, সোজা কথা!

আমার কী হল জানি না। আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না। ঠাস করে পরীর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে সবাই ছুটে আসছে। ওর দাদু চিৎকার করে বলছে, গেট-আউট স্কাউন্ড্রেল। গেট-আউট। এত বড় আস্পর্ধা! এই কে আছিস! দাঁড়িয়ে কী তামাশা দেখছিস! সবাই ছুটে আসছে আমাকে ধরার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে পরী আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল। —তোমরা ওর গায়ে হাত দেবে না। পরীর চোখ জ্বলছে।

আমার কাছে সবটাই নাটক মনে হচ্ছে। সবাই আমাকে মারুক, আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক চাইছিলাম। নিজেকে নির্যাতন করার মধ্যে অপমানিত হবার মধ্যে পরীর উপর আক্রোশ মেটাবার এটাই যেন শেষ উপায়!

পরী আমার হাত ধরে বলল, আমার ঘরে এস।

আমার স্নায়ুতে তরল সিসে ঢেলে দিচ্ছে পরী। জোর করে হাত ছাড়িয়ে বললাম, আর নাটক করতে হবে না। ছাড় বলছি। তারপর এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পাগলের মতো বের হয়ে আসার মুখে শুনতে পেলাম, এ যে তোমার কত বড় অধিকার, বিলু তুমি জান না। একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে দেখেছিলাম। পরী সারা মুখ আঁচলে ঢেকে দিয়েছে। পরী ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বাইরে বের হয়ে রাস্তায় নেমে মনে হল, ছিঃ ছিঃ, এটা আমি কী করলাম। পরীকে মেরেছি, পরীকে মারতে পারলাম?

হাতে জ্বালা বোধ করছি।

সাইকেলের হ্যান্ডেল পর্যন্ত তাপে যেন গলে যাবে।

নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি, বিলু তুমি অমানুষ।

প্রবল নিশ্বাস পড়ছে। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে পুলিশ প্যারেডের মাঠ পার হয়ে গেলাম।

চোখে কিছু যেন দেখতে পাচ্ছি না।

হয়তো কোনো অঘটন ঘটে যাবে।

সামনেই সেই ধোবিখালের মাঠ। শহরের নির্জনতা আরম্ভ। মানুষজন কোর্ট কাছারিতে যাচ্ছে। রিক্সা, গরুর গাড়ির ভিড়। আমি মাঠের মধ্যে সাইকেল ছুঁড়ে ফেলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনেই থাকল না আমার পিলুর মতো ভাই আছে। আমার অস্তিত্ব জুড়ে শুধু পরী। পরীকে আমি মেরেছি। ডান হাতটা কেমন অবশ ঠেকছে। পরীর সেই শঙ্খের মতো সাদা রঙের গালে পাঁচটা আঙুলের ছাপ লাল হয়ে ভেসে আছে। বললাম, পরী, আমি সত্যি অমানুষ। জীবনেও আর তোমাকে মুখ দেখাতে পারব না।

ঘাসের মধ্যে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম, বসে থাকলাম। কী করব কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গেছি। এখানে বসে থাকাটাও নিরাপদ নয়। লালদীঘির ধার ধরে চেনা জানা কেউ আসতেই পারে। দেখে ফেলতে পারে। চুপচাপ এখানটায় বসে থাকলে তারা বিস্মিত হতে পারে। কিছুটা সাইকেল চালিয়ে গেলে চৈতালিদের বাড়ি। ওর দিদিরা আমাকে

চেনে। লালদীঘির ধারে আমরা বিকালে অনেক দিন বেড়াই। পাশের বাড়িঘরের তরুণীরাও চেনে। নাম জানে না হয়ত, কিন্তু চেনে। যেমন আমরা শহরে সব সুন্দরী তরুণীদের চিনি, তারাও যে চেনে না সেটা অবিশ্বাস করি কী করে। দু-পক্ষই খবর রাখে আমরা কারা, তারা কারা।

এখানে বসে থাকাটা নিরাপদ ঠেকল না। উঠে পড়লাম। পরীকে আর জীবনেও মুখ দেখাতে পারব না। কে যেন ভিড়ের মধ্যে চিৎকার করে উঠেছিল, গুন্ডা বদমাসদের কে ঢুকতে দিল! পুলিশে দিন স্যার।

এখন সব মনে পড়ছে।

পুলিশে দিলেই ভাল হয়। আমি যেন তাই চাইছিলাম। পরী আমাকে নিয়ে তা হলে আর মজা করতে পারবে না। পরী ইচ্ছে করেই পরেশকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমাকে চূড়ান্ত অপমান করার জন্য পরী আগুনের মতো সেজেছে। পরী তার দাদুকে দিয়ে অপমান করিয়েছে, পরীর জেদ আমি জানি। আমি সত্যি বলছি এত অপমান সহ্য করতে পারিনি। পরীকে আমার সহসা বেশ্যা নারীর চেয়েও অধম মনে হয়েছিল। —পরী বিশ্বাস কর ইচ্ছে করে মারিনি। আমি তোমার হাতের খেলার পুতুল হতে চাই না। আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করবে! আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।

তারপরই মনে হল, পরী চড় খেয়ে বলছে, এ তোমার কত বড় অধিকার বিলু তুমি জান না। আর সঙ্গে সঙ্গে পরীর জন্য ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালো, শাসালো কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না—সব মনে পড়তেই অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি যেন এখানে থাকলে আরও ভেঙে পড়ব। যত দূরে এখন চলে যাওয়া যায়—সাইকেলে চেপে উন্মাদের মতো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইলাম। বড় বিপন্ন বোধ করছি।

কোথায় যাব, কার কাছে যাব। যেখানেই যাই না কেন আমি ধরা পড়ে যাব। মুকুলের কাছে গেলে আমি ভেঙ্গে পড়ব। মুকুল এত বেশি আমাকে টের পায় যে তার কাছে কিছুই গোপন করতে পারব না। মুকুল খোলা আকাশের মতো উদার। সে টের পাবে, পরীকে তবে যে আমি সহ্য করতে পারি না, এই কারণ। তুমি বিলু মরেছে। এ-মরণ ঠেকাবার যে কেউ নেই। মরণ তোমার হাতে। তুমিই গলায় নিজের অজ্ঞাতে ফাঁসের দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছ। শান্ত হয়ে বোস। তারপরই ডাকবে বৌদি, বিলু এয়েচে, দু-কাপ চা। বিলু মরেছে, জান? আর বৌদি সব শুনে বলবে, তুমি পরীকে মেরেছ? ছিঃ ছিঃ, পরী এত ভাবে তোমার জন্য। পরী কত দুঃখ করেছে, বিলুটা বৌদি কলেজ ছেড়ে দিল। প্রাইমারী ইস্কুলে মাষ্টারি নিল! আচ্ছা বল বৌদি, ওর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারলে, সে পুড়বে আর পুড়বে। যত পুড়বে তত সে খাঁটি মানুষ হবে। বড় কবি হতে গেলে যে নিজেকে পোড়াতে হয় বৌদি। তারপরই মনে হল কী আজে বাজে ভাবাবেগে ভুগছি।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। যে কোন দিকে এখন আমার চলে যাওয়া দরকার। মানুষের এই বিপন্ন বিস্ময় বড় আচমকা সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়।

এখন শুধু এক অন্তর্গত খেলা।

আমার এই অন্তর্গত খেলা কোন নদীর পাড়ে নিয়ে যাবে জানি না।

ভাঁকুড়ির রাস্তায় পড়ে আরও গভীর নির্জনতা টের পেলাম। কত বেলা হয়ে গেছে। চারপাশে ধানের মাঠ। সরু পথ ধরে কিছুটা গেলে রেশম গুটির গভীর জঙ্গল। নিজেকে আড়াল করার এর চেয়ে নিভৃত জায়গা যেন পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

মানুষের সাড়া শব্দ নেই। শুধু কীটপতঙ্গের শব্দ পাচ্ছি। কিছু গাংশালিখ উড়ে এল। ডালে পাখি। কিচিরমিচির করছে। ওরা দেখছে গাছের নিচে বসে আছে এক প্রাণ, নাম যার বিলু, যে নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে,—যেন এই পালানো, কোনো গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসে। গভীরতায় তার নকল রহস্য ছুঁয়ে যায়। ছুঁয়ে যায় তার তীব্র রক্তক্ষরণ। পরিণাম গলায় কোনো রজ্জুর ফাঁস,— এই পর্যন্ত ভেবে মনে হল, না, ঠিক হয়নি। বুঝি এগুলো সব এলোমেলো ভাবনা—'শুয়ে থাকা আকাশ/আপন মনে উদার হয়ে/উড়ে যায় যাক পাখিরা/মেঘেরা উড়ে আসবে/কোনো ফুলের উপত্যকা পার হয়ে/ঢেকে যাক সুন্দর শ্যামল পৃথিবী/নিচে আছে সবুজ ধানের মাঠ/গাঙ ফড়িং লাফায়, এক

গিরগিটি হাঁটে/বড় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, ক্ষুধা তার একমাত্র বৃত্তি/আহার তার একমাত্র অহঙ্কার/সে জানে না মেঘেরা উড়ে আসে/যায় যাক পাখিরা উড়ে/

আমি বিড় বিড় করে বকছিলাম।

মনে হল, নিরন্তর শুয়ে থাকি সবুজ মাঠ হয়ে/আলে পায়ের ছাপ, ছোপানো আলতার দাগ/ঘুমে দূরে সরে যায় সে/তার আঁচল ওড়ে হাওয়ায়/স্তনে ধানের সবুজ শিষ উষ্ণতা ছড়ায়/সে হেঁটে যায়, আলে পায়ের ছাপ/ছোপানো আলতার দাগ ঠোঁটে।

বললাম, পরী আমি চলে যাব বহুদূরে।

আমি উবু হয়ে শুয়ে থাকলাম। মাথার মধ্যে শব্দগুলি খেলা করছে।

পাখিরা আমার চারপাশে খেলা করে যাচ্ছে।

পাখিরা আমাকে ভয় পাচ্ছে না। কারণ তারা জানে পাখির সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমার সব শত্রুতা পরীর সঙ্গে।

একটা খরগোস কোথা থেকে লাফিয়ে আমার সামনে বসল। আমি কত নিথর হয়ে আছি, টের পেলাম! নড়লেই ছুটে পালাবে। নড়ছি না। কিন্তু চোখ দেখে কী টের পায়, আমার মধ্যে কোনো আত্মহননের প্রবণতা জেগে উঠছে। এই প্রথম নিজেকে আমি ভয় পেতে শুরু করলাম।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। খরগোসটা চলে যাবার সময় যেন শুধু বলে গেল—বেঁচে থাক। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই।

আমি কখনও বসে আছি, কখনও জঙ্গলে হেঁটে বেড়াচ্ছি। পলাতক আসামী। কে জানে সবাই জেনেও ফেলেছে কিনা। বাড়িতে বাবা অস্থির হয়ে পড়বেন জানি। বাবা মা পিলু সবাই। পিলু সাইকেলে যদি খুঁজতে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কত বড় আহাম্মক আমি টের পেলাম। পিলু গেলেই শুনতে পাবে—আমি ওখানে কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়ে পালিয়েছি। পিলুকে দারোয়ান, পরীর দাদু, ঠাকুর, চাকর, সবাই চেনে।

আকাশের রং পাল্টাচ্ছে। গভীর অন্ধকার হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাইকেলটা নিয়ে হাঁটছি। সাপ খোপের ভয় আছে। এখন বড় রাস্তায় উঠে যাওয়া দরকার। সারাক্ষণ জঙ্গলটার মধ্যে ঘুরে টের পেলাম প্রকৃতির এক কথা—বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ থেমে গেছে। অন্ধকারে বাড়ি ফিরলে চোখ মুখ দেখে কেউ টের পাবে না, এমন অশোভন আচরণের পর নিজের কাছেই ছোট হয়ে গেছি। পিলু খবর নিয়ে ফিরতে পারে,—দাদা পরীদিকে মেরেছে।

বাড়ি ঢুকতে সংকোচ হচ্ছিল।

দেখছি প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে জড় হয়েছে। বাড়িতে না ফেরায় বাবা মা কতটা উদ্বেগের মধ্যে ছিল, টের পেলাম। কেবল পিলু কিছু বলল না।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদছে। কোথায় ছিলি? কী হয়েছে তোর?

বললাম, কী হবে আবার।

কিছু না হলে তুই ফিরলি না কেন? সারাদিন কোথায় ছিলি।

বাবা বললেন, সব অদৃষ্ট।

এই প্রথম বাবা খুঁটিয়ে কিছু জানতে চাইলেন না। শুধু বললেন, তোমাকে তো বলেছি ধনবৌ, ঠিক ফিরে আসবে। বয়সটারই দোষ।

এমন কি বাবা রায়বাহাদুর সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন করলেন না। পরীদের বাড়ি গেছিলাম কিনা তাও জানতে চাইলেন না। পিলু এসে সাইকেলটা ঘরে তুলে রাখল। মায়া এক বালতি জল রাখল হাত মুখ ধোয়ার জন্য।

খেতে বসে ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম।

মা বলল, কী হল, কিছুই মুখে দিলি না।

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

আমার মুখে পুরুষানুক্রমে মানুষের বসবাস আছে, বাবা জানেন। এর আগেও সেটা টের পেয়েছেন বলে আজ বাবা ঠাকুরঘরে ঢুকে যাবার সময় বললেন, যাও শুয়ে পড়গে। সবই ভবিতব্য।

আমার বাবা জীবনের সব সংকটকে সহজেই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

ছেড়ে দিতে পারেন বলেই, আমি না ফিরলেও বাবা থানা-পুলিশ করতেন না। থানা-পুলিশের নামে বাবার আতঙ্ক আছে জানি। আমার পরিচিত সবার বাড়ি যেতেন, যেমন আমি জানি মুকুলের বাসায় খোঁজখবর নিতেন,—আমি কোনো চিঠি দিয়েছি কিনা। সাইকেলটার খোঁজ করতেন, কার কাছে রেখে গেলাম। আমার মধ্যে নাকি একজন বিবাগী মানুষের বাস আছে। সেই যে একবার গ্যারেজে কাজ করার সময় পালিয়েছিলাম, তখনও বাবা থানা-পুলিশ করেন নি। —গেছে আবার চলে আসবে। চঞ্চল মন।

বাবা মা-কে প্রবোধ দিতেন, অদৃষ্ট, বুঝলে ধনবৌ। তা না হলে দেশ ভাগ হবে কেন, আমরা ছিন্নমূল হব কেন! দু'বেলা খেতে দিতে পারি না, পড়াতে পারি না, ছেলের কী দোষ। বাবার আর একটা আপ্তবাক্য, আমি তো কোনো পাপ করিনি আমার কোনো সর্বনাশ হতে পারে না।

সর্বনাশ হয়নি।

ছোড়দি একটা চিঠি লিখেছিল, বিলু এখানে আছে। কতদিন পর আবার ছোড়দির কথা মনে হল। আমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে। ছোড়দি লিখেছিল, বিলু রহমানের কাছে থাকে।

পিলু আমার পাশে শুয়ে উসখুস করছে। আমি মটকা মেরে আছি। এ-পাশ ও-পাশ করলে পিলু দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। বাড়ি ফেরাতক পিলু একটা কথাও বলেনি। শুয়ে পড়লে সে দরজা বন্ধ করেছে। হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে পাশে এসে শুয়েছে। ভাদ্র মাসের গরম। আমার কষ্ট হয় ভেবে সে হাত-পাখায় হাওয়া করছে। এমনভাবে করছে যেন গরমটা তারই বেশি। গরমে ঘুমোতে পারছে না। বাঁশের বেড়ার ঝাঁপ তোলা। বাইরে থেকে এক-আধটু যা হাওয়া ঢুকছে, আমার গায়ে লাগছে। সে বোধহয় চায়, আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। সে জানে ঘুম থেকে উঠলে, মনের অনেকটা ক্লেদ কেটে যায়। সেভেনে পড়লে কী হবে, দাদাকে সে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে। কথা বলছে না। আমারও কিছু ভাল লাগছে না। যতই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি না কেন, ওর বুঝতে কষ্ট হয় না, অনিদ্রার শিকার আমি। আমি ভালো নেই।

সে যখন বুঝল, তার দাদাটির সহজে ঘুম আসবে না, তখনই ডাকল, দাদারে!

পাশ ফিরে শুলাম।

সে আবার ডাকল, দাদারে।

—বল।

—তুই পরীদিকে মারতে পারলি!

—কে বলল তোকে, পরীকে আমি মেরেছি! কে বলল!

—তুই মেরেছিস দাদা।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। বাবা জানতে পারলে আমায় অমানুষ ভাববে। বাবা এমনিতেই নারীজাতিকে শক্তিরূপেন সংস্থিতা ভাবেন। মেয়েছেলের গায়ে হাত! এ যে গো-বধের সামিল। কিন্তু বাবা যে আমাকে কোনো প্রশ্নই করেননি। পরীকে মেরেছি জানলে, বাবা স্থির থাকতে পারতেন না।—তুমি আমার কুপুত্র। বংশের কুলাঙ্গার। তোমার মুখ দর্শন করলে পাপ। নারী হল'গে দেবী। পৃথিবীর বীজ বপন করার ভার তোমার, বহন করার ভার তার। পৃথিবীর সৃষ্টি স্থিতি লয় তার করতলে। তুমি পরীর গায়ে হাত তুলতে পারলে। তোমার সম্ভ্রমে বাধল না।

আমি কিছুই পিলুকে বলছি না। মনে হচ্ছে, কথাটা পিলুর কাছে স্বীকার করতেও কষ্ট। আমি তো সত্যি পরীকে মারিনি। অপমানের জ্বালায় মাথা ঠিক ছিল না, বলি কী করে! কেবল বলতে চাইছিলাম, আমি সত্যি মারিনি পিলু। সত্যি বলছি।

—জানিস দাদা, আমাকে না হরি সিং বেঁধে রাখবে বলে ধরে নিয়ে গেছিল।

—তোকে? তুই গেছিলি কেন।

—বাবা যে পাঠাল। এত বেলা হয়েছে, তুই ফিরছিস না, আমাদের চিন্তা হয় না!

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আবার পাশ ফিরে শুলাম। যেন বাকিটা শুনলে আমার আবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার জের পিলুর উপর দিয়ে গেছে তবে! আমার মাথায় আবার টের

পেলাম, কে পেরেক পুঁতে দিচ্ছে।

—ভাগ্যিস পরীদি ছিল। কী চেঁচামেচি জানিস,—এসেছে। ওটা তো পালিয়েছে! একে ধরে রাখুন। আমাকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। জানিস, আমার না কী ভয় ধরে গেছিল! কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোকে ওরা কত খাতির করে। একটা লোক বলছে, এত বড় সাহস বাড়িতে ঢুকে দিদিমণির গায়ে হাত তোলে।

—আমি তো জানি নারে দাদা, কেবল চারপাশে তাকাচ্ছি। বলছি, আমার কী দোষ! আমার দাদা মারবে কেন?

—ওরা কেমন পাগলের মতো আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিচ্ছিল। আমি আর না পেরে চিৎকার করছিলাম, পরীদি, আমাকে মেরে ফেলল।

আমি শক্ত হয়ে আছি। শুনে যাচ্ছি।

—আর দেখি পরীদি নেমে আসছে। —তুই! এই তোমরা ওকে কী করছ! তোর দাদা তো কখন চলে গেছে! আয়, উপরে আয়। ও বাড়ি যায়নি?

পরীদি তার ঘরে নিয়ে গেল; দেখলাম, বাড়ির সবাই কেমন গুম মেরে গেছে। কেউ টুঁ শব্দ আর করছে না।

বললাম, পরীদি, দাদা তোমাকে মেরেছে?

পরীদি বলল, তোকে কে বলল!

—সবাই।

—ধুস, তোর দাদা মারতে যাবে কেন। অত সাহস আছে ওর! তোর দাদাটা এত ভীতু জানিস জানতাম না! আর জানিস দাদা, পরীদির এক কথা, তোর দাদা বাড়ি ফেরেনি?

—না পরীদি।

—কোথায় গেল তবে! মুকুলের ওখানে খোঁজ নিয়েছিস?

—যাইনি।

—যা একবার। কোথায় গেল খুঁজে দেখ।

—জানিস দাদা, পরীদির মুখটা না কী কালো হয়ে গেছে বলতে বলতে। মুখে একটা দিক আঁচলে ঢেকে কেবল কথা বলছিল। বলল, বোস। তারপর ফোন করল কাকে। বলল, সুধীনদা আছে। সুধীনদাকে কী বলল। ঘরে ঢোকার সময় দেখলাম, পরীদির গাল ফুলে আছে। পরীদি কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকল।

—পরীদি বলে ডাকতেই জানিস দাদা, আমার দিকে তাকাল। আমি পরীদির মুখ দেখছি। পরীদি না তাড়াতাড়ি আবার আঁচল দিয়ে গাল ঢেকে ফেলল। তুই পরীদিকে মারতে পারলি দাদা!

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। হ্যাঁ মেরেছি, বেশ করেছি। থামবি কিনা বল। বাড়িতে এসে সাতকাহন করে বাবা মাকে বলেছিস বুঝতে পারছি।

—বলব কেন। পরীদি বলতে বারণ করে দিয়েছে। পরীদি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বলল, মাসিমা মেসোমশাইকে কিন্তু বলতে যাস না! কীরে, বলবি না তো! আমার গা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর। পরীদির গা ছুঁয়ে আমি তিন সত্যি করে এসেছি। কাউকে বললে আমার পাপ হবে না!

পিলু এত সরল সহজ, বাবা আমার এক ধর্মপ্রাণ মানুষ, মায়া, ছোট ভাইটা, মা সবাই পরীর ব্যবহারে এত মুগ্ধ, আর আমি এমন অমানুষ! যত শুনছি, তত চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে উঠছে।

—পরীদি ভিতরে ঢুকে পাথরের থালা গ্লাসে খেতে দিল। বলল, রোদে মুখ পুড়ে গেছে তোর দেখছি। খা। খিদে পেয়েছে। আর তারপরই নিচে নেমে সবাইকে কী হম্বিতম্বি। —তোমাদের কাঁধে ঢাক নিতে কে বলেছে! যে আসছে, তাকেই যা-তা বলছ! দাদুর না হয় বয়স হয়েছে। বয়স হলে মাথা ঠিক থাকে না। পরীদিকে না সবাই বাঘের মতো ভয় পায় জানিস। পরীদির দাদুকে দেখলাম না। উনি নাকি ঠাকুরদালানে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন।

হত্যে দিয়েছেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, কে বলল তোকে?

—কে বলবে, পরীদির পিসি এসে উঁকি দিল। বলল, পরী তুই যা একবার। দেখ তুলতে পারিস কি না!

পরীদের পরিবারে আমার হঠকারিতা কত বড় বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে টের পেলাম। নিজের উপর আমার এত ক্ষোভ জন্মাল যে শুয়ে থাকতে পারলাম না। যেন শুয়ে থাকলে আমি হাঁসফাঁস করব। নিশ্বাস নিতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আর তখনই পিলু বলল, জানিস দাদা, পরীদি বিকেলেই এসে হাজির। সঙ্গে মুকুলদা, সুধীনদারা সবাই। পরীদি বাবাকে বলল, বিলু ফেরেনি মেসোমশাই? বাবা গুম মেরে বসে ছিলেন। বাবা পরীদিকে দেখে কী বুঝল, জানি না, শুধু বলল, ও তো মা ওরকমই। চাপা স্বভাবের ছেলে। কী যে হল বুঝি না। তবে ও ফিরে আসবে। আমার মনে হয় রেলের চাকরিটা ওর পছন্দ নয়। তা তুই যদি যেতে না চাস, আমরা জোর করব কেন! তুমিই বল মা, বুঝি তোর বাড়িঘর ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। কিন্তু মানুষের ঠিকানা তো এক থাকে না। বদলায়। ও সেটাই বুঝতে চায় না। তুমি ভেবো না। বাড়িঘর ছেড়ে ও কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। সেই যে একবার রাগ করে বর্ধমান চলে গেল, থাকতে পারল? পারল না। কালীবাড়ি এত কাছে, সেখানেও মন টিকল না। চলে এল। গেছে রাগ করে, আবার রাগ পড়লেই ফিরে আসবে।

—জানিস দাদা, পরীদি গেল না। বলল, দেখি একটু! আমি সকালেই চলে যাব পরীদিকে খবর দিতে।

আমার অবর্তমানে বাড়িতে এত ঘটনা ঘটে গেছে। পরী আমার ফেরার জন্য ছটফট করছে। বলতে পারলাম না, না যাবি না। পরী আমাদের কে? আমি মশারির বাইরে নেমে হ্যারিকেন উসকে দিলাম। জল খেলাম। দরজা খুলে বাইরের খোলা হাওয়ায় গাছের নিচে কিছুক্ষণ বসে থাকব ভাবলাম। কিন্তু পিলু দেখছি সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছে! —কোথায় যাচ্ছিস দাদা! দাদারে!

আমাদের দু'জনের স্বভাব দু'রকমের। পিলু বাবার স্বভাব পেয়েছে। সংসারের সব মানুষই তার আত্মীয়। বাবার স্বভাবও তাই। মা আমার সবাইকে বিশ্বাস করে না। মা'র এক কথা, বল বল বান্ধবল! জল জল রিদ্রের (হৃদয়ের) জল। কেউ কারো না। আমি বোধ হয় মা'র স্বভাব পেয়েছি। মা আমার সহসা ক্ষেপে যায়,—অভাবের সংসারে এক এক সময় মা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সারাদিন বাবার পেছনে টিক টিক করত। বাবার সেখানেও এক আপ্তবাক্য,—আরম্ভ হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ। অভাব কোন মানুষের সংসারে না আছে। অভাব ভাবলেই অভাব। তেনার মাপ মতো সব হচ্ছে। তুমি মাপামাপি করতে বসলে মানছে কে!

আমার আর দরজা খুলে বের হওয়া হল না। পিলু ত্রাসের মধ্যে আছে। আমি একা চুপচাপ কোথাও বসে থাকলে সে ভয় পায়। দাদাটার মাথায় কীসের পোকা ঢুকে গেছে। বাবা মা'র দুঃখ বোঝে না। সবাই যে তার দাদাটাকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে, সেটা ভেবে দেখে না। বের হলে, ঠিক চিৎকার করে উঠবে, বাবা বাবা, দেখ দাদা এত রাতে কোথায় চলে যাচ্ছে। আর একটা নাটক। অগত্যা শুয়ে পড়তে হল। পিলু বলল, কাল জানিস দাদা, আমাদের আর একটা ঘর উঠবে।

বললাম, কার জন্য।

—নবমী বুড়ির জন্য।

এটা বাড়াবাড়ি মনে হয়। নবমী বুড়ি তার জরা নিয়ে আমাদের বাড়িটায় এসে উঠতে চায়। ওর ঘরে যম নাকি ঢুকতে চায়। যমের ভয়ে কাবু। আমার হাসি পেল। আসলে বুড়ির যাবার সময় হয়ে গেছে। একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। দাদাঠাকুরকে দিয়ে বাবার কাছে খবর পাঠিয়েছে। বাবাও আজ সকালে গেছিলেন। বাবার এক কথা, বন বাদাড়ে মরে পড়ে থাকবে। শেয়ালে শকুনে খাবে—ঠিক না। নিদানকালে মানুষই মানুষের ভরসা। ছ ছ'টা পেট চললে, আরও একটা চলে যাবে।

পিলু কথা শুরু করলে থামতে চায় না। বলল, জানিস দাদা, নবমীর শেষ ইচ্ছে, মরার সময় আমি যেন ওর মুখে গঙ্গাজল দিই।

মানুষের তা হলে শেষ পর্যন্ত ঐ একটা ইচ্ছেই টিকে থাকে। আর সব ইচ্ছে উবে যায়। এ-সব ভাবতে ভাবতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি।

সকালে ঘুম ভাঙলে টের পেলাম, বেলা হয়ে গেছে। আমাকে কেউ ডাকেনি। গায়ে কেউ চাদর জড়িয়ে দিয়েছে। ভোর-রাতের দিকে সামান্য ঠান্ডা পড়ে। ঋতু বদলের সময়। চট করে ঠান্ডা লেগে

যেতে পারে, পিলু সব বোঝে। পিলুর একটাই অভিযোগ তার দাদাটি সম্পর্কে, দাদা বড় তার স্বার্থপর। কেবল নিজের কথা ছাড়া ভাবে না।

আমি নিজেও এটা বুঝি। তা না হলে কাল আমার এত মাথা গরম হবার কথা নয়। পরীর দাদু বলতেই পারেন, বসগে, পরে ডেকে পাঠাব। একজন প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক, একজন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এর বেশি কী আশা করতে পারে! পরী, পরেশচন্দ্রের সঙ্গে কোথাও বের হতেই পারে। কথাবার্তা চলছে, পরী রাজি হচ্ছে না, এক সঙ্গে দুজনে যদি কোথাও বের হয়—পরীদের আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। পরী তো আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অথচ কাল কেন যে সহসা রায়বাহাদুরের ব্যবহারে এত অপমান বোধ করলাম, পরীর উল্লাস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লাম, তারপর বিশ্রি কান্ড বাধিয়ে সারাদিন নিখোঁজ হয়ে থাকলাম,—বাড়ি ঘরের কথা ভাবলাম না,—এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কী থাকতে পারে। সকালে সবাইকে মুখ দেখাতেই এখন লজ্জা করছে। দিনের আলোয় শ্রীমানকে এবারে তোমরা সবাই দেখ,—বাবা হয়ত মনে মনে তাই ভাববেন। সবার সামনে দাঁড়াবার মতো আমার সাহসই যেন হারিয়ে গেছে। সংকোচে কেমন গুটিয়ে গেছি।

অথচ শুয়ে থেকেই টের পাচ্ছিলাম, মায়া ঠাকুরঘর থেকে পূজার থালা বাসন বের করে নিয়ে যাচ্ছে। পিলু, গরু বাছুর মাঠে দিয়ে আসছে। বাবার গলা পাচ্ছি। বোধ হয় ঝিঙে, কুমড়োর ফুল, ডগা, বেগুন সবজির জমি থেকে তুলে আনতে গেছেন। মা বাসি বাসনকোসন পুকুরে ধুতে গেছে। রোদ উঠে যাওয়ার এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাড়িটার। নিখোঁজ পুত্রটি ফিরে এসেছে। আর কোনো দুঃখ নেই সংসারে।

তখনই পিলুর গলা পেলাম, দাদা শিগগির ওঠ। মুকুলদারা আসছে।

এই রে! ওরা সবাই খবর নিতে আসছে, বিলু ফিরল কি না। সঙ্গে পরী নেই তো!

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। জামা গায়ে দিলাম। রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বেল বেজে উঠল। বাবা তার আগেই ওদের কাছে হাজির। এস, ভিতরে এস। ফিরেছে।

—কোথায় গেছিল?

আমি ঘরের ভিতর থেকেই শুনতে পাচ্ছি। জানালায় চুপি দিয়ে দেখছি, মকুল নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবু এসেছে। পরী নেই। পরী না থাকায় অনেকটা অস্বস্তি কেটে গেল। পরীদের বাড়িতে বিলু বিশ্রী কান্ড বাধিয়ে উধাও হয়েছিল, ওরা নিশ্চয়ই জানে না। পিলুর কথা থেকেই বুঝেছি পরীদের আভিজাত্যই আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা করেছে। ওরা পারিবারিক স্ক্যান্ডাল গোপন রাখতে হয় কী করে জানে।

আমার ঘরেই এসে ওরা বসবে। আমার এই তক্তপোষ ওদের বসার জায়গা। বর্ষায় চারপাশে ঝোপ জঙ্গল গজিয়ে উঠছে। এখন আর গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে বসা যায় না। আমার এই ঘরের চেয়ে গাছের ছায়ায় মাদুরে বসে গল্প করতে বেশি ভালবাসে মুকুল। মুকুলের এক কথা, গ্রীষ্মের দুপুরে এমন আরামদায়ক ছায়া নাকি পৃথিবীর আর কোথাও গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—বিলু কোথায়! বিলু!

—ঘরে আছে। যাও!

বাবা কি টের পান, তাঁর পুত্রটি এখন নিজেই বুঝতে পেরেছে, কোনো বড় গর্হিত কাজ করেছে। না হলে বাবা আজ ডাকলেন না কেন? এই বিলু ওঠ! কত বেলা হয়েছে। কত ঘুমাবি। সূর্যোদয়ের আগে বিছানা না ছাড়লে আয়ুক্ষয় হয়। বাবার এ-ধরনের অজস্র আপ্তবাক্য আছে, যা এখন আমরা শুনতে অভ্যস্ত।

ওরা রে রে করে ভিতরে ঢুকে বলল, কী ব্যাপার। কোথায় গেছিলে না বলে না কয়ে। পরী সকালে এসে হাজির। বিলুটার তোমরা খবর নেবে না? কোথায় গেল!

পরীই তাহলে এদের তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে।

সুধীনবাবু বলল, রাতে ফোন করে জানাল সুধীনদা কাল সকালে একবার যাও। বিলুটার যা স্বভাব, আমার ভয় করে।

পিলু এখন হাজির। সে বলল, দাদা সাইকেটা নিয়ে যাচ্ছি। এক্ষুনি চলে আসব।

—কোথায় যাবি?

—এই আসব। বেশিক্ষণ লাগবে না। তারপর সে আর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল।

আমি কারো সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিলাম না। ওরাই বেশী কথা বলছিল। আমাদের কবিতার রোগ আছে। মুকুল বলল, কোথায় গেছিলে কবিতার খোঁজে। জায়গাটা কেমন।

অবশ্য এটা আমাদের হয়। জীবনের সব রোমান্টিক দিকগুলি আমাদের ভারি কাতর করে রাখে। হোঁতার সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না রাতে বিলের জল দেখতে দেখতে প্রকৃতির কত রকমের রহস্য আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে। কোনো ধূলিওড়ির মাঠে ঝড়ে পড়ে গেলেও অবিরল জলের ধারার মতো রক্তে এক রণতরী ঢুকে যায়। হৃদয় নামক বস্তুটিতে সে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘন্টার পর ঘন্টা, এমন কী সারা রাত জিয়াগঞ্জের শীতের গঙ্গায় ধূ ধূ বালিয়াড়িতে হেঁটে যাবার সময় টের পেয়েছি, কেউ আমাদের অপেক্ষায় থাকে। বালির চড়ায় আমি মুকুল নিখিল শুয়ে থেকেছি জ্যোৎস্নায়। নদীর পাড়ে শ্মশানের সেই মানুষের দাহকার্য দেখতে দেখতে আকাশ নক্ষত্র এবং ঝিঁঝি পোকার ডাকে টের পেয়েছি,—কিছুই শেষ হয়ে যায় না,—'এই বনজঙ্গল, কিংবা শেষ অবশেষে / যেখানে যে প্রাণ বিচরণ করে / শুধু বিচরণ করে আর ধেয়ে যায় / কারণ অমোঘ নিয়তি তার পাখা মেলে থাকে/ তবু থাকে সে অনন্ত অক্লেশে। / ভ্রূণে, গভীর গোপন কোষে/ জীবনের বার্তা বার বার বহন করে/ কিছুই শেষ হয়ে যায় না/ সে থাকে অন্ধকারে নিমজ্জমান/ উষ্ণতায় কোনো শীতের সকালে / সে জেগে ওঠে/ কারণ, পিন্ডদানের আগে কিংবা পরে/ গোপন কোষে নিয়ত জাহাজের সাইরেন বেজে যায়।

মুকুল বলল, কিছু পেলে? এত চুপচাপ। কী ভাবছ?

বললাম, পেয়েছি।

—একলা গেলে কেন! কতদূর গেলে? আমরা তোমার এ-যাত্রার সঙ্গী হতে পারলাম না।

—অনেক দূর। অতদূর তোমাদের যেতে সাহস হত না! তাই কাউকে নিলাম না।

মুকুল বিখ্যাত এক কবির দুটো কবিতার বই নিয়ে এসেছে। সে-ই হাল আমলের কবিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করে। অনেক প্রিয় কবির কবিতা আমাদের মুখস্থ এখন। আমরা মাঝে মাঝেই প্রিয় কবিতার দু-এক লাইন কথায় কথায় উচ্চারণ করি। আর একটাই আকাঙ্ক্ষা আমরা কবে এমন কবিতা লিখতে পারব। ছন্দের প্রতি অনুরাগ আমার কম। ছন্দের ব্যাকরণও ভাল বুঝি না। কিন্তু গদ্য কবিতার সুষমা সহজেই ধরে ফেলতে পারি। যেন নাড়ী ধরে টান দেয়।

সুধীনবাবুর স্মৃতিশক্তি প্রবল। মুকুলেরও। ওরা সহজেই অনেক কবিতা মুখস্থ বলে যেতে পারে। আমি পারি না। দু-একটা পংক্তি মনে থাকে, সবটা মনে থাকে না।

আমরা ক্রমেই এক সময় দেখলাম, কবিতার আলোচনাতেই মগ্ন হয়ে গেছি।

সুধীনবাবু বললেন, কলকাতায় যাচ্ছি। সবার কবিতা নিয়ে যাব। তোমার দু-একটা কবিতা দাও তো ভাল হয়।

—কী যে বলেন! আমার দেবার মতো কবিতাই নেই। আসলে মুখচোরা মানুষের যা হয়। আমার কবিতা পরীর দয়ায় অপরূপায় ছাপা চলে। কলকাতার কাগজে কবিতা। ভাবা যায় না। চরম আহাম্মক মনে হয় নিজেকে। কিংবা আস্পর্ধা। বললাম, না, আমার সত্যি কিছু নেই।

মুকুল কেমন ক্ষেপে গেল।—তুমি না বিলু, শামুকের মতো স্বভাব তোমার। কবিতার প্রকাশ না হলে লিখে কী লাভ।

—লাভ অলাভ বুঝি না। আমার লিখতে ইচ্ছে করে না। তোমরা পীড়াপীড়ি কর বলে লিখি।

মুকুলও ছাড়বার পাত্র নয়। টেবিল থেকে খাতাটি খুঁজে বের করল। পর পর কটা পড়ে, —নিজেই দুটো কবিতা টুকে নিল। বলল, ঠিক আছে, এবারে খাতাটা যত্ন করে রেখে দাও।

এ-সময় মা থালায় করে মোয়া নাড়ু, তিলের তক্তি, দুধ কলা মুড়ি রেখে গেল। গরুর দুধ। পেঁপে কেটে একটা থালায় রেখে গেল। কৃতী সন্তানের বন্ধুরা এলে, বাবা তাঁর যথাসাধ্য সৎকার করতে ত্রুটি রাখেন না।

বাবা তঁর কৃতী সন্তানের বন্ধুদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখতে রাজি না। এতে তাঁর বাড়িঘরের

মর্যাদা বাড়ে। মুকুল তো মাসিমা, মেসোমশাইর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এক একটা নাড়ু মুখে দেবে, চেঁচিয়ে বলবে, দারুণ মাসিমা। বাবা শুনতে পান, মাও। আমি বুঝি এটা বাবার পক্ষে বড়ই সুখবর। ওরা চলে গেলে বাবা বলবেন, খাঁটি গরুর দুধ শহরে পাবে কোথায়? বাবার খুব ইচ্ছে একদিন সবাইকে খেতে বলেন। খাঁটি গাওয়া ঘি ঘরে হয়। মা সর তুলে জমিয়ে সপ্তাহে একদিন ঘি জ্বাল দেয়। সর বেটে জ্বাল দেবার সময় সত্যি সুঘ্রাণে বাড়িটা ভরে যায়। গাওয়া ঘি পাতে, খেতের বেগুন, মোচার ঘন্ট, লাউ দিয়ে মুগের ডাল এবং মাছ আর দই। মাছ বাদে প্রায় সবই এখন আমাদের বাড়িতেই মেলে। এটা একজন সংসারী মানুষের পক্ষে কত বড় সাফল্য, তাদের না খাওয়াতে পারলে সেটা যেন বোঝানো যাচ্ছে না।

ওরা চলে গেলেই পিলু হাজির।

সে হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে। কোথায় গেছিল জানি না। বাড়িতে বলেও যায়নি। সাইকেল থেকে নেমে দেখল তার দাদাটি ঘরের বাইরে বের হয়েছে। আমাকে পিলু চুরি করে দেখছে। কেন দেখছে বুঝতে পারছি না। ও কী টের পায়, আমি এখনও স্বাভাবিক নয়।

দেখলাম সাইকেলটা রেখে আমার দিকেই আসছে।

বললাম কোথায় গেছিলি!

সে খুব কাছে এসে বলল, পরীদিকে বলে এলাম।

পরীদির জন্য পিলুরও একটা কষ্ট আছে। তার দাদাটিকে নিয়ে পরীদি যে বিপাকে পড়েছে, সে সেটা বুঝতে পেরেই চলে গেছে। সে জানে, দাদার ফেরার খবর সবার আগে যদি কাউকে দিতে হয় তবে সে পরীদি। সে স্থির থাকতে পারেনি।

পিলু ফের বলল, পরীদির এক রাতে কী চেহারা হয়েছে তাকানো যায় না।

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কাল পরী যথার্থই বিদ্রোহ করেছে হয়ত। এমন একটা বিশ্রী কান্ড ঘটার পর পরী আমাদের বাড়িতে না হলে আসে কী করে! বাপ-ঠাকুরদার কাছে আমরা এখনও সবাই ছেলেমানুষ। আঠারো উনিশ বয়সে কত আর আমাদের সাংসারিক বুদ্ধি হতে পারে। পরীদের পরিবারও তাই ভেবে থাকতে পারে। বয়সের দোষে হচ্ছে। জীবনকে বোঝার বয়সই আমাদের হয় নি এমন ভাবতে পারে। পরীর উপর সতর্ক পাহারা যে ছিল না কে বলবে! না পরেশচন্দ্রের সঙ্গে বের হয়ে এসেছিল বিকালে। মানুষটি যথার্থই ভাল মানুষ। পরীর কথায় ওঠে বসে। পরী যদি পরেশচন্দ্রকে ডেকে পাঠায়, যতই গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য থাকুক, ফেলে ছুটে যাবেই। কে জানে, পরেশচন্দ্রের জিপে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে বলেছিল কি না, তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বিলুর খোঁজ নিয়ে আসছি। পরী কাল সাইকেলে এসেছিল কিনা জানি না। পরেশচন্দ্র আমাদের চেয়ে কয়েক বছর বেশি আগে পৃথিবীতে এসেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা তার আমাদের চেয়ে বেশি। পরীর সাময়িক দুর্বলতা ভেবে লেগে রয়েছে। কোনো কারণই থাকতে পারে না—পরীর মতো মেয়ের গরীব বামুনের পুত্রের জন্য এত দুর্বলতা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। পরীর চোখে মুখে আশ্চর্য এক দেবীমহিমা আছে সে টের পেয়েছে। পরীর শরীরের সবটাই যেন মা জগদ্ধাত্রীর জীবন্ত রূপ। এত রূপ যার তার আগুনে কোন্ পতঙ্গ পুড়ে মরতে না ভালবাসে।

পিলুকে বললাম, শোন পিলু।

পিলু কাছে এলে দু'ভাই বাবার ফুলের বাগান পার হয়ে রাস্তার ধারে আমগাছটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। শোন বললে, পিলু বুঝতে পারে দাদার কোনো গোপন কথা আছে। সে-কথা দাদা তাকেই বলতে পারে। আর কাউকে না।

খুব সতর্ক গলায় বললাম, পরী সাইকেলে এসেছিল?

—না তো।

—কার সঙ্গে এল? সুধীনবাবুদের সঙ্গে?

—না তো।

—তবে।

—পরীদি একাই এসেছিল। পরে মুকুলদারা।

আমার দুশ্চিন্তা, পরীর গালে আমার হাতের ছাপ থাকলে বাবা ঠিক টের পাবে। বাবা কেন, মা, মায়া সবাই।—ওমা পরী তোমার গালে কালসিটে দাগ কেন, কী হয়েছিল?

পরী যে এল, কালসিটে দাগ ছিল না? পিলুকে বললাম।

পরীদি খুব সেজে এসেছিল।

—সেজে এসেছিল?

—হ্যাঁরে দাদা। কপালে বড় আলতার টিপ। মুখ ঝকমক করছিল।

আসলে পরী কাল মুখোস পরেছিল। পরেশচন্দ্রের সঙ্গে এত সেজে বের হয়েছিল যে প্রসাধনের নিচে তার কালসিটে দাগ ঢাকা পড়ে গেছিল। এই দাগ আড়াল করার জন্য পরী তবে এত সেজেছে। দু-দিকই রক্ষা করেছে পরী। দাদুর দিক। দাদু দেখে বুঝেছে হয় তো, পরীর মোহ কেটে গেছে। না হলে পরেশচন্দ্রকে নিয়ে বিকেলে বের হবে কেন, এত প্রসাধন করবে কেন। আর বাবাকে ধোঁকা দেবার জন্য, গালের কালসিটে দাগ দেখলে বাবা প্রশ্ন না করে পারবেন না—মিথ্যা কথা বলতে পরীরও কেন জানি সংকোচ হয়—বাবার সঙ্গে মিছে কথা বলতে পারে না। বাবা মা মায়া কেউ টের না পায়, পরীর গালে কালসিটে দাগ পড়েছে। এমন সুন্দর মুখে সে দাগ কত বড় কলঙ্কের! কলঙ্কের না গৌরবের ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পরী আমাকে নির্ঘাৎ ডোবাবে। কেমন ভয় ধরে গেল। এমন জেদি মেয়েকে আমি কেন, কারও যেন সামলাবার ক্ষমতা নেই। পরী কী ভাবে, আমি তার হাতের খেলনা?

এ-সব জটিল চিন্তা ভাবনায় আমার মাথাটা কেমন ধরে গেল। পিলুকে বললাম, ঠিক আছে যা।

আর তখনই দেখি বাবা কোত্থেকে দু-জন ঘরামিকে ডেকে এনেছেন। বাবা বললেন, স্কুল থেকে ফিরে কোথাও আজ আর বের হবে না।

তারপর যেন আমার অনুমতির জন্য বলা, নবমীর ঘরটা ঠাকুরঘরের পাশেই তুলছি। কী বলিস! কাছে হবে। এই বয়সে তো তাঁর যত কাছাকাছি থাকা যায়।

পিলু ঘরামি দুজনের সঙ্গে ছুটে গেছে বাঁশ-ঝাড়ের দিকটায়। বড় বড় কটা বাঁশের খুঁটি লাগবে। বাঁশ কাটার শব্দ কানে আসছিল।

আমি কিছুতেই কালকের দুর্ব্যবহার ভুলতে পারছি না। পরী আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, না পরী যাচাই করে দেখল ওর প্রতি আমার সত্যি দুর্বলতা আছে কি না। একবার দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে যে-ভাবে পরী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, তারপর থেকে ওকে যতটা সম্ভব পরিহার করে চলেছি। তবে আমি পরিহার করে চললেও সে বার বার বেহায়ার মতো আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ি ঘুরে গেছে। এতে আমার ক্ষোভ হত, সে টের পেত। কিন্তু পরী জানত না, তাকে আমি নিজের মনে করি কিনা! গতকালের দুর্ব্যবহারে টের পাইয়ে দিয়েছি, আমার সত্যি অধিকার জন্মে গেছে। না হলে আমি তাকে এমনভাবে অপমান করতে পারি না। কানের কাছে কে যেন একই সুরে কেবল ছড় টেনে যাচ্ছে,—এ-যে তোমার কত বড় অধিকার বিলু তুমি জান না। কিছুতেই এই কথাগুলি ভুলতে পারছি না। চোখ মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠছে। বাবা বাড়িতে গাছপালা লাগাবার মতো যেন টের পান, তাঁর এই ঔরসজাত গাছটিতে পোকা লেগেছে।

গাছপালা তার ঠিকমতো মাটিতে শেকড় চালিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত বাবা বড় সতর্ক থাকেন। একজন মানুষের এই কাজ। তার উত্তরপুরুষকে ঠিকমতো রোপণ করে যাওয়া। না করতে পারলে অসফল মানুষ, কিংবা কোনো উদ্ভিদ রোপণে তাঁর যে মহিমা থাকে—নিজের সন্তানের বেলায় তা ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ্মীর অপমৃত্যুর পর আমার মুখে ঠিক এমনি হয়তো বিষণ্ণতা টের পেয়েছিলেন। না হলে বলতেন না, তোমাকে এক খন্ড জমি দিলাম, জমিতে তোমার খুশিমতো শাকসব্জি লাগাও। বলতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুই শেষ কথা নয়, জীবনে বেঁচে থাকাই বড় কথা। আসলে বাবা আমাকে জীবনের অন্য এক আকর্ষণে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। এখন সেটা বুঝি। আজও যে বললেন, স্কুল থেকে ফিরে কোথাও বের হবে না, সেই একই কারণে।

স্কুল থেকে ফিরলে বাবা বললেন, খাওয়া হলে আমার সঙ্গে যাবে।

সামান্য অপ্রসন্ন গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে আমি কোথায় যাব?

বাবা জানেন, আমি তাঁর সঙ্গে কোথাও যাওয়া আজকাল পছন্দ করি না। যজমানদের শ্রাদ্ধ শান্তিতে, বিয়ে উপলক্ষে, কখনও ন'জন, কখনও দ্বাদশ ব্রাহ্মণের দরকার হয়। বাবাই সব ঠিক করে দেন। মূল কথা বাড়িতেই আমাকে নিয়ে তিনজন সৎ ব্রাহ্মণ আছেন। এই তিনজন আমি, পিলু, বাবা। এখন আমি এ-সব নিমন্ত্রণে কিছুতেই যেতে চাই না। বাবা যেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, তাঁর যজমানদের দেখাবার জন্য,—দেখ, আমার পুত্র কেমন লায়েক। কেমন সুপুরুষ। ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কলেজের একটা পাশ দিয়েছে।

এ-ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার যজন-যাজন আমার আদৌ মনঃপূত নয়। আমি পিলু দাঁড়িয়ে গেলে বাবাকে আর এ-কাজ করতে দেব না, এমনও মনে মনে কতবার ভেবেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, বাবার সম্ভ্রম-বোধ আর আমার সম্ভ্রম-বোধ যেন আলাদা। নিমন্ত্রণে গেলে নিজেকে পেটুক বামুন ছাড়া ভাবতে পারতাম না। কলেজে পড়ার সময়ই বাবাকে সাফ বলে দিয়েছিলাম, এবার থেকে বাড়ির একজন বামুন বাদ দিয়ে লিস্ট করবেন। আমি কারো বাড়িতে কোনো আত্মার সদ্‌গতি করতে রাজি না।

বাবা শুনে অবাক হয়ে গেছিলেন। ছেলে কী তাঁর ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে! মানুষের সদ্‌গতি বলে কথা। একে তো সৎ ব্রাহ্মণ আজকাল পাওয়া কঠিন। আচার নিয়ম মানে না। গলায় পৈতা থাকলেই বামুন হয়, তিনি মানেন না। তাঁর চেনা জানা কিছু ব্রাহ্মণ শহরে আছেন, কিন্তু আজকাল এতদূর হেঁটে কোনো সৎ ব্রাহ্মণই কারো সদ্‌গতির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে না। এ-হেন অসময়ে তাঁর নিজের পুত্রটি পর্যন্ত বেঁকে বসবে, তিনি বোধহয় অনুমানও করতে পারেন নি। এবং এক সকালে বাবা যখন আমাকে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারলেন না, ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, তোমার আজকাল কী হয়েছে বুঝি না। মানুষের অসময় বুঝতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে, সৎ ব্রাহ্মণ ভোজনে আত্মার সদ্‌গতি হয়। মানুষের কাজে কর্মে আমি কোথায় যাব।

বলেছিলাম, সে আপনি বুঝবেন। আমার যেতে ভাল লাগে না। আসলে ভাল না লাগারই কথা। বাবা তো সকালে প্রাতঃস্নান সেরে নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে ঠক ঠক শব্দ তুলে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন। বাবার বেলায় বের হওয়া কথাটা যেন মানায় না। নিষ্ক্রান্ত হলেন, এমনই মানায়। এত বেশি আচার বিচার, যেন মনে হবে বাবা বড়ই পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছেন। তীর্থ করার সামিল। অথবা মনে করেন তাঁর মন্ত্রপাঠে সংসারী মানুষের আপদবিপদ কেটে যায়। অশুভ আত্মার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। মানুষের এটা কত বড় দায়, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি যদি তা বুঝত। বাবার ক্ষোভের কারণ বুঝি। আমি বাবাকে, শুধু বাবাকে কেন, পরিবারের সবার কাছ থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছি বাবাও এটা বোধ হয় খুব দোষের মনে করেন না। গাছ যখন বাড়ে,—তখন সে দূরত্ব বজায় রাখতেই চায়, নইলে গাছটা তার নিজের ডালপালা মেলবার জায়গা পাবে কোথায়। বীজ-তলা থেকে গাছ তুলে সময়কালে রোপণ করতে না পারলে গাছে ফসল ফলবে কেন। আম জামের কলম কেটে রোপণ করতে হয়। গাছ থেকে গাছ আলাদা হয়ে নিজের মতো বাড়ে। আমিও বাড়ছি। আমার আলাদা অস্তিত্ব এ-সংসারে বীজতলা থেকে চারা গাছ তুলে নেবার মতো। এতে মা আমার যতটা কাতর, বাবা তত নন।

পিলুই একদিন বলেছে, জানিস মা না কাঁদছিল!

—কেন রে!

—তুই নাকি কেমন হয়ে যাচ্ছিস।

—আমি আবার কী হলাম!

—সংসারে তোর টান নেই। মন উড়ো উড়ো। বাবা মা'র কান্না দেখে ঘাবড়ে গেছিল। বলল, বয়সের দোষ। পাখা গজাচ্ছে। উড়তে শিখেছে। জীবের ধর্মই নাকি এমন।

আমাকে নিয়ে বাড়িতে যে অশান্তি চলছে, পিলুর কথায় ধরতে পারি। আমি নাকি বাড়িতে এক দন্ড থাকতে চাই না। বাইরে আমার এত কী রাজকার্য থাকে মা নাকি বুঝতে পারে না। বেশি রাত না হলে ফিরি না। সবাই বারান্দায় আমার অপেক্ষায় বসে থাকে—বাবা ক্ষোভ সামলাতে না

পারলে আক্ষেপ করে বলবেন, খুবই কান্ডজ্ঞানের অভাব।

কান্ডজ্ঞানের কত বড় অভাব কালকের ঘটনার পর এটা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি। সে জন্য বাবা যখন বললেন, নবমী বুড়ীর জঙ্গলে যাব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। আমি না করতে পারলাম না।

ঘরামি দু'জন, ছোট্ট কুঁড়েঘরটা আজই বানিয়ে ফেলেছে। মাথায় তালপাতার ছাউনি। চারপাশে পাটকাঠির বেড়া। ঝাঁপের দরজা একটা। মুগুর দিয়ে মাটি বসিয়ে ভিটে তৈরি করে ফেলেছে। বাবা নিজেও সারাদিন তাদের সঙ্গে খেটেছেন। পিলুকে স্কুলে যেতে দেন নি। ঘরটা তোলার ব্যাপারে পিলুর আগ্রহই বেশি। মা নিমরাজি হয়ে আছে। তবে সবাই চাইলে মা না করে কী করে। বিশেষ করে মেজ পুত্রটি কবে থেকে নবমীকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য বায়না ধরেছে। রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে জীবন্ত একটা মানুষকে নিয়ে শেয়াল কুকুরে টানাটানি করবে ভেবেই সে অস্থির ছিল। কার জন্য কীভাবে যে মানুষের টান ধরে যায়, পরীর জন্য না হলে আমার এমন নাড়ির টান জন্মায় কী করে! দু-বছর আগেও সে জানত না পরী বলে এক নারী পৃথিবীতে বড় হচ্ছে। এখন তো সব এক দিকে, পরী একদিকে। সে পরীর ভালোর জন্য জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে। আর দিতে পারে বলেই, সে সহজে পরীর কাছে ধরা দিতে চায় না। পরী ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই ক্ষেপে যায়। পরীকে এমন বাড়িঘরে মানাবে কেন!

পরীর ছলনায় শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হল।

এমন যখন ভাবছিলাম, বাবা বললেন, চল। পিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দৌড়ে যাও। খবর দাওগে আমরা যাচ্ছি। কী যে বায়না বুড়ির, সবাই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাকে। আসলে নবমী তার প্রিয় বনজঙ্গল ছেড়ে চলে আসবে। আসার আগে সবাই সামনে না থাকলে যেন জোর পাবে না। দাঠাকুর, বড় দাঠাকুর, বাবাঠাকুর, সবাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। যেন সেই জঙ্গলের প্রতিটি গাছপালা, কীটপতঙ্গ, প্রাণীকুলের কাছে বলতে পারবে, তোমরা আমায় এতদিন খাইয়েছ পরিয়েছ, এখন আমি ঠিকমতো হাঁটাহাঁটি করতে পারি না,—মরে থাকলে আমার আত্মার সদ্‌গতি কে করবে! তেনারা তিন বামুন ঠাকুর এসেছেন, শেষ বয়সের সম্বল তেনারা। তাঁরা আমাকে ভালই রাখবেন। দেখছ না সবাই নিতে এসেছেন।

নবমীর এত আবদার পিলুর জন্য সহ্য করা হচ্ছে। পিলুকে আমরা জানি এ-রকমেরই।

মা বলেছিল, বুড়ি কাঁথা কাপড়ে হেগে মুতে রাখলে কে পরিষ্কার করবে!

পিলু বলেছিল, আমি করব মা! তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি সব করব।

পিলুর কী আগ্রহ বুঝতে বাবার আর কষ্ট হয়নি। বাবা বলেছিলেন, ধনবৌ, যে যার ভাগ্যে খায়। নবমী পিলুকে শেষ আশ্রয় ভেবেছে। ক'দিন আর বাঁচবে। যে ক'টা দিন বাঁচে, মানুষের কাছে থাকুক। এতে ঘরবাড়ির পুণ্যই অর্জন হবে। এর সঙ্গে তোমার ছেলেমেয়েদের শুভাশুভও জড়িয়ে আছে। যদি কুকুর-শেয়ালে খায়, তবে মানুষের কত বড় অপমান হবে বল।

এরপর আর মা কী বলবে!

কেবল বলেছে, যা ভাল বোঝ কর।

সেই ভাল বোঝাটা মা'র নিমরাজি হওয়া। আসলে এ-পরিবারে কার ঠাঁই হবে না হবে, তার শেষ অনুমতি দেবার দায়িত্ব আমার মা'র।

আমি ও বাবা যাচ্ছি। সূর্য নেমে গেছে। বাবা, পাঁজি দেখে বলেছেন সাঁঝবেলার পর যাত্রা শুভ। পিলু আগেই দৌড়ে গেছে। বেশ খানিকটা দূরত্বে বনজঙ্গলের শুরু। এদিকটায় আরও বাড়িঘর উঠেছে। কেউ বারান্দায় বসে পিতা-পুত্রকে জঙ্গলের দিকে অসময়ে যেতে দেখে, প্রশ্ন করেছে, কোথায় যাচ্ছেন কর্তা। বাবা বলেছেন, এই কারবালায় যাচ্ছি। একটু কাজ আছে। নবমীকে আনতে যাচ্ছেন ঘুণাক্ষরেও বলছেন না। বললেই তিনি যেন আবার তামাসার পাত্র হয়ে যাবেন। কর্তার চিড়িয়াখানায় আর একটি জীবের আমদানি হচ্ছে, এমন ভাবতে পারে। কেউ কেউ বুড়িকে জঙ্গলের ডাইনি বলতেও দ্বিধা করে নি। অন্যের কী দোষ, যেদিন আমি নবমীকে প্রথম দেখি, সেদিন আমারও এমন মনে হয়েছিল।

বনজঙ্গলে ঢোকার আগে কিছু খানাখন্দ পার হতে হয়। বাবার হাতে হ্যারিকেন। পকেটে দেশলাই। বর্ষাকাল বলে বনজঙ্গল গভীর ঘন। কোথাও বড় বড় গাছ কিংবা পরিত্যক্ত ইঁটের ভাটার গভীর গর্তে জলাশয়। কত রকমের সব পাখি ওড়াউড়ি করছে। নির্জন নীল ধূসর বর্ণের পৃথিবীর মধ্যে আমরা ক্রমে ঢুকে যাচ্ছি। কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না এদিকটায়। একটা সরু পথ বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কারবালার লাল সড়কে গিয়ে পড়েছে। দিনের বেলাতেই আমার আর পিলুর শহর থেকে ফেরার রাস্তা শর্টকাট করতে গেলে গা ছমছম করত। কোথাও এতটুকু রোদ ঢোকে না। ডাহুক, বনমুরগি, কখনও ঘুঘুপাখির, ডাক শোনা যায়। আর সাঁঝবেলায় শেয়ালের দল কবরের গর্ত থেকে উঠে আসে। বোধহয় অন্ধকারকে তারাও ভয় পায়। যখন রাতে শেয়ালেরা চিৎকার করতে থাকে, তখন মনে হয়, এক আদিম ঘোর অরণ্যের পাশে আমরা বসবাস করি।

বাবা বললেন, দেখে হাঁটবে।

তাই হাঁটতে হয়। সাপখোপের উপদ্রব বড় বেশি। জঙ্গলটার একটা দিক সাফ হয়ে যাওয়ায় মানুষের তাড়া খেয়ে বিশাল সব গোখরা, চন্দ্রবোড়া, ডাঁড়াস এসে এখন এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গলটার মধ্যে খুঁজলে এখনও দু-একটা নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। পোড়ো বাড়ি চোখে পড়ে। এক সময় ইংরাজরা এ-তল্লাটেই তাদের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। লাল সড়ক ধরে গেলে, বিশাল রাজবাড়ির পাঁচিল, কাশিমবাজারের নীল মাঠ, দূরে একটা খালের মতো আদি গঙ্গায় জলজ ঘাস, এবং তারপর কী আছে আমরা জানি না। আমি আর পিলু একবার গঙ্গার ধার ধরে এগোতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, ও-পার দেখা যায় না এমন মস্ত বড় ঝিল। নবাবের আসল প্রাসাদ ঝিলের তলায়। জগৎ শেঠের প্রাসাদ ঝিলের তলায়। কাশিমবাজারে ঢুকলেই মনে হত পরিত্যক্ত শহর। ইঁটের দালান, দাঁত বের করা, প্রতি বছরই কালে কাউকে না কাউকে খায়। এজন্য বাবা আমি খুবই সন্তর্পণে হাঁটছি। পিলুর এই বনজঙ্গলের ঘোরা খুব প্রিয় কাজ বলে, সে গন্ধ শুঁকে টের পায় কোথায় কী পড়ে আছে। পিলু যা টের পায়, আমরা পাই না।

আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়।

বাবার সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমার এখন আর হয় না। বাবার ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার বছর থেকেই। আজ যে যাচ্ছি, সে নিতান্ত দায়ে পড়ে। দায়টা বর্তেছে অনুতাপ থেকে বুঝি। পরীকে মেরে ভাল নেই, মনের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে, মানুষ কুকাজ করলে যা হয়, আমারও তাই হয়েছে। বাবার কথা ফেলতে পারিনি। সুবোধ বালক হয়ে গেছি।

বাবা অনেকদিন পর তাঁর বড় পুত্রকে নিয়ে আকাশের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

জঙ্গলটায় ঢুকে বাবা বললেন, নবমীকে নিয়ে যেতে বেশ রাত হবে দেখছি।

বললাম, কাল সকালে গেলেই হত। রাত করে!

—নবমী নাকি দিনের বেলায় আসতে রাজি না। তা ছাড়া সময়টা খুব শুভ।

হতেই পারে। ওকে দিনের বেলায় হাঁটিয়ে নিয়ে এলে পাড়ার ছেলেরাই পিছু নেবে। সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আমাদের মাথা খারাপ আছে ভাবতে পারে। পিলু পর্যন্ত তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলেনি, জঙ্গলের বুড়িটাকে বাবা বাড়ি নিয়ে আসবে। এমনকি পিলু একাই যায় রোজ। কারণ, দু-একজন সঙ্গে গেলে সে বুঝেছে বুড়ি ক্ষেপে যায়। বুড়িরও দোষ নেই। এমন প্রেতের মতো বুড়িকে দেখলে ভয় হবার কথা। নবমী বয়সকালে খুবই রূপবতী ছিল, বিশ্বাস করা কঠিন। ছেলে-ছোকরারা জঙ্গলে ঢুকে বুড়িকে ঢিলটিলও মেরেছে। পিলু নালিশ পাবার পরই শাসিয়ে দিয়েছে সবাইকে। এক পিলু গেলেই বুড়ি শান্ত থাকে। গড় হয়। আর কেউ গেলেই এমন শাপশাপান্ত শুরু করবে যে, ছেলেছোকরাদের রাগ বেড়ে যায়।

সাঁঝ লাগতেই আমরা নবমীর জঙ্গলে হাজির। পিলু চিৎকার করে বলছে, নবমী, বাবা আসছে। দাদা আসছে। বের হয়ে দেখ।

নবমী বের হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। বেঁকে গেছে নবমী। দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ল নবমী। অনেক দূরে আছি। দূর থেকেই দেখলাম, সে মাটিতে মাথা ঠুকে তার বাবাঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

কাছে গেলে দেখলাম, নবমী আজ কেমন চুপচাপ। পিলুই নবমীর হয়ে কথা বলছে। কি কি করতে হবে সেই কথা। নবমী শুধু বড় বড় চোখে আমাকে বাবাকে দেখছে। ভাগ্য তার এত সুপ্রসন্ন হবে জীবনেও হয়ত ভাবতে পারেনি। কেউ তাকে শেষ সময়ে বাড়ি তুলে নিয়ে যেতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি। পিলু যে মাঝে মাঝে বলত, নবমী তুমি আমাদের বাড়ি যাবে? ছেলেমানুষের কথা, সে বলত, আমার কপালে সইবে না দাদাঠাকুর। সেই দাদাঠাকুর শেষ পর্যন্ত সবাইকে রাজি করাতে পারবে, এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। বাবা তার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করেছেন, খবরটাও কেমন দাদাঠাকুরের ছেলেমানুষী বলেই এতক্ষণ হয়ত ভেবেছে। বাবা গতকাল এসে কী জেনে গেছিলেন, তাও জানি না।

কিন্তু পিলুর কথায় বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

পিলু বলল, নবমী বলছে, ওর ঘরের কোণায় একটা কাঠের বাক্স আছে। ওটা নিতে হবে। কী ভারি! দেখ। বলে সে কিছু খড়কুটো সরিয়ে বাক্সটা দেখাল। কবেকার একটা কাঠের পেটি। কিন্তু উই কিংবা অন্য কোনো পোকামাকড়ের উপদ্রবে পড়েনি।

বাবা বললেন, ওতে কী আছে তোমার?

নবমী হাতজোড় করল শুধু।

যেন নবমী বলতে চায়, কী আছে বাবাঠাকুর শুধাবেন না। নিয়ে যেতে হবে, এইটুকু সে শুধু বলতে পারে।

বাবা বললেন, দেখি পেটিতে কী আছে? এত ভারি!

আর পেটি খুলে আমরা অবাক। ক'খানা আস্ত ইঁট। ইঁটের ভাটায় কাজ করত নবমীর মরদ। তারই স্মৃতি।

বাবা হেসে ফেললেন, ওগুলো নিয়ে কী হবে?

নবমী ফের হাতজোড় করল। যেন এগুলি সঙ্গে না নিলে নবমী তার ইঁটের ভাটার পোড়ো বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। ছেঁড়া কাঁথা-বালিশ, এমনকি সে তার পোঁটলা-পুঁটলি সম্পর্কেও কিছু বলছে না।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষটার শেষ স্মৃতি। এই নিয়ে সে বেঁচেছিল তবে। কী করবি, নিতেই হবে।

—স্মৃতি যখন একটা-দুটো নিয়ে গেলেই হয়। সবকটা নেবার কী দরকার! আমি না বলে পারলাম না।

বাবা উবু হয়ে তখন হ্যারিকেন ধরাচ্ছেন। গাছপালার আবছা অন্ধকারে সাঁঝবেলার আঁধার ঘন হয়ে উঠছে। ঘরের সবকিছু অস্পষ্ট। ভ্যাপসা স্যাঁতসেতে ঘর। নোনায় ইঁট-বালি খেয়ে গেছে। একটা দিক ধসে পড়েছে। ভাটা পরিত্যক্ত হলেও, সবাই চলে গেলেও, নবমী স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে এখানটায় সেই কোন্ অতীতকাল থেকে পড়ে আছে ভাবতে অবাক লাগে। বিশ্রী গন্ধ। কাঁথা-বালিশ এত নোংরা যে, তার থেকেই ভ্যাপসা গন্ধটা উঠতে পারে। নবমীর নিজেরও ভারি জীর্ণ বাস পরনে। এককালে ত্যানাকানি পরে থাকতে দেখেছি। পিলুই বাবার কাছ থেকে চেয়ে বছরে আজকাল দুটো-একটা দানের কাপড় দিয়ে যায়। একটা ছাগল আর তার গোটা তিনেক বাচ্চা গুড়ি মেরে অন্ধকার কোণে শুয়ে আছে। ঘরেই রাম-ছাগলের নাদি জমা করে রেখেছে বুড়ি। দুটি মাটির মালসা ছাড়া আর কিছু বুড়ির সম্বল নেই।

বাবা এবার হ্যারিকেনটা তুলে কাঠের পেটিটা টেনে বললেন, পিলু তুই একটা ইঁট নে। না নিলে যখন যাবে না কী করা!

নবমী ফের বাবার দু'পায়ে গড় হয়ে পড়ল।

পিলু নবমীর আচরণ দেখে সব বুঝতে পারে। নবমী কৃতজ্ঞতায় এতই অধীর যে, চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পিলু বলল, ও রাজি না বাবা।

—তোকে কে বলল?

—নবমী।

—দাঠাকুর। বলে নবমী পিলুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। হাড় ক'খানা সম্বল করে নবমী বেঁচে আছে। চোখ কোটরাগত। চোখের ভাষা বোঝার উপায় নেই।

পিলু বলল, তোমার সবক'টা ইঁট কে নেবে। বুঝতে পারছ না, কতটা রাস্তা যেতে হবে। হেঁটে যেতে পারবে ত?

—পারব দাঠাকুর।

—তোমার ছাগলটাকেও নিয়ে যেতে হবে।

—হ্যাঁ দাঠাকুর।

—তোমাকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

—হ্যাঁ দাঠাকুর।

—কেবল হ্যাঁ দাঠাকুর, হ্যাঁ দাঠাকুর। পিলু কিছুটা যেন ক্ষেপেই গেছে। তোমার এত আবদার, সবকটা ইঁট নিয়ে যেতে হবে! কে নেবে এত!

—আমি যে সবক'টা ইঁট পাহারা দিতেছি। আমার আর কোনো সম্বল নেই। বলে কী! এই ক'টা ইঁট পাহারা দিতেছি!

বাবা বললেন, কেন? পাহারা দিতেছ কেন? তোমার যখের এত ভয় কেন?

নবমী বোধহয় আর পারল না। কেবল কাঁদতে থাকল।

পিলু ধমকে উঠল, আচ্ছা ফ্যাসাদ হল। দেব সবক'টা ইঁট জলে ফেলে। বাবা কত কষ্ট করে নিতে এসেছে, আর তেনার আবদারের শেষ নেই।

বাবা বললেন, বকিস না। ওর মাথা ঠিক নেই। বনজঙ্গলে থেকে ও তো একটা গাছ হয়ে গেছে। গাছটাকে নিয়ে কোথাও লাগালেও বসবে না। যা বলছে তাই কর। কী বলছে ছাই তাও বুঝতে পারছি না।

বাবা হ্যারিকেনটা আরও উস্‌কে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ছাগলটা সঙ্গে নিচ্ছি। পিলু কাল এসে তোমার কাঠের পেটি থেকে ইঁট ক'খানা নিয়ে যাবে। সঙ্গে বনমালী আসবে। মাথায় বয়ে নিতে ওর কষ্ট হবে না। বলে একটা ইঁট বের করে ওজন দেখলেন! যেমন ইঁটের ওজন হয় তেমনি। খুব ভারি। বহু বছর আগে তৈরি ইঁট,—অথচ এতটুকু ক্ষয়ের চিহ্ন নেই।

বাবা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইঁটের ভেতর সাপের আস্তানা গড়ে ওঠে। ইঁটের ডাঁই যেখানে পড়ে থাকে, সাপ সেখানে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বুড়ির মনে হয়েছে, পেটির মধ্যে সাপ ঢুকে বাসা বানাবে। ওর মরদের স্মৃতি সাপের বাসা হবে, ভেবেই হয়তো আকুল। দরজায় লাঠি নিয়ে বসে থাকে, পাহারা দেয়। সত্যি দেখছি নবমীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নবমী বোধহয় আর পারল না। সে দাঠাকুরের রাগ দেখেছে, দাঠাকুরকে ভয়ও পায়! দাঠাকুর মালসায় ভাত বেড়ে দেয়। তরকারি ভাজা সব। খাওয়া হলে ডোবার জল থেকে ধুয়ে রেখে যায়। ঘটি করে খাবার জল রেখে যায়। ভয় পেতেই পারে। সেই ভয় থেকেই যেন বলা, যেন দাঠাকুর রেগে গেলে রক্ষা থাকবে না, সবক'টা ইঁট ডোবার জলে ফেলে দেবে। বলবে, এবার হল! চল এবার!

সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল, তার কিছু থেকে বুঝতে পারলাম, ওর মরদ ছিল লুটেরা। সেই কোন্ অতীতে পুলিশের তাড়া খেয়ে বাংলা মুলুকে চলে আসে। সেই কোন্ অতীতে নবমী নামে গাঁয়ের এক স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে ভালবেসে ফেলে। তারপর থেকে পুরুলিয়ায় ইঁটের ভাটায় কাজ। নবমীর এক কথা ছিল, লুটেরার কাজ করলে জলে ডুবে মরবে। মানুষটা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল! এক রাতে চলে গেল কোথায়। হপ্তা পার করে ফিরল। কাঠের পেটি আর দুটো মুরগি সঙ্গে ফিরে এল। নবমী বলল, লুটেরার সব ইঁটের ভেতরে আছে গো বাবু। আমারে দিয়ে গেছে। আমি দাঠাকুরে দিয়ে যেতে চাই।

আমাদের কারো মুখে রা নেই।

পিলু বলল, ইঁট ক'খানায় কী আছে তোমার। ওতে আমার কোঠাবাড়ি হবে?

—ভেঙে দেখেন না। কোঠাবাড়ি হবে না কেন দাঠাকুর!

একটা ভাঙতেই আমাদের চক্ষু স্থির। সোনার একটি ছোট পিন্ড। দু-তিন ভরি ওজনের কম হবে না।

পিলু কেমন ঘাবড়ে গেল, নবমী তুমি ডাকাতের বৌ ছিলে?

—না দাঠাকুর। আমার কাছে মানুষটা সাচ্চা মানুষ। খেটে খেয়েছে। শেষ লুটের মাল বিঁচে খায়নি। বুলেছে, আমি না থাকলে, তুই বিচে খাবি। আমি খাইনি। পাহারা দিচ্ছি। বনজঙ্গল ছেইড়ে যেতে পারিনি।

বাবা আমার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পিলু আমি সবাই এই গভীর বনজঙ্গলের অন্ধকারে মানুষের আর এক মহিমা আবিষ্কার করে মুহ্যমান। ভালবাসলে ডাকাতও মানুষ হয়ে যায়। ভালবাসলে মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়।

বাবা কিছুটা যেন অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছেন। —তোমার মরদের পাপ দাঠাকুরের মাথায় চাপাতে চাইছ!

—না, বাবাঠাকুর। সব পাপ তেনার। বাবাঠাকুর আপনার আলয়ে বিগ্রহ সেবা হইয়ে থাকে! তার সেবায় এসব লাগলে আমার মরেও শান্তি বাবাঠাকুর।

নবমী বাবার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, দাঠাকুর আমার জীবন্ত বিগ্রহ। তার সেবায় লাগুক। সব পাপ আমার। সব পাপ লুটেরার। আপনি বাবাঠাকুর অন্যমত করবেন না গো।

আমিই বাবাকে সাহস দিলাম, মানুষের সেবায় লাগলে দোষের কী!

তবু বাবা যেন কিছু ঠিক করতে পারছেন না। আসলে আমার মা শেষ পর্যন্ত যদি রাজি না হয়। পাপের ধন ছুঁতে নেই। তবে বাবা জানেন, মা বৈষয়িক বুদ্ধি বেশি ধরেন।

বললাম, সঙ্গে নিন। মা কী বলে দেখুন।

বাবা যেন এতক্ষণে তাঁর সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। ধনবৌ কী বলে! বিষয় আশয় নিয়ে মাকে বাবা যখন কথা বলেন তখনই ধনবৌ এই সম্বোধনে ডাকেন।

বিলু ইঁটগুলি ভেঙ্গে গোটা পাঁচেক স্বর্ণপিন্ডের পুঁটুলি বেঁধে ফেলেছে ততক্ষণে। সেও মা'র মতো বিষয় আশয়ে আমার কিংবা বাবার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। সে তাড়া লাগাল, ওঠো, আমার হাত ধর।

বাবা ছাগলের দড়িটা হাতে নিলেন।

আমার হাতে হ্যারিকেন। আমি সবাইকে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিচ্ছি। আমাদের দারিদ্র্য শেষ পর্যন্ত এভাবে কিছুটা লাঘব হবে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

বাবা বাড়ি ফিরে চুপি চুপি সব মাকে বললেন, দেখলাম মা যেন আকাশ থেকে পড়েছে।— বল কী। কৈ দেখি! দেখে বলল, এগুলি সোনা তো! এত এত! মা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, পুলিশে ধরবে না!

বাবা বলল, তাই তো।

পিলু বলল, ধুস তুমি যে কী না মা।

তারপরই বাবার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যেন। বলল, বিক্রি করে জমিজমা কিনে ফেলা ভাল। ঠাকুরের নামে সব জমিজমা কেনা হবে। পিলুকে, সেবাইত করে দিলে নবমীর আত্মা শান্তি পাবে। নবমী না হলে মরে গিয়েও শান্তি পাবে না। ওর জন্য না হয় আমরা কিছুটা পাপের ভাগী থাকলামই। সবাই স্বার্থপর হলে জীবন চলবে কেন?

মা বলল, বিক্রিটা করবে কী করে। তোমার মতো লোক বেনের দোকানে নিয়ে গেলে সন্দেহ করবে না!

পিলু বলল, কেন নিবারণ জ্যেঠা আছে।

নিবারণ দাসের পাটের আড়ত আছে। বাবার যজমান। সব কাজ বাবার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে করে। শুভ দিনক্ষণ সব। বাবার উপর নির্ভর করে ব্যবসায় বুঁদ হয়ে থাকে। নিবারণ দাসের জামাতারা এলেই বাবার কাছে আসে গড় হয়। বাবার আশীর্বাদ নেয়। নিবারণ দাস, কোনো কাজে কোথাও

যাবার আগে বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। যেন সব আপদ থেকে তবে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। এ হেন মানুষটার নাম উঠতেই বাবা আমার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বললেন, তাইতো। দাসমশাই থাকতে ভয় কি। দাসমশাই আমাকে ঠকাবে না। ঠকালে তার ঘরের লক্ষ্মী উধাও হবে ভাববেন।

অবশ্য সে রাতে আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি। নবমীকে মা নতুন কোরা কাপড় দিল বের করে। পরদিন পিলু নবমীকে পুকুরঘাটে টেনে নিয়ে সাবান দিয়ে শরীর রগড়ে দিলে চিৎকার করতে থাকল, ও বাবাঠাকুর আমারে মেরে ফেলছে গো!

পিলুর এক কথা, চউপ। কী করে রেখেছ শরীরটা। কী দুর্গন্ধ রে বাবা।

বাবা বারান্দায় বসে তামাক সাজতে সাজতে বলেছিলেন, একদিনে তুই অত ময়লা সাফ করবি কী করে। আজ এই পর্যন্ত থাক। পিলু ভাল করে গা মুছিয়ে আর একটা কোরা কাপড় গায়ে পেঁচিয়ে বলল, একদম চিল্লাবে না। রান্না হলেই খেতে দেওয়া হবে।

নবমীর আজকাল খাই খাই ভাব হয়েছে। পিলু এটা জানে বোঝে। মা নবমীর জন্য একখানা কালো পাথরের থালা বের করে দিল। পাথরের গ্লাস। বাবা তক্তপোষ বানিয়ে দিল। মশারি তোষক। ঘরে হ্যারিকেন জ্বালা থাকে রাতে। বাড়িতে আর দশটা জীবের যত্ন আত্তির মতো নবমীরও যত্ন আত্তি একটু বেশিই শুরু হল।

বাবা নবমীর শিয়রে একখানা গীতা কিনে এনে রেখে দিলেন। দুদিন চন্ডীপাঠ করলেন নবমীর ঘরে। নবমী নিচে মেঝেয় হাত জোড় করে বসে থাকে। বাবা যখন বিগ্রহের পূজা শেষ করে বের হন, দেখতে পান নবমী লাঠি ঠুকে ঠুকে ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। বাবা চরণামৃত দিলে মাথায় ঠেকিয়ে ঠোঁটে এবং বাকিটা বুকে মেখে নেয়। আমি বিকেলে নবমীকে রামায়ণ পাঠ করে শোনাই। রামের বনবাস পড়লে বুড়ির দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

একদিন মুকুল এসে হাজির। নবমীকে দেখে ভেবেছিলাম অবাক হবে। সে বলল, মেসোমশাইর কান্ড। আমি বললাম, না, পিলুর।

এ-কথা সে-কথার পর মনে হল মুকুল আমার জন্য কোনো দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে। সে বলতে ইতস্তত করছে। এ-কদিন বাবা আমাকে নবমীর কিছু কাজ হাতে তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, এই বাড়িঘরে নবমী আছে। বড় একা। তোমার মা না পারেন, তুমি অন্তত তাকে কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শুনিও। রামায়ণ মহাভারত ঘরেই ছিল। পরীকে ভুলে থাকার মতো একটা কাজ পাওয়া গেছে। নবমী তার জীবনের বিচিত্র ঘটনা বলতো, আমরা মন দিয়ে শুনতাম।

নবমী বাড়িতে কিছুটা পিতামহীর ভূমিকা গ্রহণ করে ফেলল। সে যে কত সুন্দরী ছিল, কাপড় পেঁচিয়ে লাঠিতে ভর করে নেচে দেখাত। আমরা সবাই হাসতাম। সেই বীরপুরুষের কথা বলার সময় তার চোখ থেকে জল গড়াত। আসলে নবমীর যৌবনকাল থাকতেই মানুষটা ভেদবমি করে দু-দিনের মধ্যে চলে গেল। সেই অসহায় জীবনের কথা ভাবলে আমার কেন জানি বার বার লক্ষ্মীর কথা মনে হয়। পরীর কথা মনে হয়। যেন কতদিন পরীকে দেখি না। অপরূপার খবর রাখি না। সব বাবা নবমীকে বাড়িতে তুলে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। বুঝলাম, মানুষ একসঙ্গে থাকলেই মায়া জন্মায়। নবমীর প্রতি আমাদের সবারই কেমন একটা টান জন্মে গেছে। আমি শহরে যাই না বলে মুকুল অনুযোগ করল প্রথম। তারপর বলল, কথা ছিল, বের হবে নাকি।

মুকুলকে বললাম, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে শহরে গেলেই মন খারাপ হয়ে যাবে জানি। মন একবার খারাপ হলে সহজে তা কাটাতে পারি না।

মুকুলের সঙ্গে সেদিন সারা সন্ধ্যা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালাম। অথচ মুকুল কী কথা বলতে ডেকে আনল বোঝা গেল না। পরীর কী কিছু হয়েছে! বললাম, অপরূপার লেখা প্রেসে গেছে? আসলে অপরূপা ছাড়া আমি পরীর প্রসঙ্গে আসতে সাহস পাই না। পরীর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই এটাই যেন সবাইকে বোঝাতে চাই। দুর্বলতা যদি কিছু থাকে তা পরীর। পরীর প্রতি আমার দুর্বলতা যে কত হাস্যকর বাবার ঘরবাড়িতে এলেই টের পাওয়া যায়। আমার দুর্বলতা টের পেলে যে আমাদের বাড়িঘরেরই অসম্মান, সেটা বুঝি। বামন হয়ে চাঁদ ধরার বাসনা। আহাম্মক আর কাকে বলে! আমার জন্য গোটা পরিবারের মর্যাদা নষ্ট হোক, আমি চাই না। পরীকে পরিহার করে চলার

এটাও একটা বড় কারণ। পরীর জন্য মনটা আবার এত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠবে বুঝতে পারিনি। ভুলতে চেষ্টা করছি। মুকুলের সঙ্গে শহরে আসাটাই যে, আমার ঠিক হয়নি। পরী সম্পর্কে মুকুল কোনো কথাই বলল না। চৈতালী কলকাতায় চলে যাবে, কবে যাবে, কোথায় থাকবে সব খবর দিল—কিন্তু পরীর সম্পর্কে কোনো কথা নেই। কেবল ফেরার সময় মুকুল বলল, কলেজে মর্নিং ক্লাস হবে। তুমি বি-কমে ভর্তি হয়ে যাও। মেসোমশাইকে বলে এসেছি। তিনি রাজি। •

আমার পড়াশোনা নিয়ে জানতাম পরীরই মাথাব্যথা ছিল। এখন দেখছি মুকুলের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়েছে। বাবাকে বলে এসেছে। বাবা রাজি হতেই পারেন। সকালে কলেজ, দুপুরে স্কুল, সন্ধ্যায় অপরূপা মন্দ কী। নবমীর গুপ্তধনে কী হবে না হবে, নিবারণ দাস একদিন বাড়িতে এসে হিসাব করে গেছে। সবটা দিয়ে বিঘে তিনেক ধানের জমি কেনা যেতে পারে। বাবা রাজি না। বাবার এক কথা, নবমী গতায়ু হলে তার কাজ, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করার বাসনা, বিগ্রহের জন্য ছোট্ট কোঠাঘর ঠিক হয়েছে, তারকপুরের মাঠে এক লপ্তে বিঘে খানেক ধানি জমি যদি পাওয়া যায়। বাবা নিবারণ দাসকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত এক লপ্তে না হোক, রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি বিঘে খানেক পেয়ে গেছেন। দর দাম ঠিক করা, রেজিস্ট্রি করা, নিয়ে বাবা ক'দিন ব্যস্ত থাকলেন। এই জমিতে মোটামুটি ভাত-কাপড়ের সুরাহা হয়ে যাবে, বাবার ধারণা। বড়টির কখন কী মর্জি বোঝা ভার। তাকে নিয়ে তিনি কম উদ্বেগের মধ্যে যে নেই, আড়ালে বাবার কথাবার্তা থেকে তা ধরতে পারি।

বাবা নিবারণ দাসকে বলেছিলেন, দাসমশাই, আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র। তাঁরই ইচ্ছে। জমিজমা সব তাঁর নামেই কেনা হবে। বড় বিপাকে পড়েছিলাম, আমি গতায়ু হলে গৃহদেবতার কী হবে! বড়টি তো এমনিতেই ঘোর নাস্তিক। মেজটি এখন একরকমের বড় হয়ে কী হবেন জানি না। ছোটটির অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে, শেষ পর্যন্ত ডালপালা মেলবে কিনা তাই সংশয়। আমার ব্রাহ্মণীর যা জেদ,—তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কেউ করে সাধ্যি কী! কন্যার বিবাহ, কম দায় তো নয়। ঠাকুরের ভরসায় দেশ ছেড়েছি। এক সময় ভেবেছিলাম, জলে পড়ে যাব। ব্রাহ্মণীর চোপার-ভয়ে কতবার নিজেই উধাও হয়েছি।—এখন দেখছি, বাপের দোষ পুত্রে বর্তেছে। ঠাকুরই সব করান,—এজন্য ভাবি না। একটাই ভয়, আমার পুত্র-কন্যার কাজে অন্যের মনে যেন আঘাত না লাগে।

বাবার ভয়টা যে কী বুঝি। বাবা কী টের পেয়েছেন, পরীকে নিয়ে রায়বাহাদুর বিপাকে পড়েছেন। আমি যার হেতু! পরী এলে তো বাবা শুনেছি খুব খুশি হন। সারাক্ষণ মা মৃন্ময়ী বলতে অজ্ঞান। সেই পরী কী তবে বাবার মনে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। রায়বাহাদুরের নিজ থেকে আসা, আমাকে চাকরির লোভ দেখিয়ে দেশান্তরী করা,—আমি অবাঞ্ছিত, বাবা কী টের পেয়ে গেছেন!

স্কুল থেকে ফিরে খেতে বসেছি, মা ভাতের থালা এগিয়ে দেবার সময় বলল, মৃন্ময়ীর দাদু গাড়ি পাঠিয়েছে।

—গাড়ি?

—হ্যাঁ, গাড়ি করে তোর বাবাকে নিয়ে গেল!

মা'র মুখ ভারি প্রসন্ন। বাবা এক জীবনে বিনা টিকিটে আমাদের নিয়ে আস্তানার খোঁজে রেল-ভ্রমণে বের হত, সেই বাবাকে বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে গেছে, ভাবাই যায় না। এ হেন বিস্ময় মা'র জীবনে কখনও ঘটবে মায়া ভাবতেই পারে না। মায়া লাফাতে লাফাতে কোত্থেকে ছুটে এল, জানিস বাবা না, পরীদিদের বাড়ি গেছে। পরীদির দাদু বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে। পিলু স্কুল থেকে ফিরে খবরটা পেয়ে খুশি হল না। আমার ঘরে ঢুকে একবার চুরি করে আমাকে দেখল। তার দাদাটি এই খবর পেয়ে যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে যেন তার জানাই ছিল।

সে বলল, কীরে দাদা, প্যাঁচার মতো মুখ করে রেখেছিস কেন?

সহসা চিৎকার করে উঠলাম, তোরা কী আমাকে শান্তিতে শুতেও দিবি না।

পিলু বলল, না! তুই শুয়ে আছিস কেন?

অবেলায় শুয়ে থাকাটা পিলুর পছন্দ না বুঝি। আমি গুম মেরে গেলে পিলু অস্থির হয়ে পড়ে। বাবার পরীদিদের বাড়ি যাওয়াটা যে ঠিক কাজ হয়নি, পিলু সেটা বোঝে।

—জানিস দাদা, তারপর কাছে এসে ফিসফিস গলায় বলল, পরীদি এসেছিল। বাবাকে বলে গেছে তুই যেন মর্নিং কলেজে ভর্তি হয়ে যাস। নতুন ক্লাশ খুলেছে। বাবা দুঃখ করে বলেছেন, ওর কী মর্জি জানি না মা। কী যে ছাই ভস্ম ভাবে, খাতায় লেখে, মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর পড়াশোনা করলে, মাথা তো একটা,—এত ধরবে কেন? তবু তুমি যখন বলছ বলব।

—আমি যে বলেছি, বলতে যাবেন না কিন্তু মেসোমশাই।

—কী হবে বললে?

—আমাকে ও দু চোখে দেখতে পারে না।

—তা আচরণেই টের পাই। তুমি আমাদের বাড়িতে এলেই ক্ষেপে যায়। বল, বোঝাই কি করে, মানুষই মানুষের বাড়িতে আসে। শুধু মানুষ কেন, কীটপতঙ্গ পাখি সব মানুষের চারপাশে বড় হয়। তুমি কাউকেই উপেক্ষা করতে পার না।

তখনই পরীদি কী ভেবে বলল, ঠিক আছে মেসোমশাই, ওকে আপনি বলতে যাবেন না। আমি দেখি কাউকে দিয়ে খবরটা দিতে পারি কিনা!

তারপর থেমে পিলু কি যেন ভাবল। সে তার দাদার পাশে বসল। জামা খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখার সময় বলল, বাবা কেন গেল জানিস?

—কী করে বলব।

—মা, মা!

—ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছ কেন! তোমার ভাত নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব।

নবমী খোনা গলায় তার ঘর থেকে বলছে, দা-ঠাকুর, খেয়ে নেন গো। সেই কখন চাট্টি মুখে দিয়ে গেছেন।

পিলু বলল, নবমী আসায় বাড়িটা কেমন ভরে গেছে, নারে দাদা।

পিলু আবার চিৎকার করছে, মা মা, পরীদির দাদু বাবাকে নিয়ে গেল কেন জান?

রান্নাঘর থেকে মা বলল, কী করে জানব? তোমার বাবা জানে আর পরীর দাদু জানে।

আমি ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছি। কী করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। বাড়িতে থাকলে আরও যেন অস্থির হয়ে পড়ব। জামা গায়ে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। এই উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। মাথার মধ্যে গিজগিজ করে পরীর ভালবাসার পোকা।

পরী আমার সর্বনাশ / পরী আমার আকাশ বাতাস / গভীর রাতে নির্জনে একা হাঁটি / দেখি নক্ষত্র হয়ে সে আছে / মাথার উপরে / তার দিগন্ত প্রসারিত ডানার ঝাপটায় / ধুলো ওড়ে / ওড়ে কাঙ্গালের বসন / উলঙ্গ করে দেয় অজ্ঞাতে /—পরী আমার সর্বনাশ / জীবনে / বীজ-বপনে / বিসর্জনে।

পরী আমার সর্ব্বনাশ,—বাড়ি এসে টের পাই।

পিলু এসে বলল, দাদা রে ঘোর বিপদ।

বললাম, কী হয়েছে?

—বাবা শুয়ে পড়েছে।

—কেন?

—দুদিন উপবাস করবেন স্থির করেছেন।

—উপবাস।

—হ্যাঁ। সব জেনে গেছে। তুই পরীদিকে মেরেছিস!

—কে বলল?

—পরীদির দাদুর খুব অসুখ। বাবাকে ডেকে বলেছেন, শেষ জীবনে এত বড় অপমান বাড়ি বয়ে করে যাবে ভাবতে পারিনি বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমার সব শেষ। আমার সব অহং ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আমার একমাত্র অবলম্বন নাতনিটাকে মেরেছে। তারপর থেকেই শয্যা নিয়েছি। আর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নেই। আপনি ধার্মিক মানুষ। আপনাকে না বলতে পারলে আমার মরেও শান্তি নেই। আপনার

ছেলের জন্য পরীকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ-সব সাময়িক দুর্বলতা। দূরে গেলেই সেরে উঠবে।

আমি শুনে যাচ্ছি। কথা বলছি না। হাত পা কাঁপছে।

—জানিস দাদা, বাবার সে কী রুদ্রমূর্তি। আক্ষেপ, শেষে এই ছিল কপালে। নারী হল'গে শক্তিরূপিণী দেবী। সে-ই মানুষের শক্তির উৎস। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। তার গায়ে হাত! এ যে ধনবৌ মহাপাপ! এ-পাপের যে ক্ষমা নেই। আমি কী করব। এমন নিরপরাধ মেয়েটাকে বিলু চড় মেরেছে। এ-পাপের হাত থেকে তোমার ঘরবাড়ি রক্ষা পাবে কী করে! প্রায়শ্চিত্তের বিধান কী আছে জানি না। স্থির করেছি, দু-দিন উপবাস। স্থির করেছি দু-দিন অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ। তবে দেবী যদি প্রসন্ন হন। তারপরই বাবা, মা মা বলে কেঁদে উঠলেন। আমার কোন্ পাপে বিলু এত বড় সর্বনাশ করল ধনবৌ।

গোটা বাড়িটা নিঝুম। কারো ঘরে কেউ আলো জ্বেলে দেয় নি। নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কান পাতলে। মা, বাবার শিয়রে বসে আছে। মায়া ছোট ভাইটা বাবার পায়ের কাছে। নবমী ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরুগুলো গোয়ালে তোলা হয়নি। বাবা দেশভাগের দিনও এত ভেঙ্গে পড়েন নি। কেবল ভাবছি সকালে আমার এমন ভালমানুষ বাবাকে মুখ দেখাব কী করে। রাতে আমাকে ডেকে মা সাড়া পেল না। ঘরে ঢুকে বলল, ওঠ খাবি।

—বাবা খাবে না?

—তোর বাবার গোঁ তো জানিস।

আমার চোখ আবার জলে ভেসে যাচ্ছে কেন? বললাম, মা আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তুমি বিশ্বাস কর পরীকে আমি মারিনি। আমি সত্যি মারিনি মা। পরীকে আমি কোনদিনই মারতে পারি না। তারপর বললে যেন এমন শোনাত, পরীকে কষ্ট দিলে যে আমার কষ্ট তোমরা কেউ সেটা জা· না।

বাবাকে আর যেন কোনোদিন মুখ দেখাতে পারব না। আমি পরীদের বাড়িতে অবাঞ্ছিত। আজ নিজের বাড়িতেও। গভীর রাতে উঠে একটা চিরকুট লিখলাম, বাবা আপনার কু-পুত্রের মুখ দর্শন করে কষ্ট পান, সেটা আর চাই না। আমি চলে যাচ্ছি। ভাল হয়ে ফিরব। জানবেন, এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আপনার কোনো পাপ নেই বাবা। পিলুকে লিখলাম, দাদা ফিরবে বলে তুই স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। তোর দাদা একদিন না একদিন আবার ঠিক ফিরবে। মা বাবাকে দেখিস। তারপর পিলুকে লিখলাম, পরীকে বলিস, আমার জন্যে সে তার প্রিয় শহর ছেড়ে যেন চলে না যায়। আমিই চলে গেলাম। পরীকে বলিস সে চলে গেলে, কখনও যদি ফিরে আসি, শহরটাকে আমি আর ঠিক ঠিক চিনতে পারব না। শহরটাকে আগের মতো আর ভালবাসতে পারব না। ইতি তোর দাদা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই পিলুর বুক ধড়াস করে উঠল।

দাদা বিছানায় নেই।

বাড়িতে সবার আগে ওঠেন বাবা। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। অবশ্য পিলুর মনে হয় বাবার বোধ হয় শেষ রাতের দিকে বিছানায় পড়ে থাকতে কষ্ট হয়। রাত থাকতেই বাবা শুয়ে শুয়ে স্তোত্র পাঠ করেন। বেশ জোরে। ভোর রাতের ঘুম কার না প্রিয়! সে যে এত ঘুমাতে পারে, তারও ঘুম কোনো কোনো দিন বাবার স্তোত্র পাঠে ভেঙ্গে যায়। আর আশ্চর্য বাবার সেই স্তোত্র পাঠ শুনতে শুনতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। গীতার সব শ্লোক বাবার মুখস্থ। সে দু-একটা শ্লোকের অর্থও জেনে নিয়েছে। ঠিক জেনে নেওয়া নয়, যেন নানা কাজে কর্মে দাদাকে উপলক্ষ্য করে বলা—বুঝলে কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে, আবার কেহ

আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।

দাদাটা তার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাবাও। কাল যা গেল!

দাদার সেই আর্তনাদ সহসা বুকে বেজে উঠল, মা আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তুমি বিশ্বাস কর পরীকে আমি মারিনি। মারতে পারি না।

সে দেখল দরজা খোলা। ক্যাচা বাঁশের বেড়ায় খোপ কাটা জানালা। বাবা পূজার ফুল তুলছেন। কাল বাবা দাদার অবিমৃষ্যকারিতায় ক্ষোভে রাতে অন্ন গ্রহণ করেননি। বাবা তাদের এরকমেরই। পুত্র-কন্যা কিংবা যে কেউ কোনো অশান্তির কারণ ঘটলে, বাবা সব সময় সংস্কৃত ঘেঁসা শব্দ ব্যবহার করেন। তার কাছে শুধু না, বাবার কাছে, পরীদির দাদামশাইয়ের কাছে দাদার উন্মাদের মতো আচরণ অবিমৃষ্যকারিতার সামিল মনে হয়েছিল।

সেই দাদা বিছানায় নেই।

রাতে মা এত সাদাসাধি করল দাদা কিছুতেই খেল না। দু'জন দু-ঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, কাউকে টলানো যায়নি।

বাবার আক্ষেপ, শেষে এই ছিল কপালে! নারী হল গে শক্তিরূপিণী দেবী। সে-ই মানুষের শক্তির উৎস। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা। তার গায়ে হাত! মাকে ডেকে বলেছিলেন, এ-যে ধনবৌ মহাপাপ। এ পাপের কোনো ক্ষমা নেই। প্রায়শ্চিত্তের বিধান কী আছে জানি না, স্থির করেছি, দু-দিন উপবাস। স্থির করেছি দু-দিন অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ।

বাবা এতে হয়তো বুঝেছিলেন দেবী প্রসন্না হবেন।

বাবা গৃহ দেবতার ফুল তুলছেন। তাঁকে কিছুটা ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। পায়ে খড়ম। খটাখট শব্দ হচ্ছে—সে এ-সব দেখতে দেখতে সহসা ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল। ঘুম থেকে মা উঠেছে—কারণ সে দেখছে, পূজার বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে যাচ্ছে মা। নবমী বুড়ি ওঠেনি। তার দরজা বন্ধ।

সকাল হয়নি ভাল করে।

পিলু দৌড়ে গিয়ে মাকে বলল, দাদা কোথায়!

মা বলল, কেন, দাদা কোথায় আমি কী করে জানব। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কর! ঘরে নেই!

—না না ঘরে নেই।

মা কী ভাবল কে জানে, বাসন নামিয়ে নিজেই ছুটে এল। পিলু ততক্ষণে বাবার কাছে হাজির।

—বাবা, দাদা বিছানায় নেই।

—উঠে কোথাও গেছে।

তা যেতেই পারে। চারপাশে এখনও কিছু জঙ্গল আছে—কিংবা দাদা যদি বাদশাহী সড়কে উঠে যায় ঘুরে বেড়াবার জন্য। কারণ কাল রাতে সে বুঝেছে দাদা ঘুমাতে পারছিল না। কেবল ছটফট করছে। বৃষ্টি হয়নি কিছুদিন। শরৎকাল এসে গেছে—মাঠে মাঠে ধানের চাষ। রোয়া ধান বড় হয়ে গেছে—এবং চারপাশে শরতের এক ছবি—যেমন শেফালি গাছটার নিচে সাদা ফুল, স্থলপদ্ম গাছে ফুলের কুঁড়ি, ফুটবে ফুটবে করছে—রাস্তার পাশে আমগাছগুলি ঘন সবুজ। ফড়িং উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক ঝাঁক প্রজাপতিও বাড়ির এ-ধার ও-ধার জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

পিলু ছুটে আবার তার ঘরে চলে এল। সে কী করবে ঠিক করতে পারছে না।

একবার খালপাড়ে ছুটে যাচ্ছে, একবার পুলিশ ক্যাম্পের দিকে। আর ডাকছে, দাদারে!

সকাল বেলায় এ-যে কী আতঙ্ক পিলু ভালই জানে। তার ক্ষোভ হচ্ছে বাবার উপর।

কী দরকার ছিল পরীদির দাদুর কাছে যাওয়ার!

ডাকলেই যেতে হবে। বড়লোকেদের সে দু চোখে দেখতে পারত না। তার বাবা গরীব। বাবা গরীব হলে বাড়ির আর সবাই গরীব থাকে। বাবাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেছে। বোঝো এবার সমাদরের ঠ্যালা!

—সাধন কাকা, দাদাকে দেখেছো। পিলু খুঁজছে।

সাধন সরকার মিল থেকে ফিরছিল রাতের ডিউটি সেরে। যদি দাদা লাল সড়কের দিকে হাঁটতে

হাঁটতে চলে যায়। রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে।

ইস তোর দাদা এত চাপা স্বভাবের! কাউকে কিছু না বলে আবার হাওয়া! সেই বছর তিন আগেও ঠিক একবার হাওয়া হয়ে গেছিল। বাড়িতে কেন যে মন বসছে না।

কিন্তু কাল যা গেল—! বাবার যে কী দরকার ছিল বলার, এ-যে মহাপাপ ধনবৌ। এ পাপের কী প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমার জানা নেই।

আর বলি পরীদির দাদুই বা কী—বাড়ির কলঙ্ক রটাতে আছে! পরীদি তো হজম করে গেছে।

পিলু বাড়ি ফিরলে দেখল মায়া মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে, কে আর বলতে চায়, বিলুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মা বলল, কীরে পেলি?

—না।

— কোথায় গেল! বাবা, ঠাকুরঘরে ফুলের সাজি রেখে বের হয়ে কিছু বলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল মা। এ-বাড়িতে কেউ থাকবে না বলে দিলাম। কালকে তোমার নাটক করার কী দরকার ছিল। কই পরী তো এসেছিল, বিলুর খোঁজ নিতেই এসেছিল। মারলে, কেউ কাউকে খুঁজতে আসে। বল, চুপ করে থাকলে কেন। রায়বাহাদুর ডেকে বললেন, আর তুমি বিশ্বাস করে ফেললে। অহোরাত্র চণ্ডীপাঠই সার তোমার বলে দিলাম।

বাবা যেন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। কী ভেবে বললেন, দেখতো সাইকেলটা আছে কি না।

পিলুর মনেই হয়নি, দাদা কোথাও বের হলে সাইকেল ছাড়া বের হয় না! দাদা আছে সাইকেল নেই তা যেমন তার বন্ধুরাও ভাবতে পারে না, বাড়িতেও এটা কেউ অনুমান করতে পারে না।

পিলু দেখল সাইকেলটা ঠিকই আছে। ওর কেমন বুক ফেটে কান্না বের হয়ে আসছে। যেন এক্ষুনি বের হয়ে যাওয়া দরকার—লাইনের ধারে দেখে আসা—পরীদিকে দাদা এমনি এমনি মারতে পারে না।

আর পরীদিও যত দূরেই থাক ঠিক চিনতে পারে, কে ডাকে! বিলুর ছোট ভাইটা। শ্যামলা রঙ, বিলুর মতো গায়ের রঙ পায়নি, তবু ভারি মিষ্টি মুখের ছেলেটি ডাকলে পরী থেমে পড়ত। বাড়ির কুশল নিত। চুপি চুপি বলত, আমি যে তোদের বাড়ি যাই, তোর দাদাকে কিন্তু বলিস না। কেমন লক্ষ্মী ছেলে!

পিলু সাইকেলে চেপে বসতেই বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছ। রায়বাহাদুরের বাড়িতে খবর দিতে যেও না। দেখ না অপেক্ষা করে। অমন খারাপ কথা কিছু আমি বলিনি। আর আমি অমন কোনও পাপ করিনি, আমার ছেলে কিছু করে বসবে। আর একটু দেখে যাও।

মন মানে!

আজকাল শুধু দাদা না, সেও বাবার কথা অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। সে সাইকেল চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পঞ্চাননতলায় উঠে গেল। রেল বরাবর সে যাচ্ছে। কিন্তু সব স্বাভাবিক। দোকান পাট খুলতে শুরু করেছে। ভাবল এক ফাঁকে বেস্টাল জেলের পাশ দিয়ে শহরে ঢুকে যাবে কি না। পরীদিকে খবর দেবে কি না—কিন্তু বাড়ি ফিরে যদি দেখে দাদা হাজির, দাদা নিজেই হম্বিতম্বি হয়তো করছে—এ কীরে বাবা, এক দন্ড বাড়ি ছিলাম না, আর পিলু দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিয়েছে!

তার ভয় দাদাকে এ-জায়গাটিতেই।

সে নাকি তার দাদাকে নিয়ে বড় বেশি উচাটনে থাকে।

দাদাই বলেছিল, একদিন, শোন পিলু।

পিলু কাছে গেলে বলেছিল, তুই তোর দাদাটাকে কী ভাবিস বলত!

—কী ভাবি—বারে, তুই আমাকে দাদা বাজে কথা বলবি না বলে দিলাম। খুব খারাপ হবে। আমি কী করেছি!

—করিসনি। আমি বিলাসপুরে রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি, কে বলেছে সবাইকে বলে বেড়াতে। যেখানে যাই এক কথা, কী ঠাকুর, তুমি রেলে চাকরি পেয়েছো! যাক, ঠাকুরমশাইয়ের এবার কষ্ট দূর হবে। কী বিলু, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ শুনলাম। রেলে চাকরি হয়েছে। ইস কত বড় কথা।

আমাদের কলোনির ছেলে রেলে চাকরি পেয়েছে সোজা কথা!

বিলুর তখন এক প্রশ্ন, কে বলল?

—পিলু।

—কে বলল! —তোমার পিতাঠাকুর।

পিতাঠাকুরটিকে তো আর ধমক দেওয়া যায় না। বিলাসপুরে চলে যাচ্ছে, প্রথমে, এপ্রেন্টিস, পরে জুনিয়ার অফিসার রেলের—কলোনির একজন গরীব বামুনের কাছে এর চেয়ে আর কী বড় খবর থাকতে পারে।

পিলু রেগে বলেছিল, শুধু আমাকে দুষছিস—বাবা যে মনসা পূজায় বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি বলে এল—আসনে বসে ঘন্টা নাড়ার সঙ্গেই কথা শুরু, বুঝলে কালীপদ, বিলু তো রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে! আসলে পিলু বুঝত এই বলে দাদা শুধু তাকে না বাবাকেও আভাসে জানিয়ে দিত—সে তার চাকরি নিয়ে, তার কৃতিত্ব নিয়ে এমন কী তার কবিতা লেখা নিয়েও কোনও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না।

দাদা বলেছিল, খুব মজা না, রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাব, আর তুমি বাড়ির সব মজা একলা ভোগ করবে! পিলু ভেবে পায় না দাদা রেলের চাকরির নাম শুনলেই ক্ষেপে যেত কেন।

এটা কী দাদার বনবাস।

চাকরি নিয়েও দাদা বলেছে, বাবা, রায়বাহাদুর নিশ্চয় পারেন। জমিদারি গেছে ঠিক, তবু যা আছে, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি—মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ছেলেরা কৃতী। রেলে বড় ছেলে তাঁর বড় কাজ করে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখুন! আসলে কী দাদা বাবাকে বলতে চেয়েছিল, পরীদির দাদুর এটা চাল—দাদাকে দূরে পাঠিয়ে দিলে পরীদি একা হয়ে যাবে—কিংবা দাদা একা হয়ে যাবে। এটা কী দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য পরীদির দাদু বাবার উপর চাল চেলেছে। পিলু একদিন পরীদিকে বলতেই অবাক—কী বললি! বিলু বিলাসপুরে রেলে চাকরি নিচ্ছে! কৈ আমাকে তো ও কিছু বলেনি।

পিলু পড়েছিল মহাফাঁপরে। পরীদির বাবার দৌলতে দাদার চাকরি। আর পরীদিই জানে না। সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল।

পরীদির এক কথা, গিয়ে দেখুক না তোর দাদা। কী ভেবেছে! পড়াশোনা বন্ধ করে বাবু চললেন চাকরি করতে।

পিলু ঠিক বোঝে না, পরীদির দাদুর এই লুকোচুরি খেলা কেন! বাবাকেও বলেছে, দেখবেন যেন দু-কান না হয়। দু-কান হবে না, তা হলেই হয়েছে। আসলে পরীদির দাদু খবরটা গোপন রাখতে চাইছে নাতনির কাছ থেকে।

দাদাও বোধ হয় গোপনে যাওয়া আসা করছিল—পরীদি আবার টের না পায়। কী যে হয়েছিল ঠিক জানে না। সে যেন কীভাবে একদিন শুনেছিল—মাকে বাবা বলছিলেন, বুঝলে এ-সব সাময়িক দুর্বলতা।

সে যে কিছু বোঝে না তা নয়! আসলে এতবড় ঘরের মেয়ে পরীদি—ভীমরতি না হলে হয়? এমন কী দাদার প্রাইমারী স্কুলের চাকরি নিয়েও কম অশান্তি হয়নি পরীদির সঙ্গে দাদার!

রাস্তার ধারে, আমগাছতলায় পরীদি ফুঁসছে।

—কী বললে, প্রাইমারী স্কুলে? তোমার কী মান অপমান বোধ নেই। পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছ। গরীব বলে কী উচ্চাশা থাকতে নেই।

দাদারও জেদ—না আর পড়ছি না। পড়াটা বিলাসিতা। হাতের কাছে এত বড় সুযোগ ছাড়তে রাজি না। আমার এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না পরী। কেন মিছিমিছি জেদ করছ।

—আর তো দুটো বছর।

দাদা বলেছিল, তারপর কী হবে।

—কিছু একটা হবেই।

দাদাও কম যায় না। বলেছিল, হবে কচু। আমাদের এখন দু-বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকা দরকার।

তোমার স্বপ্ন থাকতে পারে—আমার কোনও স্বপ্ন নেই।

খটাখটি শেষে এমন যে সে দেখেছে, পরীদি বাড়ি এলেই দাদা সাইকেলে বের হয়ে যেত। কোথায় যেত কে জানে। হয়তো মুকুলদার কাছে। 'অপরূপা' কাগজ নিয়ে দাদা মেতে আছে তখন। পরীদির কী আক্ষেপ, মাসিমা বিলু সত্যি আর পড়বে না! পড়া ছেড়ে দেবে।

মা'রও কম আক্ষেপ নয়, কে বোঝায় বল। যেমন তোমার মেসোমশাই তেমনি তার পুত্র। আমরা সংসারে কে বল!

পরীদি বাবাকেও অভিযোগ করেছিল, মেসোমশাই বিলু নাকি আর পড়বে না! প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি নিচ্ছে।

—আগে পাক। কথা হচ্ছে। মুকুলের জামাইবাবুকে চেন! তিনিই চেষ্টা করছেন। হয়ে যাবে মনে হয়। ঠাকুরকে তো তুলসি দিচ্ছি রোজ। দরখাস্ত করেছে। রিফুজিদের জন্য কী নাকি স্পেশাল ক্যাডার হচ্ছে! তাতেই ঢুকিয়ে দেবে। ঠাকুরের কী ইচ্ছে তা জানব কী করে!

—তাই বলে পড়া ছেড়ে দেবে! পরীদি কেমন হতবাক হয়ে গেছিল বাবার কথায়।

বাবা বলেছিলেন, মানু তো বলল, বিলুর মেধা কম। বি-এ, এম-এ পড়ে কিছু হবে না। চাকরি পেলে যেন না ছাড়ে। দিনকাল বড় খারাপ।

তবে পরীদিকে দাদা কেন যে মারল—এই রহস্যটা সে বুঝতে পারছে না।

সাইকেলে লাইনের ধারে চক্কর মেরে বাড়ি ফিরে এল—না অন্তত আর যাই করুক দাদা ক্ষোভে অভিমানে জীবন নাশ করেনি। বাড়িতে ফিরতেই সে দেখল, বাবা পঞ্জিকা খুঁজছেন।

তা-হলে কী দাদা ফিরে এসেছে। সব কেমন স্বাভাবিক। না হলে বাবা পঞ্জিকা খুঁজতে যাবেন কেন! মা কোথায়! সে ফিরে আসতেই বাবা বললেন, বিলু রাতের ট্রেনে কোথায় চলে গেছে। তোমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। বলেই তার দিকে বাবা একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দেবার সময় বললেন, যাক বাবুর যে দয়া করে এবারে কর্তব্যজ্ঞান বেড়েছে! সেবারে উধাও হলেন, ফিরে এলেন তিন মাস বাদে। এবারে কতদিন পর ফেরে দেখ।

পিলু জানে বাবা তাদের এরকমেরই। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিতে গেলে বাবা বললেন, বয়সের দোষ। এ নিয়ে মন খারাপ করবে না। তোমার মা কান্নাকাটি করছিলেন, সুদামের বৌ তাকে নিয়ে গেছে। তোমার মা তো বোঝে না, ছেলে আর তার নেই। তার মায়া মমতা অন্য জায়গায় শেকড় চালাবার চেষ্টা করছে।

সাইকেলটা তুলে রাখল পিলু। দাদা তাকে কী খবর দিয়ে গেল! বাবা কী চিঠি পড়েই জানতে পেরেছে! সে উঠোনে নেমে গেল। চিঠি লিখে রেখে গেছে দাদা। আর কাউকে না, শুধু তাকে। দাদার কথা ভেবে তার চোখ ছল ছল করছিল। সে চিঠিটা পড়তেও সাহস পাচ্ছিল না। যেন পড়লেই সে দাদার দুঃখটা টের পাবে—তারপর সবার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

সে জানে, বাবা এখন দাদার যাত্রার সময় নিয়ে ব্যস্ত। রাতের কোন সময়ে দাদা গেছে—যাত্রা শুভ, না নাস্তি এটুকু জানতে পারলেই বাবা নিশ্চিন্ত হবেন। এত বেশি নিশ্চিন্ত যে মনেই হবে না, বাড়ির বড় পুত্রটি নিখোঁজ। মেজ পুত্র লায়েক নয়—লায়েক হলে সেও যে নিখোঁজ হয়ে যাবে, কেউ ঘরে থাকে না। মানুষ অহরহ নিখোঁজ হচ্ছে, নিজের কাছ থেকেও। বাবার এ-সব আপ্তবাক্য তাদের জানা আছে বলে, পিলু ঘরে ঢুকে তক্তপোষে বসল। দাদা প্রথমে বাবাকে লিখেছে।

'বাবা, আপনার কু-পুত্রের মুখ দর্শন করে কষ্ট পান, সেটা আর চাই না। আমি চলে যাচ্ছি। ভাল হয়ে ফিরব। জানবেন এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আপনার কোনো পাপ নেই বাবা।'

তারপরই দাদা তাকে লিখেছে।

'সকালে উঠেই চেঁচামেচি শুরু করিস না। দাদা নেই, দাদা কোথায়। তুই তো আমাকে নিয়ে জলে পড়ে গেছিস বুঝি। দাদা ফিরবে বলে তুই স্টেশনে গিয়েও বসে থাকিস না।'

এটা ঠিক, সেবারে পিলু দাদা ফিরবে বলে সড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও হেঁটে হেঁটে স্টেশনে। বাড়ি ফিরলে বাবা রেগে বলতেন, বড়টা নিখোঁজ তুমিও সারাদিন বাড়ির বাইরে। ভেবেছ কী! রোজ এমন বললে, সে একদিন কেঁদে ফেলেছিল, দাদা আসছে না কেন। কতদিন হয়ে গেল!

তুমি যে বললে আসবে। সময় হলেই ফিরে আসবে। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি—দাদা যদি ফেরে।

তারপর দাদা লিখেছে—'তোর দাদা একদিন না একদিন ঠিক ফিরবে। মা-বাবাকে দেখিস। স্কুল কামাই করিস না। পরীর সঙ্গে দেখা হলে বলিস, আমার জন্য সে তার প্রিয় শহর ছেড়ে যেন চলে না যায়। আমিই চলে গেলাম।'

—আবার পরী এসেছিল।

বাবা দাদার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারতেন না। বিরক্ত হয়ে বলতেন, তোমার এত রাগ কেন বুঝি না। মৃন্ময়ী এলে ক্ষেপে যাও কেন বুঝি না।

দাদা কী ভেবে যে বলত, জনসংযোগ করছে। পার্টির হয়ে জনসংযোগ! এস ডি ও সাবের গাড়িতে এসে নেমেছে। বাড়ির কুল, আচার খেয়ে কত ভাল মেয়ে দেখিয়েছে—তারপরই ক্ষিপ্ত হয়ে দাদা একদিন চিৎকার করে বলেছিল, আমরা কত গরীব দেখতে আসে আপনি বোঝেন না। পরী ভাল মেয়ে! এস ডি ও পরেশচন্দ্র নামিয়ে দিয়ে গেছে তা জানেন। আমাদের দারিদ্র্য দেখে সে মজা পায়।

—তুমি কী বলছ বিল্ব!

বাবা ক্ষোভ থেকে কথা বললে, সেই সাধু বাক্য। বিলু তখন বিল্ব হয়ে যায়।

—আমি ঠিকই বলছি বাবা।

পিলু চিঠিটা পড়তে গিয়ে শেষ করতে পারছে না। দাদার ভেতরে আগুন জ্বলছে। কে যে জ্বালিয়ে দিল। তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। দাদা যেন এক বিন্দুও মিছে অভিযোগ করেনি। পরীদির দাদু রেলের চাকরির লোভ দেখিয়ে দু'জনকে আলাদা করে দিতে চেয়েছিল। কী-ভাবে যে শেষে দাদার রেলের চাকরিটা ভেস্তে গেল সে জানে না। দাদাকে বিলাসপুরে শেষ পর্যন্ত কেন পাঠানো গেল না, তাও সে জানে না। তবে পরীদিকে বিলাসপুরে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাবা অহোরাত্র চণ্ডীপাঠের সঙ্গে মাকে এ-খবরটাও দিয়েছিলেন।

কেন পরীদিকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে টের পেয়ে দাদা নিজেই উধাও হয়ে গেল।

দাদা লিখেছে, 'আমিই চলে গেলাম। পরীকে বলিস সে চলে গেলে, কখনও যদি ফিরে আসি, শহরটাকে আমি আর ঠিক ঠিক চিনতে পারব না। শহরটাকে আগের মতো আর ভালবাসতে পারব না। ইতি তোর দাদা।'

পিলু চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল।

কী করবে এখন কিছু বুঝতে পারছে না। পরীদিকে খবরটা দেওয়া দরকার।

কারণ সব চেয়ে যেন দাদার খবর রাখার অধিকার পরীদিরই বেশি।

আজ সে টের পেল, পরীদি দাদার ভবিষ্যত নিয়ে কেন এত বেশি উতলা ছিল। দাদা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি নিলে কেন এত ক্ষেপে গিয়েছিল।

সে চিঠিটা হারিয়ে না যায়, কারণ তার বাবা হয়তো বলবেন, কী পড়া হল! চিঠিটা দাও। রেখে দি। তারপর কোথায় রেখে দেবেন কে জানে। চিঠিটা পরীদিকে না দেখানো পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছে না।

তখনই সে শুনতে পেল, বাবা বারান্দায় বসে কাকে যেন বলছেন, যাত্রা শুভ। অমঙ্গলের কোনো আশংকাই নেই।

পিলু জানে, হয়ে গেল বাবার। রাতের ট্রেনেই গেছে—বাবার এমনই বদ্ধমূল ধারণা। বাড়ি ফিরে হাতে চিঠিটা পাবার পর মনে হয়েছে, দাদা কোথাও চলে গেছে—কিন্তু কখন গেছে, কোনদিকে গেছে, যেতে হলে সঙ্গে কিছু নিতে হয়, দাদা তা নিয়েছে কি না, টাকা পয়সা কার কাছ থেকে নিল—এ-সব অনেক প্রশ্ন তার মাথায় এল।

সে বের হয়ে বড় ঘরের বারান্দায় উঠে গেল। বাবার সামনে রাজেন কর্মকার বসে। কোনো পূজাপাঠ থাকতে পারে। সকাল বেলায় বাবার কাজই হাত মুখ ধুয়ে পূজার ফুল তুলে, বারান্দার জলচৌকিতে বসে এক ছিলিম তামাক টানা, নয় পঞ্জিকা নিয়ে বসা। কী খাওয়া যাবে না যাবে তার এক প্রস্ত নির্দেশ রান্নঘরের প্রতি। কখনও মনে হয় পিলুর আসলে বাবার এটা দোকান সাজিয়ে বসা।

জঙ্গল থেকে নবমী বুড়িকে বাড়ি তুলে আনার পর বাড়তি কিছু কাজ জমে গেছে তাঁর হাতে। ইটখোলায় ঘুরে এসেছেন—কিন্তু নিবারণ দাস বলেছে—আলের মাটি থেকে ভাল ইট হতে পারে। বাড়িতেই ইট পুড়িয়ে নিলে অর্ধেক দামে হয়ে যাবে। ইটের কারিগরদের সঙ্গেও কথা বলতে হয় সকালের দিকটায়। কাঠ কিনবেন, না নিজের লাগানো গাছ কেটে করবেন এই নিয়ে দ্বিধায় আছেন। শত হলেও হাতে করে গাছগুলিকে এত বড় করে তুলেছেন। এক একটা গাছ লেগে যেতেই কম সময় লাগেনি।

কাটলে কোন কোন গাছ কাটা হবে এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার সময় বলেছেন, মায়া হয় কাটতে। গাছের ঠিকমতো যৌবনই এল না, কেটে ফেলব। তবে গৃহ দেবতার পাকা মন্দির নির্মাণ—বুঝলে না ধনবৌ তার ইট কাটা হচ্ছে, তার জন্য কাঠ লাগে—আর যদি গাছগুলো ঠাকুরের কাজে লেগে যায়—সেও কম বড় সৌভাগ্য না!

পিলু জানে, তার মা আর আগের মতো বাবাকে হেনস্থা করে না। সবই ভাগ্য। ভাগ্য যে এখন প্রসন্ন নবমী বুড়িকে তুলে আনায় মা এটা আরও বেশি টের পেয়েছেন। শেষ দিকটায় বুড়িকে সে বাড়ি থেকে দু-বেলা খাবারও দিয়ে আসত। সেই বুড়ি যে গুপ্তধনের মালিক, কে জানত! তা না হলে ঠাকুরের নামে এক লপ্তে ধানিজমিও কেনা যেত না। গৃহ দেবতার জন্য পাকা কোঠার কথাও ভাবা যেত না। পক্ষকালের মধ্যে তার দাদারও মাথায় আসত না প্রাইমারী ইস্কুলের চাকরি না করলেও বাবার চলে যাবে। বাবাকে আর দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে না।

এত সব ভেবেই হয়তো দাদা শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল। কিংবা বাবার যে চোটপাট দাদার উপর তাও যেন সেই এক মনোবাসনা থেকে, ভেব না, তুমি না থাকলে আমাদের কোনো গতি নেই। তোমার এত আস্পর্ধা, তুমি শেষে মৃন্ময়ীর গায়ে হাত তুললে!

বাবা দাদার সম্পর্কে এতটা নির্বিকার ভেবে তার খারাপ লাগছিল। বাবা রাজেন কর্মকারের সঙ্গে দুর্গাষ্টমী ব্রত নিয়ে কথা বলছেন। তালিকা করে দিচ্ছেন, কী কী লাগবে। এখন কিছু বললেই বাবার সেই এক কথা—ঈশ্বর নিয়ে কথা হচ্ছে। সারাটা দিন তো বাড়িই থাক না। তোমার সব জানার সময় এখন হল!

সে মায়াকে খুঁজল। মায়াও বাড়ি নেই। সে বুঝতে পারল মায়া মা'র সঙ্গেই গেছে। নবমী বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে এসে সামনে বসলে বাবা বললেন, ইষ্টনাম জপ করেছ তো। না ভুলে যাচ্ছ।

—ভুল হইয়ে যাচ্ছে। বড় দাদাঠাকুর নাকি কোথায় চইলে গেছে!

নবমী বুড়ি কানে কম শোনে। সকাল বেলায় উঠে তার কাজ লাঠি ভর দিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। পাঁচ বিঘে জমির উপর এত সব গাছপালা যে নবমীর মাঝে মাঝে নাকি মনে হয় সে তার পূর্বেকার বনভূমিতে বসবাস করছে। বাবার নির্দেশেই নবমীকে সকালে হেঁটে বেড়াতে হয়। শত হলেও বাবাঠাকুরের বিধান—প্রকৃতির মধ্যে হেঁটে বেড়াও, বসে থেক না। বসে থাকলে শরীরে ঘুণ ধরে। যাতে শরীরে ঘুণ না ধরে তার জন্যই সে হাঁটে। কোনো গাছের নিচে বসে থাকে। পাখ-পাখালি দেখে।

আবার হাঁটতে থাকে। কখনও বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। সে ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে। সে কী করে জানবে, এত বড় একটা দুঃসংবাদের কথা। কার কাছে শুনে ধেয়ে এসে যেই দেখেছে, বাবাঠাকুর বড়ই নিস্পৃহ—তখনই না বলে পারেনি, গেল কোথায় বড় দাদাঠাকুর।

—গেছে কোথাও। সময় হলেই ফিরবে।

পিলু আর পারল না। বলল, দাদা কোথায় গেছে তুমি জানো!

বাবা খুবই গম্ভীর গলায় বললেন, আরবারে কোথায় গেছিল দাদা তোমারা জানতে!

সে তবু বলল, তুমি যে বললে যাত্রা শুভ।

—শুভই তো। পাঁজি তো তাই বলে।

—দাদা কোনদিকে গেছে জানলে কী করে।

বাবা এবার কী মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। রাজেন কর্মকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মা-র কোমরে ব্যথা, উঠতে বসতে কষ্ট। এটা নিয়ে যাও। বলে বাবা ঘর থেকে কলাপাতায় মোড়া

কী বের করে এনে কর্মকারের হাতে দিলেন। ঘুনসিতে পরিয়ে দিতে বল। দুর্গাষ্টমীর শেষে যেন পরেন। নির্জলা উপবাসে থাকে যেন।

বাবা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, দাদার এখন তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু। বুঝলে। এই যজ্ঞই মানুষকে সারাজীবন তাড়া করে। তিনি এখন ঘোড়ায় চড়ে ছুটছেন। রাজ্য জয়ে বের হয়েছেন। তাকে কে নিরস্ত্র করবে। বড় হলে সবারই শুরু হয়। শেষ হয়, তোমার বাবা, নয় এই নবমী বুড়িকে দিয়ে। বুঝলে কিছু!

সে সত্যি কিছু বুঝতে পারছে না।

দাদার ন'টি বিষয়ে পাশ কেন কথাটা উঠল পিলু তাও বোঝে। সে এবার পরীক্ষায় পাশ করলে ক্লাশ এইটে উঠবে। সেও আর ছোটটি নেই। সে বোঝে দাদার শেষ বিষয়ে পাশটার এখন কী পরিণতি। অন্তত বাবা তাকে কী অর্থে কথাটা বলতে চাইলেন সে বোঝে।

—তোমার দাদা আর শুধু তোমাদের নেই।

ভাবতেই পিলুর মনটা দমে গেল।

—আমরা তার কেউ না! আমাদের কষ্ট বুঝলি না! বাবা মা-র কষ্ট বুঝলি না! অভিমানে দেশান্তরী হলি! বাবা কী খারাপ কথা বলেছে বল। পরীদির দাদু আসলে ডেকে নিয়ে বলতে গেলে বাবাকে অপমানই করেছে। যে-বাবা পুত্র গৌরবে এতদিন এতটা দুঃখ কষ্ট সয়ে থিতু হলেন, সেই বাবাকে ডেকে পুত্রের অপমান গাইলে কোন বাবার মনে না লাগে তুই বল! তোর জন্য পরীদিকে শেষে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে! বাবা এমন অভিযোগ শুনলে মাথা কী করে ঠিক রাখতে পারেন বল। ক্ষোভে না-হয় বলেছেনই। —তোমার জন্য শেষে অন্নপূর্ণাকে বনবাসে যেতে হচ্ছে? আর তাতেই তোর এত অপমান। চিঠি রেখে গেলি, পরীদি যেন শহর ছেড়ে না যায়। তুই নিজেই চলে যাচ্ছিস!

পিলু বাবার দিকে তাকিয়ে আর কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। সংসারের আর দশটা কাজে বাবা ক'দিন নিজেকে খুবই যে ব্যস্ত রাখবেন তাও সে বোঝে। আসলে পুত্রের এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা তাঁকে ভিতরে যতই কষ্টে ফেলে দিক, উপরে তিনি সব সময় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন। সংসার ধর্ম বাবার কাছে এ-রকমেরই। কখন কী ঘটবে কেউ বলতে পারে না। আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল। বাবার এই স্বভাবই তাঁকে যে কিছুটা নির্বিকার করে দেয় পিলু তা ভালই জানে।

দাদার সেই একটা বিষয়ে পাশ পিলুকে এখন কিঞ্চিৎ বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে। তার চেয়েও বেশি বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে, দাদা কোথায় যেতে পারে এমন কোনো নিশ্চিত ধারণা বাবার আছে—তা না হলে বাবা ধরে নিলেন কেন যাত্রা শুভ। সে নিজেও পঞ্জিকা দেখে থাকে আজকাল। 'যাত্রা শুভ' এই বাক্যটি কোন্ দিক নির্ণয় করছে—উত্তরে দক্ষিণে, না পুবে পশ্চিমে, অথবা নৈঋত কিংবা ঈশান কোণ—কারণ যাত্রা শুভ তো বড় একটা সব দিকে হয় না। তবে কী দাদা কোন দিকে গেছে বাবা মনে মনে ঠিক করে যাত্রা শুভ কথাটা বললেন!

পিলু বলল, দাদা কোথায় গেছে তুমি জান!

—কোথায় যাবে। কলকাতা ছাড়া আর কোথায় যাবে তোমার দাদা। কলকাতায় না গেলে তার নাকি কিচ্ছু হবে না। তোমার মাকে তো প্রায়ই বলত। গরীবের ঘোড়া রোগ। লেখাপড়ার পাট তুলে ইস্কুল আর আড্ডা। মুকুল বলে গেল একদিন, মর্নিং-এ বি কম ভর্তি হয়ে যাও বিলু। কলেজে নতুন কমার্স ক্লাস নাকি সরকার অনুমোদন করেছে। মাথা পাতল না। তোর মাও বলল। মিমি এসে বলে গেল, মাসিমা আপনি বলুন, যদি রাজি হয়।

পিলু অবশ্য এতটা জানে না।

তবে গরীবের ঘোড়া রোগটি কী সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। রাত জেগে এক গাদা পাণ্ডুলিপি দেখত। পড়ত। পছন্দ হলে রাখত। না হলে অমনোনীত লিখে এক পাশে ফেলে রাখত। 'অপরূপা'য়

সব গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, এমন কী এদিকটায় নিজেই ডামি তৈরি করত। এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে জিপে কোথাও পরীদি যাচ্ছে দেখতে পেলেই আরও ক্ষেপে যেত। তখন নিজেই রাত জাগত, কেন জাগত কে জানে—টেবিলে বসে এক একটা লাইন লিখত আবার কেটে দিত। কেমন ছটফট করত ভিতরে।

আসলে দাদার এই ঘোড়া রোগ কে ধরিয়েছে।

কে বলেছিল কাগজ বের করতে!

দাদা কেন যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা লিখত তার খাতায়। মাথা মুণ্ডু সে কিছুই বুঝত না। অথচ দাদার বন্ধুরা তাকে বাহবা দিত। পরীদি নাকি বলত, বিলু আমাদের গর্ব। সব এক ব্যাচের কবি। এক ডালের পাখি। দাদার ছাপা কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝত না—অথচ এই নিয়ে অযথা সবার গর্ব প্রকাশই দাদার মাথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। দাদার এই নির্বাসনের জন্য কেন জানি এ-মুহূর্তে শুধু বাবাই দায়ী ভাবতে পারল না। দাদার বন্ধুরাও কম দায়ী নয়।

সেদিন তো সুধীনদারা এসে জোর করেই দুটো কবিতা দাদার খাতা থেকে টুকে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাচ্ছে সুধীনদা। এক ফাঁকে বড় বড় কাগজের অফিসে ঢুঁ মেরে আসবে বলেছে।

দাদা কিছুতেই রাজি না।

—ধুস তোমরা যে কী কর না! ও-সব কবিতা মফঃস্বল পত্রিকায় চলে! আমার তেমন কবিতাই নেই। লিখতেই পারি না!

মুকুলদা দাদাকে অভিযোগ করেছিল, বিলু তুমি শামুকের মতো গুটিয়ে থাক কেন বলতো। সুধীনদাকে দিতে আপত্তি কেন!

—না আমার দেবার মতো কিছু নেই।

—বললেই হল! বলে জোর করে দাদার কবিতার খাতাটা কেড়ে নিল।

তার দাদাটা কেমন কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে বলেছিল, কী যে তোমরা পাগলামি শুরু করলে বুঝি না। বলছি নেই। কলকাতার কাগজে দেবার মতো কোনো লেখা নেই।

নিখিলদা দাদাকে জোরজার করে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেছিল।

পিলু একটা দুটো কথা থেকে বুঝতে পেরেছিল আসলে এটা পরীদিরই কাজ। পরীদিই সুধীনদাকে কলকাতায় পাঠিয়েছে। 'অপরূপা' কাগজের জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, কারণ যারা বিজ্ঞাপনদাতা, তাদের কেউ কেউ পরীদির সম্ভবত আত্মীয় হয়। চিঠি লিখে সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। শুধু একবার গিয়ে সই করে ব্লক আরও কী সব বোধহয় কোনো ছাড়পত্র—সে যাই হোক পিলু বুঝেছে দাদার এই স্বার্থপরতার জন্য তার বন্ধুরাও কম দায়ী নয়। পরীদি তো বটেই।

দাদার শেষ বিষয়ে পাশটা কী তবে এই ঘোড়ায় চড়ে বসা! ভাবতেই পিলুর কবেকার সব দৃশ্য মাথায় পাক খেতে থাকে।

বাবা পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

—ফিরতে এত দেরি। কোথায় ছিলে!

দাদা তবু রা করছে না।

বাবা বললেন, আমরা সব দুশ্চিন্তায় ঘর বার করছি—তুমি ফিরছ না, চিন্তা হয় না। সেই কোন সকালে বের হয়ে গেছ। মানু কী বলল? রেজাল্ট আসেনি!

—এসেছে।

—তবে?

—পাশ করতে পারিনি।

বাবা কেমন সহজে গোটা ব্যাপারটা লঘু করে দিয়ে বলেছিলেন, তাতে কী রামায়ণ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। জীবনে সবাই পাশ করে!

তারপর হেসে বাবা বলেছিলেন, কটা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলে!

শুধু এই একটি বাক্যেই পিলু যেন টের পেয়েছিল সেদিন বাবা তার কোন স্তরের মানুষ। পুত্রটির পরীক্ষাই তার কাছে বড়, কী পড়ছে না পড়ছে বাবার পক্ষে খোঁজখবর রাখাও সম্ভব না। টোলের

পড়াশোনা একরকমের পুত্রটির পড়াশোনা আর একরকমের।

দাদা বলেছিল, দশটা বিষয়।

বাবা বলেছিলেন, কটাতে পাশ করেছ?

দাদা কেঁদে ফেলেছিল বলতে গিয়ে, ন'টা বিষয়ে। আর বাবার তখন আশ্চর্য সরল হাসি। তার জন্য কান্না। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাশ করে । যাও হাতমুখ ধুয়ে খেতে বস।

এ-সব পুরানো স্মৃতি দাদা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় বার বার মনে পড়ছে।

তখনই পিলুর মনে হল, বাবা তাকে কিছু বলছেন, অথচ সে শুনতে পাচ্ছে না।

বাবা মাঝে মাঝে নিস্তেজ গলায় কথা বলে থাকেন—জলে পড়ে গেলে সাঁতার না জানলে যা হয়ে থাকে—বাবার চোখে মুখে সহসা কেমন ত্রাস ফুটে উঠতে দেখেছিল সে।

সে বাবার কাছে গিয়ে বলল, কিছু বলছ!

—চিঠিটা কোথায়!

—আমার কাছে।

—ওটা দাও।

দাও বললেই, দেওয়া যায় না। সে বলতেও পারে না, ওটা আমার কাছে থাক।

হঠাৎ বাবার কাছে দাদার চিঠিটা এত জরুরী কেন, সে তো এ-বাবাকে চেনে না! বাবা কী নিজে যাবেন, চিঠি হাতে রায়বাহাদুরের কাছে যাবেন! তাঁর পুত্র বিস্বর হয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবেন।

বাবা চিঠিটা পড়েছেন কী! তিনি যে স্বভাবের মানুষ, তাতে তাঁর মেজ পুত্রকে সম্বোধন করে লেখা চিঠি, নাও পড়তে পারেন। বয়স হলে পুত্র কন্যাদের নিজস্ব জগত তৈরি হয়—গোপন এক মহাবিশ্ব, বাবা যদি ভেবে থাকেন, সেখানে প্রবেশ করা তাঁর বয়সে অনুচিত, তিনি চিঠিটা না পড়েও দিয়ে দিতে পারেন।

তবে না পড়লে চিঠিটা দেবার পর এতক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারতেন না। নিশ্চয় কী লিখল জানতে চাইতেন। গোপন বিষয় ছাড়াও তো চিঠিতে কিছু লেখা থাকে—তার আশাতেই প্রশ্ন করতেন, কী লিখেছে তোমাকে! কিন্তু বাবা চিঠিটা তার হাতে দেবার পর একটাও প্রশ্ন করেন নি। দাদার চিঠি সম্পর্কে কিছু জানার আগ্রহ হবে না হয় না। তবু কী ভেবে পিলু বলল, তুমি পড়নি!

—পড়ব না কেন! পড়েছি। আর একবার পড়ে দেখা দরকার। চিঠিটা কোথায় রাখলে!

—আছে।

পিলু জানে চিঠিটা বাবার কাছে ফেরত দিলে, ওটা আর সে নাও পেতে পারে। এমন কী চিঠিটা বাবা গোপনও করে ফেলতে পারেন। একজন অনূঢ়া যুবতীকে এর সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। এটা বাবার মতো মানুষের পক্ষে কোনো অপযশের কারণ হতে পারে—কিংবা বড় পুত্রের পক্ষেও। তার জন্য রায়বাহাদুর নাতনিকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এক ধরনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ দাদার,এমন মনে করেও চিঠিটি তিনি গোপন করে ফেলতে পারেন। মুখে বলা, আর লিখিতভাবে থাকার মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ এ মুহূর্তে পিলু তা টের পেয়েই বলল, দেখি—কোথায় যে রাখলাম!

সে এবার তার ঘরে ঢুকে গেল। আসলে সে চিঠি খুঁজছে না। চিঠিটা তার পকেটেই আছে। দাদা কী নিয়ে গেল সঙ্গে! বোধহয় বাবা একবার নিজেই ঘরটায় ঢুকেছিলেন। মা, মায়া, এবং অন্য সবাই। সে দেখল, দাদার সুটকেসটা নেই! কিন্তু যদি কলকাতায় যায়—টাকা পয়সা কোথায় পাবে।

মাইনে পেয়েতো দাদা সব টাকা মা'র হাতে তুলে দেয়। প্রথম মাইনে পাবার দিনটা তার মনে আছে। সকাল থেকেই সবাই খুব প্রসন্ন। দাদার প্রথম সরকারি উপার্জন। এর আগে দাদা দু-একটা টিউশন করে যা পেত, তাও তুলে দিত মা'র হাতে। দাদা স্কুল থেকে ফিরে আসছে না কেন, কারণ সেদিন কেন জানি মনে হয়েছিল, দাদার ফিরতে দেরি হচ্ছে।

ঘুরে ফিরেই বার বার বাড়ি। —দাদা এল! আবার ঘুরে ফিরে বাড়ি—দাদা এল!

বাবা বাড়ি ঢোকার মুখে জামগাছের নিচে দাদার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বলেছিলেন—আসেনি। আসবে। এতো আর পূজার দক্ষিণা নয়, ঝনাৎ করে দু-পয়সা, বেশি হলে এক টাকা, আঁচলের খুঁট থেকে খুলে দেওয়া। কোনো সই সাবুদ নেই। সরকারের টাকা তো আর আঁচলের খুঁটে বাঁধা থাকে

না, যে হাত পাতলেই পাবে। দেরি হতেই পারে।

বাবার কাছে এবং গোটা পরিবারের পক্ষে এই সরকারি উপার্জনের প্রথম দিনটি ফলে উৎসবের মতো ছিল।

দাদা ফিরে এলে, মা মায়াকে বলেছিল, জলচৌকিটা এগিয়ে দে। বাবা বারান্দার এক কোণায় ফুল তোলা আসনে বসে তামাক টানছিলেন। চোখ তুলে—এবং এত প্রসন্ন যে পুত্রের ফিরে আসা সম্পর্কে আদৌ তাঁর আগ্রহ আছে বোঝা গেল না। পিলু জানে তার খুবই দুঃস্বভাব। সে বাবা-মাকে এক দণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। সে বাবাকে যেন কিছুটা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার মতো বলেছিল, দাদা এসেছে। দাদা এসেছে।

বাবা চোখ খুলে বলেছিলেন, চেঁচাচ্ছ কেন! দাদাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। কতদূর থেকে এসেছে। দুপুরের রোদ মাথায় করে এসেছে। ঠাণ্ডা হতে দাও।

দাদার প্রাইমারী স্কুল, দু ক্রোশ দূরে। বনজঙ্গলে বসতি গড়ে তোলা একজন মানুষের পক্ষে সেটা যে আদৌ কোনো দূরত্ব নয় পিলু জানে। সাইকেলে যেতে কী আর সময় লাগে! আসলে দাদা তার কত বড় চাকরি করে কত তার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন। সরকারি চাকরি সোজা কথা! আশি টাকা মাইনে সোজা কথা! পাঁচ মণ চালের দাম সোজা কথা!

পিলু জানে বাবার কাছে টাকার দাম মণ প্রতি চালের কত দর তার হিসাবে। বাবা সারা মাসে যজন-যাজনে পান বেশি হলে দশ বারো সের চাল। সিকি, দু-আনি দক্ষিণা পেলে বাবা হতবাক। দু এক পয়সাই বরাদ্দ বেশি। যাঁরা সিকি দু-আনি দেয় তাঁরা বাবার কাছে বড়ই মূল্যবান, দেব দ্বিজে ভক্তি তাঁরা আছেন বলে আছে।

অবশ্য তার বাবাটি দক্ষিণা কিংবা ভোজ্য গ্রাহ্য করেন না। পূজা, পূজাই। এক পয়সাও পূজা, এক আনারও পূজা। কিছু না দিলেও তিনি পূজা বিধিমতোই শেষ করেন। সবাই সমান দিতে পারবে কেন। তবু যে ধর্ম রক্ষা করছে দু-এক পয়সা দিয়ে, সেটাই বাবার কাছে বড়। মা'র এক কথা, সারাদিন না খেয়ে শেষে এই দু-মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে এলে! কার মুখে দেব বল! ওদেরই বা বলি কী আক্কেল! সব কিছুর দাম বাড়ে, ঠাকুরের বেলায় সেই এক পয়সা, দু-পয়সা।

বাবার তখন বোধহয় ভিতরে পীড়ন শুরু হয়। ঠাকুর দেবতা তুষ্ট থাকলে সংসারে সুখ বাড়বে সেই আশায় তিনি পৈতৃক পেশায় লেগে আছেন। এর মধ্যে তাঁর যে ঈশ্বর উপাসনার তাগিদও আছে বাবার চোখ মুখ দেখলে পিলু টের পেত। মা'র অভিযোগের উত্তরে শুধু বলতেন, আঃ কী যে বলছ ধনবৌ!

তখনই সে শুনতে পেল, কী পেলে! কোথায় রেখেছ। এতক্ষণ লাগে খুঁজতে!

সেও জবাব দিল, পাচ্ছি না তো।

—এই তো তোমাকে দিলাম।

—তা তো জানি।

—তোমরা সবাই দেখছি আলগা স্বভাবের হয়ে যাচ্ছ। চিঠিটার গুরুত্ব বোঝো। অন্য কারো হাতে পড়লে কী হবে জান!

—কী আবার হবে। পিলু ঘরে বসেই আছে। চিঠিটা পরীদিকে না দেখিয়ে, দেওয়া ঠিক হবে না।

সে পরীদিকে খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত সুস্থির হয়ে বসতেও পারছে না। সে বাবাকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে দেবার জন্য বলল, দাদা যে গেল, টাকা পয়সা পেল কোথায়। যেখানেই যাক থাকবে কোথায়, খাবে কী!

—তোমার দাদা তা জানে। তা ভালই বোঝে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ও তো মাইনে পেয়ে মা'র হাতেই এসে দিয়ে দেয়।

—মাকে জিজ্ঞেস কর দিয়েছে কি না!

অবশ্য সে জানে, মা'কে দাদা টাকা দিয়েছে কিনা, বাবা জানেন না হয় না। এ-মাসের আজ তিন তারিখ। নিজের কাছে টাকা রাখার তো স্বভাব নয় দাদার।

বাবাই বললেন, ভাগ্যিস তোমার মা বলেছিলেন, এখন রাখ, পরে নেব। হাতজোড়া দেখছ না!

নিই কী করে! তোর মা পাটিসাপটা করবেন বলে চাল বাটছিলেন। ভুলে সেও দেয়নি, আর তোমার মায়েরও খেয়াল ছিল না। টাকাটা সে বোধহয় সঙ্গেই নিয়ে গেছে। এটাও বুঝবে, তাঁরই ইচ্ছে।

—কী পেলে?

ঘর থেকে পিলু কিছুতেই বের হচ্ছে না। এটা ফেলছে, ওটা টানছে। যেন বাবা টের পায় সে বসে নেই—খুঁজে দেখছে, ভুলে চিঠিটা কোথায় গুঁজে রেখেছে।

—তোমাদের ঐ দোষ। চিঠিটা বাঁ-হাতে নিয়েছ। বাঁ-হাতে কোনো জিনিস কোথাও রাখলে মনে থাকে না। খুঁজে পাবে কী করে! কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব থাকলে চলে!

আসলে পিলু এত ত্রাসের মধ্যে ছিল যে বাঁ-হাত না ডান-হাতে বাবার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে মনে করতে পারছে না। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ছিল—বাঁ-হাত হতেই পারে। তার ভুলও হয়নি। তবে তার হয়ে বাবাই যেন পথ বাতলে দিলেন। চিঠিটা না দিলেও চলবে—বাঁ-হাতে নিয়ে সে কোথায় রেখেছে কিছুতেই আজ আর মনে করতে পারবে না।

তবে দাদা টাকা পয়সাও সঙ্গে নিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যতটা ত্রাসে পড়ে গেছিল, এখন আর ততটা ত্রাসের মধ্যে নেই। দাদা এবার না বলে কয়েও ফেরার হয়নি—টাকাপয়সাও সঙ্গে আছে—দুর্ভাবনা নেই। চিঠি রেখে গেছে। দাদা স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে বারণ করেছে।

সে জামা প্যান্ট পাল্টে শহরে যাবে বলে সাইকেল বের করতে গেলেই বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছ? চিঠি খুঁজে পেলে না?

—এসে খুঁজব। এবং বাবাকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে বড় ঘর থেকে সাইকেল বের করে দ্রুত উধাও হবার সময় শুনল, বাবা ডাকছেন, কোথায় বের হলে!

সে রাস্তায় পড়ে প্যাডেলে জোরে চাপ দেবার সময় হাত তুলে দিল—আসছি। সে দেখল না বাবা কতটা ক্ষুব্ধ। কিংবা তার যেন মনে হল, তাকালেই বাবা দৌড়ে এসে সাইকেলের ক্যারিয়ার টেনে ধরবেন। —কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না?

দু'পাশে গাছপালা, নতুন বাড়িঘর, ছাগল গরু এবং রাস্তায় কুকুর বাঁচিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে পলকে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর বড় সড়কে। প্রায় সে উড়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছে না পরীদির কথা চিঠিতে থাকায় কী এমন ত্রুটি হয়েছে। বাবা কেন ভাবছেন, এর মধ্যে একজন মেয়েকে জড়িয়ে দিয়ে বিল্ব ঠিক কাজ করেনি।

বাবার অসুবিধা সে বোঝে। তাঁর বড় যজমান নিবারণ দাস চিঠিটা দেখতে চাইতে পারে। কিংবা দেবীদারা খবর পেয়েই চলে আসবেন, অন্য প্রতিবেশীরাও। খবর ছড়িয়ে গেলে যা হয়। সকাল বেলাতেই বাড়িতে এক প্রস্থ হুলস্থূল গেছে। এবার ধীরে ধীরে আরও সব পরিচিত মানুষজন এসে দাদার খবর নেবে। বাবাই বলবেন, দাদা কলকাতায় গেছে। চিঠি রেখে গেছে। কেন যে এই মতিভ্রম ছেলের বুঝি না, তারপরই বাবা এখন যে নতুন আপ্তবাক্যটি বলে থাকেন, তাই হয়তো শেষে বলে মানসিক শান্তি পাবার চেষ্টা করবেন—কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে, কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে, আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে—কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহই ইহাকে বোঝে না।

পিলু দাদাকে দেখে এটা হাড়ে হাড়ে টের পায়। সে কি দাদাকে ঠিক বোঝে না। কার উপর দাদার এত ক্ষোভ! চিঠি পড়ে বুঝেছে পরীদির উপর কোনো ক্ষোভ নেই, বাবার উপরেও না। দাদা সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে কেন যে ফেরার হয়ে গেল! দাদাকে এত দেখার পরও সত্যি সে তাকে বোঝে না।

ভোর রাতে মিমির মনে হল বেশ শীত শীত করছে। শীত করার জন্য ঘুম ভেঙেছে, না কোনো শব্দে, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ইদানীং তার রাতে ঘুম ভাল হয় না। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়— কেন যে দেখতে পায় সহসা কোনো দূরবর্তী পাহাড় শীর্ষে সে দাঁড়িয়ে আছে আর অদৃশ্য কোনো বেহালাবাদক সামনের মরুভূমি অতিক্রম করছে। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না, আশ্চর্য সুরের ধ্বনি কানে আসছে। অথবা সে স্বপ্ন দেখে, একজন পরিব্রাজক এইমাত্র তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে

যাচ্ছে। তার মুখে হিম ঠাণ্ডা বালির ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। সে পথ চিনে যেতে পারছে না। যেদিকে দু-চোখ যায় শুধু মরু সদৃশ অঞ্চল। কোথাও গর্ত থেকে মুখ বার করে রেখেছে মরু শৃগাল। সে যেন হেঁটে যাচ্ছে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। ঝড় ঝাপটায় তার বসন ভূষণ আলগা হয়ে যাচ্ছে। সে বোঝে প্রকৃতি ক্রমেই তার শরীরের উপর থাবা বসাতে চায়। সে তখন মুখ দু-হাতে ঢেকে চিৎকার করে ওঠে।

বিলু তাকে চড় মারার পর থেকেই কিছুটা যেন অনিদ্রার সে শিকার হয়েছে।

এতদিন সে বিলুকে একরকমভাবে চিনেছিল—চড় মারার পর অন্যরকম ভাবে। সে কেন যে খেলাটা খেলতে গেল! সে তো বছর দুই তিন হয়ে গেল বিলুর সঙ্গে মিশছে। বোধহয় তার দিক থেকেই প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিলু তো সব সময় তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। বিলু কী তার অধিকারের কথা বুঝিয়ে দিয়ে গেল! সে আর কোনো হালকা চালে বিশ্বাসী নয়। বিলুর চোখে কী যেন আছে—না হলে তার এই মরণ কেন! সে কী করবে না করবে, সেটা তার মাথা ব্যথা। অথচ কেন যে বলা, না তোমাকে এটা সাজে না, ওটা কর না, কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এ-সব বলার জন্য! পরেশবাবুকে ডেকে না আনলেই পারত। সে শুনেছে—বিলুর রেলে চাকরি হচ্ছে। অথচ বিলু নিজে বলেনি—এমন কী দাদু পর্যন্ত গোপন করে গেছিলেন! কেন যে মাথায় আগুন ধরে গেছিল, দ্যাখ তবে। সে জানে পরেশবাবুর সঙ্গে আবার হেসে খেলে আড্ডা দিলে, তার গাড়িতে ঘুরতে বের হলে দাদুর মাথার ক্যাঁড়া নেমে যাবে।

মিমি উঠে বসল।

তার হাই উঠছে। সে আলো জ্বালাল। বাথরুম পেয়েছে। বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জলও দিল।

তারপর আর শুতে ইচ্ছা করল না। দরজা খুলে দোতলার বারান্দায় এসে সোফায় গা এলিয়ে দিল। ঝাড় লণ্ঠনের নিচে সে অন্ধকারে বসে আছে। কাল পার্টির সেমিনার আছে লালগোলাতে। তার যাওয়া দরকার। কিন্তু বাড়িতে যে-ভাবে অশান্তি শুরু হয়েছে তাতে যাওয়া কঠিন। দাদু তাঁর ঘর থেকেই বার হচ্ছেন না। মেশোমশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন না কি। সে পার্টি অফিস থেকে রাতে ফিরে ঠাকুর চাকরের মুখে খবরটা পেয়েছিল।

দাদু নাকি কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছে।

সে বোঝে দাদুর দুঃখটা কোথায়। তিনি শহরের প্রভাবশালী মানুষ। সারাদিন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। দিন রাত লোকজনের অপেক্ষা। গাড়ি শহরে বের হলে লোকজন সম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়। তাঁর পক্ষে বাড়ি বয়ে এত বড় অপমান সহ্য করা কঠিন। আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা সাম্রাজ্যবাদী এবং বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাই এ জন্য দায়ী সে এটা বোঝে। এও বোঝে বিলু বোকার মতো কাজটা করে ফেলেছে। সে নিজেকেও এর জন্য কম দায়ী মনে করে না। তবু কোথায় যেন এক আশ্চর্য নাড়ীর টান থেকে গেছে এই প্রাসাদের ইট কাঠে। সে ইচ্ছে করলে পার্টি করতে পারে—জনসভায় বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারে, এমন কী পার্টির তরফ থেকে পথ-নাটিকায়ও অংশ নিতে পারে—তবু বের হয়ে কোনো উদ্বাস্তু যুবকের সঙ্গে সে হাত ধরে হেঁটে যেতে পারে না। অদৃশ্য নিষেধ বুঝি আঁকা ছবির মতো ফুটে ওঠে দেয়ালে।

আসলে সে ভাল নেই।

বাবাকে বিলাসপুরে ট্রাঙ্ককল করা হয়েছিল। দাদু কী বলেছেন, সে জানে না। মেসোমশাইকে কী অভিযোগ করেছেন তাও সে জানে না। বাবা মা ভাই বোনেরা চলে এসেছে।

কেন যে কালীবাড়িতে নতুন মাস্টারকে দেখতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ। দেখা না হলে, কিংবা লক্ষ্মী যদি তাদের নতুন মাস্টারের ভীতু স্বভাবের কথা না বলত, তবে কে বিলু, কে পিলু কিংবা 'অপরূপা' কাগজ নিয়ে তার মাথাব্যথা থাকত না। বিলুর মধ্যে কবিতার গুণ—এ-সব কত কিছু ছাইপাঁশ তার যে মনে আসছে—সে এ-সব ভেবেই আজকাল বিষণ্ণ হয়ে যায়। তার কিছু ভাল লাগে না।

দাদু তার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। সে যে-ভাবে বাঁচতে চায়, বাঁচতে পারে—এত দিন এমনই মনে হত। কিন্তু দাদুর অসুস্থতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে।—এ ছাড়া বিলুকে এ-ভাবে আগুনের মধ্যে সেই যেন ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে। বিলুর রেলের চাকরি এক দণ্ডে বানচাল করে দিল। মাত্র

ক'দিনের ছলনাতেই দাদু কাবু হয়ে গেছিলেন। সে বুঝেছিল, দাদু তাকে বিশ্বাস করেছে। সেজেগুজে পরেশচন্দ্রের সঙ্গে বের হয়ে সে যে অভিনয় করেছিল, দাদু বিশ্বাসই করতে পারতেন না। বিলুও বিশ্বাস করতে পারল না, তার চাকরিটা ভণ্ডুল করে দিতে হলে এ-ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না।

বিলুকে দেশ ছাড়া করায় দাদুর এই চক্রান্ত মাথা পেতে নিতে পারেনি। একজন তার অভিনয়ে ঠকেছে।

অন্যজন তাকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। ভেবেছে, আসলে সে পরেশের। তার মতো গরীব বাবার পুত্রের পক্ষে দুর্লভ।

বাড়ির সামনে বাগান। বাহারি সব বিদেশী ফুলের গাছ—সাদা কাকাতুয়া দাঁড়ে টাঙানো। ছবির মতো সব কিছু। সকাল হবার মুখে। আকাশ পরিষ্কার। কিছু নক্ষত্র চোখে পড়ছে। বাগানের এক কোণায় বড় একটা শেফালি গাছ—নিচে সাদা ফুল সারা রাত ধরে ঝরেছে।

শরতের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। কী আকাশে, কী লতাপাতায় কিংবা গাছপালার মধ্যে। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ঋতুটির বোধহয় বৈরাগ্য আছে—যে জন্য মিমি বিশাল কাঠের কারুকাজ করা চামড়ার নরম গদিতে মাথা এলিয়ে দিতে পেরেছে। দাদু তাকে ডেকেছিলেন, পিসি ছোটকাকা ছিলেন পাশে। ন' কাকীমা, ছোট কাকীমাও তাকে বুঝিয়েছেন। মাথা গরম করিস না মিমি। বাবা তোর কাছে কথা চাইছে। তুই কথা দে।

তার বাবা মা ঘৃণায় তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি।

মিমি জানে কথা দিলেই, দাদু এ-যাত্রায় হয়তো ভাল হয়ে উঠবেন। এ বয়সে কতটা মানসিক উদ্বেগ থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন সে বোঝে। যেন বিলু বাড়ির ঐতিহ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

সে ন' কাকীমাকে বলেছিল, কেন যে তোমাদের ছেলেমানুষী বুঝি না! এখনই কী বিয়ে করব। পড়াশোনা শেষ করতে দাও।

—পড়াশোনার বন্ধের কথা উঠছে কেন বুঝি না। অবুঝ হবে না। দেখছ তো বাড়িটার কী হাল হয়েছে!

দাদুর যদি কিছু হয়!

কিছু হলে সবাই তাকে দায়ী করবে।

এই শরীর এত মহার্ঘ—তার রূপ আছে এবং সে জানে হেঁটে গেলে, সব মানুষ যেন চঞ্চল হয়ে পড়ে। সে তার লাল রঙের সাইকেলে চক্কর মারার সময়ও টের পায়—মানুষজন তাকে দেখছে। শহরের সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত। রোজ একবার সকালে কিংবা বিকেলে সে পার্টি অফিসে গিয়ে বসবেই—নানা বর্ণের পোস্টার সে লিখতে ভালবাসে। ছবি আঁকতে ভালবাসে। মানুষের শক্ত হাত মুষ্টিবদ্ধ উপরে তোলা—সে যা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে এই সব ছবিতে তা সে ধরে রাখতে চায়।

অথচ বিলুটা কী যে ছেলেমানুষী করে বসল। সে জানে বিলুর আর কিছুদিন পাত্তা পাওয়া যাবে না। চোরের মতো তাকে এড়িয়ে চলবে। দেখা হয়ে গেলে কথাও বলবে না। তাকেই গিয়ে বলতে হবে, কই এ সংখ্যায় তোমার কবিতা নেই কেন। কিংবা বিলুকে স্বাভাবিক করে তোলার দায়ও তার।

অথচ পরেশচন্দ্র তাকে ছাড়বে না। হবু কবি তিনিও একজন। সে জানে কবিতা লেখার এই অপচেষ্টা সে কাগজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই। পরেশচন্দ্র যেন তার দাসানুদাস। সে কেন যে তাকে ঠিক একজন পুরুষের মতো ভাবতে পারে না। বিলুর তেজ কিংবা অহঙ্কারের ছিটেফোঁটা তার মধ্যে নেই। ইস যদি সামান্য বিলুর স্বভাব পেত তবে তার পক্ষে কথা দেওয়া বোধহয় কষ্ট হত না। কিছুটা বেলেল্লাপনাই মনে হয় অথবা একটা অভুক্ত কুকুরের মতো তার পেছনে লেগে আছে। ভাবলেই কেন যে ওক উঠে আসে।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা একটু বেশি বোধহয় গো-বেচারা হয়ে থাকে। পরেশচন্দ্রের যো হুকুমের তালিকায় নাম উঠে যেতেই সে তার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না।

সে যে কী করে!

সাময়িক দুর্বলতা হতে পারে—তবে এ-মুহূর্তে তার কাছে এটাই বড় সত্য। বিলু যা স্বভাবের তাকে

নিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে সে এখনও ঠিক জানে না। আজ আবার তাকে ডাকা হবে সে জানে। আজ বোধ হয়, বাবাও থাকবেন। সে তার বাবাকে সমীহ করে। বাবাকে এড়িয়ে চলারও স্বভাব গড়ে উঠেছে সেই শৈশব থেকে। বাড়িতে তার কাকা কাকীমারাই বেশি আপন। মাকে সে নিজের কেউ ভাবতেই পারে না। দেখলেও মনে হবে না মা-মেয়েতে কোনো সম্পর্ক আছে।

এটা কী কোনো প্রতিক্রিয়া কিংবা অভিমান থেকে! তার পিঠাপিঠি ভাই বোনেরা যেন মা-বাবার কাছ থেকে তাকে অবাঞ্ছিত করে রেখেছে। শৈশবের কোনো অদৃশ্য অনাগ্রহ তাকে এ-ভাবে কী শেষে বাইরে টেনে নিয়ে গেল! এ-সব কী কোনো ক্ষোভ থেকে। কিংবা সে এ-পরিবারে দাদু ছাড়া আর কাউকে কী সে-ভাবে ভালবাসে না!

সে তার মধ্যে এতদিন ধরে আশ্চর্য এক তাজা প্রাণের সাড়া পেত। সে এক দণ্ড তার ঘরে বসে থাকতে পারত না। সে গড়ে উঠছিল নিজের মতো। ঝড় উঠে গেল কবে সে নিজেও যেন জানে না।

সে তো রওনা হয়েছিল অনুকূল বাতাসে। এমন দুর্বিপাকে তাকে পড়ে যেতে হবে কে জানত।

বাবার হুকুম হয়ে গেছে, বাড়ির বার হবে না।

হুকুম, মিটিং মিছিল বন্ধ।

হুকুম, পরিবারের মান সম্মান নষ্ট করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

হুকুম, যদি মনে কর পরিবারের চেয়ে তোমার ইচ্ছের দাম বেশি তবে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পার। আমরা কিছু বলব না।

তখনই এত কেন বুকে হাহাকার বাজে।

জন্ম জন্মান্তরের এক অনড় প্রস্তরের নিচে তাকে যেন পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

সে আগের মতো আর কী নেই! তার মধ্যেও কেমন এক অর্থহীন জীবন—বেঁচে থাকা গড্ডালিকা প্রবাহ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। সুধীনদা ফোন করলে বলেছে, যা ভাল বোঝো কর।

সুধীনদার প্রশ্ন, তোর শরীর ভাল নেই।

—কেন বলত!

—কেমন ধরা গলায় কথা বলছিস!

সে কী কথা বললেই ধরা পড়ে যায়। সবাই কী তবে রহস্য টের পেয়ে গেছে। বিলু যে বাড়ি বয়ে এসে তাকে অপমান করে গেছে, সবাই কী জেনে গেছে! জানতেই পারে। পিলুর যা স্বভাব, সে তো বিলুর বন্ধুদের বাড়ি চেনে। সে বলতেও পারে সব। তবে তাকে কেউ বিলু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেনি। বিলুর সঙ্গে কী হয়েছে জানতে চায়নি।

সে কেন যে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। সকালের রদ্দুর বারান্দায়, কেউ দেখলে ভাবতেই পারে মিমি আঁচলে মুখ আড়াল করে ঘুমিয়ে আছে হয়তো। তখনই যেন কে বারান্দায় ঢুকে বলল, তোমার চা মিমিদি।

মিমি সে অবস্থাতেই বলল, রেখে যাও।

সে জানে মোহনদা চা রেখে চলে যাবে। এদিকের বারান্দাটা তার একান্ত নিজস্ব। তার ঘরের লাগোয়া। তার ঘরের দরজা দিয়েই এই বিশাল বারান্দায় ঢুকতে হয়। ঘরটা সে নিজের পছন্দমতো বেছে নিয়েছে। ঠিক অন্দরেও না, আবার সদরেও না। নিচের তলাটা একটা পুরো হলঘর। হলঘর পার হয়ে দাদুর বিশাল বসার ঘর। হলঘরে মাঝে মাঝে দাদুর সঙ্গে জেলার কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক হয়। তখন সারা রাত্রি বাড়িটা গম গম করে। এঁরা সব মফঃস্বল শহর থেকে আসেন। কাঁদি, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, এমন কী আরও দূরবর্তী গ্রাম দেশ থেকেও। জেলা কমিটি গঠন নিয়ে, নির্বাচন নিয়ে কথা হয়। দাদুর পরামর্শমতো কোন অঞ্চল থেকে কে প্রার্থী হবে ঠিক করা হয়। যদিও কংগ্রেসের আলাদা অফিস আছে। হাজারদি ব্যাঙ্কের পুরো দোতলাটাই অফিস। নিজস্ব মুখপত্র আছে। তাতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সঙ্গে জেলার মানুষের অন্নকষ্টের কথাও থাকে।

আর তার ঘরে সামান্য একটা তক্তপোষ ছাড়া তেমন কিছু নেই। টেবিল চেয়ার আছে—র‍্যাক আছে। কিছু বই, কলেজের এবং মার্ক্স-এর উপর। লেনিনের ছবি ছাড়া ঘরে কোনো ছবিও টাঙানো

নেই। দাদু বলতেন, সন্ন্যাসিনী দেখছি দিন দিন আরও বেশি গোঁড়া হয়ে উঠছেন। ঘরে আর সামান্য আসবাবপত্র রাখলে লেনিন সাহেব নিশ্চয়ই রাগ করবেন না।

মিমি বলত, ঘরে একদম জঞ্জাল বাড়াবে না। বেশ আছে। তোমার ঘরে ঢুকে তো বলি না, এটা নেই কেন, ওটা নেই কেন। আমার চলে যায়।

দাদু প্রথম দিকে খুব রগড় করতেন—লেনিন সাহেবের যাদুটা কী বলত! তোমার মতো চৌকস রামণীকে হাত করে ফেলল। সারা জীবন এত পিছু পিছু ঘুরলাম, এ বুড়োটার ছবি দূরে থাক, তার কথাও দিনে একবার মনে হয় না তোমার!

তার টাঙানো ফটো নিয়ে দাদুর পরিহাসে সে যোগ দিতে পারত না। কেবল বলত, ঠিক আছে যাও। আমার কাজ আছে। সে তার পাঠ্য বইয়ে নিমগ্ন হবার ভান করত। নোট নিত কাগজে। সে মেধাবী ছাত্রী, দাদুর এই এক অহঙ্কার আছে। রেজাল্ট বের হলে, দাদু হাঁ হয়ে যায়। এক কথা দাদুর—সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াস পড়িস কখন! দারুণ রেজাল্ট দেখছি। কী যে বালকের মতো খুশিতে একে ওকে ফোন করা শুরু হয়ে যায় তখন।

সে আয়নায় দেখেছে ক'দিনেই চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে।

সে অবাক হয়ে ভাবে এত বড় অপমানই বা সে হজম করে গেল কী করে! বিলুর কী এ-ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না ক্ষোভ প্রকাশের। বাড়াবাড়ি করে ফেলল। তাহলে তুমি এই! ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ঝলসে উঠল মিমির।

সে ভাবল—না, মোকাবেলা যখন করতেই হবে, তখন তাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। সে চা খেয়ে ডাকল, মোহনদা, আমার চানের জল দিতে বল।

তার নিজস্ব বাথরুমে এখনও জলের বন্দোবস্ত হয়নি। তার যাতে অসুবিধা না হয়, ইদানীং বাথরুমটা তার জন্য করা হয়েছে। তবে জলের লাইন এখনও আসেনি। ড্রামে জল ভর্তি থাকে। কুমুদ তার নিজস্ব কাজের মেয়ে। তবে কাচাকাচির কাজ সে নিজেই করে থাকে। নিচ থেকে জল টানতে কষ্ট হয় বলে কুমুদ জল টেনে দেয়। তার এটা খারাপ লাগে। অন্দরের বাথরুম এত দূরে যে সেখান থেকে জল টেনে আনার চেয়ে নিচ থেকে জল টেনে আনা ঢের সুবিধা।

কুমুদকে এ-কাজটা করতে হচ্ছে তার অমতে। কোনো কারণে হাত পা খোঁড়া হলে, জল টানতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যেতেই পারে—দাদুর গোয়ার্তুমি—তুমি দিদি আমার কথা শুনছ না, এবং দাদু বোধহয় যতটা দ্রুত সম্ভব করে দেবেন বলেই—কটা দিনের জন্য কুমুদ জল তুলে দিক এমন সম্মতি নিয়েছিল তাঁর কাছ থেকে।

দাদুর এক কথা, তোর এত জেদ কেন বলত দিদি! তুই কী আমাদের বৈভব সহ্য করতে পারিস না।

মিমি বলত, পচে গেছে সব। এ-ভাবে হয় না। বাড়ির ভিতরটা ছিমছাম, টবে গোলাপ গাছ,—আর রাস্তায় বের হলে মরা কুকুর বেড়ালের পচা গন্ধ—কাঁচা ড্রেনের গন্ধ খারাপ লাগে না দাদু তোমাদের!

—এ-জন্য কে দায়ী। আমি!

—এই সমাজ ব্যবস্থা।

দাদু কিঞ্চিত রূঢ় গলায় বলতেন, কোনো সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের সহ্য হবে না। নিজেরা যতদিন না ঠিক হচ্ছি। আমরা কাজ করি না, কাজ করলে তার পেছনে লাগি। এমন আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা হাজার বছরের পরাধীনতার জের।

বড় বড় কথা বলে দাদুকে ক্ষেপিয়ে দিতে সে ভারি মজা পায়। পরে দাদু গট গট করে নেমে গেলে সে জানালার পাশে এসে ফিক করে হেসে ফেলে। বুড়ো সারাদিন সবার সঙ্গে মেজাজ নিয়ে কথা বলবে। দু-দিন হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলবে না। স্রোতের বিরুদ্ধে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে বলে দাদুর কম অনুতাপ না—আবার মনে হয়, রক্তের তেজ মরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদু হাসতে হাসতে বলবেন, এই যে গোমড়ামুখী, দ্যাখ কী সাজে সেজেছি।

দাদু তার বড় পরিপাটি স্বভাবের। সিল্ক না হয় মটকার পাঞ্জাবি, পাজামা পাটভাঙ্গা এবং কাঁধে

চাদর—চিরদিন এই পোষাকেই দেখে এসেছে। মিহি খদ্দরের ধুতিও পরেন মাঝে মাঝে। জেলার কুটির শিল্পের সমজদার কত তিনি, পোষাকেই বুঝিয়ে দেন। কালীবাড়ির বাবাঠাকুর তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। দেয়াল জোড়া অয়েল পেন্টিং, বিলু বাবাঠাকুরের কাছে একসময় মানুষ—এ-জন্য বিলুর অবাধ যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হয়নি—তবে তার সঙ্গে বিলুর সম্পর্ক টের পেয়ে দাদুর চক্রান্তের কথা মনে হলে মাথা গরম হয়ে যায়। দাদুর উপর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে যায়।

দাদু তুমি এত ছোট কাজ করতে পারলে!

বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে বিলুকে রেলে চাকরি দেবে বলেছ। তাকে দরখাস্ত করতে বলেছ। সার্টিফিকেটের নকল এটেস্ট করে দেবে বলে তাকে ঘুরিয়েছ। জানি চাকরিটা তার হতই—কিন্তু পরিণামের কথা ভাবলে না। সাদাসিধে ছেলেটাকে চাকরি দিয়ে বিদেয় করতে চেয়েছিলে। সে তোমাদের পরিবারে এত অবাঞ্ছিত! তোমরা মনে কর আমি কিছু বুঝি না। এবং এইসব চিন্তাভাবনাই তাকে কেন যে মাঝে মাঝে পরিবারের প্রতি তিক্ত করে তুলছে।

কুমুদ এসে বলল, মিমিদি, ভিতরে যান।

তার বুক ধড়াস করে উঠল। পরিবারের সবাই এক দিকে। কেউ তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে না। সবাই ভাবছে মাথা খারাপ। বিলুর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই হল! কিন্তু তাই বলে বিয়েতে মত দিতে হবে—তার বিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সবার কাছে। তাও পরেশচন্দ্র—মিমির শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে ঝড়ের বেগে ঢুকে কী বলতে গিয়ে দেখল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে—তাকে কী স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না! তার পোষাক কী অবিন্যস্ত। সে নিজেকে দেখে চোখ ফেরাতেই অবাক—দাদুর ঘরে কাকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে!

প্রায় ছেঁচড়ে টেনে আনা হচ্ছে।

সে ছাড়া পেতে চাইছে। কেবল বলছে, আমি কী করেছি! আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন! ইস লাগছে! তারপরই সে চিৎকার করে উঠেছিল, মিমিদি, দেখ আমাকে কী করছে! আমাকে নাকি বেঁধে রাখা হবে। আমি ঢুকেছি কেন। না বলে কয়ে ঢুকে পড়েছি কেন!

মিমির চোখে আগুন জ্বলছে। সেদিনও বিলুর খবর নিতে এসে পিলু ভারি বিপদে পড়ে গেছিল। দাদা ফেরেনি, সকালে তার দাদুর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাবার কথা। ফেরেনি। মা বাবা চিন্তা করছে। সে কতদূর থেকে হেঁটে এসেছিল। আসতেই কুমুদ, মন্মথ, মোহনদারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরী ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে বলেছিল, ছেড়ে দাও। ছাড় বলছি। সব চাকর বাকরেরা সোজা হয়ে গেছিল। সে পিলুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। সরবত, মিষ্টি সাজিয়ে দিয়ে বলেছে, খা। তোর দাদা ফিরবে। ভাবিস না। পিলুটা কী মানুষ না, সেদিন এ-ভাবে জব্দ হবার পর আবার এসেছে! এরা তো তার দাদাকে নাগাল না পেয়ে ভাইটির উপর শোধ নিতে চাইছে। বাবার হুকুম জারি, আমার মেয়ের গায়ে হাত! আমি কখনও ক্ষমা করব! কুকুর দিয়ে খাওয়াব। চাবকাব। বাবা কেমন উন্মাদের মতো চিৎকার করছিলেন। বড়বাবুর হুকুম তালিম করতেই এ-কাজ। কিন্তু পিলুর আসার এত কী জরুরী হয়ে পড়ল!

সে ছুটে গেল!

পিলুকে ছিনিয়ে নিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল।

—একদম গায়ে হাত দেবে না।

পরিবারের সবাই থ। পরীর এই রুদ্রমূর্তি তারা যেন জীবনেও দেখেনি। দাদুর কাতর কথাবার্তা, কাকাদের কাতর অনুনয় কিছুই মিমির কানে যাচ্ছে না। সে ফুঁসছে। হঠাৎ সে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, রামবিলাস, রামবিলাস। তারপর নিজেই ঝড়ের বেগে করিডোর ধরে ছুটতে থাকলে, পিলু এক দণ্ড দেরি করল না। পরীদির পিছু পিছু সেও পালাতে গেলে মিমি কেমন হুঁস ফিরে পেল। সরল এক বালকের প্রভাবে পড়ে গেল। সে এটা কী করতে যাচ্ছিল! পিলুই যেন সম্বিত ফিরিয়ে এনেছে। —পরীদি এত ছুটছে কেন। পড়ে যাবে! পিলু জানে না, সে আজ এসপার ওসপার করতে চেয়েছিল। পিলুর জন্য পারল না।

পিলু দেখছে, মিমিদি হঠাৎ সিঁড়ির মুখে ধপাস করে বসে পড়ল। মিমিদি হাঁপাচ্ছে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির লোকজন কিছুটা ছুটে এসে থেমে গেছে। এমন কী রায়বাহাদুর দরজায় এসে

দাঁড়িয়েছেন। মনেই হচ্ছে না তিনি অসুস্থ।

সে ডাকল, এই পরীদি। ছুটছিলে কেন! কী হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি।

কারণ পিলুকে নিয়েই বাড়িতে বড় রকমের তাণ্ডব ঘটতে যাচ্ছিল। পরীদি যে-ভাবে ছুটে যাচ্ছিল, তাতে কিছু একটা করে বসাও বিচিত্র নয়। তাকে হেনস্থা করতে দেখেই পরীদি আগুন হয়ে জ্বলছিল। আগুন নিভে গেলে যেমন চারপাশে ছাই পড়ে থাকে—কিংবা বিধ্বস্ত কোনো দৃশ্য—এ মুহূর্তে যেন বাড়িটার সেই চেহারা হয়েছে।

হঠাৎ পরীদি উঠে তার দিকে ছুটে এল। তারপর চুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে থাকল, তুই এলি কেন মরতে। তোরা আমাকে আর কত অপমান করবি। বল, বল কেন এলি! লজ্জা হয় না, কীরে কথা বলছিস না কেন, লজ্জা হয় না, আবার যে এলি! তোকে সেদিন তাড়া করল, তবু তবু কেন এলি! কেন এলি! বলেই পিলুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

মানুষের কী যে থাকে! পিলুর সঙ্গে যেন পরীর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। নিজের ভাই বোনদের প্রতি তার কোনো টান নেই। তারা ছুটি-ছাটায় এলে দিদিকে এড়িয়ে চলে। পিলু যে কখন সেই মায়া-মমতার জায়গা বেদখল করে ফেলেছে পরী বোধহয় নিজেও জানত না। অথবা আজন্ম এই বৈভবের মধ্যে বাস করে, মানুষের অসহায় জীবন তাকে তাড়া করে থাকতে পারে। পিলু, বিলুর এক কালের প্রচণ্ড দারিদ্র্য হয়তো পরীকে টেনেছে।

সে যাই হোক, পিলু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আমার কী দোষ! দাদা আবার কোথায় চলে গেছে। তোমাকে কী সব লিখে গেছে।

পরীদি যেন আর কাউকে পরোয়া করে না। সারা বাড়ির প্রতি কেমন ঘৃণায় মুখ চোখ শক্ত করে রেখেছে। পরীদি ইচ্ছে করলে যে সব করতে পারে তাও তার কেন জানি বিশ্বাস করতে কষ্ট হল না। তার দিকে অপলক তাকিয়ে বলছে, তোর দাদা কোথায় গেছে! বলে যায়নি!

—না। বলে গেলে ছুটে আসব কেন। এই দেখ না চিঠি।

পরীদি কাছে থাকলে সে আর কাউকে ডরায় না। অথচ আগে মনে আছে সে বাবার চাষ করা আনাজ শহরের বাজারে বেচতে এলে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত। কী বিশাল বড় বড় থামওলা বাড়ি। কত বড় উঠোন। দোতলার জানালায় কাঠের কারুকাজ করা ঝালর। সব চেয়ে তার অবাক লাগত বাড়িটার শেষ মহলের পাশে কি বিশাল ফুল ফলের বাগিচা। একটা বিশাল সাদা পাখি দাঁড়ে ঝাপটাচ্ছে। সাদা রঙের পাখিটাকে সে কতদিন অবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখত। পরীদির মতো সুন্দর মেয়েটা এ-বাড়ির সে চিন্তাই করতে পারত না।

পরীদির মুখ কালো হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বলল, আয় ভাই। কিছু মনে করিস না। আমার মাথা ঠিক নেই। তোর পরীদি মরে গেলে তোর কষ্ট হত ভেবেই, আর কিছু করতে সাহস পেলাম না। আসলে সে যে নিচের মহলে যাচ্ছিল, দাদুর চাবুকটা এনে সবাইকে এলোপাথাড়ি চাবকাতে চেয়েছিল—সব ভুলে গেছে। তার মধ্যে কী করে যে সহসা আত্মহননের ইচ্ছে জেগেছিল কেন এমন হয়, চাবুক আনতে যাচ্ছিল, না সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে যেতে চেয়েছিল—কিছুই মনে করতে পারছে না।

কে কী বলছে, কী দেখছে তার প্রতি পরীদির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন কিছুটা জড়তায় ভুগছে পরীদি। পিলু চিঠিটা বের করতে গেলে বলল, আমার ঘরে চল। পরিবারের সবাই দেখছে মিমি পিলুকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিশাল করিডোর লম্বা, কতদূর যেন চলে গেছে! এতবার এসেও, নিচের ঠাকুর দালানের কোণটায় কী আছে জানে না পিলু। কিংবা নিচের ঘরগুলিতে কারা থাকে জানে না। কিছুটা পরিত্যক্ত বলেই মনে হয় ঘরগুলি। প্রায় সময় দেখেছে দরজা বন্ধ। জ্বালালি কবুতরের ওড়াউড়ি। কেউ একটা ঢিল পর্যন্ত মারতে সাহস পায় না। সকালে একবার এসে দেখেছিল, উঠোনে ছোলা মটর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কবুতরগুলো জড় হয়ে খাচ্ছে। মানুষজন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভয় পাচ্ছে না।

মনে হয় কবুতরগুলো সব পোষা। সকালবেলায় দু'জন কাজের লোক বালতি বালতি জল এনে উঠোন বারান্দা ধুয়ে দিচ্ছে। কারণ হেগে মুতে সব নোংরা করে রাখার স্বভাব। এত জ্বালায়, তবু এ-সব কবুতর এ-বাড়ির কোনো শুভবার্তা বহন করে থাকে দেখলে এমনই মনে হয়। যেন এদের

দেখভাল করার জন্যও বাড়িতে আলাদা কাজের লোক রাখা আছে।

পিলু অনুসরণ করছে।

সে কখনও বাড়ির এত ভিতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। এক একটা ঘর পার হয়ে বারান্দা—লাল রঙের মেঝে, আয়নার মতো চক চক করছে। তার পায়ের ছাপ পড়ছে। ধুলো বালি মাখা পা। মুহূর্তে সারা বাড়িটা সে নোংরা করে ফেলেছে। তার নিজেরই সংকোচ হচ্ছিল। পরীদি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। বারান্দার শেষ মাথায় সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাড়ির মিমি, মৃণ্ময়ী সত্যি তাদের কেউ হয় না। তার তো ভয় ভিতরে। বার বার পেছন ফিরে দেখছে আর গুটি গুটি এগুচ্ছে। পারলে এক লাফে সিঁড়ি ধরে নেমে পালাত।

নিচে সাইকেল। সাইকেলে উঠে বসলে কে আর নাগাল পায়। কিন্তু চিঠিটা সব মাটি করেছে। পরীদিকে চিঠিটা না দেখিয়ে গেলেও সে শান্তি পাচ্ছে না। তা-ছাড়া দৌড়ে পালাতে গেলেও সে শান্তি পাচ্ছে না। তা-ছাড়া দৌড়ে পালাতে গেলেও পারবে না। এত মসৃণ মেঝে যে সে ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই যেন আছাড় খাবে— কিংবা পড়ে গিয়ে তার হাত পা ভাঙবে। সবাই তখন হা-হা করে হাসবে। কিন্তু পরীদি যখন ছুটে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে তখন তো সেও ছুটে যাচ্ছিল দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে। বোধ হয় তখন সে নিজের মধ্যে ছিল না।

ঝাড় লণ্ঠনের রঙির কাচ হাওয়ায় সামান্য দুলছিল। বিচিত্র বাহার ফুটে উঠেছে।

সে পরীদির ঘরে ঢুকে যেতেই যেন মনে হল নিজের ঘর বাড়িতে ফিরে এসেছে। তার ভয় নেই। তার চালচলন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। চিঠিটি এবার পরীদিকে দিতে হয়। পরীদি নিজেই পড়ে দেখুক্। কিন্তু আশ্চর্য, চিঠি সম্পর্কে পরীদির যেন কোনো কৌতূহলই নেই। ঘরে ঢুকে বলল, বোস। পালাবি না।

সে এ-ঘরটায় এসে বসলে আশ্চর্য এক মৃদু সৌরভ পায়। বকুল ফুলের মতো সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে। হয়তো ঘরটার পিছনে কোনো বড় বকুল গাছ আছে। কিন্তু অসময়ে তো বকুল ফুল ফোটে না। কে জানে, কোথাও কোনো গাছে বারো মাস বকুল ফুল ফুটে থাকে কিনা। এদের কোনো কিছুর সঙ্গেই তাদের জীবনের মিল নেই। সাদা পাখিটার নামই জানত না। কাকাতুয়া দেখতে এ-রকমের হয় পরীদিদের বাড়ি আসার পর জানতে পেরেছে। টিয়া, ময়না কত তো পোষা পাখি আছে। কিন্তু এ-বাড়ির পক্ষে যেন কাকাতুয়া পাখি না থাকলে সম্ভ্রমে বাধে।

তাকে বসিয়ে রেখে পরীদি বারান্দার দিকে গেল কেন বুঝল না। কাকে ডেকে কি বলল, ঘরের ভেতর থেকে সে তাও অনুমান করতে পারল না। সে একা তক্তপোষে বসে পা দোলাচ্ছে। আর তখনই দেখল, টানা-হেঁচড়াতে তার সার্টের হাতা ছিঁড়ে গেছে। কোথাও জ্বালা হচ্ছে। পিঠের দিকে, ছাল চামড়া উঠে গেছে এবং জ্বালা হচ্ছে পরীদির ঘরে ঢুকে বসতেই টের পেল।

দাদার জন্য তাকে যে কী-ভাবে হেনস্তা হতে হচ্ছে, কত যে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে—শুধু তাকে কেন, বাড়ির সবাইকে—মা তো এখন দরজায় বিকাল হলেই চুপচাপ বসে থাকবে—বাবাও ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়বেন। পক্ষকালও পার হবে না। ছাতা বগলে শহরে চলে আসবেন। মুকুলদার বাড়ি বাবা চেনেন। ওদের পি ডব্লু ডি-র কোয়ার্টারের পাশে বড় কদমফুলের গাছ। যেন কোনো পরিব্রাজক অপেক্ষা করছে, মুকুলদা তো সেবারে দাদা নিখোঁজ হয়ে গেলে এমন ভাবেই বাবার নিখোঁজ সন্তানের অপেক্ষার কথা বর্ণনা করত।

একজন প্রবীণ মানুষ বসে আছে গাছতলায়।

ডাকলেও বাবা বাড়িতে ঢুকতেন না। তাঁর যা জামা কাপড় তাতে যেন যেখানে বসবেন, সেখানেই ময়লা লেগে যাবে। বাবার এই সংকোচের কথাও মুকুলদা বলেছে দাদাকে। —তোমার কষ্ট হয় না বিলু, মেসোমশাই সকাল নেই বিকাল নেই, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখি। বৌদি কত করে বলেছেন, ভিতরে এসে বসুন। মুকুল বাড়ি নেই। আসবে।

বাবার এক কথা—ও ঠিক আছে। গাছের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা।

ঘরে যে পাখা আছে বাবার বোধ হয় তাও জানা ছিল না। কিংবা তিনি তখন পুত্রের মুখ ছাড়া এবং গাছ তলার ছায়া ছাড়া আর কিছুর মধ্যে বোধ হয় সান্তনা পেতেন না।

মুকুলদা ফিরে এসে দেখলেই বলত, এ কি মোসোমশাই গাছের নিচে বসে আছেন ভিতের আসুন।

বাবার তখন এক প্রশ্ন, তোমাদের কাছে কোনো চিঠি দিয়েছে। মাস দুই তো হয়ে গেল। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি তারও তো খোঁজ নিতে হয়।

মুকুলদা বলত, কী যে খারাপ লাগত বলতে, না মেসোমশাই বিলু কোনো চিঠি দেয়নি। গ্যারেজের কাজে মন বসছে না আপনাকে বললেই পারত।

বাবার কাছে যেন এটা খুবই বিড়ম্বনার সামিল ছিল। বার বার খোঁজ নিতে এসে তিনি যেন মুকুলদাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন।

কখনও বলতেন, আর বল না, ওর মা তো ঘরে এক দণ্ড শান্তিতে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। তাই বার বার আসি। কিছু মনে কর না।

মুকুলদা কত বুঝিয়েছে, চিঠি এলেই খবর দিয়ে আসব। আপনি ভাববেন না।

বাবা বোধ হয় মনে করতেন, তাঁর বার বার আসা মুকুলদার পছন্দ না। মুখ কাঁচুমাচু করে নাকি বলতেন, ও ঠিক আছে। তবে বাড়িতে বসে থাকি, পূজা-আর্চায় মন বসছে না—কী করি, একটু হেঁটে এলে ভিতরের কষ্টটা দমন থাকে। খোঁজ নিতে আসি বলে কিছু ভেব না।

মুকুলদা তো একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি মানুষ বিলু! এমন সরল সোজা মানুষটাকে কষ্ট দিতে তোমার খারাপ লাগে না। যেন সব দায় তাঁর। দেশ ছেড়ে এসে এক দণ্ড বসে থাকেন না। আর তুমি গ্যারেজে বনিবনা হল না বলে পালালে। মেসোমশাই কী বুঝবেন, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। তোমার মানুকাকাই তো বলেছেন, যা নম্বর তাতে আর চাকরি জুটবে না। হাতের কাজ শিখুক—করে কম্মে খেতে পারবে।

তারপর মুকুলদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, সব দোষ তোমার। বললেই পারতে, পড়ব, গ্যারেজে ক্লিনারের কাজ আমি করতে পারব না। তা না সবার উপর অভিমান করে নিরুদ্দেশ। আর বলি বাঙাল কাকে বলে—তুমি কী করে ভাবলে দেশের প্রধানমন্ত্রী তোমার অপেক্ষাতে বসে আছেন। দেশভাগের জন্য তোমাদের এই দশা, তাঁর এ জন্য দায়িত্ব রয়ে গেছে তোমার জীবনের সুবন্দোবস্ত করা—এ সব তোমার মাথায় আসে কী করে! বাঙাল কী আর সাধে বলে।

পিলু আমগাছের ডালে বসে সব শুনত। গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে দাদারা মজার মজার গল্প করত—তার দাদার বন্ধুরা শহরের মানুষ—আদব কায়দাই আলাদা। দাদার বন্ধুরা সাইকেলে দল বেঁধে এলে কী খুশি হন বাবা। বনজঙ্গলে বাস করা একজন উদ্বাস্তু মানুষের এত সৌভাগ্য হবে বাবা যেন কল্পনাও করতে পারতেন না। ঘরের ভাল মন্দ, আমের দিনে আম, জাম জামরুল, যে দিনকার যা, খাঁটি দুধ এক গ্লাস করে—যেন বাবা তাঁর আর বাড়ি করার গৌরব এর মধ্যে টের পেতেন। সেই দাদাটা শেষে পরীদিকে মারল! বাবার অন্নপূর্ণাকে মারল!

অথচ পরীদির কোনো ক্ষোভ নেই।

যত ভাবছে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

পরীদি এল। শাড়ি সায়া পাল্টে পরীদি এল। সাদা সিল্ক, লাল ব্লাউজ, মুখে সামান্য প্রসাধন। সামনে এসে পরীদি পিলুর জামাটা দেখে বলল, ছিঁড়ে গেছে। দেখেছিস!

পিলু নিজের ছেঁড়া জামা আগেই দেখেছে। সে পরীদির কথায় আশ্চর্য হল না।

—কোথাও লাগেনি তো!

সে বলতে পারত, জ্বলছে। জামা তুলে দেখাতে পারত। সে জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে, শুনলে পরীদিও কষ্ট পাবে। কিন্তু পরীদিকে এখন চিঠিটা দেখানো দরকার।

সে বলল, দাদা কাল রাতে কোথায় আবার চলে গেছে।

পরীদি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, কখন গেল! দেখি চিঠিটা।

পিলু চিঠি এগিয়ে দিল, পরীদি পড়তে পড়তে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পরীদি দাঁড়িয়েই আছে। এ-ঘরে সে বসে আছে পরীদির যেন খেয়াল নেই। চিঠিটা পরীদি উল্টে দেখল। কোথাও কী খুঁজল।

তারপর বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কে বলল!

—বাবা যে বললেন! তুমি বোসো পরীদি, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

—বসছি। তুই খেয়ে নে। আমরা এক জায়গায় যাব। তুই সঙ্গে থাকবি।

পরীদির সঙ্গে যাবার তো কারো দরকার হয় না। সে দেখল, যারা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরই একজন সাদা পাথরের রেকাবিতে মিষ্টি ফল সাজিয়ে এনেছে। পিলু যে কিছুটা পেটুক পরীদি জানে। কিন্তু এমন অসময়ে এত খাবার দেখে তার নিজেরই সংকোচ হচ্ছিল। বলল, পরীদি, আমার খিদে নেই।

—খাতো! লজ্জা হচ্ছে! দাদা তো লিখেছেন আবার তিনি ফিরে আসবেন। আমাকে শহর ছেড়ে যেতে বারণ করে গেছেন। এত সাহস হয় কী করে তোর দাদার! আমি শহরে থাকব কী থাকব না আমার মর্জি। তোর দাদার কথায় থাকব!

পরীদিকে পিলু ঠিক বুঝতে পারে না। কেন এই ক্ষোভ—দাদা তো খারাপ কিছু লেখেনি। পরীদিকে দাদার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে শুনে তারই খারাপ লেগেছিল। দাদার তো মন খারাপ হতেই পারে।

পরীদি চিঠিটা নিজের ব্যাগে তুলে রেখে দিতে গেলে পিলু বলল, চিঠিটা বাবাকে ফেরত দিতে হবে।

—চিঠিটা থাক আমার কাছে। তোর দাদার খুব আস্পর্ধা দেখছি। তিনি আমার জন্য সন্ন্যাস নিতে গেছেন। নিখোঁজ। নিখোঁজ হওয়া বের করব।

এই রে! পিলু ঘাবড়ে গেল পরীদির কথায়। ভেবেছিল, চিঠিটা পেলে পরীদি জলে পড়ে যাবে। ছটফট করবে, কোথায় গেল, কখন গেল, থানায় ডাইরি করা হয়েছে কি না, নিখোঁজ হলে নাকি থানায় যেতে হয়—কিন্তু এটা তো আর নিখোঁজ হওয়া নয়—লিখেই তো গেছে, আমার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। আমি ফিরব।

পরীদির শরীরে মৃদু সৌরভ। আর পাটভাঙা সিল্ক পরায় একটু নড়লেই খস খস শব্দ উঠছে। দু-একজন উঁকি দিয়ে তামাসা দেখার মতো তাকে দেখে গেল। পরীদি বোধহয় সহ্য করতে পারছে না। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, এত লজ্জা তোদের কবে থেকে হল! এখনও কিছু মুখে দিলি না।

আসলে পরীদি যেন এবার তাদের সবার মর্যাদাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলছে। 'এত লজ্জা তোদের' কথাটা তার ভাল লাগল না। পরীদি কী সব র‍্যাক থেকে টেনে নামাচ্ছে, কী যেন খুঁজছে। পরীদি যে ভাল নেই সে বোঝে। তবু এর মধ্যে পরীদি বাবাকেও যেন টেনে এনেছে।

পরীদি বইটই যা তক্তপোষে নামিয়ে রেখেছিল, তা আবার ভাঁজ করে র‍্যাকে সাজিয়ে রাখছে। দেয়ালে সেই ছবি—সে জানত পরীদির ঠাকুরদার বাবা কী তস্য পিতা কেউ হবে। সে কোনোদিন ছবিটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। আজ হঠাৎ কেন যে তার মনে হল, এমন সুন্দর মুখে পাগলের মতো দাড়ি কেন বুঝছে না। পরীদি যদি খুশি হয়, এইভাবেই যেন বলা, তোমার কে হয় ছবিটা। দাড়ি রেখেছে কেন! একটুখানি দাড়ি।

পরী কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে না। তা যে কী পরী নিজেও জানে না। অথচ খুঁজছে। সে পিলুর কথায় মুখ ফেরাল, কার কথা বলছিস?

পিলু আঙুল তুলে দেখালে বলল, আমার কেউ হয় না। চেষ্টা করছি আমি তার কেউ হতে পারি কি না। তোর দাদা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করিস, পরীদির ঘরের ছবিটা কার! নে দয়া করে খেয়ে উদ্ধার কর।

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বলছি।

—পিলু, আর কত জ্বালাবি। তোকে আমি জানি না মনে করিস। কালীবাড়িতে তোর দাদার কাছে গিয়ে বসে থাকতিস।

দাদা তাকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।—আবার! যেন সে গেলে দাদার এবং বাবার অপমান। একটু সুস্বাদু খাবার পাতে পড়বে এই ভেবে সে পালিয়ে এক ক্রোশ পথ হেঁটে দাদার কাছে চলে যেত।

দাদার কাছে চলে যেত ঠিক—তবে আমবাগানে কিংবা বটতলায় লুকিয়ে থাকত। কিংবা দাদার দুই-ছাত্র প্রায় তার সমবয়সী, তারা খোঁজখবর দিত মাস্টারমশাই কোথায়। পিলুকে ঠোঙা ভর্তি সন্দেশ এনে দিত। মাঝে মাঝে দেখতে পেত লক্ষ্মীদিকে। সে এখনও জানে না, আসলে, বাবাঠাকুর না লক্ষ্মীদি—সে গেলেই মিষ্টির ঠোঙা পাঠিয়ে দিত তাকে। জঙ্গলে বসে কিছুটা খেত। বাকিটা বাবাঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছে বলে, বাবার হাতে এনে দিত। দাদা কখনও জানতে পারত না।

একবার টের পেয়ে দাদা তাকে রেল-লাইন পর্যন্ত তাড়া করেছিল—আবার যদি আসিস, আমি এখানে থাকব না বলে দিলাম। তুই কিরে, মান অপমানবোধ পর্যন্ত নেই। সবাই কী ভাবে! দাদার সেই তিরস্কার তাকে এতই পীড়নে ফেলে দিয়েছিল, যে আর কখনও যায়নি। কেবল মনে হত, তাকে দেখলেই দাদা কষ্ট পাবে। যেন সে গেলেই বদ্রিদার বাড়ির সবাই টের পেয়ে যায় তারা কত গরীব। লক্ষ্মীদি হয়তো সব বলে দিয়েছে পরীদিকে।

তারপর না খেলে পরীদি বুঝবে, তারও কম রাগ না। তাকে অপমান করেছে বলেই খাচ্ছে না। না খেলে কষ্ট পাবে। কেউ কষ্ট পেলে তার কেন যে এত খারাপ লাগে! তার খিদেও পেয়েছে। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। একটা সন্দেশ তুলে মুখে আস্ত ঠেসে দিতেই প্রচণ্ড বিষম খেল। কাশছে।

—তুই কিরে, ইস, কী কাশছে! তাড়াতাড়ি মিমি জলের গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে বলল, শিগগির জল খা। মাথায় চাপড় মারছে, ফুঁ দিচ্ছে। পিলুর চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। সে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। আর পরীদি পাগলের মতো কী করবে না করবে ভেবে পাচ্ছে না। কেবল বলছে, এত বড় সন্দেশ এক সঙ্গে মুখে পুরে দিতে আছে। কড়াপাকের সন্দেশ। রাক্ষসের মতো গিলছিস! কালী বাড়িতেও একবার তার একই দশা হয়েছিল।

পিলু দেখছে সারা ঘরে সন্দেশের অংশ-বিশেষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইস কী বিষম খেল! দাদা হয়তো তার কথা ভাবছে। বিষম খেলে বাবা বলবেন, কে আবার তোমার কথা ভাবতে শুরু করল। জল খাও। কেউ কারো কথা ভাবলেই কিছু খেতে গেলে বিষম খেতে হয়। এটা সে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে বাবার এমন সব আপ্তবাক্য শুনে শুনে তারা বড় হয়েছে যে, বিশ্বের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। এই যে দাদা বের হয়ে গেল এটাও তাঁরই ইচ্ছে। কোনো শুভবোধ এর অন্তরালে কাজ করছে। এমন কী সে যে বিষম খেল, প্রায় চোখ উল্টে দিয়েছিল, এও তাঁর কোনো গূঢ় ইচ্ছে থেকে।

এবং অবাক হয়ে দেখল, পরীদি কেমন স্বাভাবিক গলায় বলছে, মেসোমশাইকে দাদু ডেকে পাঠিয়ে কী বলেছে, জানিস!

যাক পরীদির মধ্যে সেই রণংদেহী ভাবটা আর নেই। শান্ত স্বভাবের পরীদিকেই সে বেশি চেনে! তবে পরীদির রণংদেহী স্বরূপও তার চেনা। দাদার সঙ্গে কী নিয়ে যে খটাখটি লেগে থাকত বুঝতে পারত না।

পরীদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কথা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খেয়ে নে। না হলে আবার বিষম খাবি। আসলে সে পরীদির কথার জবাব দেবার জন্যই জল খেয়ে আর একটা সন্দেশ হজম করতে গেলে, পরীদির এই সতর্কতা।

তার প্লেট খালি হলে পরীদি ওটা হাত থেকে নিয়ে নিল। বলল, মুখ ধুবি আয়। বলে পরীদির বাথরুমে নিয়ে যেতেই সে বিস্ময়ে হতবাক। সুন্দর কারুকাজ করা পাথরে তৈরি কোনো মন্দিরের অভ্যন্তর যেন। বিশাল আয়না ফিট করা। সব কিছু এত ঝকঝকে যে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বালতি থেকে পরী জল নিয়ে বলল, বেসিনে মুখ ধুয়ে নে। হাত পাত। আরে কী করছিস, জল নিচে পড়ছে দেখছিস না! বেসিনে জল ঢালার সময় বলল, জান বাবা না কী ক্ষেপে গেছে! বাবাকে তোমার দাদু বলেছে, শেষ বয়সে বাড়ি বয়ে অপমান। দাদার জন্য তোমাকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। জান দাদা গুম মেরেছিল শুনে। বাবার হম্বিতম্বি দাদা জানত না। রাতে ফিরে এলে বললাম দাদাকে। সব শুনে দাদা কেমন গুম মেরে গেল।

—বাবার গোঁ জান তো।

—বাবা দাদাকে কুপুত্র বলেছেন।

—বাবা বলেছেন, এ যে মহাপাপ ধনবৌ। দেবীর গায়ে হাত! এ-পাপের যে ক্ষমা হয় না। আমাদের

কী হবে! জান পরীদি, বাবাকে এমন জলে পড়ে যেতে দেখিনি। বাবা রাতে কিছু খানওনি। বলেছেন, দু-দিন নিরম্বু উপবাস। দু-দিন অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ, যদি দেবী এতে শান্ত হন। দাদাও রাতে খেল না।

—মা এসে ডাকল। কত বোঝাল। বলল, তোর বাবাকে তো জানিস, গোঁ উঠলে তেনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তুই খেয়ে নে।

—দাদা কেমন ভেঙ্গে পড়েছিল। সত্যি বলছি দাদাকে এ-ভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি, বলল, বিশ্বাস কর মা, আমি পরীকে মারিনি। পরীকে মারতে পারি না। আর কেউ বিশ্বাস না করুক তুমি অন্তত বিশ্বাস কর, পরীকে আমি কখনই মারতে পারি না।

—তোর দাদা খেল!

—না খায়নি।

—মেসোমশাইও উপবাসে আছেন!

—তাই। সকালে দাদা নেই। এখন তো সবাই উদ্‌ভ্রান্ত! কী যে হবে!

—সবাই তোরা কাল থেকে না খেয়ে আছিস!

পিলু চুপ করে থাকল।

পরীদি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। জানালার পাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সে বুঝতে পারছে না, পরীদি জানালায় তার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে কেন! তারপর পরীদি হঠাৎ ছুটে গেল বারান্দার দিকে। সে দাদাকে নিয়ে যেমন ত্রাসের মধ্যে আছে পরীদিকে নিয়েও কম ত্রাসের মধ্যে নেই। সেও উঠে বারান্দায় চলে গেল। পরীদি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কী যে করবে! আর তারপরই দেখল পরীদি চোখে মুখে জল দিয়ে বের হয়ে এসেছে। সাদা তোয়ালে কাঁধে ফেলা। মুখে সামান্য হাসি।

পিলুর গলা বুক শুকিয়ে গেছিল। পরীদিকে হাসতে দেখে সে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

পরী বলল, চল। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য পরীদির সামান্য যে প্রসাধন ছিল মুখে এখন তাও নেই। তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে থাকল। পেছন থেকে কে যেন বলল, কোথায় বের হচ্ছ!

পরীদি তাকাল সিঁড়ির উপরের দিকে। পরীদির বাবা দাঁড়িয়ে সিঁড়ির মুখে। সামনে থেকে চাকর বাকরেরা সরে দাঁড়িয়েছে।

পরীদি খানিকক্ষণ কিছু ভাবল। পিতা পুত্রীর এমন মুখোমুখী হওয়ার দৃশ্য সে জীবনেও দেখেনি।

পরীদি শুধু বলল, তীর্থ করতে যাচ্ছি।

পিলু মিমির গা ঘেঁসে রয়েছে। সিঁড়ি ধরে নামার সময়ও সে মিমির আড়ালে থাকছে। যেন একটু আলগা পেলেই খপ করে তাকে কেউ ধরে ফেলবে। আবার টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনো পরিত্যক্ত ঘরে আটকে রাখবে। তেমন সুযোগ দিতে সে আর রাজি না। শত হলেও পরীদি তার একা। এত লোকজনের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন।

পরীদি সোজা নেমে হলঘরের কোণায় ফোনের কাছে চলে গেল। তাকে ইশারায় বসতে বলে, কাকে যেন চাইল।

—হ্যালো, হ্যাঁ আমি মিমি। সুহাসদা নেই?

ও-প্রান্ত থেকে কেউ কিছু বলছে। পিলুর খুব আগ্রহ ফোনে কান পাতার। সে শুনতে চায় দূর থেকে কীভাবে কথা ভেসে আসে। তার এই ফোনের খেলাটা একসময় মারাত্মক ছিল। দেশলাইয়ের বাকসে সুতো বেঁধে অপর প্রান্তে কাউকে কথা বলত। এ-জন্য একবার যা পিঠে পড়েছিল! এমনই নেশা যে নতুন দেশলাইয়ের খোল চুরি করে ধরা পড়ে যায়। সব কাঠি আছে। খোল নেই। মা পই পই করে বলেছে, পিলু তোর জন্য ঘরে দেখছি কিছু রাখার উপায় নেই! তোর কাজে লাগে না কী আছে বলত। দেশলাইয়ের একটা খোল রাখা যায় না। কিন্তু সেবারে আস্ত নতুন দেশলাইয়ের খোল নিয়ে হ্যালো হ্যালো বানাতেই মা বাড়ি এলে বিরাশি সিক্কার ওজনের কিছু কিল, এবং সে

পিঠ বাঁকিয়ে দিয়েছিল, শ্বাস নিতে পারছিল না—আর পরীদি সত্যিকারের ফোনে কথা বলছে!

—সুহাসদা পার্টি অফিসে! ঠিক আছে।

মিমি আবার ফোন কেটে দাঁড়িয়ে থাকল। পার্টি অফিসে ফোন করতে হবে। সে ঘড়ি দেখল। আধ ঘণ্টা আগে বের হয়েছে। গোরাবাজার থেকে রাধারঘাট আসতে কতটা সময় লাগতে পারে আন্দাজ করল মনে মনে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। সোজা এলে আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবার কথা। আবার নাও আসতে পারে। পার্টির ক্যাডারদের সামনে যদি পড়ে যায়—তবে এক টানা লেকচার শুরু করবে। তার তো কাজের শেষ নেই—কার হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না, কার রেশন কার্ড হয়নি, কার স্কলারশিপের টাকা আসেনি, কে অকারণে বরখাস্ত হয়েছে, মিটিং মিছিল নিয়ে ব্যস্ত মানুষটা আধ ঘণ্টায় পার্টি অফিসে পৌঁছাতে নাও পারেন।

পিলু ঠিক বুঝতে পারছে না পরীদি কেন চুপচাপ ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলার যন্ত্রটাও নামানো। আর দোতলায় সিঁড়ির মুখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কী গভীর নৈঃশব্দ।

যেন পরীদির আচরণে গোটা বাড়িটা স্তম্ভিত। কুকুরটা পর্যন্ত রা করছে না। পরীদিকে শুঁকছে। আসলে বাড়ির আগেকার সেই মেয়েটার সঙ্গে এ-মেয়েটার ঘ্রাণ এক আছে কি নেই শুঁকে হয়তো পরীক্ষা করছে।

পিলু এ-হেন দৃশ্যে খুবই বিচলিত। বাবার মুখের উপর কথা তারাও এক আধ সময়ে বলে ফেলে—কিন্তু এটা যে পরিবারের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি, পিলুর মতো ছেলেও তা টের পায়। অথচ পরীদির কোনো ভাবান্তর নেই। এ-সময় সুহাসদাকেই আবার কেন ফোন। সেও চেনে, এক ডাকে সবাই চেনে মানুষটাকে। রোগা দুবলা, বেঁটে এবং ভারি কাচের চশমা চোখে। একা, সাইকেল তার নিত্য সঙ্গী। সাইকেলে চেপে বসলেই মানুষটার মধ্যে বোধহয় কোনো আগ্রহ সঞ্চার হয়। সে তাদের কলোনিতেও দেখেছে সুহাসদাকে। বাজারের দিকটায় একবার দেখেছিল। মিলের ইউনিয়ন নিয়ে কী সব কথাবার্তা বলছিল। সুহাসদার সঙ্গে সে দেখেছে সব সময় পাঁচ দশটা ছেলে থাকে। হাঁটলে তারা হাঁটে। থামলে তারা থামে।

—হ্যাঁ আমি। ভাবলাম পাব না। যাক শোনো, আমি কাটোয়া যাচ্ছি।

অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে আসছে পিলু বুঝতে পারছে।

—আরে না। ও-সব কিছু না।

মিমি আবার থেমে বলল, না আমিই করব। কবে ঠিক হল।

—মিমি, তোমার যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। এই যে সেদিন বললে, বাড়িতে তোমাকে নিয়ে অশান্তি চলছে। বের হওয়া বারণ। মুখার্জী সাবের সঙ্গে পাকা কথা বলার জন্য তোমার দাদু ওর বাবা মাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তোমার সঙ্গে এত কথা বলার সময় নেই। আমিনার পার্ট আমিই করব। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আর শোনো আমার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ছাড়ছি।

—কী বলছ! শোনো। আর একবার ভেবে দ্যাখ। ওখানে গিয়ে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হবে। তা-ছাড়া....

—না না। আমি যাব।

—শোনো তুমি আমিনার পার্ট করতে পারছ না শুনে আমরাতো জলে পড়ে গেছিলাম। পরে ভাবলাম, লীনাকে দিয়েই ঠেকা কাজ চালিয়ে দেব। আমাদের জন্য অকারণ তুমি বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি কর না। মুখার্জী সাব তো দারুণ লোক।

—আচ্ছা আমি ছাড়ছি।

—তুমি কী বাড়ি থেকে করছ।

—হ্যাঁ।

—আমি যাচ্ছি।

—না। আমি এক্ষুনি বের হয়ে যাব।

—কাগজ। কাগজ চলছে।

—ছাড়ছি।

বলেই মিমি ফোন ছেড়ে বলল, এই পিলু, কী হাবার মতো তাকিয়ে আছিস। চল!

—আমি কথা বলব।

—কার সঙ্গে কথা বলবি।

পিলু এমন মুগ্ধ হয়ে গেছিল, যে সে নিজে কথা বলতে না পারলে, ফোনের রহস্যটা ঠিক জানতে পারবে না! তারপরই মনে হল, সত্যি সে কার সঙ্গে কথা বলবে! সে তো কাউকেই চেনে না। কিংবা অকারণ তো ফোনও করা যায় না। তার হ্যালো হ্যালো খেলাটা এখানে এসে এত বড় বিস্ময় হয়ে গেছিল, যে সে কেমন ঘোরে পড়ে গিয়েই কথাটা বলেছে।

মিমি কী ভাবল কে জানে! সে ফোন তুলে কাকে কী বলল, তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, কর। সুহাসদার সঙ্গে কথা বল। তারপর নিজেই বলল, সুহাসদা, পিলু তোমার সঙ্গে কথা বলবে। পিলুকে চেন না! বিল্বর ছোট ভাই। যার কবিতার তারিফ করে বলেছিলে—ছেলেটার মধ্যে আগুন আছে।

পিলু শিশুর মতো আব্দার করে ফেলেছে টের পেতেই সে লজ্জায় পড়ে গেল। কিছুতেই ফোন ধরছে না। আর এত বড় প্রাসাদের মতো বাড়িতে এত উত্তেজনার মধ্যে মুহূর্তে সে যেন তার এবং পরীদির আগেকার জীবনের সন্ধান পেয়ে গেছিল। কিছুক্ষণ আগে তাকে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—জামা ছিঁড়ে গেছে, হাফ প্যান্টও খুলে গেছিল, এবং ধস্তাধস্তিতে তার পিঠের ছাল চামড়া উঠে গেছে—পিলুকে দেখলে এখন আর বিশ্বাসই করা যাবে না। সে কিছুতেই কথা বলবে না। পরীদির গা ঘেঁসে বলছে, না। তুমি ছেড়ে দাও।

মিমি হেসে ফোনে বলল, কথা বলবে না। লজ্জা করছে বাবুর।

—দাওনা ওকে।

—এই পিলু। ধর।

পিলু এবার বোধহয় সাহস পেয়ে গেছে।

মিমি বলল, সুহাসদা কথা বলবে। ধর বলছি। আরে উল্টো করে ধরলি কেন। না না, এদিকটা কানে রাখ। তুই আচ্ছা বুদ্ধু।

পিলু বোকার মতো ধরে আছে।

—বল হ্যালো।

পিলু ফোন ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল। মরে গেলেও বলতে পারবে না। কেমন কৃত্রিম কথাবার্তা। হ্যালো বললেই সে যেন আর পিলু থাকবে না। সে তার বাবার দ্বিতীয় পুত্র—মাটির ঘরে বাস, ভাঙ্গা সাইকেলটা ধরলে পর্যন্ত দাদার তিরস্কার—আবার স্পোক ভেঙ্গে আনলি, তুই কী রে—তোর হাতে কিচ্ছু ঠিক থাকে না, আমার সাইকেল নিলি কেন—বলেই যে দাদার কানমলা খায়, তার পক্ষে হ্যালো বলা কত কঠিন, পিলুর ছুটে পালানো না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

মিমি ফোন তুলে হেসে দিল। বলল, পালিয়েছে। লজ্জা পেয়েছে। তুমি বিকালে থাকছ তো। যদি পারি যাব। দিনক্ষণ ঠিক হলে জানিও। আমি মুক্ত। জান, আমার আর কোনো দ্বিধা নেই।

এবার পরী সিঁড়ির দিকে তাকাল। অবাক দাদু সোজা নেমে আসছে। সে জানে এ-বাড়িতে এই একটিমাত্র মানুষ তাকে যে কোনো কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারে। দাদুকে নেমে আসতে দেখে অবাক শুধু না, কোথাও যেন এক সুপ্ত ছলনা সে টের পেল। দাদুর অসুস্থতা কী তবে ভান! কে জানে, যিনি গোপনে বিল্বর সঙ্গে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে রেলের চাকরির নামে একটা গোটা পরিবারকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেই তিনি যে ভান করবেন না কে জানে। তবু দাদুর প্রতি তার টান আছে। সে দাদুকে নেমে আসতে দেখে বলল, আমি বের হচ্ছি। ভেব না। রোজই তো বের হই। এত উতলা হয়ে পড়ছ কেন। চল। ওঠো। অসুস্থ শরীরে কে তোমাকে নামতে বলেছে। ওঠো বলছি। বলে সিঁড়ি ধরে দাদুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তর তর করে নেমে এল। সবাই তার আচরণে স্তম্ভিত। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সোজা নেমে সাইকেল বের করে রাস্তায় নামতেই যেন সেই আগেকার মিমি। তার হাতে এখন কত কাজ।

পিলু তার পাশে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। টাউন হলের সামনে এসে মিমি বলল, সুধীনদাকে একটা

ফোন করলে হত। ঠিক আছে চল। পরে ফোন করা যাবে।

আজ ছুটির দিন। রাস্তায় রিকশা, সাইকেলের ভিড় কম। তারা পুলিশ ব্যারাক পার হয়ে যাচ্ছে। বর্ষায় রাস্তায় খানা খন্দ। দু'জনই খানা খন্দ বাঁচিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে।

একটা সুন্দর মতো বাংলো বাড়ির সামনে তারা থামল। আসলে পিলু জানে না, তাকে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। সামনে বিশাল স্কোয়ার মাঠ। বাঁদিকে অফিস আদালত। আজ ছুটির দিন বলে সব ফাঁকা। এমন কী গাছতলাতেও প্রচন্ড ভিড় দেখেছে পিলু—অফিস টাইমে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়াই কঠিন। গাছতলায় স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের আখড়া। তাদের ঘিরে কত লোকজন। কোর্ট কাছারি না থাকলে যা হয়—কেমন জনবিরল হয়ে আছে জায়গাটা।

তার মাথায় দাদার চিঠিটা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। বাবা চান না, চিঠিটা আর কেউ দেখুক। পরীদি কেন যে চিঠিটা ব্যাগে রাখল!

সে সুযোগ বুঝে বলল, চিঠিটা সঙ্গে নিয়েছ তো। বাবা কিন্তু ফিরে গেলেই চিঠির কথা বলবে।

—মেসোমশাই দেখেছে!

—দেখবে না। বাবাই যে চিঠিটা দিল। বলল, অযথা আর চিন্তা করবে না। তোমার খারাপ অভ্যাস—তোমাকে এজন্য বাবু চিঠি দিয়ে গেছেন।

—মেসোমশাই তোর দাদার চিঠি দিয়ে কী করবেন!

আর এ-সময় উর্দিপরা একটা লোক ছুটে আসছে। তারা যে গেটে দাঁড়িয়ে আছে কেউ নিশ্চয় ভিতর থেকে টের পেয়েছে। পাঁচিল এবং বাগান পার হয়ে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় নীল রঙের বেতের চেয়ার টেবিল সাজানো। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। দূর থেকে সব কিছু এত পরিপাটি দেখেই পিলু বলল, কার বাসা এটা পরীদি! আর তখনই দেখল, আরে সেই লোকটা। তাদের বাড়ি একবার গেছিল—পরীদি পাঠিয়েছিল। বেঁটে মতো। সুন্দর ছিমছাম—লতাপাতা আঁকা আলখাল্লার মতো কী গায়ে। ডোর দিয়ে কোমরের কাছে বাঁধা। এটা খুবই বিচিত্র পোষাক— পরীদিকে দেখে উর্দি পরা লোকটার পেছনে ছুটে আসছে।

গেটের তালা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। গেটের দরজা টেনে ধরলেন। পরীদি তার দিকে তাকিয়ে বলল, আয়।

আসলে মিমি বুঝিয়ে দিল ছেলেটি তার সঙ্গেই এসেছে। পরেশ চিনতেও পারে। কিন্তু না চেনার ভান করাতেই যেন বলা, আমার সঙ্গে এসেছে। বিল্বর ভাই।

—আই সি। তোমাদের বাড়ি আমি গেছি।

মিমি এটাই চেয়েছিল। বিলুকে পরেশ আদৌ পাত্তা দিত না। কেবল কবিতা পাঠের আসরে বিলুবাবু বিলুবাবু করত। পরেশ এক দিন অবশ্য অভিযোগ করেছিল—বিলু শিষ্টাচার জানে না। হতে পারে। বিলু নাকি তার হাত থেকে পান্ডুলিপির বান্ডিল নিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি পরীর সঙ্গে কথা বলে নেব। তাকে বাড়িতে নিয়ে বসায়নি—রাস্তা থেকেই বিদায় করেছে। পরেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখছি খুবই রাগী ছোকরা। আমার হাত দিয়ে পাঠানো উচিত হয়নি তোমার।

—তুমি গাড়িতে ওদিকে যাচ্ছিলে বলে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, আমি নিজেই দিয়ে আসব। তোমাকে যেমন পছন্দ করে না, আমাকেও না। দেখলেই ক্ষেপে যায়।

—খুবই দাম্ভিক।

—তা ঠিক।

আসলে পরেশের সঙ্গে বিলুর বয়সের তফাৎ অন্তত সাত আট বছরের। বিলু তার সঙ্গে পড়ে, আর পরেশ এখানে বছর দুই হল আই এ এস ক্যাডার থেকে এসেছে। পরেশের চালচলনে কিছুটা তেজি ভাব থাকলেও কবিতা পাগল। নিজে ছাইপাঁশ যাই লেখে, মনে করে তুখোড় কবি। কলকাতার বড় বড় কাগজে তার দু-একটা কবিতা এক সময় ছাপা হয়েছে—তখন বোধ হয় পরেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খুবই দুর্বল—অন্তত সুধীনদা মুকুলের মতে। বিলু ওর দু-একটা কবিতা পড়ার পরই কেন যে আর তার লেখা কবিতা ভুলেও দেখে না। —ও সাহেবের কবিতা। মুকুলকে দিও। আমার কাছে দেওয়া ঠিক হবে না। হারিয়ে ফেলতে পারি।

মিমি টের পেল পিলু খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। তাঁর পায়ে জুতো নেই। ইজের পরনে। সার্টও ময়লা। চুল কিছুটা ধূসর। সে কী ভেবে যে বলল, পরীদি আমি যাই।

মিমি বলল, যাবি। একসঙ্গে যাব।

মিমি যাওয়ায় সাহেব বেশ বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। হাতে তাঁর একটা ভারি বই। যেন-তিনি বইটা পড়ছিলেন, পড়তে পড়তে টের পেয়েছেন, তার প্রিয়জন গেটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অসময়ে গেটে তালা দেওয়া থাকে। অসময়ে পরী আসেও না। একা তো নয়ই। সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে।

ঘরে ঢুকেই বলল, পরেশবাবু, তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। হাতে ওটা কী বই। এত ভারি বই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন! কষ্ট হচ্ছে না!

পরেশ বলল, জেমস ফ্রজারের 'গোল্ডেন বাউ'। দারুণ। দারুণ। তুমি তো পার্টি কর, তোমার অবশ্যই পড়া দরকার। দেখবে নাকি। বলে পরেশ বই-এর পাতা ওল্টাতে থাকল।

মিমি বসে পড়েছে। দেখলে মনে হবে খুবই যেন ক্লান্ত। চুল অবিন্যস্ত হাওয়ায়। কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিজেই উঠে গিয়ে পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিল। আর তখনই দেখল পিলু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে। মিমি জানে, পিলু ধুলো পায়ে এমন সুন্দর কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় কি না জানে না। সে হাত তুলে বলল, আরে তুই বাইরে কেন! ভিতরে আয়। কিচ্ছু হবে না। আয়।

পিলু সাহস পেয়ে সে তার পরীদির চেয়ারের পাশে ছুটে গিয়ে বসে পড়ল।

মিমি বলল, পরেশ, তোমাকে এক্ষুনি কয়েক জায়গায় ফোন করতে হবে। খবর নিতে হবে। ভেবে দেখলাম তুমি পার। থানা হাসপাতাল সব জায়গায় ফোন করে দেখবে। কোনো দুর্ঘটনার খবর আছে কিনা!

পরেশ কপাল কুঁচকে বলল, হোয়াট হ্যাপেন্ড!

—আরে বল না, বিল্ব কাউকে না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেছে।

—ডিডন্ট হি টক টু এনিওয়ান বিফোর হি লেফট দ্য হাউস?

—না না, তাহলে তোমার কাছে আসব কেন। কাউকে কিছু বলে যায়নি।

পিলু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিতে গিয়ে ধমক খেল মিমির।

পিলু বলতে চেয়েছিল, সে বলে যায়নি, তবে!

—তবে কী হতভাগা! আসলে মিমি জানে পিলু ভারি সরল স্বভাবের ছেলে। সে চিঠির কথা বলে দিতে পারে। দাদা তার জন্য চিঠি রেখে গেছে। হাবাটা বোঝেও না, চিঠিতে যা তার দাদা লিখে গেছে তাতে কোনো মেয়ের কপাল পুড়তে পারে। সে পরী মিমি কিংবা মৃন্ময়ী বলেই হয়তো কোনো আঁচ লাগবে না। কিন্তু এ নিয়ে ঢাক পেটানো ঠিক নয়, পিলুর বোধহয় তা জানা নেই।

পিলু থতমত খেয়ে থেমে গেল।

পরেশ বলল, তবে কী...!

—আরে ওর কথা কেন শুনছ!

পরেশ আর কোনো কথা বলতেই যেন সাহস পেল না। মিমি জানে তার আগুনে পুড়ছে লোকটা। নিজেই আগ বাড়িয়ে তার বাবাকে দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। এটা ঠিক সব দিক থেকেই পরেশ তার যোগ্য মানুষ—তবু কোথায় যে থেকে যায় নদীর পাড়ে মানুষের হেঁটে যাওয়ার ছবি। সেই ছবির কথা ভাবলেই জীবনের সব মূল্য কোনো শিউলিতলায় ঝরা ফুলের মতো বাসি হয়ে যায়।

পরেশ কাকে যেন ফোনে কী বলল। কোণায় গোল মতো ছোট্ট টেবিলের উপর বাহারি ফোন। ঝালরের ঢাকনা টেবিলে। এবং ঘরের মধ্যে বিলাসের উপকরণ। একজন বাঙালী সাহেব হতে গেলে যা যা দরকার কোনো কিছুর খামতি নেই। বিশাল কাচের আলমারি। থরে থরে কাচের দামি রকমারি গ্লাস সাজানো। পাশে পরেশের নিজস্ব ছোট্ট সেলার। পিলু হাঁ হয়ে দেখছে।

পরেশ ফোন করে দিয়ে এসে মিমির সামনে বসল। অসময়ে পরী কেন এসেছে বুঝতে পেরে সেই প্রসন্নতা আর নেই। কলোনির এক উদ্‌ভ্রান্ত রাগী ছোকরার জন্য তাকে ফোন করতে হচ্ছে ভেবে কিঞ্চিত বিরস মুখ। বলল, এক্ষুনি খবর পাবে। কী খাবে বল।

—কিছু না। এক গ্লাস জল দাও। ঠান্ডা না। তুমি তো জান ঠান্ডা জল আমি খাই না। গলা ধরে যায়।

মিমি বুঝতে পারছে, পরেশ কোনো অধস্তন কর্মচারিকে দায় সঁপে দিয়েছে।

এখন শুধু ফোনের অপেক্ষা।

কখন কে রিঙ করবে।

পরেশ কী বলছে, কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না।

যেমন বলছে, গ্রান্ড ওল্ড ম্যান শুনলাম অসুস্থ।

যেমন বলছে, আজই যেতাম। কাজে আটকে গেলাম।

মিমি হুঁ হাঁ কিছু বলছে না। শাড়ির আঁচল টেনে দিচ্ছে। পরেশ তাকে দেখলে, আসলে কী দেখে জানে। পুরুষ মানুষের এই ব্যাধিগ্রস্ত চোখকে সে সহ্য করতে পারে না। সে জানে না, এটা কেন হয়। নানা জায়গায় সে ঘোরে। কম পুরুষই আছে তাকে দেখলে স্বাভাবিক থাকতে পারে। বিলুর সঙ্গে এত মিশেও, কেন যে তাকে সে বোঝে না। বিলুর মধ্যে সম্ভ্রমবোধ গভীর এটা সে টের পায়। যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক—সে জানে, বিলুর কাছে সে সর্বনাশ ছাড়া কিছু নয়।

বিলু তাকে নিয়ে গোপনে একটা কবিতাও লিখেছিল। এবং সেটা চুরি করেছে। তখন কবিতাটা এতখানি গুরুত্ব পায়নি। সেটাই সে আজ র‍্যাক থেকে বই নামিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছে। বিলুর কবিতায় ছিল, তার প্রতি বিদ্বেষ। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছে। আজ কেন যে মনে হল, না সে কবিতার ঠিক যেন অর্থ ধরতে পারেনি। নিরিবিলি কোনো জায়গায়, অথবা বিলুদের বাড়ি যাবার পথে কবিতাটা আর একবার দেখবে।

বিলু খাতার পাতা ছেঁড়া দেখে বাড়িতে প্রচন্ড নাকি অশান্তি করেছিল। —কে ঢোকে আমার ঘরে। কার এত সাহস। সে মায়াকে ডেকে বলেছিল, খাতার পাতাটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে জানিস?

মায়া বলেছে, না।

পিলুকে বলেছে। একই জবাব।

সে যে বিলুর অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে এত আপন—পিলু, মায়া, মেসোমশাই, মাসিমা ছাড়া কেউ জানে না। বিলুর ঘরে কিংবা যে কোনো ঘরে সে শুয়ে বসে থাকতে পারে। ঘুমিয়ে থাকতে পারে। বিলুর কবিতার খাতা হাতড়াতে পারে। নতুন কবিতা যা লিখল বিলু, এটা জানার তার এক অপরিসীম আগ্রহ। সে তা জানতে গিয়েই কবিতাটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আর পড়ে সে বেশ মজা পেয়েছিল। জ্বালা ধরিয়ে দিতে পেরেছে—সে তো এটাই চায়। জ্বলুক। জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাক। সে গোপনে খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়েছিল।

সে যে পরেশের সঙ্গে সেজেগুজে সিঁড়ি ধরে নামছিল, তাও সেই এক জ্বালা থেকে। বোঝো জ্বালা কত গভীর। কেন এত লাগল! আমাকে দেখলে ক্ষেপে যাও আর পরেশের সঙ্গে দেখলে হৃৎপিন্ড জ্বলে যায়! কেন! কেন এটা হয়। তুমি বিলু কী মনে কর! রেলের চাকরি, বিলাসপুরে নির্বাসন—এত সোজা! কত সহজে শিস দিতে জানি, কত সহজে একজন পুরুষকে দিয়ে অভিনয়ে মেতে যেতে পারি, দাদু পর্যন্ত মজে গেল দেখে। সিঁড়ি ধরে নামছি। আগুনের মতো জ্বলছি। প্রসাধন কতটা করতে পারি ইচ্ছে করলে, টের পেলে তো। তুমি কে, তোমাকে চিনিই না—অ বিলু—দাদুর সঙ্গে দেখা করবে। বোঝো। আমি তো জানতাম তুমি আসবে। সার্টিফিকেটের নকল সঙ্গে, দাদু নিজে সব করে দিচ্ছেন, রেলের চাকরি পেয়ে উদ্ধার হয়ে যাবে—বোঝো, এক পলকে সব ভন্ডুল। তুমি সহ্য করতে পারলে না। আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। পাগল হয়ে গেলে—তোমার পরীর পাখা গজিয়েছে। নেচে নেচে নামছে। উড়ছে। পতঙ্গ হয়ে তুমিও পুড়ে মরলে। তোমার মাথা কত সহজে বিগড়ে দিলাম—আমার কী ভয় বিলু জান না, যদি তুমি হেসে কথা বল, যদি আমার উগ্র প্রসাধন জ্বালা ধরাতে না পরত, পরেশের হাত ধরে নামতে নামতে দেখতাম—তুমি সরে দাঁড়িয়েছ, আমাদের পথ করে দিয়েছ, তবে হয়তো আমি নিজেই তোমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিতাম। রামবিলাসকে বলতাম—একটা রাস্তার কুকুর বাড়িতে ঢুকল কী করে। তাড়াও! তাড়াও!

কিন্তু না, তুমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলে। নিজেকে সামলাতে পারলে না। চোখে আগুন জ্বলে উঠল। যা-

হোক মাথাটা যে গোবর পোরা নয়, সেই আমার সান্ত্বনা। পরেশকে নিয়ে রঙ্গ করছি, তোমাকে বিদ্রূপ— টের পেলে। দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে। পারলে না। নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। নকল মিষ্টি হাসিতে তোমাকে কী বলতে গেলাম, আর ঠাস করে গালে চড় মারলে—অঃ বিলু এ যে আমার...

রিঙ বাজছে।

পরেশ ছুটে গিয়ে ফোন ধরল।

পিলু মিমি তাকিয়ে আছে।

মিমি অপেক্ষা করতে পারছে না। সেও ফোনের কাছে চলে গেল।

পরেশ ফোন নামিয়ে বলল, না কোনো দুর্ঘটনার খবর নেই। কুমারপুরে একজন খুন হয়েছে। আলম নাম। পারিবারিক কলহ।

মিমির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

সে বলল, আমরা যাচ্ছি। পরে আসব।

পিলুটা যে কোথায় গেল! মায়া দেখল, বাবা বিড় বিড় করে বকছেন। এই অসময়ে কেউ বাড়ি ছাড়া হলেই যেন দুশ্চিন্তা। মায়া রাস্তায় দৌড়ে গেল।

বাড়িটাতে লোকজন আসছে যাচ্ছে। দুঃসংবাদ পেয়ে সবাই আসছে। বাবা এতক্ষণ মাকে বোঝ-প্রবোধ দিচ্ছিলেন। কিছু ধর্মগ্রন্থ সম্বল। বারান্দায় বসে বাবা মাকে বলছিলেন, ধনবৌ, আমরা সবাই নিমিত্ত মাত্র। দুশ্চিন্তা কর না। তাঁর স্মরণ নাও। তিনিই গতি, তিনিই কর্তা। তিনিই প্রভু—তিনিই সব কিছুর সাথী। আশ্রয় বলতেও তিনি। তিনি আমাদের শরণ সুহৃৎ। আবার তিনিই প্রলয়, তোমার আমার উৎপত্তির আধার। লয় কিংবা অবিনাশী বীজ স্বরূপ সেই অনন্ত জিজ্ঞাসার কাছে আমাদের মাথা নোয়ানো ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। বিচলিত হলে চলবে কেন! সবাই সকাল থেকে উপবাসে আছি। রান্নার আয়োজন কর।

যেন বাবা মাকে সবার উপবাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংসারে তাঁর দায় সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাইলেন। পিলু কোথায় গেল আবার! আসব বলে বের হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই। তারপরই বিড় বিড় করে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। বাবা নিজেকে অসহায় ভেবে ফেললে, কোন কবচ পাঠ করে থাকেন। এতে তাঁর মধ্যে সাহস সঞ্চয় হয়। সব দুর্গতির প্রতি কিঞ্চিত তিনি অবহেলা দেখাতে পারেন।

মায়া টের পেয়েছিল, ছোড়দা ফিরে না আসায় বাবার এই দুশ্চিন্তা। এখন যেন বাড়ি থেকে কারো বের হয়ে যাওয়া ঠিক না। ছোড়দাটাও বড় অবুঝ। দেখছিস বাড়িতে কী বিপত্তি—তার মধ্যে না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেলি। আসছি বলে গেছিস, এখনও ফেরার নাম নেই। মায়া রাস্তায় ছুটে গিয়ে দেখল, যদি দাদা ফিরে আসে। বড় সড়ক থেকে মাঠ ভাঙতে হয়। কিংবা নিমতলার দিকে যদি যায়। সে চারপাশে দাদাকে খোঁজার সময়ই দেখল—পরীদি আসছে। আর পরীদির পেছনে ছোড়দা সাইকেল চালিয়ে আসছে। ছোড়দা তবে পরীদিকেই খবর দিতে গেছিল।

সে দৌড়ে এসে বলল, বাবা, পরীদি আসছে।

খবরটাতে বাবা ভারি বিব্রতবোধ করলেন।

বাবা বললেন, পিলু ওর চিঠিটা যে কোথায় রেখে গেল! যেন তিনি ভাবলেন, পরী যদি এসে টের পেয়ে যায় তারই জন্য বিলু চলে গেছে, তবে আর এক কেলেঙ্কারি। মেয়েটাই বা কী ভাববে। এমন অপরিণামদর্শী পুত্র যে চিঠি পর্যন্ত রেখে গেছে। এত কথা লেখার কী দরকার ছিল। পরী তো এসেই বিলুর ঘরে ঢুকে যাবে। নিজের মধ্যে তিনি পুত্রের দায় নিয়ে কিছুটা বিচলিতই হয়ে পড়েছেন।

তাড়াতাড়ি বিলুর ঘরে ঢুকে গেলেন। চিঠিটা যদি এখানে সেখানে পিলু গুঁজে রাখে। আর পরী তো এসে সব খোঁজাখুঁজি করতেই পারে। কারণ বিলু কখন বাড়ি থাকবে না, কোথায় যাবে আগে থেকেই পরী জানতে পারে। সেই বিলু নিখোঁজ। কোনো চিঠিপত্র যদি রেখে যায়।

পরীদি আসছে শুনলে বাবা রাস্তা পর্যন্ত ছুটে যেতেন!

—পরী আসছে। কোথায় রাস্তায় গিয়ে বলতেন, মা অন্নপূর্ণা আবার আজ গরীবের ঘরে এলেন।

বাবার এমন উক্তি একবার পিলু প্রকাশ করতেই বিলু চটে লাল। —মা অন্নপূর্ণা! তা হলেই হয়েছে।

সেই বাবা ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। মায়া উঁকি দিয়ে দেখল, বাবা দাদার বই হাঁটকাচ্ছেন, ছোড়দার খাতা বই খুঁজছেন। এবং প্রচন্ড ঘামছেন। দাদার তোষক তুলে দেখছেন। তক্তপোষের ধারে উঁকি দিয়ে খুঁজছেন। জানালার জাফরি আরও তুলে দিয়ে ঘরের অবস্থা লন্ডভন্ড করে ফেলছেন। একপ্রস্থ ছোড়দা করে গেছে, শেষ প্রস্থ বাবা করছেন। মায়া ভাবছে সব তাকে গোছগাছ করতে হবে—রেগে কাঁই। পরীদি উঠোনে ঢুকেই বলল, এই মায়া, মাসিমা কোথায়।

—মা ঘরে শুয়ে আছে।

—মেসোমশাই।

—দাদার ঘরে।

মিমি পিলুকে বলল, সাইকেলটা রাখ ঘরে। সে শাড়ি গাছ কোমর করে বাঁধল—তারপর ছুটে দাদার ঘরে ঢুকে অবাক—মেসোমশাই ঘরের সব কিছু টেনে নামিয়েছেন। মুখে ঝুলকালি। ফতুয়ায় ঝুলকালি। ঘেমে নেয়ে গেছেন। বিধ্বস্ত সব কিছুর মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

ঘরে ঢুকেই পরীর মনে হল পুত্রশোকে যেন পাগল মানুষটা। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। পরীর কথায় হুঁস ফিরতেই তিনি ফের তক্তপোষের নিচে ঢুকে কী সব টেনে আনতে থাকলেন।

—কী খুঁজছেন। আমাকে বলুন। কী অবস্থা করেছেন।

পরী দেখছে মেসোমশায়ের মাথাটাও ঝুলকালিতে লেপ্টে আছে। মাথায় ঘাস পাতার মতো কী সব জড়িয়ে আছে। আসলে আগে এই ঘরে পরী দেখেছে গরুর ঘাস কেটে রাখা হত। বিলুদের তখন দু'টো ঘর সম্বল। একটা মাটির দেয়ালের, আর বিলুর ঘরটায় পাটকাঠির বেড়া। চারপাশে আম, জাম, গাছ, লিচু গাছের কলম, পেঁপে গাছ কলা গাছ, যেমন প্রথম দিকে কলোনির ঘর বাড়ি হয়ে থাকে—সেই মেসোমশাই ধীরে ধীরে কীভাবে নিজের শেকড় বাকড় চালিয়ে দিলেন, বিলুটা বুঝল না। এত অবুঝ কখনও হলে চলে।

কিন্তু তিনি পরীকে দেখে আদৌ খুশি হননি।

—এই বুঝলে, পিলু এসেছে! কখন বের হয়ে গেল! ফেরার নাম নেই।

পরী মেসোমশাইয়ের কাঁচা পাকা চুল থেকে আম পাতা তুলে বলছিল, পিলু ফিরেছে। কী খুঁজছেন বলুন না। আমি দেখছি। তারপরই ডাকল, এই পিলু, পিলু। শোনতো, মেসোমশাই কী খুঁজছেন দ্যাখতো। খুঁজে পাস কিনা দ্যাখতো।

পিলু ঘরে ঢুকে বাবার অবস্থা দেখে হতভম্ভ। সে জানে বাবা কী খুঁজছেন। পরীদিকে বলল, দাদার চিঠিটা খুঁজছেন।

বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, দাদার চিঠি দিয়ে কী তোমরা আমার আদ্যশ্রাদ্ধ করবে, যে সেটা ঠিক ঠাক আমাকে রেখে যেতে হবে!

পরী কখনও মানুষটিকে এত উতলা হতে দেখেনি। এমন কী রাগতেও দেখেনি। চিঠিটা তবে তাঁর খুবই জরুরী। শত হলেও পুত্রের চিঠি। তাঁর অধিকার বেশি, পরী যেন ভাবতে পারছিল না। সে ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে বলল, এটা খুঁজছেন। আমার কাছে ছিল।

—তোমার কাছে!

পিলু পড়ে গেছে বিপদে। সেই চিঠিটা দাদার, নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছে। এখনও বাবা ঠিক বুঝতে পারছেন না—পরীদির হাতে চিঠিটা গেল কী করে!

কেমন অবুঝ শিশুর মতো পরীর দিকে তাকিয়ে থাকল মানুষটা—ছি! ছি! মিমি কী না জানি ভাবল তাঁর পুত্রের সম্পর্কে। কত বড় আশা ছিল বড় পুত্রকে নিয়ে। সেই পুত্র, পিন্ডদানের অধিকারী যিনি, যিনি তাঁর পারলৌকিক কাজের প্রথম অধিকারের দায় বহন করছেন—তিনি কিনা একটি নিষ্পাপ মেয়ের উপর কলঙ্ক চাপিয়ে উধাও। —এত অমানুষ তুমি! মাথায় তোমার পোকা ঢুকে গেছে। পোকার কামড়ে যা খুশি আচরণ করতে পার—তা তোমার ব্যক্তিগত অভিরুচি, তাই বলে একটি নির্দোষ

মেয়েকে তোমার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়াতে গেলে! তুমি তোমার মা বাবার মর্যাদার কথা ভাবলে না, মেয়েটির পারিবারিক মর্যাদার কথা তোমার মাথায় এল না। গায়ে হাত তুলেই ক্ষান্ত হলে না, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলে। তুমি মানুষ! তুমি আমার পুত্র! কেন তুমি চলে গেছ, তার ব্যাখ্যা—পরীর জন্য চলে গেছ!

পরী বললে, বসে থাকলেন কেন। উঠুন।

পিলু উঠোন থেকেই সব লক্ষ্য করছে। কাছে যাওয়া ঠিক না। কারণ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে বাবা, তারই জন্য। চিঠিটা আসলে বাবা গায়েব করে দিতে চেয়েছিলেন—সেটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বাবার মাথা ঠিক থাকতে নাই পারে। বাবাকে তো জানে, বড় অপকর্ম করেও দেখেছে, বাবার হাসি মুখ। যা হবার হয়ে গেছে—তাঁরই ইচ্ছে। হাত পা ধুয়ে পড়তে বসগে। আবার সামান্য খুঁত টের পেয়ে বাবা অগ্নিশর্মা। চিঠিটা নিয়ে বাবার এই এত জলে পড়ে যাওয়া কেন সে বোঝে না।

পরী হাত টেনে বলল, ইস কী করেছেন—এই মায়া, একটা গামছা নিয়ে আয়। চিঠিটা নিয়ে বসে থাকলেন কেন, দিন আমি রেখে দিচ্ছি। কোথায় রাখব বলুন।

পিলু দেখছে বাবা কেমন নিথর হয়ে গেছেন। বাবা তো এত ভেঙ্গে পড়েন না। দাদার কষ্টে, না চিঠিটা জানাজানি হয়ে গেল সেই কষ্টে। পরীর মাথায় কলঙ্ক চাপিয়ে গেছে তাঁর সু-পুত্র।

পরী আবার বলল, উঠুন মেসোমশাই। সকাল থেকে আপনারা কেউ কিছু খাননি। বিলু ভালই আছে। আমি সব খবর নিয়েছি। ওর জন্য ভাববেন না। কলকাতায় ওর চেনা জানা বন্ধু আছে। আমাদের অপরূপা কাগজে তাঁরা লিখতেন। এখানকার কবিতা পাঠের আসরে তাঁরা এসেছেন। সঙ্গে তো টাকা পয়সা নিয়েছে। কলকাতায় একটা পেট যে কোনো লোক চালিয়ে নিতে পারে। ও তো লেখাপড়া জানা ছেলে। আপনি এত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন। উঠুন।

পিলু দেখল, বাবা বের হয়ে গেলেন ঠিক, তবে তাঁর ভেতর আগের মানুষটা যেন নেই। মহা অপরাধ করেছেন এমন ভাব চোখে মুখে। এসে তিনি বারান্দায় বসলেন।

পরীদি জানে বাবাকে কী করে তুষ্ট করতে হয়। সেও জানে, মায়াও জানে। পরীদি নিজেই নারকেলের ছোবড়া ছিঁড়ে হাতে দ্রুত ঘষে একটি পিন্ড বানিয়ে ফেলল। আগুন দিল সেই পিন্ডস্থানে। তা কলকেয় রেখে ফুঁ দিতে দিতে বাবার দিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে বলল, মেসোমশাই, তামাক।

বাবা কেবল দেখছেন পরীদিকে।

পরীদি খুবই দ্রুত কাজ করছে। মা'র কাছে গিয়ে বলল, মাসিমা উঠুন। বিলু ভালই থাকবে। বাবাকে যা যা বলেছে, মাকেও তাই বলল। তারপর পরেশবাবুর কাছে গিয়ে যে খোঁজখবর নিয়েছে তাও জানাল।

মায়া আর পরীদি যেন এখন বাড়িটায় সব। তারাই কোথায় কী আছে টেনে বের করছে। নবমী বুড়ি বলছে, আমায় দিনগো কাটাকুটির কাজটা সেরে ফেলি।

পরীদি ডাকছে, এই পিলু, রান্নাঘরে দু-বালতি জল দে। তারপর যা গরুগুলি মাঠে দিয়ে আয়।

বাবা বসে বসে তামাক টানছেন। কোনো বিষয়ে যেন তাঁর আর আগ্রহ নেই। চাকরি ছেড়ে গেল, কোথায় গিয়ে উঠবে জানিয়ে গেল না, একটি নিষ্পাপ মেয়েকে জড়িয়ে দিয়ে গেল। এত সব অপকর্ম বাবার মতো মানুষের পক্ষে যে খুবই দুঃসহ পিলু বোঝে। পরীও মানুষটাকে দেখে দেখে ধাত বুঝে গেছে।

এখন যে কোনো প্রকারে মানুষটাকে ঠেলেঠুলে ঠাকুর ঘরে পাঠাতে হবে। আর মাসিমাকে তুলে চানটান করিয়ে কিছু মুখে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরী বলল, এই মায়া, রান্নাঘরে কাঠগুলো রেখে আয়। পরী এ-সব পারে। কারণ পরী ক্যাম্প করতে গিয়ে নানাভাবে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার এবং পার্টি করতে গিয়ে নানা জায়গায় যথেষ্ট অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেশ আনন্দের সঙ্গেই রাত্রি দিন উজাড় করে দিতে পারার স্বভাব কবে থেকে যেন গড়ে তুলেছিল। সুহাসদা মহেশ নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে তাকে হঠাৎ কেন যে বলল, তোমার অসুবিধা হবে। আসলে মনে হয় দাদুই তাকে ফোনে সব জানিয়ে দিয়েছিল। সুহাসদা সেই ছোটবেলা

থেকে তাকে জানে। সুধীনদা জানে, শহরের এই মেয়েটি কিছুটা পাগলা আছে। এটা যদি পাগলামি হয় হবে। তার কিছু করার নেই। তার হাতে এখন কত কাজ।

পরীদি এক ফাঁকে এসে বলল, মেসোমশাই, চিঠিটা কোথায় রাখব।

বাবা বললেন, রেখে দাও, তোমার কাছেই রেখে দাও। পিলুকে দিতে যেও না। ওর তো কত বান্ধব! সে কী বোঝে কিসে কী হয়!

পিলুর মনে হল, যাক তবু যে বাবা কথা বলেছেন। বাবাকে সে জীবনেও অমন চুঁপচাপ হয়ে যেতে দেখেনি। একটা চিঠি সামান্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বাবা এ-ভাবে আতান্তরে পড়ে যেতে পারেন এই প্রথম টের পেল। তার খুবই আতঙ্ক—যে বাবাকে সে দেখে গেছিল, ফিরে এসে যেন অন্য বাবাকে দেখছে। বাবা কথা বলায় কেমন কিছুটা হালকা হতে পেরেছে। চিঠিটা পরীদিই রেখে দিল। আসলে বাবা বোধহয় বুঝেছে, চিঠিটা দাদা বাবাকে লিখে যায়নি, তাকেও না—লিখে গেছে পরীদির কথা ভেবেই। পরীদি না থাকলে হয়তো দাদা চিঠিটা লিখে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করত না।

এতে তার দাদার উপর ফের কেন যে অভিমান হল সে বুঝতে পারছে না।

মায়া কাঠ কুটো রান্নাঘরে নিয়ে রাখছে। পরীদি টিন থেকে মুড়ি বাতাসা বের করল। দুধ গরম করে থালায় ঠান্ডা হতে দিল। বাবাকে, মাকে, মায়াকে খেয়ে নিতে বলল, কিন্তু বাবা ঠাকুর-সেবা না করে জল গ্রহণ করেন না। পরীদি যে জানে না তা নয়। তবে আজ হয়তো পরীদির মধ্যেও কিছু গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে।

বাবা বললেন, আমার তো পূজা আছে মা। তুমি নিয়ে যাও।

—একটু খেলে কিছু হবে না।

—না না।

—তবে তাড়াতাড়ি যান।

কারণ শুধু তারা কেন, পরীদিও জানে বাবা আজ ঠাকুর ঘরে ঢুকলে কখন বের হবেন কেউ বলতে পারবে না। যদি একশ একটা তুলসীপাতা নারায়ণ শিলার মাথায় চাপান—তবে দুপুর পার করে দেবেন। আর যদি মনে মনে সহস্র তুলসী স্থির করে থাকেন তবে তো হয়েই গেল। বেলা পড়ে যাবে—বাবা পদ্মাসনে বসে থাকবেন। আর উৎসর্গ করবেন সহস্র তুলসীপাতা। জীবনের অজস্র বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার এই উপায় বাবার জানা আছে বলেই তিনি এই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিরুপদ্রবে বসবাস করতে পেরেছেন।

পিলু লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করছে। দু-বালতি জল রান্নাঘরে রেখে দিল। সে গোয়াল থেকে গরু বের করে মাঠে দিয়ে এল। বাবা কিছুদিন থেকে বাড়ির কাজের লোক খুঁজছিলেন। নিরাপদদাকে রাখার কথা হয়েছিল। কিন্তু মা'র পছন্দ না। মাথায় গোলমাল আছে। কিন্তু তার খুবই পছন্দ নিরাপদদাকে। বাবারও।

বাবার এক কথা, কার মাথায় গন্ডগোল নেই ধনবৌ। সবাই গোলমালে ভুগছে। গোলমালেই সংসার। গোলমালেই জন্ম মৃত্যু। গোলমালে পড়ে গিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। কে কার মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল, বোঁ বোঁ করে ঘুরতে। এমন ঘোরা শুরু হয়েছে তেনার কবে থামতে পারবেন জানেন না। থামলেই প্রলয়।

মা-র এক কথা, এই শুরু হল।

বাবা খুবই কাতর গলায় বলেছিলেন, নারে, নিরাপদ, বাড়ির দেবী তোর প্রতি তুষ্ট হতে পারছেন না।

নিরাপদদাও ছাড়বার পাত্র না।

তারও এক কথা।

—কর্তা রাখেন, রেখে দেখেন। আমি বলরামবাবুর বাগানে ছিলাম। মাঠে পড়ে থাকতাম। কর্তা একটাই মহা-অপরাধ। ভাত বেশি খাই বলে ছাড়িয়ে দিল।

—তুমি ভাত বেশি খাও বলে ছাড়িয়ে দিয়েছে, না রাতে এর ওর বাড়ি ঢিল মেরে বেড়াও বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ধরা পড়ে নিরাপদদা মা'র দিকে আর তাকাতে পারল না। তার এই একটা ব্যামো আছে। রাত হলেই, তার মাথায় পোকা ঢুকে যায়। কে কখন অপমান করে মনে রাখে। একবার বাবুদের কাঁসার থালা হারাল বলে গাছপেটা করল। বগি থালাটা সে নিয়েছিল ঠিক তবে তাকে ধরতে পারেনি। বাজারের মুকুন্দ হালদার মশাই ওজনে মেরেছে—তাতেও কষ্ট ছিল না। পয়সা কম দিয়েছে তাতেও কষ্ট ছিল না। কিন্তু সে পাউরুটি চা খেয়ে দোকানে সব টাকা ফুটিয়ে দিতেই মনে হল—আরে আরও ক'দিন পাউরুটি চা খেতে পারত। সে বিড়ি খায় না, ভাত খায় না, নেশা নেই—একটাই নেশা, সকাল হলে বাদশাহী সড়কে বসে সকালের দিকে এক কাপ চা আর কোয়াটার পাউন্ড পাউরুটি। চা-এ পাউরুটি ভিজিয়ে খাবার নেশাটাই যত নষ্টের গোড়া। সে তখনই টের পেল মুকুন্দ হালদার তাকে ঠকিয়েছে। ঠকিয়েছে বলে, এমন প্রিয় খাওয়া থেকে নিরস্ত হতে হল আচমকা। চোর ছ্যাঁচোড় মুকুন্দ হালদারের কাছে গিয়ে চোটপাট। —মাপেন থালাখানি আবার মাপেন!

—কিসের থালা?

—ক্যান যে বগি থালাখান দেলাম।

—দেলাম। শূয়ার তুই আমারে থালা দিয়েছিস!

—দেলাম না। ওজনে মারলেন।

—পেলি কোথায় থালা। বল কোথায় পেলি!

—সে দিয়া কাম কি!

মুকুন্দ আর নিরাপদ লড়ালড়ি।

মুকুন্দ তাকে বলে, চোর।

সে মুকুন্দকে বলে, চোর।

বাবুমশাই জানতে পেরে বলেন, এই মুকুন্দ, দেখি থালাখানা।

মুকুন্দ বাবুমশাইকে ভয় পায়। সে নিয়ে দেখাল।

আরে এটাতো সেই থালা।

ধর ধর।

নিরাপদ দৌড়ায়, বাবুমশাইয়ের চাকর-বাকর দৌড়ায় এবং তাকে ধরে ফেলে গাছপেটা করলে, এক কথা তার, মারেন, যত খুশি মারেন। আমার দোষ নাই। ভূত ছাইড়া দিলে মজা বোজবেন! খুদা পাইলে কার দোষ। আমার! কার খিদা পায় না কন।

সেই ভূত নিরাপদ নিজে। গভীর রাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায়। আর ইট পাথর কুড়িয়ে বাবুমশাইয়ের বাড়ির ছাদে ঢিল। টিনের ঘরে ঢিল—বন বন। ঝন ঝন। ধবাস। সে চরকি বাজির মতো দু-হাতে এত দ্রুত ঢিল ছোঁড়ে যে বাড়ির মানুষজন ভাবে, ভূতের কাণ্ড—নিরাপদ ভূত ছেড়ে দিয়েছে—হলে কী হবে, একবার ধরা পড়ে যেতেই তার এই যাদুবিদ্যাটা অকাজের হয়ে গেল। জানাজানি হয়ে গেল, নিরাপদের কাজ।

নিরাপদদা ওঠার সময় বলে গেছে, ঠাইনদি কথা দিতে পারি, কর্তার হুকুম ছাড়া নড়ানড়ি করমু না। জান দিয়া কাজ করমু। দুই বেলা দুইডা বেশি ভাত দিয়েন, দু'মাসে ন'মাসে একখানা গামছা। বছরে একখানা কাপড়। টাকা পয়সা মনে যা লয় দিবেন। সক্কাল বেলায় ছাইড়া দিবেন, চা-পাউরুটি খাইলে সারাদিন আপনার বান্দা হইয়া থাকুম।

মা কিছুতেই রাজি হয়নি।

নিরাপদদা, দাদা নেই খবর পেয়ে এসে গেছিল। গরুগুলি মাঠে দিতে গেলে বলল, যান পিলুদা বাড়ি যান। বাড়িতে কর্তার কত বড় বিপদ। কানে গেল আর ছুইটা আইলাম। ঘাস কাইটা নিয়া যামুনে। কর্তার বাড়িতে দুইডা যেন অন্ন পাই। বিলুদার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতি হইছে। পালাইছে।

—কে বলেছে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। নিরাপদদা, যা জান না বলবে না।

—না হলে পালায়! কেউ পালায় কখন। আমি পালাই সক্কালবেলায়, এই গাছপালা বন জঙ্গল, বাদশাহী সড়কে হাঁটা, বেড়ান, বুঝবেন মজাটা! জোৎস্না রাতে বালির ঘাটে গেলে ফিরতে ইসছা হয় না। মারুক ধরুক, আমাকে লোকজনে চেনে। এডা কম কথা—আমি নিরাপদ, যে যার মতো

মনে লইয়ে ভাবে—চোর—পাগল, ছাগল কী না কয় আমারে কন। আমি পালাই—পালাইতে পারি! নিজের রাজত্বি ছাইড়া কেউ পালায়!

সেই নিরাপদদা এসে হাজির। এক বোঝা ঘাস মাথায়। বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। উঠোনে এসে ঘাসের বোঝাটা ফেলে সটান মাটিতে সোজা হয়ে গেল।

পরী মায়ার দিকে তাকালে, মায়া মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল। মাথার গোলমাল আছে।

বাবা বললেন, ঘাস নিয়ে এলি নিরাপদ।

—হ্ কর্তা। ঘাস। বিলুদা চইলা গ্যাছে বইলা মনে কষ্ট। আপনের মনে কষ্ট। পিলুদা একলা পারব ক্যান। এক বোঝা ঘাস নিয়া আইলাম, দ্বিপ্রহরের অন্নভোজন—যদি কৃপা করেন।

পরী দেখল, লোকটা পরেছে খোট। খালি গা। মাথা ন্যাড়া। মাথায় খুসকি। থুতনিতে দাড়ি। চোখ কোটরাগত।

মাথার দিকে তাকাতেই পরীকেও প্রণিপাত করে ফেলল। নিরাপদ পরীকে ভাল চেনে। একবার সে পরীদিকেও গাছের আড়াল থেকে ঢিল মেরেছিল—পরীদি বলল, তুমি পঞ্চাননতলায় থাক না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে দু-দন্তপাটি বিকশিত হাসি। —আপনে আমারে মনে রেখেছেন দ্যাখছি।

পরীর কেমন মায়া ধরে যায়।

পরী বলল, থাক। খাবে। গোয়াল পরিষ্কার করতে পারবে?

—হ্যাঁ

—যাও। দেখে শুনে হাত লাগাও।

পিলু দেখল, একবার কাউকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না পরীদি। পরীদির কথায় বাবা খুবই তুষ্ট হয়েছেন। মেয়েটার মধ্যে মানুষের জন্য মায়া মমতা আছে। তার দ্বিতীয় পুত্রটির মতোই।

নবমী নিজেই বঁটি নিয়ে এল। লাউ-এর মাচান থেকে নরম ডগা কেটে আনল। মাচানের নিচে বসে কচি লাউ হাত দিয়ে দেখল। ভারি মজা লাগে দেখতে। কিন্তু লাউ কেটে হাতে নিয়ে যাবার তাগদ নেই। দা-ঠাকুর এসে হাজির। —তুমি পারবে! বলতে পার না। পিলু লাউ কেটে নিয়ে এল। জমি থেকে বেগুন তুলে এনে পরীদিকে দিল।

এবং পরীদি তখন বলল, মায়া, মাসিমার একটা শাড়ি বের করে দেতো।

মায়া মাকে কিছু বলল না। কারণ সে জানে সামান্য দামের শাড়ি-ব্লাউজ পরীদি পরলে মা খুশি হবে।

আসলে কে জানে কোথায় থাকে মানুষের অবলম্বন। পরী এসে বাড়িটার হাল ধরায় সবার মধ্যেই আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। বাবা বললেন, মায়া, তেল দে। চানে যাই। ভেবে আর কী করব!

মা-ও বলল, তুমি পারবে না পরী। তোমার অভ্যাস নেই। আমি যাচ্ছি।

ক্রমে সব কেমন সচল হয়ে উঠছে সংসারে ফের। পরীদি তবু পুকুর থেকে চান করে এল। আসার সময় হাতে করে এক বালতি জলও নিয়ে এসেছে।

নবমী লাউ কেটে দিল ডুমো ডুমো করে। মুগের ডালে লাউ, বেগুন ভাজা, পিলু গিমাশাক তুলে এনেছে। গিমাশাক ভাজা। তেঁতুল দিয়ে লাউ-এর চাটনি। কচু, ডাটা আলু আর লাউ-এর ডগা দিয়ে তরকারি।

বাবা ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছেন। আর আশ্চর্য বাবা নিত্য পূজার মতোই সময় নিলেন। একশ একটা তুলসী দিলে ঠাকুরকে এত তাড়াতাড়ি কখনও বের হতে পারতেন না। তিনি বের হয়ে এসে হাতে প্রসাদ দেবার সময় দেখলেন, পরী বারান্দায় আসন পেতে দিচ্ছে। জলের গ্লাস সাজিয়ে দিচ্ছে। থালায় ভাত বেড়ে দিচ্ছে। এমন কি মাসিমাকেও বলছে, আপনি বসে পড়ুন। আমি দিচ্ছি। নবমীকে বলছে, তোমার পাথরের থালা বের করে বসে পড়। নিরাপদকে ডেকে আনার জন্য পিলুকে পাঠাল। কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে।

পিলু ডাকছে, ও নিরাপদদা, কোথায় গিয়ে বসে থাকলে!

নিরাপদ অন্ন ফেলে বসে থাকার লোক না! কোথায় গেল! কেউ তাকে যদি আটকে রাখে। রাখতেই পারে। কোথায় কী অপকম্ম করে বেড়ায়, নিরাপদকে দেখলে, লোকজন অনেক সময় দূর দিয়ে হাঁটে।

কারণ—পাগল, ছাগল মানুষ, বেধড়ক মার খেলেও মাথা গরম করে না। উ আ করে না। কেবল হাসে। ঘটি বাটি বাইরে রাখা দায়। গাছের ফল রাতে চুরি করার অভ্যাস। কোন টানে পড়ে গেছে কে জানে!

পরী বলল, পিলুকেও ডাক। বসে যেতে বল। নিরাপদ এলে, ওকে দিয়ে আমি বসে পড়ব।

পিলু এসে বলল, আসছেন।

আসলে নিরাপদর এত দেরি হবার কারণ এতক্ষণে টের পেল পরী। একটাই খোট। চান করেছে, খোটের একটা দিক ধরে বাতাসে শুকিয়েছে। শুকনো দিকটা পরে ভিজা দিকটা শুকিয়েছে। সে দেখেছিল, পুকুরের অন্য ঘাটে সে স্নান করছে। পুকুর না বলে দীঘিই বলা ভাল। সে মায়া পিলু একসঙ্গে সাঁতার কেটেছে। ডুব দিয়েছে। বাড়ি থেকে নেমে একটা জমি পার হয়ে দীঘিটা। এখনও এদিকটায় বাড়িঘর হয়নি। জঙ্গল আছে। পায়ে হাঁটা সরু পথ। শুধু এ-পাড়ার মানুষজনই পুকুরটা ব্যবহার করে। বেশ গভীর এবং কালো জল, এর পাড় দিয়ে পরী পিলুর সঙ্গে একবার বড় সড়কে উঠে গেছিল—কেন যে মনে হয়েছিল, কোনো দিন সুযোগ পেলে দু'জনে এই ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করবে।

আজ করেছে ঠিক, তবে বিলু ছিল না। পিলু ছিল আর মায়া ছিল। তখন কিন্তু ও-পাড়ের ঘাটে কাউকে প্রথমে দেখেনি। পরে দেখতে পেয়েছে। তেল মাখার জন্য নিরাপদ হাতে তেল নিয়েছে। হাতে পায়ে চপ চপ করছে তেলে। যখন নিরাপদ ফিরে এল, হাতে একটা লাঠি। এক হাতে দা, যেন স্নান টান সেরে পবিত্র হয়ে সে বান্দর লড়ির মূল তুলে এনেছে। কেন এনেছে জানে না। এ-জন্যও দেরি হতে পারে।

নিরাপদ লাঠিটা ঠাকুরঘরের বারান্দার চালে গুঁজে রেখে খেতে বসল। পরী আর মায়া পরিবেশন করছে। দুটো বড় কলাপাতা কেটে নিরাপদ অন্ন রাখার জায়গা বড় করে নিয়েছে। ওর পাতা বিছানো দেখেই পরী বুঝেছে, প্রথমেই অনেকটা ভাত দিতে হবে। না হলে ত্রাসে পড়ে যাবে। কতটা খেলে পেট ভরে সে বোধ হয় ভাল জানে না। নিরাপদ ভাত সাজিয়ে বলল, কাচা লংকা নাই ঠাইরেন?

তারপর নিরাপদ কী ভেবে নিজেই উঠে গেল। গেরস্থরা কোন জমিতে কী লাগিয়েছে, চোখে চোখে রাখার স্বভাব। রান্নাঘরের পেছনে দুটো বারোমেসে লঙ্কা গাছ আছে এ-বাড়িতে সে তারও খবর রাখে। গোটা ছয়েক কালো ধানি লঙ্কা পাতের কিনারে বোঁটা সহ সাজিয়ে রাখল। পাশে নুন দিল মায়া। তার খাওয়ার প্রতি যত্নআত্তি দেখে পরী কেমন মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছে। এত যত্ন করে কেউ খায়! খাবার আগে কিছু অন্ন হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাল। কিছুটা খেল। উঠোনে সে খেতে বসেছে। কাক শালিক উড়ছে, ঘুরছে। সে কিছুটা অন্ন কাক শালিখের নামে পাতের কিনারে বোধ হয় রেখে দিচ্ছে।

বাবা বলছেন, পরী, তোমরাও এবার বসে পড়। নিরাপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, পেট ভরে খাস। পরী না এলে দুপুরের খাওয়া আজ জুটত না। আমরাও তোর মতো নিরাপদ হয়ে থাকতাম। নবমী বসেছে, তার চালা ঘরটায়। দাঁত নেই। মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে খায়। খুবই সময় লাগে। তার পাথরের থালার পাশে পরী সব সাজিয়ে দিয়েছে। খুবই স্বল্পাহারী নবমী সে জানে।

পিলু দেখল, বাবা যেন কী খুঁজছেন।

আসলে বাড়িতে আজ বাবার প্রায় ছোটখাটো ভোজ। গরুর দুধের সামান্য পায়েসও করেছে পরীদি। পরীদি কত দ্রুত কাজ করতে পারে! কে বলবে, পরীদি তাদের কেউ হয় না।

বাবা পিলুর দিকে তাকিয়ে আছেন। তার পাশে সামান্য ফাঁকা জায়গা রয়েছে। বাবার কাছে এই ফাঁকা জায়গাটা কেন এত আগ্রহ তৈরী করছে সে বুঝতে পারছে না। তার দিকে তাকিয়েই বাবা চোখ নামিয়ে আনছেন ফাঁকা জায়গাটায়। যেন এখানে বসে আজ কারো অন্নগ্রহণ করার কথা ছিল। সে অন্নগ্রহণ করেনি। কোথাও সে চলে গেছে। আর পাশে রান্নাঘরের দরজায় পরীদি। পরীদিও বাবার এই অন্যমনস্ক চোখ দেখে কিছু টের পেয়েছে। একজন মানুষের মধ্যে কোথাও যে হাহাকার রয়েছে—পরী টের পেতেই রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। আর দেখল বাবা মাথা নীচু করে খাচ্ছেন। বাবা তো সোজা হয়ে খান। কখনও মুখ আড়াল করে খান না। বাবা কী দাদা এই ভোজে নেই বলে, ভেঙ্গে পড়েছেন। কাঁদছেন!

নিরাপদদা হঠাৎ বাবার দিকে পলকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। কারণ সে উঠোনে খেতে বসেছে। উঁচু বারান্দায় বাবা। উঠোন থেকে তাদের চেয়ে বাবার মুখ নিরাপদর কাছে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সে বলল, কর্তা নিজে পেট ভইরা খান। শোকতাপ কইরা কী করবেন। কপাল। আপনের মনোকষ্টের কথা জাইনা নিরাপদ আইজ যা করল! বলেই সে বারান্দার চালা থেকে বাঁ-হাতে লাঠি বের করে দেখাল।—এই যে লাঠিখান দ্যাখছেন, এটার গুণ অনেক। লাঠি চালাম্ম দিলাম। মাথার উপরে আকাশ, নিচে ধরণীতল, আর আপনের মতো সৎ মানুষের কাছে মিছা কথা কইলে জিভ খইসা পড়ব। ভাইবা দ্যাখেন লাঠিটারে চালান দিলাম ক্যান। ছয় মাসের মধ্যে বিলুবাবুরে দুরমুজ কইরা বাড়িতে ফিরাইয়া যদি না আনে আমার নামে কুত্তা পুইযেন।

পরী বলল, ঠিক আছে, লাঠিটা রেখে দয়া করে খাও।

পরীর দিকে তাকিয়ে নিরাপদদা বলল, খাওয়ন ত ফুরাইয়া যাইব না। কিন্তু কথা থাকব। যা কথা তা কাজ। অন্ন মুখে দিয়া কথা কইছি। আকাম, কুকাম করতে পারি, কিন্তু মানুষের অনিষ্ট করি নাই। বেদ বাক্য, ব্রহ্ম বাক্য দুইখান কথা আছে। লাঠিখান গুঁইজা রাইখা দিলাম। ছয় মাস পরে দেখতে পাইবেন লাঠির গুণ।

পিলু জানে, নিরাপদদা তুকতাক জানে। তার কেন জানি অবিশ্বাস হল না। দাদা ফিরে আসবে—এমনিতেই আসার কথা, দাদাই লিখে গেছে—নিরাপদদা কেন যে বলল, দুরমুজ কইরা নিয়া আইব।

বাবা এতক্ষণে নিজেকে বোধহয় সামলে নিয়েছেন। তিনি মুখ তুলে বললেন, নিরাপদ, পাগলামি করিস না। খা। মা অন্নপূর্ণা তোদের খাওয়া হলে খাবেন।

কেউ আর এখন পরীকে দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তাকে নিয়েই এ-পরিবারে এত বড় অশান্তি। সেই কারণ। তার বোধহয় খারাপ লাগতে পারে। কে জানে কোথায় সে! আড়ালে লুকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

বাবা তখন ডাকলেন, একটু পায়েস আর হবে মা। বড় সুস্বাদু হয়েছে। মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বল, দেবীভোগ মনে হচ্ছে না? মা কথা বলতে পারছিল না। তারও গলা ধরে গেছে।

পরীদি এক বাটি পায়েস পাতে দিতে গেলে, বাবা হা হা করে উঠলেন।—আরে করছ কী। তোমার জন্য রাখলে না। মায়া তুমি—না না আর দেবে না!

—খান না মেসোমশাই।

—একলা খেলে চলে!

তবু পরী জোরজার করে আরও এক হাতা দিতে গেলে বাবা বললেন, মৃন্ময়ী, আমরা এ-দেশে এসে অগাধ জলে পড়ে গেছিলাম। ভাল মন্দ খাওয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম। ভোজ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু তোমার জন্য না রাখলে যে খেয়ে শান্তি পাব না। আর দেবে না!

মৃন্ময়ী দেখল, মেসোমশাই বড় তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে পায়েসটুকু খেলেন। দিলে আরও খেতে পারেন। কিন্তু সে না খেলে তিনি কষ্ট পাবেন।

পিলু পায়েসের বাটিটা দেখছে।

মৃন্ময়ী বলল, তুই আর এক হাতা নে!

মা তখন না বলে পারল না।—তুমি কাকে দিচ্ছ! সে দিলে না করে কখনও! পেটুক। না না ওকে দেবে না! তুই কিরে পিলু, মেয়েটা একটু খাবে না।

পিলু বলল, থাক মিমিদি। দেখ না মা রাগ করছে।

বাবা তখন হাত চাখছেন। বললেন, অনেকদিন পর বড় তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। অন্নপূর্ণার রান্না। স্বাদই আলাদা। আর দেরি কর না মৃন্ময়ী। এবারে তোমরা বসে পড়।

পরী হঠাৎ ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। সে তার উদ্গত অশ্রু রোধ করতে পারছে না। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর কী আছে সে জানে না।

বিকেল পড়তেই নবমীর সঙ্গে পিলুর চোটপাট শুরু হয়ে গেল। নবমী আজকাল বাবাঠাকুরের বাড়িতে উঠে এসে চোপা করতে শিখে গেছে। অবশ্য পিলু জানে, নবমীর চোপা আগেও কম ছিল

না। কেবল তাকে দেখলেই বুড়ির মাথা ঠাণ্ডা হত। তার সমবয়সীদের উৎপাতের কথা জঙ্গলটায় ঢুকলে বুড়ির কাছে শুনতে পেত। নবমীর নালিশ ছিল, দেখেন দা-ঠাকুর আমারে ঢিল মেইরেছে। দ্যাখেন—বলে পায়ের গোড়ালির উপর হাত দিয়ে দেখাতেই চটে গেছিল—নাম জান, কে, কে করেছে!

নবমী মাথা নেড়েছিল।

—মুখ চেন?

নবমী তাও যেন ঠিক জানে না। তবু যারা পরিত্যক্ত ইটের ভাটার বনজঙ্গলে ঢুকে উৎপাত করতে পারে তাদের সে চেনে। সবাইকে নবমীর কাছে নিয়ে গেছিল।

নবমী ঠিক চিনতে পেরেছিল।

—তুই ঢিল ছুঁড়লি!

—আমারে আকথা কু-কথা কয় পিলুদা।

নবমীর সাফ কথা, না দা-ঠাকুর, মিছা কথা।

—তুমি আমারে ছাগলের বাচ্চা কও নাই।

—হ কইছি।

—তুমি আমারে কও নাই ওলাওঠা হইয়ে মরবি।

—হ কইছি।

—তুমি আমারে কও নাই বংশে বাতি দিতে থাকব না।

—হ কইছি।

পিলু নবমীকেই তেড়ে গেছিল। —কেন বললে। বল। ছাগলের বাচ্চা কেন বললে। এটা কু-কথা না!

—আমার ছাগলের বাচ্চা নিয়া নিব কয়। কু-কথা হইব ক্যান।

—তুমি বোঝ না ভয় দেখায়।

—ঘর থেইকে তাড়িয়ে দেবে কয়।

—এটা ঘর! এটাতে মানুষ থাকতে পারে! বনজঙ্গলে থাক, আর এটা তোমার ঘর হয়ে গেল।

—আমার স্বামীর ভিটে পিলুদা। বনজঙ্গল বলেন ক্যানে!

—স্বামীর ভিটা! ভয়ে তো মর, রাতে সাপ ঢোকে। সারারাত ঘুমাও না। লাঠি নিয়ে দরজায় বসে থাক। শেয়ালে খটাশে টেনে নিয়ে যখন যাবে, কে রক্ষা করবে! হ্যাঁ কে তোমাকে রক্ষা করবে বল। শাপশাপান্ত করলে ঢিল ছুঁড়বে না।

তারপর পিলু কেমন ফুঁসে উঠত—তোরাই বা কী! বুড়ির কিছু আছে! নবমীর কাছে তোদের নিয়ে আসাই ঠিক হয়নি! আগে তো ভয়ে জঙ্গলটায় ঢুকতিস না।

—না পিলুদা, বনটায় ডাইনি থাকে। লোকে স্বচক্ষে দেখেছে। নবমী ডাইনি! হ্যাঁ—কি রে, কথা বলছিস না কেন! বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ফলপাকুড় যা পায় খায়। ছাগলটা নিয়ে জঙ্গলের মাঠে ঘাস খাওয়ায়। গাছের সঙ্গে কথা বলে, সে কী মানুষ আছে! একটা গাছ হয়ে গেছে না! গাছের সঙ্গে তোদের যত বাঁদরামি! আর কোনোদিন নবমী যদি নালিশ করে ঠ্যাং ভেঙ্গে খোঁড়া করে দেব বলে দিলাম।

—পিলুদা, একখানা কথা!

—কী কথা আবার।

—নবমী য্যান আমাদের ছাগলের বাচ্চা না কয়।

—নবমী, আর কখনও যদি শুনি, এদের মুখ করেছ, তবে তোমার ভাত জল বন্ধ। তোমার খোঁজখবর নিতে আমার বয়ে গেছে।

—না দা-ঠাকুর, মুখ কইরব না। আপনি না এইলে আমার যে দিন যায় না দা-ঠাকুর।

সেই দা-ঠাকুরের সঙ্গে নবমী চোপা শুরু করেছে। পরী আর মায়া বিলুর তক্তপোষে শুয়েছিল। ভাদ্র মাসের গরম। জানালার খলপাটা তুলে দেওয়ায় ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে দুপুরের দিকে মেঘ করেছিল, আবার মেঘ কেটে গেছে। সামনের মাঠটায় আউস ধানের চাষ—ধান

পেকে গেছে, জানালায় বসে সব দেখা যায়। ঘরটা তার এত চেনা, মনেই হয় না এটা তার পরবাস।

পিলুর এক কথা, পারব না। রোজ রোজ বায়না। কে নিয়ে যায়! মানুষের আর কাজ কাম নেই। এই সেদিন গেলে স্বামীর ভিটে দেখতে। আজ আবার মাথায় ক্যাড়া উঠেছে। আমি পারব না। স্কুলের মাঠে ভলিবলের কোর্ট কাটতে যাব।

মিমি ঠিক বুঝতে পারছে না কেন বুড়ির এত চোপা! নবমী বুড়ির বনটা সেও চেনে। একবার কারবালার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসার সময় পিলু বলেছিল, জান পরীদি, এই জঙ্গলটায় একটা বুড়ি থাকে।

মিমি অবাক হয়ে গেছিল শুনে।

সেই প্রথম তার বিলুদের বাড়ি দেখতে আসা পালিয়ে। লক্ষ্মীকে নাকি বিলুই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। রাস্তাটা লক্ষ্মী সে-জন্য চেনে। কালীবাড়িতে বিলুর সঙ্গে জোর করে পরিচয় করতে গিয়েই ফ্যাসাদ। মজা করার জন্যই বলেছিল, তোমাদের বাড়ি আমি যাব। লক্ষ্মী আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। মুখচোরা স্বভাবের বিলু সহসা ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, গিয়ে দেখ না!

—কেন ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে।

—কী করব গেলে বুঝবে।

সেই থেকে তার জেদ। এবং এই জেদ শেষ পর্যন্ত তাকে বিলুর আত্মপ্রকাশের জন্য মরিয়া করে তুলবে যদি আগে টের পেত—তবে বোধ হয় এ-ভাবে গলায় তার কাঁটা ফুটে যেত না। বিলুর আত্মপ্রকাশের জন্যই যেন অপরূপা কাগজ, কবিতা পাঠের আসর—এবং এক জলছবির মতো একজন বাদ্যকার মাঠ দিয়ে ঢাক বাজিয়ে যায়। গভীর নিশীথে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো একজন পুরুষ তার পাশে থাকুক—যার মধ্যে সে কোনো নীরব এবং নিশ্চিত মাধুর্য টের পাবে। তারই প্রতীক্ষায় সে আছে। এবং মায়া আজ তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর বিলুর সেই আক্ষেপ, বার বার কিছু শব্দমালার মধ্যে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, বিলু যেন ঠিকই লিখেছে—পরী আমার সর্বনাশ। পরী আমার আকাশ বাতাস। গভীর রাতে নির্জনে হাঁটি। দেখি নক্ষত্র হয়ে সে আছে। মাথার উপরে। তার ডানার ঝাপটায় ধুলো ওড়ে। ওড়ে কাঙ্গালের বসন। উলঙ্গ করে দেয় অজ্ঞাতে—পরী আমার সর্বনাশ/জীবনে/বীজবপনে/বিসর্জনে।

পরী বার বার উচ্চারণ করছিল, জীবনে, বীজবপনে, বিসর্জনে। এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকাল থেকে যা গেছে। আর ঘুম ভাঙতেই সে শুনছে কী.....।

পিলু বলছে, ডাকাতের বৌ, তার আবার স্বামীর ভিটে!

ছি পিলু! তুই ও-ভাবে বলিস না। ডাকাতের বৌ নবমী!

পরী পায়ে শাড়ি টেনে দরজা খুলে বের হয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য পাশের ঘরে মাসিমা, মেসোমশাই নির্বিকার। তারা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে মনে হয় কথা বলছে।

পিলু আর নবমীর এই কথা কাটাকাটি তারা যেন গ্রাহ্যই করছে না।

পরীর এটা ভাল লাগল না।

সে দেখল বুড়ি কোরা থান পরে হাতে লাঠি নিয়ে বসে আছে। কিছুটা অচল। লাঠি ভর দিয়ে উঠতে পারে। কিছুটা যে হেঁটে বেড়ায় তাও লাঠির সম্বলে। সেই নবমীর কী গলা। ডাকাতের বৌ বলাতেও কোনো আক্ষেপ নেই। কোথাও যাবে বলে সে প্রস্তুত। বাধ সেধেছে পিলু।

পরী বলল, কী বাজে বকছিস পিলু!

—আর বল না পরীদি, এই সেদিন ধরে ধরে নিয়ে গেছি। হাঁটতে পারে না। দু-পা গিয়ে পড়ে যায়। না ধরলে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবে। তা তোকে কে বাবাঠাকুরের বাড়ি উঠে আসতে বলেছিল! ডর লাগে! ডর। ধনে তার যখ লেগেছে। ঘুম হয় না। লাঠি নিয়ে দরজায় ধপাস ধপাস। না আমি পারব না। একা পার তো যাও।

পরী বলল, কিরে যা না। এত করে বলছে। তার স্বামী ডাকাত তোকে কে বলেছে!

—কে আবার বলবে! জিজ্ঞেস কর না। না বললে আমরা জানব কী করে! তিনি নাকি ডাকাতের বৌ ছিলেন। এক বারে গরিমায় পা পড়ে না। ফোকলা দাঁতে কী হাসি, কী নাচ, সে যদি দেখতে।

ডাকাতের বৌ বলেই নাচ শুরু। লাঠিতে ভর করে ঘুরে ঘুরে কোমর বাঁকিয়ে নাচ যদি দেখতে!

ডাকাতের বৌ, নবমী ডাকাতের বৌ—পরী বড় বড় চোখে দেখছিল। কেমন ডাকাত, কোথাকার ডাকাত, খুনটুন কত করেছে কে জানে! তবে কী জঙ্গলের মধ্যে থাকত ডাকাতের বৌ বলেই। কিন্তু পরী এটাই বা কী দেখছে! ডাকাতের বৌ বলায় নবমী কী খুশি।

নবমী লাঠি ভর দিয়ে ওঠার সময় কঁকিয়ে বলল, ডাকাতের বৌ বলে কী আমার স্বামীর ভিটে থাকতে নাই। লিয়ে না যান, একাই চইললাম।

পিলু সেই মতো এক দুর্বাসা যেন।—পা বাড়িয়ে দ্যাখ কী করি! যাও ঘরে। বারান্দায় বসে থাক।

ইস্ পিলুটার মায়া দয়া নেই! জঙ্গলের মধ্যে স্বামীর ভিটে, বেশি দূরেও না, পরী বলল, চল নবমী, আমার সঙ্গে চল।

মায়া বের হয়ে বলল, তুমি যাবে! আমিও যাব।

পিলু বলল, তবে আমিও যাব।

বাবা ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, দিলে তো মাটি করে। নিত্যকার যাত্রাপালাটা দেখতে পেলে না। রোজ বিকাল হলে নবমীর নাকি মন কেমন করে! আর সাধাসাধি। পিলু যাবে না। নবমীর গোঁ যাবে। ডাকাতের বৌ বলে তারও জেদ কম না। দু'জনের তর্ক দেখলে তোমার হাসি পেত।

পিলু বলল, জান পরীদি, কী আস্পর্ধা। বলে, কি না যোয়ান মানুষটা সামনে নাই। থাকলে দেইখতেন। তাঁর বধূরে নির্যাতন! এক আছাড়ে ছাতু কইরে ফেলত। গোট গোট মল বানিয়ে দিয়েছিল। ঘাঘড়া। রেইতের বেলা ফিরে এইলে কোমরে হাত দিইয়ে নেইচেছি কত—কী যেন সব বলে না! তারপরই নবমীর দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, মনে রেখ তুমি ডাকাতের বৌ, আমি বামুনের পোলা। এক ফুয়ে উড়ে যেত তোমার মরদ।

পিলু ব্রাহ্মণ সন্তান কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই নবমী জব্দ। বামুনের অভিশাপেই মানুষটা নাকি তার গেছে। কোন এক ব্রাহ্মণীর গা থেকে অলঙ্কার খুলে আনার সময় নাকি অভিশাপ দিয়েছিল, ভেদ বমিতে যাবি। নবমী মনে করতে পারে সব। নবমী মনে করতে পারে সেও ছিল লুটের মাল। বখরায় বনছিল না বলে, তাকে নিয়ে পালাল। কত গ্রাম গঞ্জ রেল ইস্টিশানে তারা পড়ে থেকেছে। তার জন্য মানুষটা পুলিশের তাড়ায় দেশ ছাড়া রাজ্য ছাড়া হয়ে গেল। শেষ বেলায় ইটের ভাটায়। কুলি কামিনের সর্দার।

পরী আগে আগে হাঁটছে। পিলু, বুড়ির পেছনে। সত্যি বেশ দূর মনে হল—তার বাড়ি ফিরতে হবে। রাত করে ফিরলেও কেউ বলার নেই। সে পার্টির কাজে কত জায়গায় যায় মিটিং মিছিল করতে। কত রাতে ফিরতে পারে না। খুব বেশি হলে সুহাসদাকে ফোন—এবং সুহাসদা জানে সে যেখানেই যাক, তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা পার্টির ক্যাডাররাই করে থাকে। আজ দাদু ক্ষোভে অভিমানে ফোনও না করতে পারে।

বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে উঁচু নিচু পথ। সামনে ঢিবি। ঢিবির পাশে মাটি তোলায় মজা পুকুর। শাপলা শালুক, জলজ ঘাস, এবং কত সব বিচিত্র পাখি উড়ে যাচ্ছে বনটায়। পিলু কিংবা মায়ার যেন মনেই নেই তাদের দাদা নিখোঁজ। পরীদিকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে সব দেখাচ্ছিল। ওটা—উ যে চালা ঘরটা দেখছ, ওখানে আমার পিসি বাড়ি করেছে। বাড়ি না বলে জঙ্গলের মধ্যে ঝুপড়ি বললেই হয়। গোপাল করের সীমানা শেষ হতেই বনজঙ্গলের শুরু। কাঁটা গাছ, খেজুরের বন, তাল গাছ, শিশুগাছ চারপাশে। বর্ষাকাল বলে ঝোপজঙ্গল নিবিড়।

পরী বলল, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছিস তো!

পরী আসলে সেই রাস্তাটা চিনতে পারছে না। এমনও হতে পারে বর্ষাকাল বলে, বনজঙ্গল নিবিড় বলে সে যে ঠিক এই রাস্তায় এসেছিল মনে করতে পারছে না—কিংবা দিন দিন বাড়িঘরের সংখ্যা বাড়ায় জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা জায়গা বদল করতে পারে। আসলে রাস্তা বলেও কিছু নেই। একটা গভীর সুমার বনে ঢুকে যাচ্ছে তারা। পরী বলল, নবমী, জঙ্গলে একা থাকতে কষ্ট হত না।

নবমী হাতজোড় করে তখন কার উদ্দেশে যে প্রণাম করত বোঝা ভার।

পিলু এগিয়ে গিয়ে বলল, জান পরীদি, নবমীর ছাগলের দুটো বাচ্চা। বেশি হলে জঙ্গলে রেখে

আসত।

—জঙ্গলে কেন?

—কী জানি কেন! ওতো বলে ভূতেরা চাইত!

—ভূতেরা ছাগলের বাচ্চা চাইত। ভারি মজার ভূত তো!

নবমী লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছে। কাঁটা গাছে তার কাপড় জড়িয়ে গেলে পরী উবু হয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কাঁটা গাছ বাঁচিয়ে যাবারও রাস্তা নেই।

পরী নবমীর কাপড় থেকে কাঁটা গাছ ছাড়িয়ে দেবার সময় শুনতে পেল, ভূত কেন হবে। ঠাকুর দেবতা!

পিলু বলল, আচ্ছা পরীদি, বনে ভূত ছাড়া কিছু থাকে! ঠাকুর দেবতা থাকে বাড়িতে। নয় মন্দিরে।

নবমীর এক কথা, দা-ঠাকুর বনের দেবতা আছেন। জানেন না গো। একলা এতটা কাল থেইকে বুঝেছি।

নবমীর সব কথা স্পষ্ট নয়। শুধু জিভ নাড়ে। আর কী বলে বোধহয় পিলু ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তবু বনটার কাছে এসে মনে হল পরীর, এক নারী তার যুবতী বয়সে এই জঙ্গলে উঠে এসেছিল। সঙ্গে তার মরদ। বাবুদের ইটের ভাটায় কাজ। শীত বর্ষায় গাছপালার মধ্যে থাকতে থাকতে নবমীর এই বন ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু শেষ বয়সে মেসোমশাই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। শেয়ালে খাটাসে খেলে মানুষের অসম্মান। এখন সেই নবমী স্বামীর ভিটে দেখার জন্য পাগল। কে করবে এত!

বিলুদের বাড়িটায় হাঁস কবুতর খোঁড়া বাঁদর গোটা ছয়েক বিড়াল, দুটো কুকুর—কী না ছিল! এখন প্রাণীর সংখ্যা কমে এসেছে। পরী মনে করে একজন উদ্বাস্তু মানুষের নানা সংস্কার গড়ে উঠতে পারে—কোন পাপে দেশ ছাড়া, এমন কোনো উচাটনে পড়েই হয়তো যাবতীয় প্রাণীজগত থেকে গাছপালার প্রতি এক অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছে মানুষটার। তা না হলে এই নবমীকে, যার তিনকাল গেছে, শেষ কালে যাবার সময়, তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছে! গীতা কিনে দিয়েছে! পিলু নাকি মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারতও পড়ে শোনায়। সব বিলুর কাছেই শোনা। বাড়িটা যে চিড়িয়াখানা করে তুলছে তার বাবাটি—সেটাও ক্ষোভের বিষয়। পরী তার বাড়ি যে যায়, তাও বাবা মানুষটিকে দেখতে, তার চিড়িয়াখানা দেখতে। কিন্তু বিলু বোঝে না, এই বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই—একজন মানুষের প্রাণ কত বড় হলে তাকে বসবাসের জায়গা করে দিতে পারে। নিজে উদ্বাস্তু না হলে, হয়তো নবমীর কথা মেসোমশাইয়ের মাথাতেই আসত না।

জঙ্গল থেকে নবমীকে তুলেও আনা হত না। রোগে ভোগে চারপাশে শুধু বনজঙ্গলের জীবজন্তুর সাড়া পাওয়া যেত। পিলুর খোটা দিয়ে কথা বলাটাও পরীর পছন্দ হচ্ছিল না। ডাকাতের বৌ! তোর দাদা কত বড় ডাকাত জানিস। তার মান অপমানের জ্বালা কত জানিস! সে কী-ভাবে আমাকে হেনস্থা করত জানিস!

কিছুই জানিস না।

ওদের দুই বন্ধুকে সাইকেলে আসতে দেখলেই বুক ধড়াস করে উঠত। সাইকেল থামিয়ে অপেক্ষা করতাম। কতদিন কতভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে। আমাকে দেখেই মুকুল সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াত। তোর দাদা নামত না। অবজ্ঞারও শেষ থাকে। সে সাইকেল নিয়ে ভাকুড়ির রাস্তায় উধাও হয়ে যেত।

কী যে খারাপ লাগত। বুঝবি না!

আমি কী মুকুলের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাইকেল থেকে নেমেছিলাম! যার জন্য নামা তিনি হাওয়া।

কী ব্যাপার মুকুল!

খুব চটে আছে।

কেন?

আর কেন। কলেজ ডিবেটে যেই তুমি উঠে দাঁড়ালে, ব্যস বাবু বললেন চল। আরে যাবে কী!

শোনো মিমি কী বলছে! জোরজার করে বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু যত তুমি যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তির পক্ষে কথা বলছ, তত খেপে যাচ্ছে। যত তুমি হাততালি পাচ্ছ তত তার মুখ গোমড়া হয়ে যাচ্ছে। আর হঠাৎ জান দেখি পাশে নেই। কখন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাইরে বের হয়ে দেখছি গঙ্গার ধারে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, কী বিলু, এখানে! পরী ডিবেটে কী তুখোড় যুক্তি দিয়ে বলল, যদি শুনতে!

আরে রাখ! বড়লোকের মাইয়া আমি চিনি। মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি। আচ্ছা মুকুল, তুমি বিশ্বাস করতে পার এরা কখনও গরীবের দুঃখ বুঝতে পারে! ভণ্ডামী না। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ। সব মানুষের জন্য আহার আশ্রয় উত্তাপ একমাত্র বিজ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। মানুষের জন্য সমান সুযোগ—কখনও সম্ভব! এরা যতদিন আছে শুধু ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে গরীব মানুষকে প্রতারিত করবে। আগেকার জমিদাররা পুকুর কেটে, মন্দির বানিয়ে গরীব মানুষদের ধোঁকা দিয়ে গেছে, এরা এখন সমাজবাদের নামে ভাঁওতা দিচ্ছে। পরীর এটা প্রতারণা। তোর কী দরকার, হ্যাঁ কে তোকে বলেছে, মিটিং মিছিলে স্লোগান দিতে, এ-আজাদি ঝুটা হ্যায়।

মিমি জানে, একজন মেয়ের এই আত্মপ্রকাশ বিলুর একদম পছন্দ নয়। সে মিটিং মিছিলে গেলে বিলু ক্ষেপে যেত। পথ নাটিকায় অংশ নিয়েছে মিমি, শুনলেই ও রাস্তায় যেত না। সে মহেশ নাটকে আমিনার পার্ট করেছে, কলেজিয়েট স্কুলের দোতলার হলঘরে নাটক—সে কার্ড দিতে গিয়ে শুনল, বিলু বাড়ি নেই। মাসিমা মেসোমশাইকে বলেছে, পিলুকে বলেছে, তোরা যাস। সে নাটকে অংশ নেবার আগে বারান্দায় বার বার ছুটে আসত, পিলু যদি আসে। আর কেউ না আসুক পিলু ঠিক আসবে। সেই পিলুর পর্যন্ত পাত্তা নেই। তার যে কী খারাপ লাগত! পরে পিলু এলে মিমিও কথা বলত না।

পিলুর তখন এক কথা, কী করব দাদা বারণ করেছে।

মিমি কটাক্ষ করে বলত, একেবারে লক্ষ্মণ ভাই! দাদা বারণ করল বলেই আসবি না। আমি কেউ না। দাদার কথাই বড় হল!

পিলু বলত, জাননা দাদা কী অশান্তি করতে পারে!

তোর দাদা স্বার্থপর। মজা দেখাচ্ছি।

সেও তখন ক্ষেপে যেত। আরও বেশি পার্টিঅফিস, আরও বেশি কলেজ ইউনিয়ান, সারাদিন টো টো করে ঘুরছে—আর মিমি জানে, বিলুটা চোরের মতো দূর থেকে সব দেখবে আর দিনরাত ফুঁসবে।

এটাও ডাকাতি। আমার ভাললাগা মন্দলাগার বিন্দুমাত্র দাম নেই। জবরদস্তি করে তুমি আমার প্রাণ ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে চাও।

পিলু বলল, মিমিদি, আমরা এসে গেছি।

সে কেমন হুঁস ফিরে বলল, নবমী কোথায়!

—ঐ যে আসছে।

পরী দেখল, এক অশীতিপর বৃদ্ধা কেমন বেহুঁস হয়ে স্বামীর ভিটে দেখার জন্য উঠে আসছে।

গভীর বনজঙ্গলে মিমি কোনো ডেরা পর্যন্ত দেখতে পেল না। নবমী থাকত কোথায়! কুল গাছের জঙ্গল পার হয়ে বড় বড় সব শিরীষ গাছ, আকন্দ গাছের ঝোপ, পিটুলি লতার সমারোহ। লাল বনজ ফল। এক ঝাঁক টিয়াপাখি ঠুকরে খাচ্ছে। মানুষজনের সাড়া পেয়েই তারা উড়াউড়ি শুরু করেছিল। কিন্তু মিমি বুঝল না, শুধু বনজঙ্গলেই স্বামীর ভিটে কী করে হতে পারে। থাকার মতো একটা ঝুপড়ি হলেও বসবাসের জন্য দরকার। সেটা কোথায়?

পিলু সারা জঙ্গলটায় ঢুকে গিয়ে কেমন এক নেশার মধ্যে পড়ে গেছে। ঝোপে জঙ্গলে কোথাও যদি পাকা পেয়ারা পাওয়া যায়—এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোনো গোপন জায়গায় সেই পেয়ারা গাছটা—পিলু বোধহয় সেটাই খুঁজছে। সে গুড়ি মেরে ঢুকছে, মায়া ডাকছে, ছোড়দা তুই কোথায়?

মিমি দাঁড়িয়ে আছে একা। ছোট্ট এক তৃণখণ্ডের চারপাশে এত বড় বড় গাছের বনরাজি লীলা

দেখতে দেখতে সে কিছুটা অভিভূত। এর কোনো গোপন অভিলাষ আছে সে টের পায়। এখানে একজন পুরুষ তার প্রিয়তমা নারীকে নিয়ে থাকার মধ্যে কোনো গভীর আনন্দ খুঁজে পেতেই পারে। নবমীর স্বামী মানুষটাকে কেন জানি এই মুহূর্তে একজন স্বপ্নের মানুষ মনে হল। সেও হয়তো পালিয়ে কোথাও এখন গোপন করতে চায় নিজেকে। সে আর তার প্রিয় পুরুষ। আহার আশ্রয় উত্তাপের ব্যবস্থা থাকলে এর চেয়ে ভালবাসার জায়গা আর কোথায় থাকতে পারে সে জানে না।

এবং উলঙ্গ করে দেবার স্পৃহা নিরন্তর যে জন্মলাভ করে মনের মধ্যে, ডাকাত মানুষটি বনজঙ্গলে ঢুকে গিয়ে এটা বোধহয় আরও বেশি টের পেয়েছিল। সে জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারেনি। সারাদিন পরিশ্রমের পর কী ঝড় বৃষ্টি, কী শীতের হাওয়ায় অথবা কোনো জ্যোৎস্না রাতে তার পরিভ্রমণ ছিল নবমীকে নিয়ে। প্রতিটি গাছের প্রতি তার মায়া জন্মে যেতেই পারে। এমনকী এই মুহূর্তে তার নিজেরও কেন যে মনে হচ্ছিল জায়গাটা ছেড়ে চলে গেলে সেও আর এক নবমী। নবমী হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে মিমির পায়ের কাছে বসে পড়ল। কথা বলতে পারছে না।

মিমি বলল, কোথায় তোমার ঘর!

—ঐ যে হোথায়!

মিমি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু একটা ভাঙ্গা ইট কাঠের আস্তানা। ভিতরে কিছু নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওটা ধসে পড়তে পারে। পরিত্যক্ত কোনো আবাস হতে পারে এটা মিমি ভাবতেই পারে না। বাইরে থেকে মনে হয় শেওলা ধরা ইটের পাঁজা। তার ভিতর থেকে, ফাঁকফোঁকর থেকে বনজ উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে। এবং হেমন্তে শীতে কিংবা বর্ষায় এই ইটের পাঁজার মধ্যে শেকড় চালিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

—ওর ভিতর তুমি থাকতে!

নবমীর ফোকলা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। কিছু বলল না। সে তার আবাসের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সামনে কবে কোন প্রাচীনকালে মাটি তুলে ইট তৈরি হয়েছিল, তার খানাখন্দ এখনও বিদ্যমান। এই খানাখন্দের জলই ছিল নবমীর জীবনলাভের উপায়। তার রোগ শোক ব্যাধি এবং সুখ সব যাবার সময় জলে বিসর্জন দিয়ে গেছে।

কেন যে মিমির মনে হল, এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে কেউ যায়! মানুষটার স্মৃতি নবমীকে আটকে রাখতে পারল না। কারণ এই গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে সব গাছপালার সঙ্গে একজন মানুষের নিরন্তর অবস্থান যে মরে যায়নি, নবমীর মুখ দেখে সে তা টের পাচ্ছিল।

মিমি না বলে পারল না, তোমার খারাপ লাগল না, চলে গেলে!

—সাধে কী গেছি মা ঠাকরুণ!

—কী হয়েছিল!

—যখ।

—যখ!

—হ্যাঁ মা ঠাকরুণ যখ এসে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। কত ডাকতাম, তার সাড়া পেতাম না। ডর ধরে গেইছিল।

নবমী এ-সব কী বলছে! সারা জীবন এই বনজঙ্গলে বসবাসের পর যখ এসে তাড়া করল তাকে!

মিমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়ছে। একজন অনাথ নারীর মধ্যে যখের ভয় কেন উদয় হল, সে তা বুঝতে পারছে না। ক্রমেই সে বিস্ময়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।

সে বলল, তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে না!

—পড়ে।

—কষ্ট হয় না?

—না।

—কার কথা ভাবলে কষ্ট হয়।

—মরদের কথা।

—আর কারো কথা না!

—না আরও একজন আছেন। পিলু দাদা! আমার দা-ঠাকুর।

—তোমার দা-ঠাকুর। পিলু তো সেদিনের ছেলে।

—উ তো এসে আমাকে দেখে পালাল না।

—পালাবে কেন!

—আমি যে মানুষ না মিমিদি। আমার শনের মতো চুল, কংকালসার শরীর, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াই, ডাইনি ছাড়া কেউ কিছু ভাবতে পারত না। জঙ্গলটায় ভয়ে লোক ঢুকত না। আমি তুকতাক করে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখি। বিলুদাও রেগে যেত। দা-ঠাকুর খোঁজ খবর নিতে এলেই বিলু দাদা তাড়া করত দা-ঠাকুরকে।

নবমী কত কথা বলে যাচ্ছে।

কবেকার সব স্মৃতি—ভাল করে বোধহয় মনেও রাখতে পারেনি। তার অসংলগ্ন কথা এটা ওটা বাদ দিয়ে জুড়ে দিলে মনে হয়, আশ্চর্য এক গভীর প্রেম ছিল তার ডাকাত মানুষটির সঙ্গে।

সে বলল, তোমার বাবা কী করতেন!

—তিনি তো বড় সওদাগর ছিলেন। বয়েল গাড়ি ছেইল তিন গণ্ডা। বাজারে আড়ত—চাল, ডাল, তেলের। মোকাম। ঘর দরজার সীমাসংখ্যা নাই। বাড়িতে ডাকাত পড়ল। ছিনতাই হয়ে গেলাম।

পরী শুনছে। তার মধ্যে কোনো জলছবি ফুটে উঠছে। প্রশস্ত হলঘর—ঝাড় লণ্ঠন, চাকরবাকর, দাঁড়ে কাকাতুয়া এমন এক জলছবি ভেসে বেড়াতে থাকলে সে দেখতে পেল, সেখানে কে একজন লুণ্ঠন করার জন্য গোপনে ঢুকে গেছে। তার ভিতর হাহাকার বাজছে। কোথায় গেল বিলু! কোথায় গিয়ে উঠল! যেন সেই মৃত ডাকাত আবার অন্য ভূমিকায় এসে হাজির হয়েছে বনটায়। সেখানে সে কাউকে তুলে আনতে চায়—আবার অবাঞ্ছিত ভেবে নিজেকে কষ্ট দিতেও ভালবাসে।

নবমীর জীবন তাকে আজ অন্য কথা বলছে। তার মা-বাবার কথা মনে পড়ে, তবে কষ্ট হয় না। তার মোকামের কথা মনে পড়ে কিন্তু কোনো অসুবিধা বোধ করে না।—দু-তিন গণ্ডা বয়েল গাড়ির কথা মনে পড়ে—কিন্তু তাতে উঠে বসার কোনো আগ্রহ নেই তার। শুধু স্বামীর ভিটায় ঘুরে ফিরে চলে আসতে চায়। পিলু মুখ করে। সে নিয়ে না এলে আজ এই তীর্থক্ষেত্রেরও খবর পেত না। তীর্থ তো মানুষ শান্তির জন্য করে। মানসিক শান্তি।

তখনই পিলু কোত্থেকে জঙ্গলের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। ডাকল, পরীদি, শিগগির এস।

—কেন।

—এস না।

মায়াও জঙ্গলের ডালপালা সরিয়ে দূরে উঁকি দিল।—মিমিদি, এসে দেখ!

মিমির ইচ্ছে হচ্ছিল না নড়তে। এই বৃদ্ধার সঙ্গে তার কথা বলার আগ্রহ অসীম। সে বলল, যাচ্ছি। যাচ্ছি বলে আবার কথা শুরু করে দিল।

—তোমার মরদ কী মরে যখ হয়ে গেছিল।

—না না। মরদ আমার সে-রকম আদমি ছেল না।

পরী ঘাসের উপর বসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। সব কথা নবমীর বুঝতেও পারছে না। সে নবমীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

দু'জন মুখোমুখি বসে।

একজনের উষাকাল, অন্যজনের সাঁজ লেগে গেছে।

পরীর কেন জানি নবমীর মুখ দেখতে দেখতে এমনই মনে হল। তার চেয়ে যে বেশি শ্রী ছিল না নবমীর শরীরে কে বলবে! সে নবমীকে বলল, ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে ভয় করত না।

নবমীর আবার সেই অপরূপ স্নিগ্ধ হাসি।

—যম। চোখের পাকে ভিরমি খেত। যমের মতো আমারে ডরাত।

বলে কী নবমী!

—তোমার চোখের পাকে ভিরমি খেত।

—হা সাচ বুলছি। মিছা বুলছি না। ডাকাতি ছেইড়ে দিল ডরে।

—বলে কী!

—হ্যাঁ মিমিদি, আমি মিছা কখনও বুলি না।

মিমির কেন যে এত আগ্রহ নবমীর সব খোঁজ খবর নেবার। সে বলল, তোমার বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে হত না।

—হত। তবে মরদের ইজ্জত বড় না আমার ইচ্ছা বড় বুলেন! আমি তারে ছেইড়ে গেলে আতান্তরে পইড়ে যাবে না!

—সেই ভেবেই যাওনি।

লজ্জায় নবমী মাথায় আঁচল টেনে দিল।

এ কী পরীর সহসা আবার অশ্রুপাত কেন!

সে কথা বলতে পারছিল না। দু-হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিল। কোথায় খুঁজবে। সে জানে মেসোমশাই তার সান্ত্বনা পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছেন। বাড়ির সবাই। কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করবে কে! বিলু যদি কোনো প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকে। সে তো নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যই সংসারের স্বচ্ছলতা থেকে সরে গেল। এক দিকে তার নিজের আত্মপ্রকাশের তাড়না, অন্য দিকে পরীর মর্যাদা নষ্ট না হয় ভেবেই সে নিখোঁজ হয়ে গেল। তার হাত পা কাঁপছে। কেন যে দেখতে পাচ্ছে, প্রখর রোদে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। মুখচোরা মানুষ। কাউকে নিজের কষ্টের কথা কখনও মুখ ফুটে বলে না। তা-ছাড়া সে কলকাতার রাস্তাঘাটও ভাল চেনে না। ভিতরে এমন উতলা হয়ে পড়ল যে কিছুক্ষণ সে আর কোনো কথা বলতে পারল না।

নবমীর কথাতেই তার হুঁস ফিরে এল। নবমী তো জানে না, সেই শুধু ডাকাত নিয়ে ঘর করেনি। সব নারীকেই কোনো না কোনো ডাকাতের পাল্লায় শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে হয়।

—আমার নিবাসে চলেন।

নবমী লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়াল।

পরী আর কী করে! নবমীর জীবন যে আগ্রহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তাতে সে তাকে যেন আর বিন্দুমাত্র অবহেলা করতে পারে না। নবমী এতটা হেঁটে এসেও কোনো ক্লান্তি বোধ করছে না। সে এখন যেন পরীদিকে নিয়ে এই বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কী মজা ছিল তার বেঁচে থাকার—দ্যাখ দ্যাখ, ঐ শিরীষের তলায় মরদ শুয়ে আছে, আমি জল নিয়ে গেছি, দ্যাখ দ্যাখ, হোথায় আড়াল হয়ে গেলে মরদ খোঁজাখুঁজি করত। জ্যোৎস্না রাতে ঘুরে বেড়াত গাছের ছায়ায়—আকাশ চাঁদমালা হয়ে বিরাজ করত—এমন ভুবনমোহিনী রূপ তার যেন বনজঙ্গলে না থাকলে ডাকাত মানুষটি টের পেত না।

ভিতরে ঢুকতে ভয় করছিল পরীর। যেন ইটের পাঁজা সব খুলে মাথার উপরে পড়বে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, মেঝে পাকা। দেয়ালে সিমেন্ট বালির পলেস্তারা, একটা বনজ গন্ধ ঘরে।

শেষ দিকে নবমী ছাগলের দুধ আর বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত।

পিলু বলেছে, বাসাটাই যেন বুড়িকে আগলে রাখত। হয়তো নবমী যখের ভয়ে পড়ে না গেলে স্বামীর ভিটে ছেড়ে যেতই না। জঙ্গলেরও থাকে প্রাণ কিংবা ভালবাসা, আর সব প্রাণীসকলের মতো নবমীও ছিল এই জঙ্গলের একজন। শেয়াল, বেজি, গো-সাপ, এমন কি সাপ খোপও ছিল তার প্রিয় সঙ্গী। আর যখন যে গাছে ফল হত, যেন নবমীর হয়ে তারা ঝরে পড়ত নিচে। পিলু গেলেই বাবাঠাকুরের জন্য ফল প্রণামী দিত। বেল, কয়েতবেল, তাল, নারকেল, আম, জাম, গোলাপজাম—কত না বিচিত্র ফলের সমারোহ। কেউ জানতই না, এই কবরভূমি সংলগ্ন জমি সরকারের খাস, আর ভূত প্রেতের উপদ্রবে কত রাতে মানুষ তালকানা হয়ে গেছে, পথ হারিয়েছে—পথ হারালেই জঙ্গলের মধ্যে এলোপাথাড়ি ছুটতে গিয়ে দেখেছে, কোনো জরাগ্রস্ত উলঙ্গ রমণী গাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছে! এই বনজঙ্গলে ঘরবাড়ি ওঠার আগে অঞ্চলের মানুষেরা বনটায় ঢুকতেই সাহস পেত না। নবমী বলে এক যুবতী এই জঙ্গলে প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, নবমীর বন বলে খ্যাত, তাকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, যে দেখে সেই দৌড়ায়। পিলুই আবিষ্কার করেছিল, বনের গভীরে এক বুড়ি থাকে। চাঁদের বুড়ির মতোই ছিল প্রথম দিকে রহস্যময়—কিন্তু পিলুর বেজায় সাহস—নবমীর বনের ভিতর দিয়ে শহর থেকে সর্টকাট একটা রাস্তা সে খুঁজে বের করেছিল। রেল-লাইন পার হয়ে, নীলকুঠির

পরিত্যক্ত জঙ্গল পার হয়ে কবরখানা। কবরখানার ভিতর দিয়ে গেলেই নবমীর জঙ্গল। সেই কবে থেকে মানুষেরা নবমীর নিশীথে পরিভ্রমণকে কোনো ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড ভেবে তার এলাকা পরিহার করে চলেছে। পিলু যেদিন তাকে দেখেছিল, তারও কম ভয় ছিল না। এক হাতে কী একটা ফল কুড়িয়ে লাঠি ভর করে এগিয়ে আসছে। দৌড়, দৌড়। এক দৌড়ে গাছপালা জঙ্গল ফেলে সে বাড়ি ফিরে নাকি বলেছিল, বাবা, বনটায় না—তারপর আর কিছু বলতে পারেনি।

বাবা পাটকাঠির বেড়া বাঁধছিলেন। শুনে বলেছিলেন, বনটায় কী!

পিলু চোখ বড় বড় করে বলেছিল, বনের অপদেবী।

—বনের অপদেবী!

—হ্যাঁ বাবা। লাঠি ঠুকে ঠুকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—অপদেবী হবে কেন। চোখের বিভ্রম। অমন জঙ্গলে মানুষ আসবে কী করে! ভিতরে তো শুনেছি ঢোকাই যায় না। কেউ কেউ বলে নবমী বলে এক নারী এক কালে তার স্বামীকে নিয়ে থাকত। তারা তো সেই কবে হেজে মজে গেছে।

—না বাবা আছে। আমি দেখেছি।

বাবা হেসে বলেছিলেন, তুমি যে কত কিছু দেখতে পাও!

বাবার এই কথাটাই পিলুকে নাকি জেদ ধরিয়ে দিয়েছিল। শহর থেকে ফেরার পথে সে বাদশাহী সড়ক দিয়ে আসত না। তার কাছে বাদশাহী সড়কটাও ছিল রহস্যময়—এই রাস্তায় সিরাজদৌল্লা ঘোড়া ছুটিয়ে গেছেন পলাশীর মাঠে যুদ্ধ করতে। মোহনলাল মীরমদনের বাহিনী ছুটে চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। মীরজাফর হাতীর পিঠে। দামামা বাজছে। সেই রাস্তার পাশে অলৌকিক বনটা তাকে তখন নাকি আরও বেশি টানত। নিঝুম গাছপালা থেকে কেবল পাতা ঝরছে। খস খস শব্দ শুনতে পায়। সর সর করে কারা যেন লুকিয়ে পড়ে তার পায়ের শব্দ পেলে। আর ডাহুক পাখির কলরব কিংবা বনটিয়ার ঝাঁক কোথাও। কোথাও মৌমাছির গুঞ্জন। পিলু ভিতরে ঢুকলে নাকি বিচিত্র কীটপতঙ্গের আওয়াজ পেত। তার মনে হত বনের ভিতর এক অদৃশ্য বাজনা বাজে।

তার পরীদিকে দেখলেই পিলুর রাজ্যের সব খবর দেবার স্বভাব। বনটায় ঢুকলে তার গা নাকি ফুলে যেত। লোম-খাড়া হয়ে উঠত। ঝুপ করে সামনে কে লাফিয়ে পড়ল, আরে বিশাল একটা হনুমান। দলে দলে হনুরা তাকে দেখলেই কেমন বিস্ময়ে নাকি তাকিয়ে থাকত। তাকে কিছু বলত না। দু-একটা যে তাকে দেখার জন্য একবারে গায়ের কাছে চলে আসত তাও সে বলেছে। পিলু হনু দেখলে সাহস পেত। এরা তো মানুষের সমগোত্র। তা-ছাড়া রামের সেতুবন্ধনে এরা ছিল বলেই রাক্ষসের দেশ থেকে সীতাকে রামচন্দ্র উদ্ধার করতে পেরেছিল। সেও নাকি দেখেছে, জঙ্গলের ভিতর মানুষ চলাচলের একটা গোপন পথ তৈরি হয়ে গেছে। খুব খেয়াল করলে ওটা বোঝা যেত। পথটা অনুসরণ করতে গিয়েই সে নবমীর এলাকায় ঢুকে তাকে দেখে ফেলেছিল।

তারপর পিলু এই রহস্য আবিষ্কারের জন্য কতবার যে বনটায় ঢুকে গেছে। না কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। সে দেখতে পেত না নবমীকে। নবমী কী তখন মানুষের সাড়া পেলে ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ত!

সে তার খুশিমতো যে-সময়কার যে ফল, পেড়ে এনেছে। তালের দিনে তাল, এমন কী একবার জঙ্গলের মধ্যে একটা পাকা আনারসও সে খুঁজে পেয়েছিল!

কে গাছ রোপণ করে!

সে নারকেল নিয়ে আসত। ঝুনো নারকেল। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা নারকেল গাছ, একটা লিচু গাছ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করেছিল!

কে রোপণ করে!

সেই অনন্ত আগ্রহই পিলুকে কখন যে বনের রাজা বানিয়ে ফেলেছিল। কিংবা নবমী যখন বলে, মাঝে মাঝে সে দেখতে পেত কেষ্টঠাকুরের লীলা—সে নাকি তখন জোড় হাত করে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ত। তাকে দেখলে ঠাকুরের লীলা যদি আর দেখতে না পায়। এমন কী সে তার ছাগলটাকেও আড়াল করে রাখত। ...পিলুর যে কত কথা মনে হয়।

পিলু গাছে উঠে ডালে বসে থাকত। কখনও গাছের ছায়ায় হেঁটে বেড়াত। বেত ঝোপ থেকে বেতের ডগা নিয়ে যেত। নারকেল পেলে নিয়ে যেত। ঠাকুর পুণ্যবান—ফলমূল তার প্রিয় হবে বেশি কী। একবার দেখেছিল, ঠাকুর ঝুড়ি এনে সারা দিনমান, বন আলু তোলার জন্য মাটি সরাচ্ছে। বিশাল বন-আলুটা ঝুড়িতে ধরছে না। ওটা মাথায় তুলতে বেজায় কষ্ট। সহ্য হয়নি। লাঠি ভর দিয়ে কাছে যেতেই পিলু চমকে উঠেছিল—আরে সেই বুড়িটা।

পিলুর আত্মারাম খাঁচা।

নবমী কী বুঝে বলেছিল, জঙ্গলটায় এলেন যখন কৃপা করে, একবার কপালে মাথা ঠেকাতে দিন গো দা-ঠাকুর।

পিলু দৌড় মারবে কিনা ভাবছিল।

নবমী তারপর সত্যি গড় হয়ে পায়ের কাছে একটা ঝুনো নারকেল রেখে বলল, দা-ঠাকুর, মানুষ তো এ-বনে ঢোকে না।

পিলু বলেছিল, তুমি কে? তুমি নবমী। লোকে বলে হেজে মজে গেছে! মরে গেছে!

—আমি মরব কেন! বেঁইচে আছি।

—লোকে যে বলে জঙ্গলে ডাইনি থাকে।

—না গো দা-ঠাকুর। আমর ঘরে আমি থাকি! ডাইনি থাকবে কেন!

—তোমার ঘর আছে!

—আছে না। হুই উদিকটায়। আসেন দা-ঠাকুর। পায়ের ধূলা দিয়ে যান। আপনার পা-খান ছুঁতে দিন। বলেই সে গড় হয়েছিল ফের।

এর পর আর ভয় থাকে!

সে বলেছিল, তোমার ভয় করে না! কোথায় তোমার ঘর।

—বনজঙ্গলে থাকলে দা-ঠাকুর ঘর লাগে না গো। সব কথা শুনি। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। উৎপাত করলে ভয় দেখাই।

—ভয় দেখাও মানে।

—এই আছি, এই নাই। বলেই জঙ্গলে সহসা অদৃশ্য নবমী।

—এই নবমী, তুমি কোথায়।

নবমী ঝুপ করে ভেসে উঠেছিল জঙ্গল থেকে। ....পিলুর যে কথা কতা মনে হয়!

নবমীর পেটে পেটে তবে এত দুষ্টুবুদ্ধি। বনটায় লোকজন ঢুকলে তার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। সে নিজেই নানা রঙ্গ তামাসায় মেতে গেছিল। গাছপালা এবং অরণ্যের মোহ তাকে এত দিন জড়িয়ে রেখেছিল। সেই নারী শেষে যখের ভয়ে উঠে গেল পিলুদের বাড়ি।

মৃন্ময়ীকে যত গভীর অরণ্যে নিয়ে যাচ্ছে তত তার সব মনে পড়ছিল। পিলুই তাকে নবমীর গল্প করত। পিলুর তো গাঁজাখুরি গল্পের শেষ নেই—এও হয়তো তেমনি। কিন্তু সত্যি তবে নবমী বুড়ি আছে। আছে তার গভীর অরণ্য আর অরণ্যের প্রতি টান। আজ নবমীর সঙ্গে না এলে সে টের পেত না, কোনো নারী একা স্বামীর স্মৃতি আগলে যে কোনো দুর্গম এলাকায় বসবাস করতে পারে।

বার বার বিলুর মুখ ভেসে উঠছে।

সে যে কী করবে!

কোথায় খোঁজ করবে তার।

বছর তিন আগেও একবার বিলু নিখোঁজ হয়ে গেছিল। তখনও মেসোমশাই ছিলেন নির্বিকার। গেছে—আবার ফিরে আসবে। মেসোমশাইয়ের এত আত্মবিশ্বাস—কী করে হয়—সে জানে দৈব বিশ্বাসই এর মূলে। তার কাছে মানুষের জন্য এমন কী প্রাণীজগত থেকে সব গাছপালা—কী নয়, এক অদৃশ্য শক্তির খেলা। সেখানে কোনো লড়ালড়ি চলে না।

পিলু গেল কোথায়!

মিমি ডাকল, এই পিলু, কোথায় গেলি।

অনেক দূর থেকে পিলু সাড়া দিচ্ছে।

ওরা ওখানটায় কী করছে ভাই বোনে!

বেলা পড়ে আসছে। গাছপালার ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবং সে দেখল দূরবর্তী আকাশে বিশাল চাঁদের আবছা উপস্থিতি। পূর্ণিমা পার হয়ে গেছে, প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া—সাঁজ লেগে গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই পিলু বোধহয় জানে। পিলু কী এই অরণ্যের মধ্যে জ্যোৎস্নায় কখনও হাঁটাহাঁটি করেছে। তার ভয় না থাকারই কথা। কারণ নবমী বনটায় থাকলে—রাতের বেলায় সে অনায়াসেই ঘোরাঘুরি করতে পারে।

পরী বলল, তা হলে শেষে যখের তাড়া খেয়ে স্বামীর ভিটে ছাড়লে!

—হা মিমিদি।

ওরা হাঁটছিল। নবমী তার স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। নবমীর এই স্মৃতি ছাড়া আর কিছু যেন সম্বল নেই—যা সে মানুষের কাছে গর্ব করে বলতে পারে।

মিমি সব শুনছিল না। তাকে এখন আসলে যখ তাড়া করছে। সে বলল, নবমী, যখ তো গুপ্তধন পাহারা দেয়। তোমার ঘরে যখ কী করতে আসবে!

নবমীর কী মনে হতেই চুপ করে গেল। বাবাঠাকুর তো তাকে চোটপাট করেছে—কী তোমার ইট ক'খানা নিতে হবে! পারব না। কে নেবে! তোমার ছাগল নিতে হবে, আবার কাঠের পেটি নিতে হবে। এত বাহানা চলবে না। যেতে হয় একা চল। ছাগলটা নিচ্ছি।

কিন্তু নবমীর সেই কড়জোড়ে প্রার্থনা, পেটিখান ফেইলে যাই কী করে।

দা-ঠাকুরও কম চোটপাট করেনি। এখন যদি খবরটা জানাজানি হয়ে যায় তবে বাবাঠাকুর গোসা করতে পারেন। —নবমী, আমরা কী তোমার গুপ্তধনের লোভে বাড়ি এনে তুলেছি! বল! আমরা কী জানতাম, তুমি ইট ক'খানা পেটিতে পাহারা দিচ্ছ, গুপ্তধন আগলাচ্ছ আমরা জানতাম! পিলু তো সব ক'টা ইট জলে ফেলে দিতে গেছিল! দশ কান হলে ভাববে না, তোমার গুপ্তধনের খবর পেয়েই বাড়ি তুলে এনেছি, ঘর বানিয়ে দিয়েছি। পিলু মায়া প্রতিদানে তোমাকে বিকালে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনায়। তোমার সেবা যত্ন সব গুপ্তধন পেয়েছি বলে! বল, বল চুপ করে থাকলে কেন। বাবাঠাকুরের মুখ মনে পড়তেই নবমী কেমন চুপ করে গেল।

মিমি ফের বলল, যখ দেখেছ চোখে।

নবমী রা করছে না।

—যখ ঘোরাঘুরি করে টের পেতে কী করে!

নবমী রা করছে না।

—কী হল তোমার! কথা বলছ না!

নবমীর হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গেছে। মিমি ওটা তুলে দিল নবমীর হাতে। যখের কথা তুললেই রা করছে না। নবমীর মুখে সেই প্রসন্নতাও নেই।

নবমী যেন তার অজ্ঞাতেই সব ফাঁস করে দিচ্ছিল। কী যে হবে!

তখনই পিলু মায়া লতাপাতা ঝোপজঙ্গল সরিয়ে এদিকে ছুটে আসছে।—শিগগির মিমিদি এস, শিগগির।

—কেন!

—এসই না।

—কেন বলবি তো!

মায়ার মুখ শুকিয়ে গেছে।

পিলু হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মিমিদিকে। নবমীকে বলল, বোস। আমরা আসছি।

—কোথায় হাত টেনে নিয়ে যাচ্ছিস?

সামনে বিশাল এলাকা নিয়ে কবরভূমি। মিনার, পরিত্যক্ত মসজিদ, কবরের উপর শ্বেতপাথরের ফলক, কোথাও গম্বুজ আর যতদূর চোখ যায় গাছপালা, পরে লাল সড়ক, একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে, ঝোপ জঙ্গলের ফাঁক থেকে তাও দেখা যায়।

জায়গায় জায়গায় শুধু ঘাস। তার উপর দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আর কিছু দূর গিয়েই সে যা দেখল, তার আত্মারাম খাঁচা। তাড়াতাড়ি পালাতে চাইল মিমি।

পিলুর এই দুর্জয় সাহস তাকে কেমন বিচলিত করছে। সে কেবল বলছিল, সর্বনাশ!

—কিচ্ছু করবে না। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন!

বিশ পঁচিশ গজ দূরে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার জন্য পিলু তাকে এখানটায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পিলুর ভয় ডর কম। তাই বলে কাল নিয়ে খেলা!

মিমি দু-জনের হাত ধরেই ছুটতে চাইল। কিন্তু পারল না।

পিলু কেবল বলছে, সাপের সং। কিচ্ছু করবে না। দেখ না। আমরা তো কখন থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। তুমি আসছ না!

যেন পিলু এই গভীর বনের জন্মরহস্য আবিষ্কারের নেশায় এতক্ষণ তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরীদি আসছে না দেখে সে ছুটে এসেছিল—না দেখে গেলে, পিলু ভাববে, পরীদি কী ভীতু—আলিসান দুই ভুজঙ্গ একে অপরকে জড়িয়ে লতার মতো বেয়ে উঠছে।

ভাদ্রের শেষ বেলা—মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া। গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে পরীর শরীর কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। সাপের এই সহবাস তাকে কোনো গভীর অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের লীলায় সে অধীর। এখন ইচ্ছে করলেও সে নড়তে পারবে না। সে তাকিয়েই আছে। অবিরাম ঘাসের উপর বেয়ে বেয়ে দু'জনের এই সংলগ্ন হওয়া কোনো নারী পুরুষের উপগত হওয়ার মতো। ক্ষণিকের আশ্রয় উত্তাপ অথবা বিষবাষ্প থেকে আত্মরক্ষার সামিল—সাপ দুটো যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে, দু'জনে মুখোমুখি ফণা তুলে দুলছে, ছোবল দিচ্ছে ভূমণ্ডলের হৃৎপিণ্ডে, তারপর আরও ঘন, আরও আরও যেন দুটো দড়ি পাক খেয়ে কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বাতাসে ভর করে দাঁড়াচ্ছে—তারপর এক অপরূপ নৃত্য, ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নৃত্য। ফুলে ফুলে উঠছে শরীর। রোদে ঝকমক করছে তলপেট—এবং বরফের মতো সাদা পেটের সংলগ্ন স্থানে সহ-অবস্থান। শরীরে, রোমকূপে ঝড় তুলে দিচ্ছে।

বনভূমির কী যে থাকে সবুজ ঘ্রাণ, এই বেলায় বাতাসে তার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। পরীর চোখ বিস্ফারিত। রোমকূপে ঝড়। আকাশ বাতাস থেকে দেবদূতের মতো উঠে আসছে মাত্র একটি মুখ—সে এতই নিষ্পাপ, সে এতই ভীরু, তার যেন জোরজার করারও ক্ষমতা নেই। এখন আর চোখের সামনে কোনো কালভুজঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না। এবার পরী নিজেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল—ঠিক সাপের ভঙ্গিতে এই মোচড় তাকে পীড়নের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। চোখ লাল, কান গরম—এমন কী বালক-বালিকার সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গম দৃশ্য উপভোগ করা অশোভন—তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। শরীরের গভীর অন্তস্তল থেকে দ্রুত কী সব সংকেত পাঠাচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। ধক ধক করছে—বুক। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পিলুর কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে বলল, আমার কী হচ্ছে! জোর পাচ্ছি না। শিগগির আমাকে ধর। আমাকে নিয়ে পালা। আমি না হলে মরে যাব।

পিলু বলল, ভয় পাচ্ছ কেন! ওরা এখন কারো ক্ষতি করবে না। আমি তো ঢিল ছুঁড়েছিলাম। ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখ না কত ঢিল ছুঁড়েছি! আমাকে তাড়া করেছে? তবে ভয় পাবে কেন!

পিলু জানে না, পিলু বোঝে না, সরল বালক। সাপের সং দেখার সৌভাগ্য কম মানুষের হয়! সে বলল, জান পরীদি, ইস্ কী যে খারাপ লাগছে না। যাব দৌড়ে!

—কোথায় যাবি! কেমন ত্রাসের গলায় কথাটা বলল পরী।

—এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসব। জান সাপের সং-এর উপর নতুন গামছা ফেলে দিলে পুণ্য হয়। গামছাটা ঘরে রাখলে যার যা মনোবাসনা পূর্ণ হয়!

—কে বলেছে!

—বাবা বলেছেন।

—যাবি! অতি কষ্টে কথাটা বলল। সারা শরীরে ঘুমের মতো কী এক জড়তা নেমে আসছে।

আর তখনই দেখল সেই কালান্তক যম প্রায় পাশাপাশি ঘাসের বুক বেয়ে পরিত্যক্ত মসজিদে ঢুকে গেল।

পরী আর পারল না। বসে পড়ল। তার পায়ে জোর নেই। দু-জংঘার মাঝে অবিরাম নদী প্রবাহ প্রবল প্রতাপে ভেসে যাচ্ছিল। পরী বসে থাকতে পারল না। পরী ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। চোখ বুজে ফেলল। যেন সে এক গভীর অবশ অলস মুখর রাতে উপগত হবার পর তৃপ্তি নিয়ে শুয়ে আছে। সবাই চলে গেলেও তার কিছু আসে যায় না। রোমন্থনে সেই অমৃতের স্বাদ। সমুদ্র

কত গভীর এবং তার সুখে অবগাহন পরীকে বড়ই কাতর করে রেখেছে। হুঁস নেই।

—পরীদি! কী হল তোমার! ও পরীদি, ওঠো শরীর খারাপ লাগছে! ভয় কী। দেখ কিচ্ছু নেই। ও পরীদি, ওঠো।

পিলু দেখছে পরীদি চোখ মেলতে পারছে না। সে কেমন হায় হায় করে উঠল।

—নবমী, নবমী।

সে চিৎকার করে ডাকছে। নবমী বনজঙ্গলের ভেতর থেকে পিলুর ভয়ার্ত গলা পেয়ে ছুটে আসার চেষ্টা করছে। এসেই সে দেখছে পরীকে। শুয়ে, দিদিমণি অবশ।

পিলু সব বললে, নবমী ফোকলা দাঁতে হেসে ফেলল। পরীদিকে ডাকাতে ধরেছে গো। বসেন। ঠিক হয়ে যাবে।

জীবনের এই মাধুর্য পিলুর টের পাবার কথা নয়, নবমী জানে। নবমী তাকাল। এই অরণ্যের কোথায় সেই নিভৃত স্থান, যেখানে সে কত রাতে গাছের ছায়ায়, ঘাসের উপর ডাকাতের হাতে পড়ে উলঙ্গ হয়ে গেছে। সেই মাধুর্য জীবনে আর নেই—কিন্তু তার স্বাদ আজ যেন এক নারীর মধ্যে আবার খুঁজে পেয়েছে।

নবমী মাথার কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল শরীরে। বেশবাস কিছুটা আলগা হয়ে গেছে। দুই বালক বালিকা কেমন তাজ্জব। পরীদির হিস্টিরিয়া আছে কিনা জানে না। পরীদিকে যদি ভূতে ধরে। এত সুন্দর পরীদিকে নিয়ে কবরখানায় ঢুকে সে ভাল কাজ করেনি! কী যে করবে!

পিলু প্রায় ছুটে যেতে যেতে বলল, নবমী, তুমি বোস। মায়া, তুই থাক। বাবাকে ডেকে আনছি।

পরীর হুঁস ফিরে আসছে!

ছিঃ ছিঃ সে এটা কী করে ফেলল!

নবমী ডাকছে, যাবেন না গো দাদাবাবু। সে বলল, সাপের সং দেখে ভিরমি খেয়েছে। হুঁস ফিরে এসেছে। যাবেন না!

পিলু চঞ্চল স্বভাবের। সে দৌড়ে এসে দেখল, পরীদি উঠে বসেছে। মাথার চুল ঠিক করছে হাত দিয়ে। আঁচল দিয়ে শরীর ঢেকে দিচ্ছে।

পিলু হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হেঁটে যেতে পারবে তো।

কোটাল আসার মতো পরীর পরিতৃপ্ত মুখ। নিজেই উঠে দাঁড়াল। তারপর কী ভেবে আঁচল দিয়ে দ্রুত পেছনটা আড়াল দিল। একবার নিজেও পেছন দেখার চেষ্টা করল। আর তারপর পিলু না, আর ভাবতে পারে না! পরীদি ছুটছে। এক হাতে আঁচল কোমরের নিচে টেনে ধরে রেখেছে। আর ছুটছে। বাতাসে আঁচল উড়ে না যায়? পরীদি কোমরের পেছনে হাত রেখে শুধু বলছে, শিগগির আয়।

কেন এই চাঞ্চল্য পিলু বুঝল না।

নবমী গাছপালার মধ্যে দ্রুত হাঁটতে পারে না। তাকে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। পরী এটা বোঝে। সে শুধু বলল, আমি যাচ্ছি। তোরা আয়।

পিলু বলল, মায়া, তুই যা পরীদির সঙ্গে। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে রাস্তা খুঁজে পাবে না।

মায়া তাড়াতাড়ি ছুটছে। তার ফ্রক উড়ছিল, বাতাসে পরীদি টানা ছুটছে না। ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে দ্রুত ছোটাও যায় না। কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। আবার ছুটছে। আবার দাঁড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে, আবার ছুটছে। মায়াও পরীদির সঙ্গে ছুটছে, দাঁড়াচ্ছে, হাঁপাচ্ছে।

মায়া পরীদির এই মতিগতির কিছু অর্থ ধরতে পারছে না। আর বাড়ি এসে অবাক, পরীদি কাউকে না বলেই মা'র শাড়ি সায়া ব্লাউজ নিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল।

বাবা পরীদির ছুটে আসা দেখে কিঞ্চিৎ তাজ্জব হয়ে গেছিলেন। বললেন, ওরা কোথায়!

পরীদি জল ঢালতে ঢালতে বলল, ওরা আসছে।

নবমীও বাঁশতলা দিয়ে হেঁটে আসছে। বোধহয় জোর ছিল না—হাঁটতে আর পারছিল না। পিলু ধরে নিয়ে আসছে। এক হাতে নবমীর লাঠি। ফিরে এসেই নবমী ধপাস করে বসে পড়ল। এক গ্লাস জল খেল আলগা করে। বাঁ-হাতে মুখ মুছে দেখল, পরীদি চান করে ভিজা কাপড়ে বিলুদার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। নবমী কেমন প্রসন্ন গলায় বলল, তীর্থ করে এলাম বাবাঠাকুর।

—ভাল করেছ। মনে জোর পাবে। মানুষের দাঁড়াবার জায়গা একটা বড় দরকার। যখন মনে

হয় চলে যাবে। পিলু না যায় মায়াকে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবার লোকের তো অভাব নেই।

পরী ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছিল। সে ভাল নেই। জঙ্গলে যা হল! সে কেমন আশ্চর্য এক সুখ, ঠিক সুখও বলা যায় না, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তারও যে দরকার ছিল নিজেকে আবিষ্কার করার। কোনো পুরুষই একজন নারীর জন্য অপেক্ষা করে না। নারীও না। তবু কেউ অদৃশ্য ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে। সে তার পিছু হাঁটে। কোনো দুর্গম অঞ্চলই তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।—বিল্ব, তুমি কী চাও! আমাকে আর কত কষ্ট দিতে চাও। নিজে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। আমি কী ভাল আছি! এ কী শাস্তির মধ্যে ফেললে। এখন আমি তোমাকে কোথায় খুঁজব!

সাড়া শব্দ না পেয়ে বাবা বললেন, দেখ তো পিলু, মিমি কী করছে!

দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ হয়ে গেল। সহসা তিনি ত্রাসের মুখে পড়ে গিয়েই বলেছেন, হয়তো নিজেই দৌড়ে যেতেন। কেন এই ত্রাস তাঁর!

পিলু দরজা ঠেলে অবাক।

পরীদি দাদার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে সে বাবার কাছে ছুটে গেল। কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, বাবা, পরীদি না কান্নাকাটি করছে। বাবা বিস্ময়ের গলায় বললেন, কাঁদছে! কেন! শরীর খারাপ! তারপরই কী ভেবে বাবা মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। নিখোঁজ পুত্রের কথা ভেবে তাঁরও মন খারাপ হয়ে গেল। তবু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আজ তিনি কেন জানি পরীকে শুধু রায়বাহাদুরের নাতনি ভাবতে পারলেন না। সে এ-পরিবারের একজন। দরজার কাছে গিয়ে বাবা তাঁর ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি বললেন, বুঝলে মিমি, কেহ আত্মাকে আশ্চর্য মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে। আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না। কান্নাকাটি কর না। সে ঠিক ফিরে আসবে।

পিলু শুনছিল। সে জানে বাবা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় সাধু বাক্য বলেন।

সকালে পিলু আবার সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। দাদা না থাকায় সাইকেলটা নিয়ে সে যখন তখন বের হয়ে যেতে পারে। যখন খুশি ফিরতে পারে। মা বাবা কোনো ফরমাস করলে তার মেজাজ তখন আর অপ্রসন্ন হয় না। বরং সে অপেক্ষায় থাকে বাবা কী ফরমাস করবেন, মা'র কী দরকার। কাল সকালে দাদাকে বিছানায় না দেখে সাইকেলে প্রায় সারাটা দুপুর কাটিয়েছে। এটা যে কী মজা, যেন সে ঘোড়ায় চড়ে বসে—তারপর বাদশাহী সড়কে উঠে এদিক ওদিক—যেদিকে দু চোখ যায় ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে। দাদা বাড়ি না থাকায় ধমক খাবার ভয় নেই। বাবার ধারণা শরীরের মতো যন্ত্রও বসিয়ে রাখলে ঘুণে ধরে। ঘুণে ধরা ঠিক না। চলুক, যতক্ষণ চলছে চলতে দাও। থামলেই বিগড়াবার ভয় থাকে।

কাল সারাটা দিন পরীদিকে নিয়েই কেটে গেল।

আজ বাকি কাজগুলো তার করা দরকার। যেমন মুকুলদাকে খবর দিতে হবে। কেউ যদি কোনো নতুন খবর টবর পেয়ে যায়।

সে সড়কে উঠে গেলেই হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ট্রাক সামনে। যমদূত আসছে। সে রাস্তা ছাড়ছে না। ট্রাক, বাস দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাপের জায়গা! নিশ্চিন্তে সাইকেল চালাতে না পারলে মেজাজ আসে না। সে সড়ক ছাড়ছে না। ট্রাকটাকে পাকা রাস্তার বাইরে নামিয়ে ছাড়বে। সে পারেও। দুরন্তগতিতে ট্রাকের সামনে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে নেয়। বোঝো মজা! নামিয়ে ছাড়লাম শালা শূয়োরের বাচ্চা আমি! বোঝো এবার। সেও তখন মরিয়া হয়ে যায়। সেও ছেড়ে কথা বলে না। কোনো কারণে গরু ছাগল আনতে গেলে কিংবা সড়কের ধারে একা থাকলে ট্রাক দেখলেই একটা ইট কুড়িয়ে নেয়। ধাঁই করে মারে—তারপর মাঠ ধরে দৌড় আর দৌড়। ট্রাক থামতে থামতে বনজঙ্গলের আড়ালে পড়ে যায় সে।

বাবা একদিন শুনে তেড়ে এসেছিলেন—খুবই বিপজ্জনক খেলা। বার বার নিষেধ করছি! কখন

কী হয় বলা যায়! সাইকেল নিয়ে তো বের হও না, বাড়ির আত্মাটি হাতে নিয়ে বের হও। সময় মতো না ফিরলে কত দুশ্চিন্তা তুমি বোঝো!

এটা ঠিক। এটা তারও হয়। দাদা সাইকেলে শহরে যেত। ফিরত বেশ রাত করে। অপরূপার কত কাজ! তা ছাড়া পুলিশ মাঠে দাদাদের আড্ডা। কী নিয়ে যে দাদারা এত কথা বলে বোঝে না। ফিরতে একটু বেশি রাত হলেই সে সড়কের কাছে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। দুশ্চিন্তা। দাদার বেলায় এটা হত, নিজের বেলায় কেন তা হয় না বোঝে না।

আসলে ফাঁক পেলেই তার যে সাইকেল চড়ার নেশায় পেয়ে বসে। নেশা বিষম বস্তু। বাবা বলেছেন, একবার ধরলে আগাপাশতলা ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। তারও নেবে হয়তো। কে জানে—ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, যেই টের পাচ্ছে, পেছনে ট্রাকের হর্ন, তার যে কী হয়—পাল্লা। চালাও পানসি রানাঘাট—কে পারে দেখ! কে আগে যায় দ্যাখ! হলে কী হবে শেষ পর্যন্ত তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতেই হয়। ক্ষোভে জ্বালায় তখন তার একমাত্র ঢিল সম্বল। ট্রাক দেখলেই—মারো শালাকে। কে তার শত্রু ঠিক অবশ্য জানে না। ট্রাক না ট্রাকের ড্রাইভার। বড় হয়ে সে ভেবেছে, ট্রাকের ড্রাইভার হবে। এই একটা বাসনা আছে। কত কত সব দূর গঞ্জ, পাহাড়তলি কিংবা শস্যক্ষেত্র পার হয়ে চলে যাবে। নদী, মাঠ, সেতু পার হয়ে সে চলে যাবে। সটান বসে থাকবে—হু হু করা বাতাসে তার চুল উড়বে—স্বপ্ন স্বপ্ন। সাইকেলেরই এত নেশা, আর ট্রাকের নেশা কী না জানি।

—আরে পিলু যে! আয় আয়।

মুকুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল। মুখে পেস্টের ফেনা। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে বলে, মুখের ফেনা ফেলে এগিয়ে গেল, গেট খুলে দিল। ভোর রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। বাগানের এখানে সেখানে জল জমে আছে। শরতের আকাশ, সকালের রোদ, রাস্তার কদমগাছ—এবং চারপাশে সবুজের সমারোহে সে বেশ প্রসন্ন। শারদীয়া অপরূপার প্রস্তুতি চলছে। বিল্ব হয়তো কোনো জরুরী খবর দিয়ে পাঠিয়েছে পিলুকে। ওর তো মতিস্থির নেই। হয়তো কোনো লেখা পছন্দ, প্রেসে দিয়ে দাও, আবার বিকেলে ডাকে আসা কোনো লেখা পছন্দ হয়ে গেল তো ওটা ফেরত নিয়ে এস। পরে দেখা যাবে। তা ছাড়া সে যেমন ভাল নেই—চৈতালি কলকাতায় চলে যাবার পর থেকেই মনমরা, আসলে তো কাগজটা বের করার এত উৎসাহ একমাত্র চৈতালি—সেই নেই। বিল্বও ভাল নেই। মিমির সঙ্গে বোধহয় বড় রকমের খিটিমিটি বাধিয়ে বসে আছে। কিছুতো বলে না! চাপা স্বভাবের।

পিলু বলল, জানো মুকুলদা, দাদা না কোথায় চলে গেছে। তোমাকে কোনো খবর দিয়ে গেছে! কোথায় উঠবে! কোথায় থাকবে।

—বলিস কী! কোথায় গেল বলে যায়নি! কখন গেল। ওর যে কী হয় মাঝে মাঝে বুঝি না।

—না। একটা ... বলেই থেমে গেল। বাবা কেন যে চিঠির কথা ফাঁস হতে দিতে চান না, সে বুঝছে না। চিঠিতে দাদা পরীদিকে জড়িয়ে গেছে। খুবই নাকি কেলেঙ্কারি ব্যাপার। দাদা তো খারাপ কিছু লেখেনি। তার জন্য পরীদিকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে—খারাপ তো লাগবেই!

মুকুল বলল, ভিতরে আয়। কবে গেল! কখন গেল। তুই চুপ করে আছিস কেন। মেসোমশাই থানায় গেছে? এতো ভারি ঝামেলা। কত কাজ অপরূপার। না বলে না কয়ে ফের উধাও। পাগলা আছে সত্যি। কোথায় যাবে কিছুই বলে যায়নি!

—না।

তার এই প্রিয় বন্ধুটি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যেতেই মুকুল কেমন কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল। দু'জনের দুটো প্রিয় সাইকেল, দুই প্রিয় নারী, কবিতা চর্চা, অর্থাৎ স্বপ্ন, বিল্ব এ-শহর ছেড়ে চলে যেতে পারল! দু'দিন দেখা নেই, ভাবছিল, আজই যাবে, কেন যে এটা হয়! যেন কোনো এক আশ্চর্য অমোঘ বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে। দু'জনে কতদিন চুপচাপ বসে থেকেছে বড় মাঠে—কিংবা রেশম কুটির জঙ্গলে ঢুকে গাছপালার ছায়ায় হেঁটে গেছে—দু'হাত উপরে তুলে গলা ছেড়ে কবিতা আবৃত্তি, নিজেদের কবিতা পাঠ আর কখনও সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে নির্জন রাস্তায় কোনো বৃক্ষের ছায়া পেতে কী যে ভাল লাগত! সে নেই, নিখোঁজ। বুকটা কেমন তোলপাড় করে উঠল।

—বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল!

—না।

তারপরই মনে হল সে মিছে কথা বলছে। বাবার হম্বিতম্বি—গায়ে হাত, দেবীর গায়ে হাত, এ-যে মহাপাপ।

কিন্তু পাপের কথা তো বলা যায় না। তবে যে সে তার বাবাকেই ছোট করে ফেলবে। দাদাকেও। সে বলল, না মানে, মন কষাকষি চলছে। তুমি তো জান, আমার বাবা কি রকমের।

—মিমি জানে।

—হ্যাঁ কাল তো মিমিদি আমাদের বাড়িতেই ছিল।

—তোদের বাড়িতে!

পিলু বুঝল না, এতে দোষের কী আছে। তারা গরীব। কিন্তু পরীদি তো গরীব লোকদের খুব ভালবাসে। বাড়িতে কত দাপট তাও সে অনেকবার দেখেছে। বাবা কত করে বললেন, তা হয় না, তুমি বাড়ি যাও। পিলু সঙ্গে যাবে। অবশ্য পিলু জানে, পরীদি একাই যেতে পারে। তার দুর্জয় সাহস।

—সকালে বাড়ি চলে গেল। পিলু বলল।

—চল তো পরীর কাছে। বলেই মুকুল সাইকেল বের করতে গেলে বলল, পরীদিকে পাবে না। কোথায় যেন যাবে। নাটক আছে।

মুকুল জানে পরী মহেশ নাটকে আমিনার পার্ট করে। কিছুদিন তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছিল না তাও জানে। পরেশচন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে। বিবাহযোগ্যা কন্যা হলে যা হয়। পরী থম মেরে বাড়িতে এতদিন বসেছিল, ভাবলেই অবাক লাগে। তবে পরী আবার বিদ্রোহ করেছে!

মুকুল কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে গেট থেকেই দৌড়ে গেল। বারান্দায় উঠে বলল, বৌদি, শুনছ বিলুর কাণ্ড। সে নাকি আবার ভেগেছে।

বৌদি দাদা সবাই বের হয়ে দেখল, পিলু তখনও বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে।

—ভিতরে এস। ওখানে কেন!

—না আমি যাই। সুধীনদা, নিখিলদাকে যদি কিছু বলে যায়।

মুকুল সাইকেল বের করছে। সে কেমন জলে পড়ে গেছে। পিলুর কথাও মনে নেই। কিন্তু পিলু বলছে, যদি কিছু বলে যায়। তাকে কিছু বলল না, পরীকেও না, নিখিল, সুধীনদাদের কিছু বলে যাবে বিল্ব সেই ছেলেই না। সে বলল, দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

বৌদি বলল, কিছু মুখে না দিয়েই বের হচ্ছ! পিলুকে ডাক। কিছু খেয়ে বের না হলে অশান্তি হবে। সে পিলুকে ডেকে বলল, আয়। ভেবে আর কী হবে। সেবারেও তো কোন এক ছোড়দির খবর পেয়ে মেসোমশাই বিল্বকে আনতে চলে গেলেন। ওর যা স্বভাব, আর যা চেহারা, ছোড়দির অভাব হবে না। অযথা মাথা গরম করে লাভ নেই।

পিলু তবু ঢুকল না। কারণ সে তো ভাল নেই—যতই এই শহর, এবং বোস্টাল জেলের পাঁচিল পার হয়ে কোনো দিগন্ত-প্রসারিত মাঠে পড়ে যেতে ভাল লাগুক, সাইকেলের নেশা থাকুক—তবু দাদার জন্য আজ কেন জানি তার কিছু ভাল লাগছে না।

—না আমি যাই।

পিলু কিছুতেই ভিতরে ঢুকল না। দাদা যা মানুষ, যদি কোনো প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকে! যদি স্টেশনে এসে মনে হয়—কাজ ঠিক করেনি। বাড়ির কথা, পিলুর কথা ভাবলে, দাদা শেষে কোথাও নাও যেতে পারে। লজ্জায় হয়ত বাড়ি যেতে পারছে না। চিঠি লিখে গিয়ে কে আর ফিরে আসে। মান মর্যাদা যে খোয়া যায়।

তার হাতে এত কাজ মুকুলদার সঙ্গে আটকে গেলে আজকের দিনটাও নষ্ট হবে। কোথায় কোথায় চলে যাবে—তারপর তার আসল কাজটাই হবে না।

সে সাইকেলে যাচ্ছে। কে পেছন থেকে ডাকল, এই পিলু, তোর দাদা নাকি নিখোঁজ।

পিলুর মাথা গরম হয়ে যায়। কলোনির সুবোধদা। কাপড়ের দোকান আছে মীরা সিনেমার সামনে। দোকান খুলতে যাচ্ছে। খবরটা তবে বাতাসের আগে উড়ছে। নিখিলদা বাড়ি নেই। সুধীনদা বাজারে গেছে। তবে মুকুলদা ঠিক খবর দেবে। তার এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ, দুটো স্টেশনে খোঁজ নেওয়া।

পিলু বাবার নির্বিকার স্বভাব পায়নি। সে তার আয়ত্তের মধ্যে যতদিন দাদা না ফিরছে, ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাবে। আর তার কেন যে মনে হয় স্টেশনে গেলেই দেখতে পাবে দাদা দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। কেউ ডেকে না নিয়ে গেলে দাদা যেতে পারছে না। সে গেলেই দাদা সুটকেস হাতে নিয়ে তার সঙ্গে রওনা হবে।

এই সব আশার কুহকেই সেবারে সে রোজ গাড়ি এলেই স্টেশনের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এটা এত বেশি প্রচার হয়ে গেছিল, যে দাদা সেই ভয়ে চিঠিতে লিখে গেছে, আমার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। মন মানে! দাদা তুই এত অবুঝ। তুই বুঝিস না, বাড়ি না থাকলে আমাদের কত কষ্ট !

সে স্টেশনে সাইকেল তুলে প্ল্যাটফরম ধরে হেঁটে গেল। যাত্রীর ভিড়। সাড়ে আটটার ট্রেন ছাড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হয় দূরে ঐ তো দাদা দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় চুল, পাজামা পাঞ্জাবি পরা। সে কাছে গিয়ে নিরাশ হয়ে গেল। দাদা না। সে উঁকি দিয়ে মুখ দেখতে দাদার বয়সী মানুষটা বলল, খোকা, কিছু বলবে।

সে লজ্জায় পড়ে যায়। ওয়েটিং রুমের ভিতরে উঁকি দিল, তারপর মনে হল বাথরুমে থাকে যদি। সে বাথরুমের দরজা ঠেলেও দেখল। এটা তার কেন হয়! দাদা না ফিরে আসা পর্যন্ত সে বাড়িতে এখন এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে না। দাদা যদি না ফেরে কলকাতায় চলে যাবে। কলকাতায় গিয়ে খুঁজতে শুরু করবে। কিন্তু সে তো খুব বেশিদূর যায়নি। বাবা মাঝে মাঝে এ-দেশে এসে উধাও হয়ে যেতেন। তাঁর শিষ্য যজমান আত্মীয়রা কে কোথায় এসে উঠল খোঁজ-খবর নিতেন। বাবার তখন ট্রেনে টিকিট লাগত না। উস্বাস্তু মানুষের কাছ থেকে নাকি রেলের ভাড়া নিতে নেই—এই বিশ্বাসে বাবা সহজেই এখানে সেখানে চলে যেতে পারতেন। দু-দিনের বলে বের হতেন—ফিরতেন পক্ষকাল পরে। মা'র চোপার ভয়ে বলতেন, আর বল না নেত্যকালীর সঙ্গে ট্রেনে দেখা। সেই ধরে নিয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়ল না।

মাধবদির সরকাররা পূর্বস্থলীতে এসে উঠেছে। নিয়ে গেল। সেখান থেকে রানাঘাটে। হাইজাদির রাঘব ঘোষ কিছুতেই ছাড়ল না, এত বড় পাবদা মাছ, প্রায় হাতখানা মেলে ধরে পাবদা মাছের সাইজ দেখিয়েছিলেন। এ-দেশে এসে এত বড় পাবদা বাবা খাননি, পাবদা মাছ খাবার লোভেই বাবা বিনা নোটিসে থেকে গেলেন। পিলুর তখন মনে হয় বাবাও কম পেটুক না। তারপর বাবার এক কথা, রাঘব খুব আদর যত্ন করল। ছেড়ে আসি কী করে! এমন সব গল্প শুনে পিলুর মনে হয়েছিল বড় হলে রানাঘাটে যাবে। অনেক স্টেশনে কিংবা প্ল্যাটফরমে রাত্রিবাস তাদের তখন নিত্যকার ব্যাপার। সে বিছানায় উঠে বসেছিল তড়াক করে। বাবার পাবদা মাছ খাওয়ার গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। নানা জায়গায় তারা ঘুরেছে এ-দেশে এসে। রানাঘাট জায়গাটায় গেছে কিনা বলতেই বাবার জবাব, যাবে না কেন! দেশভাগের পর রানাঘাটের উপর দিয়েই তো এলাম।

তারপরের প্রশ্ন ছিল, রানাঘাট কতদূর! সেখানে আবার যাওয়া যাবে কি না। কারণ গেলে বড় পাবদা মাছের ঝোল খাওয়া যাবে—পিলুর এমন মনে হত। রানাঘাটে তার যাওয়া হয়নি। তিন চার বছরের উপর বনজঙ্গলে বাড়ি ঘর করার পর কোথাও আর যাওয়া যায় তাও সে এখন বিশ্বাস করে না। কিন্তু বড় হয়ে রানাঘাট যাবে—এই উচ্চাশা সে এখনও পোষণ করে থাকে। বেগে সাইকেল চালাবার সময় তার লক্ষ্য, চালাও পানসি রানাঘাট।

যার রানাঘাটই যাওয়া হয়নি, তার পক্ষে যে কলকাতা জায়গাটা খুব নিরাপদ নয় পিলু তা বোঝে। সে কাশিমবাজার স্টেশনে ঢুকে খুঁজল। কোনো বেঞ্চিতে কেউ শুয়ে নেই। সব ফাঁকা। কেবল কিছু কাক দূরের গো-ডাউনের মাথায় কা কা করছে। সে কেমন ক্রমশই নিরাশ হয়ে যেতে থাকল। বাকি থাকল, সেই রেশম কুটির জঙ্গল। যেখানে দাদা সারাদিন একটা গাছের নিচে শুয়েছিল। পরীদিকে মেরে আসার পর জঙ্গলটায় ঢুকে গাছের ছায়ায় চুপচাপ শুয়েছিল।

রেশম কুটির জঙ্গলটা রেললাইনের ধারে। সে সেখানে ঢুকে গেল। বড় বড় তুঁত গাছ, নীল সবুজ ঘন পাতা—রেশম গুটির চাষ। কেমন গভীর নির্জন। গাছপালার মধ্যে কোনো মানুষের সাড় পাওয়া যায় না। তবু তার সেই আশা কুহকিনী—সে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় চিৎকার করে উঠল, দাদারে!

না কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

সে গলা ফাটিয়ে ডাকছে, দাদারে!

না কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে। ঘাসের মধ্যে কীটপতঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ট্রেন চলে গেল হুইসিল দিতে দিতে। মালগাড়ির ঝকর ঝকর শব্দ। দূরে বাসের হর্ন বাজছে। সব এত স্বাভাবিক, সব এত ঠিকঠাক, কেবল তাদের সংসারেই দাদা আগুন ধরিয়ে কোথায় যে চলে গেল! তার চোখ ফেটে জল আসছিল। সে ছাড়বে না, দাদা কী ভেবেছে! তারা মানুষ না, যা খুশি করবে! সে কেমন পাগলের মতো কেবল ডাকছে, দাদারে তুই ফিরে আয়। পরীদি তোর বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তোর কোনো মায়া দয়া নেই !

পিলু আসলে দাদার এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিতে এর চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। তার আর কোনো বড় সম্বল নেই। জ্বালা ক্ষোভের যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিল। গাছের ডাল ভাঙছে। যা কিছু সামনে পড়ছে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কাক পক্ষী দেখলে তেড়ে যাচ্ছে। তোমরা সুখে থাকবে, উড়বে—ওড়া বের করছি! আর ডাকছে, দাদারে। যেন সে দাদাকে পেলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেত। গাছের ডাল ভেঙে ভাল ছিল না, পাখি তাড়িয়ে ভাল ছিল না—কী ভাবে যে সে খুঁজে বের করবে!

একদিন বাবা বললেন, বুঝলে পিলু, এটাই তোমার কুঅভ্যাস! ভাল না। দাদা ফিরে আসছে না কেন, আমরা কী করব! তোমার খোঁজার পালা শুরু হয়ে গেল। সে কী এখানে আছে! জান পৃথিবীটা কত বড়। এর সাতটা সমুদ্র আছে জান। হিমালয় পাহাড় আছে জান। পাঁচটা মহাদেশ আছে জান? কুমেরু সুমেরু আছে জান! এত বড় পৃথিবীতে লুকিয়ে থাকলে কার বাপের সাধ্যি আছে খুঁজে বের করে। সে নিজে ফিরে না এলে আমরা কিছু করতে পারি না। খোঁজাখুজি সার। তুমি বের হবে না বলে দিলাম।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সে সাইকেল বের করছে। সে রেলে চড়ে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত গেছে। ভাবদা সারগাছি গেছে। সে এই করতে করতে কতদূর যেতে পারে একবার দেখবে। কলকাতায় দরকার হলে চলে যাবে।

মায়া বলল, ছোড়দা, যাস না। সারাদিন টো টো করে কোথায় ঘুরিস, খাওয়া নেই, তোর ঘুরতে ভাল লাগে। কষ্ট হয় না। মা কাঁদে। আমার কপাল এই। যাও একটু সুখের মুখ দেখলাম, এখন দু'জনের এই মতিগতি। কেউ কারো কথা শোনে না।

পিলু যাবেই—অগত্যা বাবা আর কী করেন। তাঁর আজ দুর্গা নবমীর ব্রত আছে। সকাল সকাল বের হতে হবে। স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। তখনই পিলুর মাথায় ক্যাড়া উঠে গেল। সাইকেল বের করতে দেখেই বললেন, আরে তোমার দাদা তো লিখে গেছে, তোমার এই কুঅভ্যাসটি তো তার জানা। তোমাকে কী লিখে গেছে বল!

যেন বাবা পড়া ধরছেন।

পিলু ছাত্রের মতো বলল, স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে নিষেধ করে গেছে।

—তবে!

খড়মের একটা বাউলি খুলে গেছে। বাবা খড়মে বাউলি ঠুকে দিতে দিতে বললেন, তবে, বুঝছ সে তোমার মতো অবিবেচক নয়। সে জানে। তাকে নিয়ে তোমার মাথার ক্যাড়া উঠে যাবে। এ-জন্যই নিজের হস্তাক্ষরে লিখে গেছে। গুরুত্বটা তার বুঝছ।

পিলু জানে তাদের বাবা এ-রকমেরই। ঈশ্বর ছাড়া তাঁর কোনো আর অবলম্বন নেই। না হলে সেই কবে এমন একটা বনজঙ্গলে ঘরবাড়ি বানাতে সাহস পায়! ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। সামনে পুলিশ ক্যাম্প ছাড়া আর কোনো মানুষের বসতি নেই। রাতের বেলা বেড়ার পাশে শেয়াল খাটাস ঘুরে যায়। পুলিশ ক্যাম্পও খুব কাছে না। পানীয় জল আছে, প্রথমেই সেদিন বাবার ছিল এই আপ্ত বাক্যটি সার। কপর্দকশূন্য মানুষের যা হয়ে থাকে।

—এখানে ঠাকুরকর্তা ঘরবাড়ি বানালেন। কে আছে?

—কেন, ঈশ্বর আছেন। গাছপালা বনজঙ্গল আছে। মাটি আছে। আকাশ আছে। হাওয়া আছে!

কী নেই বল?

সুতরাং এমন বাবার সঙ্গে তার তর্ক করা বৃথা। সে সকালে এক পেট পান্তা খেয়ে আর কোনো কথা না বলে সাইকেলে বের হয়ে গেল!

বাবা বিরক্তিতে বললেন, যত্তসব! খুঁজবেন! বের কর খুঁজে। দেখি কী করতে পার। আরে তাঁর মর্জি না হলে, তোমার দাদা নিখোঁজ হন! তাঁর মর্জি না হলে, তিনি কখনও ফিরে আসেন।

একদিন মিমি হুড়মুড় করে রিকশা থেকে নেমে ছুটে এল। পিলু দেখছে, পরীদি কেমন রোগা হয়ে গেছে। এর আগেও প্রায়ই খবর নিয়ে গেছে, আর খবর শুনে মুখ কালো হয়ে গেছে। ফেরেনি। কোনো চিঠিও দেয়নি। পরীদি তারপরও বলেছে, মেসোমশাই ভাববেন না—আমি বসে নেই। লোক লাগিয়েছি। কলকাতায় আমাদের কাগজের জানাশোনা ছেলেরা আছে। ওদের সব খুলে লিখেছি। সম্ভবত বিলু কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। কফি-হাউসে খোঁজখবর নিতে বলেছি। খবর পেলেই চলে যাব।

—তুমি চলে যাবে কেন? তোমার দাদামশাই দুঃখ পাবেন। আমিই যাব। কলকাতায় আমি গেছি! ভাববে না, আমি কলকাতা চিনি না। মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। মা বাবার কথা সহ্য করতে পারে না। বলল, তুমি গেলেই হয়েছে। বাপ বেটা দু'জনকে খুঁজতেই তখন আবার পরীকে হন্যে হয়ে ছুটতে হবে।

বাবা পরীদির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, বোঝো! অর্থাৎ যেন বলা, বোঝো আমি কী শান্তিতে আছি।

সেই পরীদি রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নামল। শাড়ি সামলে এক হাতে ছুটে আসছে জাম গাছতলার নিচ দিয়ে। পিলু বারান্দায় মাদুর পেতে পড়ছিল। আর তখনই রিকশার ঘন্টি বাজছে—সে দেখছে রাস্তা থেকে পরীদি ছুটতে ছুটতে আসছে। মুখে চোখে উত্তেজনা! পরীদি কী দাদার খোঁজ পেয়েছে! সে চিৎকার করে বলল, বাবা, পরীদি আসছে। সেও পরীদির কাছে ছুটে গেল। দাদার নিশ্চয়ই কোনো খবর আছে। না হলে এ-ভাবে কেউ ছুটে আসে না। আর তখনই মাথায় পোকা ঢুকে যায়, কোনো খারাপ খবর নয় তো! পরীদি তো সাইকেলে আসে। কলোনিতে পরীদি পার্টির কাজ করে বেড়ায়। কার লোন বের হয়নি, কার ক্যাসডোল মেলেনি, কারা নতুন এল—বসতি কোথায় দেওয়া হবে, নানা কাজে এখন পরীদি আসে। মাঝে মাঝে রাত বেশি হয়ে গেলে শহরে ফেরে না। দাদার ঘরে মায়াকে নিয়ে শোয়। সে তখন বাবার পাশে শুয়ে থাকে। সেই পরীদি রিকশাতে। খুবই জরুরী খবর—না হলে রিকশায় যেন আসতে পারে না। কাছে আসতেই দেখল পরীদির চোখে মুখে উচ্ছ্বাস। ঠিক এই পরীদিকে পিলু চেনে না।

সে বলল, পরীদি তুমি! দাদার কোনো খবর পেলে!

পরীদি বলল, পেয়েছি!

পিলু লাট্টুর মতো পাক খেয়ে বলল, মা মা, বাবা বাবা—মায়া, দাদার খোঁজ পাওয়া গেছে।

বাবা ঘরে কিছু করছিলেন। করছিলেনটা আর কী! তাঁর গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটা ঘাঁটছিলেন। যখন তিনি অথৈ জলে পড়ে যান, ওটা করে থাকেন। এরই ভিতর তাঁর টাকা পয়সা গোঁজা থাকে। কেউ ধরলেই ক্ষিপ্ত হয়ে যান। পুঁটুলিটা তাকের উপর তুলে রাখেন। বাড়িতে ঠাকুর দেবতার পর এই পুঁটুলিটাই বাবার সব। সিঁদুর মাখা একটি রুপোর টাকাও থাকে পুঁটুলিতে। টাকাটা বাবা দেশ থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। মাথা নেড়া একজন মানুষের মুণ্ডুর ছাপ টাকাতে। সে একবার গোপনে খুলে টাকাটা হাতে নিয়ে দেখেছিল। তাঁর পোঁটলা কেউ ধরলেই টের পান। সেদিন বাবা অগ্নিশর্মা। আমার গৃহলক্ষ্মীর উপর কার দয়া হল! কে ধরেছে! কেউ স্বীকার করে না। সেও না। বাবা গজগজ করছিলেন, আমার জিনিসে কার যে এত দরকার বুঝি না। কিছুই খোয়া যায়নি—কিন্তু কিছুতেই বাবার মেজাজ প্রসন্ন করা গেল না সেদিন।

দাদার খবর পাওয়া গেছে শুনে সবাই ছুটে বের হয়ে এলেও বাবাকে দেখা গেল না। নবমী পর্যন্ত তার ঘর থেকে বড় দাদাঠাকুরের খবর পাওয়া গেছে শুনে গুড়ি মেরে বের হয়ে এসেছিল। কেবল বাবার সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

পরীদি ছুটে এসে বারান্দায় বসে গেল। মাটি উঁচু করে ঘরের বারান্দা। গোবরজলে নিকানো।

পরীদির এই স্বভাব। মাটির দাওয়ায় বসলে আকাশের নক্ষত্র নাকি খুব কাছে দেখা যায়। অদ্ভুত সব কথা। পরীদি উচ্ছ্বাসে প্রায় যেন ভেঙে পড়েছে। মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এক গ্লাস জল খাওয়া।

কী খবর কিছুই বলছে না। কোথায় আছে দাদা তাও বলছে না। পিলু অপেক্ষা করছে উঠোনে—দাদা কোথায় আছে? কবে আসবে? কিন্তু পরীদি কিছুই বলছে না দাদার সম্পর্কে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, মেসোমশাই বাড়ি নেই!

ভিতর থেকে গলা পাওয়া গেল, যাই। দেখ না, কোথায় যে রাখলাম!

খুবই জরুরী কিছু বাবা হারিয়ে বসে আছেন। দাদার খবরের চেয়েও জরুরী বিষয় বাবার এখন আর কী থাকতে পারে পিলু বুঝতে পারছে না। এমন কী অমূল্য নিধি তাঁর হারিয়েছে যা দাদার খবরের চেয়ে বড়। পরীদি যতবারই এ-বাড়িতে এসেছে—দেখেছে বাবা ঝোপজঙ্গলে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত। আগাছা সাফ করছেন। গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছেন। সেই বাবা ঘরের ভেতর কী করছেন এখন কে জানে! পরীদিও হয়েছে, বাবা বারান্দায় এসে না বসলে যেন কোনো খবরই কাউকে দিয়ে লাভ নেই।

পিলু আর পারল না, দাদা তোমাকে চিঠি দিয়েছে!

—তোর দাদাকে এই চিনলি এত দিনে! সে চিঠি দেবে! তা-হলেই হয়েছে। সে চিঠি দেবার পাত্র!

—তবে কে জানাল? তুমি কলকাতায় গেছিলে!

পার্টির মিছিল গেলে পরীদি কলকাতায় যায়। পরীদি এমনিতেও যেতে পারে। কলকাতায় তার কাকা থাকেন, এক পিসি থাকেন। তাদের বাড়ি ঘর আছে। বেড়াতে যেতে পারে। কত কারণেই পরীদি যখন তখন কলকাতায় চলে যেতে পারে। এক-দু'দিন থেকে ফিরে আসতে পারে—যদি সেখানে দাদার কোনো খবর পায়।

পরীদির হাতে সুন্দর মলাটের একটা বই। এত যত্ন করে রেখেছে, এবং কোলের উপর রেখে যাতে ভাঁজটাজ না পড়ে—যেন এই বইটা পরীদির কাছে বাবার চণ্ডীস্তোত্রের চেয়ে মূল্যবান। কারণ পরীদি আঁচল দিয়ে এরই মধ্যে মলাটে ধুলোবালি না লাগে, মুছে আবার নিজের মুখ মুছল। কার্তিকের বেলা—রোদের তাপ কম—তবু পরীদি ঘামছে। এত যত্নে আলতো করে আঁচলে বই-এর মলাট কেউ মুছে দেয় পিলু এই প্রথম টের পেল। নিজের মুখের চেয়েও দামি বই-এর সুন্দর মলাট—এমনই মনে হল তার।

বাবা বিরক্ত হয়ে যেন এবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে বললেন, তা হলে শ্রীমানের খবর পাওয়া গেল। আসার কোনো খবর দেয়নি!

পরী বলল, না তা দেয়নি। খবর পাওয়া যায়নি!

—কী বলছ। এই যে পিলু গলা ফাটিয়ে বলল, দাদার খবর পাওয়া গেছে।

—তা পাওয়া গেছে।

—সেটা কী! বাবার কেমন তিক্ত গলা।

পরী যত্ন করে পত্রিকাটা এগিয়ে দিল।

—এটা কী! এটা দিয়ে আমি কী করব!

—কলকাতার খুব বড় কাগজ।

—কী আছে এতে?

—বিলুর কবিতা!

—কবিতা!

পিলু দেখল বাবার চোখ মুখ কুঁচকে গেছে। পরীদি কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। এটা তাহলে বই নয়। পত্রিকা। দাদার কোনো খবর নেই। দাদার কবিতা ছাপা হয়েছে। বাবা যে এতে কুপিত হবেন বোঝাই যায়। দাদার কবিতা নিয়ে বাবার যত ক্ষোভ। গোল্লায় গেল। মাথায় পোকা ঢুকে গেছে। আখের সর্বনাশ!

পরীদি বলল, বিলুর কবিতা ছাপা হয়েছে।

—ছাপা হয়েছে তো আমি কী করব।

—কত নামি কাগজ মেসোমশাই—।

যেন পরীদির এত দিনে জীবন সার্থক। পিলু জানে, দাদা বন্ধুদের গর্ব—দাদা পরীদির আবিষ্কার। পরীদিই ব্লেকমেল করে দাদাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়েছে। ব্লেকমেল কী পিলু জানে না। তবু দাদার সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেলে, পরীদি চেঁচিয়ে বলত, আমি তোমাকে কবিতা লেখার জন্য ব্লেকমেল করেছি বিলু!

—হ্যাঁ করেছ। কে যায় ও-পথে। তুমিই তো অযথা ভয় দেখালে। প্রতারণা করেছ।

—প্রতারণা! তোমার সঙ্গে!

—কার সঙ্গে তবে! তোমার তো একজনই আছে প্রতারণা করার লোক। তুমি বলনি, বলে দেব।

—কী বলে দেব বলেছি।

—আমি যে গ্যারেজ থেকে গোবিন্দের কৌটা ভেঙে কুড়ি টাকা নিয়ে সেবারে পালিয়েছিলাম বলনি! বলনি, আমি চোর। চোরকে কালীমন্দিরের পুরোহিত করা যায় না!

—হায় সর্বনাশ, বিলু তোমার মিছে কথা বলতে জিভে আটকাল না! চোর না বললে তো মন্দিরে পুরুতগিরি করতে। সব তো ঠিক হয়ে গেছিল। দাদামশাই, তোমার মানুকাকা, মেসোমশাই মিলে ঠিকই করে ফেলেছিল। মনে নেই ছুটে এসেছিলে, পরী আমাকে বাঁচাও। বাবার যা কাছাখোলা অবস্থা রাজি হয়ে যাবেন। বর্তে যাবেন। রক্ষা কর। কার্তিক ঠাকুরকে তখন কে রক্ষা করেছিল!

—না বলিনি।

—মিছে কথা বলবে না। একদম বলবে না। বলনি, এখন আমি কী করব পরী!

পিলু দেখেছে, দাদা আর কথা বলতে পারত না। একেবারে চুপ করে যেত।

পরীদি তখনও গজ গজ করছে—আমি যত নষ্টের গোড়া না! নষ্ট করেছি। ঠিক করেছি। আরও করব। পারলে একশবার করব। হাজারবার করব। কবিতা লিখতে বললে মানুষকে নষ্ট করা হয়!

দাদা আবার গর্জে উঠত, চুপ। তুমি বলনি, বিলু, সব করব। কবিতা লেখ। তুমি পারবে। তোমার চোখ মুখ বলছে পারবে। তোমার ভিতর জ্বালা আছে। অনুভূতি আছে স্বপ্ন আছে। তুমি পারবে। কলেজ ম্যাগাজিনের কবিতাটি দাও। তবেই দাদামশাইকে বলব, বিলুটা একটা চোর। গ্যারেজ থেকে টাকা চুরি করে একবার পালিয়েছিল। একটা চোরকে বাবাঠাকুরের জায়গায় বসাবে! ভাল দেখাবে! তোমার মা কালী রাগ করবেন না! কী বলনি! বল চুপ করে থাকলে কেন। কে আমাকে রাস্তায় টেনে নামিয়েছিল!

পরীদি বলত, বেশ করেছি। তোমার সর্বনাশ আমি চাই। আঃ কী কবিতা! পরী আমার সর্বনাশ। আর কোনো লাইন খুঁজে পেলেন না তিনি!

দাদার ঘরে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বাইরে থেকে কেউ শুনছে। সেই পরীদি কত উচ্ছ্বাস নিয়ে এসেছে, আর বাবা কেবল বসে বসে তামাক টানছেন। পত্রিকাটা মাটিতে পড়ে আছে। পরীদির কাছে যা গৌরবের, বাবার কাছে বোধ হয় তা খুবই অগৌরবের।

হঠাৎ বাবা প্রশ্ন করলেন, এতে কী পেট ভরে মা! এই যে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাবু দুম করে অন্তর্ধান করলেন, ফল ভাল হবে! কবিতা লিখলে পেট ভরবে!

পরীদি মাথা নিচু করে বসে আছে।

মা বললেন, মিমি, বিলুর কোনো খবর নেই কাগজে!

—আছে মাসিমা। কাগজটাইতো খবর। বিলু কী সুন্দর কবিতা লিখেছে। বলে সে মা'র কাছে কাগজটা নিয়ে গেল।

বাবা বললেন, ওনি তো কবিতা বোঝেন!

আসলে ঠেস দিয়ে কথা।

পরীদি বলল, কবিতা বোঝার জন্য কেউ লেখে না মেসোমশাই। পড়ে ভাল লেগে যায়। দূরের কথা বলে। স্বপ্নের কথা বলে। বেঁচে থাকার কথা বলে। কত পাঠক পড়বে। নাম জানবে। আমি তো

আর কিছু চাইনি।

বাবা বললেন, বেশ ছিল, এখানে কাগজ নিয়ে পড়েছিল। কুকর্ম সুকর্ম তার এখানকার বন্ধুরাই সামলাত। এত বড় শহরে গিয়ে কবিতা লিখে শেষে দেশসুদ্ধ যজালি!

পরী মেসোমশাইকে জানে। তার প্রতি মেসোমশাইয়ের এ-কারণে চাপা ক্ষোভও আছে। যদি তিনি পাতা উল্টে দেখেন, পড়েন। কত বড় বড় কবির পাশে তার কবিতা ছাপা হয়েছে। না দেখলে বুঝবেন কী করে! তারপরই মনে হল, মানুষের দারিদ্র্য অনেক কিছু বোধহয় হরণ করে নেয়। ঝড়, জল, অন্ন চিন্তা, মুষ্টি নির্ভর জীবন কোন কবিকেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয় না। তিনি দেখলেও এর গাম্ভীর্য কিংবা গুরুত্ব টের পাবেন না। পরীর নিজেরই ইচ্ছে হল একবার সবটা পড়ে শোনায়।

তখনই পিলু বলল, তুমি যে বললে, দাদার খবর আছে, এই খবর!

—হ্যাঁ। তোর দাদা কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। কতদিন থাকতে পারে দেখব। পত্রিকা অফিসে গেলেই ওর খবর পাওয়া যাবে। কফি-হাউসে গেলে পাওয়া যাবে। কবিরা মুখচোরা স্বভাবের হয়। আড়ালে আবডালে থাকতে ভালবাসে জানি। তবু সে ভালই আছে। এর চেয়ে বড় খবর আর কী পেতে চাস বুঝি না। আমার কাছে এর চেয়ে বিলুর আর অন্য কোনো বড় খবর যে থাকতে পারে না। কথা বলতে বলতে মিমির গলা ধরে এল।

এতে বাবার বোধ হয় সামান্য লেগেছে। বললেন, দেখি। তারপর তিনি পাতা উল্টাতে থাকলেন কাগজটার।

সকাল থেকেই পিলুর মেজাজ খারাপ। আমাকে কিছু বলবে না। যাব বাড়ি থেকে বের হয়ে বুঝবে মজা।

—যা না যা, একটাতো গেছে। তুইও যা। কে থাকতে বলেছে! আমি তোদের কে?

আসলে পিলু বুঝতে পারে, দাদা বাড়ি নেই বলে মা'র চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে গেছে। শীতের সময়। বাড়িতে পিঠে পুলি হবে। চাল বাটা থেকে, মাষকলাই কিছুই বাদ যায়নি। ঠাকুরের ভোগ হবে। অথচ দাদাটা বাড়ি নেই। ইট কাটার আগে ঠাকুরকে সামান্য অন্নভোগ।

সব ঝক্কি তার উপর।

—এই পিলু!

বাবা হয়তো ডাকলেন।

—যাতো সনাতনকে বলবি সের খানেক আরও খেজুরের গুড় দিতে। তোর মা-তো রণচণ্ডী হয়ে আছেন। ঠাকুরের ভোগ কার জন্য! আরে বোঝো না, কার জন্য! মানত করেছি যখন, দিতেই হয়। দেখি ঠাকুর কী করেন। কতটা খেলাতে পারেন। নবমীর ইটের ভাটা হবে বোঝো না!

সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। এক দণ্ড সে বসে থাকতে পারছে না। পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্কুল নেই। বাড়িতে আর কে আছে ছোটাছুটি করবে! দাদাটি তো মজা করছেন। কার সঙ্গে পিলু তাও বোঝে না। পরীদি দাদার কবিতা নিয়েই হৈচৈ করছে। আরে মানুষটা কোথায় আছে কী খাচ্ছে, কারো মাথায় নেই। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে খেতে জানে না, তার কি না এত মেজাজ!

সকালে উঠেই একবার যেতে হয়েছে নিবারণ দাসের আড়তে। ইট কাটা হবে। মাটি তোলার কাজের জনমজুর নিবারণ দাসেরই ঠিক করে দেবার কথা। বাবার বড় যজমান। বিষয়ী মানুষ। সব কাজে কর্মে নিবারণ দাসকে খবর দাও। কোথায় ইটের ভাটা হবে, জনমজুর কত লাগবে, সাঁওতাল মেঝেন হলে ভাল হয়—সবই নিবারণ দাসের পরামর্শে। দাদা বাড়ি নেই—অথচ বাবা কোনো কাজই করতে বাকি রাখছেন না। বাবা যে ভাল নেই সে বোঝে! যখন ভাল নেই, তখন আর ইটের ভাটা পুড়িয়ে কী হবে! কার জন্য মন্দির! নবমীর গুপ্তধন বাবা পেয়ে সব ঠাকুরের নামে করে রাখছেন।

জমি জমা বাড়ি ঘর সব। নবমীর ইচ্ছে, জঙ্গলে তার স্বামীর ভিটায় যেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়।

পিলু আজ নবমী বুড়ির উপরও ক্ষেপে আছে। কৈ যখন তুলে আনি তখন তো এত বায়না ছিল না! যখের ভয়! যখ ঢুকে গেছে! যখন ঢুকে গেছে তো আমরা কী করব!

সেই নবমীর এখন সাধ, তার ভিটায় যেন একখানা শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়।

সে শুনেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে। নবমী তোমার এত সাধ থাকলে জঙ্গলে পড়ে থাকলেই পারতে। কে করে!

বাবা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।—কে করে মানে!

পিলুও আজকাল বাবার মুখে মুখে উত্তর করে। বাবা তখন গুম মেরে যান। কখনও তার ভুল ধরিয়ে দেন। কে করে মানে ঈশ্বর করেন। নবমীর ভিটায় শিবলিঙ্গ স্থাপন হবে কী হবে না তাঁর মর্জি। তুমি বললেও হবে না, না বললেও আবার হতে পারে।

হয়ে গেল!

সকাল থেকে এই করে তার চোটপাট শুরু। বাবা রাজি হয়েছেন। ইটের ভাটায় আর ক'খানা বেশি ইট পুড়িয়ে নিলেই হবে। বাড়িতে এই রাজসূয় যজ্ঞ চলছে, আর তার দাদাটা কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। কেউ কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না। আজ বাড়িতে ঠাকুরের ভোগ হবে। দু-দশজনকে বলাও হয়েছে—প্রসাদ নেবার জন্য—মা সকাল থেকে লেগে পড়েছে। বৃন্দাবন করের বৌ এসে গেছে। বাড়িতে গোবিন্দভোগ আতপ চালের ভাত হবে। পায়েস হবে। পিঠে পুলি কালই করে রাখা হয়েছে। ঠাকুরকে দেওয়া হবে না, তবে যারা আমন্ত্রিত তাদের পাতে দেওয়া হবে। কাল থেকে বালতি বালতি জল তোলা, ড্রামে ভরা, নিরাপদদা সকাল থেকেই কাজে লেগে গেছে—সে চেলাকাঠ এনে ফেলছে। গর্ত করছে। উনুনে বড় কড়াই, বড় তামার ডেগ বসানোর মতো গর্ত করা হচ্ছে। আর তার দাদার কথা একবারও কেউ মনে করছে না! মাথা কী গরম সহজে হয়! একবার দাদা ফিরে আসুক, মজা বুঝবে।

বাবা বললেন, পিলু, কাজের বাড়িতে মেজাজ খারাপ করতে নেই। মা'র কথা শুনতে হয়। দেখছিস তো কেউ বসে নেই!

বাবা পিলুকে আজ বেশ তোষামোদ করে কথা বলছেন। সকালবেলায় স্কুলের মাঠে তার কত কাজ। সবাই এসে বসে থাকবে। একটা দড়ি যোগাড় হয়ে গেছে। দুটো বাঁশও। চাঁদা তুলে বল কেনা হয়েছে। সে না গেলে কেউ কাজে হাত দেবে না। কিছুতেই মা আজ সাইকেল তাকে হাতছাড়া করবে না। চাবিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। সে দৌড়ে গেছে। সনতের দোকান থেকে খেজুরের গুড় এনে দিয়েছে। সাইকেলটা দিলে কত তাড়াতাড়ি হয়! সেই সাইকেলটাই হাত ছাড়া! কার মাথা ঠিক থাকে।

আর এ-সময়ই বাবার কী মনে হল কে জানে! ডাকলেন, পিলু, শোন। পিলু রাগে ক্ষোভে থম মেরে আছে। কিছু বলছে না। বাবা বললেন, যখন ভোগ হচ্ছেই, এক কাজ করলে হয় না! তুই কী মনে করিস—একবার শহরে খবর দিলে হয় না, বিলুর বন্ধুদের। অন্ন প্রসাদ নিত তারা।

বাবার এ-হেন বিবেচনায় পিলু আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। দাদা বাড়ি নেই, ভোজ হচ্ছে! দাদার বন্ধুরাও ভোগ খাবে। তাদের বলে আসতে হবে। সাইকেলটা সে এই অজুহাতে পেয়ে যেতে পারে। আসলে সাইকেলে তালা পড়ার পেছনে বাবার কোনো উসকানি থাকতে পারে। দিন-রাত টো টো করে বেড়ানোর স্বভাব হয়ে গেছিল। বাবা বার বার সাবধান করেও পারেননি। সাইকেলই তোমাকে খাবে। কিন্তু সে তো কথা শোনার পাত্র নয়। তাকে জব্দ করতে হলে সাইকেলে তালা না দিয়ে রাখলে চলবে না। প্রতিবেশীরা তার সাইকেল, আর ট্রাকের বাজি রেখে খেলা দেখে ফেললেই বাবার কাছে এসে নালিশ, ঠাকুরকর্তা, পিলু তো যমের সঙ্গে লড়ালড়ি শুরু করে দিয়েছে। তারপর বিশদ বর্ণনা। অভিযোগ এক দু-দিন নয়—মাঝে মাঝেই ওঠে। আজ কাজের দিন, কোনো অনর্থ ঘটলে—শুভ কাজ পণ্ড। তার চেয়ে সংসারে বাবার শুভ কাজের দাম বেশি!

সে বলল, আমি পারব না।

বাবা বললেন, সাইকলটা নিয়ে মুকুল নিখিল সুধীনকে অন্তত বলে আয়। ওরা তো আমার বাড়িতে অন্ন প্রসাদ কখনও গ্রহণ করেনি! গেরস্থের এতে মঙ্গল হয় জানিস।

সাইকেলটা হাতে পাবে জেনেই সে শেষে রাজি হয়ে গেল। বলল, দাও তবে বলে আসি।

বাবা বললেন, মিমিকেও খবরটা দিস।

বাবা একপ্রস্থ ফর্দ দিয়ে নিরাপদকে আবার বাজারে পাঠিয়েছেন। পিলু সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। সে সাঁ সাঁ করে ছুটে যেতে থাকল। এবং যাবার আগে স্কুলের মাঠে বলে গেল, আজ আর তাকে পাওয়া যাবে না। বাবা অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ কী সে জানে। নবমীকে বিকেলে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব মাঝে মাঝে তার উপর বর্তায়। দুলে দুলে সুর ধরে পড়তে মন্দ লাগে না। অভিমন্যু বধ পড়তে পড়তে সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলে। সুভদ্রা জননী যেন আর কেউ না। তার নিজের মা'র কথা মনে হয়। উত্তরার কথা মনে হলে তার পরীদির মুখ ভেসে ওঠে। যেন পরীদিরই কাজ, দাদা যে আজ নিখোঁজ পরীদি তার জন্য দায়ী। সাজগোজ করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে এখন নিজে হা হুতাশ করছে।

কারণ সে পরীদিকে আবার দেখেছে, দাদার খোঁজ খবর না পেয়ে কেমন মনমরা হয়ে গেছে।

পরীদি নিজেও গেছিল কলকাতায়। ফিরে এসে বাবাকে সব খবর দেওয়া চাই।

পত্রিকা অফিসে গেছে। কবিতার নিচে নাকি নাম ঠিকানা লিখে দিতে হয়। ওদের খাতা থেকে যে ঠিকানাটি দেওয়া হয়েছে, তা অপরূপার ঠিকানা। মুকুলদার বাড়ির ঠিকানায় পত্রিকা এসেছে পরীদি খবর দিয়ে গেছিল।

তারপর পরীদি আবার খোঁজাখুঁজি করেছে কলকাতায় গিয়ে। সেখানে বেলাঘাটা বলে একটা জায়গা আছে। চাউলপট্টি রোড বলে রাস্তা আছে। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ি, সরকার বাড়ির মাঠ পার হয়ে বড় বড় সব পুকুর ডোবা। কুঁড়েঘর সারি সারি। তারপরই একটা খাল। হাড়ের কারখানা—কী দুর্গন্ধ। সেই বস্তিতে পরীদি খোঁজ নিতে গিয়ে মহা বিপর্যয়ে পড়ে গেছিল। খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে গেছে। ঝড় বৃষ্টি, আর সেই পুকুর ডোবা নালা ভর্তি ছোট ছোট ঝুপড়ি। প্রেসের কোন কিরণ বাবু বলেছে, হ্যাঁ এই নামে তো একজন আমাদের প্রুফ দেখে। ঠিকানাটা দেখুন তো। পরীদি দেখেছে,—দাদার সই। নিচে কী সব নম্বর দিয়ে লেখা চাউলপট্টি রোড। জায়গাটা যে এত দুর্গম হতে পারে, এমন আস্তাকুঁড় হতে পারে পরীদি নাকি চিন্তাই করতে পারেনি। বিলু কী নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। হাড় পোড়া দুর্গন্ধ, খাটা পায়খানা, মানুষ শুয়োর গাদাগাদি করে আছে। সেখানেও পরীদি খুঁজে এসেছে। সন্ধ্যা বলে একটি মেয়ে খবর দিয়েছে, বিল্ববাবু কখন আসে, কখন থাকে, কখন যায় আমরা কেউ টের পাই না। তার ঘরটাও দেখিয়েছে। ঘরে কিছুই নেই। টিনের বাক্স। একটা খাটিয়া। একটা মাটির জার। জল নেই।

পরীদি তারপর আর একা যেতে সাহস পায়নি। পার্টির দু-জন ক্যাডারকে নিয়ে খুঁজতে গেছে। গিয়ে দেখে নেই। পরদিন সকালেই নাকি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস হাতে নিয়ে চলে গেছে কোথায়।

এমন দাদা যার, তার ভাই আর কত ভাল হবে! তুই পরীদিকে নাকের জলে চোখের জলে এক করছিস। তোর মায়া দয়া নেই! বাবার জন্য কষ্ট হয় না! মা'র জন্য! তুই অত কী রাজকার্য করতে গেলি, আমাদের কথা ভুলে গেলি! পরীদির গন্ধ পেলেই পালাস। তুই বল, পরীদির কী অপরাধ! পরীদির পার্টি করা তুই পছন্দ করিস না, নাটক করা পছন্দ করিস না। পরীদির এটা বিলাসিতা! বিলাসিতা হলে, তোর ঘরে রাতে শুয়ে ঘুমাতে পারে! আলো নেই, পাখা নেই। জানালা বাঁশের কঞ্চির। ছোট্ট জানালা। হাওয়া বাতাস কিছু ঢোকে না, থাকতে পারে। পরীদি তো আমাদের বাড়ি এলে যেতেই চায় না।

এ-সব ভাবলেই পরীদিকে মনে হয় সেই উত্তরা—যে নারী তার যুবরাজকে যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছে। মাথায় উষ্ণীষ, শরীরে বর্ম, ঢাল, তরবারি, তূণ পিঠে! সব দিয়েছে, কেবল সপ্তরথী ঘিরে ধরলে, সে জানত না কী করে বাঁচতে হয়। ব্যূহ থেকে বের হতে হয়। দাদাও কী কোনো অদৃশ্য সপ্তরথীর বাণে জর্জরিত। না-হলে পালাচ্ছে কেন বার বার। সে পরীদিকে কী আর মুখ দেখাতে চায় না। জীবনের সেই জয়, যা সহজ লভ্য নয়, করতলগত নয়—যার জন্য সে অস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, হয়তো ঠিকঠাক পারছে না, সে পাখি দেখলে মুণ্ডু দেখতে পায়, চোখ এখনও দেখতে পায় না, যতদিন না তার সেই দেখা পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন কী অজ্ঞাতবাস চলবে!

সে সবাইকে বলে ফিরে এল। কেন যে আজ মনে হল, সত্যি এই কাজের দিনে তার বাড়িতেই থাকা দরকার। সে না থাকলে বাবা একা। সে ফিরে এসে দেখল, পরীদি রান্নাঘরে বসে মুগের ডাল বাছছে। পরীদিকে গিয়ে বাড়িতে পায়নি।

পরীদিকে বাড়িতে আর কেউ কিছু বলে না। তবে বোঝে পরীদিকে নিয়ে প্রচণ্ড তিক্ততা চলছে। পরীদি কোথায় বললে, এক কথা, তা তো তোমরা ভাল জানবে। সে তো আমাদের কিছু বলে যায় না। সুহাসদাও নাকি একদিন ফোন করায় তার দাদামশাই বলেছিল, জানি না। বরং আমি জিজ্ঞেস করছি সে কোথায়! আমার মানমর্যাদা নিয়ে তোমরা আর কত হোলির রঙ খেলবে। সে কোথায় আছে, থাকবে, সে তো তোমরা জানবে। তোমরা তার সুহৃদ। আমরা তার শত্রু। সে কোথায় ঘোরে থাকে খায় তোমরাই আমার চেয়ে বেশি জানবে।

পিলুর এ-জন্য আরও বেশি কষ্ট। কোথাও যেন ঠাঁই নেই। পরীদি বাড়িতে থাকে খায়, খুশি মতো ফেরে, বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গেই যা সম্পর্ক। পরীদির কখন কী দরকার জানে। পরীদি ইচ্ছে করলে প্রাসাদের মতো বাড়িতে নিরিবিলি, নিজের ঘরে, বারান্দায় বসে চুপচাপ যেমন দিন যাপন করতে পারে আবার তেমনি, সহসা সিঁড়ি ধরে নেমে নিজের লাল রঙের সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। শুধু বাড়িতে খবর রেখে যায়, যেন খবরটা দাদামশাইকে দেওয়া হয়।

এখন যে পরীদি মুগের ডাল বাছছে সেও আর এক পরীদি। পার্টি করা, নাটক করা, কিংবা ক্যাডারদের নিয়ে মিছিল মিটিং করা পরীদি যেন এ নয়। ঠিক মা'র মতো, বাবার মতো একেবারে ঠাকুর ঘরের পবিত্রতা নিয়ে বসে আছে। চাল বেছে টাগারিতে রাখছে। মাকে ডেকে বলছে, এতেই হয়ে যাবে। পিলুকে দেখে বলেছে, পিলু বসে থাকিস না। নিরাপদকে নিয়ে কলার পাতা কেটে আন। আর শোন, কলার পাতাগুলো ধুয়ে রাখ। তারপরই পরীদি রান্নাঘরে ঢুকে বলল, মাসিমা, এ কী! কাঁদছেন কেন!

পিলু দেখল বাবা বেশ তটস্থ হয়ে উঠেছেন। কেন কাঁদছে বাবা টের পেয়ে গেছেন। কারণ বাবার সঙ্গে যা কিছু মান অভিমান ঝগড়া রাতের বেলা। দাদা বাড়ি নেই, অথচ বাড়িতে অন্নভোগের আয়োজন হচ্ছে, লোকজন খাওয়ানো হচ্ছে, কেউ পারে—বড় পুত্রটি কোথায় আছে, তার কোনো সঠিক হদিস পাওয়া যাচ্ছে না—তিনি এখন অন্নভোগ নিয়ে পড়লেন।

পিলুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মুখ কালো হয়ে গেল। সে শুনতে পাচ্ছে, মা বলছে, কাঁদি আর সাধে মা। যার মানুষের কোনো হুঁস নেই, তার কান্না ছাড়া আর কী সম্বল আছে বল! একবার গেল, কলকাতায় কোথায় আছে খুঁজতে গেল! তোমার বাবা দাদামশাই পারতেন। নির্বিকার পুরুষ।

বাবা বললেন, আরে পরী পাত্তা করতে পারল না, ধরেও ধরতে পারল না, আমি গেলে তো বিষম কাণ্ড হবে।

হঠাৎ মা কেমন দজ্জাল গলায় বলে উঠল, লজ্জা করে না, যখন বলেছিলে, এমন কু-পুত্রের মুখ দর্শন করব না। তারপর পরীদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সোজা সরল ছেলেটার উপর এত অত্যাচার! ভগবান সহ্য করবে! পরী, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, বিলু আমাকে বলেছে, এক বর্ণ মিথ্যা বলছি না। বলেছে, মা আমি মারিনি। মারতে পারি না। বিশ্বাস কর আর যাই করি আমি পরীকে কখনও মারতে পারি না।

এ-কথা শোনার পর পরীদিও মুখ আড়াল করে ফেলল। দু-হাতে মাকে সামলাচ্ছে, আর মুখ নিচু করে ফেলছে। উদ্গত অশ্রু সামলে কেন যে পরীদিও বলছে, মাসিমা থামুন। মাসিমা, আমিও জানি ও মারেনি, মারতে পারে না। মাসিমা থামুন।

—আমি থামব বল! নিষ্কর্মা মানুষের এত বড় কথা! তোমার দাদামশাই কী বললেন, আর তিনি বিশ্বাস করে ফেললেন। আমার ছেলে কারো গায়ে হাত তোলার ছেলে! তুমি তাকে কী না বলেছ! তুমি না গেলে ও কখনও ফেরে! সে তোমার কু-পুত্র!

পিলু, নিরাপদদা, বৃন্দাবন করের বৌ, মায়া সবাই মা'র এই দজ্জাল স্বভাবে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে।

—আর তুমি বাড়ি বসে ধর্ম দেখছ। বলছ, পাপ খণ্ডন হোক, পাপ খণ্ডন হোক। সহ্য হয় বল! একবার একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না। গেলে না। বললে না গিয়ে, চল, যা হবার হয়ে গেছে। বাড়ি চল। বসে থাকলে! উৎসব, ইটের ভাটা, মন্দির শিবলিঙ্গ—কত আয়োজন, আর আমার ছেলেটা একটা আঁস্তাকুড়ে পড়ে আছে! বলে আবার হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পরীদিও মা'র সামনে বসে পড়েছে। মা'র মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলছে, মেসোমশাইকে নিয়ে আমি যাব। ঠিক খুঁজে বের করব। আপনি এ-ভাবে কাঁদবেন না। কী খারাপ লাগছে বলুন তো? ঐ দেখুন পিলু মায়া সবাই কাঁদছে। আমি কাকে সামলাই। তারপরই ধমক, এই পিলু, হচ্ছেটা কী। মায়া, যা এখান থেকে—যা!

পরীর মুখে এসে গেছিল, আপনার পুত্রটি মানুষ না অপদেবতা। কিন্তু মাসিমা কষ্ট পাবেন!

কার জন্য কাঁদছিস! সে কারও দুঃখ বোঝে পিলুকে বলার ইচ্ছে।

পরী শেষে বললে, মাসিমা, অবুঝ হলে চলবে কেন। চিঠি কাকে দেবে! মেসোমশাই যাবে কোথায়! মেসোমশাইয়ের দোষ কী। দাদামশাইয়েরও দোষ নেই। তারা যে যার মতো বুঝেছে। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঐ দেখতো পিলু, কারা আসছে। এগিয়ে যা।

কারা আসছে বলায় মা'র সম্বিত ফিরে এল। রান্নাঘরের কোণায় ঢুকে ঘটিতে জল নিয়ে বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল। এখন পিলু কিংবা মায়া, পরী সবাই জানে, মা'র মুখে যতক্ষণ হাসি না ফুটে উঠবে ততক্ষণ, এই বাড়ির গাছপালায়ও অদৃশ্য কুয়াশা লেগে থাকবে। ভেজা আবহাওয়া—ভারি স্বভাবের হয়ে যাবে ঘর বাড়ি—অন্ধকার হয়ে থাকবে সবার ভেতরটা। একমাত্র মাসিমার মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই আজকের অন্নভোগ সার্থক।

বাবা হঠাৎ উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন, মন খারাপ করবে না। অন্নভোগ সবারই কমবেশি থাকে। তার হাত থেকে কে কবে রেহাই পেয়েছে।

রাতের দিকে বাড়িটা কেমন নিঝুম মনে হল পরীর। সে পিলু মাসিমা বারান্দায় বসে গল্প করছিল। মাসিমা রাতে কিছু খাবেন না। পরীরও খাবার ইচ্ছে নেই। শীতের বেলা শেষ হতে সময় লাগে না। তাদের খেতে খেতে বেলা পড়ে গেছিল। অবেলায় খেয়ে রাতে আর খাবার ইচ্ছে নেই।

মেসোমশাই বলেছিলেন, তোমার মাসিমার বুদ্ধিতেই জমিটা কেনা হয়েছিল। ভাগ্যিস কিনেছিলাম। চার পাঁচ বছরে কী দাম হয়ে গেল!

বাবার কাছে এটা খুবই কৃতিত্বের খবর। পিলু এটা বোঝে। বাবা যে এখানে এই গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে প্রথম ঘর বাড়ি বানান, পরীদিকে কতবার যে সে খবর দিয়েছে। পরীদিও যতবার শুনেছে, যেন এর আগে শোনেনি।—তাই নাকি! এত দাম হয়ে গেল জমি!

পরীদি যে খুবই বুদ্ধিমতী সে বোঝে। এক দাদা ছাড়া বাড়িতে পরীদির আর কোনো শত্রু নেই। রাত হয়ে যাওয়ায় আজ থেকে গেল। পিলুর এটা যে কী আনন্দের! বিকাল থেকেই পেছনে লেগেছে, পরীদি আজ যাবে না। আমি বলে আসব। তুমি থাক পরীদি। একটা তো রাত। থেকে যাও।

আসলে এটা কেন হয় সে বোঝে না। তাদের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত কেউ আসে না। মানুকাকা

শহর থেকে এলে, গাছের পেঁপে, আমের সময় আম, বেলের সময় বেল—যেদিনকার যা ফল ব্যাগে করে নিয়ে যায়। বাবার তখন কী আনন্দ! এটা নে, ওটা নে। আর মা'র তখন নানা অভিযোগ। গজ গজ করবে, দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও। এসে তো উঠেছিলে, তাড়াবার কত ফন্দি করছিল! এখন তো বলছে, ধনদা, আমার জন্য জমি দেখুন। রিটায়ার করে ভাবছি এখানেই বাড়িঘর বানাব।

আসলে পিলুর কাছে বাবার এই জায়গা নির্বাচন নিয়ে, এক ধরনের অহঙ্কার আছে। বাবাই পারেন, বোঝেন, কেন না, এখানে না এলে সে এই গভীর বনজঙ্গলের স্বাদই পেত না। নবমীকেও আবিষ্কার করা হত না। এক সময় তো তাদের কী ভয় লাগত! বাবা বাড়ি নেই, জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা—চারপাশ নিঝুম, আকাশে কিছু নক্ষত্র বাদে তাদের দেখবার কেউ নেই—তখন কুকুরের বাচ্চা তুলে এনেছিল একটা—কী না দিন গেছে!

মা কথা বলছে না। সকালে দাদার জন্য কান্নাকাটি করার পর আর কোনো অশান্তি করেনি ঠিক, তবু নিখোঁজ পুত্রটির জন্য সারা দিন এক চাপা দুঃখ বয়ে বেড়িয়েছে।

পরীদি চলে যেত, কেবল তার মনে হয়েছে, এই পরিবারে সে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কিছুটা যেন অবলম্বন থাকবে। নবমী পাশে বসে ঝিমোচ্ছিল। নবমীর খুব ইচ্ছে ছিল, আজ সে তার মরদের গল্প করে। কিন্তু কেন যে বার বার মরদের কথা তুলতে গেলেই পিলু ধমকে উঠেছে।—থাম তো ডাকাতের গল্প কে শুনবে!

পরী বলল, আজ ডাকাতের গল্পই হোক। তুই ওকে ধমকাচ্ছিস কেন!

—ও পরীদি, শোন না! ডাকাতের গল্প কী শুনবে—বাবা, তুমি একবার একটা ল্যাংড়া গরু নিয়ে এসেছিলে না!

ল্যাংড়া গরুটার কথা উঠতেই মাসিমা কেন হেসে ফেলল সে বুঝল না।

মাসিমা বললেন, আর বল না, সে যা গেছে। চণ্ডীপাঠের নামে বের হতেন, ফেরার নাম থাকত না।

পরীর মনে হল, তা-হলে মাসিমাও ডাকাতের গল্পই শুরু করেছেন।

পরী বলল, কোথায় যেতেন?

মা হেসে বলল, জিজ্ঞেস কর না, কোথায় যেত।

বাবা বললেন, আমার তখন সসেমিরা অবস্থা বুঝলে। যে যেখানে পূজা-আর্চার খবর দিত, চলে যেতাম—সেখান থেকে আবার এক জায়গায়—বাড়িতে থেকে তো লাভ নেই। উপার্জন চাই। ছ'ছটা মুখ। বোঝো। তা একবার ছেলেদের দুধ খাওয়াবার সখ হয়েছিল ..... বলে বাবার সেই গরু আনা এবং পিলুর সড়কে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার আবিষ্কারের কাহিনী বললে, পরী কেমন হতবাক হয়ে গেল।

—বুঝলে পরী। কী না বলেছে তোমার মাসিমা! আমি অবলা মানুষ, বলেই পিজরাপোঁলে না দিয়ে গরুটা বামুনকে দান করে দিয়েছে। দুধ দিল না ঠিক, তবে কী জান, বামুনের বাড়িতে গোবরটাও তো কম নয়। ওটা ওরা বোঝে না! তখন ওটুকুই বা আমাকে কে দেয়। কত জায়গা থেকে আম জামের কলম, কাঁঠালের কলম এনে লাগিয়েছি। সারা বাড়িটায় এত যে গাছপালা তারও প্রাণ আছে জান! তোমার মাসিমা কত আমাকে বকাবকি করেছে জান! নির্বুদ্ধিতার শেষ নেই।

নবমী বলল, আমার মরদ না, একবার জেল খেটে এল। দু সাল। আসার সময় আমার জন্য একটা টিয়া পাখি নিয়ে এসেছিল। পিলু বলল, আবার মরদের গল্প! থাম বলছি।

একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। বারান্দার এক কোণায় জলচৌকিতে বাবা বসে আছেন। মা পরীদি মায়া মাদুরে বসে আছে চাদর গায়ে। —চারপাশে বাড়িটার গাছপালার ছায়া, এই হ্যারিকেনের আলো এবং পরিবারের সবাই আজ অনুষ্ঠানের পর কেন যে এত অতীতের গল্প নিয়ে পড়েছে পিলু তা বোঝে। কোথা থেকে কোথায় তারা উঠে এসেছে। নবমীকে দেখলে মনেই হবে না, তারই গুপ্তধন আজ এই গরীব বামুনের পরিবারটিকে সামান্য স্বচ্ছলতার মুখ দেখিয়েছে। আসলে পিলুর ভেতর মায়া দয়া বেশি। পিলু

এ-জন্য কম ধমক খায়নি। এই মায়া দয়াই নবমীর কাছে নিয়ে গেছে তাকে। এই মায়া দয়াই শেষে সামান্য গুপ্তধন এনে দিয়েছে সংসারে।

নবমী বলে একটা বুড়ি আছে জঙ্গলে সবাই জানত। কী খায়, কোথায় থাকে, কী পরে, কেউ খোঁজ নিত না। ওর কঙ্কালসার শরীর শনের মতো চুল আর প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা—কাউকেই কাছে টানেনি। বরং দেখলে পালিয়েছে। নবমী ঠিক বুঝতে পেরেছিল পিলুকে। ঠিক মানুষকেই সে চিনেছে। পিলু না নিয়ে এলে জঙ্গলেই মরে থাকত। ওর ইট ক'খানা ইটের পাঁজার মধ্যে পড়ে থাকত। মানুষের কাজে লাগত না। পরীদি জানে না। একবার ইচ্ছে হল বলে। তারপরই বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বলি বাবা?

বাবা বললেন, তোমার আবার কী বলার আছে! তুমি তো কোথাও পালাওনি। কাল ফিরবে বলে পক্ষকাল পরে ফেরনি। কোথাও ডাকাতি করেছ বলেও জানি না।

বাবার এই কথায় সবাই হেসে উঠল।

পরী ভাবল, যাক, যে চাপা কুয়াশায় ঢেকেছিল বাড়িটা তা যেন কেটে গেল।

—বলি বাবা!

—বল না। আমি বারণ করব কেন!

—না ঐ যে ইট, নবমীর ঘরে ইট।

—অ সেই কথা! পরীকে বলনি! পরী জানে না!

পরী বুঝল না, পরী কী জানে না।

পিলু গল্প বলার মতো যেন সব বলে গেল। পরী শুনে হাঁ। নবমী তবে তার ডাকাতের ধন ইটের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। নবমীকে এমন প্রশ্ন করতে বলল, না না, ডাকাতের ধন হবে কেন? ও আমার গয়নাগাটি। কত যে ছেল। সব গলিয়ে রেখে দিয়েছিল। বনজঙ্গলে থাকি, কার কখন নজর যাবে—

পরী অনেক দিন থেকে এই বাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে মিশে আছে। নবমীকে তুলে আনার মধ্যেও মহত্ত্ব আছে—কিন্তু গুপ্তধন মেসোমশাই কিছুই নিজে ভোগ করছেন না—ঈশ্বরের প্রতি তাঁর এত নির্ভর কেমন যেন বিচলিত করে তুলল। সে এত দিন যা জেনেছে, যা পড়েছে, তার সঙ্গে মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং ধর্মবিশ্বাসে কোনো ফারাক আছে বলে ভাবতে পারল না। সত্যি তো এ-দেশে গরীব মানুষের তো কিছুই নেই। কবে হবে তাও জানে না। কিন্তু একটা পরিবারকে এই বিশ্বাসই কী প্রবলভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে—মেসোমশাইকে না দেখলে সে টের পেত না।

সে বলল, মেসোমশাই, আমরা একটু ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—আপনার বাড়ির সবটা আমি দেখিনি। আপনার গাছপালাও না।

বাবা তাতে খুবই খুশি। পরী বাড়ি ঢুকেছে, নবমীকে নিয়ে বনের মধ্যে গেছে। কিন্তু এই বাড়ির সব গাছপালা সে দেখেনি। কিংবা বাবা কোনো দিন বলতে পারেননি, কোথা থেকে কোন গাছের কলম এনে লাগিয়েছেন। শুধু লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি, তার ফল খাইয়েছেন, সেখানেও শেষ ছিল না, খেয়ে যদি কেউ বলেছে, ভারি সুমিষ্টি আম, একটা কলম করে দেবেন। বাবা খুশি হয়ে কলম করে দিয়েছেন। কখনও বাড়ি বয়ে গিয়ে দেখে এসেছেন, তাঁর দেওয়া কলমের আদর যত্ন ঠিক হচ্ছে কি না!

জ্যোৎস্না রাতে পরী গাছগুলির পাশ দিয়ে হাঁটছে, পিলু কেবল বাবার গল্প করছে। গাছপালার ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল পরীর—মানুষ তার উত্তরপুরুষের জন্য এ-ভাবেই কিছু রেখে যায়। পরী কাঁঠাল গাছগুলির নিচে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চারপাশে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে। গাছপালাগুলি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। একজন মানুষের এর চেয়ে বড় কী আর অবলম্বন থাকতে পারে সে

ভেবে পেল না। যেন বিলু কিংবা পিলু তাদের বাবার কথা এক দিন ভুলে যেতে পারে—কিন্তু গাছগুলি কোনো দিন ভুলবে না—কত যত্নে তিনি তাদের বড় করে তুলেছেন। মানুষের সৃষ্টির তো শেষ নেই। যে যার মতো কবিতা সৃষ্টি করে।

বিলুর কবিতা মেসোমশাইয়ের ভাল লাগবে কেন?

মেসোমশাই বলতেই পারেন, কবিতা লিখে কী হয়।

পিলু বলল, পরীদি, ওদিকটায় চল!

—কেন রে!

—বাবার বাতাবি লেবু গাছটা দেখবে না।

জ্যোৎস্নায় এই ভ্রমণ খুবই মধুর। আসলে তাকে নেশায় পেয়ে গেছে। যেন ইচ্ছে করলে সারা রাতই গাছপালার ভেতর এখন ঘুরে বেড়াতে পারে। বিলু পাশে থাকলে কী যে ভাল লাগত। আর সহসা কেন যে মনে হল, গাছপালার মতো চাই তার একজন সরল অকপট মানুষ। —যে বৃক্ষের মতো ছায়া দেবে।

সে এবার বলল, চল পিলু। রাত হয়েছে। এই মায়া আয়।

ঘরে মায়া আর মিমি। আলো জ্বলছে। হ্যারিকেনের অল্প আলো জ্বালা। মশারির নিচে লেপ গায়ে দিয়ে মিমি পাশ ফিরে শোয়। মায়া শুয়ে পড়েছে। মিমি মশারি গুঁজে দিল এক দিককার। তক্তপোষটা খুব বড় না। তার অসুবিধা হবার কথা। তবু মানুষের কী যে থাকে! সে পা ছড়িয়ে দিলে একটা দিকের মশারি আলগা হয়ে যাচ্ছে। বিলু আর পিলুর জন্য এই ছোট্ট তক্তপোষ। এতেই সে বছরের পর বছর শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। কোনো অভিযোগ ছিল না।

কখন মনে হল, মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার ঘুম আসছে না।

ঘুম আসার কথাও না।

গাছাপালা লাগাবার মধ্যেও কবিতা আছে—ঘর বাড়ি বানাবার মধ্যেও কবিতা আছে। পূজা-আর্চার মধ্যেও আছে—নবমীর জীবনের মধ্যেও। কোথায় নেই! স্বার্থপরতার চেয়ে এই কবিতা কম কৃতিত্বের নয় এমনই মনে হল তার। বিলুকে আজ কেন জানি সত্যি স্বার্থপর মনে হল তার। তবু তার নিজের জীবনের মধ্যেও কেন এই কষ্ট, দুঃখ বিলুর জন্য সে জানে না। কিছু শেয়াল ডাকল অদূরে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ এত গভীর হয় আগে সে জানত না। যেন এক আশ্চর্য মিউজিক সৃষ্টি হচ্ছে। এই মিউজিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কত দরকার, বাড়ির গাছপালার ছায়ায় হেঁটে না বেড়ালে টের পেত না। বাড়ির অন্নভোগ কত সুস্বাদু আজ মাসিমার চোখে জল না দেখলে টের পেত না। তার চোখে জল এসে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মিমি জানে না। সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেউ যেন দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, পিলু। দরজা খোল। পিলু।

কে ডাকছে! কে! মিমি কেমন ধড়ফড় করে উঠে বসল। তার বুক কাঁপছে। গলা শুকিয়ে উঠছে।

কে ডাকছে, কে!

অবিকল বিলুর গলা। বিল্ব কী তবে ফিরে এসেছেন!

সে ডাকল, এই মায়া ওঠ, শিগগির ওঠ।

মায়া উঠে বসলে বলল, কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, কে?

—মনে হয় তোর দাদা।

—দাদা!

মিমি বলল, আস্তে। সে সন্তর্পণে নামল। হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় মনে হল, হাত পা কাঁপছে। সে পড়ে যাবে। কোনো রকমে দরজা খুলতেই দেখল, কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কেউ না। সে বাইরে বের হয়ে এল। না কেউ না। হতাশায় তার বুক ভেঙ্গে গেল।

চিৎকার করে বলতে পারলে, সে সান্ত্বনা পেত—বিল্ব, আমি কী করব!

উঠোনে হ্যারিকেনের সামনে অনাথ রমণীর মতো কে বসে! বিল্ব কাছে এসে বলল, তুমি!

মিমি কিছুই বুঝতে পারছে না। ভৌতিক মনে হচ্ছে সব কিছু।

তুমি এখানে! রিকশাটা ছেড়ে দিতে গেছিলাম।

মায়া বুঝতে পারছিল না, পরীদি একা লণ্ঠন হাতে নিয়ে কোথায় গেল! বাইরে বের হয়ে অবাক। দাদা। হাতে সুটকেস। সে চিৎকার করে উঠল, বাবা, দাদা ফিরে এসেছে।

সহসা এই ঘরবাড়িতে সব আলো জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে। পিলু চিৎকার করে বের হয়ে এসেছে—দাদারে' মা কেবল পাগলের মতো উঠোনে এসে লণ্ঠন তুলে পুত্রের মুখ দেখতে দেখাতে বলল, এলি তবে! রাগ পড়েছে।

বাবা বললেন, তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। মুখে গোটা। দেখি দেখি। বলে বাবা লণ্ঠন তুলে কী দেখে বললেন, মায়ের দয়া হয়েছে! ও ধনবৌ, শিগগির বিছানার চাদর ওয়াড় পাল্টে দাও। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ইস জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!

মিমির মুখে কথা সরছিল না। অন্ধকারে কোথায় দূরে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

বাবা, দাদাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, ঠাকুরের চরণামৃত দিলেন খেতে। বললেন, ভালই হয়েছে। মহাপাপ খণ্ডন। কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বল! যাক পাপ খণ্ডন হয়ে গেল। বোঝা নামল আমার।

মিমি বলল, পিলু, রিকশাটাকে বল থাকতে। আমি যাব।

বিল্ব ঘরে শুয়ে টের পাচ্ছিল। মিমি আর তার ঘরে আসেনি। রাতের ট্রেনে সে প্রায় তস্করের মতো পালিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা জোর করে ট্রেনে তাকে তুলে দিয়ে গেছে। কেউ জানে না, সে সারা রাস্তায় প্রায় একজন তস্করের মতোই বসেছিল। ধরা পড়ে গেলে অনাসৃষ্টি হবে না কে বলতে পারে। তার সারা শরীরে কী ব্যথা। গলা বুজে আসছে। কথা বলতে কষ্ট। পিলু মায়া মা বাবা সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশে। এখন এই রোগের প্রতিবিধান নিয়েই বাবা ফাঁপরে পড়ে গেছেন। মিমি যে এ বাড়িতেই আছে কারো যেন খেয়াল নেই।

বিল্ব কোন রকমে পাশ ফেরার চেষ্টা করল। কোনো রকমে বলল, পরীকে ডাক। পরী এলে বাবা বললেন, যাও তোমরা। সবাইকে নিয়ে বাবা বের হয়ে গেলেন। বিল্ব বললে, এত রাতে যাবে!

—অসুবিধা হবে না। পিলুকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

—জানি। পিলু না গেলেও তুমি একা চলে যেতে পার। তোমার অসুবিধা হবে না জানি। একটাতো রাত। নাই গেলে। বলে পাশ ফিরে বিল্ব চোখ বুজল। এ-মুহূর্তে বিল্বর যেন এর চেয়ে বেশি কিছু বলার অধিকার নেই। এত কষ্ট শরীরে—তবু সে বাড়িতে ফিরে পরীকে দেখতে পাবে আশাই করেনি। সব চেয়ে দুশ্চিন্তা ছিল পরীকে মুখ দেখাবে কী করে। সেই পরী বাড়িতে নিজেই হাজির।

বাবা তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে আবার তার ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করলেন, বুঝলে কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে—আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে পরীর খোঁজ করতেই বিল্ব জানতে পারল সে নেই। পরী রাতেই চলে গেছে।

।। প্রাসঙ্গিক ।।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে যেখানে শেষ হয়েছে অথবা বলা যায় দেশ ভাগে সোনার জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিল, তার করুণ বর্ণনা আছে ট্রেনিং শিপ ভদ্রা জাহাজের একটি দৃশ্যে—সোনা জাহাজ--ডেকে হলিস্টোন মারছে। হাত ক্ষত বিক্ষত। একটাই সান্ত্বনা তার, সে অনেকদিন পর পেট ভরে ভাত খাবে। সোনা তখন তরুণ—আই-এ পাশ, বাবার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে—বাবার এই ঘরবারি নির্মাণের ছবি এই খণ্ডে আছে। সে একান্নবর্তী সংসারে মানুষ হয়েছিল—দেশভাগের বিপর্যয়ে তার সোনা-জ্যাঠামশাইর নির্দেশে তার বাবা কাকা জ্যাঠারা পৃথগন্ন হয়ে গেলেন। জ্যাঠামশাই-এর নির্দেশ, দেশের সম্পত্তি সব হাতছাড়া, সবাইকে স্বাবলম্বি না হলে চলবে না। সোনার বাবা চন্দ্রনাথ বিবাগি মানুষ, তিনি খুবই জলে পড়ে গেলেন। দেশে জমিদারির আদায়পত্র এবং যজনযাজনে তাঁর কিছু উপার্জন ছিল। এ-দেশে এসে তাঁর সব গেল। তিনি নিরুপায় মানুষ। তাঁর বড় পুত্র প্রায় বলতে গেলে নিখোঁজ—রেলের কী একটা সামান্য চাকরি নিয়ে পুনার কাছে কোথাও আছে—বিয়ে করেছে, চিঠি দেয়, তাতে তার শুধু অর্থাভাবের কথা থাকে। বিল্ব নামটি বিষ্ণুপুর কালীবাড়ির সাধক নরেন খ্যাপার দেওয়া। এই পর্বটি সেই নামেই গড়ে উঠেছে। সেই তখন পিতার একমাত্র লায়েক পুত্র। নরেন খ্যাপার দেওয়া বিল্ব নামটি এই পর্বে সোনার পরিবর্তীত নাম।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

তৃতীয় পর্ব : অলৌকিক জলযান

চতুর্থ পর্ব : ঈশ্বরের বাগান-

জন্ম—১৩৩৭। ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে। বাবা—অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়, মা—লাবণ্যপ্রভা দেবী। যৌথ পরিবারে তাঁর শৈশব কৈশোর অতিবাহিত। দেশভাগের পর ছিন্নমূল। এ দেশে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষা। কাশিমবাজারের মণীন্দ্র কলোনিতে বাবার ঘরবাড়িতে কিছুকাল থিতু হয়ে থাকা। তারপর যাযাবরের মতই প্রায় কেটেছে যৌবণ। যখন যে কাজ পেয়েছেন সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে বি. কম. পাশ করেন। বি.টি.ও পাশ করেন। কখনও নাবিকরূপে সারা পৃথিবী পর্যটন। কখনও ট্রাক-ক্লিনার। পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা। প্রধান শিক্ষকও ছিলেন একটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের। আবার ঠাঁই বদল, প্রধান শিক্ষকের কাজ ছেড়ে ১৯৬৩ সালে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন কলকাতায়। কখনও কারাখানার ম্যানেজার। কখনও প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা। শেষে সাংবাদিকতা। প্রথম গল্প বহরমপুরের 'অবসর' পত্রিকায়। 'সমুদ্রমানুষ' লিখে পান 'মানিক-স্মৃতি পুরস্কার'—১৯৫৮। 'বঙ্কিম পুরস্কার' পান 'দুই ভারতবর্ষ' উপন্যাসের জন্য—১৯৯৮। 'পঞ্চযোগিনী'-র জন্য ১৯৯৩ সালে ভুয়ালকা পুরস্কার। এছাড়া 'বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার'ও পান ১৯৯১ সালে। 'মতিলাল পুরস্কার', 'তারাশঙ্কর-স্মৃতি পুরস্কার', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' এবং 'সুধা পুরস্কারে' ও তিনি সম্মানিত। ২০০১ সালে 'সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার' পান তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্পে'র জন্য।

২০০৫ সালে 'শরৎ পুস্কার এবং ২০০৮ সালে আই.আই.পি.এম কর্তৃক প্রবর্তিত 'সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কার' পান 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে-র জন্য। সাম্মানিক মূল্য দশ লক্ষ টাকা। কথিত হয়ে থাকে উপন্যাসটি এই উপমহাদেশের বিবেক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, মানুষের ঘরবাড়ি, অলৌকিক জলযান, ঈশ্বরের বাগান, আবাদ, ঝিনুকের নৌকা, দুই ভারতবর্ষ, নগ্ন ঈশ্বর, একটি জলের রেখা, শেষ দৃশ্য, দেবী মহিমা, মানুষের হাহাকার, টুকুনের অসুখ, জীবন মহিমা প্রভৃতি।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম শর্ত হল—স্রষ্টার জীবনব্যাপি সন্ধান কিসের জন্য—মৌলিক যদি হয় এবং সেই সন্ধানে মানুষের ইতিহাস যদি লেখা থাকে, তবেই সার্থক সেই সাহিত্যমালা। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থেকে শুরু—'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান' এবং 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসগুলি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের গভীর সমাজ এবং ইতিহাস মনস্কতার কথা বলে। খণ্ডিত বঙ্গের অখণ্ড বর্ণমালার চালচিত্র নির্মাণে স্রষ্টার এই সব উপন্যাসে দেশ কাল অতিক্রম করে মানুষের বিস্তীর্ণ অধিকারের কথা আছে। কোনও জাতির ঐতিহ্য, ঈশ্বর বিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্নতাই শেষ কথা নয়, তার উপরেও আছে আত্মপ্রত্যয় এবং মানবিক দায়। এই সাহিত্যমালা অর্থাৎ 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থেকে 'ঈশ্বরের বাগান' সর্বত্র একজন যাযাবর মানুষের জীবন অন্বেষণের কাহিনী বিরচিত। সব উপন্যাসগুলিই একে অপরের পরিপূরক।

শুধু জীবন নয়, শুধু ইতিহাসও নয়—মানুষ যখন বেঁচে থাকে, তার জীবন সত্যও বেঁচে থাকে। মানুষ এবং তার জীবন-সত্যের খোঁজে লেখকের এই যাত্রা। এই যাত্রায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র নায়ক সোনা বিম্ব হয়ে আছে এই আধুনিক মহাভারতে।